

UK-1404770-11-P036087

(11)

P 36,087

সূচীপত্র : ৪০তম বার্ষিক সংখ্যা

জয়ন্তী : বৈশাখ : ১৩৮২

লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
হরপ্রসাদ বৈশাখ		মহাবীরের নির্বাণ		
সম্পাদকীয়	১	পঞ্চবিংশ শতবার্ষিকী		
জান সম্পাদকীয়	৩		অমলদাশঙ্কর রায়	১৫
গীতা		(প্রবন্ধ)		
অমলধর চারপিক	৫	চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সবুজ বিপ্লবের		
বিনদেবতা তান্ত		তাৎপর্য	অধ্যাপক রাখাল দত্ত	১৭
১) হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	(প্রবন্ধ)		

গম বিপ্লব ! সবুজ বিপ্লব !! কৃষি বিপ্লব !!!

১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে এ রাজ্যে গম বিপ্লব শুরু।

পশ্চিমবাংলায় গমের একর প্রতি ফলন সারা

ভারতের গড় ফলনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি।

* গম বিপ্লবের জোয়ার ক্রমেই বেগবতী হয়ে চলেছে এ রাজ্যে।

সাল	জমির পরিমাণ (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)
১। ১৯৪৭-৪৮	৯১	২১.৭
২। ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১	১১৬	২৫.৪
৩। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬	১১৫	৩১.৯
৪। ১৯৬৭-৬৮	১২৫	৭১.১
৫। ১৯৬৯-৭০	৫১১	৪৮১.৯
৬। ১৯৭১-৭২	১০৪৪	৯২১.২
৭। ১৯৭৪-৭৫	১০৪৫	৯০০.০ (অনুমান)

গম বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের স্বয়ংস্বরতার দিশারী।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুত

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহা বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখা মন্ডর গতিতে অতি দীর্ঘে দীর্ঘে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেকচাঁদ ঠাকুরের পত্নীরাজ বংশ বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ চাবুক পড়িলে চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রাম কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখি কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বা যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল একাল' থেকে)

কলকাতা/রাজনারায়ণের কলমে



রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি সেটা গত শতকের গোড়ার। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহমানুষের মনে কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জন বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ি বাড়ি জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তা প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্ডর দ্রুতগা যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল। তা প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিকে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমে মূর্তি। এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

MP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (দে)

সূচাপত্র : ৪০তম বার্ষিক সংখ্যা

জয়ন্তী : বৈশাখ : ১৩৮২

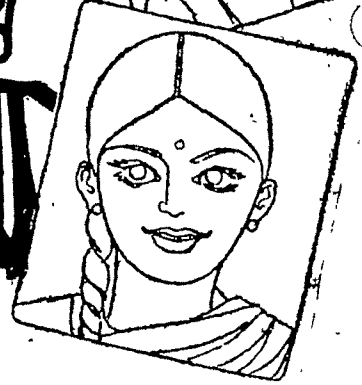
লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পূর্ব এশিয়ায় অসমাপ্ত বিপ্লবের সমাপ্তির এক ধাপ (সমীক্ষা)	২২	একমাত্র তখনই (কবিতা)	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৫৬
বিশ্ববিজ্ঞানায়ের স্বপ্ন (আলোচনা)	৩৫	ভারতবর্ষ বিষয়ক (কবিতা)	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৭
ডা ও বই পাড়া অধ্যাপক দেবদাস (প্রবন্ধ)	৩৩	নিজেকে (কবিতা)	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮
য জীবনের ধারা (আলোচনা)	৪৩	আমার ঐশ্বর্য তুমি (কবিতা)	শান্তীশীল দাস	৫৮
গ ছোপপুঞ্জ* রূপেন্দ্রনাথ ঘোষ (আলোচনা)	৪৯	তীর্থপথে (বাংলাদেশের বিপ্লবতীর্থ)	ডাঃ নরেন্দ্র সরকার	৫৯
স্মৃতিম (কবিতা)	৫৫	পুস্তক-পরিচয়	সমদর্শী	৬৩
		চিরঞ্জয়ী আত্মার শক্তি	অনামী	৭০

সম্পাদক : সুনীল দাস

WITH THE COMPLIMENTS OF

TATA STEEL

ইউবিআই-এর রেকারিং ডিপজিট স্কীমে



প্রয়োজনের সঙ্গে

তাল রেখে সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠে

কখনো না কখনো নিশ্চয়ই আপনার একসঙ্গে থোক টাকার দরকার পড়ে। আমাদের রেকারিং ডিপজিট স্কীমে আপনার পরিকল্পনামত সঞ্চয়ের সুবিধে আছে। পাঁচ থেকে পঁচাত্তর টাকার মধ্যে সাধ্যমত একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে জমাতে শুরু করুন। আপনার পক্ষে সুবিধেজনক মেয়াদ আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন না, আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদে কেমন বেড়ে ওঠে।

জরুর হলে টাকা থাকে না, সত্যিকার কাজও লাগে না, সেটাই নিয়মিত জমালে আপনি একসময় মোটা টাকা পাবেন। ধরুন, ৭২ মাসের মেয়াদে প্রতি মাসে আপনি ১০ টাকা করে রেখেছেন। মেয়াদ শেষে আপনার তাহলে জমালো ৭২০ টাকা। কিন্তু ইউবিআই আপনারকে দেবে ৯৮৩ টাকা। আজই ইউবিআই-তে একটা রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

মাসিক কিস্তি	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন					
	১২ মাস	২৪ মাস	৩৬ মাস	৪৮ মাস	৬০ মাস	৭২ মাস
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
৫	৬৩	১৩০	২০৭	২৮৯	৩৭৮	৪৯১
১০	১২৫	২৬১	৪১৪	৫৭৮	৭৫৭	৯৮৩
২০	২৫১	৫২১	৮২৭	১১৫৫	১৫১৩	১৯৬৬
৩০	৩৭৬	৭৮২	১২৪১	১৭৩৩	২২৭০	২৯৪৯
৪০	৫০১	১০৪৩	১৬৫৪	২৩১০	৩০২৭	৩৯৩২



ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

ASA-UBI-747

“ছাড়া ডাক, হে রুজ বৈশাখ !”

একটি রুজ বৈশাখের ডাক এসেছে।
কলে-আসা বছরের সীমানা পার হতেই
তোরণ-দ্বার আমাদের অভ্যর্থনা
। “মুখে তুলি বিষণ্ণ ভয়াল”-এর ডাক
অভ্যর্থনা, যে অভ্যর্থনার ডাক শুনে
শ্রু দক্ষতৃণ দিপস্তের পারে
নিস্তরু নির্বাক—”

মী ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকতে হবে।
বৈশাখের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে
তন বছরের যাত্রা শুরুতে আমরা অরণ
আমাদের প্রতিভাধর পুরোগামীদের,
র আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের
ী ও শ্রুগদের, যারা জয়ন্তী পরিচালনায়
শেষে রয়েছেন।

হরের অন্তরালে কোন্ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
হে, তা শুভ কি অশুভ, অন্তর্মামীই সে-

কথা জানেন। কিন্তু আমাদের জাগতিক বিচারে
দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যে শক্তি-
সমাবেশের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তাকেই আমরা
বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি। দেশের অভ্যন্তরে
আর্থিক ছর্বোপের অঙ্ককার আরও বনিয়ে আসবার
সূচনা বছরের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে। মাত্র কিছুদিন
পূর্বে ভারত সরকারের কর্তাব্যক্তির উল্লসিত হয়ে
উঠেছিলেন গত সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে মাত্র
৮ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু সে উল্লাস কণিকের।
এপ্রিল থেকেই মূল্যবৃদ্ধি আবার উর্ধ্বপামী। অর্থমন্ত্রী
স্বীকার করেছেন সামান্য মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু এক
বিতর্ক জুড়ে দিয়ে বলেছেন এটা মৌসুমী
(seasonal) না ইনফ্লেশনের চাপে তা সঠিক বলা
যায় না। এই মূল্যবৃদ্ধি নাকি সর্বস্তরে (‘all-
round’) হয় নাই এবং মস্তুর মতে সরবরাহ
ব্যবস্থায় অবরোধের জন্তই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে কিনা

সেটাও দেখা দরকার। অপরদিকে ইনফ্লেশনের মাঝখানে মন্দার আবির্ভাব, এক নতুন সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। মোটর-শিল্প, ওয়াগনশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মোটা বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্প এই নতুন ব্যাধির আক্রমণে পযুঁদন্ত। এই ব্যাধির নাম ষ্ট্যাগফ্লেশন (stagflation)। মন্দার ইংরাজী stagnation এবং Inflation-এর সন্ধি করে এই শব্দটির উৎপত্তি। সরকার ঋণদান নীতি সঙ্কুচিত করেছেন ব্যাঙ্কের নুদের হার চড়া করে, বাজারে মুদ্রাসরবরাহ কমিয়েছেন তা সত্ত্বেও বাজারে প্রচুর টাকার যোগান রয়েছে—এই টাকা কালোটাকা, যার পরিমাণ ১১,০০০ কোটি টাকায় পৌঁচেছে বলে সরকারী অনুমান—এই টাকার গোপন লেনদেনে মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেও মন্দার সৃষ্টি। তাছাড়া আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্যে মন্দার ধাক্কা আমাদের অর্থনীতিতে মন্দার জোয়ার বেগবান করে তুলবে। এর উপর মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। টাকার দাম ১৯৭৫-এ ২৫ পয়সায় নেমে এসেছে,—১৭ই মে বাংলাদেশ স্টার্লিং-এর অনুপাতে তাদের মুদ্রা টাকার মূল্য শতকরা ৫৮ ভাগ হ্রাস করেছে যার ফলে ভারতবর্ষের পাটশিল্প আরও সঙ্কটের আওর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই ঘটনাক্রমগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে কল কারখানা বন্ধ হবে, হাঁটাই বেকারী বাড়বে—কলে আইন-শৃঙ্খলারও অবনতি হবে। অর্থনৈতিক সঙ্কট দারুণ বিক্ষোভ ডেকে আনবে।

এবারকার রবিশস্তুর সংগ্রহের মাএ ৫৫ লক্ষ টন পূরণ হবে কিনা তাও সংশয়ের বিষয়। কারণ

১৯শে মে পর্যন্ত মাত্র ১৫ লক্ষ টন সংগ্রহ গন্তব্যের খরিকের সংগ্রহমাত্রা হতাশাবাঞ্জক। ভাল খরিক হলে, কিছুটা সামলাতে পারতো। কিন্তু সেটাও অনিশ্চিত। ইনফ্লেশন ও মন্দার পাপচক্র ভাঙতে আয়ুপাতিক মান (devaluation) যেমন অনিবার্য হবে, তেমনি হবে টাকায় অবঃ (demonetisation)।

এরই মধ্যে গুজরাতের নির্বাচনে শক্তি চলেছে। কংগ্রেস বিরোধীদের জনতা ফ্রন্ট ৭ ফ্রন্টগুলির পাঁচমেশালী যোগবিয়েগের উর্ধ্বে পারতো যদি একটি মাত্র নির্বাচনী প্রতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাদের সম্ভব হতো। মন্দের ভাল, দেশের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটে প্রতিপক্ষ শাসকদলের বিরুদ্ধে একটি মাঃ সংযুক্তির (merger) জন্ম সর্ব-সংগঠন কংগ্রেস, জনসত্ত্ব, লোক সোস্যালিস্ট পার্টি ভাবছেন। হয়তো বা এ-পথে এগিয়েছেনও, তবে জনতার জীবনে আনবার দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি এই সংযুক্তি পার্টির নেতৃত্ব ক্ষমতা কয়ায়ত্ত করাকে মনে করেন, তাদের আবার বিচ্ছিন্ন হতে লাগবে না। খণ্ড খণ্ড স্বার্থবোধকে অতিক্রম অথবা জাতীয় স্বার্থের বৈশ্ববিক দাবির প্রবল ওপরই এই সংযুক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করবে বাদের ভক্তমা রইলো, অথচ তার আড়ালে (শেষাংশ ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

পরিণত বয়সে সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে সুপণ্ডিত, দার্শনিক, মানবতাবাদী ও সর্বোপরি কৃত্তী শিক্ষাবিদ প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ৮৬ বছর বয়সে গত ১৭ই এপ্রিল কিছুকাল রোগভোগের পর মাদ্রাজে লোকান্তরিত হয়েছেন।

বিগত এক শতাব্দী ব্যাপী কালের পরিধিতে ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত বাণীকে, যে কয়জন কৃত্তী সন্তান তাঁদের প্রতিভা ও সাধনাবলে পৃথিবীর ইন্দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন, পরিচিত করেছেন এবং মর্যাদার আসনের স্বীকৃতি সংগ্রহ করেছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন তাঁদের অগ্রতম। রাজা রামমোহন রায় পশ্চিমের ভাবনাকে পূর্বের ছায়ায় অভিযন্তা জানিয়ে বাংলা তথা ভারতে নবজাগণের সূচনা করেছিলেন। পশ্চিমের সঙ্গে প্রাচ্যের এই সমন্বিত ধারা ভারতবর্ষে বুদ্ধির দীপ্তি, বিজ্ঞানের আলো ও যুক্তির প্রস্রবণ, বিশ্বাসের বেদীকে পরিশোধিত করে সমন্বিত জীবনবোধের এক বেগবান ধারা প্রবাহিত করেছিলো। কিন্তু ভারতবর্ষের আত্মপুরুষের দৃপ্ত বারিচয় পাশ্চাত্যে পৌঁছে দিয়ে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টিতে সৃষ্টির অদ্বিতীয় পুরোহিত ছিলেন শিক্ষণশ্রমের মন্দিরের আধুনিক শিক্ষাবিহীন আত্মদর্শী সাধক ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হাতে গড়া

মন্ত্রশিষ্য পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের ধারা বহন করে ভারতের যে কয়জন মুষ্টিমেয় কৃত্তী সন্তান ভারতের আত্মাকে বিশ্বের ছায়ায় সপৌরবে পৌঁছে দিয়েছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁদের শেষতম উজ্জল প্রতিনিধি। জাগতিক পাওয়া, সাম্রাজ্যের ভাঙাপড়ার ইতিহাসে মানুষের অভিযাত্রায় কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, আত্মার আবিষ্কারের অভিযাত্রায় সত্যাত্মসন্ধানীর কাছে, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তার জীবনে যেমন সে বাণীর স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তেমনি সেই উপলক্ষকে সঞ্চালিত করে মানবজীবনের সমৃদ্ধি সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। অনব্যদ ভাবায় এই অল্পভূমি ব্যস্ত করেই তিনি লিখেছিলেন : “The greatest fact in the story of man on earth is not his material achievements, the empires he has built and broken but the growth of his soul from age to age in his search for truth and goodness,” মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একটি লেখায় তাঁর এই উপলক্ষের উল্লেখ রয়েছে।

শিক্ষাবিদরূপে রাধাকৃষ্ণণ ভারতবর্ষে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে শত শত ইংরেজী শব্দের অনর্গল প্রবাহে ধীশক্তির

সঙ্গে ভাষার ছন্দের একটি সুরপ্রবাহ সৃষ্টি করে শ্রোতাদের চমকিত করেছেন। ১৯৪৭-এর ১৪-১৫ আগস্ট-এর মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘোষিত হবে ; সমগ্র জাতি বেতারের ঘোষণার জন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সহসা দেখা গেলো রাত্রি ১২টা বাজতে তখনও এক ঘণ্টা বাকী। রাধাকৃষ্ণান কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর মধ্যে আরোহণ করে শব্দ-বজ্রের গৌণে চললেন। নিমেষে ৪৫ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেলো এবং সমবেত শ্রোতাদের উৎকর্ষের আবেগে প্রশমিত হোলো।

রাধাকৃষ্ণান রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবিকতার অল্পম দার্শনিককে আবিষ্কার করে ১৯১৮ সালে বই লিখলেন “The Philosophy of Rabindra Nath Tagore”। তারপর চলে তার লেখনীর জয়যাত্রা এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে করে পড়ে সন্মানের অঞ্জলি। এমন কি এই সন্মান মন্ডো বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে তাকে অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত করে এবং মস্কোলিয়া তাকে ‘Master of Wisdom’ উপাধি দিয়ে।

অধ্যাপক মুইরহেডের অনুরোধে লেখা দুই খণ্ডে ‘Indian Philosophy’ গ্রন্থ, অক্সফোর্ড বক্তৃতা “The Hindu View of Life,” হারভার্ড আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা “Kalki or the Future of Civilisation” এবং ইংল্যান্ডের চার্চের বেদী থেকে বক্তৃতার সমাবেশ

“East and West in Religion” তার মনমার-
দিগন্তের স্বাক্ষর বহন করছে।

প্ল্যাটোর আদর্শের মাপকাঠিতে রাধাকৃষ্ণান ছিলেন দার্শনিক-রাষ্ট্রনেতা—যদিও রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি প্রবেশ করেন ১৯৪৭-এর পর। ১৯৪৯-এ মস্কোতে রাষ্ট্রদূতরূপে স্ট্যালিনের কাছ থেকে সন্মাননা অর্জন, ১৯৫২ সাল থেকে উপরাষ্ট্রপতিরূপে এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদে যোগ্যতার এবং দূততার সঙ্গে কর্তব্যপালন, ইতিহাসের পাতায় স্থায়িত্ব পেয়েছে।

১৯৬২তে চীন আক্রমণের সময় শিক্ষাত্রুটী রাষ্ট্রপতির অনমনীয় দূততার ফলে নেহেরু তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেকথা আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। দার্শনিক-রাষ্ট্রনায়ক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান সর্বোচ্চপদে থেকেও সাধারণের সমতলের সমীপবর্তী হয়ে সারাজীবন সাধনা দিয়ে ভারত-সংস্কৃতির প্রবল প্রবক্তারূপে মানবতাবাদের জয়পান গেয়ে গেছেন।

বাইট্রাও রামেল বস্তুতই বলেছেন : “...he is one of those who serve to make the culture of India one of the glories of human achievement.”

এই দার্শনিক-রাষ্ট্রনায়কের স্মৃতির প্রতি আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি।

“প্রতিদিন তব গাঁথা গান আমি সুমধুর”

চারণিক

মহাকাল সম্বন্ধিত কোনো লেখাই যখন চারণ লিখতে বসে, তার খেঁই হারিয়ে যায়। কোথা থেকে আরম্ভ করবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোকপাত করবে। দেশেবিদেশে ভ্রাম্যমান ‘স্কাউট’ নানা সময়ে নানা ছিন্নপত্র চারণের ঝোলায় ফেলে দিয়ে যায়, আর যখন সুযোগ ঘটে চারণের মহাকালের বৈঠকে বসার, তখন চলে ফল্গুয়ারা। সে ধারায় চারণ পরম আনন্দে অবগাহন করে, কিন্তু সীমিত জ্ঞান নিয়ে মহাকালের অন্তর্দেশীয়, আন্তর্জাতিক, জাগতিক, বহির্জাগতিক নানা আলোচনার সবটা সমঝে নিতে পারে না। তবু চারণ এক নবতম মহাভারত, নবতম রামায়ণের খসড়া লিখে চলেছে। দেশ, মাটি, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি এই বিষয়গুলি নিয়ে মহাকাল আলোচনা করেন সত্য, কিন্তু এই মহাসাধকের ‘হেথা নয় অস্ত্র কোথা’র, beyond this world-এর যোম মহাযোম মানব জীবনের গুঢ় রহস্যের তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ বেশী। অথচ সেই অমূল্যরত্নরাজী সংগ্রহ করে রাখার ক্ষমতা চারণের নেই, যোগ্যতাও নেই। এক বিস্ময়কর অমুভূতি নিয়ে চারণ শুনে যায়। চারণ স্থির করেছে আজ যেমন মন চায়, ঝোলায় যা যেমন উঠবে তা-ই পরিবেশন করবে।

ছিন্নপত্র ১

“আজ আটদিন হলো, লিখে রেখেছিলাম, চিঠিগুলো, দফায় দফায় লিখেছি প্রত্যেক দফা লিখে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারার আগেই, “এমন কিছু হোচে যার উপযুক্ত ব্যবস্থার” কাজে (অন্তসব দৈনন্দিন কাজ স্থগিত রেখে) নিজেকে লাগাতেই হোচে।

উপরি উপরি এই টানা পোড়েন, ভেতরের রক্ততা শুকতা বাড়িয়েই ছায়। ভাবি কোন্ সে লগন ছিলো যে লগনে এ শরীর ধরায় নেবেছিল।

সৌমাহীন চলার পথে, দিব্য আকাশ থেকে টপকে পড়া স্নিগ্ধ শিশির কণা : মনে করেছিলাম, এই স্নিগ্ধ কণার হাঙ্কা হোঁচাচ পেনে, ভেতরের দহন ছালায় কিছু শান্তি, কিছু শীতলতা পাবো। কণিকের স্বরেও ছালায়-হাঙ্কা স্তিমিত হবে। কিন্তু হায়রে! মূঢ় আমি চিরন্তন পথিক।

অজানা আশার আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে দেখি, দূরের—সুদূরের এক স্নিগ্ধ শান্তিময় প্রদীপ-

জ্যোতিষ পানে। চিরজাগরক স্নিগ্ধ মেত্র দিয়ে; সে প্রদীপ-জ্যোতি চির আবাহন নিয়ে জেগে আছে—
বাতে; প্রান্ত পরদেশী পথিক ককীর দিশেহারা না হোতে পারে। শান্ত স্নিগ্ধ মধুর-নীরব-ইশারা,
A Beacon—Beacons !”

ছিন্নপত্র ২

“পৃথিবীর মাটি হোয়া থেকে—উপরে উপরে—উপরে এই ভাবে পরের-পর স্তর আছে।—
সর্বশেষে মহাস্তর তক্। এই “উপরে—উপরে—উপরে তারো-তারো-তারো-উপরে” যদি বোঝা, তবে,
এটা দাঁড়ালো—পৃথিবীর চারিদিকেই—সবদিকেই ঘিরে। পৃথিবী এই পরপর উপরি উপরি স্তর
(স্তরশ্রোত) বেইনীর মধ্যেই, নিজের পথের গতি প্রাপ্ত হোয়ে ঘুরে-ঘুরে মেচে চলেচে। প্রকৃত সত্য
এই যে, পৃথিবী ঘোরে (নৃত্যে আবর্তনহন্দে) ছয়টি পোকে (পাক্কা নৃত্যপট্ট মেয়ে) ॥

চারিদিকের (উপরের) স্তরশ্রোতের যে পরপর আবরণসমূহ (এই রক্ষাকবচগুলো না থাকলে,
নিম্নেই পৃথিবী ভেপোরাইজড্ হোয়ে অদৃশ্য হোয়ে যাবে।) (তারো) পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে
নিজের পতির-স্থিতির 100% মিথুঁতভাবে ‘একমিল’ রাখে। এই সব স্তরের কনস্টিটিউটিং পারটি-
কলস্-এর ডেনসিটি সর্বত্র সমান একরকম নয়। কোথাও কোথাও ঐ ডেনসিটি এতই কম যে, পারটি-
কলগুলো অনেক দূর দূর ছড়িয়ে বিছানো। ফলে এই সব অতীব সূক্ষ্ম (মানুষের হিসেবে) মা-
বরাবর ডেনসিটির জায়গাগুলো দেখাও যায় না—বোঝাও যায় না—ধরাও যায় না। এই জট্টাই
(মানুষের মগজকে চমকে না-দিয়ে) বোঝাবার জন্তে বলা যায়—“ব্ল্যাক স্পট” “ব্ল্যাক প্যাচ”
“ব্ল্যাক হোল” এই প্রায়শুঁত ডেনসিটির-প্যাচগুলি উপরের নীচের-সমস্ত স্তর নিয়ে (ভেদ করে ?)
“টানা” (বিস্তৃত) টানেলের মত বলা চলে। এর লক্ষ্য বিস্তৃতি, কোনো কোনো বিশেষ স্তর পর্যন্ত
চলেও শেষ হয়। অর্থাৎ এই জায়গাগুলো সূক্ষ্মজায়গা।

ফলে: এই অলমোষ্ট Blank ডেনসিটির (না-দেখতে পাওয়া) প্যাচে-হোলে-স্পটে যে জিনিষ-
বা যা কিছুই পড়ুক না ক্যানো:—গ্যাংবোরে সাক্‌ড অজটব হয় যায়, এবং ছউশ করে সাক্‌ড্।
(খুব, বেড়ে মজার কথা; কি বলো? goose flesh হচ্ছে না, কি ?! য্যা !)

মানুষের স্মরণচোখের দৃষ্টিশক্তি সীমিত। সূক্ষ্ম জিনিষ দেখতে পায় না। যোগীদের সূক্ষ্ম-
শরীরে ভ্রমণ, দেবতাদের, বন্ধ-রন্ধ-জিন্দ-পরী-গুরু-অঙ্গরা-ভূতবোনি-প্রেতবোনি, আমাদের চারিদিকে
প্রায় সব সময় (ভূতবোনি) সর্বত্রই ঘুরছেন, যাচ্ছেন—আসছেন—দাঁড়াচ্ছেন; সাধারণ আমরা দেখতে
পাচ্ছিমে ॥ কিন্তু তাদের সত্য সত্য।

৭ “প্রতিদিন তব গাঁথা গাব আমি হুমধুর”

এই দীনাতিদীন পথিক ফকীর “মৃতভূত” তোমাদেরকে, মিথো ভাঙতা ছায়ানি। অর্ধাটীন “সাইন্টিস্ট রা”-ও (scientist), জানতে পেরেচে নিশ্চিত রূপে ANTI বা BLACK অ্যাটমের অস্তিত্ব। কিন্তু ধরতে পারেনি। অ্যান্টি বা ব্ল্যাক অ্যাটম, বস্তু, রীজান—Region, গ্লোবস আছে। এই গ্লোবের বাসিন্দা আছেন। এই সব জিনিষে আয়নার দেখার মত উন্টো প্রতিফলিত হচ্ছি আমরা।

এই Anti বা Black পৃথিবীর লোকেরা, আমাদের চাইতে অনেক-অনেক বহু উচ্চস্তরের। এই Truth সব সময়ে মনে রাখবে : আমাদের ম’ জননীর স্মৃতির, স্মৃতিস্মৃতি কণাটি পর্যন্ত নিরঞ্জিত ॥

এই Black or Anti জগতের “ওঁরা”, ইচ্ছা মতন, নিজেদের যানবাহনে বেরিয়ে বেড়ান (অবশ্যই তাঁদেরই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে) ॥ কখনো কখনো (ভেরী-ভেরী-রয়রলী) অন্য গ্যালাকসার দিকেও এগোন। বাট দে আর নেভার গ্যালাক্সিও, ট্রান্সগ্রেসিং প্রোটেক্ট-বেন্টস্। বি-কজ্-কন্ট্যাক্ট মিন্‌স্ ক্র্যাশ্‌বাম্‌ডাষ্ট।

1949এ, সর্বপ্রথম, ওঁদের জগতের সীমারেখা দেখতে পাই ; —দূ-উ-র থেকে ॥ প্রথমে তো বুঝে উঠতেই পারিনি “এ দূরে, এ আভাষের মতন কী ? কি ওদিকে ? ।.....”

[এই পত্র এসেছিল চারণের ‘এ মহামানব আসে’ গ্রন্থের ২৩৭ পৃষ্ঠা ও ২৩১ পৃষ্ঠার বক্তব্যের আরও সহজ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ।]

চারণ অভিব্যক্ত হয়ে পড়ে যখন ভাবে এ কোন্ ভাগ্য যার জ্বরে চারণ মহাকালের এমন অপার করুণা অমুণম স্নেহের অধিকারী হল, মনের মণি কোঠায় ছলছলিয়ে ওঠে স্বপ্নালু—বুটিশ গোয়েন্দা বিভাগের ভাষায়—দেশনেত্রীর Large luminous চোখ ছুটি। তাঁর আশীর্বাদে আজ এই সুযোগ।

মহাকালের আরও অনেক বক্তব্য প্রকাশের ছিল, যা পত্রাভাবে আগামীর অন্য তোলা রইল।

বৈঠকে

মহাকালের বৈঠকে একটি বিষয় আলোচিত হয়েছিল, বক্তব্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক কোনো কোনো ঘটনার ছায়া ছিল। বিষয়কর এই যে যখনই, কোনো ঘটনা পূর্ণতার রূপ নিতে যাচ্ছে final shape নিতে যাচ্ছে, বা সেই final shape এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। মহাকাল চারণের ধারণায় তার পূর্বমুহুর্তে এই সাধারণ অবুঝ স্রোতাদের সে ঘটনার ইশারা দেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন

৮ জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৮২

শক্তির পরাজয় এবং কবি-রাষ্ট্রনেতার রাজ্যের স্বাধীনতার কথাও তিনি এমনি এক মুহূর্তে দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী অনর্গল বলে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর ভাষায় 'তোমাদের পূর্বাহ্নে বলা মানে আরও পাঁচজনকে তোমাদের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া এবং ফলে সমস্ত পক্ষকে সচেতন করে দেওয়া।'

মহাকাল এই বৈঠকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি দেশে একটি খরশ্রোতা বড় নদীতে ভ্রমণের একটি বর্ণনা দিলেন। আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন—“একটি রাজ্যের যার অস্তিত্ব নেই, সেই রাজ্যের অত্যাচারে দেশবাসী অস্থির, কিন্তু তার একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সব সময় এই মহারাজার সব*protect করে কাজ করতেন। It is a Historical fact। আমি শুধু রাজ্যের নামটা নিলাম না। / Crown Prince, বজ্রেন তিনি একজন Citizen হয়ে থাকবেন। অল্পপরিমাণ বীজকে রোপণ করে তাকে প্রতিপালন করলে একদিন এক বিরাট মহৌরুহ হয়ে দাঁড়াবে। এই Crown prince একা এক সংগঠনের মাধ্যমে monarchy থেকে presidentship শাসনতন্ত্র প্রচলন করলেন।”

আজ চারণ ভাবছে একোন্ রাজ্য, কী ঘটনাই বা ঘটলো সম্প্রতি, মহাকালের মাতৃযজ্ঞে কোনো আকস্মিক আরোপিত ঘটনা নেই, স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে তা বাঁধা, নির্ধারিত পথেই এগিয়ে চলেছে।

(চলবে)

২০-৫-৭৫

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনদেবতা তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠেছিল একটি দোটারার প্রভাবে। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে প্রকৃতির মধ্যে তিনি এক প্রচ্ছন্ন সর্ব-ব্যাপী সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তার সহিত তিনি শ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অবকাশ পান নি। তাই একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে পিতৃরূপী ঈশ্বরের কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তাতেও হৃদয়-বৃত্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তি ঘটেনি। তাই এল জীবন-দেবতা তত্ত্ব। তা যেন এ দুয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করে তাদের সহাবস্থিতি সম্ভব করায়। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনে হয় তিনি অবহিত ছিলেন। তাঁর সমালোচক অধ্যাপক টমসন-এর কাছে তিনি তার ব্যাখ্যা করে যে চিঠি লেখেন তা এই প্রতিপাত্ত সমর্থন করে। সেখানে তিনি বলেছেন জীবনদেবতা তত্ত্বের দুটি দিক আছে। একটি দিক উপনিষদের ব্রহ্মবাদ সমর্থন করে। সেখানে ব্রহ্ম বিশ্বের নিয়ামক শক্তি। অপর দিক বলে, তিনি অতিরিক্তভাবে ভক্তের হৃদয়ে স্থান নিয়ে তার সহিত শ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসুক। এর মধ্যে উপনিষদের সর্বেশ্বর-বাদের সহিত বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের বৈতণ্যবাদের যেন মহান স্থিতি ঘটেছে।^১

এই জীবনদেবতা তত্ত্বের উৎপত্তি সংঘটিত হয়েছে খানিকটা দিব্য-অনুভূতির ভিত্তিতে, খানিকটা চিন্তার ফলে। দিব্য-অনুভূতির কথাই প্রথমে বলা যাক। সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ হুঁজারগায় বিবরণ দিয়েছেন। একবার 'মাল্লেশ্বর ধর্ম (সংযোজন)' অংশে। আর একবার তাঁর হিবার্ট বক্তৃতা-মালায় যা 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' নামে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়ীতে। তিনি সেদিন স্নানের আগে দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে নববর্ষার জলভারনত মেঘের শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর অন্তরে একটি ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সত্তা রয়েছেন যিনি কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করছেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মনে ধারণা জন্মাল যে একটি বিশেষ সত্তা তাঁকে এবং তাঁর বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নিজের

is the Vaisnava dualism always keeping the separateness of the self and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual and is also the ground reality of all as in the Vedantic unification.

১. The idea has a double strand. There

পূর্ণতম প্রকাশের সন্ধান করতেন। এই উক্তিটি পাই 'রিলিজিয়ন অফ মান'-এ।^২

'মানুষের ধর্মের' সংযোজন অংশে এই সস্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আছে। তাঁর ধারণা এই জীবনদেবতা ব্যক্তি বিশেষের অন্তরে থেকে তাঁর জীবনকে পরিচালিত করতেন। তাঁর ভূমিকা অনেকটা নাট্যকার এবং নাটকের নির্দেশকের ভূমিকার মত। তিনি বিশ্বনাট্য রচনা করেছেন, ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ ভূমিকা দিয়েছেন। অতিরিক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর জীবন-শিল্পী হয়ে জীবনকে গড়ে তুলতে উৎসুক হয়েছেন। নাটকের নির্দেশকের সঙ্গে অভিনেতার যেমন একটা শ্রীতির সম্বন্ধ আছে এবং তাকে কি ভাবে কি অভিনয় করতে হবে শিখিয়ে দিচ্ছেন, তেমন অভিনেতা ঠিক মত অভিনয় করতেন কি না তা দেখে তিনি সাক্ষ্যে আনন্দ পাচ্ছেন, অসাক্ষ্যে বেদনা পাচ্ছেন। অমুরূপভাবে জীবনদেবতা জীবন-নাট্যের অভিনয়েও আছেন তার বাহিরেও আছেন। তিনি ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়েই তার সহযোগিতা নিয়ে নিজের ইচ্ছাটি পূরণ করতে চাইতেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

২। I feel sure that some Being who comprehended me and my world, was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-wideing individuality which is a spiritual work of art.
[Religion of Man—The Vision.]

"কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও স্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে।"^৩

একেই রবীন্দ্রনাথ 'সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ' বলে বর্ণনা করেছেন। জীবনদেবতা অসীম এবং অশরীরী, ব্যক্তি-মানুষকে অতিক্রম করে তিনি পরিব্যাপ্ত। ভক্ত সসীম। ব্যক্তিবিশেষের বা ভক্তের হৃদয়ে স্থান নিয়ে, তার সহযোগিতা নিয়ে, তিনি তার জীবনকে পরিচালিত করেন, নাটকের নির্দেশক যেমন অভিনেতার অভিনয় পরিচালিত করেন। এর মধ্যে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। যে ভক্ত তাঁকে গ্রহণ করে তার সহযোগিতা নিয়েই তিনি তাকে ফুটিয়ে তোলেন। কারণ, এটা ত শ্রীতির সম্বন্ধ, জবরদস্তি কাজ করিয়ে নেবার ব্যাপার নয়। ভক্ত জীবনদেবতার সহিত সহযোগিতা করবেন কিনা, তা ভক্তের ইচ্ছাধীন। এখানে তিনি প্রেমের ভিত্তি, প্রেম ত জবরদস্তি করে পাওয়া যায় না। তাই তিনি বলেছেন এটি দুজনের সহযোগিতার লীলা : "সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ, কেননা স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না।"^৪

সুতরাং ভক্ত ও জীবনদেবতার মধ্যে এই লীলার প্রকৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত,

৩। মানুষের ধর্ম, ত, সংযোজন

৪। শাস্ত্রনিকেতন, বিশেষ

ভক্তের জীবনকে অবলম্বন করে উভয়ের পরস্পর সহযোগিতায় জীবনদেবতার ইচ্ছাটি ভক্তের কাজের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভক্তের সহযোগিতা করা তার ইচ্ছাধীন। সুতরাং, এই লীলা সাম্যের ভিত্তিতে অমুষ্ঠিত এবং উভয়ের প্রয়োজনেই এই সহযোগিতা। তাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই পরিকল্পনার একটি দৃষ্ট ভাব ফুটে উঠেছে। ভক্ত অবজ্ঞার পাত্র নয়, শ্রীতির প্রকাশের ক্ষমতা ভক্তকে ঈশ্বরেরও প্রয়োজন আছে। সেই দৃষ্টভাব এই কাব্যংশে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর

ভূমি তাই এসেছ নীচে

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হত যে মিছে। ৫

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় 'সীমার মাঝে অসীমের লীলা'। তাকে তিনি 'মধুর প্রকাশ'ও বলেছেন। এখানে ভক্ত ও দেবতা উভয়ে মিলে ভক্তের জীবনকে পরিস্ফুট করে চলেছেন। তাই ভক্তের জীবনের কর্মধারার মধ্যে দেবতারই ইচ্ছা তরঙ্গিত হচ্ছে। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,

আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা,

মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে

তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিত। ৬

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্বের মধুর রসের সাধনার সঙ্গে জীবনদেবতা তত্ত্বের সাদৃশ্যের কথা প্রসঙ্গত এসে পড়ে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধের চারটি সম্ভাব্য রূপের উল্লেখ আছে : দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গারকেই মধুর রস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী'।^৭ ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ কোন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তার ওপরেই এদের বিভিন্নতা নির্ভর করে। দাস্যে ঈশ্বরকে প্রভু কল্পনা করা হয়, বাৎসল্যে পিতা বা মাতা রূপে কল্পনা করা হয়, সখ্যে বন্ধুরূপে কল্পনা করা হয় আর মধুর রসে দয়িত বা প্রেমাস্পদ-রূপে কল্পনা করা হয়। সেখানে শ্রীতির সম্বন্ধের পরিপূর্ণরূপটি পাই। তাই তাকে মধুর রসও বলা হয়। শ্রীরাধার সাধনা মধুর রসের সাধনা।

জীবনদেবতা তত্ত্বের সঙ্গে মধুর রসের সাধনার মিলও আছে অমিলও আছে। মিল এই ক্ষণে যে উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীতি পরিপূর্ণতমরূপে প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু ছুটি তত্ত্বের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্যও আছে। রাধাভাবের সাধনায় ঠিক সাম্যের ভাব পাওয়া যায়না, তাঁর দয়িত যেন তাঁর থেকে বড়, এই ধরনের একটা চিন্তা বৈষ্ণব সাধন শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্য আছে। এখানে বলা হয়েছে রাজার রাঙ্গা হয়েও জীবনদেবতা ভক্তের প্রেমের ভিখারী। এই চিন্তায় সাম্যের বোধ অত্যন্ত প্রকট।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব সাধনায় ঈশ্বরের সহিত প্রীতির চর্চাই ভক্তের সমগ্র মন জুড়ে বসে। ফলে ভক্তের কল্যাণধর্মী কর্ম করবার অবকাশ থাকে না। কর্মবৃন্তি তাঁর এক রকম উপবাসে থাকে। ভক্তি ভাবকেই এই ভাবে সর্বস্ব করে তোলা রবীন্দ্রনাথের রুচি বিরুদ্ধ ছিল। তাঁর জীবনদেবতা কর্মযোগী, শুধু প্রীতির আশ্বাসনে তাঁর লীলা সীমিত নয়। তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন ‘কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরি’। কর্মের মধ্য দিয়েই মধুর রসের সাধনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় কেবল ভক্তির উচ্ছ্বাসে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তা হয়ে দাঁড়ায় ‘ভাবোন্মাদ মত্ততা’। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

“আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল, ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বাসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।”

বিশ্বসত্তারই যে জীবনদেবতারূপে ভক্তের হৃদয়ে বিশেষ প্রকাশ ঘটে এ বিষয় আগেই উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা থাকায় তা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারের মতে জীবনদেবতা একটি স্বতন্ত্র সত্তা। যে মন্তব্যটিকে ধরে এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা এই :

“বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে

লোকে, গ্রহচন্দ্রভারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অমুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ।”^১

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের এমন নানা পরিপূরক উক্তি পাওয়া যায়, যার সাহায্যে এ বিতর্কের সহজ মীমাংসা হয়ে যায়, বিভিন্ন বিরোধী মতের সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত হতে হয় না। তাই তাঁর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে স্থাপন করবার প্রস্তাব করি।

‘অরূপরতন’ প্রতীকধর্মী নাটক। তার বিষয় হল একটি কাহিনীর সাহায্যে জীবনদেবতার প্রকৃতির কিছু পরিচয় দেওয়া। তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি মন্তব্য করেছেন যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে স্পষ্টই বিশ্বদেবতার সঙ্গে জীবনদেবতার কোনো বিভেদ টানা হয় নি, তাঁরা যে উভয়েই এক, এই কথার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে :

“যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে আপন অন্তরের আনন্দরসে যীহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।”

‘শান্তিনিকেতনের’ ভাষণ-মালায় ‘সৌন্দর্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বশক্তির দুই পর্যায়ের প্রকাশ—একটি কালের প্রকাশ, অপরটি আনন্দের প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে তিনি ‘সত্য’ রূপে প্রকাশ। সেখানে তাঁর নিয়ম অমোঘ। আর আনন্দরূপে প্রকাশ সৌন্দর্যের মধ্যে। সেইরূপে

তিনি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে ভক্তকে বলেন : ‘আমাতে তোমাতে আনন্দ হোক ; তুমি স্বতঃ আমাকে গ্রহণ কর।’

বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতার একত্ব আরও স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয়েছে ‘শান্তিনিকেতনেরই’ অন্তর্ভুক্ত আর একটি ভাষণেতে। সেখানে তিনি বলেছেন, বিশ্বে যেখানে নিয়মের রাজত্ব চলছে, সেখানে তিনি ‘বিধাতা’, সেটা তাঁর কাক্সের প্রকাশ। আর একটি প্রকাশ আছে বহুরূপে মানুষের মনে। সেটাই আনন্দের প্রকাশ। প্রসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

“কিন্তু তিনি ত শুধু বিধাতা নন, ‘স এব বহুঃ’, তিনিই যে বহু।

বিধাতার প্রকাশ ত বিশ্বচরাচরে দেখছি, বহুর প্রকাশ কোন খানে? বহুর প্রকাশ ত নিয়মের ক্ষেত্রে নয়, সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে, প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে।” ১০

এই উক্তিগুলি হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা ও বিশ্বসত্তার মধ্যে কোনো ভেদ টানেন নি। একই সত্তার যে তারা ভিন্ন প্রকাশ তা বোঝাতে তিনি কোথাও বলেছেন একটি সত্য-রূপে প্রকাশ, অল্পটি আনন্দরূপে প্রকাশ, কোথাও বলেছেন একটি বিধাতারূপে প্রকাশ অল্পটি বহুরূপে প্রকাশ। সুতরাং জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা পৃথক সত্তা নয়, একই মহাসত্তার দুই ভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ—একটি প্রকৃতির মধ্যে নিয়মরূপে অল্পটি মানুষের হৃদয়ে ভক্তের প্রেমের ভিধারী

রূপে। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ, অল্পটি ব্যক্তিরূপী প্রকাশ।

এই আলোচনার আরম্ভে বলা হয়েছিল জীবনদেবতা তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল খানিকটা দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে, খানিকটা কবির নিজস্ব মতিগতির পথে যুক্তির প্রভাবে। এই সমর্থক যুক্তি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন প্রকৃতির কাছ হতেই পাঠ নিয়ে। তাঁর প্রতিপাদ্য হল একই বিরাট সত্তা দুই বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা রাখেন। একটি প্রকাশ হল সমগ্র বিশ্বে ক্রিয়াশীল একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে। অপরটি হল ব্যক্তিবিশেষের কাছে ব্যক্তিস্ব-বিশিষ্ট প্রেমিকরূপে। প্রকৃতির মধ্যে তাঁর একটি সমর্থক দৃষ্টান্ত তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সেটি ‘উৎসর্গের’ একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১১

আমাদের সূর্য একটি বিরাট বস্তু, বিপুল তার শক্তি, আকাশের মত বিরাটতর আধার না হলে তাকে ধারণ করবে কে? অপর পক্ষে ঘাসের ডগায় লক্ষ্যমান শিশির বিন্দু একটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র বস্তু। উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক সম্ভব নয় বলেই মনে হবে। শিশির বিন্দুরও তাই ধারণা। তাই সে বলেছে :

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিতে কেবা,

গুণো তপন তোমার স্বপন দেখি যে

করিতে পারিনে সেবা।

কিন্তু সত্যই কি সূর্য তার কাছে ধরা দেয় না। তা যেমন বিরাট বিশ্বকে কিরণে ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে তেমনি শিশির-বিন্দু বক্ষে

প্রতিকলিত হবারও ক্ষমতা রাখে। তখন তাই উত্তরে বলছে :

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভাল।

এই উপমাটি মনে হয় অপূর্ব হয়েছে। এতে যেন রবীন্দ্রনাথের মনের ধারণার প্রতিধ্বনি পাই। সূর্যের দুই পর্যায়ে প্রকাশ। নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে মহাকাশে এবং ব্যক্তিক্রপী সত্তারূপে শিশিরবিন্দুর বক্ষে প্রতিকলিত হয়ে। বিশ্বসত্তারও প্রকাশ দুই পর্যায়ে, বিশ্বদেবতারূপে এবং জীবনদেবতারূপে, বিধাতারূপে ও বদ্ধুরূপে। একটি কাজের প্রকাশ, অপরটি আনন্দের প্রকাশ।

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে এক অবস্থায় গ্রহণ করে পরের অবস্থায় সরে এসেছিলেন। কারণ ব্রহ্মবাদ একটি নৈর্ব্যক্তিক

সত্তার জ্ঞানের পথে পরিচয় দেয়। সুতরাং তাতে হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের অবকাশ নেই। ভক্তিমার্গে ব্যক্তিক্রপী ঈশ্বরের সাধনায় হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের এবং তৃপ্তির যথেষ্ট সুযোগ মেলে। এই পথেই তিনি তাঁর জীবনদেবতা তত্ত্বকে লাভ করেছিলেন তবে ঔপনিষদিক চিন্তাকে একেবারে ঠেলে প্যারেন নি। তাই জীবনদেবতা তত্ত্বের মধ্যে দেখি নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদের সহিত একেশ্বরবাদের ব্যক্তিক্রপী ঈশ্বরের সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্তু এক অভিনব পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। এ-সত্যই এক অভিনব সৃষ্টি। সুতরাং দেখা যায় জীবনদেবতা তত্ত্ব উপনিষদের নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের ভক্তিভাষ্যের সহিত মিলন-মেল রচনা করেছে। তার সাহায্যে বিশ্বসত্তাকে জ্ঞান ও পাওয়া যুগপৎ সম্ভব হয়েছে।

মহানীরের নিৰ্মাণ পঞ্চবিংশ শতাব্দী

অন্নদাশঙ্কর রায়

উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যেমন পরম সত্য-জিজ্ঞাসা, বৌদ্ধ ও জৈনদের সৰ্বজীবে শ্রীতি ও হিংসার উত্তরে অহিংসা তেমনি পরম নীতিজিজ্ঞাসা। নীতি-ভ্রংশের প্রমাণ হাজার জড়ো হলেও অপ্রমাণিত হ'ব না যে নীতির দিক থেকে শেষকথা বলে গেছেন বুদ্ধ ও মহাবীর। .ক্রোধকে জয় করতে হবে অক্রোধ দিয়ে, ঘৃণাকে জয় করতে হবে প্রেম দিয়ে, অস্থায়কে জয় করতে হবে স্থায় দিয়ে, অহিংসা বলতে এসবও বোঝায়। এসব যাঁরা পারেন তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁদের প্রভাব অল্প নয়।

বত্রিশ বছর আগে আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখেছি লক্ষ লক্ষ মানুষ খেতে না পেয়ে মরছে, তবু পেট ভরাবার জন্তে গোবধ করছে না। বৈদিক যুগে কি এমন কথা কেউ শুনেছে? সে যুগে আর দশটা প্রাণীর মতো গোরুও ছিল ভক্ষ্য। গোহত্যার উপর বিরাগ পরবর্তী যুগের ব্যাপার। ততদিনে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম জনপ্রিয় হয়েছে। কেবল গোহত্যা নয় জীবহত্যামাত্রই ভারতের সাধুজনমানসে গতিত। সাধুসন্ন্যাসী বলে লোকে যাঁদের মানে তাঁরা সাধারণত নিরামিষভোজী। তাঁদের দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় নিরামিষভোজন ভারতে যেমন ব্যাপক আর কোনো

ভূখণ্ডে তেমন নয়। জাতকে জাত, শ্রেণীকে শ্রেণী, বংশকে বংশ নিরামিষভোজী হয়েছে কে জানে ক' শতক ধরে।

জৈনদের সঙ্গে আমি মিশেছি। কলেজে আমার এক বন্ধু ছিলেন। চতুরচন্দ্র জৈন। তাঁর নৈশভোজন সারা হয়ে যেত সন্ধ্যা না হতেই। পাছে আলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গ আসে ও ভোজ্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে উদরে চলে যায়। অল্পক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় যাতে অপরের প্রাণহানি না হয়। হোক না কেন সামান্য পতঙ্গ। তারও তো প্রাণ আছে। আর সে প্রাণও তো সমান মূল্যবান। প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের প্রতি পক্ষপাতের প্রশ্রয় দেয় না। বরঞ্চ বিপরীতটাই দেখতে পাওয়া যায়। সেটা অসমর্থনীয়। এ নিয়ে আমরা অনেক হাস্য পরিহাস ও তর্কবিতর্ক করেছি। চতুরচন্দ্র তাঁর ধর্মমতে অবিচল।

জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে খনিকরা প্রায় সবাই কলকাতায় চলে এসেছেন। একদা এঁদের সঙ্গেও আমার মেলামেশা ছিল। এই সব জৈন পরিবার বহু পরিমাণে আধুনিকতাসম্পন্ন তথা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হতে পারেন, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে অবিচল।

শত প্রাণোভনসংকল্পে তাঁরা আমিষভোজন করবেন না, সন্ধার পর খাবেন না। কে জানে এখন হয়তো সন্ধার পর ভোজন সম্বন্ধে তেমন কড়াকড়ি নেই, কিন্তু আমিষ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ কঠোর। হিংসায় উদ্ভূত পৃথ্বী। বহু জৈন যুবকও সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদলেও আজকাল আমিষাশী ও নিরামিষাশীদের জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। এটা জাত বা ধর্মের নিরিখে নয়। ব্রাহ্মণ অত্রাহ্মণ নির্বিশেষে গুজরাটী হিন্দুরা প্রায় সকলেই নিরামিষ-ভোজী। দক্ষিণের ব্রাহ্মণরা আমিষ খায় না। তবে মহারাষ্ট্রে ওটা চলে। উত্তরের ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী। বৈশ্যরাও তাই। ভারতীয় সৈন্যদল এখন আর ধর্ম অনুসারে বা জাত অনুসারে বিভক্ত নয়। কিন্তু ভোজ্য অনুসারে বিভক্ত।

যাদের পেশা হচ্ছে অস্ত্রধারণ, যারা আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত, কে জানে হয়তো একদিন যারা পারমাণবিক ব্রহ্মাস্ত্রও ব্যবহার করবে, তারা দেশভক্ত বলে সকলের সমাদর পেতে পারে, কিন্তু বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে কী করে, যদি পতঙ্গবধে বিমুখ হয় অথচ মহুগ্রবধে প্রস্তুত? ভয়ঙ্কর অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যারা যায় তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে নিরামিষ খাত্ত না পায় তবে কি তারা জৈন মুনিদের মতো অনশনে তপস্বীতাগ করবে? না প্রাণধারণের জন্তে আমিষ গ্রহণ করবে? এ রকম উভয়সঙ্কটে পড়ে দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ সৈনিক বর্মার রণক্ষেত্রে নির্ভিক মাংস খেয়ে প্রাণধারণ ও অস্ত্রধারণ উভয় কর্মই করেছিলেন। পরে বোধহয় গোময়

ডঙ্কপ করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। গজায় ডুব দিয়েছিলেন নিশ্চয়। অমুরূপ অবস্থায় জৈন সৈনিক হলে কী করতেন জানিনে।

মোগল ও ইংরেজদের এ জাতীয় কোনো উভয়-সঙ্কট নেই। সেইজন্তেই বোধ হয় তারা এত সহজে ভারত জয় করতে পেরেছিল। কিন্তু যাদের আছে তারা কেমন করে দেশরক্ষা ও নীতিরক্ষা ছুই কাজ একসঙ্গে করবে এটা সত্যি ভাববার বিষয়। তাঁদের সামনে যুদ্ধ যেমন একটা মহাপরীক্ষা, বিপ্লবও তেমনি আর একটা। এটা বিপ্লবেরও যুগ। বিপ্লব তো একালে যত্র তত্র ঘটছে। এদেশেও ঘটতে পারে। তার জন্তে যারা অধীর তাঁদের মধ্যে জৈনরাও আছে। বলাই বাহুল্য বিপ্লব মানুষকে কোনো মনোনয়নের অবকাশ দেয় না। বিপ্লবের অনিবার্য প্রয়োজনে নরহত্যাও করতে হয়, গোমাসও খেতে হয়, নয়তো পরাজয় ও মরণ। জাপান, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা আপৎকালে এসব মেনে নিয়েছে। ভারতের জৈনরাও কি মেনে নেবে? নেওয়া অসম্ভব নয়। একদা জৈন রাজারাও যুদ্ধক্ষেত্রে হুর্কির্ষ ছিলেন।

জীবনের মূলনীতিগুলো কেবলমাত্র সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের জন্তে নয়। ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, সৈনিক, প্রশাসক, রাজমন্ত্রী ও রাজমিস্ত্রী সকলেই মূলনীতির আমলে আসে। সবাইকেই বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া ও জনগণের সামনে দৃষ্টান্তস্থাপন করতে হবে। জৈন কিংবা বৈদিক হিন্দু কেউ এর ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধ বা বিপ্লব যেটাই আসুক না কেন, মূলনীতি হচ্ছে মূলনীতি।

চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য

রাখাল দত্ত

[চারটি কিত্তিতে অধ্যাপক রাখাল দত্ত এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করবেন। এই চারটি কিত্তিতে চীনের কৃষি-ব্যবস্থার চারটি পর্যায় আলোচিত হবে। জঃ সঃ]

চীনে ক্ষমতা দখলের ঐতিহাসিক অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত রেযারেসিও আজ বিশ্ববিদিত। কিন্তু এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মূল বিরোধ দেখা দিয়েছে সামাজিক ও আর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের প্রশ্নে এবং নীতি রূপায়ণের প্রশ্নে। সামাজিক ও আর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার উপর বেশি জোর দেওয়া হবে, না আর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এই নিয়ে চীনের নেতারা ত্রিধাবিভক্ত। কেউ মনে করেন বৈষম্য দূর করাই সবচেয়ে জরুরী কাজ। আবার অনেকে ভাবছেন সর্বপ্রথম আর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বাধীন না করলে অল্প কোনও কাজ সম্ভব হবে না। আবার তৃতীয় এক দলের মতে এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য নিয়ে আসা প্রয়োজন।

চীনের সমস্যা এ দিক দিয়ে দেখলে যে কোনও অলৌকিক দেশের সমস্যা। স্বল্পকালীন পরিশ্রমিক্তে বহুলাংশে পরস্পরবিরোধী দুটি মূল লক্ষ্যই চীনের

বৈশাখ '৮২—৩

বিভিন্ন সাম্প্রতিক আলোড়নের জন্ত বহুলাংশে দায়ী। কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে বিষয়টি এখনও অমোক্ষের নজরে পড়ছে না তা হচ্ছে এই যে, চীন তার সাম্প্রতিক ইতিহাসের টানাপোড়েন থেকে মোটামুটি একটা শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে, আদর্শের দিক দিয়ে যতই উগ্রতা থাক না কেন, প্রচারের ঢঙ্কানিনাদ যতই প্রবল হক না কেন, চীনের আর্থনৈতিক কার্যক্রম গোড়ার দিকের বছরগুলির তুলনায় আজ অনেকটা বাস্তবসম্মত। আরও একটু এগিয়ে বলা যায়, চীনের আর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রথম দিকের আদর্শগত জড়তা এবং রুশ ছক নকল করার প্রবণতা কাটিয়ে উঠে আজ মোটামুটি বাস্তবমুখী। এই সত্য চীনের আর্থনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন অংশে কমবেশি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে। কিন্তু কমানিষ্ট চীনের কৃষিতেই বোধ হয় তা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে। বর্তমান আলোচনায় সংক্ষেপে চীনের কৃষিনীতির বিবর্তনের বিশ্লেষণ করা হবে এবং দেখাবার চেষ্টা করা হবে যে এই বিবর্তন বহুলাংশে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের প্রবক্তাদের মূল প্রতিপাত্তের বিরোধিতা করেছে না, বরং তা জোরালোভাবে সমর্থনই করেছে।

মনে রাখা ভাল চীনের বিশাল জনসংখ্যার কথা।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর নাগাদ এই জনসংখ্যা ছিল ৮৩ কোটি ৫০ লক্ষ। ১৯৮০ সালে চীনের জনসংখ্যা হবে ১০০ কোটি এবং ১৯৯০ সালে ১৩০ কোটি। এই জনতাজলতরঙ্গের পটভূমিকায় কৃষির গুরুত্ব সহজেই চোখে পড়ে। প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে ২ শতাংশের মত। এই নতুন মানুষগুলোকে খাওয়ানোর জন্তাই চীনে তার খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়তে হবে প্রতি বছর অন্ততঃ ২ শতাংশ।

কিন্তু আরও আছে। কম্যুনিষ্ট চীন অল্প যে কোনও স্বল্পোন্নত দেশের মত শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলাই যথেষ্ট মনে করে না। চীন আর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়নের মাধ্যমে অল্পোন্নত দেশেরই মত জীবনযাত্রার মানও চায় তুলে আনতে। কিন্তু কৃষি উৎপাদনে সম্প্রসারণ না হলে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয় না। এই সহজ সত্য বিভিন্ন দেশের বেলায় বার বার প্রমাণিত হয়েছে। কৃষি শিল্পের কাঁচা মাল জোগায়, কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তিবিজ্ঞা ও যন্ত্রপাতি আমদানি সম্ভব হয় এবং কৃষির উপরেই বর্তমান শহরগুলোর ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সম্প্রদায়কে খাদ্যবস্তু সরবরাহ করার দায়িত্ব। ১৯৪৯ সালের পর কম্যুনিষ্ট চীনের আর্থনৈতিক ইতিহাসে কৃষির এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বারবার লক্ষিত হয়েছে। কৃষি উৎপাদন যখনই কমেছে, যেমন ১৯৫৩, ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালে, তখনই এক থেকে দুই বছরের মধ্যে শিল্পোৎপাদনও গেছে কমে। অল্প দিকে, যখনই কৃষিজাত পণ্যের

উৎপাদন গেছে বেড়ে, তখনই দেখতে পাওয়া গেছে শিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের দ্রুততর হার।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শিল্পোন্নয়ন নির্ভর করে কৃষির উন্নতির উপর। কিন্তু অল্প দিকে কৃষির সম্প্রসারণ কতটা শিল্পের উন্নতির উপর নির্ভর করছে? চীনের নেতারা অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন এক মত হতে পারেন নি। শিল্পকে যদি কৃষির জন্ত যন্ত্র, কীটনাশক ওষুধ, রাসায়নিক সার ইত্যাদি জিনিষ জোগাতে হয় তাহলে তার নিজস্ব উন্নয়ন কিছুটা সীমিত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু কৃষি যদি শিল্পের উপর নির্ভর না করে বাড়তে পারে তাহলে শিল্পজাত পণ্যের প্রায় সবটাই আরও দ্রুত শিল্পোন্নয়নের কাজে লাগানো যেতে পারে। কম্যুনিষ্ট চীনের পরিকল্পনাকারেরা এই জটিল সমস্যার সমাধানে একমত হতে পারেন নি। তবে গোড়ার দিকে সোভিয়েত রুশিয়ার আর্থনৈতিক উন্নতির কার্যক্রম অঙ্কভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা কৃষিকে যে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। চীনের কৃষিনীতির বিবর্তনকে আমরা দুটি যুগের সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে পারি। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল নিয়ে প্রথম যুগ এবং ১৯৬১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে দ্বিতীয় যুগ। এই দুটি যুগের মধ্যে মূল পার্থক্য হল সরকারী সম্পদের বিনিয়োগ নিয়ে। প্রথম যুগে কৃষিতে আপেক্ষিকভাবে মোট সরকারী সম্পদের সামান্যই বিনিয়োগ করা হয়। অধিকাংশ সরকারী সম্পদই যায় শিল্প, বিশেষতঃ ভারী

শিল্পের দিকে। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে দেখতে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ বিপরীত এক নীতি, এই সময় কৃষির গুরুত্বই শুধু নয়, তার প্রাধান্যও স্বীকৃত হতে দেখা যায়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থের বহুল প্রয়োগ, যন্ত্রপাতির বিপুল ব্যবহার এবং উন্নত বীজের উপর নির্ভরতা দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য। এই দুটি যুগ নিয়ে নীচে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল। মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, কম্যুনিষ্ট চীনের দ্বিতীয় যুগের অভিজ্ঞতা ভারতে তথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অকম্যুনিষ্ট দেশে গ্রহীত “নতুন কৃষি পদ্ধতি” বলতে যা বোঝায় তারই একটা বিশেষ রূপের প্রতিফলন।

কৃষিতে প্রথম যুগের কর্মকৌশল (১৯৪৯-৬১):

গোটা দেশটার উপর ক্ষমতা বিস্তার করার পর কম্যুনিষ্টদের প্রথম কাজ হয়েছিল যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ আর্থনীতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন। এই কাজ করেই তাঁরা হাত দিয়েছিলেন বৈষয়িক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনার কাজে। আগেই বলেছি এই সময় তাঁরা বহুলাংশে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং স্ট্যালিনের প্রদর্শিত পথে চলতে চেয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাই তাঁরা শিল্পের প্রসারে, বিশেষ করে ভারী ও সামরিক শিল্পের প্রসারের উপর জোর দিয়েছিলেন। মোট মূলধনের খুঁা সামান্য অংশই তাই কৃষির ভাগে জুটেছিল। ফলে কৃষিকে এই সময় নির্ভর করতে

হয়েছিল তার পুরনো প্রযুক্তি বিজ্ঞান উপর। এসময়ে মনে করা হয়েছিল জমিদারদের উচ্ছেদ করে ও রাশিয়ার ধরণে যৌথ খামার (কালেক্টিভ ফার্ম) স্থাপন করে কৃষি-বিভাগের উপর পিকিং-এর দৃঢ় রাজনীতিক ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যাবে।

চীনের নেতারা অবশ্য এই আশাও পোষণ করেছিলেন যে “কৃষির সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন” বা যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার ফলে বেশ কিছু সুফল দেখা যাবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়বার ফলে গ্রামের লোকদের খাজদ্রবোর ব্যৱহার কমিয়ে রাখা সম্ভব হবে এবং যেটুকু উৎপাদন বাড়বে তার প্রায় সবটাই শহরগুলোকে খাওয়াবার কাজে, শিল্পের কাঁচা মাল সরবরাহে এবং উন্নততর প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও সাজ-সংজ্ঞাম আমদানি করার জন্য দরকারী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কাজে লাগানো যাবে। শুধু তাই নয়, কৃষি-বিভাগের উপর আর্থনীতিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে সরকার কৃষিসংক্রান্ত যে কোনও নীতিও কার্যকর করতে অধিকতর সফল হবে, বলেও ধরে নেওয়া হয়েছিল।

প্রথমেই ভূমি-সংস্কারের কথা ধরা যাক। গ্রামের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রথমেই চীনা কম্যুনিষ্টরা চীনের পরম্পরাগত গ্রামীণ সংগঠন ভেঙ্গে ফেলার জন্য “আমূলক” ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। জমিদারদের বাদ দিয়ে দেওয়া হল—অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত অর্থের সঙ্গে আঞ্চরিক অর্থও। ৩০ কোটি দরিদ্র চাষীর মধ্যে ৪ কোটি

৬০ লক্ষ হেক্টর জমি পুনর্বন্টন করা হল এবং গ্রামাঞ্চলের আয়বিভাজনের প্রচলিত পদ্ধতি নষ্ট করে ফেলা হল। অর্থাৎ, এক এক জন চাষীর ভাগে পড়ল আধ একরের চেয়েও কম জমি।

কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক এই যে গ্রামাঞ্চলে জমি বন্টনের নতুন ব্যবস্থা মজবুত হবার আগেই নতুন নতুন সাংগঠনিক পরিবর্তন নিয়ে আসা হল। চাষীদের প্রথমে সংগঠিত করা হল তথাকথিত “পারস্পরিক সহায়তামূলক দলে” (‘মিউচুয়াল এইড টিম’)। তারপরই খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আনা হল এক ধরনের ট্রিলে ঢালা যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা ইংরেজীতে যেগুলো বলা হয় “এগ্রিকালচারাল প্রোডিউসার কোঅপারেটিভ্‌স অব এসোয়াস অর্ডার”। আবার সামান্য সময়ের ব্যবধানেই দেখা দিল পাকা পোস্ত যৌথ খামার যা রাশিয়ার কালেক্টিভ ফার্মের সঙ্গে তুলনীয় এবং যার ইংরেজী নাম “এগ্রিকালচারাল প্রোডিউসার কোঅপারেটিভ্‌স অব এ হাওয়ার অর্ডার”। এখানেই শেষ নয়। তার পরই দেখা দিল চীনের “কমুন”। গোড়ায় এই সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ১৫ বছরে আনা হবে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সালের মধ্যেই চাষীদের ৯৯ শতাংশকে টেনে আনা হয় সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে।

গোড়ার দিকে “মিউচুয়াল এইড টিম”গুলো ছিল, কাক্সের চাপের সময়, মাত্র কয়েকটি চাষী

পরিবারের পশু, যন্ত্রপাতি বা শ্রমের একত্র সমাবেশ। পরে পরিবারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সারা বছর ধরে এগুলোকে সক্রিয় রাখা হয়। পর-ষোড়ার এক ধরনের সাধারণ মালিকানা চালু করা হয়েছিল এবং উৎপাদনের জন্তু সাদামাটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

পরবর্তী স্তরে ট্রিলে ধরনের যৌথ খামারে সমস্ত গ্রামকে আনা হয়েছিল। চাষীর জমিতে অধিকার তখনও যায় নি। কিন্তু এসব খামারে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ যায় বেড়ে। সমবায় সংস্থায় কতটা জমি ও শ্রম দিয়েছে তারই ভিত্তিতে চাষীদের আয় নির্ধারিত হত।

আরও শক্ত ধরনের যৌথ খামারে বা কৃষ ধরনের কালেক্টিভ ফার্মে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কয়েকটি গ্রাম জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন এই সংগঠনে চাষী জমির উপর তার অধিকার হারাণ এবং সমবায় সংস্থায় সে কতটা শ্রম দিয়েছে তারই ভিত্তিতে তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হত।

“সামনের দিকে বিরাট লাক্সের” সময় বা ১৯৫৮ সাল নাগাদ কমুনিষ্ট কৃষিব্যবস্থার শেষ পর্যায় বা “কমুন” দেখা দিল। যৌথ খামারগুলির বদলে এক ‘জনগণের কমুন’। আর্থনৌতিক, রাজনৌতিক, এমন কি সামরিক অর্থেও স্বয়ংসম্পূর্ণ একক হিসাবেই কমুনগুলোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় যৌথ খামারের সদস্ত চাষীদের যেসব ছোট ছোট ব্যক্তিগত জমি দেওয়া হয়েছিলো তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। “কমুন”গুলোতে কলকারখানা

২১ চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য

স্থাপন করা হয়েছিল এবং খাওয়া দাওয়াও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল।

কম্যুনিষ্ট চীনের আর্থনৌতিক পরিকল্পনার এই প্রথম যুগে রাষ্ট্রের বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের সামান্যই কৃষিকে দেওয়া হয়েছে একথা আগেই বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫০ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে কৃষি, বিনিয়োগজিত মোট রাষ্ট্রীয় সম্পদের মাত্র ৮ শতাংশ পেয়েছিল। এই ভাগের অর্ধেকের উপর আবার গিয়েছিল চাষের সেচের জল ও অনুরূপ বিভিন্ন প্রকারে। প্রধানতঃ, গীত, ছয়াই ও হাই নদীর জন্তই এই টাকাটা ব্যয় করা হয়েছিল। এই যুগে সামান্য কিছুটা স্থানীয় বিনিয়োগ অবশ্য হয়েছিল। পশুপাখির সংখ্যা বাড়ানো, জমির উৎকর্ষ সাধন এবং জমির আয়তন বাড়ানোই ছিল এই সব স্থানীয় বিনিয়োগের উদ্দেশ্য।

প্রথম যুগে কৃষিক্ষেত্রে চীনের কর্মপন্থা মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হয়নি মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথম পরিকল্পনার (১৯৫৩-৫৭) কৃষি উৎপাদন ২৩ শতাংশ বা বছরে ৪.২ শতাংশ হার বাড়বে বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধির হার এই অনুমানের ধারে কাছে দিয়েও যায় নি। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং প্রথম পরিকল্পনার শেষ বছরগুলিতে কলন বেশ কিছুটা কমে যায়। এই জন্ত (১) অব্যবস্থা ও অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং (২) কয়েকটি

প্রাকৃতিক হুর্যোগকে দায়ী করা যেতে পারে ফলে কৃষিতে যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ার ফলে সমগ্র আর্থনৌতিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রভাব লক্ষিত হয়। বিনিয়োগের হার প্রতি বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রমেই বেড়ে না গিয়ে কমে আসে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল নিয়ে চীনের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এই পরিকল্পনার সময় সরকার কৃষির উৎপাদন নাটকীয় ভাবে বাড়তে আগ্রহী হলেও কী করে তা সম্ভব হবে ভেবে উঠতে পারেন নি। এই পটভূমিকায় দেখ দিল মাও-তসে-তুং এর “সামনের দিকে বিরাট লাফ” রাতারাতি সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে আনা হল নতুন এক কর্মপন্থা ঠিক করা হল আর্থনৌতিক ব্যবস্থা “জুই পায়ের উপর হাঁটব।” আপেক্ষিকভাবে সঙ্কীর্ণ ভারী শিল্প-সামরিক শিল্প একটা পা এবং অস্ত্র পা বিশাল গ্রামাঞ্চল। “সামনের দিকের বিরাট লাফের” পেছনে যে অনুমান ছিল তা হচ্ছে এই যে শ্রম-শক্তির প্রয়োগ দ্বিগুণ করে দিতে পারলে চীনের শিল্পায়ন কয়েক দশক এগিয়ে আনা যেতে পারে। এই অনুমান যে অপ্রাস্ত ছিল না পরবর্তীকালে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

(পরের সংখ্যায়)

P 36,087

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অসমাপ্ত নিপ্লবের সমাপ্তির এক প্রাণ

সুনীল দাস

মত ১৭ই এপ্রিল নমপেন-এ কাঙ্গোডিয়ায় আমেরিকার পরগাছা শাসকশক্তি প্রিন্স সিহানুকের জাতীয় মুক্তি বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে কাঙ্গোডিয়ার পাঁচ বছরের অবিশ্রান্ত মুক্তি-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। তারই এক গুরুত্বপূর্ণ অতিক্রান্ত হতে না হতে ৩০শে এপ্রিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্র প্রধান জেনারেল মিন বিপ্লবী জাতীয় মুক্তি বাহিনীর নিকট সাইগনে আত্মসমর্পণ করে। এই দুই রাজধানীতেই যুদ্ধবিরতির জ্ঞাত মুক্তি বাহিনী যে ছুটি সত্ৰ দিয়েছিলো, আত্মসমর্পণকারীদের অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে হয়েছে : ১) নিঃসত্ৰ আত্মসমর্পণ। ২) আত্মসমর্পণের পূর্বে শেষ মার্কিনী প্রতিনিধির অপসারণ। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের আমেরিকার জাতীয় পতাকা অবনমিত করে পলিথিনের ব্যাগে পুরে পলায়নের ঘটনা আমেরিকার দু'শো বছরের ইতিহাসে আর ঘটেনি। এই পলায়ন ও পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনে ত্রিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের ওপর ছেদ পড়লো।

কাঙ্গোডিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো ১৯৭০-এর ১৮ই মার্চ প্রিন্স নরোদম সিহানুকের ক্ষমতাচ্যুতির পর। প্রিন্স সিহানুক সে-সময় ইউরোপে সফররত ছিলেন। সেই অবসরে আমেরিকার প্ররোচনায়

সিহানুকেরই সেনাধ্যক্ষ লন নল তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জ্ঞাত কৃতসঙ্কল্প হয়ে সিহানুক আশ্রয় ও সাহায্যের জ্ঞাত মঙ্গোর দ্বারস্থ হয়। কিন্তু মঙ্গোতে আমল না পেয়ে সিহানুক পিকিং-এর সমর্থনে সেখানে নির্বাসনে সরকার গঠন করে তারই এককালের মন্ত্রীসভার সদস্য ও পরবর্তীকালের শত্রুস্থানীয় ক্ষেত্র রুদ্ধদলের প্রধান খিউ সাম্পানের সঙ্গে মিলিত হয়ে লন নল সরকার উৎসাদনে প্রতিশ্রুত হন। ক্ষেত্র রুদ্ধ বাহিনী কাঙ্গোডিয়ার জাতীয়তাবাদী, মার্ক্সবাদী ও কম্যুনিষ্টদের সমন্বয়ে গড়ে উঠলো ও কাঙ্গোডিয় জাতীয়তাবাদের বেগবান প্রবাহ, এই ক্ষুদ্র নিঃস্ব জাতিকে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্র আমেরিকার সর্বময় সাহায্যপুষ্ট লন নল সরকারকে পযুর্দস্ত করতে সাহায্য করেছে। সাম্পান নমপেন-এ সিহানুক মন্ত্রীসভার বারিষ্ঠ্য মন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৬৩ সালে সিহানুক তাকে পদচ্যুত করে। তারপর ১৯৬৭ সালে কাঙ্গোডিয়ার বাটাম-বাং প্রদেশের বিজ্রোহী কৃষকদের নম পেন অভিযানের অন্যতম নেতা ছিলেন খিউ সাম্পান। সে-সময় থেকেই খিউ সাম্পান আত্ম-গোপন করে থাকেন এবং ক্ষমতাচ্যুত সিহানুক পিকিং-এ কাঙ্গোডিয় গ্রাশনাল ইউনিয়নের সরকার

২৩ দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় অসমাপ্ত বিপ্লবের সমাপ্তির এক ধাপ

গঠন করলে অজ্ঞাত স্থান থেকে সাম্পান এবং তার আর দুই আত্মগোপনকারী সহকর্মী সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক লন-নল সরকার উৎসাদনে সিহানুককে সমর্থন জানান। ১৯৭০-এ ফেমর রুজ বাহিনী গঠিত হবার সময় এদের সংখ্যা ছিল তিন থেকে পাঁচ হাজার এবং স্থানে এদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত উত্তর ভিয়েতনামের তদারকেই এরা সংগ্রাম করে এসেছে। ওই বছরের জুলাই মাসে এরা নিজেদের জেনারেল ষ্টাক তৈরী করে এবং ১৯৭৪-এ এদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ হাজার এবং তার মধ্যে নারী আত্মবিশ্বাসী স্কোয়াডও ছিল। ১৯৭২-এর পর এরা নিজেদের যুদ্ধ নিজেরাই পরিচালনা করেছেন, সমরাস্ত্র পেয়েছে চীনের কাছ থেকে উত্তর ভিয়েতনামের হাত দিয়ে। সোভিয়েত রুশ এদের সাহায্য করেনি। মস্কোতে লন নল সরকারের রাষ্ট্রদূত বরাবরই ছিল। নম পেন পতনের অল্পসময় পূর্বে লন নল সরকারের রাষ্ট্রদূতের দপ্তর মস্কো বন্ধ করে দেয়।

সুতরাং কম্বোডিয়ার বিজয়ে এশিয়ার রাজ-নীতিতে খিউ সাম্পান যবনিকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভার সঙ্গে সিহানুকের প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অনন্ত ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা মিলিত হয়ে কম্বোডিয়ার নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ জয়ী হয়েছে। তা সত্ত্বেও মুক্তি বাহিনীর বিজয়ের পর নরোদম সিহানুকের সঙ্গে ফেমর রুজ বাহিনী ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হবে স্বাধীন ভাষায় তা নিয়ে

সিহানুক বলেছিলেন তিনি রাষ্ট্র প্রধান থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ফেমর রুজের হাতেই থাকবে। আর না হয় সকল ক্ষমতা খুমী মনে ছেড়ে দিয়ে একজন নাগরিক হিসাবে কম্বোডিয়ায়, বসবাস করবেন আর, “লিখবো, ছবি আঁকবো, ছবি তৈরী করবো।”

নমপেন সরকারের আত্মসমর্পণের পরও তাকে বলতে শোনা গেছে তিনি আপাতত কম্বোডিয়ায় ফিরবেন না। গত ২৮শে এপ্রিল খিউ সাম্পান নমপেন থেকে বেতারে ঘোষণা করেছেন যে ২৫শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর এবং অস্ত্রাস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিনিধি-দের নিয়ে গঠিত নমপেনে অনুষ্ঠিত ৩১১ সদস্য-বিশিষ্ট এক বিশেষ জাতীয় কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে নরোদম সিহানুকই রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন এবং বিপ্লবোত্তর কম্বোডিয়ার নীতি হবে নিরপেক্ষ, জোট-বিহীন এবং স্বাধীন—‘neutral, non-aligned and independent’।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধের উৎস বলতে গেলে ১৯৪১-এর ইন্দো-চীন জাপানের দখলে চলে যাবার সমসময় থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্যায়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে গোপন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছিলো ইন্দোচীনের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ত। সে সংগ্রামে ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদীরা ও কমুনিষ্টরা একজোট হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্বে সোভিয়েত রুশও জাপানের

বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। যুদ্ধকালীন জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের পুরোভাগে সেদিন ছিলেন হো-চি-মিন, যিনি ভিয়েতনাম বিপ্লবের জনকও বটে। ব্রিটিশ-আমেরিকা সোভিয়েত রুশ সমবেতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করেছে। সেদিনকার মার্কিন গোয়েন্দা সংগঠনের বিচারে হো চি মিন ছিলেন সব চাইতে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯৪৫-এ জাপানী আত্মসমর্পণের পর ফরাসী উপনিবেশিকরা ইন্দোচীনে ক্ষমতার আসনে ফিরে আসবার চেষ্টা করলে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ষায় শুরু হয় এবং আট বছর পর্যন্ত বিপুল মার্কিনী সাহায্য সত্ত্বেও ফরাসী বাহিনী ক্রমশ পূর্বদিক হয়ে ১৯৫৪-র ৭ই মে ভিয়েতনাম বাহিনীর অপূর্ব কুণলী সেনানায়ক জেনারেল গিয়াপের হাতে 'দিয়েন বিয়েন ফুর' রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করে নেয়। 'দিয়েন বিয়েন ফুর' ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ভগ্নস্তূপের ওপর কম্যুনিষ্ট শিবির ও পশ্চিমী শিবিরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ছায়াপাতে ত্রস্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ ১৯৫৪-র ২৬শে এপ্রিল জেনেভায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ২০শে জুলাই একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বলে ইন্দোচীনে ফরাসী শাসন লোপ পেলো বটে কিন্তু ১৭ অক্ষ রেখায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস এই চারটি নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো। খণ্ডিত ভিয়েতনামের উত্তরাংশে কম্যুনিষ্ট

শাসন স্বীকৃত হলো এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রধানত আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গঠিত হলো। চুক্তির সর্ব অমুযায়ী ১৯৫৬ সালে গোটা ভিয়েতনামে—উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে—স্বাধীন ও ত্রায়সঙ্গত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দুই ভিয়েতনামের মিলনের ব্যবস্থা ছিল।

আমেরিকার ইচ্ছিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী নোগো দিন দিয়ে, উত্তর ভিয়েতনাম কর্তৃক জেনেভা চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে ১৯৫৬ সালের নির্বাচনের বিরোধিতা করলো। তার অভিযোগের মর্গার্ধ ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'ভিয়েকং' নামে পরিচিত কম্যুনিষ্ট গরিলারা লাওস ও কম্বোডিয়ার মধ্য দিয়ে 'করিডর' বা যাতায়াতের পথে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে সেনাবাহিনীর ও সমরাস্ত্রের সরবরাহ পাচ্ছে এবং সেই শক্তিতেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে বিজ্রোহী ভিয়েকং-এর অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদিন আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েতনাম ও তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি বিতর্কের ঝড় চলেছিলো। বিতর্কটা দক্ষিণ ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে ভিয়েকং-এর অন্তর্ঘাতমূলক বিজ্রোহ নিয়ে। এটা কি দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ সঞ্চারে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদেরই অন্তর্বিজ্রোহ না উত্তর ভিয়েতনাম সেনাবাহিনীর পরিচালনায় বহিরাগত শক্তির নেতৃত্বে সৃষ্ট বিজ্রোহ? গত ৩০শে এপ্রিল (শেষাংশ ৬৫ পৃষ্ঠায়)

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন

পবিত্রকুমার ঘোষ

আধুনিক কালের বাংলা দেশ গঠিত হয়েছে একটি মহতী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। আমরা তাকে বলি নবজাগৃতি বা রেনেসাঁস আন্দোলন। তার আদ্যপুরুষ রামমোহন, শেষপুরুষ সুভাষচন্দ্র। আধুনিক কালের বাঙালীর জীবনসাধনার উদ্বোধন যদি করে থাকেন রামমোহন তবে তার পরিণতির সারাংশার বিধৃত হয়েছে সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের জীবনে ও চরিত্রে সেই বিশালতা আছে জাতির সাধনার মহৎ ধারাগুলি যেখানে এসে আশ্রয় পায়; এবং তার ফলে যে শক্তি সংহত হয়ে উঠে, তিনি তাকে নতুন পথে প্রাণহিত করতেও সক্ষম,—সেজগুই ইতিহাসের বিস্তৃত পটে তিনি হয়ে উঠেছেন অসামান্য যুগশ্রষ্টা, আমরা যাকে ব'লি কালপুরুষ।

রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাংলার যে তপস্বী তার ফলশ্রুতি কিন্তু পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। তার প্রধান কারণ, এই তপস্যার অগ্নিশিখার আপামর বাঙালীর জীবন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেনি। কোনো কোনো বাঙালী ঐ অগ্নিশিখা থেকে আপন জীবন প্রদীপকে জ্বালিয়ে বিদেশের দিগন্তকে পর্যন্ত আলোকিত করে গিয়েছেন। এই বরদীয়া বাঙালীদের নামের তালিকা বিরাট। তাঁদের জ্ঞানসাধনা,

বৈশাখ ১২—৪

বিজ্ঞান সাধনা, শিল্প সাধনা, ধর্ম সাধনা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে। এরই মাঝে যা দেখে আমাদের বারংবারে চমকে উঠতে হয়েছে, বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আজও হয়তো যেখানে বিশেষভাবে পড়েনি, তা বাঙালীর চরিত্রসাধনা, মনুষ্যত্বের মহিমার অপকল্প বিকাশ—বিশ্বে যার তুলনা নেই। জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের মতো বিশ্বশ্রুত বাঙালীদের কথা বাদ দিলেও বভীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, সূর্য সেনের মতো পূর্ণ মনুষ্যত্বের অমল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত চরিত্র আর কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? তাঁদের সঙ্গে তুলনা চলে এমন মনুষ্যের নাম আমি বিশ্ব-বিশ্ববের ইতিহাসে পাইনি। লেনিন বা মাও সে তুওঁর জীবনকথা আমি জানি; তাঁরা সফল, কারণ রাষ্ট্রকর্মতা তাঁরা দখল করেছেন। কিন্তু মনুষ্যত্বের উজ্জল মহিমা উপলব্ধি করিনি তাঁদের চরিত্রে। সর্বোপরি তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক। খণ্ডতা, ক্রুবতা, বড়বড় তাঁদের কর্মসূচীর অবিকল্পিত অঙ্গ—নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা যে কর্মসূচীর প্রধানতম লক্ষ্য। মানবপ্রেমের পুণ্য তীর্থে নিজেকে নিঃশেষে উজ্জার করে দেবার বীর্যদীপ্ত শক্তি ও পূর্বজাগ্রত মনুষ্যত্বের যে মহিমোজ্জল বিকাশ

বাংলার বিপ্লবীরা রেখে গিয়েছেন তার তুলনা নেই।

নবজাগৃতির আন্দোলন বাংলার প্রাণ থেকে জেগে উঠেছিল। ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এই জাগরণে সাহায্য করেছিল। বাংলার রেণেসাঁস জীবনের কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত থাকেনি—সহস্রদল পদ্মের মতো তার বিকাশ ঘটেছিল; ইয়োরোপীয় রেণেসাঁস, যা চোদ্দো শতকের গোড়া থেকে ষোলো শতকের গোড়া পর্যন্ত ইতালিতেই বিশেষভাবে অসুষ্টি হয়েছিল, তাকে ব্যাপ্তিতে, গভীরতায় ও তাৎপর্যে অতিক্রম করে গিয়েছে বাংলার রেণেসাঁস। ইতালীয় রেণেসাঁসের মতোই আমাদের রেণেসাঁসেও গোড়াতে আবির্ভূত হয়েছিল এক নতুন বিশ্ব সমাজ। আমাদের নব-জাগৃতিও জন্ম দিয়েছিল নতুন কাব্য ও শিল্প;—নতুন সাহিত্য নিয়ে এসেছিল নতুন বাণী। কিন্তু আরও কিছু ছিল, যা অভিনব। বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, মানুষের বিশ্বদৃষ্টি ও জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে যায়নি;—বাংলার নবজাগৃতির কার্যধারা ছিল আরও সামগ্রিক, তার রূপ ছিল আরও সর্বাঙ্গব্যবস্থাপন। তা মানুষকে পরিশোধিত মনুষ্যত্বের সাধনায় দীক্ষা দিয়েছিল—মানবমহিমার পরমতম বিকাশ সাধনে মানুষকে নিয়োজিত করেছিল। রামমোহন রায়ের বাগানের পুষ্প সজ্জা—শৈবালী বাগানের চেয়ে বেশি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

দাবী করতে পারে। সে বাগানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন একটি ফুল, ক্ষুদ্ররাম বসু তেমনি আর একটি ফুল। কেশবচন্দ্র সেন যদি একটি রক্তগোলাপ তবে বিনয়-বাবল-দীনেশরাও এক একটি পারিজাত পুষ্প। ইয়োরোপের রেণেসাঁসে পেয়েছি নতুন শিল্প; বাংলার নবজাগৃতিতে শিল্পও পেয়েছি, কিন্তু পেয়েছি তদতিরিক্ত—জীবনশিল্প।

তবু মনে হয় বাঙালীর জীবন তো ব্যর্থই হয়েছে। এমনও মনে হয় যে এত বড় সাধনার পর আমরা যেন কণজীবী ও কণজীবী হয়ে যাচ্ছি। যুত্মার লক্ষণ চারদিকে। নতুন চিন্তা নেই, নতুন উত্তম নেই, নতুন বাণী নেই—আমরা করছি দৈনন্দিন কালক্রয়। আমরা সন্ত-আনীত যে ঐতিহ্য, তার জন্ত গর্ববোধ করি কি না তাও সন্দেহ—আর করলেও ঐ গর্বমাত্র সফল করে বণে আছি। আজকের বাঙালী জীবনযুদ্ধে পরাস্ত, ক্লান্ত, ভীত ও সংশয়াক্ত; তার সমস্তা জটিল ও ক্রমবর্ধমান, সমাধান অজানা। জ্ঞানার চেষ্টাও নেই। জাতির জীবনীশক্তি যেন ফুরিয়ে গিয়েছে।

একটা এত বড় নবজাগরণের পর এই কাল-নিজা কেন? শিথরে ওঠার প্রয়াসে এ কি পদস্থলন-জনিত অধঃপতন? আমার মনে হয় এই বিপরীত ও বিষময় পরিস্থিতির কারণ, নবজাগৃতি আন্দোলন জাতির উপরের অংশকে যেমন স্পর্শ করেছে, তলার অংশকে তেমন স্পর্শ করতে পারেনি। যে নতুন বাণী বাংলার বুকে জেগে উঠেছিল তা সর্বজনীন চেতনাকে জাগ্রত করে দেয়নি। রামমোহন-বঙ্কিম-

বিবেকানন্দের প্রদীপ থেকে নিজের জন্ম-দীপকে জ্বালিয়ে নেবার সুযোগ সবাই পায়নি। তাই একাংশ যখন জাগ্রত উন্নত উদ্ভবমুখী হয়েছে— আর এক বিরাট অংশ তখন নৃপু তমোগ্রস্ত রয়ে গেছে। তাই যেদিন নবতর পরিবেশে কঠিন হুঃসহ চূৰ্ণোৎসবে জাতির জীবন-মরণের সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল সেদিন উপরের অংশ ক্রৈব্যার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে তলার অংশ তাদের সতর্ক করে দেয়নি, নতুন বলাধান করেনি, সমগ্র জাতি সংহত শক্তি নিয়ে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে উঠে দাঁড়ায়নি। তলা থেকে চাপ, ধাক্কা কিংবা সহযোগিতা না পেয়ে উপরের অংশ লোভ ও মোহের মসৃণ পথে গড়িয়ে গিয়েছে, আপন প্রাণটুকু কোনোমতে রক্ষা করতে চেয়েছে, বিস্ত-বৈভবের স্বপ্নে বন্দী করেছে নিজেকে। আর সমগ্রের তলার অংশ মুক্ সসিফুর ভূমিকায় অচলপ্রতিষ্ঠ থেকে গিয়েছে। আজও বাঙালীর জাতীয় জীবনের দৃশ্যটি মোটামুটি এই।

আমাদের বর্তমান অবক্ষয় ও অবসাদের মূল কারণটি কী? আমাদের নবজাগৃতি আন্দোলন অতি ক্ষুদ্র জাতীয় স্বাধীনতালাভের আন্দোলনের দিকে মোড় নিয়ে নেয়। পরাধীন দেশে এই পরিণাম ছিল অবশ্যস্বাভাব্য। নব যুগের নতুন বাণী জনসাধারণের মধ্যে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার কাজটি শেষ হবার আগেই বিদেশী রাজকে দূর করার দিকে জাতীয় মনোবা য়োক নিয়েছে। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ যখন নবজাগৃতি আন্দোলনের পরিণতি সংহত হয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন

তঁরাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের মস্তপাঠ করেছিলেন। জীবনের রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে আপাতত পশ্চাতে চলে গেল—সেখানে সামনে এসে দাঁড়াল বিদেশী শাসন মোচনের লক্ষ্য।

বিদেশী শাসন মোচনের অস্ত্র শুদ্ধ-বিশুদ্ধ, ভাল-মন্দ, প্রশংসার্ম ও নিন্দাযোগ্য সব পথই নিতে হয়। শুচিগায়ুর স্থান সেখানে নেই। দূরবিসারী পরিণামের কথা ভাবলে সেখানে চলেনা। বোম্বা-পিস্তল-কুট-নীতি-যড়যন্ত্র সব উপকরণেই সেখানে প্রয়োজন আছে। আশু লক্ষ্য সিন্ধি সেখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শ্রীমদ্রবিন্দ্রের মতো প্রজ্ঞাবান পুরুষও একথা বিশ্বাস করতেন। আমরাও করি।

অম্ম সময়ে অম্ম কেন্দ্রে যাকে আমরা কুৎসিত ও কদর্ষ বলি বৈপ্লবিক রাজনীতিতে সেও সমাদর পেয়ে যায়। বোরিস পাস্তারনাক তাঁর “ডক্টর “ঝিভাগো” উপন্যাসে বৈপ্লবিক রাজনীতির এই অনিবার্ধ ক্লেশাক্ত পরিণাম আন্তরিক আবেগে উদ্ঘাটন করেছেন। আমি শুধু বলতে চাই, পরাধীন দেশের নবজাগৃতি আন্দোলন, ঐতিহাসিক কারণে অকস্মাৎ বৈপ্লবিক রাজনীতির পথে চলে যাবার ফলে সর্বাত্মক জীবনসাধনার ধারাটি মাঝপথে খণ্ডিত হয়েছে। নবযুগের নতুন বাণী জনসাধারণের চেতনাকে আঘাত করে তাদের হৃদয়ে অবিষ্ট হবার আগেই ইংরেজ তাড়াবার আশু লক্ষ্যে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। শত্রুকে যখন বাইরে জানি তখন নিজের জীবন-সাধনার তাগিদ হারিয়ে ফেল। তখন শত্রুনিধন একমাত্র কর্তব্য। শত্রুকে যখন ভিতরে

বোধ করি তখনই কিন্তু প্রকৃত আত্মজাগরণের কাল।

আমাদের মনে হয়, বাংলাকে আবার স্বধর্মে স্থিত হয়ে স্বপথে চলতে গেলে এখন শিক্ষার নতুন উদ্ভোগের প্রয়োজনই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবার দাবী রাখে। নতুন শিক্ষাই আগার আমাদের সম্ভবিত করতে পারে। সে শিক্ষা যুষ্টিমেয়ের জন্ত নয়। সে শিক্ষা বিদেশী পুঁথি থেকে ধার করা নয়। বাঙালী জাতির সর্বস্তরে শিক্ষার দীপ্তি জাগিয়ে তুলতে হবে আর সে শিক্ষাক্রম উদ্ভূত হওয়া দরকার আমাদেরই জীবনের অভিজ্ঞতা—জাতির মর্মমূল থেকে।

কোনো প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসীমায় আবদ্ধ থেকে নতুন শিক্ষার উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে যোগ রেখে চলে না। ইংরেজ প্রবর্তিত সীমিত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করেই এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারা আগতিত হয়। তার ওপর ভর করেছে নেহরু যুগের আমদানী মাফিনী সংস্কৃতির অপছায়া। ঐ সবল বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অধ্যাপনা করেন তাঁরা তাঁদের ভোগ-সম্ভোগ বিলাস-বৈভব চিন্তায় নিমগ্ন, যারা পড়েন তাঁদের একমাত্র সাধনীয় বিষয় ব্যক্তিগত কেরিয়ার। এর মধ্যে দেশ বা জাতির অল্প প্রবেশের কোনো রাস্তা নেই। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ সুযোগ্য ছাত্ররা যখন প্রশাসনে,

পেশায়, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চ পদগুলি দখল করেন, তখন জাতি তাঁদের কাছে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকায়, কিন্তু পরিপূরিত হয় না সে প্রত্যাশা। এটাই বর্তমানে জাতীয় দুর্ভাগ্য। মেডিকেল ছাত্র ত্বর্নৈতিক পথে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়ে সমাজে চিকিৎসক হয়ে বসলে রোগীর কি আশ্বাসের কোনো কারণ থাকে? কিংবা সুনিপুণ ডাক্তার যদি অর্থ আদায় করাষ্ট একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেন ও রোগীকে সর্ববিধ উপায়ে শোষণের কথা চিন্তা করেন তবে পীড়িত মানুষের ভরসা পাবার উপায় থাকে কোথায়? তেমনি ইঞ্জিনিয়ারদের বেলা, প্রশাসকদের বেলা। উজ্জ্বলতম ছাত্রটি প্রশাসনে গিয়ে বসে ঘুষখোর, হুণীতিপরায়ণ হয়ে যাকেন—আমাদের সমাজের ক্রম নিমজ্জন ছাড়া আর কোন পথ তবে খোলা থাকবে? বিবেক, মহত্ত্ব, আচরিকতা, দেশপ্রেম, মানবস্বীতি জাগে না যে শিক্ষায়, সে শিক্ষাই আমরা পাচ্ছি। আর দেশটা যে কী ও কেমন এবং দেশের প্রয়োজন কী কী তা জানার দরকার হয় না এ শিক্ষাপ্রায়। শিক্ষা শিক্ষকের হাতে জনসাধারণের গলা কাটার শাণ দেওয়া অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। হার, এ শিক্ষার মারাত্মক নাগপাশ থেকে আমরা মুক্ত হব কবে?

রবীন্দ্রনাথ এ শিক্ষার প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, তাঁর ত্রীনিকৈতন রচনা। কিন্তু কবির উদ্দেশ্যকে টুটি চেপে ধরেছে সরকারের দানব-বাহ। আজ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর পরিমণ্ডল বিষে,

২৯ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন

চক্রান্ত, কূটনীতিতে বিষাক্ত এবং মাঝে মাঝে সংস্কৃতির আক্রমণে পর্যুদস্ত। বিশ্বভারতীও দেশের সঙ্গে সংযোগবিহীন।

তাই বাংলার ন্যূনতম সাধনাকে পূর্ণায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে আজ আমরা মনে করি নতুনভাবে শিক্ষা-চর্চার আয়োজন করার জরুরী দরকার আছে। প্রাথমিক স্তরে থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান ও জ্ঞান চর্চার ধারার পুনর্নিষ্ঠা ঘটতে হবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। নতুন শিক্ষা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়েই গড়ে উঠতে পারে। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগারে বন্দী থেকে নতুন শিক্ষাক্রম অনুসরণের সুযোগ ও অবকাশ মিলতে পারে না।

আমরা তাই প্রস্তাব করছি একটি নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। তার নাম হোক নেতাজী সুভাষ বিশ্ব বিদ্যালয়। সুভাষচন্দ্রের সাধনার যদি কোনো মূল্য আমরা স্বীকার করতে রাজি হয়ে থাকি তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে ও প্রাচীরে আমাদের জাতীয় জীবনে সেই সাধনাকে ফলগান করে তোলার জন্ত আমরা প্রয়াসী হব।

আমাদের মনে হয় বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল, সমুদ্র সৈকালে বঙ্গজনের পশুচর্যন করেছে, ভারত সংস্কৃতির সূত্র স্বরূপ। গঙ্গা যেখানে তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছেন এবং বাঙালীর সঙ্গে বহির্বিশ্বের নিরন্তর যোগ আবহমান কাল ধরে যেখানে বজায় থেকেছে এবং সৌভাগ্যের বিষয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ নিবাস যেখানে সেখানেই সুবিস্তৃত এলাকা

নিয়ে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

বাংলার এই দক্ষিণ ভাগ পুতল নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল; শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষী 'আদি বিদ্বান' সাংখ্যকার কপিলের সাধনশীঠ; এইখানে প্রকৃতি, পশু ও মানুষ—জলচর, ভূমিচর, বৃক্ষবাসী প্রাণী পাশাপাশি হাত ধরে বাস করেছে। জীবনপ্রবাহের সামগ্রিক রূপ এখানে যেমন অক্ষুণ্ণ করা যায় তেমনটি আর কোথাও নয়। বিশ্ববিজ্ঞান মানুষের জন্ত, হিমালয়ের নিভৃত বাসীর জন্ত নয়। বাংলার সবচেয়ে দরিদ্র জনসাধারণ এই দক্ষিণ ভাগে বাস করে। আমাদের নতুন শিক্ষা-প্রয়াস তাদের জীবনের ভিতর থেকে উদ্ভূত হোক। আরও সুখের কথা, কলকাতা মহানগরী সন্নিকটবর্তী হওয়ায় প্রাচীরের সঙ্গে আধুনিকের, স্থিরের সঙ্গে গতির সমন্বয় করার সুযোগ দক্ষিণ বঙ্গের এই অংশে পরীপূর্ণ ভাবে বর্তমান।

বস্তুত একটা সীমানা-প্রাচীরের সাহায্যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে রাখার কোনো প্রয়োজনই হবে না। তাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বিস্তিয়ে দেওয়া যাবে নিবিড় তরুপুঞ্জের তলে, গৃহবাসীর আঙিনার কাছে, নদীর মর্মস্বর্গনির পাশে। জলজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, পশু সম্পদ ও মানব সম্পদের প্রত্যেক পরিচয় নিতে নিতে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষার সময় বাড়িয়ে তুলতে পারবে। এ হবে জনতার বিশ্ববিদ্যালয়। এ হবে মাটির নিবিড় আত্মীয়তায় স্নেহ বিশ্ববিদ্যালয়।

এ হবে পলিমাটি দ্বারা তৈরী ভূভাগে উর্বর সৃজনী ক্ষেত্র। এ হবে প্রাচীন ঐতিহ্যের সারাংশের দ্বারা নিমিত্ত ভূমিতে নতুন কালকে আবাহন করে আনার উদার ক্ষেত্র। প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞান এখানে হাত ধরাধরি করে এসে মিলবে। অধির তপোভূমি, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রভূমি, বিপ্লবীর জন্মভূমি, দেশ ও বিদেশের মিলনভূমি, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞার সমন্বয় ভূমি এই পূণ্যভূমিতে নতুন জাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হবে। এ হবে অবিদ্যার সৃষ্টি লীলার চিরহরিৎ ক্ষেত্র।

কিভাবে সে বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলব আমরা? আমার তো মনে হয় প্রাচীন ভারতে শিক্ষার যে নির্দেশ ছিল যা রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ধারাকে অনুসরণ করেই পথ চলা শুরু করা যায়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, গোপালন, পশুপালন, মৎস চাষ, বৃক্ষপালন, হাতের কাজ, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পূর্ণ সুযোগ থাকতে পারে। মাও সে তুও চীনে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের বছরে তিন মাস, ছয় মাস, এমনকি টানা এক বছর, দু' বছর গ্রামে যাবার বিধান দিয়েছেন। তাঁর বিধান কতকটা খাপছাড়া কিন্তু তাঁর প্রেরণার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। গ্রামের জনপদ, পশু পাখি নদী কৃষি সহজাত শিল্প ইত্যাদির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ভারতের ছাত্ররা বড় না হলে তারা ভারতের বস্তুার্থ কাজে আসবে না। শহরের বিজ্ঞান কেন্দ্রেই যাদের সারাজীবন কাটল ইংরেজিভাষার

মাধ্যমে পাঠ নিতে নিতে, তারা ভারত নামে দেশটাকে চিনবে কিভাবে? কিভাবে তারা জানবে শতকরা নব্বুই জন ভারতীয়ের দুঃখ-বেদনা, আশা, স্বপ্ন ও প্রয়োজন? শহরের বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলি স্বতই জনসংযোগবিহীন। সেখানে যারা লাগিত পালিত তারা আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার অধিকারী তো হবেই। আমরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী পর্যন্ত যে পরিবেশে ও যে রীতিতে ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছি তার অনিবার্য ফলশ্রুতি তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতার বোধ সৃষ্টি। আমাদের মতো জনবহুল দরিদ্র দেশে তার ফল মারাত্মক। সমাজদেহকে সবচেয়ে সর্বনাশা আঘাত হানে আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি স্বচ্ছল দেশে সে আঘাত কতকটা সামলে নেওয়া যায়। দরিদ্র দেশে তা যায় না। এখানে একজনের পরমান্বের জোঁগাড় দিতে হলে আর অনেক জনের অন্নই কেড়ে নিতে হয়। যে বিলাস, যে ব্যসন পশ্চিমী সংস্কৃতির অঙ্গ ও আমরাও যার ভাগ পেতে চাই আমাদের দেশে সর্বসাধারণের পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব নয়। মুষ্টিমেয় জন পাবে কিন্তু সেজন্য বৃকের রক্ত তুলে দিতে হবে সমাজের বাকি অংশকে। বলতে পারেন তারা ইতর জন। কিন্তু আমি বলছি নতুন শিক্ষার আয়োজন তাদেরকে নিয়েই করতে হবে। মুষ্টিমেয় ও বৃহৎ সমাজকে এমটা ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। দমন ও দলন নীতির সাহায্যে তা করতে হবে তা আমি বলছি না। আমি বলছি জগৎ হবে মহুয়াঘের পীঠভূমি। মহুয়াঘের সাধনার আশীদায়

আমরা সবাই। জনসমাজকে বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয়ের মনুষ্যত্বের সাধনা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। গোড়াতেই সেকথা আলোচনা করেছি।

কিন্তু জনগণকে নিয়ে সাধনার কথা বলতে গিয়ে আমরা যেন মানব-মতিমা ও মানবোৎসর্ঘ সাধনার কথা ভুলে না যাই। সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিশে বিকাশ লাভ করেছে জনগণকে তাদের প্রাপ্য মূল্য না দিয়ে, একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জনগণকে মনে করা হয়েছে সভ্যতার পিলস্তুজ—উপরে ঝলছে সভ্যতার অনির্বাণ দীপ, আর তাকে ধারণ করে আছে ভূমি—আচ্ছন্ন জনগণ। প্লেটো বলেছিলেন জনগণ সভ্যতার tools মাত্র, তার বেশি মূল্য তাদের নেই। একথা সত্য। ত্রাট সাজাহান তাজমহলের সৌন্দর্য সৃষ্টির সময় ঐ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রতি স্মৃতিচারণ করেন নি। কিন্তু শুধু এই কারণে মানব-সভ্যতার ভাষার কীতিগুলিকে অস্বীকার করতে পারি না। শ্রমিক ও জনগণের প্রতি প্লেটোর মনোভাব যাই থাকুক প্লেটোর দর্শন-সিদ্ধান্তে মানব-সভ্যতার সম্পদ—তাকে সঞ্চার স্বীকৃতি দিতেই হবে। প্রদীপের নিচে অন্ধকার ছিল বলে, প্রদীপের দীপ্তি ও

অনল মিথ্যা হয়ে যায়নি। উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের সাধনার ওপর যে আয়োচিত প্রাধান্য দান—তা থেকে বিচ্যুতি বা প্লথতার প্রশ্রয় দিলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিম্নাভিমুখী হয়ে যায়। আমরা একদিকে যতই জনতার কথা বলি, জনতার জড়তা, শিথিলতা, অল্পে আত্মতুষ্টি, নিম্ন স্বভাব ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দিলে সাধনার কোনো কথাই উঠতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য মানব-বিকাশ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও জড়তার লাগন পালন নয়।

নেতাজীর নামে বিশ্ববিদ্যালয় করতে হলে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে স্বতন্ত্র চরিত্রের বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে। জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, সামরিক বিজ্ঞা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর একটা বিশেষ জোর সেখানে দেওয়া হবেই। সকল জীবনবিজ্ঞা ও বিশ্ববিজ্ঞাগুলির চর্চাও সেখানে অবিরলধারায় চলবে। পরীক্ষা দান ও গ্রহণই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত কথা হবে না। হাতে বলমে এরকম নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করে তোলার আনন্দের অংশীদার হতে পারাও একটা মৌভাগ্য।



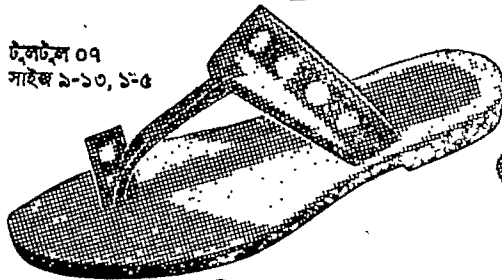
শ্রী বসন্তের মরুময়ী

শিট ০৪
সাইজ ৩-৬, ৭-১০
১১-১

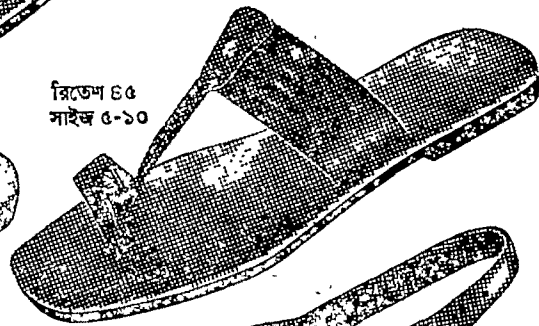
জুতো



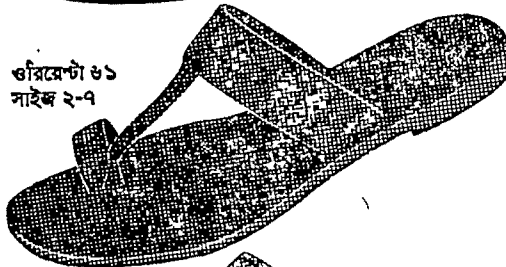
টমটল ০৭
সাইজ ৯-১০, ১১-৫



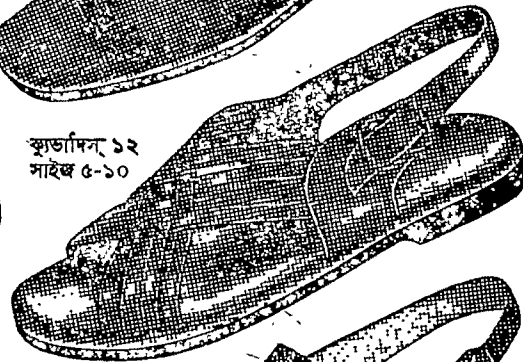
রিডেশ ৪৫
সাইজ ৫-১০



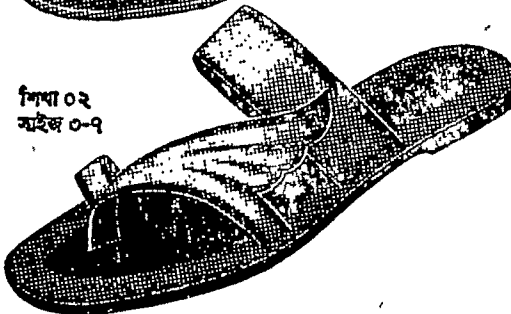
ওরিয়েন্টা ৬১
সাইজ ২-৭



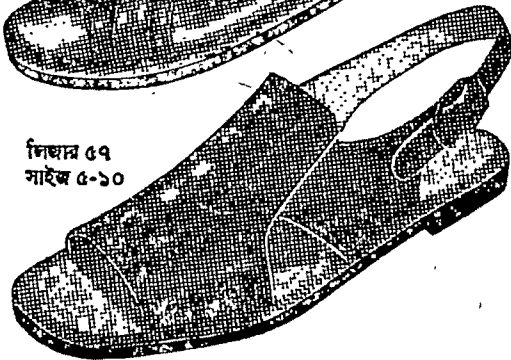
ক্যভামিন ১২
সাইজ ৫-১০



শিখা ০২
সাইজ ৩-৭



লিয়ার ৫৭
সাইজ ৫-১০



Bata

বই পড়া ও বই পাড়া

দেবদাস জোয়ারদার

সৈয়দ মুজতবা আলীর কল্যাণে আমরা মার্ক-টুয়েনের লাইব্রেরি করার কাহিনীও সঙ্গে পরিচিত। মার্কটুয়েনের এতো বড়ো ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ নষ্ট হচ্ছে দেখে এক বন্ধু নাকি তাঁকে গোটা কয়েক শেলফ যোগাড় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরটিতে একটি সত্য উদ্ভাসিত হলো। বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার এনে ফেরৎ না দিয়ে বইয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়েছে। কিন্তু শেলফহতা আর বন্ধুদের কাছ থেকে ধার আনার উপায় নেই! সত্যি বই এনে ফেরৎ না দেওয়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। এমন যে উদার বিদ্যাসাগর, তিনি নাকি কাউকে একটি বইও ধার দিতেন না। বলতেন, বরং টাকা দিচ্ছি, বই কিনে নিয়ো। তবু বই ধার দিতেন না। শহীদুল্লাহ্ নাকি এই প্রসঙ্গে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলতেন, বই, লেখনী ও জ্বীকে পর-হস্তগতা করলে চিরতরে চলে যায়, যদিই বা ফিরে আসে, তবুও নষ্টাভ্রষ্টা ও মর্দিতা হয়ে আসে। ‘লেখনী, পুস্তক ভাষা পরহস্তং গতঃ গতঃ। যদি সা পুনরায়তি নষ্টা ভ্রষ্টা চ মর্দিতা’। একথা সত্য যে আমাদের সেকলে পণ্ডিত মশাইরা বই আর কলমের সঙ্গে জ্বীকে এক শ্রেণীভুক্ত করে নারীর প্রতি

বৈশাখ '৮২-৫

কচিশোভন মনের পরিচয় দেননি। কিন্তু বই ও কলম প্রসঙ্গে তাঁদের এই উচ্চারণ সত্য। তা সত্ত্বেও এ কি অস্বীকার করা যায় যে নিজেদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ায় পাঠকদের অনেক বেশি বই পড়ার সুযোগ ঘটে। মনের মতো বই পেলে ধার না চেয়ে উপায় নেই। আর ধার কাছে চাওয়া হচ্ছে, তাঁরও দিতে হয়। কেন না তাঁকেও যে একদিন চাইতে হতে পারে। বই পড়ার সঙ্গে বই দেওয়া-নেওয়া ও বই কেনার একটি নিবিড় যোগ আছে। কিন্তু কেনার সুযোগ ও সামর্থ্য ক’জনের আছে? অল্প-চিন্তা চমৎকারা সবযুগেই। এযুগের অভাবক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের দিনগুলিতে এ আরো সত্য। চাল কেনার পর যদি অতিরিক্ত গোটের কড়ি থাকে, তাহলেই বই কেনার চাল দেখানো যায়। চালতো বটেই। কেন না বই বড়োলোকি চাল দেখানোর জ্ঞাত অনেক সময় অনেকে কেনেন। ‘পাষণ-গাঁথা প্রাসাদ’পরে / আছেন ভাগ্যবন্ত, / মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি / পঞ্চ হাজার গ্রন্থ। সোনার জলে দাগ পড়ে না, / খোলে না কেউ পাতা, / অনাস্বাদিত মধু যেমন / যুধী অনাজাত। / ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে / স্বপ্ন পুরামাএ।’ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’র এই বিখ্যাত কবিতাতে আছেই। এমন বড়োলোকের লাইব্রেরি থেকে ছয়েকটি বই ধার এনে ফেরৎ না দিলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? আবার একথাও সত্য পাঠোৎসাহীর নিজের বাড়িতে যে সব বই আছে, সেগুলিতে আছেই। কোথাও চলে যাচ্ছে না। তাই জীবনের প্রসন্ন প্রহরে সেগুলি পড়া যাবেই, তাড়া নেই। বরং কারো কাছ থেকে ধার-চেয়ে-আনা বা পাঠাগার থেকে আনা বই ফেরৎ দিতে হবে। তাই সে সব বই পড়ার তাড়া বেশি থাকে। এভাবে আনা সব বইও কি পড়া হয়? যে বইটি একদিন বিশেষ কাজের মনে হয়েছিল বা যেটি না পড়লে জীবনবোধ অগভীর থাকবে মনে হয়েছিল এবং তা মনে হওয়ায় ধার করে নিয়ে, এলুম বটে, কিন্তু বাড়িতে এসে ঐ উদ্দীপ্ত মনটিকে রুঢ় দিনগুলির মোড়ে মোড়ে হারিয়ে ফেললুম। তাই অপঠিত অবস্থায়ই বইটি ফেরৎ দিতে হলো। এ অভিজ্ঞতা কোন্ পাঠকের হয়নি? বোধ হয়, অনেকেরই হয়েছে। নিজের কেনা এমন বইও থাকে, যেগুলি আদৌ একটানা পড়ে শেষ করার মতো নয়। অনেক বই রেখে রেখে পড়তে হয়, প্রয়োজন বোধে নাড়তে হয় আশু জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার জন্ত। আবার কিছু বই আছে সেগুলি নাকি শুধু রেখে রেখে পড়লেই চলে না, একটু আধটু করে চেখে চেখে পড়তে হয় আশ্বস্ত করার জন্ত। এমন বই আমাদের মনকে দেয় স্বাস্থ্য বা স্বস্থতা, যার আরেক নাম আশ্বস্ততা, বলা বাহুল্য, আশ্ববিক্ষেপ নয়।

আজকের ব্যস্ত ও ব্যথিত যুগে আশ্ববিক্ষেপের কারণ পথে পথে ছড়ানো, এমনকি মানুষের দেহ ও মনের আশ্রয় নিজের বাড়িটিকেও এযুগ করেছে অনেকক্ষেত্রে কলুষিত।

টিভেনসনের ‘ভবঘুরের একটি কৈফিয়ৎ’ নামে বিখ্যাত রচনার দোহাই দিয়ে আমরা বইকে বলতে পারি জীবনের নীরস্ত বিকল্প, হোক নীরস্ত, ভবতো বিকল্প বটে। এমন বিকল্পকে যখন কাঁচের শো-কেসে পথে যেতে যেতে বইয়ের দোকানে বন্দী দেখি, তখন খমকে দাঁড়াতে হয়। ছোটো দোকান হলে ভেতর থেকে প্রায় উত্তত হয়ে ওঠে কোন্—বই চাই? হায়রে, কিভাবে বুঝাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের নায়কের অতৃপ্ত ভ্রমণেচ্ছা যেমন সার্থকতা পেতো রেলকোম্পানির সময় ও পথনির্দেশিকা দেখে, আমাদের অনেকের তেমনি গিপটিষা পাঠ পর্যন্ত অগ্রসর হয় না, ঠেকে যায় শো-কেসের কাঁচে, আর মনে করিয়ে দেয় পকেট পড়ের মাঠ মাসের আরম্ভেই। কেননা টাকা যে চালের দোকানীর কাছে বাঁধা। তাই বই পড়ার ইচ্ছা বা বই কিনে চাল দেখানোর ইচ্ছা, এই দুই ইচ্ছাই চালের দামের দৌরাণ্ডো দমবদ্ধ হয়ে মারা যায়।

তবু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সম্প্রতি পাশ্চিমবঙ্গে প্রচুর নতুন নতুন বই ছাপা হচ্ছে। তার সঙ্গে চলছে পুরোনো বই নতুন করে ছাপানো। এর চাক্ষুষ প্রমাণ ‘দেশ’ পত্রিকার সপ্তাহে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন-ও এই পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায়

প্রকাশিত সারা বছরের উল্লেখযোগ্য বাংলা বইয়ের তালিকা। প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়া পর্যন্ত ছোট্টার প্রয়োজন নেই। এতো বই যখন ছাপা হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই বই বিক্রিও হচ্ছে। কেন না যতদূর জানি গতযুগে যেমন কালীপ্রসন্ন দিগ্‌হের মহাভারত বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল, ঠিক এ ধরনের কাজ এ যুগে আর হচ্ছেনা। বিক্রি যখন চলছে, তখন ক্রেতা আছে। তাহলে ক্রেতা কে? স্বাধীনতার পর ধনী আরো ধনী হয়েছে, দরিদ্র দরিদ্রতর হয়েছে। এ সব সত্য হলেও শিক্ষা কমেনি, বরং বেড়েছে; সেই শিক্ষার মান যা হোক না কেন। শেষ মন্তব্যটিতে আমাদের কটাক্ষ নেই। আমরা সারা দেশে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার চাই, হলোই বা শিক্ষার মান অবনত। ভারতের সনাতনী অনড় অচল সমাজ শিক্ষাকে একদিন অভিজাত্যের অঙ্গ হিসেবে জেনেছিল। শিক্ষা আজও সর্বত্রগামী হয়নি, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষাও হয়নি। সর্বত্রগামী না হলেও এ যুগের কাগজী বিজ্ঞা বহুদূরগামী হয়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সেদিন এক বন্ধুর কাছে স্তন্যমুখ, কোনো কোনো কারখানার শ্রমিক যা মাইনে পাচ্ছেন, তাঁতে বই কিনে তাঁরা বাড়তি টাকা খরচের সুযোগ পাচ্ছেন। একজাতের বড়োলোকের মতো বই কিনে যদি তাঁরা ঘর সাজান, তাহলে আমাদের হৃৎপাওয়ার কারণ আছে। কেননা ঘর সাজানো তো দূরের কথা, পড়ার জন্যও আমরা বই কিনতে পারছি। কিন্তু শ্রমিক যদি পড়ার জন্য বই

কিনেন বা বাড়িতে পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজের ছেলেমেয়েদের পড়ায় উৎসাহিত করতে চান, তাহলে আমাদের আনন্দ পাওয়ার কারণ আছে। যে বই পড়া জমিদার, আমরা ও অস্বাস্থ্য পরশ্রমজীবী পরগাছাদের একচেটিয়া ছিল। সেই একচেটিয়া কারবারে ভাঙন ধরছে, তার চেয়ে বড়ো আনন্দের খবর আর কি আছে? কিন্তু তার পরেও আরেকটি কথা মনে জাগে। বস্তিবাসী শ্রমিক বা কুটিরবাসী কৃষকের ঘরে গ্রন্থাবলী তো দূরের কথা 'কিশলয়' স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে দিয়েও প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না। অতীতের ছয়েকটি তথাকথিত উচ্চস্তরের সংস্থার শ্রমিকরা গ্রন্থাবলী কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। এই অসঙ্গতি দূর করার উপায় চলতি সমাজ ব্যবস্থায় কোন পথে? আদৌ আছে কি? শুধু উচ্চস্তরের সংস্থার শ্রমিক বা অশ্রমিক কর্মচারী কেন? উন্নয়নকামী অর্থনীতির ছিটকোঁটা প্রসাদ বীরা যেভাবে পাচ্ছেন 'হাইসেল' পারমিট-কর্পাক্টার বা বেশিমাইনের চাকুরির কল্যাণে, তাঁদেরই সামাজিক মর্যাদা বাড়তে হয় অনেক কিছু কিনে। সেই অনেক কিছুর মধ্যে বইও পড়ে। তাই স্বাভাবিক কারণে বইয়ের বিক্রিও বাড়ছে। তবে এসব বই সব সময় উচ্চমানের নয়। অনেক সময় এই বইগুলি রোমাঞ্চকর কাহিনীপূর্ণ বা সমরেশ বসু জাতীয় লেখকদের বসনান্তরালের রক্তাক্ত স্বাদে ভরপুর বা নিদেনপক্ষে রম্য স্বাদে আধা-গুরুগাভীর বিষয়-ভিত্তিক।

কিন্তু এসবতো পেল বাঁকা চোখে দেখার

পরিণতি, বিরূপাক্ষের কথা। প্রসন্নাক্ষ হয়ে যদি তাকাই স্বীকার করতেই হবে, ছাপাখানার স্বর্ঘর আওয়াজে অভিজাতের মধ্যে এককালের বন্দিনী বিদ্যার শিকল ভাঙার গান শোনা যাচ্ছে। রামমোহনের মতো চিন্তানায়ককে, বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষক ও কর্মীর, মধুসূদনের মতো কবিশিল্পীর, বাঙ্কমের মতো দ্রষ্টার গ্রন্থাবলীর একাধিক সংস্করণ থেকে আরম্ভ করে কতো অজস্র মূল্যবান প্রকাশনায় কোলকাতার বই পাড়া সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং তার ফলে বাঙালি পাঠকের বই পড়ার দিগন্ত বিস্তৃত্তর হচ্ছে। অমুবাদে বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত থেকে সাম্প্রতিক কবিকুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালা পর্যন্ত কতো মূল্যবান পসরাই না আমাদের প্রকাশকরা নিষ্ঠাভরে সাজাচ্ছেন। তাঁদের এই বিপুল উদ্ভূত ফল কি শুধু অন্ধকারে ঝরে পড়বে? নিশ্চয়ই নয়। বাজারে কাগজ হুমুলা ও প্রয়োজনীয় কাগজ তুলুত। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিদ্যুতের অভাবে ছাপাখানার কাজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে বই ছাপা কমেনি। তার থেকেইতো বাংলা বইয়ের প্রকাশনার অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রমাণিত হয়। অফিসে অফিসে পাঠাগার, পাড়ার সাধারণ পাঠাগার, প্রতিজেলার সমাজশিক্ষা বিভাগ পরিচালিত পাঠাগার, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার—এমনিভাবে অজস্র পাঠাগার থেকে প্রচুর বই কেনা নিশ্চয়ই হচ্ছে। নইলে প্রকাশকরা নিশ্চয়ই এতো বই ছাপতেন না।

বহু তুলুত বই পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। অগ্রিম টাকা নিয়ে গ্রাহক করা হচ্ছে অনেককে। গ্রাহক যে টাকার প্রতিশ্রুতিতে করা হচ্ছে, সেই প্রতিশ্রুতি খেলাপ করে একটি ক্ষেত্রে দাম বাড়ানো পর্যন্ত হয়েছে। কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে, আগের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা নিয়ে বই ছাপানো হুমুলোর বাজারে সম্ভব নয়। কোনো কোনো প্রকাশক যে সময়-সীমায় কিস্তিতে কিস্তিতে বই ছাপবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তা মেনে চলতে পারছেন না। এখন পর্যন্ত প্রকাশনা ব্যবসায়টি বাঙালির হাতে আছে। তবে বাঙালি বলেই সততায় প্রকাশকরা খোয়া-তুলসীপাতা, এমন মনে করার কারণ নেই। তবু ছাপার কাজে, বই বাঁধানোর কাজে ও অস্বাস্থ্য আনুষঙ্গিক কাজে প্রকাশকরা বাঙালি হওয়ায় বাঙালি ছেলেরাই সুযোগ পাচ্ছে। অগ্রিম নিয়ে গ্রাহক করার রীতিটি চালু হওয়ায় একটা প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ হয়ে যাচ্ছে। এই জগুই বোধহয় স্বল্প মূলধনের বাঙালি মালিকরা এই রীতির সুযোগ নিচ্ছেন। যা হোক, অমুবাদে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে আমাদের নিজেদের শাস্ত্র সম্পদ পর্যন্ত অনেক বইই গ্রাহকরা এই রীতির কল্যাণে পেয়ে যাচ্ছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেক সময় সরকারি টাকা সাহায্য হিসেবে পাওয়ায় কোনো কোনো বই কিছু কম দামেও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সবই আলোর দিক, আশার কথা।

তবু বাংলা বইয়ের প্রকাশনাকে সমৃদ্ধতর করে

তোলার আরো অনেক সুযোগ আছে। বেশি শিক্ষিত বয়স্কদের বাংলা বই সংখ্যায় যেমন প্রচুর, অল্পশিক্ষিত ও ছোটদের বই এতো প্রচুর নয়। অল্পশিক্ষিত বয়স্কদের জন্য বাজারে যে সব বই আছে সেগুলি বিবর্ণ, অদগ্ধহীন ও সাহিত্যগুণ বঞ্চিত। অথচ আমরা কে না জানি জনশিক্ষাই জাতির একমাত্র মুক্তির পথ। জনশিক্ষার অনেকটাই বয়স্কদের শিক্ষা। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকে বরাহনগর অঞ্চলের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সা দামের একটি সচিত্র পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আমরা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরো অনেকের মতো মনে রাখিনি। এক তরুণ বন্ধুর কাছে শুনলুম পশ্চিম বঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি নাকি 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলি ছেপেছেন। কিন্তু আমরা বলি, পুনর্মুদ্রণ কেন? যে প্রতিষ্ঠানের নাম নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, তাঁরা শুধু কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, বঙ্কিম বা দীনবন্ধু রচনাবলী নতুন করে ছেপেই কেন দায়িত্বমুক্ত হচ্ছেন? তাঁদের কি বাংলা লিপি ও বানান শেখানোর জন্য আধুনিক সূচিস্থিত বই ও বঁাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, সেই সব বয়স্কদের মনস্তত্ত্ব বুঝে সুন্দর বই ছাপা উচিত নয়? পুরোনো বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী ছেপে বিক্রি করে যে লাভ হচ্ছে, সেই টাকা জনশিক্ষা বিষয়ে গবেষণা-প্রস্তুত সাহিত্যগুণাঙ্কিত বই প্রকাশের জন্য এই

প্রতিষ্ঠানের খরচ করা উচিত। তাহলেই শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠান সার্থকনামা হতে পারে। নইলে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হবেন। বাংলা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লিখে বয়স্কদের জন্য একজাতের বই ছাপা হয় দেখেছি। ভাবটা যেন এরকম যুক্তাক্ষর ভেঙে লিখলেই চাষী মজুরদের এসব বই পড়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আসলে যুক্তাক্ষর অবিকৃত রাখাই উচিত। কেননা বাংলায় যুক্তাক্ষর তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি সাধারণের বোধগম্য চিন্তাকর্ষক ভঙ্গিতে লেখার গুণেই এ সব বই উৎরে যেতে পারে। তার জন্য কৃত্রিম ছলাকলার প্রয়োজন নেই।

এ যেমন বয়স্ক অল্পশিক্ষিতদের বইয়ের বেলায় সত্য, ঠিক তেমনি শিশু ও কিশোরদের বইয়ের বেলায়ও সত্য। ছোটদের হজম হবে না বলে হুধের সঙ্গে মাঝে মাঝে জল মেশানো হয়। আমাদের দেশে একজাতের অসাহিত্যিক সাহিত্যের হুধে জল মিশিয়ে পরিবেশন করে ভাবেন যে শিশু-সাহিত্য রচনা করছেন! অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক ভাবেন, ছোটদের হাতে সূন তারিখ ও ঘটনা কণ্টকিত মহাপুরুষদের জীবনীই একমাত্র তুলে দেওয়া যায়। অজ্ঞ বই নৈব নৈব চ। যে বই ছোটদের বন্ধনাকে আগায়, মনকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে, সামাজিক অজ্ঞায় অবিচার সম্পর্কে সচেতন করে, চার পাশের সব কিছুর মধ্যকার

কার্যকারণযোগ সম্পর্কে ভাবায়, মানুষকে ইতিহাসের পুতন-অভ্যুদয়ে বহুর পথে চলমান দেখতে শেখায়, যা কাছের ও দূরের দুই সম্পর্কেই আগ্রহী করে তোলে, সেই বইই ছোটোদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। ছোটোদের ধরে বেঁধে শুধু জীবনী পড়াতে হবে আর সাধারণজ্ঞান নামক একটি নিষ্প্রাণ যম-পুরীতে ঘোরাতে হবে, এ কথা কে বলেছে? সাধারণজ্ঞান তরুণমনকে যতোটা বিচ্ছিন্ন তথ্যমু-সন্ধিস্থ করে ততোটা বিচিত্র তথ্যের অন্তর্লীন সত্য-বোধে দীপ্ত করেন। এ জন্তই আমরা সাধারণ জ্ঞানের প্রতি প্রসঙ্গ নই। আমরা প্রতিপদক্ষেপে যা দেখছি, শুনছি তার প্রতি শিশুকে উৎসুক করে তোলাই শিশুদের জন্ত লেখা বইয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর সর্বোপরি যিনি লিখবেন, তাঁকে সাহিত্যিক হতে হবে, নিদেনপক্ষে প্রায়-সাহিত্যিক। এমন কথাও ছাপার অক্ষরে পড়েছি, যারা ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রী, তারা যে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য পড়ে না, তার কারণ এজাতীয় বাংলা বইয়ের অভাব। সত্যি অভাব আছে নাকি, তার আলোচনার জন্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদতে হয়। আপাততঃ আমাদের মতটি বলি, বাংলায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের অভাব নেই। ইংরেজি মাধ্যমের কিছু পোড়োর মনে বাংলার প্রতি এমনই বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলা হয়েছে যে তারা হাজার ভালো বই পেলেও বাংলা পড়বে না, এই তুলনায় অনেক অধ্যাত্ত ইংরেজি বই গোত্রাসে গলবে। কেননা ইংরেজি ছাব্বিশটি বর্ষের এমনই জগজ্জয়ী মাহাত্ম্য।

এই মাহাত্ম্যের মূল কারণ প্রভুপদে আসীন হওয়ার অব্যাহত সুযোগ-সুবিধা ইংরেজি মাধ্যমে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর জন্ত থাকে। আমাদের নানা রঙের ছবিতে ভরা ছোটোদের বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের অভাব অত্যন্ত বাস্তব কারণের জন্ত হয়েছে। বইয়ের বাজার ছোটো ও ছাপাখানা, রক ও অফ-সেট ছাপার দৈন্ত এই দুটিই অভাবের মূল কারণ। তবু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতো লেখকদের কল্যাণে আমরা সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞানের বই পেয়েছি। ছোটোদের হাতে ভালো বই তুলে দেওয়ার মতো মন অভিভাবকদের থাকা চাই। আমাদের অভিভাবকদের যতোটা ইংরেজি ও অজ্ঞাত বিষয় মুখস্থ করানোর উৎসাহ, ততোটা আগ্রহ নেই শিশুর মনকে নানাদিক থেকে জাগিয়ে তোলার দিকে। সেই আগ্রহ থাকলে শিশু-কিশোর সাহিত্যের মনন-জাগানিয়া রচনার পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়তো। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাইরের বই পড়ার অভ্যাসের একটি সমীক্ষার ফল কাগজে দেখেছিলাম। ঠিক পরিসংখ্যান মনে নেই। বছরে শতকরা একজনেরও কম ছাত্র গড়ে একটিরও অনেক কম বই পড়ে। পাঠক বাড়লে বাজার বড়ো হবে। তখন চাহিদার চাপে যোগান বাড়বে। এ অত্যন্ত সাধারণ নিয়ম। সাম্প্রতিককালে 'আলকাবিটা' প্রকাশনী, এশিয়া পাবলিশিং হাউসের মতো কয়েকটি প্রকাশক-সংস্থা ছোটোদের বই ছেপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

৩৯ বই পড়া ও বই পাড়া

করছেন। জুলেভানে, হাল এণ্ডারসন, গ্রিমের অনূদিত রচনাবলী থেকে আরম্ভ করে 'গণিতের কাহিনী' পর্যন্ত অনেক বই তাঁরা ছেপেছেন। শিক্ষক ও অভিভাবক সমাজকে ছোটদের ভালো ভালো বই প্রকাশের খবর জানানোর কোনো সুসজ্জিত উপায় নেই। তাই তাঁরা অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভালো বই তাদের হাতে তুলে দিতে পারেন না। বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি যাবতীয় প্রকাশিত বইকে বর্ণীকরণ ও পরিচয়দানের মাধ্যমে যদি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরেন তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকায়, তাহলে বইয়ের বাজারের এখনকার এলোমেলো চেহারাটা দূর হয়। তাহলে শুধু শিশু-কিশোর সাহিত্য কেন, সব বই বেচা ও কেনার বাজারে একটা শ্রী আসতে পারে।

গত ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন আশা জেগেছিল যে দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র-ব্যাপারের মতো সংস্কৃতির যোগও নিবিড় হবে। কিন্তু সেই আশা ব্যর্থ হয়েছে। হাতের কাছে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, বাংলাদেশ প্রকাশিত 'বই' পত্রিকার ১৩৮-র কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যাটি আছে। এই সংখ্যায় চট্টগ্রামের 'বইঘর' প্রকাশনা সংস্থার মালিক সৈয়দ মোহাম্মদ শফির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। আমাদের সাধারণ ধারণা দুই বাংলার মধ্যে পরস্পরকে জানার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। এই আগ্রহকে প'থোয়ক করে এই পথে দুই বাংলার পুস্তক কারবারীরাই এগিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু

অসুবিধা হচ্ছে দুটি। একটি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতির অভাব। অল্পটি, পশ্চিম বঙ্গের বইয়ের যতো চাহিদা বাংলাদেশে, ততোটা চাহিদা বাংলাদেশের বইয়ের নেই পশ্চিমবঙ্গে। কেননা বাংলাদেশের বই সংখ্যায় কম। তাই সম-মূল্যের সমসংখ্যক বই আমদানি-রপ্তানির নিয়ম আঁকড়ে থাকার জন্য এই লেনদেন প্রায় হচ্ছেই না। বরং মাঝে মাঝে বাংলাদেশের বইয়ের পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ ছাপা হচ্ছে, পাল্টাপাল্টি ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বইয়ের বাংলাদেশ সংস্করণ এমন কি নিউজপ্রিন্টে অনেক বের হচ্ছে। পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে শফি সাহেব বলেছেন, তাঁরা ভারতীয় লেখকদের বই ছাপাছেন ভারতীয় বইয়ের আমদানি কমানোর জন্য। প্রদ্বকর্তা বদিউদ্দিন নাজিরকে তিনি বলেছেন— 'আমি মনে করি বই আমদানি বাবদ যত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় এই ব্যবস্থায় তার অনেক কম মুদ্রা রয়্যালটি বাবদ সংশ্লিষ্ট লেখক বা প্রকাশককে দিয়ে ব্যয় হ্রাস করা যেতে পারে। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক বইয়ের ব্যাপারে এই চেষ্টা করলে উপকার পাওয়া যাবে।' বিনা রয়্যালটিতে পাক-আমলে ঢাকা থেকে এমন কি লাহোর থেকে বিখ্যাত বাংলা বই ছাপা হয়েছে। শফিসাহেব রয়্যালটি দেওয়ার জন্য সরকারি অনুমতি সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। তাঁর প্রস্তাব অতি উত্তম। তবু শেষ পর্যন্ত কিছু আমদানি-রপ্তানির ওপর নির্ভর করতেই হবে। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ আমরা চাই। ভারতীয়

বইয়ের, বিশেষভাবে কোলকাতার বইয়ের, চাপে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্ত সেদেশের সরকার ও জনসাধারণ নিশ্চয়ই সজাগ থাকবেন। কিন্তু তারজন্ত আমরা সে দেশের মূল্যবান বইয়ের নামই শুধু শুনে থাকবো, কোনোদিনই পড়তে পারবো না একখনোই হতে পারে না। শ্রী সাহেবের মতে 'ভারতীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের বাংলাদেশের বই আমদানির ব্যাপারে অনীহা রয়েছে'। এ অভিযোগ কতদূর সত্য জানি না। তবে বইয়ের মতো ব্যাপারের লেনদেনে বৈদেশিক মুদ্রা হারানোর ভয়ে বাংলাদেশের প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতারা যদি সমমূল্যের বই আমদানি-রপ্তানির, নীতিতে অটল থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে হৃদয়েরই ক্ষতি হবে। আমরা অচিরে এই অচল অবস্থার অবসান চাই। আমরা পরস্পরকে জানতে ও জানাতে চাই। নইলে যে মাতৃভাষার জন্ত ঢেলে-দেওয়া-রক্তে উর্বর জমিতে স্বাধীনতার বীজটি ১৯৫২ র দীর্ঘ উনিশ/কুড়ি বছর পরে ১৯৭১ এ অঙ্কুরিত হয়েছে, সেই উভয় বাংলার মাতৃভাষারই ক্ষতি হবে। এ বিষয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলায় নতুন করে চার বছর পরে ভাবা জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

অন্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্তরাষ্ট্র রাজ্যে যেমন আসামে, ত্রিপুরায় এবং সমগ্রভাবে ভারতের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা বইয়ের চাহিদা আছে। কিন্তু পুস্তক বিক্রেতাদের কমিশন কম থাকার ফলে কোলকাতার বাইরে এই বাজার সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এমন কি কোলকাতার বাইরে

পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলে বিশেষভাবে বিশ্বভারতী ও অন্তরাষ্ট্র বিখ্যাত সংস্থার দেয় কমিশন কম থাকায় চাহিদা সত্ত্বেও ভালো বই পাওয়া যায় না। কোলকাতায়ই কি সর্বত্র বাংলা বই সুলভ? যেমন অফিস পাড়া চৌরঙ্গি-এসপ্লানেড, বিনয়-বাদল দীনেশ বাগ 'অকলে ইংরেজি বইয়ের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাংলা বইয়ের বাজার বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে হৈদো পর্যন্তই কেন্দ্রীভূত। এমন কি সংস্কৃতির পাদপীঠ দক্ষিণ কোলকাতাও সব বাংলা বইয়ের দাক্ষিণ্য লাভে সমর্থ নয়। এই অবস্থারও নিরসন চাই। সব জায়গায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে কিছু কিছু দোকান চাই। আর তার সঙ্গে একটি কেন্দ্রীভূত বাজারতো থাকবেই। এই বাজারকেই আমরা শিরোনামায় বই পাড়া নাম দিয়েছি।

এই বই পাড়ার ইতিহাস জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজের সেই উদ্ভটচঞ্চল উনিশশতকীয় উজ্জ্বল দিনগুলিতেই কলেজস্ট্রীট পাড়া বই পাড়া হয়ে উঠার দিকে ঝুঁকছিল। আর তারই পরিণতি আজকের নতুন ঝুঁকাকে থেকে পুরোনো মলিন সব রকম বইয়ের গঞ্জে ভরপুর এই বই পাড়া। আমাদের জীবনের ওপর দিয়ে অনেক সংকটের ঝড় বয়ে গেছে। তবু বই পাড়ার মৃত্যু হয়নি। কেন না সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বাঙালীর বই পড়া থেমে যায়নি। সংকট ত্রাণের পথ সন্ধানের জন্তও বই মানুষ যুগে যুগে পড়েছে। বিদ্যাসাগরের চটির শব্দ

হেয়ার সাহেবের পাক্ষির শব্দ, মধুসূদনের উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি থেকে আরম্ভ করে এই সেদিনের পথের পাঁচালির অপুর সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বিলাতযাত্রীর কাহিনীর লেখকের পরিচয়—এমনিতরো কতো স্মৃতি গুণগুণিয়ে উঠছে এই বইপাড়ায়। অদূরে য়ানিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, মেডিকেল কলেজ, এলবার্ট হল বা এখনকার কফিহাউস, প্রেসিডেন্সি-সংস্কৃত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্মসমাজ

লাইব্রেরি, কমাশিয়াল ম্যাজিয়াম, বিভাগাগর কলেজ, পাক্ষির মাঠ, হৈদো, সেদিনকার জেনারেল এসেম্বলি অর্থাৎ আজকের স্কটিশচার্ট কলেজ, বেথুন কলেজ—এই বই পাড়ার ছ' পাশে আমাদের গত পৌনে ত্রিশো বছরের ইতিহাস নীরব হয়ে আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে। আমাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী এই বই পাড়ার ইতিহাস লেখা হলে সেই ইতিহাসই হয়ে উঠবে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস।

For best quality pure-white crystal sugar

Always rely on the product of

THE PRATAPPUR SUGAR MILLS LIMITED

Mills at :

P. O. Pratappur

Dist : Deoria (U. P)

Registered office :

9, Brabourne Road,

(6th Floor)

Calcutta-1

Phone : 22-0181 (4 lines)

Gram : BESTSUGAR, Calcutta,

Telex : Cal. 611

Phone : Siwan 48

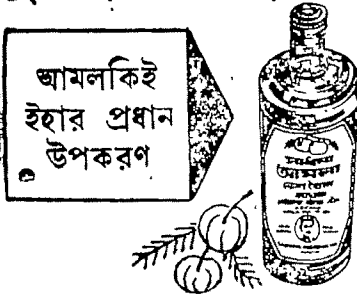
Gram : "Sucrose" Mairwa

We also manufacture Raw Sugar for Export

অনুপম আয়ুর্বেদীয় কেশ তেল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
যুগ যুগ ধরে সুবিদিত



কেশ পতন, অকালপকতা ও
কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং
প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকেশ
কেশোদগমে সহায়তা করে।
মস্তিষ্ক শিথিল ও কর্মক্ষম রাখে।



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা



ভারতীয় জীবনের শ্রান্ধ

নির্মল সেনগুপ্ত

বাইরের দিক থেকে ছনিয়ার চেহারাটা অনেক বদলে গেছে। যানবাহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ক বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্রুত এবং বিজ্ঞানের বহুবিধ আবিষ্কারের ফলে হাজার হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর ও তার সভ্যতার সঙ্গে আজকের পৃথিবী ও তার সভ্যতার মিল নেই।

কিন্তু বাইরে এত পরিবর্তন হলেও মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তন খুব বেশী নয়। সেকালের মানুষের মতো একালের মানুষেরও আছে শ্রম ও ক্ষুধা, আছে আনন্দ ও আতঙ্ক। এই নিয়েই মানব-প্রকৃতির গঠন। বৈষয়িক জীবনের রূপ বদলে যাওয়া সত্ত্বেও মানব-চিন্তার গভীর ধর্মীয় অনুভূতি ও দার্শনিক সমস্যাগুলির কোনো মৌলিক রূপান্তর হয় নি।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে অনেক ভারতীয়ের অজ্ঞতা আছে। অনেকের ধারণা প্রাচীন মুনি ঋষিদের একমাত্র চিন্তা ছিল—জগৎ মায়াময়, সব মানুষ কর্মফলের দ্বারা অদৃষ্টের কারাগারে বন্দী, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল ত্যাগের দ্বারা অমুপ্রাণিত হওয়া এবং কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া—তারা বুঝে নৈয়ায়িক তর্ক ছাড়া

আর কিছুই করতেন না; শুধু শব্দের ব্যঙ্গারই বুঝি ছিল, যেমন 'তৈলাধার পাত্র না পাত্ৰাধার তৈল।' অনেকের ধারণা সেকালে মানুষ সমষ্টিগত চিন্তা করতো না; শক্তিশালী জাতি গঠনের কথা ভাবতো না। কেউ বা বলেন, আমরা যদি ইওরোপীয়ানদের সংস্পর্শে না আসতাম, তবে এখনও অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে যেতাম।

ইওরোপ অনেক উন্নতি করেছে সন্দেহ নেই। তাদের দর্শন ও বিজ্ঞান এবং বৈষয়িক অগ্রগতি পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। এর মূলে আছে সামাজিক নিরাপত্তা। সমাজ যদি স্থিতিশীল না হয়, মানুষ যদি নিরাপদ জীবন যাপন না করতে পারে, সে যদি নিশ্চিন্তে ভাববার অবকাশ না পায়, তবে কোনো সমাজেই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শন-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারে না। ছন্নছাড়া ভবঘুরেদের জীবনে বলিষ্ঠ সংস্কৃতি অসম্ভব।

প্রাচীন ভারতে সামাজিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অবশ্যই ছিল। ছিল বলেই ভারতের দার্শনিক চিন্তা এত উচ্চ স্তরে পৌঁছুতে পেরেছিল। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এর উত্তরে আছে দেবতাত্মা

হিমালয়, বাকী তিন দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। কালিদাস কুমারসম্ভবের সূচনায় ভারতের এই সমগ্র রূপটির চিত্রা করেছেন—‘অস্তি উত্তরস্তাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়োনাম, নপাধিরাজঃ। পূর্বাণরৌ ভোয়নিধী বণাহ স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ’। পর্বত আর সমুদ্র মিলে ভারতকে দিয়েছে একটি বিরাট উপদ্বীপের চেহারা। প্রকৃতি এই অঞ্চলের মানুষকে অকপণ হাতে দান করেছিল নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের নানা উপকরণ। এই ভৌগোলিক অবস্থিতির দরুণ ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে বাইরের অভিযান থেকে মুক্ত ছিল। যদি বা কেউ অভিযান করতে এসে থাকে, তবে তারা ভারতীয় জীবনের সঙ্গেই মিশে গেছে। প্রাচুর্যের জন্যই হয়তো সূপ্রাচীন যুগের ভারতীয়রা কমতার লোভ আর প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে বড় করে দেখে নি এবং অর্থ সম্পদকে জীবনের একমাত্র কাম্য বলে বিবেচনা করে নি। ভারতীয় পরিবেশের পার্থক্যই প্রাচীন মনীষীদের মনে স্বতন্ত্র চিন্তা জাগ্রত করেছিল, যার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সব চিন্তার মিল নেই। ভারতীয় চিন্তার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেছেন সোপেনহুইজ, রোমঁ রোলা, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় মনীষী।

ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দর্শন চিন্তার মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধির চেষ্টা করা যাক। ভারতের বহুদর্শনে জড়বাদী দর্শনের স্থান নেই। কিন্তু যন্ত্র সত্যতায় উন্নত ইউরোপের কাছে জড়বাদী দর্শনের প্রাধান্যই বেশী। কার্ল মাক্স ভারতের দর্শন চিন্তার

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চার্বাক দর্শনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু একালেই হোক আর সেকালেই হোক চার্বাকের জড়বাদী দর্শন ভারতীয় জনমানসে কখনই স্থান পায় নি। এদেশে বা যে কোনো দেশে কমিউনিজমের চর্চা যারা করেন, তাঁদের দর্শন চিন্তায় হেগেল এবং মার্ক্সেরই স্থান বেশী। মাক্স এক জায়গায় লিখেছেন—The philosophers have only interpreted the world in various ways: the point, however, is to change it.

কার্ল মার্ক্সের এই কথার তাৎপর্য হ'ল, দার্শনিকরা ছুনিয়াটাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেই কান্ত, ছুনিয়াটাকে কি ভাবে বদলাতে হবে এবং তার জন্য মানুষকে কিভাবে চলতে হবে, দার্শনিকরা সেই কথাটা ভাবেন নি বেশী। কিন্তু আমরা জানি এই কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের প্রতিটি দর্শনের সঙ্গে পৃথক পৃথক জীবন-চর্যারও নির্দেশ করে গেছেন। ভারতীয় দর্শনে কখনই দারিজ্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় নি। মহাভারতকার স্বীকার করেছেন, দারিজ্য তিলে তিলে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। এই চিন্তার সঙ্গে ‘যাবৎ জীবৎ সুখং জীবৎ’ চিন্তার মৌলিক পার্থক্য আছে।

প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে নৈরাশ্র আত্মসমর্পণ করেছিল একথা ঠিক নয়। তাই যদি হ'ত, তবে প্রাচীন ভারতে শিল্প-কলা, সাহিত্য-কাব্য, প্রযুক্তি বিজ্ঞা ও শাস্ত্র

১ বিজ্ঞান এবং জাহাজ তৈরীর মতো উদ্ভোগগুলি
ঘটতে পারতো না, এবং সেই জাহাজে ক'রে
৬ ভারতীয়রা দেশ বিদেশে বাণিজ্য করতেও যেতো
না। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শত বছর আগে মৌর্য
রাজধানী পাটলিপুত্রে ছিল পঞ্চায়েৎ ও পৌরশাসন।
একটা বিরাট সাম্রাজ্য পরিচালনার মূলে ছিল
কোটিলোর অর্থশাস্ত্র। বাৎসায়নের কামসূত্র প্রমাণ
করে যে জীবন সম্পর্কে সেকালের মানুষের আগ্রহ
নিতান্ত কম ছিল না। মানুষ শতায়ু হোক, তার
জীবনে শত বসন্ত আসুক এই কামনা সেকালের
মানুষও করেছে। তারা খুশী হয়েছে নারীর মিষ্টি
হাসিতে, মুগ্ধ হয়েছে নারীর রূপে, নিবদ্ধ হয়েছে
নরনারী নিবিড় প্রেমে, উর্ধ্বে স্থাপন করেছে
মাতৃষের মহিমাকে।

ভারতীয় আদর্শে শক্তিশালী জাতি গঠনের চিন্তা
আজকের নয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের
সঙ্গে এই চিন্তা ওতপ্রোত ছিল। বিবেকানন্দ,
অরবিন্দ, তিলক প্রভৃতির ছিলেন এই চিন্তার
উদগাতা। বিবেকানন্দ অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস
করতেন, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল
গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য
অনুকরণে গঠিত সমাজ এদেশে নিষ্ফল হবেই।
আমাদের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা আছে পাশ্চাত্য
যা করে তাই ভাল, তা নইলে ওরা এত প্রবল
কেন? এর উত্তরে স্বামীজী বলেছেন—‘বিজ্ঞাতের
আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণ-স্থায়ী। বালক,
তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।’

- শক্তিশালী জাতিগঠন করতে হলে চাই দেশ-
প্রেম। বিবেকানন্দের ভাষায়, ‘পরমাত্মনমী
মাতৃভূমি যেন তোমার আরাধ্যা দেবী হন, অত্যাশ
অকেন্দ্রো দেবতাদের কয়েক বর্ষ ভুলিলে ক্ষতি নাই।
অত্যাশ দেবতার। ঘুমাইতেছেন। এই দেবতাই
একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি, সর্বত্রই তাহার
হস্ত, সর্বত্রই তাহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া
আছেন।’

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জাতীয় জীবনে ত্যাগের
আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বলছেন, ‘হইতে
পারে, পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে কতকগুলি
ব্যক্তির মাথা ঘুয়িয়া গিয়াছে, হইতে পারে সহস্র
সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয় ভোগ রূপ পাশ্চাত্য গরল
আকর্ষণ পান করিয়াছে। তথাপি আমার মাতৃভূমিতে
সহস্র সহস্র ব্যক্তি আছেন, যাহাদের নিকট ধর্ম
কেবল কথার কথা মাত্র রহিবে না, যারা প্রয়োজন
হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সর্বত্যাগে প্রস্তুত
হইবেন।’

বিবেকানন্দের সমকালীন পটভূমিকা এই প্রসঙ্গে
স্মরণ করা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের
বহু বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল বাংলার তথা ভারতের
সমাজজীবনে। সেই বিকাশ ঘটেছিল যেমন
সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, তেমনি ধর্মে ও সমাজে।
এই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন রাজা
রামমোহন রায়। তখন মাত্র কিছু দিন আগে
ইংরাজরা ভারতে এসেছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে
এসেছে খৃষ্টান মিশনারীরা। মিশনারীদের অন্ততম

প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয়দের স্বধর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা। তারা যখন সরাসরি হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত হানতে উদ্ভূত হ'ল তখন সেই আঘাত প্রতিহত করার জন্য আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা ব্রাহ্ম ধর্মের সূচনা করলেন। সেকালের ধনী-মানীরা অনেকে আকৃষ্ট হলেন এই নব ধর্মের প্রতি, অনেকের কাছে এটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এক সময় ব্রাহ্ম ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির সংঘাত শুরু হয়। এই সময়টাতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁদের প্রভাবে হিন্দু সমাজ নিজেকে আবার নতুন করে চিনলো। এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম বিদ্রোহ আত্মস্থ হলো।

বস্তুতঃ তিনটি ধর্মের উর্মিমালা ভারতীয় জীবনকে কয়েক শতাব্দী ধরে ক্ষত-বিক্ষত ও পরিশুদ্ধ করেছে। ভারতে ইউরোপীয় প্রভাবের সবচেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টি হ'ল রাজা রামমোহন রায়। যেমন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে মুসলিম প্রভাবের সব চেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টি হ'ল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ইতিহাসের দুটি যুগে এই দুই মহান পুরুষের আবির্ভাবের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির প্রতিঘাতে এবং রামমোহনের আবির্ভাব ঘটেছিল ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল নব জাগ্রত হিন্দু সমাজের নবীন চেতনায়।

ব্রাহ্মরা হিন্দু সমাজের আধুনিকীকরণে বিশেষ

সাহায্য করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনায়াসে সেই সংস্কারকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের পৃথক অবস্থান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল, ধর্ম ও সমাজের এই বিবর্তন লক্ষ্য করা গেল একদিকে সাহিত্যে এবং অল্প দিকে রাজনীতিতে। 'সাহিত্য আর রাজনীতির সংমিশ্রণ দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে এবং সাহিত্য ও সমাজনীতির সংমিশ্রণ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে।

আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা এক সময় ভারতের মুক্তি চেতনাকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁদের 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র আমাদের জাতীয় মন্ত্রে পরিণত। আনন্দমঠের সূচনা হয়েছে এই ভাবে :

‘আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?’

‘তোমার পণ কি?’

‘পণ আমার জীবন-সর্বস্ব।’

‘জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।’

‘আর কি আছে? আর কি দিব?’

তখন উত্তর হইল, ‘ভক্তি’।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব জাতিকে এবং সর্ব জাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সভ্যরূপে পাওয়া যায়। গোরাকে দিয়ে তিনি বলাচ্ছেন, ‘আমি দিনরাত্রি যা হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ

এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমবার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন.... আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু-মুসলমান ঋষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই যার মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”

‘আনন্দ মঠ’ এবং গোরা-র যুগ হ’ল আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামের সূচনার যুগ। স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতির মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তৎকালীন রাজনীতির কথাগুলি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হত ঋষি বাক্যের মতোই। তখনকার রাজনীতির উপজীব্য ছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং ভারতের পশ্চাদ-বর্তিতা। বিবেকানন্দ বলতেন ভারতের কল্যাণের জন্ত তিনি নরকেও যেতে রাজী। সত্যকারের রাজনৈতিক নেতার মতোই তিনি ভাববাসতেন দেশের অজ্ঞ মূর্খ মানুষদের—“তুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ মুঁচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। তুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্ত বলি প্রদত্ত।’

লক্ষ্য করা যেতে পারে একই ধরনের কথা ভিন্ন সুরে ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে উচ্চারিত হয়েছে গোরার মুখে এবং বিবেকানন্দের মুখে। বিবেকানন্দকে এক সময় বলা হ’ত ‘সাইক্লোনিক হিন্দু’। গোরাকেও সাইক্লোনিক হিন্দু বলতে দোষ কি? এটা নিরর্থক বক্সনা নয় যে, বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা প্রতিফলিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বক্সনাকে আশ্রয় করে ‘গোরা’ উপন্যাসে।

‘গোরা’ কল্পিত চরিত্র। কিন্তু বিবেকানন্দ কল্পিত নয়। বিবেকানন্দ যেমন কল্পিত নয়, তেমনি সুভাষচন্দ্রও কল্পিত নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে যদি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ আর সুভাষচন্দ্র একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। স্বামীজীর মতো নেতাজীও বিশ্বাস করতেন তাঁর জীবন ব্যক্তিগত সুরের জন্ত নয়, জন্ম থেকেই তিনি মায়ের জন্ত বলি প্রদত্ত। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন যে, বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর জীবনে ‘আমূল পরিবর্তন’ এনে দিয়েছিল। তাঁর অসংখ্য জিজ্ঞাসার জবাব তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের মধ্যে। তাঁর নিজের ভাষায় ‘স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।’

আনন্দ মঠের সন্ন্যাসীদের পথ বেছে নিয়েছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীরা, স্বামী বিবেকানন্দের পথ বেছে নিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র,—এই কথা যখন ভাবি, তখন তার মধ্য দিয়ে যেন আমরা ফিরে পাই আমাদের হারিয়ে যাওয়া অতীতকে। এই দেশের রাজা জনক হয়েছিলেন রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক, এই দেশের রাজপুত্র রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গিয়ে বুদ্ধজ লাভ করেছিলেন, এই দেশেরই মহা প্রতাপশালী সম্রাট অশোক বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন, শিবাজীর পথ নির্দেশ করেছিলেন স্বামী রামদাস, বলেছিলেন ‘রাজ্য লয়ে হবে রাজ্যহীন।’ আধুনিক যুগের সব্যসাচী নেতাজীকে দেখতে পাই স্বামীজীর নির্দেশত পথে তিনি সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে

এগিয়ে গেছেন আলোর সন্ধানে। স্বামীজীর কথা মতই নেতাজী যেন ছিলেন জন্ম থেকেই মায়ের জন্তু বলি প্রদত্ত। বলতে পারি অনায়াসে, এমনি করেই আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা সমানে বয়ে চলেছে।

অতীতকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা অবশ্যই বলব না—‘দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর / লও যত লৌহ লৌষ্ট কাষ্ঠ ও প্রস্তর / হে নব সভ্যতা।’ আমরা অবশ্যই অরণ্য সভ্যতায় ফিরে যাবার জন্তু ব্যাকুল হয়ে উঠবো না। কিন্তু আমরা ফিরে পেতে চাইবো আমাদের অতীতের বলিষ্ঠ জীবনকে। পাশ্চাত্য আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে

আমরা গ্রহণ করেছি যথেষ্ট। ভারতীয় সমাজদেহে অতীতে বহু বিদেশী প্রভাব যেমন বিলীন হয়ে গেছে, তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাবের আঙ্গ আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যা আছে তা হ'ল কতকগুলি অবাঞ্ছিত উপসর্গ। সেই উপসর্গগুলি থেকে মুক্ত হওয়া চাই। অনুকরণের দ্বারা কোনো জাতি কোনো দিন বড় হয় নি, হতে পারে না। জাতিকে তার আদর্শের স্বর্ণখনির সন্ধান করতে হবে দেশের মাটির নীচেই। ‘ইজম’-এর ঠোকটুকি বাদ দিয়ে আমাদের নিজেদের জানতে হবে, যে জ্ঞানার নির্দেশ আছে ভারতীয় দর্শনে। ভারতীয় দর্শনেরই রায়, বলহীনের ভাগ্যে লভ্য কিছুই নেই।

মশা
ম্যালেরিয়া

ছড়ায়

ডি. ডি. টি-তে মশা মরে।

ডি. ডি. টি. ছড়াতে দিন, বাধা দেবেন না...

আগনার বাড়ীর

আশে পাশে

মশা জন্মাতে দেবেন না

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করুন

৩

স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রক



“গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ”*

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৯৪১ এর জুন। তরুণ সোল্‌ঝেনিংসিন্‌ সবে রক্তক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছেন। তার সামনে সারা জীবনের স্বপ্ন। ২১শে জুন স্বপ্নটা হুঃস্থপ্নে পরিণত হল। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে। আলেকজান্দার সোল্‌ঝেনিংসিন্‌ আর্টিলারী কাহিনীতে যোগ দিলেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁর বাপও ১৯১৪-১৫-র যুদ্ধে আর্টিলারী বাহিনীতে অফিসার ছিলেন।

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারী। রাশিয়ার প্রত্যাক্রমণ পুরোদমে চলেছে। সোল্‌ঝেনিংসিন্‌ ওখন আর্টিলারীর ক্যাপটেন; রণক্ষেত্রে আসীন সাহসিকতার জন্তে দু'বার ভূষিত হয়েছেন। একদিন হঠাৎ ব্রিগেড কমান্ডার ত্রাক্কিন তাঁকে তলব করলেন: তিনি গেলেন ব্রিগেডয়ারের তাঁবুতে, জ্বালুট করে দাঁড়াতেই ত্রাক্কিন বলেন, “ক্যাপটেন সোল্‌ঝেনিংসিন্‌। তোমার পিস্তল সমর্পণ করো।” তিনি ছকুম তামিল করলেন। সেই মুহূর্তে দুজন গোয়েন্দা লাফিয়ে পড়ে তাঁর অফিসারের ব্যাংক্‌ ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলল। ত্রাক্কিন পেশাদার সৈনিক, তিনি ডায়লেক্টিক্‌, ফাইলেক্টিকের ধার ধারেন

বৈশাখ '৮২- ৭

না;—হতভম্ব হয়ে দেখলেন তাঁরই একজন হুঃসাহসিক অফিসার—সরকারের অশিক্ষিত গোয়েন্দার হাতে অপমানিত হচ্ছেন, বিনা বিচারে বিনা সওয়াল জবাবে, বিনা আপীলে। ব্রিগেডিয়ার ক্যাপটেনের করমর্দন করলেন। হতভম্ব ক্যাপটেনের নেক্সট স্টপ্‌ সাইবেরিয়ায় মৃত্যুশীতল নরককুণ্ড।

দীর্ঘ এগারো বছর—সাইবেরিয়ার নরক ও মধ্য এশিয়ার পাণ্ডববঞ্জিত অঞ্চলে নজরবন্দী থাকার পর ১৯৫৬ সালে সোল্‌ঝেনিংসিন্‌ মুক্তি পেলেন। লেনিন সীমাহীন ত্রাস ও সাইবেরিয়ায় ব্যাপকভাবে নির্বাসনের নীতির উদগাতা (পৃ: ২৯৭, ৩২৮, ৩৫৩)। সেই কারণে বইখানির নাম গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ ১৯১৮-১৯৫৬। লেখকের বিচার হয় নি, সুতরাং ফরিয়াদটা কি সেটা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে লেখক অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছেন যে দ্বিতীয় ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টে এক বাণ্য বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তিনি স্টালিন শব্দটার বদলে “পাখান” ব্যবহার করেছেন। রাশিয়ার এক কাহিনীতে পাখান ছিলেন বিখ্যাত ঠগী সর্দার। কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরাট সাইবেরিয়াতে শত শত বন্দী শিবির যেন সাগরের মাঝে বহু দ্বীপের

সমাবেশ। বন্দী শিবির শাসন বিভাগের পাঁচটি আত্ম
অঙ্কর নিয়ে “গুলাগ” শব্দটি রচিত।

যুদ্ধ-বন্দী

সোলভেনিংসিনের মতে দশ লক্ষাধিক রুশ যুদ্ধ-
বন্দী তিনবার বিশ্বাসঘাতকতার বলি হয়েছে।
প্রথমতঃ, স্টালিন যুদ্ধ-বন্দী সংক্রান্ত জেনেভা
কনভেনশানে যোগ দেন নি; ফলে হিটলার রুশ
বন্দীদের প্রতি জানোয়ারের মতন ব্যবহার করেছেন।
যুদ্ধ শেষে, ব্রিটেন ও আমেরিকা এদের ইচ্ছের
বিরুদ্ধে রাশিয়ায় ফেরৎ পাঠায়। পরে, ভাগ্যবান-
দের গুলি করে নিক্ষেপ করা হয়, বাকী সবাইকে
(নারী ও শিশু সমেত) সাইবেরিয়ায় নরকে নিক্ষেপ
করা হয়।

ফেরৎ বন্দীদের ভেতর কিছু সৈনিকের বিরুদ্ধে
অভিযোগ ছিল কেন তারা আত্মসমর্পণ করেছে
এবং আত্মসমর্পণ যখন করেছে তখন সে নিশ্চয়ই
পাপী। বহু সহস্র সৈনিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ
কেন তারা জার্মানীর হয়ে যুদ্ধ করেছে। এদের
অধিকাংশ রণধর্মী কসাক। সংখ্যায় প্রায় দশ লক্ষ,
বহু শত আর্মেনিয়ানও ছিল। রুশ সেনাপতি
ভ্লাসভের নেতৃত্বে এরা জার্মানীর হয়ে যুদ্ধ করে।
এদের অভিযোগ :- যে সরকার মানুষের ইচ্ছা ও
নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয় না, সে সরকারের কারও
আত্মগত্যে অধিকার নেই। জার্মানীর সৈন্য দল
রাশিয়া থেকে পিছু হটার সময় এরা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার
সমেত জার্মানদের সঙ্গে চলে আসেন। এদের ধারণা

এরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে
রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে।* ১ যাই
হোক, চার্চিল ও রুজভেল্টের প্রত্যক্ষ হুকুমে এদের
জোর করে রাশিয়াতে ফেরৎ পাঠানো হয়।
(পৃ: ২১৯, ২৪৫, ২৫৯)।

রচনা

সাইবেরিয়ায় নরকে বেঁচে থাকাই বীরত্বের
নিদর্শন; মনকে বাঁচিয়ে রাখা অধিকতর বীরত্বের
পরিচয়। সোলভেনিংসিন সেই নরকে ১১ বছর
কাটিয়ে আজ বিশ্বজগতে মহালেখক ভিগেবে
পরিচিত। এই সময় বন্দীদের লেখাপড়ায় কোনও
সরঞ্জাম দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে, সোলভেনিংসিন
যে কোনও ধরণের কাগজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অক্ষরে
একাধিক বইয়ের কাঠামো লিখে রাখতেন যা আজ
বিশ্বের বিদগ্ধজন বই আকারে পড়ছেন। গুলাগ
প্রকাশিত হলে পর করাচী কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড
কোহেন রূপবাহীতে অর্থাৎ টেলিভিশনে আবির্ভূত
হলেন কমিউনিজ্‌মের সমর্থনে। প্রথমে তিনি বলেন
যে গুলাগে যে সব অভিযোগ তোলা হয়েছে সেসব
কথা ঐতিহাসিক বিবেচনা করে মেনে নেওয়া
বলেছেন। কথাটা অপহৃৎ। ক্রুশ্চেভের ঐ
ঐতিহাসিক স্টালিন-বিরোধী বক্তৃতা রাশিয়ার ছাপা
হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, কমরেড কোহেন বলেন যে
গুলাগ একটি উপস্থাপন স্তর এবং ওপর গুরুত্ব
দেওয়া যায় না। গুলাগ উপস্থাপন নয়। এটা নথি-

* ১ গড্ডন লাস্ট সিফ্রেট : লেখক নিকোলাস বেবেল।

পত্র, সাক্ষী-সাবুদ সমেত লাল কংস শাসনের—
 অমানুষিকতার প্রতিবাদ—নাম, ধাম, বৃত্তি, বয়েস
 সবকিছু আছে পাতার পর পাতায়, মোট ৬৬০ পৃষ্ঠা।
 এই সূত্রে, রুশ সরকার প্রচার করেছেন যে
 সোল্‌ঝেনিৎসিন্ দেশজোহী সেনাপতি ভ্লাসফ্কে
 সমর্থন করেছেন। অভিযোগটা ডাঃ মিথ্যে।
 সেনাপতি ভ্লাসফের সমর্থনে লেখক কিছুই বলেন
 নি। শুধু প্রমাণ করেছেন যে, কোন ধরনের শাসন-
 ব্যবস্থায় রুশিয়ার দশ লক্ষ সন্তান জার্মানীর হয়ে যুদ্ধ
 করে? তিনি আরও প্রমাণ করেছেন, “৮৬ হাজার
 জার্মান যুদ্ধাপরাধীকে জেলে পোরা হয়েছে, অথচ
 রাশিয়ার মানুষের প্রতি অপরাধের ক্ষেত্রে ১৯১৯
 থেকে ১৯৫৬ অবধি কোন কমিউনিষ্টের শাস্তি তো
 দূরের কথা বিচারও হয়নি। (পৃ: ১৭৫)।

লর্ড বাট্রাণ্ড রাসেল সম্বন্ধে লেখক বিজ্ঞপাত্তক
 মন্তব্য করেছেন, “ভিয়েৎনামে মার্কিন অত্যাচার
 বিষয়ে লর্ড রাসেল মুখর অথচ রুশিয়ার নিপীড়িত
 মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধে লর্ড সাহেবের কিছুই বলার
 নেই।” (পৃ: ৫৩৭)।

পাখান্‌-এর অগ্ন্যস্ত্র পাপ কর্ম সম্বন্ধে সোল্‌ঝে-
 মিৎসিন্ বলেছেন “কাতিন অরণ্যে ৫৫০ জন পোলিশ
 অফিসারকে কোতল করার কাহিনী (পৃ: ৭৭)।
 এরা জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণের পর পিছু হটে
 রুশ সীমান্তের দিকে যান। তখন হিটলার ও
 স্টালিনের মাঝামাঝি; * স্টালিন পোলিশ

অফিসারদের কয়েক মিনিটে সাবাড় করেন।
 রাশিয়ার সরকার বলে ওটা জার্মানেরা করেছে।
 লেখকের প্রথম কথা হল জার্মানরা ১৯৪১-এর
 আগে কাতিন অরণ্যে পৌঁছায় নি। দ্বিতীয়তঃ যদি
 জার্মানরা পাপটা করে থাকে তাহলে জার্মান
 যুদ্ধাপরাধীদের নূরেমবার্গের বিচারের সময় রাশিয়ার
 উকীলরা—কথাটা তোলেন নি কেন? “১৯৪৪ এর
 অক্টোবরে যখন পোল্যান্ডের গোপন সৈন্যবাহিনী—
 জার্মানদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, শেষ
 পোলিশ সৈন্য প্রাণ দিয়েছে তখন রাশিয়ার
 সৈন্যবাহিনী নদীর অপর পারে বসে বিয়ার খেতে
 খেতে দূরবীণ দিয়ে পোল্যান্ডের সর্বনাশ দেখছিল।”
 এটাতে একটা কথা প্রমাণিত হয়; লেখক রুশিয়ার
 বিবেক। (পৃ: ২৫৭)।

ভারত ৪র্থ শ্রেণীর রাষ্ট্র হলেও সেখানে মানুষ
 ইচ্ছামত লিখতে পারে। কিন্তু যে সব দেশে পান
 বিড়ির দোকান থেকে ছাপাখানা অবধি রাষ্ট্রায়ত্ত-
 সেখানে মানুষ কি ভাবে মতামত প্রকাশ করবে?
 লাল বা কালো অজ্ঞাতশত্রুর শাসনে ম্যানিফেস্টো হল
 বেদ, দলের সম্ভার ব্রাহ্মণ, চেয়ারম্যান হুগেন
 রাজা। এটা যারা ভোলে তাদের কপাল পোড়ে।
 পশ্চিম বার্লিনে একটা স্মৃতি-ফলক আছে, যে সব
 জার্মান অফিসাররা হিটলারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র
 করেছিল (৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪) তাঁদের স্মৃতিতে।
 পশ্চিম বার্লিনে গেলেই সেই স্মৃতি-ফলকের সামনে
 দাঁড়িয়ে ভাবি “অমিতা ঠিক, না শ্রীমতী ঠিক, না
 জ্ঞানেনই ঠিক।” সোল্‌ঝেনিৎসিন্ শ্রীমতীর পথ

* পূর্ব পোল্যান্ড রাশিয়ার দখলে।

বেছে নিয়ে লিখেছেন এবং দণ্ড দিয়েছেন। ইনি যদিও সাংখ্য দর্শনের ভক্ত (কালার ওয়ার্ড ভ্রষ্টব্য) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি। “শেষ আরতি” না পড়লেও অমিতাভের অমৃতবাণী তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছেছে। ইনি দেশ (যা বিবেকের মতন চিরন্তন) আর সরকার (যা সাময়িক) এই দু’টা জিনিষ গুলিয়ে ফেলেন নি। সোলভেনিংসিনের কাছে বিবেক নিত্য এবং সরকার, আইডিওলজি, ইজম ও দল খণ্ড। নিজের সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগের কলে সোলভেনিংসিনের সাহিত্য হয়েছে নিত্য।

অগ্ন্যাত্ম রচনা

স্টালিন কোঁত হবার ৩ বছর পরে লেখক মুক্তিলাভ করেন। তখন স্টালিনের নামে রাশিয়ায় মানুষ হাঁড়ি ফেলে দেয়, এবং স্টালিনের বই তখন শিলিভোভল কাগজের দরে বিক্রী হচ্ছে। এই সময় ১৯৬২ তে মস্কোর নভিমির (নতুন জগৎ) পত্রিকায়—সোলভেনিংসিনের ছোটগল্প “এ ডে ইন্ দি লাইক্ অব্ ইভান দেনিসোভিচ্” এক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ইভান সাইবেরিয়ার বন্দী শিবিরের একজন বন্দী। এক টুকরো—ঝোলানো রেল লাইমে ঘণ্টা বাজিয়ে—ভোরবেলা তার দিন আরম্ভ এবং সূর্যাস্তের পর সেই একই ঘণ্টা শুনে তার দিনান্ত। জেলের পৈশাচিক বিলি-ব্যবস্থা, প্রহরীদের অমানুষিক আচরণ, নারী বন্দীদের ওপর নির্যাতন, এই সব কাহিনী দিয়ে গল্পটি—ভরা। “এ ডে” এবং “গুলাগ” পড়লে

লেখা যাবে যে জারের যুগে শাসকরা অন্ততঃ ভ্রষ্টলোকের মতন ব্যবহার করত। লেনিনকে বন্দী রাখার সময় তাঁকে একটা পুরো বাংলো দেওয়া হয়েছিল; শুধু তাই নয়, শিকারের জন্যে একটা বন্দুকও দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিষ্ট শাসনে সাইবেরিয়ার বন্দীদের বন্দুক তো দূরের কথা, শেলিস রাখলে জেলের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

“এ-ডে”র পর এল একাধিক ছোটগল্প। “এান ইভনিং ইন ফ্রেচেস্তোফ্কা রেল ষ্টেশন,” “কর দি গুড অব দি কজ,” “উই নেভার মেক মিস্টেক্‌স্” এই তিন ছোট গল্পই ১৯৬৩ তে মোস্তিমির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। “এ-ডে” প্রকাশিত হবার পর সারা রাশিয়ায় সোলভেনিংসিনের নাম ছড়িয়ে গেল। অগ্ন্যাত্ম গল্পগুলো প্রকাশিত হবার পর রাজ্যের রসিক সমাজ বুঝলেন যে নতুন এক টল্‌স্টয়ের আবির্ভাব হয়েছে। এর গুরুত্ব আমরা বুঝব না কারণ ভারতে আমরা যা ইচ্ছে বলি এবং যা ইচ্ছে লিখি। অনুরূপ চিন্তাও সর্বহারা রাষ্ট্রে দণ্ডনীয় অপরাধ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সকল সর্বহারা রাজ্য সত্যিকারের সর্বহারা। এই ধরণের রাজ্যে যে কোনও স্বাধীনচিত্ত সাহিত্যিকের—দম বন্ধ হয়ে যাবে এক অনুমোদিত লেখক (যেমন মিখায়েল সোলোখোভ্) ও কবি (যেমন ইউজিন ইয়েভ্‌তুশেংকো) ছাড়া। যাই হোক সারা পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সোলভেনিংসিনকে স্বাগত জানালে।

ছোট রচনার পর এল ক্যালার ওয়ার্ড,

৫০ “গুলাগ দীপপুঞ্জ”

(হাসপাতালের কথা) এবং ফার্স্ট সার্কুল (বন্দী বৈজ্ঞানিকদের গোপন কারার নিখুঁৎ বর্ণনা)। এ-ছাড়া “গুলাগের”—মতন বৃহৎ গ্রন্থ না হলেও বড় উপস্থাস। হুটোই রাশিয়ার সরকারী প্রকাশক প্রকাশের আযাণ্ডা বলে বিবেচনা করেন। ১৯৭০ এর ৮ই অক্টোবর সুইডেনের রাজকীয় অ্যাকাডেমী লেখককে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেন। এই সময় এই মহা-ঐতিহাসিক-রিয়থান্‌ সহরে এক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মাস্টারী করে অম্লসংস্থান করতেন। ১৯৫৮য় আর এক রুশ সাহিত্যিককে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। তার নাম ওবোরিস পাস্তেরনাক। তাঁর অমর রচনা খানির নামঃ উষ্টির জীভাগো (অর্থাৎ জীবন)। রুশ সরকার পাস্তেরনাককে পুরস্কার নেবার জন্তে স্টকহোমে যেতে দেয় নি। সোলজেনিৎসিনও অমুমতি পেলেন না। তাঁকে বলা হয়েছিল গেলে আর ফেরবার অমুমতি দেওয়া হবে না। এখান বলা দরকার যে রুশ নাগরিকদের স্বদেশে ফিরতে হলে ভিসা লাগে। অথচ মিথ্যায়েল সোলোখোভকে একই কারণে স্টকহোমে যেতে দেওয়া হয়। যাইহোক, নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পর রুশ সরকার সোলজেনিৎসিনের ওপর চটে লাল। আরম্ভ হল পুলিশী হয়রাণি। এখেন “পথের দাবী”—লেখার জন্তে শরণচাটুয্যোকে ও “বিজোহী” রচনার জন্তে নজরুলকে অশিক্ষিত কনেষ্টবলরা বাড়ী চড়াও হয়ে উতপাৎ করছে। মস্কোর ছোট্ট ফ্লাটে—দিনে-রাত্রে যখন তখন

অমাজিত গোয়েন্দারা এসে দরজায় ধাক্কা মেরে প্রশ্ন করত, “কে ভইল বা?”

গত বছর ১৩ই ফেব্রুয়ারী, রাশিয়ার পুলিশ সোলজেনিৎসিনকে তাঁর স্ত্রীর ফ্লাটে (যেখানে থাকার জন্তে তাকে পুলিশ পারমিট দেওয়া হয়নি) গ্রেপ্তার করে খানায়, থানা থেকে বিমান বন্দর, সেখান থেকে বিমানে পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন্-এ নিয়ে যাওয়া হয়। বিমান বন্দরে দাঁড়িয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানী নোবেল সাহিত্যিক হাইনরিখ বোয়েল। কিছু দিন পরে তাঁর স্ত্রী, তিনটা শিশু সন্তান ও শাস্ত্রীকে রাশিয়া ত্যাগের অমুমতি দেওয়া হয়। যেই সোলজেনিৎসিন পরিবার এক হল অমনি প্রকাশিত হল গুলাগ দীপপুঞ্জ।

যতদূর মনে পড়ে লগুন বইখানির আবির্ভাব হয় গত বছর ৩রা জুন। আমি পাঁচ কপি কিনি। এক কপি নিজের জন্তে, বাকী কপিগুলো ভারতের কয়েকটি পত্রিকায় জাহাজ ডাকে পাঠাই। টাকা সমস্তার সমাধান করি টেলিফোন বিলের জন্তে গেলাসে জমানো সঞ্চয় দিয়ে কারণ তখন টেলিফোন কোম্পানীর “ধীরে চলো”র জের চলেছে। আমার বিল আসতে আরও তিন মাস।

একদিন রবিবাসরীয় টেলিগ্রাফে দেখি কলিকাতার কাস্টম্‌স্‌ ৩০০ কপি গুলাগ বাজেয়াপ্ত করেছে। লোকসভায় বইখানি আলোচিত হয় নি, ইন্দিরাজী বা রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন সাহেব পড়েন নি। তাহলে কোন মহাপুরুষের উজ্জোগে প্রোমেথিউসকে বন্দী করা হোলো? আমি

কিছু হয়ে এক ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটকে ফোন করলুম?

—আমরা কি রুশিয়ার শাসনে?

—নিশ্চই না। কি ব্যাপার?

—গুলাগ্।

—আমি এক্ষুণি খবরটা পড়লুম।

—আর.....?

—(অশ্রাব্য হিন্দীভাষায় গালাগাল দিয়ে)

এ জন্তে ঐ দুজন ভারতীয় সাংবাদিক দায়ী। ওরা অর্ডার অব্ লেনিন পাবার আশা রাখে।

আমরা কলিকাতায় ধর্মতলা স্ট্রীটের নাম রেখেছি “লেনিন স্মরণী” কিন্তু রুশ সরকার “রেড্ স্কোয়ারে”র নাম বদলে সুভাষ বাগ্, গান্ধী বাগ বা নেহেরু বাগ রাখেনি। সুভাষ, গান্ধী বা নেহেরু কেউ স্বৈরাচারী ছিলেন না। লেনিন পুরোদস্তুর স্বৈরাচারী ছিলেন, এই কথাটাই সোলঝেনিৎসিন সরকারী নথি পত্রের উল্লেখ করে গুলাগে প্রমাণ করেছেন। কলিকাতার কার্চিস ৩০০ কপি গুলাগ বাজ্যেয়াণ্ড করে ভারতীয় সংবিধানের মুখে চূপকালি দিয়াছে। তথাকথিত বামরা নীরব। এদের হাতে কমতা গেলে ভারতীয় সাহিত্য সাধনার লক্ষ্মীলাভ না গঙ্গা লাভ। বিনা বিচারে রাশিয়ার

লেখকদের বন্দী করার প্রতিবাদে মহালেখক ম্যাক্সিম গর্কী লেনিনকে পত্র দেন; উত্তরে লেনিন লেখেন, “ওরা জাতির মস্তিষ্ক নয়, ওরা জাতির বিষ্ঠা” (পৃঃ ২৮)। এ যেন মীনা পেশোয়ারী শরৎ চাট্টোকে ধমক দিচ্ছে। ওরা দাবী করছে যে সে বিধান রায়ের চেয়ে ভাল ডাক্তারী জানে। এদের মতে দলের বাইরে জ্ঞান, সৌন্দর্য, সাহিত্য, আর্ট বলে কিছু থাকতে পারে না। এদের রাষ্ট্রকমতা লাভেই জাগতিক জ্ঞান গরিমার শেষ। সাহিত্যিকরা প্রতি রচনায় “সরবার সেলাম” না জানালে সাইবেরিয়ার কংস কারায় তাদের শেষ নিঃশ্বাস কেগতে হবে। এ হেন রাজ্যে মানুষের কঃ পছা? সোলঝেনিৎসিন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন শেষ পাতায় (পৃঃ ৬১৫), “আমাদের বয়েসের লোকরা যখন নিরাপদ কোণ খুঁজেছি বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পেরিসকোপ দিয়ে ঝোপেঝাপে শত্রু সৈন্য খুঁজেছি সেই সময় একটা পুরো নতুন পুরুষ বেড়ে উঠেছে যাদের মন এখন কুচকাওয়াজ করছে। ওরা আমাদের দিকে চেয়ে মনে মনে বলবে, “ভোঁদার দল!”

• Gulag Archipelago By Alexander SOLZHENITSY N, প্রকাশক COLLINS FONTANA. London paper back 80p.

পুরুষোত্তম

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

স্নিগ্ধ নীলনভসম, বর্ণ ষাঁর মনোরম, সুগঠিত শ্রীমণ্ডিত দেহ ;
শস্ত্রে শাস্ত্রে মণীষায়, শৌর্ষে ধৈর্ষ্যে মহিমায়, তুল্য ষাঁর ছিল নাকে কেহ ।
কুরুক্ষেত্রে অগণন, সমবেত যোদ্ধাগণ, যুদ্ধিবারে সমুদ্ভূত যবে ;
দেখে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, বেশ তাঁর সারথির, অঙ্গহীন ! চমকিল সবে ।
শস্ত্রাঘাতে জর্জরিত, কলেবর রক্তস্নাত, তবু বীর অস্ত্র নাহি ধরে ;
ছুরিরাশি ছণিবার সুদর্শনচক্রে ষাঁর, যুহুর্তেই শত্রু ধ্বংস করে ।
সুখদুঃখলাভালাভ, ক্ষতিবৃদ্ধি সম ষাঁরে, সম ষাঁর জয়পরাজয় ;
সুখে ষাঁর স্পৃহা নাই, দুঃখে ক্রক্ষেপ নাই, কামক্রোধ নাই—নাই ভয় ।
শত্রুমিত্র সম ষাঁর, আশ্রয় প্রদায়ী, মৃত্যু আর অমৃত সমান ;
হলো তাঁর তরোধান, করি বরা ভয় দান, ভায়েও যে নিল তাঁর শ্রাণ ।

একমাত্র তখনই
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অনেকগুলো লোককে জড়ো করলেই মিছিল হয় না,
ওদের সচেতন কর ।

যখন ঝড় আসে খুয়ে পড়ে গাছপালাগুলো,
ঝড় থামতেই

আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় আকাশের নীচে,
তেমনিভাবেই ওদের তৈরী কর ।

ওরা এখন মাথা নীচু করে আছে অনেক সময়,
প্রতিকূল সময়, রক্তচক্ষু শাসন,
ওদের সামনে পেছনে সারিবদ্ধ বুটের শব্দ,
মাথা তুললেই মৃত্যু ।

আগে তৈরী করো, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হোক পাথরে,
কতগুলো লোককে আগুনের কুন্তে ঠেলে দেয়া নয়,
আগুনের তাপে
ভীষণ একটা শপথ অঙ্গীকারের আদলে নিঃশব্দে সেকঁ নেয়া ।

একমাত্র তখন
একমাত্র তখনই
দীর্ঘ প্রতিরোধ, দীর্ঘ সংগ্রাম, রক্তপাত,
মাথা তুলে দাঁড়বার ক্ষণে
নিখুঁত উত্তোঙ্গ ॥

ভারতবর্ষ বিষয়ক

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জামরুল গাছতলায় ভারতবর্ষ এখন কি ভিখারী পথিক

আমরা তার সন্ধ্যা ফুরোতে দেখছি

শুধু খান-পূরা একজনের স্মিত হাস্য

শুধু পান চুন খয়েরের অভ্যাস

১.

নখের ডগায় দাগ

ভোরজে কয়েক খানি ছেঁড়া কাপড়, পোকাকাটা নামাবলী

এখন ভিখারী আসছে গ্রাম থেকে সহরের দিকে

চেহারা পাল্টিয়ে যাচ্ছে সংবাদের রঙিন গার্লিকে

কয়েকজন জামরুল গাছের তলায় আশায় আশায়

এই মাত্র ম্যাজিক লণ্ঠনে কিছু একটা দেখা যাবে এই ভেবে

জানে না নিজেরা কবে ইতিহাসের ভারত হয়ে গেছে।

২.

কী জন্তে তোমার সুখের ঘর ছেড়েছিলে

কী জন্তে বাঁপ দিয়েছিলে সেই গনগনে আগুনে

মানুষের স্বভাব, আসলে মানুষ মাটির গড়া ভাই

কীটপতঙ্গ যেমন আগুন দেখলেই ছুটে যায়

আমরা খুব বড় ঘরের ভাবতে ভাবতে ভারতবর্ষের কিছু ছেলে

বার বার আগুন ছুঁয়েছে

আসলে একজন মরে, আর একজন বাঁচে

আসলে ইতিহাস একটা ধারাবাহিকতা

কারো মরা কারো বাঁচা অচ্ছেদ্য বৃক্সি বা

সকলেই একদিন ছিল এই প্রকৃতির কোলে

ভবু অন্ধকারে মনে কয়

কী জন্তে সুখের ঘর তোমরা ছেড়েছিলে।

আমার ঐশ্বর্য তুমি
(২৫শে বৈশাখ স্মরণে)

শান্তিলীল দাশ

নিজেকে

দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়

অনেকবার নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম
অনুখে, ভালোবাসায়।
আরেকবার হারাই যদি একটি বীজনামে,
রয়েছি সেই আশায়।

পাই নে খুঁজে পাই নে, পথবিপথ সব শেষ—
গোধূলি মুখ ভরে।
অস্থিসার মাটির তাপ উঠছে গায়ে এসে
রক্ত বাস পরে।

হারিয়ে দিতে পারো? আমায় সঁজুতি করে তার
পুরছে ব্রত বুঝি,
আগুন-মণ্ডলের মাঝে অকূল দিশেহারা
নিজেকে আমি খুঁজি।

আমার ঐশ্বর্য তুমি, আনন্দ আমার :
যখন গভীর অন্ধকার
ঢেকে দেয় আমার ভুবন,
কী বিষন্ন হয়ে যায় মন !
খুঁজে ফিরি এখানে ওখানে—
কোথায় আলোর শিখা? সেই অন্ধকারে
তোমার গানের কলি একটি মধুর
গুণ গুণ ক'রে তোলে কী অপূর্ব সুর
আমার সে অন্ধকার মনে ;
দূরে যায় সব কালো, আমার নিজনে
জাগে কী আনন্দ আলোড়ন ;
কোথা বিষন্নতা, কোথা আশাহত মন !
আমার ভুবনে আলো কী উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে তার।
ঘুচে যায় নিঃশ্বাস আমার।
তোমার ঐশ্বর্যে আমি হই বিস্তারন ;
নমো নমো দীপ্ত রবি, নমো বিষ্ময়ন।

তীর্থ পথে

নরেন সরকার

বৃহস্পতি তুঙ্গী, ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সহসা সুযোগ
মিলে গেল বাংলাদেশ ঘুরে আসবার, যে সে সুযোগ
নয়; প্রায় অর্ধশত অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সঙ্গে
সুদূর চট্টল-তীর্থ পরিক্রমা। মাষ্টারদা সূর্য সেন-এর
মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও স্মৃতিরক্ষা করতে চলেছেন “চট্টগ্রাম
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন” ও তত্ সংক্রান্ত বিপ্লবকর্মে অশং-
গ্রহণকারী মাষ্টারদার অমুগামী নামী বিপ্লবীরা।
সঙ্গে থাকছেন তাঁদেরই আমন্ত্রিত অপরাপর গোষ্ঠীর
জনকয়েক বিপ্লবী বন্ধু। এই ‘জন কয়েক’ এর
একজন হিসেবেই আমার এই সুযোগ প্রাপ্তি।

মাটি থেকে অনেক অনেক উঁচুতে আকাশ পথের
স্বপ্ন-প্রয়াণ এ নয়। বাস্তব জগতের কঠিন মাটির
ওপর-দিয়ে, বেগবতী নদীর ওপর দিয়ে যাতায়াত।
বাস, ফেরী, রেলগাড়ী, রিক্শা, আর পদযাত্রা মিলে
সত্যিকার ভ্রমণ। একদিকে কলকাতা থেকে
হরিদাসপুর চেক-পোস্ট, ওদিকে বেনাপোল চেক-
পোস্ট থেকে চট্টলার গ্রাম-গ্রামান্তর। একটা
এ্যাড্‌ভেঞ্চার-এর আনন্দন এপারো দিনের প্রতিটি
দিনে।

ফেরার পর বন্ধুরা বলে—তোমার বাড়ী যাবো,—
বাংলাদেশের পল্ল গুনবো। আমি বলি—পরীবা-

ধানায় নিত্য এসো, সেটা আমি সৌভাগ্য বলেই
মানবো; তবে গল্প তো বলতে পারবো না। বাংলা-
দেশ কি ভূত পেত্নীর দেশ, রাজপুত্‌তুর—
কোটা পুত্‌তুর—পক্ষীরাজ বোড়া—ব্যাঙ্গমা-
ব্যাঙ্গমীর দেশ যে তাকে নিয়ে পল্ল হবে। বাংলা
নামে দেশটা বাস্তব—ভয়ানক ভাবেই বাস্তব।
কঠিন বাস্তবের মাঝ দিয়ে, রক্ত কঠোরকে
বরণ করে নিয়ে বাস্তব মানুষগুলো চলেছে
প্রতিদিনের মর্মস্তুদ বাস্তব হৃৎথকে জয় করতে
করতে,—প্রতিদিন আশা করতে করতে যে
‘বঙ্গবন্ধু’র যাত্রস্পর্শে একদিন সোনার বাংলা
জন্ম নেবে। বলতে থাকি—তার চেয়ে চলে যাও
বন্ধুরা আমার। নিজের চোখে দেখে এসো,—
মানুষের দিক থেকে কঠিনের সাধনা কাকে বলে,
প্রকৃতির দিক থেকে করুণাঘন শ্রামলিমা কাকে
বলে—নদীমাতৃক বাংলাদেশ, মাতার দাক্ষিণ্য নিয়ে
নদীরা বয়ে চলেছে। আর দেখতে ভুলো না মানুষ
মায়েদের—যাঁরা এক চতুর্থা শতাব্দী ধরে কতো না
হৃৎথ, কতো না যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে আপন ছিন্ন অঞ্চল
দিয়ে ঘিরে তুলনী তলার মাটির প্রদীপটিকে আজও
প্রতি সন্ধ্যায় শিখায়িত করে রাখেন, নিজেদের প্রাণ

ও মানকে আজও মাটিতে মিশিয়ে দিতে দেননি, প্রতিদিনের প্রার্থনায় চলে আসা শ্রিয়জনদের স্মরণ করেন, আর—‘কিমাশ্চর্যমতঃপরম্’—একটা দিনের এক দোস্তুর দেখা পেয়ে সব অভিমান ভুলে গিয়ে জিহ্বার সকল শক্তি দিয়ে উল্খনি আর বুকের সবটুকু খাস ঢেলে দিয়ে শঙ্খধ্বনি করে সেই শ্রিয়জনদের বরণ করে নেন। চট্টলার সুদূরতম গ্রামে গিয়ে দেখে এসে—সর্বসহা চিরকল্যাণী জননীয়ুতি কাকে বলে।

আমি এই তীর্থযাত্রার তীর্থরেণু সারা পায়ে, সারা মনে মেখে এসেছি। আমার মন যেখানে পুলকিত হয়েছে, বিষন্ন হয়েছে, কেঁদে উঠেছে, হেসেছে সে তো একান্তই আমার মনের মিরামায়, আর কেউ কি পারবে এই বিচিত্রগামী মনটার আনন্দ-বেদনার অশীদার হতে? হওয়া কী সম্ভব? হয়তো নয়।

তার চেয়ে বন্ধুরা, শোনো ওঁরা সব কী বলছেন, কী লিখছেন। দলের মধ্যে ছিলেন নামী কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা, ছিলেন সুদক্ষ আলোকচিত্রশিল্পী, ছিলেন রাজনীতিক, ছিলেন শিক্ষাব্রতী, ছিলেন আরও আরও বিদগ্ধ জন। তাঁরা ‘নোট’ নিয়েছেন, ডায়েরীর পাতা ভরেছেন, নিয়েছেন অগুণতি কাগজের ‘কাটিং’ আর ছবি, নিয়েছেন ভাষণের ‘টেপ-রেকর্ড’। অনেক অনেক জ্ঞানবর্ষী প্রবন্ধ সবাইকার উপকারার্থে নিশ্চয়ই তাঁরা ছাপাবেন। আমি ছিলাম নিঃসম্বল, সঙ্গে ছিল না এক স্কোয়ার ইঞ্চি কাগজ, ছিল না কলম। ভাড়া ‘ডটপেন’টা

নিয়েছিলাম লেখবার জন্তে নয়, কর্ণকজ্জ্বল নিবৃত্তির জন্তে।

এ নয় ভ্রমণ কাহিনী। স্বাভী, জাতী, যুধি, মল্লিকা, মালতী গোছের ভ্রমণ রোমান্স-এর নায়িকা কোথায়? সঙ্গে নারী ছিলেন যে কয়জন। তাঁরা ‘কট্টর’ বিপ্লবীদের সহধর্মিণী, ভগিনী, কন্যা, ইত্যাদি। সঙ্গে ছিলেন মাষ্টারদার অমুগামিনী, তাঁর স্নেহজ্ঞা প্রখ্যাত। চট্টলহুহিত। এঁরা কেউই যুধি মালতীদের স্বপোত্রা নন।

“উদয়াচলেয় সে তীর্থপথে আমি, চলেছি একেলা সন্ধ্যার অমুগামী।” শতকের মাঝে আমি একক, আমার মনস্চারণার ‘সঙ্গী’ নেই কেউ। আমার জীবনে প্রথম শিক্ষার আলো, প্রথম দীক্ষার আলো যে উদয়াচল থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিলো সে এই বাংলাদেশ; আজ জীবন-সন্ধ্যার দিনান্ত সেই পূর্ব-দিগন্তেই লুটিয়ে পড়তে চাইছে। শৈশব ও কৈশোরে বিভ্রাশিক্ষা শুরু হয়েছিলো চট্টলায়, কৈশোর-প্রাপ্তে ও যৌবনে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ ঘটেছিলো ঢাকায়। আমার জীবনের এই দুই গীঠস্থানে ছবার নতুন করে জন্মেছিলাম। এই জন্মভূমিছয়ের মাটিকে সর্বসম্মত দিয়ে প্রণাম জানাবার জন্তই আমার এই ব্যাকুল তীর্থ যাত্রা।

রাড়ের সন্তান আমি। সেই রাড়—বার গৈরিক-লালে মেশানো কঠিন মাটিতে কেমন ঘেন-একটা মন-কেমন করা গন্ধ থাকে; যেখানে প্রকৃতির ঐশ্বর্যের ব্যভিচার নেই; যেখানে বয়ে যায় দামোদর, ধারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, অজয়, ময়ূরাকী,

৬১ তীর্থ পথে

গন্ধেশ্বরী, সুবর্ণ রেখা—যাদের বর্ষায় ভরা যৌবন আসতে না আসতেই শীর্ণ রুক্ষ সন্ন্যাসীর বেশ ফিরে আসে আর পড়ে থাকে রাশি রাশি সোনালি বালি, আর ছোট্টো একটি পরিচ্ছন্ন স্রোতের ধারা; যার আকাশে বাতাসে বৈরাগী বাউলের একতারার সুর শ্রুত-অশ্রুত সঙ্গীতে ভেসে বেড়ায়; যেখানে কবির পলাতক মন কোথায় যে উধাও হয়,—“গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।”

ঘটনাচক্রে এ-হেন রাত থেকে উত্থিত হয়ে এসে পিয়েছিলুম তদানীন্তন অখণ্ড বাংলার পূর্ব প্রান্তান্তদেশে। একেবারে নতুন মঞ্চ, নতুন পাদপীঠ, নতুন সব দৃশ্যপট। সেই প্রচণ্ড ভালোলাপার দিনটিতে ভাপ্য বিধাতার চরণে যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন শুরু হয়েছিলো আজ জীবন শেষে সেই নিবেদনের নির্মাণটিকে নতুন করে সাজিয়ে দেবার সুযোগ মিলে গেল। “খস্তোহ্মি কৃতকৃতার্থম্।”

পরিচয়ের ‘ফেস্টু’ আঁটা চারখানা বড়ো বড়ো বাস-এ কলকাতা শহীদ মিনারের তলা থেকে ১৫ই এপ্রিল যাত্রা শুরু। লক্ষ্য—শহীদ ক্ষেত্র চট্টগ্রাম। এখানকার ‘যাত্রামোহন হল’-এর প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক ১৮ই এপ্রিল-এ বিপ্লবী সূর্য মাস্টারদা’ সূর্য সেনের ‘ব্রজ’ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এপার ওপার হ’ বাংলার মানচিত্র মনের সামনে ভেসে উঠলো। কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, যশোর, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ও চট্টগ্রাম জেলার ভেতর দিয়ে পরের পর যেতে থাকবো—ওঃ কী রোমাঞ্চকর! আর

সেই চিরপ্রমত্তা পদ্মা, অঁধে জলের মেঘনা, চল-চঞ্চলা কর্ণফুলী, আরও সব ছোট্টো বড় নদ-নদীর সঙ্গে আবার দেখা হবে—সীমা নেই উন্মেষনার। এরা তো যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে, পঞ্চাশটা বছর তো এদের কাছে, নিমেষমাত্র। তবু ভয় হোলো না জানি কেমন দেখবো এদের! এরা না বদলালেও চোখ দুটো তো বদলেছে। দৃষ্টি হয়েছে ক্রীণতর আর তীর্থক, সে স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অভাবে আমার চোখে অনেক কিছুই রূপান্তর ঘটবার সম্ভাবনা—তাই তো এই ভয়।

সীমান্ত শহর বনগাঁ পৌঁছুতে বিকেল হয়ে গেল। স্থানীয় যুবকরা একটা বড়ো ‘হল’-এ সম্বর্ধনা জানানোর জন্তে আমন্ত্রণ করলেন। বলা হোলো—সময় নিতান্তই অল্প, পাঁচটার আগে হ’তরকের চেক পোস্ট পার হতে হবে। যাই হোক—নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রতিভাষণের ওপর দিয়েই অমুষ্ঠানটি সাজ হোলো; তাঁরা খানিকটা ক্ষুধা হলেন হয়তো। কখন-কিয় জাতি, পেট খোলসা করে কথা না বলতে পেলে আমরা’ স্বভাবতই ক্ষুধা হই, কিন্তু এক্ষেত্রে উপায় ছিলোনা কিছু।

কাগজে পত্রে পড়ে আর ভ্রমণ পণ্ডিতদের-মুখে শুনে ‘চেক পোস্ট’ ‘কাস্টমস’ প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞামিশ্রিত ভীতি ছিলো। ধারণা ছিলো—ওসব জায়গার লোকরা ভেমন সুবিধের নয়, যাত্রীদের অসুবিধে সৃষ্টি করাই তাঁদের কাজ। কিন্তু কই! আমরা তো “মাখন-মাখানো পথে” চলে গেলুম। পাসপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেহাতই আনুষ্ঠানিক

৬২ জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৮২

ভাবে ক্ষতভালে শেষ হলো; শ্রীঅঙ্গ বা পোর্টলা
পুঁটলি অস্পৃষ্ট-ই রইলো। ওদিকের ওঁরা হয়তো
ভেবেছিলেন—“প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত”—এর বিপ্লবী
ডেলিগেশন,—‘সীজার-পত্নী’র মতো নিশ্চয়ই সব
সম্মেহের বাইরে। ওঁদের শিষ্টাচার ও বন্ধুবত আচরণ
মমে পত্নীর দাগ কেটেছিলো।

সন্ধ্যার গোড়ায় গোড়ায় পৌঁছে গেলুম
“বঙ্গবন্ধু”র সোণার বাংলার পশ্চিম দ্বারের।

(ক্রমশঃ)

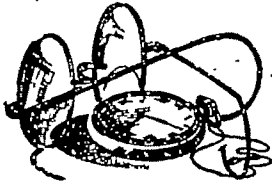
২৬/৪/৭৫

With best Compliments of

TEXMACO LIMITED

Regd. Office
BELGHARIA
Calcutta-58
Phone : 58-1631

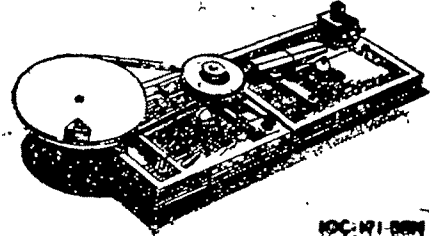
এক ভ্রাতৃ: এক প্রাণ



“একই রাষ্ট্রে, একই পতাকার প্রতি যাদের অগুণ্ড আনুগত্য—তাদের
পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে...যাঁরা ভারতকে এক জাতি বলে
মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে
কোনো প্রম্নই উঠতে পারে না। সকলেরই সমান অধিকার, সমান স্বযোগ—আমাদের ধ্যান-
ধারণার রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ তো হতেই হবে, হতে হবে গণতান্ত্রিক আর তার অঙ্গরাজ্যগুলির
মধ্যে থাকবে ঐকান্তিক সায়ুজ্য।” —মহাত্মা গান্ধী



ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড



১০৮/৭৫

পুস্তক পরিচয়

আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সম্পাদক
ডঃ আব্দুল হাফিজ ভট্টাচার্য, ১৯৭৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী
সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৫ : সঙ্কলনে কিরণশঙ্কর
সেনগুপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্র-
ছাত্রী সম্মেলন ইতিপূর্বে মাঝে মাঝেই অমুষ্ঠিত
হয়েছে, তবে অনেক সময়ের ব্যবধানে। সম্প্রতি
এই ব্যবধানটা ঘুচিয়ে এটি একটি বার্ষিক পুনর্মিলন
উৎসবে পরিণত করার জ্ঞাত গত বছর প্রস্তুতি
কমিটি গঠন করে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী
উদ্যোগী হয়েছিলেন। অবশ্য এই উদ্যোগের পেছনে
কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যাপকদের উদ্যম ও আগ্রহ
নিঃসংশয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের মধ্যে অধ্যাপক
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ; পি, কে, গুহ গত বছর
পুনর্মিলন উৎসবের পূর্বেই লোকান্তরিত হন। তবে
মৌভাগ্যের কথা আচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
এখনও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনের প্রেরণা
দিয়ে চলেছেন।

এই পুনর্মিলন উৎসবের পক্ষ থেকে ১৯৭৪ সালে
ডঃ আব্দুল হাফিজ ভট্টাচার্য সম্পাদনায় “আমাদের
সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়” এবং এবার ত্রীকিরণশঙ্কর
সেনগুপ্তর সঙ্কলন “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষক

ও ছাত্রছাত্রী সঙ্কলন স্মারক গ্রন্থ” আমাদের হাতে
এসেছে। দুইটি স্মারক-গ্রন্থের প্রকৃতি ভিন্নতর।
“আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়” স্মারক গ্রন্থে
প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী-অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের
জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলির আনন্দ-বেদনার
মাধুর্যঘেরা স্মৃতি-চারণ করেছেন। এই স্মৃতি-চারণ
কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের
পরিধিতে সীমিত নয়, বাংলার বৃহত্তর সামাজিক-
রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলনও
দেখা যাবে সেখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উদার প্রাঙ্গণে সেদিনকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ
জীবনের বনিয়াদও রচিত হয়ে গেছে। তাছাড়া
সবচাইতে বড়ো কথা হোলো সেদিনকার
ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক
ফালি জীবন যে সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি করেছিলো,
বহু বৎসর পর বহুতর পথ পরিক্রমা করেও বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের রূপকল্প চেতনার যখন ডাক আসে
পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে, সে-ডাকে প্রাক্তনদের নবীন-
দের মতই সাড়া দিতে দেখা গেছে। ঢাকা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ইতিহাস বাংলার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক-
সামাজিক জীবনের ইতিহাস—“আমাদের সেই ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়”-এর স্মৃতি-চারণগুলি সেই ইতিহাসের
উপাদান বহন করছে।

কিরণ সেনগুপ্তর ১৯৭৫-এর পুনর্মিলনের সঙ্কলনকে মূলত একটি সাহিত্য-সঙ্কলন বলা চলে। ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপকদের সাহিত্য-কৃতীর স্বাক্ষর ধরে রাখবার উদ্যোগ হয়েছে এই স্মারক গ্রন্থে। ব্যতিক্রম আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের দুইটি প্রবন্ধ এবং আরও দু-একটি প্রবন্ধ। ডঃ মজুমদার রচিত প্রবন্ধ “ঢাকায় জীমতী সরোজিনী নাইডু” একটি মূল্যবান স্মৃতি-চারণও বটে দলিলও বটে। তাঁর “স্মৃতি কথার বিভ্রান্তি” শীর্ষক প্রবন্ধ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতি-কথার হের-ফের থেকে প্রকৃত তথ্য উদ্ধাটনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। স্মারক-গ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির এবং সেদিনকার সমসাময়িক জীবনের স্মারক হবে, না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-ছাত্র-ছাত্রীর সাহিত্য-কৃতীর স্মারক হবে, না উভয়ের সংমিশ্রণ হবে এ-সম্বন্ধে উত্তোক্তারা অতঃপর স্থির-নিশ্চয় হবেন, এই আশা নিয়ে

আলোচ্য দুইটি স্মারক গ্রন্থের উত্তোক্তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সমদর্শী

প্রাপ্তি স্বীকার

সমালোচনার জন্য কিছুদিন পূর্বে নীচের ক'খামা বই পেয়েছি।

- ১) বাংলার রেনেসাঁস—অন্নদাশঙ্কর রায়
- ২) Principles and Techniques of Administration : H. V: Kamanh
- ৩) সুভাষবাদ—নূরেন চক্রবর্তী
- ৪) নমামি—জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী
- ৫) West Bengal—The Violent

Years : Sajal Basu

৬) Light me a Candle . Dr Rita Nisinger Ferris

নির্মল বসাক ও অভিজিত ঘোষ সম্পাদিত মে, ১৯৭৫ সংখ্যা সৈনিকের ডায়ারী আমাদের দপ্তরে পৌঁছেছে।

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

ভিয়েৎকং গরিলাদের রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট বাহিনীর নিকট দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সে তরকের মীমাংসা হয়ে গেছে। মার্কিন সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের চূড়ান্ত পরাজয়ে ইতিহাস সপ্রমাণ করেছে যে অস্ত্রবিজ্রোহের উপকরণ থেকে উৎসারিত বিপ্লব দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পরিপূর্ণতা পেয়েছে—চীন, রুশ ও উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক সহায়তায়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহায়তায় আমেরিকা কী পরিমাণ শক্তি সমাবেশ করেছিলো, তার পরিমাপ হিসাব করলেই বোঝা যাবে ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদের আবেগ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী-চেতনাকে এতো প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিলো, যার খরস্রোতকে কোটি কোটি মার্কিনী ডলার, মার্কিনী সর্বোত্তম আধুনিক মারণাস্ত্রের অস্ত্রহীন প্রবাহ নিরস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমল থেকে ১৯৭০-এর ২৭ শে জানুয়ারী প্যারিসে ভিয়েৎনামী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত ভিয়েৎনাম যুদ্ধে যোগদানকারী সর্বোচ্চ মার্কিনী সৈন্য সংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষ। যদিও কেনেডি কার্ভিভার নেবার পূর্বে মাত্র ৬৮৫ জন আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টা ভিয়েৎনামের মজুদ ছিল। এই যুদ্ধে অর্ধ-লক্ষাধিক মার্কিনী যুবক নিহত হয়েছে, এদের নিয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বমোট ২০ লক্ষ নিহত হয়েছে; এ-ছাড়া লক্ষ লক্ষ

লোক পঙ্গু হয়ে গেছে। খাস আমেরিকার প্রবল যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন মার্কিন সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করেছে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ছাত্র-যুবশক্তির বিজ্রোহ নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং সর্বোপরি মার্কিনী সমাজে হুঁসিতির প্রবাহ বইয়ে গভীর সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬৪র ৫ই আগস্ট টনকিন উপসাগরে অবস্থিত উত্তর ভিয়েৎনামের টপেডো বোট-এর উপর বিমান আক্রমণ শুরু করার দিন থেকে মার্কিন বিমানবাহিনী ১৯৭৩-এর জানুয়ারীর যুদ্ধবিরতির দিন পর্যন্ত আমেরিকা গোটা ইন্দোচীনে ৭০ লক্ষ টন বোমা বর্ষণ করেছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে মিত্রশক্তি যে পরিমাণ বোমাবর্ষণ করেছিলো তার শতকরা দেড়শগুণ। এই যুদ্ধে ইন্দোচীনের অস্ত্রভূক্ততিনটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা শতকরা দশভাগ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাষ্ট্র আমেরিকা আণবিক বোমাবাদে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ পরিচালনা করেও এশিয়ার একটি দরিদ্র দেশকে পদানত করতে ব্যর্থ হলো—জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের নিকট এ এক বিস্ময়কর পরাজয়।

১৯৭৩-এর জানুয়ারীর যুদ্ধ-বিরতির বাটদিনের মধ্যে মার্কিনী সামরিক শক্তি সকলপ্রকার সমরাস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ, বিমানবাঁটি প্রভৃতি দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েও উত্তর ভিয়েৎনামের এবং জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট বাহিনীর সামরিক অভিযানকে প্রতিহত করার জন্য দরাজ

হাতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দিয়ে এসেছে। কিন্তু বিপ্লবী বাহিনীর ভাগ, কৃচ্ছ্রতা ও অমিতবিক্রমের মুখে আমেরিকার সামরিক অভিযানের যান্ত্রিক কায়দায় পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীর আয়াসবাহুল্য, তাদের অন্তিম দিনগুলি ডেকে আনে। প্যারিস চুক্তির পর ছই বছরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক যন্ত্র যুগে ক্ষয়ে যায় এবং তাদের অবধারিত শোচনীয় পরাজয়ের দিকে ছবিবার বেগে টেনে নিয়ে যায়। ইন্দোচীনে ফরাসী উপনিবেশিক শক্তি বিভাড়নের পর ভিয়েতনাম বিভাগের ফলে ভিয়েতনামে সেদিনকার জাতীয় বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেলো। ফরাসী উপনিবেশিকদের শূন্যস্থান মার্কিনীশক্তি পূর্ণ করতে এগিয়ে এসেছিলো দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে। সেই সরকারের চূড়ান্ত পরাজয়ে ভিয়েতনামের অসমাপ্ত বিপ্লব সার্বক পরিণতির দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেলো।

কাম্বোডিয়ায় এবং ভিয়েতনামে মার্কিনপুষ্ট সরকারগুলির পরাজয়ের পর প্রশ্ন উঠেছে অতঃপর আমেরিকা কি করবে? আমেরিকা কী এই এলাকায় নিজে থেকে গুটিয়ে নেবে? সোভিয়েত রুশ, চীন এরা কী করবে? এরা কী অতঃপর এই এলাকায় দ্রুত প্রভাব বিস্তারে অগ্রণী হয়ে পারস্পরিক সংঘাতের চাপ বৃদ্ধি করবে? ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়াই বা কী করবে? দক্ষিণ কোরিয়ার কী হবে? কিম্বা ASEAN শক্তিজোটের থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও

ইন্দোনেশিয়া? জাপান, তাইওয়ান এদের কথাও ভাবতে হয়। সর্বোপরি শক্তিবিস্তারের সাম্প্রতিক পরিবর্তনে ভারতবর্ষই বা কী করবে? ছই ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসের পারস্পরিক সম্পর্কই বা কি হবে?

কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে বিভাড়নের প্রচণ্ড গ্লানি আমেরিকার জাতীয়মানসকে আত্মপ্রত্যায়ের শিখর থেকে আত্মহুঙ্কানের অনিশ্চিত ভূমিতে নামিয়ে এনেছে। আমেরিকার সিনেটে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা বিলাপ করে বলেছেন: আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতায় জেনেছি সমস্তার জবাব অস্ত্রসম্ভারে খুঁজে পাওয়া যাবে না— “The tragic experience that we have gone through shows that modern weapons are not the answer. We had everything. The other side had a people who had literally nothing but a determined nation to defend their own country...” উদভ্রান্ত কিম্বারেরও হৃদয় ফিরে আসায় বলেছেন: ‘বোধহয় আমরা ভিয়েতনামে ভুলই করেছি।... যদি আমেরিকার কোন মিত্রশক্তি অস্ত্রবাত দমন করতে চায়, সেক্ষেত্রে সে দেশে আমেরিকার সৈন্যপ্রেরণের মত আর মুখ্যমি কিছু হতে পারে না, কারণ তার ফলে সে দেশে একটি বৈদেশিক শক্তি এসে হাজির হয়—“If an ally decides to fight an internal subversion—I would think that the

introduction of American military forces is the worse way of dealing with it because that introduces a foreign element."

ভিয়েৎনামের আবর্জনার বোঝা ঝেড়ে ফেলে এই দারুণ পরাজয়ের গ্রানির মধ্যে আমেরিকার কোনো ভূমিকা অবশিষ্ট রইলো কিনা, এ-সম্বন্ধে যখন নেতিবাচক সহজসিদ্ধান্তে অনেকেই পৌঁছাচ্ছেন, সে-সময় দুই প্রধান কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত রুশ ও চীন খুবই সতর্কভাবে আমেরিকার ভূমিকা মূল্যায়নে মগ্নসর হয়েছে। সোভিয়েত রুশ, ভিয়েৎনামে মার্কিনী অস্থিতি নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করা দূরে থাকুক বিশ্বের পাদপীঠে আমেরিকার অব্যাহত ভূমিকা সে ভিয়েতের দৃষ্টিতে কতো বাঞ্ছনীয়, সেটাই তার এখন প্রধান প্রতিপাত্ত। কারণ, আমেরিকা যদি তার বিবরে ফিরে যায়, যদি রুশ-মার্কিন মৈত্রীর গতিবুদ্ধিতে অনাগ্রহ আমেরিকাকে পেয়ে বসে, তবে ব্রেজনেভ-এর নেতৃত্বের সমূহ বিপদ। রুশ-মার্কিন মৈত্রী বা দাঁতাত (Detente) ব্রেজনেভের কাছে চির চলমান,— 'constant movement forward'—থেমে থাকতে পারে না। কারণ আগামী বছর ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ২৫-তম কংগ্রেসে চোখ ঝলকানো সাফল্যের চূড়ায় বসে ব্রেজনেভ দলের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করতে চান। তার পূর্বে আমেরিকার সঙ্গে আণবিক অস্ত্র সম্বরণের চুক্তি পাকা করতে হবে, তারপর আমেরিকায় ব্রেজনেভ শীর্ষ সম্মেলনে ফোর্ড-এর সঙ্গে মিলিত হবেন, বছর

না ঘুরতেই হেলিসিকিটে ৩৫-দেশের সদস্যযুক্ত অমুষ্ঠিতব্য শীর্ষসম্মেলনে ইউরোপীয় নিরাপত্তার নীতি পাকা করতে হবে—পর পর এই ধাপগুলির সাফল্যের জন্য আমেরিকার সাহচর্য ব্রেজনেভের অপরিহার্য। এ-ছাড়া যুদ্ধবিশ্বস্ত ভিয়েৎনাম গড়ে তুলবার জন্য আমেরিকার সাহায্য চাই এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের শক্তি-প্রাধাত্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্যও এই অঞ্চলে মার্কিনী উপস্থিতি সোভিয়েতের দৃষ্টিতে উপেক্ষা করবার মত নয়।

পিকিং-ও কিন্তু আমেরিকার পরাজয়ে খুসীতে গদগদ নয়। পিকিং-এর মতে ভবিষ্যতে আমেরিকার পক্ষে এই অঞ্চলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবার সুযোগ এসেছে—"to play a positive role in Asia in future"। এশীয় জাতীয়তাবাদের তীব্রতা সম্পর্কে আমেরিকার চৈতন্যদায় তাকে এই ভূমিকার উপযোগী করে তুলবে। এ-ছাড়া পিকিং এই অঞ্চল থেকে কখনই আমেরিকার অপসারণ চায় নাই নিজেদেরই স্বার্থে। এই অঞ্চলে সোভিয়েতের উপস্থিতির রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করতেই চীনের দিক থেকে আমেরিকার উপস্থিতি প্রয়োজন। ভিয়েৎনামীদের প্রবল জাতীয়তাবাদী প্রবণতা তাদের উপর চীন কিম্বা সোভিয়েত রুশের প্রভূত্বের পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে দেখা দেবেই—সে দুই ভিয়েৎনাম পৃথকই থাকুক কিম্বা পুনর্মিলিতই হউক। সোভিয়েত রুশ যেমন তাদের গড়ন চীনের ওপর চাপাতে পারে নাই, তেমনি চীনও তাদের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার গড়ন ভিয়েৎনামের উপর চাপাতে

পায়বে না। এই দেশগুলির রাষ্ট্রীয় কমতা কমুনিষ্টদের করায়ত্ত হলেও সেখানে কমুনিজমও মূলত নিজ নিজ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে অবলম্বন করে রূপায়ণের পথ খুঁজছে। সুতরাং, মুখ্যতঃ এরা জাতীয়তাবাদের পতাকা বহন করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং এদের কমুনিজমের পরিচয় প্রসঙ্গত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে মুদ্রিত হয়ে আছে। চীন এবং সোভিয়েত-রুশকেও এই বিপ্লবী রাষ্ট্রগুলির জাতীয়তাবাদের আদর্শবোধকে মর্যাদা দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ছয়মাস আগে চীন দক্ষিণ ভিয়েনামের পারাগেসেল দ্বীপ দখল করেছে, দক্ষিণ ভিয়েনামের বর্তমান বিপ্লবী সরকার সে-ঘটনা স্বরণ রাখবে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক মূল্যায়নের সময়ও।

উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করবে কি না সে-প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো সাধারণের পত্তনের সমসময়ে উত্তর কোরিয়ার প্রধান কিম-এর পিকিং সফরে। এই সফরের পর যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে-তাই কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ মিলনের কথা। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারও দমন-সীড়নের আঁটবাঁট বেঁচে সম্ভাব্য অন্তর্বিক্রোহ রূপে তৈরী হয়েছে এবং আমেরিকাও দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পুনরুচ্চারণ করেছে। ভিয়েনামের শুনগঠনের সমস্যাটাই বর্তমানে চীন-রাশিয়ার কাছে অগ্রাধিকার পাবে, তাই উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণের আপাত-সম্ভাবনা নেই।

ASEAN জোটের থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস,

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া-নতুন বিপ্লবী রাষ্ট্রগুলির এবং চীনের কাছাকাছি আসবার জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে। থাই-কাম্বোডিয়া-সীমান্তে উত্তাপ দেখা দিলেও এখনই এই অঞ্চলের ভারসাম্য ব্যাহত হবে না। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সামরিক চুক্তি সত্ত্বেও জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। সুতরাং আপাততঃ কমুনিষ্ট-অকমুনিষ্ট বিরোধ জাপানের পরিস্থিতির ইতর-বিশেষ ঘটাবে না। তাইওয়ানকে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড নতুনভাবে আশ্বাস দিয়ে চীন-মার্কিন সম্পর্কের কোনো হেরফের করেছে বলে মনে হয় না। বরং এই আশ্বাসের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রুশকেই যেন বিজ্ঞাপিত করা হলো তাইওয়ান থেকে দূরে থাকবার জন্য।

ভিয়েনামের অসমাপ্ত বিপ্লব সার্থক পরিপূর্ণতার পথে আর এক ধাপ নিঃসন্দেহে এগিয়ে গেছে দক্ষিণ ভিয়েনামে ও কাম্বোডিয়ায় জাতীয়তাবাদীদের ও কমুনিষ্টদের জয়ে। লাওসেও কোয়ালিশন সরকারের দক্ষিণপন্থীরা কমুনিষ্ট প্যাথেন্ট লাও-এর চাপের মুখে পিছু হটছে; অবিমিশ্র প্যাথেন্ট লাও সরকার সেখানে গঠনের বিলম্ব নাই। তবুও লাওস, কাম্বোডিয়া এবং ভিয়েনামের জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র-দেশগুলির স্বাধীন সত্তার একমাত্র রক্ষাকবচ। যে কোনো বৃহৎ কমুনিষ্ট শক্তি এদের গ্রাস করতে উদ্যত হলে, এদের জাতীয়তাবাদী শৌর্ধ তাদের প্রতিহত করবে। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমুনিষ্ট বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই অঞ্চলে নতুন

৬৯ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অসমাপ্ত বিপ্লবের সমাপ্তির এক ধাপ

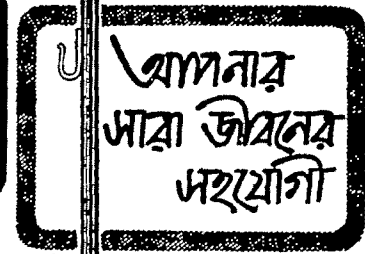
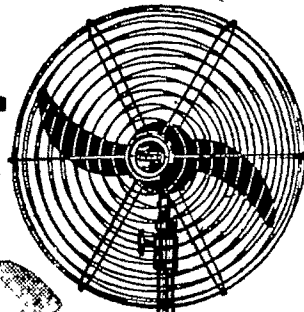
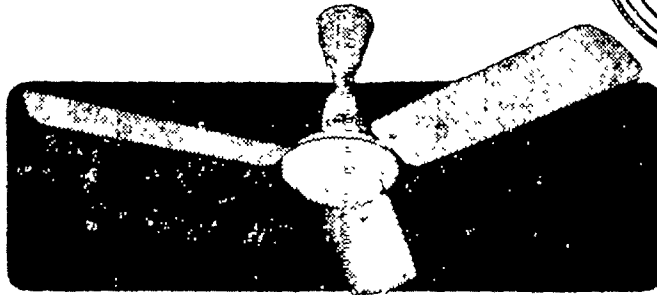
সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। অত্যাচার
আপাতত এই অঞ্চলে পুনর্গঠনের জন্য শান্তি বজায়
থাকবে। বৃহৎ কম্যুনিষ্ট শক্তিবর্গের পারস্পরিক
সম্ভাব্য সংঘাতের জন্যই হোক কিম্বা পুনর্গঠনের
জন্যই হোক, এই অঞ্চলে পরাজিত ও লুপ্তিত-মর্যাদা
আমেরিকার ডাক পড়বেই—যদি আমেরিকা
ভিয়েৎনাম বিপ্লব থেকে কোনো প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে
থাকে।

ভারত সরকার যদি এই অঞ্চলের পরিবর্তিত

পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়নে এবং শক্তিবর্গের ভারসাম্যের
নূতন পারস্পরিকতা সম্পর্কে অবহিত না হয়,
তাহলে মারাত্মক ভুল করবে। সোভিয়েত ঋণের
ভূমিকার চাইতে চীন ও আমেরিকার ভূমিকা যেমন
এই অঞ্চলে অতঃপর মুখ্য হবে, তেমনি জাতীয়তা-
বাদের আবেদনও এই অঞ্চলে প্রবলতর হবে,
নূতন বিপ্লবী সরকারগুলিতে কম্যুনিষ্টদের প্রাধান্য
সংশোধ।

১৫-৫-৭৫

ক্যালকাটা ফ্যান



ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

১৫-৫-৭৫

চিরঞ্জয়ী আত্মার শক্তি

অনামী

“পশুশক্তির উর্ধ্ব জয়ী হোক তোমার আত্মার শক্তি”—দীর্ঘ অনশনের পর কারামুক্ত বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগকে আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তুর্জয় আত্মশক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন নিরস্ত্র সংগ্রামীরা, বিপ্লবীরা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে ৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব পর্যন্ত আত্মশক্তির শৌর্যের, বীর্যের অঙ্গুলি কাহিনী আকর্ণ হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, পশুশক্তির নির্মম পীড়নের মুখে যেখানে উন্নত শির সংগ্রামী বিপ্লবী নিঃশঙ্কচিত্তে আপন প্রত্যয় ব্যক্ত করে চলেছেন আর আঘাতে আঘাতে পঘূর্দস্ত করে তাকে ব্রতচ্যুত করবার পাশবিক অত্যাচার সীমাহীন পূর্ষায়ে পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও আত্মশক্তিতে বলীয়ান বিপ্লবীকে শাসকের চরম অত্যাচার ব্রতচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়েছে—বীর-বিপ্লবী হয়েতো বা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন কিশা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।

১৯০৬ সালে বরিশাল কনফারেন্সে এই তুর্জয় আত্মশক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সমাগত নেত্রবৃন্দের অভ্যর্থনা মিছিলে ‘বন্দে মাতরম’ নিষিদ্ধ; সম্মেলন চলাকালীন পথে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি নিষিদ্ধ।

সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বরিশালের নেতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি দিলে ইংরেজ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কম্প-এর হুকুমে তাকে লাঠির আঘাতে জলে ফেলে দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন পুলিশের লাঠির আঘাত খায় আর ধ্বনি দেয় ‘বন্দে মাতরম’। ১৬শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনে যবন হরিদাসও এই অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এই তুর্জয় আত্মশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন: “খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যদি যায় প্রাণ / তবু আমি বদনে না ছাড়ি হার নাম”। সুরেন্দ্র নাথ বানার্জি তাঁর ‘Nation in Making’ গ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের আত্মশক্তির এই আভ্যাক্তি সম্বন্ধে লিখেছিলেন: “It was a supreme effort of resignation and submission to brutal force without resistance and without questioning.”

জেল-শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীর নিশ্চিত মৃত্যু বরণ, স্বীকৃতি আদায়ের জন্য পুলিশের তুর্জয় অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী বন্দীর মৃত্যু বরণ, কারা আইনের নৃশংসতার প্রতিবাদে বেত্রাঘাতে রক্তাপ্লুত সংজ্ঞাহীন বিপ্লবীর ভুলুঠন,

৭ ৭ JUN 1975

পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে তাদের নৃশংসতার প্রতিরোধ, আত্মশক্তিতে বলীয়ান এমনি নিরস্ত্র সংগ্রামীর আদর্শের পতাকা বহন করবার অজস্র দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়তই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে।

জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের সংগ্রামেও তরুণদের এমনি আত্মছত্রের দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে গুজরাতে ২১ বছর বয়স্ক রাজেন্দ্র ভ্যাস-এর পুলিশের গাড়ীর সামনে সত্যাগ্রহ করে আত্মদান এমনি একটি উজ্জ্বল ঘটনা।

পত ২রা এপ্রিল কলকাতায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সামনে জয়প্রকাশনারায়ণের সভা জোরজবরদস্তি পশু করবার জন্তু কংগ্রেসের যুব-ছাত্রদের হিংস্র আক্রমণ প্রতিহত করতে যারা আত্মশক্তি নিয়ে নিরস্ত্র প্রতিরোধবাহু রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র পার্থসারথি সেনগুপ্ত মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। পার্থসারথি মাথায় গুরুতররূপে আহত হবার পূর্বে যেমন “লোকনায়ক জয়প্রকাশ জিন্দাবাদ” ধ্বনি দিচ্ছিলেন তেমনি আক্রমণকারীদের আঘাতে ভুলুপ্তিত হয়েও ‘লোকনায়ক জয়প্রকাশ জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দিতে থাকেন যদিও আক্রমণকারীদের দাবি ছিল ঐ ধ্বনি বন্ধ করতে হবে। পার্থসারথি তুর্জয় আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীবন-সংশয় জেনেও সেদিন ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। তার এই আত্মশক্তির শৌর্যকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রবীণ বিপ্লবী পঞ্চানন চক্রবর্তী যে পত্র লিখেছেন,

তারই অংশবিশেষ এখানে দেওয়া হল। বিপ্লবী নেতা পঞ্চানন চক্রবর্তীও তরুণ বয়সে মাদারীপুর জেলে জেলের সর্বোচ্চ কতৃপক্ষের আগমনবার্তা বোষণার সঙ্গে সঙ্গে ‘সরকার সেলাম’ ধ্বনি তুলে তাকে সম্মান জানাবার অপমানকর পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বেত্রাঘাতের দণ্ড বরণ করে নিয়েছিলেন। বিশটি নির্মম বেত্রাঘাতে রক্তাশ্লুত বিপ্লবী তরুণের আত্মশক্তি সেদিন পশু-শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলো।

পঞ্চাননবাবু মাদারীপুরের বিপ্লবী ঐতিহ্যের অগ্রতম স্রষ্টা। পার্থসারথিও পারিবারিক সূত্রে সেই ঐতিহ্যের অংশীদার। এই সূবাদেই পঞ্চাননবাবুর পত্রে মাদারীপুরের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে।

পার্থসারথিকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ

পার্থ,

বিগত ২রা এপ্রিল বিহারের জননেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য শোনবার জন্তু আয়োজিত ‘ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের’ সভায় বর্তমান শাসক কংগ্রেসের পক্ষে পশুশক্তির একটা মহড়া হইয়া গেল। ঐ পাশব আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে যাহারা দৃঢ়ব্রতী প্রশস্ত বুক পাতয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা বীর। দৈবী প্রভাব তাহাদের অমোঘ আশ্বাস। তুমি তাহাদের একজন—হয়ত বিশেষ জন। অগ্রদের চিনি না। তোমাকে চিনি। তোমাকে অভিনন্দন জানাই। আর, তোমার

মাধ্যমে তাহাদিগের জন্ত প্রসারিত করিতে চাই আমার আবেগ ও অমুভূতি।

.....অজ্ঞায়ের বিরুদ্ধে তেজ-প্রকাশ। একদা শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছিলেন—জানিয়া রাখ ঐ তেজের মধ্য দিয়েই আমার প্রকাশ (তৎ তেজঃ বিদ্ধি মামকাম।)

১৯০৫ সালে মাদারীপুরের মাটিতে একটি স্থলের জাতকে পুলিশ লাঠিপেটা করে। নামটা আমার জানা-নাই। এটা সূত্রপাত। ১৯৩০ সালের ঘটনা বিশেষ অমুখাবনের যোগ্য। মাদারীপুর মদের দোকানে ‘নিকেটিং করার সময় পুলিশ এমন অত্যাচার করে যে স্বেচ্ছাপ্রবেশকগণ দাঁড়াইয়া তিষ্ঠিতে পারে না। রক্তাক্ত দেহে ছুটিয়া পলায়। এমন অবস্থায় কাল (ইন্দুভূষণ মজুমদার) সংবাদ পাইয়া, মৃত্যুর জন্ত মুখ মনে প্রস্তুত হইয়া, হাতের বাড়িটি পার্শ্ববর্তীর হাতে স্তম্ভ রাখিয়া সংঘর্ষের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। তাহাকে মারিয়া তাহার রক্তাক্ত দেহটা অজ্ঞান অবস্থায় পার্শ্ববর্তী নর্দমায় ফেলিয়া দিয়া বিজয়ী পুলিশ দল আনন্দ প্রকাশ করে। কে সেদিন জিজ্ঞাসাছিল!

১৯৩৩ সালের নিষিদ্ধ কংগ্রেস অধিবেশনের কথা মনে পড়ে। ‘এসপ্লানেডে’ ট্রামগুটির মুখে ১লা এপ্রিল একটা সামরিক আয়োজনের মত অবস্থায় নেতী সেনগুপ্তাকে সভাপতি করিয়া যে অধিবেশন হয়, সেখানে রক্তের ফোয়ারায়

দাঁড়াইয়া, রক্তসিক্ত দেহে প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিল মাদারীপুরের ছেলে। পাঠ শেষ করিয়া চৈতন্য হারাইয়া সে মাটিতে লুটিয়া পড়িল।

দেহ, দেহের ক্রেশ, দেহ অবসানে মৃত্যু এত, তৃণ, লতা, পশুপক্ষী, মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে দৈবী প্রকাশ কেবল মানুষের মধ্যেই সম্ভব যখন সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে দেহের অতিরিক্ত অস্তিত্বে নির্ভর করিয়া তাহাকে প্রকট করিতে পারে। তোমরা তাহা করিবাছ। তোমরা বীর।

যে বীরকে প্রতিঘাৎ নাই, অভিসম্পাত নাই তাহা বশিষ্ঠের বীরত্ব—বীরের বীরত্ব অপর কথায় ধর্মের বীরত্ব। এ বীরত্ব প্রকৃতির নমস্কা। এ বীরত্ব পুরুষের বরণীয়।

আমার বিশ্বাস, এ বীরত্ব আমি চিনি। এবং চিনি বলিয়াই প্রাণ ভরিয়া তোমাঙ্গিকে ভালবাসিতে পারি, আশীর্বাদ করিতে পারি। তোমাদের মধ্য দিয়া ঐ বীরত্বের জয় হোক।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৫

শ্রীপঙ্কজন চক্রবর্তী

পুঃ দৈবী বীরত্ব বিশ্বব্যাপী। ‘কারণ’ বিশ্ব দেবাধীন। উহাকে ‘মাদারীপুর’ বলিয়া চিহ্নিত করাকে ভুল বুঝিও না। দেবাধীন বিশ্বই ধর্মক্ষেত্র। ভবুও কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হইয়াছে। এটা একটা গৌরবান্বিত অমুপ্রাস বিশেষ।

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গোষ্ঠি বা ব্যক্তিস্বার্থেরই পোষকতা করা হোলো—
এই পাপচক্রের দিন ফুরিয়ে গেছে। 'বাম', 'দক্ষিণ',
'প্রতিক্রিয়াশীল', 'প্রগতিশীল' এগুলি অবাস্তব
অভ্যাসের রেশ মাত্র।

সীমান্ত সঙ্কট ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে
সাধারণ নির্বাচনের ছলনা দিয়েও সঙ্কট উত্তরণের
চেষ্টা শাসকদলের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু রাজ্যে
রাজ্যে ও কেন্দ্রে শাসকদলের ভীতভর অন্তর্দ্বন্দ্ব
সে প্রচেষ্টাকে কঠিন করে তুলবে। একদিকে
জয়প্রকাশনারায়ণের সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের সংগ্রাম
ও অজ্ঞদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির ও মস্কোর
অনুচরদের কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্ষমতাদখলের
চেষ্টা, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বকে
আরও বেগবান করে সারা দেশে রাজনৈতিক
অস্থিরতার সৃষ্টি করে। জয়প্রকাশনারায়ণের বিপ্লব
যদি সংগ্রামের ভূমি থেকে সরে গিয়ে পাঁচমশালি
দলের যোগবিয়োগে জড়িয়ে পড়ে বিপ্লব
পথান্তরিত হতে বাধ্য। বিভিন্ন রাজ্যে জয়প্রকাশ
নারায়ণের চারপাশে সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের প্রতি
আস্থাহীন শক্তিগুলি সমবেত হয়ে যে
ভাবে এই সংগ্রামকে আর একটি নির্বাচনী-
চক্রে পরিণত করবার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন,
সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের সংগ্রামীদের সে-সম্পর্কে
কালবিলম্ব না করে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। নির্বাচনী-
ছলনায় সর্বাঙ্গিক বিপ্লবকে পথভ্রষ্ট করতে কংগ্রেসও
যেমন সূচত্বর ভাবে সচেষ্ট আছে, তেমনি কোমো

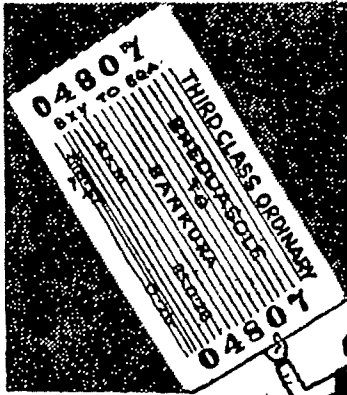
কোনো কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যেও সেই চাতুরীর
লক্ষণ ফুটে উঠছে।

এরই পাশে রয়েছে সীমান্তে বিনদের সম্ভাবনা।
চীন ও পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্বরণ সিং
বলেছেন নিরাপত্তার বিপদ ('Security risks')
বিশেষ। চীন সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে
পরিণত করাকে ভারতের আগ্রাসী নীতি বলে
চিহ্নিত করেছে এবং শপথ নিয়েছে কখনই
এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেবেনা। চীনের
উপ-প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে সফর করে পাকিস্তানের
সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে
গেছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ,
দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচল, প্রভৃতি
বিষয়ে পাকিস্তান মৌমাংসায় অত্যন্ত আগ্রহী।
তা সত্ত্বেও পাকিস্তান ও ভারতের পারস্পরিক
আস্থাহীনতা সুস্পষ্ট। পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীরে
ভূট্টোর পিপলস পার্টির পরাজয়, আজাদ কাশ্মীরের
পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রথম ইসারা যদি
হয় তাহোলে পাকিস্তান বেলুচিস্তানকে দমনের যে
আয়োজন করেছে, আজাদ কাশ্মীরের বেলায়ও
সে-আয়োজন হবে। আগামীতে পাক-ভারত এবং
পাক-আফগানিস্তান সংঘাতে আজাদ কাশ্মীর
বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি যথাক্রমে আজাদ কাশ্মীর
ভারতে যোগ দিতে চায় এবং বেলুচিস্তান
আফগানিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, সেক্ষেত্রে
ভারতের উত্তর সীমান্তে আন্তর্জাতিক সঙ্কটের আপাত
উদ্ভব হতে কিনা—সেটাই বড়ো প্রশ্ন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার পরাজয়ে এই অঞ্চলে যে নূতন ভারণাম্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এই সংখ্যায় প্রবন্ধাক্তরে তা আলোচিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লবে ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ায় বিপ্লব সমাপ্তির পথে এক ধাপ এগিয়ে সে-পথে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রবল আবেদন বিচ্ছুরিত করেছে। ১৩৮২ সালের তোরণ-দ্বারে

নানা স্বন্দ-সংঘাতের মধ্যেও রুদ্র বৈশাখের ভৈরব কণ্ঠ বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের জানান দিয়ে গেলো। বিচ্ছিন্ন চমকে জাতি এই ডাকে জেগে উঠুক নূতন বছরে এটাই আমাদের প্রার্থনা।

২৫শে মে ১৯৭৫



দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

আমার রেল প্রয়ানের ছাড়পত্র

যদি কোনও যাত্রী বিনা টিকিট কিম্বা বেঠিক টিকিট নিয়ে রেল চাপন, তবে আদালত ঠাক ৫৭০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। সবচেয়ে কম জরিমানা হালো ১০ টাকা। সঠিক টিকিট না নিয়ে ট্রেনে যাওয়ার সময়ে রেল কর্মচারীদের হুমত পড়বার আশঙ্কি যদি কোনও যাত্রী রেলভাড়া মিটিয়ে দিত চান, তবে খুব কাম ঠাক ৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

বিনা টিকিট ট্রেনে যাওয়ার সময়ে যদি কেউ ধরা পড়েন, ঠাক খুব কাম ১০টি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

টিকিট কেটে ট্রেনে চাপা আরও জন্মা

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ) ১২'০০

পকেট গীতা ৫'০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১০'০০

ভারত-আত্মার বাণী ৭'৫০

Soul of India Speaks ৭'৫০

কর্মবাণী ১'৫০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১'৫০

শ্রীশ্রীচণ্ডী ২'০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিভাসাগর ৩'০০

ছোটদের গল্পগুচ্ছ ৩'০০

ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাসের

তব্ধ তুর্কী ৩'০০

ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড ৩'২৫

বেতুইনের দেশে ৩'০০

নিবেদিতা ১০'০০

বিভাসাগর ১০'০০

শিবরামের কিশোর নাটক ২'০০

ছোটদের সেরাগল্প ৪'০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী ৪'০০

বীরহে বাঙালী ৩'৫০

বিজ্ঞানে বাঙালী ৫'৫০

বাংলার ঋষি ৫'০০

বাংলার বিদ্বয়ী ৩'৫০

বাংলার মনীষী ১'৭৫

রাজর্ষি রামমোহন ৩'০০

যুগার্চ্য বিবেকানন্দ ২'৫০

আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪'০০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ২'৫০

রবীন্দ্রনাথ ৩'০০

জীবনগড়া ৭'৫০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪'০০

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান

৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত

সংস্করণ)

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী ৬'০০

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ শরীর ও শক্তি ৩'০০

নিবারণ ৫'০০ সরল যোগ ও ব্যায়াম ৩'০০

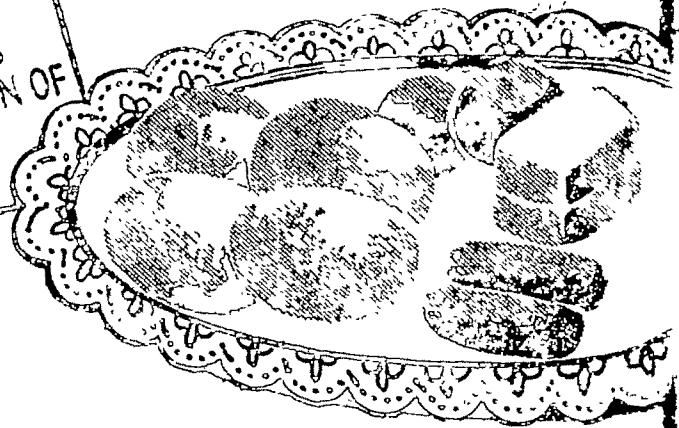
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৩'০০ নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন ২'৫০

ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন ৩'০০ আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট ১'০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২

ADDS A SMILE TO YOUR DISHES

IT'S NOT ONLY
ALL GOODNESS
BUT ALSO A SIGN OF
GOOD TASTE



LAKHMI GHEE

*makes
your dishes
delicious
and
adds
flavor*



Patent Registration No 2870/57 Per Copy Rs 3.00 with Regtd Postage
3.70 : 20-A, Prince Goli Md Road, Calcutta-26, Phone : 46-1710, 46-4116



৪০ বর্ষ
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৮২

প্রতিষ্ঠান-সম্পাদিকা : লীলা বাবু

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২'০০
পকেট-গীতা	৫'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০'০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭'৫০
Soul of India Speaks	৭'৫০
কর্মবাণী	১'৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২'০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.	
বিভাসাগর	৩'০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩'০০
ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের	
তরুণ তুর্কী	৩'০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড	৩'২৫
বেহুইনের দেশে	৩'০০
নিবেদিতা	১০'০০
বিভাসাগর	১০'০০
শিবরামের কিশোর নাটক	২'০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪'০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০
বীরস্বৈ বাঙালী	৩'৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫'৫০
বাংলার ঋষি	৫'০০
বাংলার বিদুষী	৩'৫০
বাংলার মনীষী	১'৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩'০০
ধুগাচার্য বিবেকানন্দ	২'৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪'০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২'৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩'০০
জীবনগড়া	৭৫
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪'০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত সংস্করণ)	
শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	
সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬'০০

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ		শরীর ও শক্তি	৩'০০
নিবারণ	৫'০০	সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩'০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩'০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	২'৫০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩'০০	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	১'০০

সূচীপত্র

জয়ন্তী : বৈষ্ঠ : ১৩৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এই স্তাবকটা কেন ?	সম্পাদকীয়	৭৫	চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও		
শহীদ অনিল দাস	স্মৃতি তর্পণ	৮১	সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য		
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শিকার			(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক রাখাল দত্ত	৯৯
ক্রমবিকাশ	শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ	৮১	নেতাজী-স্মৃতি	অধ্যাপক অমলাভূষণ সেন	
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)			(নাট্টকৃত ইতিহাস)		১০৫
নরেন গোসাঁই যেদিন			ভারতের জাতীয়তা ও স্মৃতিচিহ্ন		
রাজসাক্ষী হলেন	পুলকেশ দে সরকার	৯১	(প্রবন্ধ)	কপেশ্বর ঘোষাল	১১৫
(বিপ্লব-যুগের এক বলক)			সেদিন শারদ স্বপ্নে প্রভাতে উষ্মধারী		
			(সত্যঘটনা অবলম্বনে পল্ল)		১২১

সম্পাদক : সুনীল দাস

বিজ্ঞপ্তি

চারণিকের লেখা পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ।
এই সংখ্যায় প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা হুঃখিত ।
জঃ সঃ

বিজ্ঞপ্তি

ডাঃ নরেন সরকার গুরুতর স্বদরোগে আক্রান্ত
হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন । সেজন্য
তার লেখা 'তীর্থপথে' আপাতত প্রকাশ করা
যাবে না । [সেজন্য আমরা হুঃখিত ।
জঃ সঃ

অনুপম আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকিই
ইহার প্রধান
উপকরণ



কেশ পতন, অকালপকতা ও
কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং
প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনরুক্ষ
কেশোদগমে সহায়তা করে।
মস্তিষ্ক শিথিল ও কর্মক্ষম রাখে।



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা





জয়ন্তী

১০ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২

সম্পাদকীয়

এই স্থানকতা কেন ?

ইন্দিরা গান্ধীর স্থূলস্তুতিতে আজ দিল্লীর আকাশ মুখরিত। কংগ্রেস দলের সাধারণ কর্মী থেকে সর্বোচ্চস্তরের নেতারা স্তুতির ডালি ইন্দিরা গান্ধীর চরণপ্রান্তে উজ্জার করে দিয়ে ধুত হচ্ছেন। প্রতিযোগিতার উদ্দানায় কে কত বেশী নগ্নভাবে ইন্দিরা গান্ধীর বন্দনা করবেন তার জুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে, তাদের বক্তব্যের বাঞ্জনায, আচারে-আচরণে, ভাবে-সাবে। ইন্দিরা গান্ধী তাদের পরিত্রাতা তো বটেই, দেশেরও একমাত্র পরিত্রাতা—ইন্দিরা-বিহনে প্রধান মন্ত্রীর মসনদ অধিকারের যোগ্য লোক কংগ্রেস দলে নাই, দেশের পরিত্রাতাও আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নাই—তাই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব দেশের পক্ষে অপরিহার্য। গদগদকণ্ঠে ভক্তিগ্লুত 'আবেশে' কংগ্রেস সভাপতি বলছেন : 'তেরে নাম কি জয়, তেরে কাম কি জয়,'—'বন্দনা করি তার'—অথবা 'ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা'—

ইন্দিরাই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই ইন্দিরা। এই ধরণের অবিস্থাস্ত স্তাবকতার জন্তই কংগ্রেস সভাপতি সম্পর্কে পরিহাস করে তাকে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাকে দরবারী বিদূষক—'Court Jester' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। স্তাবকতায় কেউ কাউকে হার মানাবেন তার জো নেই। এবীণ কংগ্রেস নেতাদের অজ্ঞতম চ্যবনও বড় কম যান নাই, চাটুব্যাক্যের দৌড়ে। তবে তার ইন্দিরা প্রশস্তিকে আরও একটু উচ্চগ্রামে পৌঁছে দেবার চেষ্টার স্থূল অবলোপ রয়েছে তার বাক্য-বিছাসে। তিনি বলছেন : ইন্দিরার ভাগ্যে যা ঘটবে, তা ভারতের ভাগ্যেও বর্তাবে। ভারতের ভাগ্যে যা ঘটবে তা ইন্দিরাকেও বর্তাবে—'What happens to her happens to India, what happens to India happens to her'।

ভক্তদের চোখে দেশ আর ইন্দিরা এক, দল আর

ইন্দিরা তো অনেকদিন যাবৎই একাকার হয়ে গেছে। যার হওয়া উচিত ছিল—‘Primus inter pares’ বা ‘first among equals’—অর্থাৎ ‘সমকক্ষের মধ্যে প্রথম’—তিনি হয়ে উঠেছেন সর্বোত্তম শুধু মন, সর্বসর্বা। ১৯৭১-এর নির্বাচনের পর থেকেই ইন্দিরা গান্ধী দলের একেশ্বর, সর্বসর্বা, আর দলের প্রবীণ সদস্য সমেত সকলে তার আজ্ঞাবহ মাত্র। নেতা ও দলের সম্পর্কের একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। গণতন্ত্রের নেতা যেমন দলের যন্ত্রমাত্রও নন, তেমনি নেতা দলের সর্বময় কর্তৃক্সের আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে অপর সহকর্মীদের আজ্ঞাবহ হতে পরিণত করেন না। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নেতা দলের প্রতিনিধি। এক প্রতিনিধির পতন বা প্রস্থানে অপর এক প্রতিনিধি দলীয় নেতৃত্বের হাল ধরবেন। আর যেখানে একতান্ত্রিক কাঠামো, সেখানে তাদের ক্ষমতার বিস্তার সীমিত। নেতা সেখানে দলের প্রতিনিধি বা দেশের প্রতিনিধি মাত্র মন, নেতা সেখানে একেশ্বর। কম্যুনিষ্ট ক্রশের ষ্ট্যালিন, ক্যাসিট জার্মানীর হিটলার সর্বশক্তিমান একেশ্বরের নজীর। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস জে, এম, এল সিংহ গত ১২ জুন রায়বেরিলী কেন্দ্রে থেকে ১৯৭১-এ ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং নির্বাচনে ছর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের দায়ে তার ছয় বছরের জস্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার রদ করে রায় দেবার পরই কংগ্রেস দলে এই একতান্ত্রিক উদ্ভাস্ততা প্রবলভাবে বেগবান হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে রাজ নারায়ণের নির্বাচনী মামলায় যে সাতটি অভিযোগ আনা হয়েছিল, এলাহাবাদ হাইকোর্টে জাস্টিস সিংহের বিচারে তার দুইটিতে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সপ্রমাণিত হওয়ায় তার নির্বাচন বাতিল করে ছয় বছরের জস্ত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীর জ্ঞাবহরা প্রশ্ন তুলেছেন, এলাহাবাদের রায়ে ইন্দিরা গান্ধীকে যে ছর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সে ছর্নীতির সঙ্গে নৈতিক ব্যভিচারের (moral turpitude) কোনো সম্পর্ক নেই। ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলায় রায় বেরিলী কেন্দ্রে পরাজিত সংযুক্ত-সোস্যালিষ্ট প্রার্থী রাজনারায়ণ চৌদ্দটি অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর খাস দপ্তরের বিশেষ অফিসার যশপাল কাপুরকে গেজেটেড চাকুরে থাকাকালীন ১৯৭১-এর ৭ই জানুয়ারী থেকে ২৫ শে জানুয়ারী পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী তার নির্বাচনী প্রচারে কাজে লাগিয়েছেন এবং রায় বেরিলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, এজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, রায় বেরিলীর জল বিদ্যুৎ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের ১৯৭১-এর ১লা এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী রায় বেরিলীতে তার নির্বাচনী সভার মঞ্চ তৈয়ারী করতে এবং মাইক্রোফোন চালাবার জস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে লাগিয়েছেন। অস্ত্রাস্ত্র অভিযোগ থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জাস্টিস সিংহ রেহাই দিলেও—এই দুইটি অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত করে রায় বেরিলী থেকে ইন্দিরা

গান্ধীর ১৯৭১-এর লোক সভায় নির্বাচন বিচারক সিংহ বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং সেই সঙ্গে জন-প্রতিনিধিমূলক আইনের বিধান অনুযায়ী দুর্নীতির দায়ে ৬ বছরের জন্ম ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে প্রতিযোগিতার অধিকার বাতিল করে দিয়েছেন। উপরোক্ত দুইটি অভিযোগ জনপ্রতিনিধিমূলক আইনের চোখে দুর্নীতিমূলক আচরণ এবং এই আচরণে দায়ী ব্যক্তিদের ছয় বছরের জন্ম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার হরণ আইনের বিধানে অনিবার্য।

সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর স্তাবকরা তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে 'টেকনিকাল' অর্থাৎ সামান্য খুঁটিনাটির ব্যাপার বলে যতই মনকে চোষ ঠারতে চান না কেন, আসলে দুর্নীতি দুর্নীতিই। উচ্চ মহলে যখন এই দুর্নীতি প্রশ্রয় প্রায়, তখন সেই অনৈতিকতা সীমাহীন হয়ে ওঠে। আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা যেমন আইনের দরবারে প্রশ্রয় পাবার কোনো যুক্তি হতে পারে না, তেমনি আইনের লঙ্ঘন—ছোট-বড় সবরকমই—আইনের চোখে রেহাই পেতে পারে না। তাছাড়া আইনের চোখে ছোট-বড় সবাই সমান। প্রধান মন্ত্রীর জন্ম এক আইন, অপরের জন্ম ভিন্ন আইন—আইনের সামনে এই ধরনের কোনো বৈষম্য অচল। মদ খাইয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে কিম্বা অর্থ ঘুষ দিয়ে ভোট আদায় যেমন আইনের চোখে অনৈতিকতা ও দুর্নীতিরূপে গণ্য, তেমনি জেনেশুনে সরকারী কর্মচারীদের

নির্বাচনের কাজে লাগানো দুর্নীতিমূলক অনৈতিক আচরণ।

এই ধরনের দুর্নীতিমূলক আচরণের দুইটি নজীর বিচারক ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে তথ্য বিচারে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়া বিচারক ইন্দিরা গান্ধীর প্রদত্ত সাক্ষ্য সম্বন্ধেও কয়েক জায়গায় গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন, যা তার সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবিশ্বাস করায়ই সামিল। বিচারক, ইন্দিরা গান্ধীর প্রাক্তন মুখ্য একান্ত সচিব এবং বর্তমানে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান পি এন হাকসার ও প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরের তৎকালীন বিশেষ অফিসার যশপাল কাপুরের সাক্ষ্য সরাসরি অবিশ্বাস করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষ্যের সততা সম্বন্ধেও তেমনি বিচারক কয়েকটি ক্ষেত্রে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন, সরকারী কর্মচারীদের পদত্যাগ মৌখিকভাবে গ্রহণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিচারক বলেছেন শ্রীমতী গান্ধীর ওটা 'পরবর্তী চিন্তা' (after-thought)। কারণ মূল দরখাস্তের এক বছর পর ইন্দিরা গান্ধী যে অতিরিক্ত দরখাস্ত করেছেন, তাতে পদত্যাগ গ্রহণের মৌখিক পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। কবে ইন্দিরা গান্ধী রায় বেরিলী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, সে সম্বন্ধে তার সাক্ষ্য বিচারক সরাসরি অগ্রাহ্য করে বলেছেন গোড়ায় শ্রীমতী গান্ধী অস্বীকার করেন নি যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি রায় বেরিলী কেন্দ্র থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু সাক্ষী দিতে

এসে তিনি অন্তরকম কথা বলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষ্যের এই অংশটুকু সম্পর্কে বিচারক বলছেন: "I regret my inability to accept Mrs Gandhi's assertion from the witness box..."। অত্যাধিকারিক বিচারক ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে বলছেন, ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষ্য 'তথ্যের অসঙ্গতিগুলি দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে'। প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন ব্যক্তির সাক্ষ্য বিচারে বিচারক যথাসম্ভব নিরপেক্ষ মনোযোগ প্রয়োগ করে বলছেন সাক্ষীর পদমর্যাদা বিচারকে কখনই তার প্রদত্ত সাক্ষ্য বিচারে নিয়োজিত করবে না.....সাক্ষীর পদ-মর্যাদার কথা মনে না রেখে নিরপেক্ষতার সঙ্গে তার সাক্ষ্য বিচার করতে হবে: "The status and respectability of the witness alone cannot induce the court to accept his/her testimony, more so when he or she is a party to the proceedings or interested in the result of the case. In such cases, evidence of the person has to be assessed without in any manner being obsessed by the high office that he or she may hold."

বিচারক সিংহ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধেই কার্যত কংগ্রেস দলের একটানা সাজানো বিক্ষোভ চলছে ১৩ই জুন থেকে

২৩ শে জুন পর্যন্ত। বিচারপতি সিংহ তার রায় ২০ দিনের জন্য অকার্যকর করে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, সেই বিরতির সময়ই কংগ্রেসের উচ্চতম মহল থেকে একেবারে নীচের সারি পর্যন্ত আইনের শাসনকে খর্ব করবার প্রচণ্ড উত্তোপ দেখা গেছে এবং সেই সঙ্গে বাস্তবপূজা, অন্ধ স্তাবকতা এবং ক্ষমতার একতান্ত্রিকতার জোয়ার বয়ে গেছে। বিদেশে যেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামোর কোনো উচ্চতম পদাধিকারীর উপর সামান্য মাত্র কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগলে কিম্বা তার সত্তার ওপর সামান্য মাত্র কালো ছায়াপাত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী পদত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন, একতান্ত্রিকতার ক্ষেত্রে তার বিপরীত আচরণ দেখা যায়। পশ্চিম জার্মানীর গণতান্ত্রিক ফিডারেল কাঠামোর অন্ততম স্তর ও স্তম্ভ চ্যান্সেলার উইলী ব্রান্টের খাস দপ্তরে তার একান্ত সচিবদের অন্ততম সোভিয়েত রুশের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রান্ট পদত্যাগ করেন। অথচ ব্রান্টের নেতৃত্বে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করে ফ্রি ডেমোক্রেট দলের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে এবং তিনি প্রধান মন্ত্রী বা চ্যান্সেলারের পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই নির্বাচন নাকচ হয়ে ৬ বছরের জন্য নির্বাচনের অধিকার লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক মান ও সর্বোচ্চ মহলে নৈতিকতাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখবার দায় মেনে নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ

অনিবার্য ছিল। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালে সঞ্জীব রেড্ডীর নাম রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রস্তাব করে নিজেই সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের জনজীবনে একবার যেমন নৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের মূলে ত্বরন্ত আঘাত করেছিলেন তেমনি এলাহাবাদের রায়ের পর কংগ্রেস দলের সাজানো মিছিল ও স্তাবকতা দিয়ে নিজের স্থান অনিবার্য একেধারের পর্যায়ে উন্নীত করে দ্বিতীয় বার মূল্যবোধের হস্তারকের ভূমিকা নিয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর কোনো বিকল্প কংগ্রেস দলে নেই, কংগ্রেস দলের চাইতে ইন্দিরা গান্ধীর স্থান উর্ধ্ব এবং ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতবর্ষ এক ও অভিন্ন— এই মানসিকতা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে কলুষিত করেছে। ভারতবর্ষের অনেক শীর্ষস্থানীয় অপ্রতিরোধ্য নেতার তিরোধানের পরও দেশ এগিয়ে চলেছে। দু'জন প্রধানমন্ত্রীর তিরোধানের পর সহজ ও সঙ্গতভাবেই পর পর তাদের বিকল্প প্রধান মন্ত্রী দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে হাল ধরেছেন। আর ইন্দিরা গান্ধীর বিকল্প নেই, এই প্রত্যয় যারা তারস্বরে ঘোষণা করেছেন, তারা নিজেদেরও যেমন অসম্মানের গহ্বরে টেনে এনেছেন, তেমনি গোটা দেশের মূল্যবোধকেও।

গত ২৪ শে জুন সুপ্রিম কোর্টের অবসরকালীন বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ারের কোর্টে ইন্দিরা গান্ধী বিচারপতি সিংহের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের এবং আপিলের চূড়ান্ত মিস্প্রিটি না হওয়া পর্যন্ত এ

রায় পূর্ণরূপে অকার্যকর রাখবার আবেদন করেন। বিচারক আয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ১৪ ই জুলাই সুপ্রিম কোর্ট খুললে প্রধান বিচারপতির কোর্টে আপিলের শুনানীর তারিখ ধার্যের আবেদন জানানো এবং অন্তর্বর্তীকালে শর্ত সাপক্ষে এলাহাবাদের রায় অকার্যকর থাকবে। এই শর্তগুলিতে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালাবার অধিকার দেওয়া হলো ও লোকসভার কাজে অংশগ্রহণে এবং লোকসভায় ভোটদানে বিরত থাকতে ইন্দিরা গান্ধীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও ইন্দিরা গান্ধী লোক সভায় হাজিরা খাতায় সহি করতে পারবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

বিচারক আয়ারের রায়ে ইন্দিরা গান্ধীকে লোক সভায় ভোট দানে এবং সভার কাজে অংশগ্রহণে বিরত থাকার নির্দেশ, তার প্রতিনিধিত্বের ওপর গভীরতর কালিমা লেপন করেছে। সুভাষা প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগের অনিবার্যতা সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী রায়ের পর আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সে পথে যাবেন না। চূড়ান্ত স্বৈরশাসনের জন্য তারা প্রস্তুত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থেকে এবং বশংবদ কংগ্রেসের সমর্থনের সাজানো প্রাচীর ঘেরা অনৈতিক মনোভাব, দেশে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরী করে গণতন্ত্রের শাস্ত্রানুশাখা রচনা করবে। যারা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে

বহুপরিকর তাদের সঙ্গে সংঘাতে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরশাসনে সেনাবাহিনীর ভলব পড়তে পারে, কিম্বা উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কোনো নতুন সংঘাতের সূচনা দেখা দিতে পারে। এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে স্বৈরশাসনের অস্থির পরিণতিতে বাংলাদেশের মত একদলীয় শাসনের আবির্ভাবে, গণতান্ত্রিক ঠাটবাট, বহুরৈখিক সামাজিক-রাজনৈতিক (pluralist polity) কাঠামো পঙ্গুর জলে ভেসে যাবে।

গুজরাতে নির্বাচনে জনতা ফ্রন্টের কাছে কংগ্রেসের পরাজয় শাসকদলের একতান্ত্রিক গতিবেগ বৃদ্ধি করবে। জনতা ফ্রন্ট ৮৭টি আসন পেয়েছে, কংগ্রেস গত বিধান সভার ১৪০টির পরিবর্তে ৭৫ টি আসন পেয়েছে (গতবারের আসন সংখ্যা ১৬০ এবার ১৮২ তে বৃদ্ধি পেয়েছে)। 'গুজরাতে বঁধু' ইন্দিরা গান্ধীর ১১ দিনে প্রায় একশ ত্রিশটি সভা করা সত্ত্বেও। গুজরাতে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের এবং কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনমানসের প্রবল বিক্ষোভ দ্ব্যর্থহীনভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই বিক্ষোভ আরও ব্যাপক-

ভাবে দানা বেঁধে উঠবার আগেই জনবিক্ষোভ দমন করবার প্রস্তুতিরূপে গণতান্ত্রিক ঠাটবাট বিসর্জন দিতে হবে। ১২ই জুন থেকে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী সেই প্রস্তুতিকে স্বায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

বিরোধী দলগুলিকে দেশের সামনে এই বিপদ-সঙ্কটের ভাবগর্ষ উপলব্ধি করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয়তাবাদী দলগুলির এ-বিষয়ে দায়িত্ব প্রস্ফুটীত। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অবিলম্বে তাদের সংযুক্ত (merger) চাই। আর এই জাতীয়তার প্রকৃতি হবে বৈপ্লবিক। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ দেখাবে। ভারতবর্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সর্বোত্তম প্রতীক। জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাঙ্গক বিপ্লব সেই পথেরই অমুসারী যদি কোনো অপশক্তি তাকে পথান্তরিত করবার সুযোগ না পায়।

২৪শে জুন, ১৯৭৫

শহীদ অনিল দাস

৪৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো, বাংলার তারুণ্য-শক্তির একটি চূর্ণয় দীপ্তি নিঃশেষে আত্মদান করে গেছেন। 'ঐক্যবর' যুবশক্তির ক্রান্তিহীন, নিঃশঙ্ক নায়ক, বিপ্লবী নেতৃত্বয় অনিল রায় ও লীলা নাগের পরম স্নেহভাজন মন্ত্রশিষ্য, বিপ্লবী অনিল দাস ১৯৩২-এর ১৭ই জুন শহীদদের জয়মালা নিয়ে মহা-প্রস্থানে যাত্রা করলেন।

১৯৩০-এর এপ্রিলে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর বাংলার সর্বত্র গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেছে। প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে। কাউকে পুলিশ তড়িৎগতি গ্রেপ্তার করেছে, কেউ বা আঁচ পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। অনিল দাসের নামে মে মাসে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হল। পুলিশ তাঁকে খুঁজে পেলো না।

১৯৩২-এর মে মাসে দিনছপুর্নে ঢাকা শহরের বুকে একটি নিখুঁত ও চূর্ণবর্ষ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে পুলিশ হতচকিত হয়ে গেলো। সুপরিকল্পিতভাবে শহরের ওপর দিনের বেলায় ট্রেন থামিয়ে সশস্ত্র যুবকদের অর্থলুণ্ঠন সেদিনকার বাংলার বৈপ্লবিক অধ্যায়ে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা।

৮ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর থেকে অকস্মাৎ ১৯৩২-এর ৬ই জুন শেষরাতে ঢাকার অদূরবর্তী এক গ্রামার ঘাটে অনিল দাস গ্রেপ্তার হন।

২৬ বছর বয়স্ক মেধাবী ও শক্তিমান যুবক অনিল দাসের উপর পুলিশের পৈশাচিক অত্যাচার শুরু হয় ঢাকায় কয়েকদিন পূর্বে দিনছপুর্নে ট্রেনের অর্থলুণ্ঠন সংক্রান্ত বৈপ্লবিক নেতৃত্বের জন্ত। অবিশ্বাস্য অত্যাচারে গ্রেপ্তারের এগার দিনের মধ্যে সবল, সুঠাম দেহ চুরমার হয়ে গেলেও বিপ্লবী অটল রইলেন। তিল তিল হত্যার পরিণতিতে ১৭ই জুন বিপ্লবী অনিল দাস শহীদদের সারিতে যোগ দিলেন।

১৯০৬ সালের ১৮ই জুন কলকাতায় হারিসন রোডে মাতামহের বাসায় অনিল দাসের জন্ম। তাঁর স্কুল জীবন শুরু হয় নারায়ণপাশে, সেখানে তার পিতামহ লক্ষপ্রতিষ্ঠা আইনজীবী ছিলেন। পিতা ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান সরকারী কর্মচারী। অতঃপর মেদিনীপুর ও কাঁথি স্কুলে পড়াশোনার পর ঢাকার পোগোস স্কুলে ভর্তি হলেন। মেদিনীপুরে তাঁর মাতামহ অতিরিক্ত জেলা মাজিস্ট্রেট ছিলেন। অনিল দাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে কেমিস্ট্রিতে এম-এস-সি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবন থেকেই সুতোয় ধীসম্পন্ন ছিলেন অনিল দাস। বন্ধু বৎসল, সেবাপরায়ণ, আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক, অল্পপম মানসিক সৌন্দর্যের অধিকারী এই আত্মভোলা তরুণ, তাঁর সহপাঠি, সতীর্থ, সহকর্মী, পরিবার-পরিজন ও পরিশেষে

৮২ জয়ন্তী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২

জনজীবনে নিম্নে সর্বদাই বিজিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর দুর্লভ চরিত্রমাধুর্য তাঁকে সকলের নিকট প্রবলভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

জয়ন্তীর প্রদোষকালে যারা এই পত্রিকাটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদিকার পাশে

দাঁড়িয়েছিলেন আত্মগোপনকারী অনিল দাস ছিলেন তাঁদের ঘনিষ্ঠতমদের অন্যতম। জয়ন্তী তুমি এই শহীদের ৪৩তম স্মৃতি-বর্ষিকোত্তে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

দুর্মদ আহানকোষা আজ অতীতের স্মৃতি



আহানকোষা। নবাব মুশিদকুলি খাঁর দেয়া হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র। অতীতের মুশিদাবাদ—ঐশ্বর্য আর বিলাসের লীলাভূমি। যেখানে অতুলনীয় দেশপ্রেম আর ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে সমান গতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে নবাবী বাড়লার গৌরব-গাঁথা আর তার পতনের বেদনাময় ইতিহাস। এছাড়াও আজকের মুশিদাবাদে আপনি পাবেন অতীত ঐতিহ্যের স্মারক সূক্ষ্ম কারুকার্যে অসাধারণ হাতির দাঁতের জিনিস পত্র আর সিল্কের শাড়ি। আজই চলুন মুশিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী আমলের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি। রাজীবাসের জন্মে রয়েছে বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ। সেখানে পাবেন আধুনিক স্বচ্ছন্দা আর আরাম।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩২, বিনয়-বাদল-দীপেশ বাগ (ডালহৌসি কোয়ার্টার) ষ্টে. কলিকাতা-৩
ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS
বরাহ্ম (পের্টন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শিক্ষার ক্রমনিকাশ

শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

“সেখানেও এক সমস্যা, নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শুধু গ্রামের ছেলেরা পড়ে। এখানে তা নয়। এখানে দূর থেকেও ছেলেরা আসে। তাদের পক্ষে ছুঁবার যাতায়াত সম্ভব নয়। সুতরাং স্থির হল, দূরের ছেলেদের জন্য ছুপুরের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব বিদ্যালয়ে রান্নার আয়োজন করতে হ’ল এবং একদল ছেলেকে রান্নার কাজের ভার দিতে হল।

“শুধু ভাই নয়। ছেলেদের খাওয়াতে হলে তার খরচও আছে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছেলে দূর থেকে আসে। এতগুলো ছেলেকে খাওয়ানোর অনেক খরচ, ঠিক হল চালটা ছেলেরা বাড়ী থেকে আনবে। আর সব স্কুল থেকে দেওয়া হবে কিন্তু তাও বড় কম নয়। সারা বছরের তরকারী তো আছেই তার উপর আছে আলানি এবং তেল মুন মরিচ মশলা। এই সবই ফসল বিক্রি করে করতে হবে। সুতরাং একটু বড় করে চাষের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতদিন কোদাল দিয়েই চাষ হচ্ছিল, বড় চাষ কোদাল দিয়ে হয়না। কাজেই হাল গরুর ব্যবস্থা করতে হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরুর খাবার চাষেরও ব্যবস্থা করতে হ’ল। চাষ বাড়ার সঙ্গে সারের প্রয়োজনও বাড়ল। গরু থাকতে একটু সুবিধা হল। আবর্জনা এবং শুকনো পাতা থেকে পচা সার আপেই করা হত। এখন কমপোষ্ট করা শুধু হল।

“ছেলেদের বাড়ী থেকে চাল আনবার কথা। কেউ আনতে পারে, কেউ বা পারে না। যারা আনে তাদের খুব কষ্ট করে আনতে হয়। মনে হল, চালের ব্যবস্থাও বিদ্যালয় থেকেই করতে পারলে ভাল হয়। হাল গরু আছে। কিন্তু খান চাষের উপযুক্ত জমি নেই। কিছু খান জমি ভাগে বন্দোবস্ত করে নিয়ে খান চাষ আরম্ভ করা হল। শুধু ভাল তরকারী হলেইত চলে না। কিছু আমিষ খাওয়া চাই। সুতরাং মাছ চাষ এবং হাঁস মুরগী চাষের ব্যবস্থা করতে হল। পরে তেলের জন্তে তিল সরিয়া এবং মরিচ মশলার জন্য লঙ্কা হলুদ আদা চাষও আরম্ভ করা হল।

“এই অঞ্চলে অনেক অনুন্নত শ্রেণীর লোকের বাস। তাদের বেশীর ভাগই অত্যন্ত গরীব ছেলেদের খাওয়াতেও পারে না জামা কাপড়ও দিতে পারে না। তাদের ছেলেরা যখন স্কুলে আসতে আরম্ভ করল, তখন খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জামা কাপড়ের সমস্যা এসে উপস্থিত হল। বিদ্যালয়ে পুতা কাটা এবং কাপড় বোনার কাজ ছিল। চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই কাজও করানো হত। দেখা গেল গরীব ছেলেদের জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হলে এটাকে অবসর সময়ের কাজ করে রাখলে চলবে।

না। আরও বেশী করে এই কাজ করাতে হবে। এবং শুধু কাপড় বুনে ছেড়ে দিলেই চলবে না। জামা প্যান্টও করতে হবে। সুতরাং সেলাই-এর কাজেরও ব্যবস্থা করতে হল।

“বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে শ্রেণীকে একক হিসাবে গ্রহণ করে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি শ্রেণী পৃথক ভাবে কাজ করত। শিক্ষার দিক থেকে সেটাকেই ভাল বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, উৎপাদনের দিক থেকে তাতে সুবিধা হচ্ছে না। ষষ্ঠ শ্রেণী নতুন কাজ শিখছে। স্বাধীনভাবে অনেক কিছুই তারা করতে পারে না। কাঁচা হাতের কাজ ভাল হয় না। মনে হল, বড়দের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে দিলে কাজের সুবিধা হয়। বড়দের তত্ত্বাবধানে বড়দের কাছে কাজ করলে কাজ বেশী হয়। কাজ ভালও হয়। শ্রেণীর পরিবর্তে দলকে একক করে দল হিসাবে কাজের ব্যবস্থা করা হল।

“এইভাবে কাজের ক্ষেত্রে ক্রমাগত পরিবর্তন করা হচ্ছে। কোন একটা বাঁধা-ধরা ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে সেটাকেই বৎসরের পর বৎসর চালিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়নি। ছেলেদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে, বিদ্যালয়-সমাজের কথা চিন্তা করে যখন যা করলে ভাল হয় তাই করা হয়েছে। আজ যে ব্যবস্থা চলেছে আবশ্যিক হলে সেটাকেও পরিবর্তন করতে হবে। কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তনের কথা ইতিমধ্যেই ভাবা হচ্ছে।”

[পরিশিষ্ট ৩৯ অষ্টব্য]

মুদালিয়র মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিল্প শিক্ষা প্রবর্তন

(১৯৫২-১৯৬৫)

১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশন সমগ্র ভারতের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। স্বাধীন ভারতের এই নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্প ও হাতের কাজকে একটা আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে (Core-Subject) গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকে সাধারণতঃ আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ১৯৫২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত কতখানি প্রসার লাভ করেছে তা সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

(Ref: Craft Education in Indian School System : National Council of Educational Research and training)

৪৪। পশ্চিমবঙ্গে যে সব শিল্প শিক্কিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে বা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিল্প শিক্কিক শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :—

১। সরোজ নলিনী ট্রেনিং স্কুল

২। ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল

৩। কলাভবন, বিশ্বভারতী

৪। গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ ফর আর্ট এ্যাণ্ড ক্রাফট

৫। লেডি ব্রেকিং কলেজ, কলকাতা

৬। শিবপুর বি. ই. কলেজ

৭। শ্রীনিকেতন-কটেক ইণ্ডাস্ট্রি ট্রেনিং সেন্টার। (শিল্প সদন শিক্ষা শাখা)

৮। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ফুলিয়া, কল্যাণী ও শ্রীরামপুর

৯। তাহাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র দাসনগরে আছে। বিশ্বভারতীর মাধ্যমিক-শিক্কিক শিক্ষণ কেন্দ্র বিনয় ভবনে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ১৯৫২ থেকেই আছে।

১০। ১৯৫৫ সালে-মুদ্রালয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে মীতিগতভাবে শিল্প শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে, দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে শিল্প শিক্ষার এই অগ্রগতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একথাও সত্য যে শিক্ষার অঙ্গরূপে-শিল্প শিক্ষার বিশেষ কোন মান (standard) আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠেনি, এর কারণ অনেক ; ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

১। “আমাদের মতে গুরুত্বই ভ্রম সমাজের লক্ষণ, হাত পা গুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভ্রমতা পাকা হয়.....যাহার হাত ছোটো কর্মিষ্ঠ নয় হাতের দিকে সে মুট, তা হোক না সে নবাবজাদা বা পণ্ডিত বংশের কুলতিলক।” বস্তুতঃ দেশের প্রাক-স্বাধীনতার আমলে অর্ধ শতাব্দী বা তারও আগে রবীন্দ্রনাথ যে সকল-অন্তরায়ের কথা বলেছিলেন তা আজও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এর কারণ আমাদের স্বভাব ও শিক্ষা-মৈত্রিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে অনেক আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গুটিকতক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে—যেমন কলানবগ্রাম উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়—শিক্ষানৈতিক শিল্পের পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ নিষ্ঠার সঙ্গে চলেছে সত্য কিন্তু মামুলী সরকারি পরিচালিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার অবস্থা কি রূপ, অল্প বিস্তর তা সকলেরই সুবিদিত; সেইজন্য আলোচনাও নিস্প্রয়োজন। আসল কথা জাতির জনক মহাত্মাগান্ধী যে উদ্দেশ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেছিলেন তা আজও দেশে সফল হয়ে ওঠেনি।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প সাধারণতঃ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শেখান হয়। মুদাণিয়র কমিশন একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিল্প শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাত্র কয়েকটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীতে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিল্প শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প প্রবর্তনের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে তার মর্ম হল :—

শিল্প :—পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়েই শিল্প একটি আবশ্যিক বিষয়। কেবল মাত্র একটি বিদ্যালয় শিল্পকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্বীকার করেছে এবং অপর একটি বিদ্যালয় শিল্পকে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক উভয় রূপেই গ্রহণ করেছে। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিল্প শেখান হয়। কতকগুলি বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র নবম শ্রেণীতে শিল্প শেখান হয় এবং কতকগুলি বিদ্যালয়ে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীতে শেখান হয়।

এই পাঁচটি উদ্দেশ্যই সমভাবে গ্রহণযোগ্য। যেমন—শিল্প শিক্ষা লাভ করলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ সুগ্রহস্ত হয়। এর দ্বারা হস্ত-চালন কৌশল অর্জনে সমর্থ হয়। প্রমুখক যথার্থ মর্মানাদি দেওয়ার শিক্ষা হয়। ছাত্রদের রুচি ও আগ্রহকে এর দ্বারা অনুসন্ধান করে বার করে ভবিষ্যতের জন্ত তাদের ভাল গৃহস্থামী করে পড়ে তোলা সম্ভব হয়। এইগুলি চল্লিশটি বিদ্যালয় দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যে উদ্দেশ্যটি সবচেয়ে কম সমর্থন পেয়েছে সেটি হচ্ছে অন্বেষণ এবং পরীক্ষণ বিষয় সুবোপ সুবিধা। মাত্র ষোলটি বিদ্যালয়ের দ্বারা এই লক্ষ্যটি সমর্থিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলি এই দেখাতে চান যে এই সমস্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে কার্যকরী হচ্ছে।

যে সমস্ত শিল্প শেখান হয় :

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষতঃ কাঠের কাজই শিল্প হিসাবে শেখান হয়। মাটির কাজ ও ছুঁচের কাজের পরই এর স্থান। শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ববর্তী তেত্রিশ নম্বর টেবলে দেখা যেতে পারে।

সেই টেবল থেকেই জানা যায় যে সূতা কাটা ও বয়ন শিল্প কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে এবং বহুমুখা বিদ্যালয়গুলিতে শেখান হয়। বয়ন শিল্প কোন বালিকা বিদ্যালয়ে নেই। দারুশিল্প, ধাতব শিল্প, বাগান ইত্যাদিও কোন বালিকা বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না। এইগুলিতে পুতুল তৈরী গৃহশিল্প, সূচাশিল্প এবং মুদ্রাশিল্প শেখান হয়, যা ছেলেদের বিদ্যালয়ে শেখানো হয় না।

সমস্ত বিদ্যালয়েই সমস্ত ছাত্রদের এক সময় বা এক সঙ্গে একটি শিল্পই শেখান হয়, কেবল মাত্র তিনটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে দুটি শিল্প শেখান হয়।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্রদের শিল্প বিষয়ক বিভিন্ন রুটিকেই এই ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থার জন্ত দায়ী করেন। কেবলমাত্র স্বল্প সংখ্যক (১৭) বিদ্যালয়েই ছাত্রদের রুটিকে (শিল্প) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভিত্তি বলে স্বীকার করে নেয়। খুব কম স্কুলই অস্বাভাবিক কারণের উল্লেখ করেছেন; যেমন মাতা-পিতার পছন্দ (৪) শিক্ষকের পছন্দ (১০) এবং বংশ পরম্পরায় হাতের কাজ পারিবারিক শিল্প হিসাবে স্বীকৃত (১০)।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এই বলে অভিযোগ করে যে মাধ্যমিক অবস্থায় শিল্প প্রবর্তন কখনই সম্ভব নয়। মাত্র সাতটি বিদ্যালয় এর সম্ভাবনার উল্লেখ করেছে। সেই বিদ্যালয়গুলি আবার পর্যায়ের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী—৭. ৮. ৯. এবং ১০ম শ্রেণীর উল্লেখ করেছে।

শিল্প শিক্ষার জন্ত সপ্তাহে একটি ক্লাসে যে সময় দেওয়া হয় তার বন্টন বিভিন্ন ধরনের দেখা যায়। যেমন চল্লিশ মিনিট থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টা। সাধারণভাবে বলা যায় যে দেড় ঘণ্টা সময় প্রতি সপ্তাহে এই জন্ত বরাদ্দ হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ শিল্প শিক্ষার পিরিয়ড '৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের থাকে। কয়েকটি বিদ্যালয়ে ষাট, সত্তর অথবা আশি মিনিটের পিরিয়ড আছে। অধিকার বেশী বিদ্যালয়েই অনুভব করে যে পিরিয়ডের সময় বিস্তারের বিষয়টি শিল্প শিক্ষানুযায়ী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তনীয়।

একটি বৃহৎ সংখ্যা (প্রায় ৪৪টি) বিদ্যালয় এই মত পোষণ করে যে শিল্প শিক্ষার পাঠ্য তালিকা যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহোদ্দীপক এবং বিদ্যালয় জীবনের পরও ছাত্রদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পথ খোলা থাকে।

অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক বিদ্যালয় (মাত্র ১৬টি) যে কোন ধরনের ব্যবস্থা করে থাকে যাতে শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ উৎপন্ন হতে পারে।

দৈনিক সুযোগ সুবিধা: ব্যবস্থা: যে সমস্ত ঘরে শিল্পের ক্লাস হয় সেই সমস্ত ঘরের আকার সম্বন্ধে কোন নির্ধারিত, সুস্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায় না। কতকগুলি বিদ্যালয় অস্বাভাবিক ক্লাসের ঘরের আকারকেই তালিকাভুক্ত করেছে। যাই হোক ঘরের আকার ছ'শ বর্গফুট থেকে বাইশ শ বর্গফুট পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে বিস্তৃত রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই (৪০) অনুভব করে যে ঘরগুলির নির্দিষ্ট আকার থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অধিকার বেশী বিদ্যালয়েই ছাত্রদের দ্বারা উৎপন্ন হাতের কাজের জিনিস রাখবার পর্যাপ্ত স্থান রয়েছে।

যন্ত্রপাতি :—

বহু সংখ্যক বিদ্যালয় বিভিন্ন প্রকারের (৩০) কাঁচা মালের ব্যবস্থায় সজ্জা রয়েছে, সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতি (৩৮), কাজ করবার বেঞ্চ ও টেবল (৩৩) ইত্যাদি ব্যবস্থায় সজ্জা। মাত্র তেইশটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণের ফ্রেমের এবং উনিশটি বিদ্যালয়ে সো-কেসের আমদানী করতে হয়েছে। তেতাল্লিশটি বিদ্যালয় স্বীকার করেছে, যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায় তার যথার্থ ব্যবহার করা হয়।

অনেকগুলি বিদ্যালয় (প্রায় ৪৪টি) স্বীকার করেছে যে ছাত্ররা যথা সময় কাঁচা মাল পায়। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্ররা যৌথভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে। বত্রিশটি বিদ্যালয় এই স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে তারা ছাত্রদের একা কাজ করবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতির দ্বারা সাহায্য করে। সাধারণতঃ একজন ছাত্রকে আরো চার পাঁচ জন ছাত্রের সঙ্গে যন্ত্রপাতির অংশভাগ করে নিয়েই কাজ করতে হয়।

মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয়েই বিদ্যালয়ের সময়ের পরও তাদের ওয়ার্কসপ খোলা রাখা। অর্ধেকের বেশী বিদ্যালয়েই স্বীকার করেছে যে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর ফাইল আছে। এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমই আছে যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ছাত্রদের সংগ্রহ সামগ্রীর পরিমাণ কম। মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিল্প সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকা পাওয়া যায়।

বিত্যাস :—ছাত্রদের তৈরী জিনিস তাদের কিরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রচলিত প্রথা। সতেরটি বিদ্যালয় এই ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছে। মাত্র পঁয়ত্রিশটি বিদ্যালয় এই সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান দেয় এবং দেখা যায় যে এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছাত্রদের জিনিস কিরিয়ে দেয়। আটটি বিদ্যালয় স্বীকার করেছে যে তারা এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে দেয়। অপর আটটি বিদ্যালয় এই সমস্ত জিনিস বিদ্যালয়েই রেখে দেয়। দুইটি বিদ্যালয় রিপোর্ট দেয় যে এই সমস্ত জিনিস বিদ্যালয়েই ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষক মণ্ডলী :—সর্বশেষে বলা যায় অস্কাহ রাঙ্কের মত পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি শিল্পের জন্য একজন শিক্ষকই নিযুক্ত হন। আবার এমনও কতকগুলি বিদ্যালয় আছে যেখানে শিল্পের জন্য কোন শিক্ষকই নেই। পঞ্চাশের কোথাও কোথাও দুই বা তিনজন শিক্ষকও আছে। এমন একটি বিদ্যালয়ের নীর পাওয়া যায় যেখানে একটি শিল্পের জন্য চারজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ের মতে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প শিক্ষক আছেন। চুয়াল্লিশটি বিদ্যালয়ের রিপোর্টে এই সমস্ত শিক্ষকেরা কোন প্রাতিষ্ঠান থেকে শিল্প বিষয়ক শিক্ষণ লাভ করেছে।

পঁয়ত্রিশটি বিদ্যালয়ের বিরূতি থেকে জানা যায় যে তাঁদের অশিক্ষিত শিল্পশিক্ষক পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। আটত্রিশটি বিদ্যালয়ের বিরূতি থেকে জানা যায় যে যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক লাভ করতে তাদের যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছে। এখন মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয়ে অশিক্ষিত এবং যথার্থ শিক্ষিত নন এমন কারিগরদের শিল্প শিক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট ৪০ ত্রুট্য]

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক - ৪০০ শত বিভাগে সম-সংখ্যক ওধ্যায়-
সন্ধান-পত্র (Questionnaire) পাঠান হয়েছিল। যে সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ
উত্তর পাওয়া গেছে তাদের সংখ্যা এইরূপ—

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে শিল্পশিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি

সাঙ্কেতিক চিহ্ন :

উ. মা. বা. বি = উচ্চমাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগ ; উ. মা. বি = উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ

উ. মা. ছে. বি = উচ্চমাধ্যমিক ছেলেরদের বিভাগ ; উ. মা. ব. যু. বি = উচ্চমাধ্যমিক বহুযুগী বিভাগ ;

কো. এ. উ. বি = কো. এডুকেশনাল উচ্চ বিভাগ ; উ. মা. বি. ৪ (শাখা) = উচ্চমাধ্যমিক বিভাগ, ৪ শাখা যুক্ত :

শিল্পের নাম	উ. মা. বা. বি	উ. মা. বি.	উ. মা. ছে. বি.	উ. মা. ব. যু. বি	উ. মা. বি. ৪ (শাখা)	কো. এ	মোট সংখ্যা
সেলাই	১	২		২		১	= ৬
চামড়ার কাজ	১		৩				= ৪
খাতব শিল্প			১				= ১
বয়ন শিল্প		৩	২				= ৫
মাটির শিল্প		৩					= ৩
ছাঁট-কাট			১				= ১
রাগান		৩	১				= ৪
কাঠের কাজ			৩০	৩	১	২	= ৩৬
মোট সংখ্যা	২	১১	৪৭	৫	১	৩	= ৬০

(ক্রমঃ)

নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

পুলকেশ দে সরকার

অমৃতবাজার পত্রিকা ৭ই সেপ্টেম্বর আবারও “পাইওনিয়ার” বনাম (বোম্বাইর) টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রসঙ্গে লিখলেন :

এপ্রভার নরেন গোসাঁইর হত্যা সম্পর্কে পাইওনিয়ারের মন্তব্যের উল্লেখ অর্থ ভীমকলের চাকে খোঁচা দেওয়া। বস্তুতঃ, কলকাতার চারটির মধ্যে তিনটি গ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র অত্যন্ত অসৌজন্যের সঙ্গে স্পষ্টভাষী এলাহাবাদের সাংবাদিককে কামড়ে চলেছে। “স্টেটসম্যান” তাঁর মহান উদার নীতির ঐতিহ্য নিয়ে এই আক্রমণের নেতৃত্ব করছেন। তিনি বলছেন, “পাইওনিয়ার” যদি নেটিব (দেশী) হ'ত তো তার এই ভাবোচ্কাসের জ্ঞান কীসী হ'ত। অহো! গবর্ণমেন্টের কি গুণকীর্তন। পাইওনিয়ারের যুক্তির জবাবে কি প্রজ্ঞা-পারমিতা! ভাল কথা, স্টেটসম্যান আরম্ভ করেছেন ভারতের পরম বন্ধু রূপে, শেষ করছেন ভারতীয়দের প্রতি বিরোধে অজ্ঞান গ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রকে ছাড়িয়ে গিয়ে; ভারতীয়দের বন্ধু সেজে আমাদের বিরুদ্ধে অসংলগ্নতার অভিযোগ তুলেছেন। যে সব সমালোচকের পাইওনিয়ারের স্পষ্টোক্তিতে চিন্তা আহত হয়েছে তাঁরা এই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে,

পাইওনিয়ারের ঐ লেখা হত্যার প্ররোচনা। এরকম ইঙ্গিত, বলা বাহুল্য, চরম নিবুদ্ভিতার পরিচায়ক। পাইওনিয়ারের কোন্ শব্দগুলো সামান্যতম হত্যার প্ররোচনা দেয়? চোরঙ্গীর সহযোগী এই বলে আমাদের অসংলগ্নতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, আমরা একাধারে যুবক ছটির কাজ নিন্দা করেছি আবার পাইওনিয়ারের কথারও সমর্থন করেছি। বিস্তারিত খবর না পেয়ে ও বন্দীদের মানসিক অবস্থা না জেনে যদি একটা বিয়োগান্ত ঘটনায় ত্রাস প্রকাশ করা হয় এবং পরে কারও শাস্ত, স্থিরমনা ও সর্বাঙ্গিক বিবেচনা প্রসূত কোন উক্তিই সাং দিলে যদি অসংলগ্নতা হয় তবে আমাদের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ আনা যেতে পারে।

যাই হোক, অত তড়িঘড়ি করে অমৃতবাজারের এ বিষয়ে ঐ জাতীয় মন্তব্য তার ভাবমূর্তিকে নিঃসন্দেহে খাটো করেছে। নীরবতাও ছিল ভালো।

অন্ধ আইনের গতি পথে

এদিকে অন্ধ আইনের গতিপথে বিচারের আয়োজন চলল। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ, মিঃ সি পি বিক্রমফুট ১৪ই সেপ্টেম্বর

বিচারের দিন স্থির করলেন, জুরীদের তালিকা হ'তে লাগল।

ইতিমধ্যে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: এ ডবলিউ মার আই-সি-এস যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করলেন তাতে ইউরোপীয়ান কয়েদী লিটন বলল, আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একজন কয়েদী; যখন গুজব শুনলাম যে, হিগিনসকে গুলী করা হয়েছে আমি তখন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে। আমি অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম, একজন জেলার এবং অন্যতম টার্নস্টাইল জেলারকেও দেখলাম ছুটে যাচ্ছেন। আমি মিলের ভাঁত ও সূতাকাটা চালির মাঝখান দিয়ে যে পথ গেছে সেই পথ বরাবর দৌড়োলাম, ভাঁত চালির দক্ষিণ-পূব কোণ ঘুরতেই ডাক্তার বাবুকে দেখলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইকে আরও একজন কয়েদীর সাহায্যে নিয়ে আসছেন; আরও দু'জন নিয়ে আসছেন হিগিনসকে। এমন সময় জেলার ও অপার সবাই ঐ মোড়ে দেখা দিলেন। একজন ঢেঙ্গা মানুষ ডাক্তার বাবুর পেছনে ছুটে আসছিলেন; তিনি চোঁচয়ে বললেন, 'নরে যাও, নইলে, আমি সবাইকে মেরে ফেলব। ইতিমধ্যে ডাক্তার বাবু নরেনকে সরিয়ে নেবার জন্য ছুটতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর পায়ে পায়েই দু'জন মানুষ— একজন সেই ঢেঙ্গা মানুষটি। আমি তখন ঐ দু'জনের মধ্যে যিনি কিছু ছোট তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম; যেই ধরেছি অমনি তিনি নরেন্দ্রকে গুলী-বিদ্ধ করলেন। নরেন্দ্র ড়েনে পড়ে যার, তার

পরিচ্ছদে রক্ত। আমি রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলাম, নিয়ে কিছু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম; একজন ওয়ার্ডার ওটা তুলে নেয়। দু'জনের মধ্যে যিনি ঢেঙ্গা তিনি ইতিমধ্যে তাঁর রিভলভারটি জেলারের দিকে তাক করেছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর বাঁ হাতটা ধবে ফেললাম। তিনি রিভলভারের নলটা আমার কপালে ঠুকে দিলেন, কপাল কেটে গেল। আমি হঠাৎ নীচু হয়ে গিয়ে তাঁকে পেছন থেকে জাপটে ধরলাম। তাঁকে ফেলে দেবার আগেই তিনি নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করে আর একটা গুলী ছুঁড়লেন। আমি রিভলভারটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কয়েদী ওয়ার্ডার বাহারদ্দিনের হাতে দিলাম। অন্ত্যান্ত ওয়ার্ডার এসে পড়ায় আমরা তাকে পয়'দস্ত করলাম। আর একজনকে আগেই ধরা হয়েছিল। দু'জনকে সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে নিয়ে এলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট লিখলেন : আসামীদের হাজির করার আগেই সাক্ষী আমার কাছে এই বিবৃতি দিল। আমি তখন জেল অফিসে গেলাম; সেখানে বন্দী দু'জনকে হাজির করা হ'ল। সাক্ষী শপথ নেবার পর বাংলায় তার বিবৃতি পড়ে শোনানো হ'ল।

সাক্ষী আরও বলল, আমি যে বিবৃতি দিয়েছিলাম শপথ নেবার পর আমি তারই পুনরাবৃত্তি করলাম বাংলায়। যে ঢেঙ্গা মানুষটির কথা আমার বিবৃতিতে বলেছি তিনি এই (বল কানাইলাল দত্তকে দেখিয়ে দিল)। আর যে ষাট মানুষটিকে আমি ধরেছি বলে বলেছি তিনি এই (বলে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দেখিয়ে দিল)। এই ওয়ার্ডার (পাঁচকোড়ি চৌবে)

৯০ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাকী হলেন

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়েছিল।
ঐ রিভলভারটা আমি সত্যেন্দ্রনাথের হাত থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। এইটিই সেই
রিভলভার। আর ঐ রিভলভারটা হচ্ছে কানাই
লাল দত্তের।

একজন এসিস্ট্যান্ট জেলার আমার আগে
ছিলেন যখন আমি ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে
যাচ্ছিলাম। (এসিস্ট্যান্ট জেলার গোরওয়ার
নারায়ণকে দেখিয়ে) একেই আমি দেখেছি।
(দ্বিজেন্দ্র নাথ মুখার্জিকে দেখিয়ে) ইনি আর এক
এসিস্ট্যান্ট জেলার, আমার পর জেলার ও অল্প
এসিস্ট্যান্ট জেলারের সঙ্গে এসেছিলেন।

বন্দীদের জিজ্ঞাসা করা হ'লে তাঁরা বললেন,
তাঁরা কোন প্রশ্ন করতে চান না।

লিটন ৩১এ তারিখে লিপিবদ্ধ তার সাক্ষ্য পড়ে
১লা সেপ্টেম্বর বলল, আমি ভেবে দেখলাম আমি
কাল যে সাক্ষ্য দিয়েছি তাতে একটা ভুল করেছি।
সত্যেন্দ্রকে ধরবার পর তাঁর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার
সময় আমি আমার কানের কাছে একটা গুলীর শব্দ
শুনে তাকিয়ে দেখি গোসাঁই একটু যেন ঘুরে গেছে,
যেন ঘুরপাক খাচ্ছে; ঐ সময় সত্যেন্দ্র গুলী চালান।
আমি তখন সত্যেন্দ্রের হাত থেকে রিভলভারটা
কেড়ে নি।

জিজ্ঞাসা করা হ'লে জ'জন বন্দীই বললে, তাঁদের
ইচ্ছা, সাক্ষ্য ইংরেজিতে নেওয়া হোক, কেন না,
তাঁরা ইংরাজি বোঝেন।

মোরক্রফ্ট ভিনসেন্ট হিগিনস শপথ নিয়ে বলল:

এই মানুষটি (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) বার বার গোসাঁইকে
তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসতে বলেছেন। এ
হ'ল হাসপাতালে শনিবার ছুপুর বেলা বা একটার
সময়। গোসাঁই এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। আমি
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর গোসাঁই চলে
আসেন আমার সঙ্গে আমাদের কোয়ার্টারে। তখন
আমি জানতে পারলাম, এই মানুষটিও রাজসাকী
হতে চায়। আমি লিটনের সামনে গোসাঁইকে
পরামর্শ দিলাম, সাবধান! কেননা, আমি তাঁদের
বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আশঙ্কা করছিলাম
কোনরকম মতলব চলেছে। আজ সকালবেলা
সত্যেন্দ্রনাথ বসু গোসাঁইকে ডেকে পাঠালে আমি
গোসাঁইকে বললাম, দোহাই আপনার, যাবেন না,
আমার আশঙ্কা এতে কোন সহৃদয় নেই, আপনার
শুধু পশুশ্রম হবে। গোসাঁই অবশ্য বললেন, এই
মানুষটি যা কিছু জানেন তার সব কিছু লিখে একটা
বিবৃতি দেবেন। তিনি খুব খুশি হবেন যদি আমার
সঙ্গে গিয়ে তাঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে পারেন।
আমরা হাসপাতালে এলাম। গোসাঁই ও আমি
ডিসপেন্সারিতে গেলাম। গোসাঁইর অমুরোধে আমি
ডিসপেন্সারির দরজার কাছে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে
ডাকতে গেলাম। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল কানাই
লাল দত্তের। তাঁর থেকে একটু দূরে সত্যেন্দ্র।

মিথ্যা না মনোবিকার ?

কানাই ডিসপেন্সারিতে ঢুকলেন এবং কিছুক্ষণ
গোসাঁইর সঙ্গে যুহুভাবে আলাপ করলেন। তারপর

গোসাঁই ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় এল। আমি ডিসপেন্সারির দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ বিশ্বয় ও ভীতির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম গোসাঁই ছুটে এল এবং বলল, ভগবানের দোহাই, হিগিন্স, বাঁচাও। গোসাঁই আমার পেছনে পেছনে ছুটে লাগল। আমি তখন দেখলাম কানাই ছুটো রিভলভার আমার দিকে ধরেছেন এবং এই মাস্তুলটি (সত্যেন্দ্র) আর একটি রিভলভার ধরেছেন।

কানাই বললেন : ‘সরে যাও, নইলে তোমাকে গুলী করব’ এবং অশালীন ভাষা প্রয়োগ করলেন। আমি তাঁকে নিষ্ক্রিয় করতে চেষ্টা করলাম; দেখলাম আমার কজিতে তাঁর গুলী এসে লাগল। ইতিমধ্যে গোসাঁই সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নেমে গেছে। বন্দী হুজনে আমাকে লাথি মারায় আমি সিঁড়ি গড়িয়ে পড়ে গেলাম। গোসাঁই মোড় ঘুরে গেটের দিকে ছুটছিল। আমার সামনে কানাই গোসাঁইকে হ’বার গুলী করেছেন। তখন গোসাঁই ড্রেনে পড়ে যায় এবং বে-মাটিতে পড়ে ছিল সেই কানাইকে লিফটন ধরে কেলে ও নিরস্ত্র করে। গোসাঁই ইতিমধ্যে উঠে পড়ে বলে “বিদায়। আমি গেলাম।”

যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে এবং আমি আহত হয়েছি তখন আমি ডাঃ চ্যাটার্জিকে দেখলাম। কানাই ডাক্তারের দিকেও রিভলভার তুললেন। তিনি দ্বিতীয় রিভলভারটা কোথাও ছুঁড়ে কেলে দিলেন। কোথায় জানিনে।

কে একজন বন্দী ওটা তুলে নেয়। বোধ হয় নন্দী।

হিগিন্স সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জেরার উত্তরে বলে, নন্দী যখন রিভলভারটা তুলে নেন, তিনি আসামীর পেছনে ছিলেন। এটা ওপর তলায়ই হয়েছে। আমি তিনটি রিভলভার ঠিকই দেখেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট ফুটনোটে মন্তব্য রাখলেন : এই সাক্ষী যন্ত্রণা-কাতর ছিল এবং স্পষ্টতঃই আচমকা আঘাতের ক্রিয়া চলছিল তার শরীরে। সাক্ষ্য দেবার সময় তাকে বারকয়েক উত্তেজক ওষুধ দিতে হয়।

সিনিয়ার সিভিল হসপিটাল এসিস্ট্যান্ট ডাঃ বৈষ্ণনাথ চ্যাটার্জি বললেন, সকাল সাতটা নাগাদ আমি যখন হাসপাতালে ঢুকি আমি অপর সিভিল হসপিটাল এসিস্ট্যান্টকে দেখি কাজে রয়েছেন। খাটের কাছে দেখলাম কানাই ও গোসাঁই যত্নভাবে আলোচনা করছেন। আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং গোসাঁইর কানে কানে বললাম, “কি সাহসে একা আপনি হাসপাতালে এলেন? কেউ যদি দেখে ফেলে বিপদে পড়ব আমি।” তিনি বললেন, “আমি হিগিন্সের সঙ্গে একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে এসেছি।” আমি তাঁদের ছেড়ে ওয়ার্ডে চলে এলাম। রোগীদের দেখতে লাগলাম; এমন সময় একটা গোলমাল শুনলাম, কে বলল বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আমি ওয়ার্ড থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম, কি ঘটেছে দেখবো বলে। এবার গোলমাল শুনলাম ডিসপেন্সারিতে। দেখলাম গোসাঁই ও কানাই

ধন্যধন্য করছেন। আমি তাঁদের ছাড়িয়ে দেবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করলাম। কানাইলাল দত্তকে ডিসপেন্সারি থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি একটা গুলী ছুঁড়লেন। গুলীটা আমার পা ঘেঁষে চলে গেল এবং সে যখন আমার ভয় দেখালো যে, আমি যদি বাধা দিই তবে সে আমাকেও গুলী করবে, বলে সত্যিই রিভলভারটা ধরল আমার কপালের দিকে, আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম এবং ছুটে ছুটে অফিসে এলাম জেলারকে খবর দিতে। জেলারকে খবর দিয়ে আমি ফিরে আসছি, এমন সময় দেখি, গোসাঁই ও হিগিনস কয়েকজন হাসপাতাল পরিচালকের সাহায্যে অফিসের দিকেই ছুটে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটু দূরে তাকিয়ে দেখি এই দু'জন বন্দী তাঁদের পায়ে পায়ে ছুটে আসছেন। তখনই দেখলাম লিটন, ডেপুটি জেলার ও এসিস্ট্যান্ট জেলার ঘটনা স্থলের দিকে আসছেন। বন্দী দু'জনকে থামাবার জন্য আমি তাঁদের অমরোধ করলাম। তখন কানাইলাল দত্ত রিভলভার তুলে আমাদের সবাইকে শাসালেন। তিনি গুলী করতে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, দোহাই আপনার, গুলী করবেন না। কোন বাধা না মেনে বন্দী দু'জন গোসাঁইর পিছু ধাওয়া করলেন। পাট কলের তাঁত-চালির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেখলাম গোসাঁই খোলা ড্রেনটায় হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন। তাঁকে পাগুর ও মুয়ু' মনে হল। আমি জেলারকে বললাম, মনে হচ্ছে মারা

যাচ্ছেন এবং যদি সম্ভব হয় তবে তাঁর জবানবন্দী নেওয়া উচিত।

আমি ও জেলার তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম তাঁর আদৌ কথা বলবার মত অবস্থা নয়। তাঁকে ড্রেন থেকে তোলা হ'ল এবং হাসপাতালে আনা হল। আমি নানাভাবে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি আমার স্নুখেই দু'তিন মিনিটের মধ্যে মারা গেলেন। আমি মোড় ঘুরে যেমন দেখছিলাম গোসাঁইকে পড়ে থাকতে তেমনই দেখছিলাম তাঁর কাছেই লিটন ও কানাইলাল দত্তকে মাটিতে পড়ে থাকতে। লিটন কানাইলাল দত্তকে পেছন থেকে জাপটে ধরে কানাইয়ের হাতের রিভলভারটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল; অপর বন্দী, সত্যেন্দ্রকে দু'তিনজন ওয়ার্ডার ধরে রেখেছিল।

ডিসপেন্সারিতে গোসাঁই আর কানাই যখন ধন্যধন্য করছিলেন তখন লক্ষ্য করেছি, তাঁদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিতীয় বন্দী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁকে আমি গ্রাহ্য করিনি।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি যখন প্রথম গোলমাল শুনে ডিসপেন্সারিতে ঢুকি আমি তখন হিগিনসকেও ডিসপেন্সারির ভেতরে দেখি। হিগিনস একটা হাত দিয়ে আর একটা হাত ধরে আছে। এক হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। ডিসপেন্সারিতে ঢুকে কয়েদী পরিচারক শামুলাও দেখি। আরও দু'তিন জন ছিল; কিন্তু তাড়াহুড়ো ও হট্টগোলে তারা কে খেয়াল করতে পারি নি। ডিসপেন্সারিতে ঢোকবার আগেই একটা গুলীর শব্দ শুনি। একদল

আগে ছুটছে, আর একদল পিছু ছুটছে, হুঁদলই আমার পাশ কাটিয়ে গেল; তারপর আমি তাঁত চালির দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘোরবার আগেই আর একটা গুলীর আওয়াজ শুনি।

সত্যেন্দ্রকে কয়েক সপ্তাহ আগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কানাইকে গতকাল ভর্তি করা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের পর হাসপাতাল গেটে বন্দীদের কয়েদি প্রহরী (কনভিক্ট ওয়াচম্যান) দেহ তল্লাসী করে থাকে। তারা যখন হাসপাতালে চোকে তখন ওয়ার্ডে আর একবার কয়েদী ওয়ার্ডার (কনভিক্ট ওয়ার্ডার) তল্লাসী করে।

জেলায় যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ

প্রধান জেলার যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ বললেন, কিভাবে রিভলভার ছুটো জেলখানায় এল আমি বলতে পারবনা। বন্দীদের সঙ্গে আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎ হয় এইভাবে:—সাক্ষাৎ প্রার্থীরা থাকেন অফিসের ভেতরে এবং অফিসেরই সঙ্গে সংযুক্ত এক জাকরির কাছে বন্দীদের আনা হয়। বন্দীরা ঐ জাকরির বাইরে জেলের ভেতরে থাকেন। গতকাল বিকেলে সত্যেন্দ্র নাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ, মহেন্দ্র নাথ বসু ও মহেশ চন্দ্র বসু। সাক্ষাতের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সাক্ষাৎ আধ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়েছিল। সত্যেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল অফিসে বিকেল বেলা। সত্যেন্দ্র, অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র—সকলকেই আমার অফিসের মধ্যে আনা হয় এবং সরোজিনী ও তাঁর

হুজুন সঙ্গীরা সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আমার ঘরে আমার সামনেই। তাঁদের পেছনে একজন ওয়ার্ডার (জেল প্রহরী) দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদের দিকে নজর রেখেছিলাম। ছুটো একটা কাগজেও অবশ্য সই করেছি, তা ছাড়া বিশেষ কোন কাজ করছিলাম না। ছ'জনই চেয়ারে বসে ছিলেন। আমার সামনে তাঁদের কোন দেহতল্লাসী হয়নি। যে জেল প্রহরী বা ওয়ার্ডার তাঁদের ওয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এই তল্লাসীর কাজ তারই।

কানাইয়ের দৃষ্ট কণ্ঠ

সাক্ষীদের সাক্ষাৎ নেওয়া হলে এবং তা বন্দীদের সামনেই লিপিবদ্ধ হ'লে আদালত (ম্যাজিস্ট্রেট) কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য জানতে চাইলেন। মিঃ মার কানাই লালকে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দেওয়া হল আপনি তা ব্যাখ্যার জন্ত কিছু বলতে চান?

কানাই লাল দত্ত বললেন: হ্যাঁ। রিভলভার ছুটোই ছিল। কে একজন সাক্ষী যে বলেছেন তিনি, তা নয়। ইন্দ্রনাথ নন্দী সম্পর্কে বিবৃতিটি মিথ্যা। গোসাঁইয়ের প্রাণ নেবার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। আমি আর সত্যেন্দ্রই কেবল এই চেষ্টার জন্ত দায়ী।

আদালত: তবে কি আমি ধরে নেব যে, আপনি স্বীকার করছেন যে, আপনি গোসাঁইকে মেরেছেন? ইচ্ছা না করলে একধার আপনি জবাব নাও দিতে পারেন।

কানাই : আমি বলতে চাই আমিই তাকে হত্যা করেছি। তাকে কেন মেরেছি তার কোন যুক্তি আমি দিতে চাইমে। না, আমি কারণটা বলতে চাই : তার কারণ সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুকেও জিজ্ঞাসা করা হ'ল তাঁর কোন বক্তব্য আছে কিনা। তিনি উত্তরে বললেন, তিনি দায়রা আদালতে বিচারের আগে আপাততঃ কিছু বলবেন না।

আদালত এর-পর দু'জনকেই আনুষ্ঠানিকভাবে দায়রা সোপর্দ করলেন।

ইতিমধ্যে কানাইয়ের রিভলভারটার নাকি ইতিহাস পাওয়া গেল। ওট ওয়েবলি রিভলভার। ওটা ছিল হুগলীর এক বাঙালী ভদ্রলোকের; তিনি ওটা কিনেছিলেন চৌরঙ্গীর বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে ১৯০০ খ্রষ্টাব্দে। কানাই লাল দত্ত নিজেই হুগলীর (চন্দননগরের) মানুষ। আর একটা রিভলভারের নম্বর ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে।

এবার দায়রা বিচারের পালা

দুই বন্দীর এবার দায়রা বিচারের আয়োজন হ'ল। বিমর্ষ সরকারের বড্ড ভাড়া। আলিপুরের পাব্লিক প্রসিকিউটার বাবু আশুতোষ বিশ্বাস আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ আর রো' (F. R. Roe)-র সামনে হাজির হয়ে প্রথমবার নরেন গোসাঁইর হত্যারক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল

দত্তের মামলার শুনানী স্বরাধিত করবার প্রার্থনা জানান। মামলাটি আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ সি পি বীচক্রফটের আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে অল্প একটি মামলায় নিযুক্ত থাকায় শিগগির গোসাঁই হত্যার মামলাটি নিতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় পাব্লিক প্রসিকিউটার মিঃ রোকে আগামী সোমবার মামলাটি নেবার জন্ত অনুরোধ জানানলেন। জজ রাজী, তবে তার আগে বন্দীদের সোপর্দপত্র ও অস্ত্রাদলিলের নকল দেওয়া চাই—আগামী কাল শুক্রবার দুপুর বারোটার আগে। ঐ সময়ের মধ্যেই কাগজ পত্র দেওয়া হবে বলে আশুবাবু প্রতিশ্রুতি দিলে জজ যথাযোগ্য আদেশ জারি করলেন।

একটু পরেই সত্যেন্দ্রের তরফে একজন উকিল জানানলেন যে, তাঁর মক্কেলের পক্ষে সোমবারের মধ্যে প্রস্তুত হওয়া খুবই শক্ত। জজ বললেন, প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র শুক্রবার ১২ টার মধ্যেই দেওয়া হবে। দরকার হলে এই আবেদনের ওপর আদেশ জারি করা হবে।

ইতিমধ্যে আলিপুর জেলের নিয়ম কানূনের কিছু কড়াকড়ি করা হ'ল। কর্ণেল বুকানন শুক্রবার সকালে তাঁর বিভাগীয় তদন্ত শুরু করলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কি অবস্থায় গত সোমবার গোসাঁইর হত্যা ঘটল সেই বিষয়ে তদন্ত। দু'জন কয়েদীগ্রহরী, হিগিনস ও লিটলও আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের যান্মুলেলে করে সেন্ট্রাল জেল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য

জানা যায়নি। গতকাল সকালে সেন্ট্রাল জেলের বাইরে-বোমা-সংশ্লিষ্ট বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত একটি নোটিশ স্টেটে দেওয়া হয়।

(১) বোমা সংশ্লিষ্ট বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেবল সে ক্ষেত্রেই করা হবে যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট আনবেন যে, সাক্ষাৎ-মঞ্জুরীতে আপত্তি নেই। জেল অফিসারের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাসী না করে এমন আবেদনকারীকেও সাক্ষাতে অনুমতি দেওয়া হবে না।

(২) এক সঙ্গে চারজনের বেশি সাক্ষাৎপ্রার্থী ও একসঙ্গে চারজনের বেশি বন্দীকে দেখা করতে দেওয়া হবে না এবং এ সাক্ষাৎও হবে রোববারে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশটার মধ্যে।

(৩) উকিলদের সঙ্গে সাক্ষাৎও ঐভাবে হবে।

(৪) মেয়েদেরও একই ভাবে ও একই নীতিতে সাক্ষাৎ মঞ্জুর করা হবে।

(৫) আইন-সংক্রান্ত আলাপ ছাড়া সাধারণতঃ সাক্ষাতের কাল হবে পাঁচ মিনিট।

এদিকে দুই বন্দীর অবস্থা কি? শুক্রবার সকালে দু'জনের স্বর ছেড়ে যায়; সত্যেশ্বর অবশিষ্ট আবার সামান্য স্বর হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উকিল বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু জেলে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার পর আলিপুরের জেলা দায়রা জজ মিঃ এক রো'র কাছে শুক্রবার অপরাহ্নে বিচারের তারিখ সোমবার থেকে ১৪ই তারিখে পরিবর্তন করবার একটা আবেদন পেশ করেন; তাতে বন্দীর আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতিতে আরও সময় পাওয়া যাবে। বাবু আশুতোষ বিশ্বাস এর বিরোধিতা করেন। জজ যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে বলে এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। জজ আরও বলেন যে, মামলাটা যত শিগগির সম্ভব নিতে হবে; তিনি তাই জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার বেশ খানিকটা সময় ধরে বন্দীকে উকিলের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেন।

(ক্রমশঃ)

চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সমাজ বিপ্লবের তাৎপর্য

রাখাল দত্ত

কিছুটা অপরিমিত ভাবেই চীনের গ্রামাঞ্চলে “কম্যুন” ধরনের সংগঠন প্রথম দেখা দেয়। বাস্তবিক ১৯৫৮ সালের আগে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির কোনও প্রস্তাবে বা দলিলে কৃষি-বিপ্লবের লক্ষ্য হিসাবে “কম্যুন” শব্দটির উল্লেখ নেই। এমন কি একথাও বলা যায় যে ১৯৫৮ সালের জুন মাসের আগে গ্রাম-চীনে এরকম সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা হয়তো মাও-তসে-তুঙও করেন নি। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯৫৮ সালের মে ও জুন মাসে কৃষির ব্যাপারে যে সব নির্দেশ পাঠিয়েছিল সেগুলিতে কেবল যৌথ খামারগুলিকে আরও মজবুত করে তোলার কথাই বলা হয়েছিল। এখানে মনে রাখা ভাল ১৯৫৮ সাল নাগাদ চীনের কৃষি-পরিবারগুলির প্রায় ৯৯ শতাংশই এসব যৌথ খামারের আওতায় চলে এসেছিল।

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে হোনান প্রদেশের ২৭টি যৌথ খামার এক জোট হয়ে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলে এবং তার নাম দেয় ওয়াইশিং (স্পুটনিক) জনগণের কম্যুন। জুন মাসে হোপেই ও হোনান প্রদেশে আরও ছুটি কম্যুন স্থাপিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৮-৪

জুলাই মাসে হুনান, ছপে ও ফুচিয়েন প্রদেশের বেশ কয়েকটি যৌথ খামার কম্যুন প্রতিষ্ঠা না করেও এক সঙ্গে রান্না ও খাওয়ার জন্য বারোয়ারী ব্যবস্থা চালু করে। চীনের খবরের কাগজগুলি এসব নতুন বন্দোবস্তের প্রশংসা শুরু করে দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এগুলির কথা চারদিকে প্রচারিত হয়ে পড়ে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে এসব নতুন প্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠায় এবং অল্প কোন-কম্যুনিষ্ট দেশের অভিজ্ঞতায় অনুরূপ কিছু না থাকায়, চীনের নেতারা কম্যুন সম্পর্কে মন স্থির করতে ইতস্তস্ত করছিলেন। যাই হোক পার্টির পলিটবুরো ১৯৫৮ সালে ১৭ই আগস্ট থেকে ৩০শে আগস্ট ধরে অস্বাভাবিক বিষয়ের সঙ্গে কম্যুন নিয়েও আলোচনা করে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এসব কম্যুন “ঘটনাপ্রবাহের যুক্তিসম্মত পরিণতি” এবং এগুলি “পঞ্চাশ কোটি কৃষকের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার” উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য পলিটবুরো কম্যুন গড়ে তোলার ব্যাপারে তাড়াছড়ো না করারও পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, রাতারাতি উৎপাদন বর্ডনের নিয়ম বদলানো ও ব্যক্তিগত

মালিকানাধীন ছোট ছোট জমি চাষীদের কাছ থেকে নিয়ে নেবার বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি জারি করা হয়।

এসব সতর্কবাণীতে কিন্তু বিশেষ কাজ হয় নি। স্থানীয় কৃষকপক্ষ এগুলিতে বিশেষ কর্ণপাত না করে মালিকানা ও বর্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসে ও ব্যক্তিগত জমি চাষীদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চাষীদের ৯০.৪ শতাংশ কম্যুনের ভেতর চলে আসে এবং ডিসেম্বর নাগাদ সমস্ত গ্রামাঞ্চলে কম্যুন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে ১৯৫৮ সালে চীনের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা শুরু হবার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা সূচনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বর্জিত হয় ও সে জায়গায় “সামনের দিকে বিরাট লাফের” কার্যক্রম গৃহীত হয়। কৃষির দিক দিয়ে দেখলে তাই বলা চলে যে কম্যুনের মাধ্যমেই “সামনের দিকে বিরাট লাফের” কার্যক্রম রূপায়িত করার কথা ভাবা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল শিল্পায়ন স্বায়িত্ব করতে চীনের কৃষি-ব্যবস্থা আরও বেশি পরিমাণে কাঁচা মাল সরবরাহ করবে এবং কৃষিজাত পণ্য আরও বেশি পরিমাণে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা হবে। ১৯৫৮ সালের ফসল খুব ভাল হয়েছিল। কম্যুনগুলি প্রতিষ্ঠা করে নতুন আয়বর্টন নীতির প্রচলন করা হয় এবং ফলে রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ বেড়ে যায়। যৌথ খামারের সদস্যরা উৎপাদনের প্রায় ৮০/৮৫ শতাংশ পেত। কিন্তু কম্যুন ধরণের সংগঠনে তাদের ভাগ স্বাভাবিক ফসলের বছরে কমে আসে ৬৫ শতাংশে। ফসল

ভাল হলে তারা আরও কম অংশ পাবার অধিকারী হয়।

“সামনের দিকে বিরাট লাফের” পরিণতি ও কৃষির উপর এই নতুন কার্যক্রমের প্রভাব পর্যালোচনার আগে ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কম্যুনগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। একথা মনে রাখা ভাল চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে অল্প দিনের মধ্যে গজিয়ে ওঠা এসব কম্যুনের মধ্যে পার্থক্যও ছিল বেশ। কিন্তু কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সব কম্যুনেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

বেশ কিছু যৌথ খামার নিয়ে গঠিত এক একটি কম্যুনে গড়ে ৫,০০০ কৃষক পরিবারকে আনা হয়েছিল। গোড়ার দিকে কেবল উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও অল্প দিনের মধ্যে এসব কম্যুন স্থানীয় কৃষকদের হাত থেকে সামাজিক, শিক্ষা-সংক্রান্ত এবং সামরিক দায়িত্বও নিয়ে নেয়। কম্যুনগুলি গ্রামাঞ্চলের মোল আর্থনৌতিক, সামাজিক ও রাজনৌতিক এককে পরিণত হয়। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম ছাড়াও কম্যুনগুলি ব্যাঙ্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, দোকানপাট এবং সামরিক বাহিনীরও ভার নেয়। কম্যুনের প্রতিটি সদস্যকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত করা হয়। সর্বত্রই সদস্যদের খাওয়াদাওয়ার জন্য একত্র ব্যবস্থা করা হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সদস্যদের থাকার জায়গাও কৃষক নির্দিষ্ট করে দিয়।

মালিকানার দিক দিয়ে দেখলে কম্যুনই ছিল

সব সম্পত্তির মালিক। সম্পত্তির মধ্যে বাসস্থান, ঘরবাড়ি এবং দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহারযোগ্য কিছু ভোগ্যপণ্যও ছিল। কৃষকদের ব্যক্তিগত জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, কমুন কর্তৃপক্ষের অধীনে উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করা ছাড়া সদস্যদের ব্যক্তিগত উপার্জনের আর কোনও পথই খোলা ছিল না।

আয়বন্টন ব্যবস্থাও প্রচণ্ডভাবে বদলানো হয়েছিল। প্রত্যেক সদস্যকেই বিনা মূল্যে সাধারণ আহারগৃহে (লন্ডরখানা?) খাদ্য সরবরাহ করা হত এবং ঐ জায়গায় আহার বাধ্যতামূলকও করা হয়েছিল। এছাড়া সদস্যদের আরও কিছু কিছু জিনিষ সরবরাহের দায়িত্ব কমুনগুলিকে নিতে হয়েছিল। বিনা মূল্যে আহাৰ ও অশ্রান্ত ভোগ্যপণ্য সরবরাহের এই ব্যবস্থা কমুনিষ্ট আদর্শের “প্রত্যেকের প্রয়োজনানুসারে” বন্টনের নীতি প্রচলিত করেছিল বলে মনে করা হয়েছিল। মোট উৎপাদন থেকে কর, ভবিষ্যতের জম্ম জন্ম ও কল্যাণমূলক কাজের জম্ম জন্ম টাকা বাদ দেবার পর বিনা মূল্যে সরবরাহ ব্যবস্থার মোট খরচ হিসাবে একটা মোটা অঙ্ক বাদ দেওয়া হত। অবশিষ্ট যা থাকত তা সদস্যদের কাজের মাত্রানুসারে “মজুরি” হিসাবে দেওয়া হত। মনে রাখা ভাল চীনের গড় কৃষি আয় এসময় এতই কম ছিল যে তথাকথিত বিনা মূল্যের সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রেখে জীবনধারণের জম্ম অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটানোর পর প্রায় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। আবার, কমুন

কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জম্ম একটা মোটা অঙ্ক জমা রাখার প্রবণতাও দেখা গিয়েছিল। সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছিল তা হচ্ছে এই যে “মজুরি” হিসাবে মোট আয়ের যে অংশ কৃষকদের ভাগে জুটত তা ছিল যৎসামান্য।

কমুন ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় আরও বেশি পরিমাণে “শ্রম” সংগ্রহ এবং তা উৎপাদনে ব্যবহারের। এ ব্যাপারটার কিছু বিশদ আলোচনা অগ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকেই গ্রামাঞ্চলে কৃষি ছাড়া অশ্রান্ত কাজকর্ম দ্রুত কমে আসছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের শীতকালে দেশ জুড়ে চাষের জল সংরক্ষণের জম্ম বিভিন্ন প্রকল্পের এক বিরাট কর্মসূচী রচনা করা হয়। “সামনের দিকে বিরাট লাফ” আন্দোলন এবং “হুই পায়ের হাঁটার” আন্দোলনের ফলে গ্রামাঞ্চলের সংগঠনগুলিকে কৃষি ছাড়াও শিল্পোৎপাদনের জম্ম বহু দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হয়। এসবের অবশ্যস্বাবী পরিণতি হিসাবেই চীনের শ্রম-উদ্ভূত গ্রামাঞ্চলে এই প্রথম শ্রমের অভাব অনুভূত হতে থাকে। কমুনিষ্ট পার্টির স্থানীয় কর্তারা এই পরিস্থিতিতে উৎপাদন ও বিভিন্ন নির্মাণ কার্যের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করতে গিয়ে শ্রমিকদের অভাব টের পেয়ে অতিরিক্ত শ্রম সংগ্রহের প্রয়াসে সচেষ্ট হন।

সাধারণভাবে, দুটি উপায়ে অতিরিক্ত শ্রম সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছিল এবং “কমুন” সংগঠন এই দুয়েরই পরিণতি। প্রথমটি ছিল বেশ কয়েকটি যৌথ খামার বা কালেকটিভ ফার্ম একত্র করে কৃষি শ্রমিক-

দের বড় বড় বাহিনী গড়ে তোলা এবং এসব বাহিনীকে ক্ষেত্রীয় ভিত্তিতে নিয়ে আসা। অপর ব্যবস্থাটি ছিল বারোয়ারী আহারস্থের আয়োজন। এই ব্যবস্থায় আহারের সময় প্রত্যেক কৃষকের ক্ষেত্রেই এক করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের পক্ষে বেশি কাজ করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, রান্নাবান্নার কাজ থেকে মুক্তি দিলে মেয়েদেরও চাষের কাজে মাঠে নিয়ে আসা হয়েছিল।

কম্যুনগুলির প্রতিষ্ঠা এবং “সামনের দিকে বিরাট লাফের” নুতনায় শ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে “আদি মূলধন” সৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন সব দাবি করা হয়েছিল। এই “আদি মূলধন” যে পরিমাণে কৃষি-উৎপাদন বাড়তে সক্ষম হয়েছিল সে সম্বন্ধেও অতিরিক্ত প্রচার চালানো হয়েছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের শীত মরশুমে চাষের জল সংরক্ষণের ক্ষমতা নির্মাণ কার্যক্রমে (বাঁধ তৈরী বা খাল কাটার মত কাজে) ৯০০ কোটি শ্রম দিবস প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে প্রতি হেক্টর চাষের জমিতে ১৫,০০০ টন জৈব সার প্রয়োগ করার কথা এবং জমির ১০ ফিট নীচে পর্যন্ত গভীরতায় চাষ করার কথা বলা হয়েছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৫৭ সালের ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৫৮ সালে ৩৫ কোটি থেকে ৪০ কোটি টন হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছিল। চাষের নতুন পদ্ধতি এতই বৈপ্লবিক বলে মনে করা হয়েছিল যে চীনের কম্যুনিষ্টরা দাবি করতে শুরু করেছিলেন, ১৯৫৯ সালে

ষতটা শ্রম কৃষিতে নিযুক্ত তা মোট কৃষিত জমির সবচেয়ে উর্বর এক-তৃতীয়াংশে প্রয়োগ করেই ৫০ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যাবে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ জমি পশুপালন ও বনজ সম্পদ উৎপাদনে ফিরিয়ে নেবার কথাও বলা হয়েছিল।

এসব দাবি কত ভিত্তিহীন তা প্রমাণ হতে বেশি দিন লাগে নি। গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে জল সংরক্ষণের ছোট ছোট প্রকল্পে এবং অত্যন্ত ছোট মাত্রার ইম্পাত উৎপাদন-কারখানায় নিযুক্ত করার ফলে কসণ কাটার মত জরুরী কাজও বহু ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়েছিল। চাষের জমির পরিমাণ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা যে আগামী ১০ বছরেও চীনে সার্থক হবে না একথা ১৯৫৯ সালের ১২ই জুনের “পিপলস ডেইলি” পত্রিকা সর্বপ্রথম স্বীকার করল। আবার, পত্তীয় ভাবে জমি কর্ষণ, বিরাট পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ এবং জল সংরক্ষণ ও সেচের ক্ষমতা লক্ষ লক্ষ ছোট প্রকল্পে শ্রমিকদের নিয়োগ করে কৃষির শ্রম-নিবিড়তা বাড়ালেই যথেষ্ট হয় না এই সত্যও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। উৎপাদন বাড়তে হলে কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগও বাড়তে হবে এবং যতদিন তা না করা যায় তত দিন শত শত বছর ধরে যে কৃষি-ব্যবস্থা চলে আসছে তা ছাড়া উপায় নেই, এই উপলব্ধিও ছড়িয়ে পড়ল। অর্থাৎ কৃষিত জমির পরিমাণ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানো ঐ পর্যায়ে চীনে সম্ভব নয় এই সত্য স্বীকৃত হল।

অন্যদিকে কম্যুনব্যবস্থার ফলে ব্যাপক অব্যবস্থা

১০৬ চীনে কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সবুজ বিপ্লব

দেখা দিল। কম্যুনগুলির আয়তন এতই বড় ছিল বলে এবং উৎপাদন ছাড়া আরও অস্বাস্থ্য কাজে কম্যুন কর্তৃপক্ষ জড়িত হয়ে পড়েছিল বলে তাদের দক্ষতার মান খুবই নীচু স্তরের ছিল। বস্তুত, ১৯৫৮ সালে সমস্ত চীনের গ্রামাঞ্চল মাত্র ২৬, ৫৭৮টি কম্যুনে বিভক্ত ছিল। সহজেই বোঝা যায় এক একটি কম্যুন বিরাট আয়তন ও গড়ে প্রায় ৫,০০০ কৃষি-পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছিল।

কম্যুনব্যবস্থা আর এক দিক দিয়েও উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। এখানে উৎপাদনে কৃষকদের প্রেরণার কথাই বলা হচ্ছে। তথাকথিত বিনা মূল্যের সরবরাহ ব্যবস্থা কে কী কাজ করেছে তার উপর আয়বর্টনের নীতি বর্জন করে “প্রত্যেকের প্রয়োজনানুসারে” নীতি চালু করতে চেয়েছিল। কিন্তু “প্রত্যেকের প্রয়োজনানুসারে” বর্টনের নীতি একমাত্র সেই সমাজেই বাস্তবে রূপায়িত করা চলে যেখানে অগ্রাচর্যের সমস্যা আর নেই। অর্থাৎ, ঐ সমাজে অপরিাপ্ত সম্পদ রয়েছে এবং প্রত্যেকের প্রয়োজনানুসারে তাদের অভাব মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন সেখানে হয়। কিন্তু যে দরিদ্র সমাজে অগ্রাচর্য অভ্যস্ত প্রবলভাবে প্রকট সেখানে দ্বিতীয় নীতিটির প্রয়োগ করার প্রয়াসের ফল সাংঘাতিক হতে পারে। ১৯২৮ সালের পর চীনে ঠিক তাই হয়েছিল। কাজ না করেই যদি মোটামুটি অভাব মেটানো যায়, তাহলে কাজ করবো কেন? ১৯৫৮ সালের শরৎকালে ধান কাটা ও ভানাইয়ের কাজ এত খারাপভাবে করা

হয়েছিল যে প্রচুর পরিমাণে শস্য কৃষিক্ষেত্রে বা ধান ভানাইয়ের জায়গাতেই পড়েছিল। এই শস্য সংগ্রহের ক্ষমতা তাই দেশ জুড়ে এক আন্দোলন চালাতে হয়। ১৯৬০ সালের আগাছা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরও মারাত্মক। উত্তরাঞ্চলের ৬টি প্রদেশে আগাছা সমস্যা কর্ষিত জমির ১০ থেকে ৮২ শতাংশ বিপন্ন করে তুলেছিল। এর আগে চীনে আগাছা সমস্যার কথা কোনও দিনই শোনা যায়নি। কারণ, চীনের চাষীরা চাষের সময়ে নিজেরাই আগাছা উপড়ে ফেলত।

একই সময়ে প্রতিকূল আবহাওয়াও চীনের কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি করে। সব মিলে দেখা গেল ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১—পর পূর তিন বছর চীনের কৃষি উৎপাদনে সাংঘাতিক অবনতি। ১৯৫৮ সালের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের তুলনায় (১৯৫৮ সালে উৎপাদন ভাগ হয়েছিল) এ তিন বছর উৎপাদন প্রায় ২০ শতাংশ কমে গিয়েছিল বলে চীনের সরকারী সূত্রই স্বীকার করে। একই সময়ে তরীতরকারী, ফল ও পশু ও পাখি পালন থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের উৎপাদনও ভয়ানক কমে যায়। চীনের কৃষকরা ব্যক্তিগত জমিতেই এসব জিনিস উৎপন্ন করত। ঐ জমি চলে যাওয়ায় এসব জিনিসের উৎপাদন প্রায় শূন্যে পরিণত হয়। ফলে চীনের খাদ্যসমস্যা বিশেষ মারাত্মক আকার ধারণ করে। কতটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় তা ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালের গম আমদানির হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। ১৯৬০ সালে চীন মাত্র ৬০ হাজার টন গম আমদানি করেছিল।

১০৪ জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২

১৯৬১ সালে আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২ লক্ষ টন।

এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্ত চীনের সরকারকে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। শিল্পের কাঁচা মাল উৎপাদনের জন্ত যে জমি ব্যবহৃত হত তার একটা বড় অংশ খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের ফিরিয়ে আনা হল। উৎপাদনের পরিকল্পনার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কম্যুন কতৃপক্ষের হাত থেকে প্রথমে ক্ষুদ্রতর উৎপাদন লিগেডের এবং পরে আরও ছোট উৎপাদন দলের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। সাধারণ ভাবে বলা যায় উৎপাদন দলগুলি এক একটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল। ব্যক্তিগত ছোট ছোট জমিগুলি কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়া হল। কম্যুনগুলির আয়তনও কমিয়ে এনে ১৯৬২ সাল নাগাদ ৭৪,০০০ এ নিয়ে আসা হল (১৯৫৮ সালের ২৬, ৫৭৮-এর সঙ্গে তুলনীয়)। ১৯৬১ সাল নাগাদ তাই চীনের কৃষিতে প্রথম যুগের সমাপ্তি হল মনে করার কারণ রয়েছে। ১৯৬২ সালে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির দশম প্লেনে “কৃষিকে অগ্রাধিকার” দেবার নীতি স্বীকার করে নেওয়া হল।

(পরের সংখ্যায়)

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1981

Advertisement Rate Schedule

[From June, 1975]

Ordinary

Full Page : Rs. 250.00

Half Page : Rs. 150.00

Quarter Page : Rs. 80.00

Special Position : 15% extra

Cover Page

Second Cover : Rs. 350.00

Third Cover : Rs. 400.00

Fourth Cover : Rs. 650.00

For Special Position contact *Advt. Manager*
Jayasree.

Advertising Space 20*5Cm x 15*24Cm.
(8" x 6")

Contact

Manager, Jayasree

Office : 20A Princee Golam Md. Road

Calcutta—26

Phone : 46-1701 & 4116

নেতাজী-সুভাস

অষ্টম দৃশ্য

(পরবর্তী অংশ)

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন

আমার ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! ইচ্ছাছিল, আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমি পরাজয়ের হলাহল আকর্ষণ পান করি। কিন্তু আমার মন্ত্রীমণ্ডলীর এবং সমর পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নবোন্মত্তে পরিচালনার প্রয়োজনে অনিচ্ছায় আমি আপনাদের হেঁড়ে যাচ্ছি। আমি আজন্ম আশাবাদী। ভারতের আশু মুক্তির আশার বনিয়াদ আজও আমার একতিল শিথিল হয়নি। আপনারাও সে আশায় বুক বাঁধুন। বন্ধুগণ, রাজ্রি, শেষ যামের পতীরতম তমিষ্রা প্রভাতের শুভলগ্ন নুচনা করে। নবাবরণোদয়ের মুহূর্তটি আমাদের সম্মুখে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই হবে।

পরিশেষে ব্রহ্ম সরকারকে এবং বর্মী জনগণকে আমার জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সাহায্যদানকে দিচ্ছি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। স্বাধীন ভারত একদিন এই ঋণ উদার হস্তে পরিশোধ করবে। জয়হিন্দ। *

নেতাজী—বেশ। এবার লেখো আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যে বিশেষ নির্দেশ নামা। আমি

* ভাবানুবাদ বর্ধমান লেখকের।

বলে যাচ্ছি।—আমার আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরবৃন্দ। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা সংখ্যাভীত শৌর্যপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস যে স্থানে রচনা করেছো, সেখান হতে আমি আজ অন্তরের নিবিড় বেদনায় বিদায় নিচ্ছি। প্রথম পর্বে আমরা পরাজিত। কিন্তু জন্ম-আশাবাদী আমি এ পরাজয়কে স্বীকার করিনি। ইক্ষলের সমতল ক্ষেত্রে, আরাকানের পাহাড়ে অরণ্যে, জঙ্গলের তৈলধনি অঞ্চলে ও অজ্ঞাত ভূমিতে রচিত তোমাদের শৌর্যগাথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথার অমর হয়ে থাকবে। কমরেড্‌স্! এই সঙ্গীনের মুহূর্তে আমি একটি মাত্র আদেশ রেখে যেতে চাই। সামরিক বিপর্যয় যখন চরম রূপ ধরে আসবে, তখনও তোমরা যেমন তেরঙা ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে বীরের মতো তাকে গ্রহণ করতে পারো। সৈনিকের মর্যাদা ও শৌর্যবানের মহৎ সম্মান যেন কখনও ভুলুষ্ঠিত না হয়। উত্তর-কালে সম্মানগণ—যারা তোমাদের আত্মোৎসর্গের ফলে স্বাধীন ভারতে জন্মাবে—তারা যেন কৃতজ্ঞ-চিত্তে সমগ্র জগৎকে আহ্বান করে বলতে পারে—চেয়ে দেখো আমাদের পূর্বসূরীদের, যারা মণিপুর

আসাম ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে বার্ষিকাবরণ করেও এতটুকু হতোত্তম হননি, যারা পরাজয়কে অস্বীকার করে রচনা করেছেন শেষ সাফল্যের রাজপথ।*

তোমাদের হাতে একান্ত নির্ভরতায় আমি আজ তুলে দিচ্ছি ভারতের তেরঙা ঝাণ্ডা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বদেশের সম্মান এবং সৈনিকের মর্যাদা। ভারতের স্বাধীনতার হে অগ্রদূতবৃন্দ! আমার একবিন্দু সন্দেহ নেই যে সেই সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তোমরা সর্বস্ব দান করবে, প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দেবে। এ থেকেই সংগ্রামরত তোমাদের সতীর্ঘগণ সজীবনী স্রুধা আহরণ করবে।

...বিশ্বাস করো তোমাদের এই সামগ্রিক নিগ্রহ, এই আত্মত্যাগ কখনও নিষ্ফল হবে না। আমার কথা বলি। ১৯৪৩ সালে ২১শে অক্টোবর আমি যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম, তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি যুদ্ধ করবো আমার আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর মুক্তিকল্পে। বঙ্গুগণ, তোমরা আমার মতোই আশাবাদী হও। বিশ্বাস করো, নিরস্ত্র তমসার পরপারেই উষার অরুণ আলোক। ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে স্বাধীন হবেই হবে। ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন। ইনশাআল্লাহ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!*

ভাসি, বড়ের বেগে বলে পেলাম, লিখতে পারলে তো?

ভাস্করণ—পেরেছি নেতাজী।

* ভাবানুবাদ লেখকের

নেতাজী—খাঙক্ য়া, মাই স্টেনো! ভাসি, আমার সকল আবেদন ও আদেশনামার সঙ্গে তুমি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রইলে।

ভাস্করণ—এ আমার সৌভাগ্য নেতাজী।

নেতাজী—(মুচকি হেসে) কিন্তু এই সৌভাগ্য লাভ করতে তোমাকে ভৎসনা সহ্যে করতে হয়েছে কম নয়। ১৩ই মার্চ-এর কথা স্মরণ করো। বিশ্বাস-ঘাতক কাপুরুষ ফৌজীদের, ডেসপটিকেবল ট্রেটরস মদন-সারওয়ার-রিয়াজদের জঘন্ততম কার্যকলাপে অসহ্য ক্রোধে আমি দুটি আদেশ নামা বলে যাচ্ছি, তুমি ভাল রেখে লিখতে পাচ্ছানা। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে তিরস্কার করলাম। মেজর রাওয়াতকে বললাম, এমন অযোগ্য প্রতিবেদককে সরিয়ে নিতে, একটা ডিক্টোফোন আমাকে এনে দিতে। তারপর চোখে পড়লো, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ডিক্টেশন টুকে যাচ্ছো—

ভাস্করণ—নেতাজী, আপনার পায়ে পড়ি, ওকথা আর তুলবেন না। আমার দোষ, আমারই ত্রুটি। আপনার তিরস্কারে আমার পুরস্কার।—

নেতাজী—না ভাসি এতটা বিচলিত হয়ে তোমাকে অমন করে বলাটা আমার উচিত হয়নি। আমি অবশ্য জানি, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলে যে আমার ক্রোধ ও বিরক্তি তোমাকে উপলক্ষ্য করে বরিত হয়েছিল ওই ঘৃণ্য বেইমানদের ওপর। পাপিষ্ঠ দে-মদন-সারওয়ার-রিয়াজের দল ইংরেজ শিবিরে গিয়ে আমাদের উত্তর ব্রহ্ম পুনর্দখলের সমস্ত গোপন কৌশল ফাঁস করে দিলে। আমার বীরশ্রেষ্ঠ বাগরি

সময়ে পোপার যুদ্ধে পরম বিপাকে পড়ে নিঃশেষে যুদ্ধে গেল ধরাশূন্য থেকে। মাত্র পঁচিশজন জওয়ান সঙ্গে নিয়ে আজাদ হিন্দ শেরখান মহম্মদ শত্রুপক্ষের দু'শো সৈনিককে হত্যা করে দখল করেছিল সাদি পাহাড়ের চূড়া। কিন্তু সব ব্যর্থ হোলো। ব্যর্থ হোলো আমাদের সামগ্রিক অভিযান। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপলেন) ভাসি, আমাদের পরাজয়ের জ্ঞা খাড়াভাব, অজ্ঞাভাব, পূর্জ্ঞদেবের অবিরাম বর্ষণ; সরবরাহ কেন্দ্রের সঙ্গে রণক্ষেত্রের সংযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং নির্ভর ম্যালেরিয়া ব্যাধি—এ সবই দায়ী, সন্দেহ নেই। তবু আমার ব্রতচারী বীর জওয়ানেরা এতো বাধা সত্ত্বেও এতটুকু পশ্চাৎপদ হয়নি। কিন্তু ওদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে এই নরাধমদের বিশ্বাস-ঘাতকতা।

ভাসি—সত্যি তাই নেতাজী। ওদের কৃতঘ্নতা আমাদেরই ঘৃণার ও ক্ষোভের উদ্রেক করেছে। সর্বাধিনায়ক নেতাজীর চিন্তে তা যে কী প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড় তুলেছে তাতো হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি। সেই যুহুর্তে আপনি তো আমার অযোপাতায় একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আপনি যখন বললেন—‘আমি হুঃখিত-ভাসি,’ তখন আমি কন্নার বেগে বাইরে ছুটে গিয়েছিলাম আপনাকে আমার ক্রন্দনধারা পোপন করতে।

নেতাজী—কেন ভাসি!

ভাস্করণ—নেতাজী, আপনি কতো বড়ো আমি

ভ্যাক্স ১০২—৫

কতো ক্ষুদ্র। ওকথা আপনি বলতে আমি যে পাপের ভাগী হলাম।

নেতাজী—না ভাসি, নিজেকে অত ক্ষুদ্র মনে কোরো না। তাহলেই পাপ হবে।—আজাদ হিন্দের সর্বাধিনায়ক তোমাকে ভালবেসে তার এতো কাছে কাছে রেখেছে, সে তোমারই গুণে।—এখন যাও, এ ছুটি আবেদন এক্ষুণি টাইপ করে নিয়ে এসো।

(ভাস্করণের প্রস্থান। কালীর প্রবেশ)

কালী—নেতাজী, চা নেনছি।

নেতাজী—য্যা আর এ ভেরি গুড্ বয়, কালী। (চা খাচ্ছেন, একটা সিগ্রেটও ধরিয়েছিলেন) কালী, রেঙ্গুনের পাট তো আমার উঠলো। তুমি এখন কোথায় যাবে ঠিক করেছে?

কালী—কেন? আমি আপনার কাছেই থাকবো। আপনি যেখানে, থাকবেন, আমিও থাকবো চিরদিন আপনার টেবুল বয়।

নেতাজী—আমার সঙ্গে এখন থাকার বিপদ আছে কালী।

কালী—না নেতাজী, কোন বিপদ নেই। বিশ্বস্তরজী আমাকে বলেছেন, ‘জানো কালী, সমস্ত বিশ্ববিপদ উনি নাশ করবেন। উনি যে ত্রেতাযুগের রামজী, কলি যুগে নেতাজী হয়ে এসেছেন।’

নেতাজী—(হেসে) বিশ্বস্তর তোমাকে স্তোক দিয়েছে। আমি তোমার মতোই মানুষ।—কালী, একদিন তুমি বড়ো আশায় বলেছিলে, আমার সঙ্গে ফিরবে তুমি ইংরেজ শাসন মুক্ত স্বাধীন হিন্দুস্থানে, তোমার জীবিকে নিয়ে থাকবে, আমার কাছে।

(দীর্ঘনিশ্বাস চেপে) এ যাত্রা তা আর হোলো না কালী।

কালী—(বিশ্বাসের কণ্ঠে) না হোলো এখন একদিন হবেই। আপনার সঙ্গে আমি ফিরবোই স্বাধীন হিন্দুস্থানে। (কাঁদো কাঁদো সুরে) আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না নেতাজী। আমি তা হলে মরে যাবো—আমার আপনি ছাড়া আর কেউ নেই (কাঁদতে লাগলো)।

নেতাজী—ছিঃ কালী, কাঁদে না। (একটু ভেবে) আচ্ছা, আইয়ার সাবকে আমি বলবো 'খন তোমার কথা। তাঁর কথা আমিও এখন শুনে চলি, বুঝলে? যাও, এখন কাজে যাও। (কালী চেপে মুহুর্তে মুহুর্তে চলে গেল একটু পরে। বিশ্বস্তরের প্রবেশ, নেতাজী গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। বিশ্বস্তর স্টেলুট করে—)

বিশ্বস্তর—নেতাজী।

নেতাজী—(স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-তরল কণ্ঠ ফিরে পেলেন)—কেয়া বিশ্বস্তরজী! খবর সব আচ্ছাতো? তোমার বজ্রদণ্ডবলী আর দেখাটেকা দিলেন?

বিশ্ব—(বিশ্ব কণ্ঠে) মহাবীর বজ্রদণ্ডবলীর দেখা আর পাচ্ছিনে নেতাজী। তিনি বুঝি আমাকে ত্যাগ করলেন।

নেতাজী—বলো কী বিশ্বস্তর! স্বপ্নে, তিনি আর কোন প্রত্যাশে তোমাকে দেন নি?

বিশ্ব—না নেতাজী। কতো প্রার্থনা কছি—মহাবীরজী! তুমি এ চরম সঙ্কটে আমাদের পথ

বলে দাও—যুক্তির পথ, হিন্দুস্থানের যুক্তির পথ। কোন সাদা পাচ্ছিনে নেতাজী—

নেতাজী—না বিশ্বস্তর, শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত বিশ্বাস হারিওনা। তোমার আরাধ্য দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি বিপদের কালো মেঘ ভেদ করে নিবন্ধ রয়েছে তোমার ওপর, আমাদের সবার ওপর। বিশ্বাস রাখো, এ অন্ধকার সাময়িক। কেটে যাবে অন্ধকার সূর্যোদয়ের আলোকে। হিন্দুস্থান স্বাধীন হবেই। হয়তো আমরা কেউ থাকবো না। তাতে কী! আমাদের অশীষ্ট পূরণের অটুট বিশ্বাসে আমরা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো।

বিশ্ব—নেতাজী, আমি সৈনিক, আপনার অমুপত্য সেবক। আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার কাজেই যেন জীবন চলে যায়। মৃত্যুর সিংহদ্বারে যেন আমি অমর হয়ে থাকি।

নেতাজী—একই পথে আমরা সবাই পৃথিক বিশ্বস্তর।—দেখো তো একটু এগিয়ে, আইয়ার কেন এখনও আসছে না।

বিশ্ব—যাচ্ছি নেতাজী। (স্টেলুট দিয়ে প্রস্থান)

[নেতাজী গুণ গুণ করে গাইছেন
“তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শক্তি।” প্রবেশ করলেন
আইয়ার।]

আইয়ার—নেতাজী, পাড়ীর বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

নেতাজী—“যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রা দল

উঠেছে আদেশ, / বন্দরের কাল হল শেষ।”—
তাই না। বাংলা তো শিখলে না আইয়ার, তাহলে
বৃষতে মানব জীবনের প্রতিটি অমুকুল প্রতিকূল
মুহূর্তকে কী অপূর্ব ভাষা দিয়েছেন মহাকবি
রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই কথায় আজ প্রার্থনা জানাচ্ছি
আমরা—“নূতন উষার স্বর্ণদ্বার / খুলিতে বিলম্ব কত
আর!”

আইয়ার—(মাথা চুলকিয়ে) বেঁচে থাকলে
বাংলা শিখবেই নেতাজী। আপনার কাছ থেকে,
দেবনাথ বাবু, ডাক্তার চ্যাটার্জি কিম্বা সরকার
সহেবের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা শুনে বাংলা কথা
এখনই বেশ ধরতে পারি।

নেতাজী—তাই নাকি? কিন্তু ওটুকুতে চলে
না। ভাষা শিখে রবীন্দ্রনাথ পড়ে যেদিন বৃষতে
পারবে, সেদিন তোমার মনে হবে জীবন সার্থক।
তোমার মতো মেধাবী শিক্ষার্থীর অগোপনে তা আয়ত্ত
হবে।

আইয়ার—নেতাজী, আপনার মাতৃভাষা শিখে
রবীন্দ্রনাথ পাঠ করার পরেও একটি কাজ আমার
বাকি থাকবে।

নেতাজী—কী কাজ আইয়ার?

আইয়ার—আমাকে খুঁজে দেখতে হবে কোথায়
রয়েছে আমাদের অনন্ত নেতাজীর মহাজীবনের
প্রেরণার উৎসমুখ। তার সন্ধান বাংলা সাহিত্য
ও সংস্কৃতি ছাড়া আর তো কোথাও মিলবে না
নেতাজী।

নেতাজী—(হেসে) তা খুঁজে দেখো। আজাদ

হিন্দুর প্রচার সচিবের কাজ তো কোনদিনই
ফুরোবে না। আইয়ার তুমি শুধু সাংবাদিক নও,
তুমি সাহিত্যিক—ইংরেজি ভাষা তোমার মাতৃভাষা
স্বরূপ।—আমরা যখন থাকবো না, ভারত যখন
স্বাধীন হবে—তখন যদি তুমি বেঁচে থাকো তাহলে
তুমি লিখবে আমাদের কথা, অমর করে রাখবে
আমার জীবনবাদকে, পূর্ব এশিয়া জুড়ে এই মহান
বিপ্লব প্রচেষ্টার যা পথের দিশারী।

আইয়ার—নেতাজী আজ তিন বৎসরের উর্ধ্বকাল
ধরে এই পূর্ব এশিয়ায় যা দেখেছি যা জেনেছি—তাকে
জামাবার প্রচেষ্টায় আমার লেখনি যেন ধরা
হয়। আপনার অলৌকিক কর্মতৎপরতার সাক্ষী
হয়ে, আপনার অগূঢ় চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকতে
পেরে যে অমূল্য সম্পদ লাভ করেছি তা যেন
কাগজের বুক কালির আঁচড় কেটে স্বদেশবাসীকে
উজ্জাড় করে দিতে পারি। ঈশ্বর আমাকে করুণা
করুন।*

(ভাস্করণের প্রবেশ। ছুটি টাইপ করা
কাগজ নেতাজীকে দিলেন। নেতাজী
ভাতে সই করার আগে চোখ বুলোচ্ছেন।)

নেতাজী—(হালকা সুরে) ওহে আইয়ার,
তোমার কাজে ভাসিকে সঙ্গে নিও। ওর ভারি
সাধ, আমার একটি জীবনী লেখে।

ভাস্করণ—না নেতাজী, আমি সামান্য

* Unto Him A witness—নেতাজী ও আই-এন
এ'র উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ।
(by S. A. Ayer)

অতিলেখক, সাধা কি আপনার জীবনী লিখি। এই কাজের যোগ্য একমাত্র মিঃ আইয়ার।

নেতাজী—দেখেছো, ভাসির কী বিনয়। (কাগজ দুটি আইয়ারের হাতে দিয়ে) আইয়ার, ব্রহ্মদেশের অবিস্মরণীয় যুদ্ধের ওপর এই আমার লাস্ট্ টেস্টামেন্ট।

আইয়ার—নেতাজী, মেজর জেনারেল জামান কিয়ানী এবং মেজর ভেঁস্লে আমাকে বলে পাঠিয়েছেন যে আপনার সহযাত্রীদের সংখ্যা কমাতে হবে। জিনিসপত্র তো কম নয়, ট্রাকমাত্র বারোখানা। দুটি জীপ ও চারটি মোটর গাড়ী—তা বুঝে যাত্রীদের নামের ফর্দ করতে হবে। আমাদের বোঝা কমাতে হবে।

নেতাজী—হ্যা, বোঝা কমাতে হবে। “আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি / সকলি হয়েছে বোঝা / এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও।”—আইয়ার, তুমি আমার কালীর ভার নাও।

আইয়ার—নিলাম নেতাজী, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

নেতাজী—আর শোনো। মালয় ও সিঙ্গাপুরের নারী সৈনিকেরা আমাদের সঙ্গে যাবে। ওদের যার যার ধরে নিবিঘ্নে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব।

আইয়ার—ওদের সংখ্যা কতো হবে?

নেতাজী—আমি ওদের লিষ্ট তৈরী করতে বলেছি।—ভাসি, সুভদ্রা আর শ্রীমতী এসেছে কিনা, দেখে এসো। (ভাস্করণের প্রস্থান। কিছুক্ষণ

পরে সুভদ্রা জয়সোয়াল ও শ্রীমতী নায়ারকে নিয়ে পুনঃপ্রবেশ।)

শ্রীমতী—(অভিবাদন করে) নেতাজী, আমরা লিষ্ট তৈরী করেছি। এই যে। এঁরা যেতে চান আপনার সঙ্গে।

নেতাজী—সবাই মালয়-সিঙ্গাপুরের মেয়ে তো?

শ্রীমতী—না! আমাদের ক্যাম্প রটে গেছে যে নেতাজী মালয়তে গিয়ে নৃতন করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়বেন, নবোত্তমে আবার সংগ্রাম শুরু হবে। তাই সবাই যেতে চান নেতাজীর সঙ্গে, সবাই আবার মেতে উঠতে চান দ্বিগুণ উৎসাহে। আমরা এখন ক্যাম্পে আছি তিনশ' জন। তা থেকে কাট ছাট করে এ লিষ্টটি তৈরী করেছি।

আইয়ার—(লিষ্ট দেখে হাসলেন) কিন্তু শ্রীমতী এতো নারী সৈনিকের জ্ঞান তো হবে না আমাদের ‘কনভয়’তে। সংখ্যা কমাতে হবে।

নেতাজী—হ্যা, শুধু মালয়-সিঙ্গাপুরে যাদের বাস, তারা যাবে আমার সঙ্গে। সুভদ্রা তুমি আর শ্রীমতী সে ভাবে এক্ষুণি লিষ্ট করে ফেলো। (ছ'জনে নাম গুণে-গুণে চাঁরা চিহ্ন দিতে লাগলেন। তারপর গোণা হোলো)

সুভদ্রা—আমরা সাতান্ন জন আছি নেতাজী।

নেতাজী—বাকি সবাই কি রেজুনের মেয়ে?

শ্রীমতী—না। তবে সবাই ব্রহ্মদেশের, বেশির ভাগ রেজুনের ও কাছাকাছি অঞ্চলের।

নেতাজী—বেশ। আইয়ার সাতান্ন জন মেয়ের জন্য আমার অন্তত তিনটি ট্রাক চাই।

আইয়ার—(একটু ভেবে) তা বোধ হয় পাওয়া
বে।

নেতাজী—সুভাষ, একদা তুমি পিতার
বদান্ততার মূল্যস্বরূপ নিজেকে উৎসর্গ করেছিলে
স্বদেশের সেবার। ‘সর্দার’কে কৃতিত্বের সব অংশটুকু
ছেড়ে দাওনি। তারপর খানজোল সামরিক
হাসপাতালে সেবার কাজে যাবার পথে সেই পতীর
রাজিতে তুমিই ছিলে একমাত্র সাথী সর্দারের অসম-
সাহসিক আরেক্ষ পাহাড় অভিযানে। (সুভাষ
লজ্জায়, গৌরবে মাথা নত করলেন) আমি সবই
জানি সুভাষ। (একটু থেমে) এখানকার সব কাজ
কুরিয়ে গেছে। এবার যার যার গচ্ছিত রক্ত কুরিয়ে
দেবার পালা।

সুভাষ—নেতাজী, আপনি আবার সৈন্ত
সাজিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রু সৈন্তের উপর—
তাইতো চলেছেন মৌলমিন হয়ে মালয়ে। দয়া
করে আমাদের সঙ্গে নেবেন। আজাদ হিন্দের মহান
কাজে যদি আমার জীবন চলে যায়, তবেই নিজেকে
ভাগ্যবতী মনে করবো।

শ্রীমতী—ভাবিজী সঙ্গে আমিও আছি
নেতাজী।

নেতাজী—ভাবিজী। সুভাষ বুঝি তোমার
ভাবিজী। (সুভাষের মাথা নত হোলো লজ্জায়।
শ্রীমতী সুভাষকে চিম্টি কেটে মুচ্কি মুচকি
হাসছেন।)

সুভাষ—শ্রীমতী, তা হলে তোমার কথাটাও
বলে দেবো কিন্তু? কবি তো চ্যাটার্জি সাহেবের

সঙ্গেই যাচ্ছেন এই কনকসুতে। কী মজা! সারা
পথ উছ'বয়ে শুনতে শুনতে যাবে (শ্রীমতী সুভাষের
মুখ চেপে ধরলেন)

নেতাজী—কবি কে?

আইয়ার—(হেসে) আমাদের নাজির আহমেদ,
মেজর-জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জির এডিকং। এই
মেয়ে ছ'টোর কথা শুনবেন না। ওদের বেমন ভাব,
তেমনি ওরা খুনশুটি করে।

নেতাজী—(হেসে ফেললেন) ও। শ্রীমতী
তুমিতো মাজাজের মেয়ে। তুমি উছ'জানো?

শ্রীমতী—না নেতাজী। তবে উছ'শেখার
অভিলাষ রয়েছে।

নেতাজী—হ্যা, নাজিরের কাছে মুখে মুখে
শিখে নিও। যখন আমরা পথ নেবো, কিংবা কোন
ভাঙ্গা বাড়িতে বা গাছ ডালয় আমরা বিজ্ঞান
করবো। বুঝলে আইয়ার, উছ'ভারি মূল্যবান
ভাষা, কবি-কল্পনার যোগ্য বাহন। আমার
বাংলার পাশে দাঁড়াতে পারে, উছ'। শ্রীমতী,
নাজির যদি কোথাও ভুল করে, আমার কাছে
এসো আমি তা শুধরে দেবো। আইয়ার ‘সর্দার’
এখনও রণক্ষেত্রের সম্মুখে, তাইনা?

আইয়ার—হ্যা নেতাজী। যতদূর শুনেছি,
‘সর্দার’ এখনো পোপা সেক্টারে মরণপন যুদ্ধে
রত।

নেতাজী—(আপন মনে) আশ্চর্য এই ‘সর্দার’।
ভাস্করণ—পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে সবাই
আশ্চর্য সোনা হয়ে গেছে। ‘রিয়াজ-

সারওয়ার-দে-মদনের দল মুষ্টিমেয়, ওরা ব্যতিক্রম নেতাজী।

আইয়ার—ঠিক বলেছো ভাস্করণ আজাদ হিন্দে ওরা ব্যতিক্রম।

শুভদ্রা—নেতাজী, আমার ও জীমতীর আবেদন মঞ্জুর তো?

নেতাজী—শুভদ্রা! তোমাদের আবেদনের উত্তরে এটুকু শুধু বলতে পারি—দেশপ্রেমের বর দিতে মহান যুত্যা যখন রাজ সমারোহে আসবে, তখন সে আনন্দ-যজ্ঞে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ রইলো।

আইয়ার—আমি তাহলে যাবো নেতাজী? কিয়ানী, ভোঁসলে অপেক্ষা করে আছেন।

নেতাজী—আমাদের যাবার লগ্ন তো সন্ধ্যার পরে। এখন মাত্র সকাল আটটা। এখনও হাতে বেশ সময় আছে। আইয়ার, মৌলমিনে যাবার রাস্তা তো পেগুর গা ঘেঁষে। পেগু এখন ইংরেজের দখলে। অত্যন্ত সাবধানে আমাদের গুপ্ত চলতে হবে। শুভদ্রা, জীমতী! তোমরা শিবিরে ফিরে যাও, লিষ্ট অনুসারে সবাইকে প্রস্তুত হতে বলো গে। লিষ্টটা একবার দাও তো। আমি 'নোট' দিয়ে সই করছি। (তথাকরণ)

(শুভদ্রা ও জীমতী লিষ্ট নিয়ে চলে গেলেন)

নেতাজী—ভাসি।

ভাস্করণ—বলুন নেতাজী।

নেতাজী—আর একটি জরুরি কাজ করতে হবে।

ভাস্করণ—কী সে কাজ নেতাজী?

নেতাজী—শোনো। রেঙ্গুনে এসে যখন ঝাঁসিরাণী ব্রিগেডকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া হয়, তখন রেঙ্গুনের ও অজ্ঞান মকঃখল শহরের ভারতীয়গণ তাঁদের মেয়েদের নিশ্চিন্ত সঁপে দিয়েছিলেন আমার হাতে। তাদের এখন বার বার গৃহে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এ আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। রেঙ্গুনে বাড়ী বাড়ী আমি ওদের নিয়ে যাবো। তুমি এবং আইয়ার একুণি যাও লোকনাথনের কাছে। তাকে বলা গিয়ে মকঃখলের মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেবার বন্দোবস্ত একুণি করতে হবে।

আইয়ার—শহরের মেয়েদের ভারও লোকনাথনকে দিন নেতাজী। নাগরিকদের ধন মান রক্ষার ভার তাঁকে দিয়েছেন, একাজ তিনি সানন্দে করবেন।

নেতাজী—বলেছি তো আইয়ার—এ আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। রেঙ্গুন ছেড়ে যাবার আগে আমার ও কাজ সাজ করতে হবে। আমি একুণি যাচ্ছি ঝাঁসিরাণী বাহিনীর শিবিরে। ভয় নেই, বিশ্বস্তর ও তার সাজ্জীরা আমার সঙ্গে থাকবে।

ভাস্করণ—(আমতা আমতা করে) কিন্তু নেতাজী, মেয়েরা তো সংখ্যায় কম নয়। বাড়ী বাড়ী গিয়ে ওদের পৌঁছিয়ে দিতে অনেক সময় লাগবে। এয়ার রেড এর সাইরেন ঘন ঘন বাজছে। রাস্তায় রাস্তায় চলেছে গৃহ যুদ্ধ আউন্ট সানের মুক্তি কোজের সঙ্গে বাম'র সরকারী ফৌজের। রাহাজানি ও ডাকাতি শহরের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এ অবস্থায়—

নেতাজী—অবস্থা এত গুরুতর বলেই আমাকে যেতে হবে ভাসি। ওদের গৃহ যুদ্ধে তো আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। ওদের ঘরোয়া ব্যাপার-ওরাই বোঝাপড়া করে নেবে। (হেসে) বিশ্ব বিপদের কথা চলছে। ভাসি, ওসব যত প্রবলকার হোক না কেন, আমাকে ওরা সমীহ করে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

আইয়ার—হ্যাঁ, সময়েরও একটা প্রশ্ন আছে নেতাজী।

নেতাজী—হ্যাঁ, তা আছে। আইয়ার, আমাদের রেক্সন ছেড়ে যাবার কথা ছিল গত কাল তেইশে এপ্রিল। অনিবার্য কারণে তা চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়েছে। না হয় আরও চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে যাবে। এ কার্য সম্পন্ন না করে আমি রেক্সন ত্যাগ করবো না।

সুত্রধার—২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যার পূর্বেই নেতাজী মেয়েদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রিতে রওনা হলেন তাঁরা। শত্রুর বিমান থেকে বোমা পড়ছে, পেগুর মোড়ে ইংরেজের প্যারাট্রুপারেরা মেশিনগান চালালো। অবর্ণনীয় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নেতাজীসহ কনভয় এ গিয়ে গেলো। পথিমধ্যে নেতাজীকে বাঁচাতে কবি সৈনিক নাজির আহম্মেদ ইংরেজের মেশিনগানের গুলিতে বীরের মৃত্যু বরণ করে শহীদ হলেন। নেতাজী সতীর্থদের সঙ্গে রাস্তার দশ মাইল হেঁটে গেলেন। জাপানৈসর্গিক তাকে মোটর গাড়ী এগিয়ে দিলেন, সবিনয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। সবার হুঁশ তিনি সমানে

ভাগ করে নিতেন, তাইতো তিনি সবার প্রিয়তম নেতাজী। আজাদ হিন্দের মেজর-জেনারেল থেকে নিম্নতম সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সকলেরই তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু, অত্যন্ত কাঙ্ক্ষের মনুষ্য। অবশেষে নেতাজী ও তাঁর সঙ্গীরা (হুঁজন ছাড়া) মৌলমিনে পৌঁছিলেন ওরা মে তারিখে। মাত্র দু'টি ট্রাক মূল্যবান কাগজপত্র এবং কিছু মাল নিয়ে মৌলমিনে যেতে পেরেছিল। নেতাজীর হাতে ছিল শুধু ছোট্ট একটি ব্যাগ তাতে ছিল গীতা ও রুদ্রাক্ষের মালা।

১৫ই মে তারিখে নেতাজী এলেন ব্যাংককে। ইটালি গেছে, জার্মানি গেছে, জাপান নৌবাহিনী মার্কিন নৌবাহিনীর হাতে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে পর্যুদস্ত। ব্রহ্মদেশ ইংরেজ অধিকৃত। মালয়-সিঙ্গাপুরে হুঁশ জাপানবাহিনী কণিতর—শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, মনোবলের দিক দিয়েও। আজাদ হিন্দকে সাহায্যদানের কাঠামোটুকু শুধু জাপান কোনক্রমে বজায় রেখেছে। ঘর সামলানোর উদ্দেশ্যে জাপজাতি পীড়িত। তবু নেতাজী হাল ছাড়লেন না। মনের গহনে তাঁর অভিলাষ, জাপান যদি পরাজয়ের পঙ্ককুণ্ডে ডুবেও যায়, তবে তিনি রাশিয়ায় চলে যাবেন। বিজয়ী মিত্রশক্তির বৃহৎ শিবিরে সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার নীতিগত মনকষাকষি অর্গোণে প্রচণ্ড সংঘর্ষে পরণত হবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। রাশিয়া এ যাবৎ জাপানের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশ নেয়নি, নেতাজীর আজাদ হিন্দ ও রাশিয়াকে কোনদিন শত্রু মনে করেনি। সর্বোপরি

তার আশা, জাপানের সহযোগিতা তিনি শেষদিন পর্যন্ত লাভ করবেন।

আজাদ হিন্দ নেতাজী নূতন প্রাণের স্পন্দন আনলেন। 'ব্রহ্মদেশের কেরং তেরশ' সৈনিকের সঙ্গে যুক্ত করলেন মালয়স্থিত ফৌজের তৃতীয় ডিভিসনটিকে। উদ্ধার মতো তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন আজ, সিঙ্গাপুর, কাল আবার ব্যাঙ্ক, অপরদিন সেরেমবাম এবং তারপর সাইগণ। ছড়িয়ে রাখছেন দায়িত্বশীল মন্ত্রীদেয়, মালয় ও সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে।

১১ই আগস্ট ১৯৪৫। নেতাজী সেরেমবামের অতিথি ভবনে বসে শুনলেন, রাশিয়া জাপানকে

চরম পত্র দিয়ে ক্রোত ধাবমান—মার্কুরিয়া অধিকার করতে। চিন্তে তাঁর জাপানো সমুদ্রগভীরে বিকোভ, বাইরে তাঁর সমুদ্রবক্ষের প্রশান্তি। ১৩ই আগস্ট সংবাদ ভেসে এলো, জাপান আত্মসমর্পণ করার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তৎক্ষণাৎ চল গেলেন সিঙ্গাপুরে, বিশেষ আদেশনামা প্রচার করলেন— 'জাপানের আত্মসমর্পণ গুজব মাত্র। চারিদিকে যুদ্ধ চলছে। আমরা যেন অচঞ্চল চিন্তে বীরের ধর্ম পালন করে যাই, সকল পরিবর্তিত অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকি।'

(ক্রমশঃ)

জয়ন্তী প্রকাশনের কলেক্টিভ নাই

নেতাজী প্রসঙ্গে :

—অন্যান্য বই—

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ

ঐ মহামানব আসে : চারণিক

৬.০০

১ম খণ্ড ৯.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০

চিন্তাজয়ী চিন্তরঞ্জন

ও ৩য় খণ্ড ১৩.৫০

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

২০.০০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়

রামমোহন

সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

৪.০০

সুভাষচন্দ্র ও জ্ঞানদাস প্ল্যানিং

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬.০০

অনিল রায়

৪.০০/৬.০০

NETAJI SPEAKS

বাংলাদেশের বিপ্লব

Volume One

সুনীল দাস

১.২৫

A collection of speeches & writings

ধর্ম ও বিজ্ঞান

Paper back 4/- Board 5/-

অনিল রায়

২.০০

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

ভারতের জাতীয়তা ও সুভাষচন্দ্র

অগণেশ্বর ঘোষাল

জাতীয়তার তত্ত্বের নিরিখে

জাতি-সঙ্ঘার উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তার তত্ত্বের জন্ম। কিন্তু জাতি-রাষ্ট্রের আবির্ভাবের আগে জাতীয়তার তত্ত্বের সংহত বিকাশের সুযোগ হয়নি। জাতি-রাষ্ট্রের স্মৃতিকাগার বলা হয় ইউরোপকে, আর ফরাসী বিপ্লবের সময়কে চিহ্নিত করা হয় তার জন্মকাল রূপে। এমতক্কেও, নানা আলোচনা ও মতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

Elie Kedourie বলছেন, 'জাতীয়তার তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে আবিষ্কৃত...এই তত্ত্বের বস্তুব্যাংল : মানব জাতি প্রাকৃতিকভাবেই জাতিতে বিভক্ত আর জাতির আছে কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা নিরূপণ করা চলে এবং স্বয়ংশাসিত জাতীয় সরকারই আইনগত সরকার।' (Nationalism p.-9)।

অবশ্য ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পূর্ব থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে গবেষণার জোয়ার বইছিল। এই দর্শনের মতে বিশ্বজগতের নিয়ন্তা হ'ল অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম—কোথাও এর হেরফের হ'বার উপায় নেই।

জ্যেষ্ঠ ৮২—৬

মানুষ যুক্তি বিচার দিয়ে তা অসম্ভব ক'রে সমাজকে সেই নিয়মমাত্তিক পড়ে তুলতে পারলে আরামে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম বিশ্বপ্রযোজ্য হ'লেও মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবে না এমন নয়...তবে ঐক্যের উপাদানগুলিই বেশী প্রয়োজনীয়। এই মত অনুসারেই দেশের শাসক প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করবেন কারণ দেশের মহানতাই শাসকের গৌরব (ডঃ E. K. p. 10-11)। ফরাসী বিপ্লবের অর্থ দাঁড়ালে রাষ্ট্রের প্রশাসন কাঠামো জনগণের স্বীকৃতি না পেলে তা বদলে দেবার অধিকার ও ক্ষমতা জনগণের রয়েছে। দাবী সনদের (Declarations of the Rights of man and the citizen) বস্তুব্যে রয়েছে, 'জাতির মধ্যেই সার্বভৌমত্বের নীতি নিহিত এবং জাতির প্রকাশ্য সমর্থন না পেলে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কতৃৎ করার অধিকার নাই।'

জাতীয়তার বিকাশের জন্ম এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক মানসিকতার প্রয়োজন

১ E. K.—Nationalism by Elie Kedourie

ছিল। জাতি-রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠনে জাতীয় জনতার অধিকার এবং সে বিষয়ে বলপ্রয়োগেরও প্রয়োজন স্বীকৃত হ'ল এবং ফরাসী বিপ্লব এর দৃষ্টান্ত হ'য়ে রইল।

এখন জাতি বলতে কি বোঝায় তা জানা দরকার। ইউরোপে জাতি বলতে বোঝাতো গৃহ-সংসার থেকে বড় কিন্তু রাষ্ট্র থেকে ছোট কোন সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীকে কিংবা বিদেশী নাগরিক সম্প্রদায়কে। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কয়েকটি 'নেশনে' ভাগ করা হ'ত। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে একরূপ চারটি নেশন ছিল। এই 'নেশন' বিভাগ ছিল স্থানীয় বিভাগ, বর্তমান জাতিবিভাগের ভৌগোলিক অর্থে নয়। Hume বলেছেন নেশন হ'চ্ছে এক জনগোষ্ঠী যেখানে মানুষ পরস্পর আদান-প্রদানে ভাব বিনিময়ে, কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। Diderot ও D' Alembert বিশ্বকোষে বলেছেন, 'নেশন' হচ্ছে এক জনগোষ্ঠী যারা একটি দেশের বিশিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বসবাস করেন এবং সেখানকার সরকারকে মেনে চলেন। এমনি করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতির অর্থ ক্রমশঃ বিকাশলাভ ক'রছিল এবং তার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চলছিল। নেশন বলতে Montesquieu'র সময়ে Lords আর Bishops'দের বোঝাত। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে এই সব ব্যাখ্যার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল এবং জাতীয় সরকার ও জাতীয়তার উদ্দেশ্যে বিকাশ ক্রমতালে এগিয়ে চললো। তবে তৎসংগঠনের ইতিহাসে শুধু ফরাসী বিপ্লবের

নয়—এতে চিন্তারাজ্যেরও বিপ্লবী অবদান রয়েছে (জঃ E. K. p, 19)।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি মানুষের জন্মগত অধিকার কিন্তু ত' কি উল্লিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন? এর তত্ত্বগত প্রমাণ তখনও দুর্বল। Kant-এর (১৭২৪-১৮০৪) দর্শন এর মোমাংসার পথ দেখিয়ে দিল। জ্ঞান থেকে নৈতিকতাকে আলাদা ক'রে ফেলতে হবে...তা না হ'লে নৈতিকতার স্বাধীনতা থাকে না। Kant তাঁর Critique of Practical Reason (১৭৮৮) এ লিখছেন, ভিত্তিগত অর্থে এই স্বতন্ত্রতাই সঠিক স্বাধীনতা। নৈতিকতা প্রাকৃতিক জগতের বস্তু নয়—মানুষের অন্তরের বস্তু। এ বস্তু ফলাফলের ধার ধারে না, পুরস্কারের প্রত্যাশাও তার নাই। মানুষের অন্তরের নির্দেশ থেকে এই স্বাধীন ইচ্ছা জন্ম। Kant এমনি করে মানুষকে তার নিয়ন্ত্রা করে তুললেন—ভাগ্য বা প্রাকৃতিক নিয়মকে নয়। 'দর্শনের ইতিহাসে Kant-এর মতের ব্যাপ্তি ও প্রভাবের গভীরতা অতুলনীয়। পরবর্তী একশ বছরের দর্শনের ইতিহাস Kant-এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল' (A History of Philosophy—Fuller p, 217)। কবি Heine বলেছেন, বিপ্লবী হিসাবে Kant, Robespierre'র প্রভাবকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। 'কারণ Kant-এর মতবাদ ব্যক্তিকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করলো—ব্যক্তিই হ'ল তার বিচারক, তার নিয়ন্ত্রা' (Vide E.K p. 25)। অন্তরের স্বাধীন নির্দেশ মহত্তর কাজের দিকে ঠেলে

নিয়ে যায় মানুষকে। এই মানুষ শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন কল্পনা থেকেই ঈশ্বরের কল্পনা। এই কল্পনা সে করে তার নৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্ত। Kant মনে করতেন প্রতিটি রাষ্ট্রের পঠন প্রজ্ঞাতান্ত্রিক হওয়া উচিত। তিনি ফরাসী বিপ্লবকে মানব ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায়রূপে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। ভাল মানুষের অর্থ হল স্বাধীন মানুষ—তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত স্বাধীনতার প্রয়োজন... এর থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তৎপরিণীত হ'ল। জাতীয়তাবাদ বস্তুতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। মানুষের স্বাধিকারের নৈতিকমূল্যের বিকাশ ঘটে তার সমাজের পরিবেশের মধ্যে (vide E. K. p. 40)। Rousseau-র রাষ্ট্রিক মতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে—তার মতে ব্যক্তি-ইচ্ছা, সমষ্টি ইচ্ছার পরিপূরক হ'তে হবে—না হলে ব্যক্তি বা সরকার কখনো সুখ অর্জন করতে পারে না। Kant-এর মতে বৈচিত্র্য থাকবেই যার জন্ত একটি মাত্র বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠিত হচ্ছে না...জগৎপ্রকৃতি ও তার গতি সে পথে নয়। তবে মানুষের চিন্তার গতি সামঞ্জস্য বিধানের পথে এগিয়ে চলছে—ভাষা ও ধর্মের বাধা সত্ত্বেও। পৃথিবী হবে অনেকগুলি রাষ্ট্রের সমাহার। আর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাম্য-সামঞ্জস্যের ধারা এগিয়ে চলবে (Idea of a Universal History on a Cosmopolitan plan 1788 Kant. জঃ E. K. p. 53)।

এর উপর Herder বললেন অতীতের অজিত

প্রমূল্যগুলিরও স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে।...আজকের অজিত মূল্যই শ্রেষ্ঠ আর অতীতের মূল্যগুলি তাদের পথ তৈরী করেছে, তা নয়। আজকের মূল্যগুলিকে বড় ক'রে দেখাবার প্রয়াসে অতীত মূল্যগুলিকে ছোট করা ঠিক নয়। অতীত মূল্যের পূর্ণতা রয়েছে আর ঈশ্বরের সব সৃষ্টির সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর আবহাওয়ায় বৈচিত্র্য আছে ছড়িয়ে এবং তা ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার অঙ্গ (জঃ E. K. p. 56)।

জাতীয়তা সম্পর্কে Schleiermacher-এর বক্তব্যও প্রাধান্যযোগ্য। বলছেন, 'ঈশ্বর প্রতিটি জাতিক পৃথিবীতে তার বিশিষ্ট কাজে নিয়োজিত করেছেন। সেজন্ত্য তাকে বিশিষ্ট চেতনামণ্ডিত করেছেন যাতে সে তার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে নিজে-কৈ পৌরবময় ক'রে তুলতে পারে।' Herder যুক্তি দিলেন, 'অনেকগুলি জাতি মিলিয়ে যে রাষ্ট্র-সে রাষ্ট্রে একটির বিশিষ্টতা অন্তঃগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে...বৈচিত্র্যের নিয়মের বিরুদ্ধে এ এক অন্তায় পাপ। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি তাদের বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলতে পারে যেমন অপচারী অটোমান ও গ্র্যাণ্ডমোগল সাম্রাজ্য, যেখানে অনেক জাতিকে রাষ্ট্রের বাঁধনে বদ্ধ করা হ'য়েছিল...কিন্তু চীন রাজ্য, ব্রাহ্মণদের এবং জুদের রাজ্য ছিল...কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। সেগুলির বিনাশ হলেও জাতি বেঁচে থাকে কারণ তা বিভিন্ন জাতির মিশ্রণকে অতিক্রম করেছে (ঐ পৃঃ ৫২)।

জাতীয়তা সম্পর্কে পণ্ডিত Hans Kohn বলেন,

চিন্তাজগতে Rousseau, Herder আর রাষ্ট্রনৈতিক জগতে ফরাসী ও আমেরিকার বিপ্লব থেকে জাতীয়তাবাদের যুগের সূচনা... যদিও অজ্ঞাত উপাদানও এ যুগ-সংগঠনে সহায়ক ছিল। বিশ্বের ইতিহাসে... নানা ঘটনা ও কার্য-কারণের জটিল গ্রন্থনা, কত ব্যক্তিত্বের অবদান, দৈবঘটনা, ছুঁঘটনা, কত ধরনের গতি-প্রকৃতির প্রভাবে রচিত হয়ে চলেছে। জাতীয়তা এ-সকল উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। কোন ইতিহাসই মানুষের জীবনের পূর্ণতার কাহিনী তুলে ধরতে পারে না। জাতীয়তার চরিত্র জানতে হলে একটি জাতির ইতিহাস জানলে চলবে না..... পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করেই তবে জাতীয়তার সাধারণ উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে (ডঃ H. K. Preface)। (২)

পুরাকালে বর্তমান জাতীয়তার উপাদান-বিশিষ্ট রাষ্ট্র ছিল না তা নয়। Edward Mayer বিশ্বাস করতেন, জু, ইরানীয় ও গ্রীকেরা জাতি হিসাবে পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন কিন্তু অধ্যাপক M. T. Walek-Czernecki'র মতে গ্রীক ও রোমানগণ প্রকৃত জাতীয়তার বিকাশ ঘটাতে পারেননি বরং বেলিনীয়গণ, মিশরীয় ও প্রাচ্যের অধিবাসীরা জাতীয়তার পূর্ণবিকাশ ঘটিয়েছিলেন। অজ্ঞাত সব ঐতিহাসিক আন্দোলনের মতই জাতীয়তার শিকড়

প্রসারিত হয়ে আছে অতীতের গভীরে। (৩) জাতীয়তার যুগের বহু পূর্বেই জাতীয়তার ভাবধারা ও প্রকৃতি সংগঠিত হয়েছে। (৪) তারপর একদিন তা বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন কালে। অবশ্য পারস্পরিক অবদানের প্রভাব স্বীকার করতেই হবে।

জাতীয়তার বিকাশের পথে সাধারণের সমষ্টিগত প্রভাব নীরবে কাজ করে চলে। যে যুগে যে রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ তার স্বাধীনসত্তা ভোগ করতে পেরেছে—সেখানেই সে জাতি ইতিহাসে তার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের স্বাধীন সমাজধারা যুগ যুগ ধরে জাতীয় ভাবনার আধার। তার কালাতিক্রমী প্রভাব ভারতীয় চিন্তাধারার স্বকীয়তার মধ্যে গ্রথিত হয়ে আছে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন পণ্ডিতদের হাওয়া বইতে লাগলো, এবং সাধারণ মানুষের সামাজিক প্রভাব বাড়লো তখন জাতীয়তার উপাদানগুলি তার রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্তনে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র। জাতির আর্থিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে জাতি রাষ্ট্রের সংগঠনে (ডঃ H. K., p 16)

(৩) Like all historical movements, nationalism has its roots deep in the past (H. K.—P. 3).

(৪) Both the idea and form of nationalism were developed before the age of nationalism (H. K.—P. 19).

। (২) 'H. K.—Idea of Nationalism by Hans Kohn,

বলা-হয় জাতিরাজের ভাবনায় অর্থনৈতিক দিকটি একটি আধুনিক সংযোজন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই তা ঘটেছে (H. K. p 18)। ভারতে জাতীয়তাবাদের পুরোধা ভারত পণ্ডিত জাতাবলম্ব ও অর্থনৈতিক বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলেছেন 'আমাদের কাছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মুখ্যতঃ এক অর্থনৈতিক প্রয়োজন' (ড্রঃ I. S. p 373)।

এখন জাতীয়তার তত্ত্বের নিরিখে উপাদানগুলির গুরুত্ব বিচার্য বিষয় হয়ে পড়ে। নেশনের আভিধানিক সংজ্ঞা হ'ল, জাতি হচ্ছে একটি বিশিষ্ট জনসমষ্টি যারা বংশগত, ভাষাগত, বা ইতিহাসগত দিক থেকে এক এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে একত্রিত বন্ধনে একতাবদ্ধ' (Short Oxford Eng. Dictionary Vol II p 1311 3rd Ed)।

Hans Kohn বলেন, কোন সামাজিক জনগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈষয়িক বন্ধন থেকে হয় জাতির জন্ম।...এই বন্ধনগুলির ভিতর সবচেয়ে প্রচলিত হ'ল, সাধারণ বংশধারা, ভাষা, ভৌগোলিক সীমা, রাষ্ট্রীয় স্বাভাব্যতা, দেশাচার ও ঐতিহ্য এবং ধর্ম। সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই দেখা যাবে কোনটিই জাতির অস্তিত্ব বা তার সংজ্ঞার পক্ষে অপরিহার্য নয় (H. K. p. 14)।

সাধারণ বংশধারা বা রক্তের বিন্দুজতার কাহিনী আজ এক কুসংস্কার। পৃথিবীতে কত জাতির মিশ্রণের ফলস্বরূপ হ'ল বর্তমান মানব গোষ্ঠী এবং এখনও এই মিশ্রণ হ'য়ে চলেছে।

'Fichte এবং Herder জাতি গঠনে ভাষার উপর গুরুত্ব দেন কিন্তু সুইস জাতির ভাষা হ'ল চারটি। এ বিষয়ে প্রবন্ধের অন্তত কিছু আলোচিত হবে। বর্তমান জাতীয়তার বিকাশের যুগের আগে ধর্ম ছিল প্রবল শক্তি। ধর্মীয় সভ্যতায় অন্ত কোন উপাদানের স্থান ছিল না। বর্তমান জাতিরাজের বিকাশের ফলে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনোভাবও পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে। একটি ধর্মের অধীন বিভিন্ন জাতিরাজ বর্তমান রয়েছে যেমন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। শুধু ধর্ম নয় এদের ভাষাও এক, তবু এরা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র। মধ্য প্রাচ্যে মুসলিম ধর্মাবলম্বী বহু রাষ্ট্র পাশাপাশি বিদ্যমান।

জাতিগঠনের প্রধান উপাদান হ'ল ভৌগোলিক সীমা ও সেই সীমায় সীমায়িত রাষ্ট্র। ক্যানাডার রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এই কারণেই। ভৌগোলিক জাতি সত্তা থাকলে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী অনিবার্য হ'য়ে ওঠে (ড্রঃ H. K. p. 19-15)।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্ততম প্রধান আবেদন ছিল ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে সীমায়িত ভারতীয় জাতির মুক্তি। জাতীয়তার আলোচিত উপাদানগুলির গুরুত্ব বিচার করে Hans Kohn বলেন, শ্রেষ্ঠ উপাদান হ'ল 'সমবেত সজীব সক্রিয় ইচ্ছা' (Corporate Will)। দেশের জনগণের সিদ্ধান্ত থেকেই হ'য় জাতির গঠন (ড্রঃ H. K. p. 15)। (৫) জাতীয় ইচ্ছা ভাবাদর্শের সৃষ্টি করে।

(৫) '...the most essential element is a living corporate will. Nationality is formed by the decision to form a nationality.'

বর্তমান যুগে রক্তের ডাক নয়, একটি ভাবাদর্শের শক্তি দিয়েই জাতি সত্তা সংগঠিত হ'চ্ছে (জঃ ঐ p. 16)।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাতিগঠনের বিভিন্ন উপাদানের আলোচনা ক'রে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকেই 'বড়ো' উপাদান হিসাবে দেখেছেন। জাতির গঠন সম্পর্কে বলেছেন, 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিষ এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিষ বস্তুতঃ একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্ব-সাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা।' (রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ ৬৭৭)।

সুভাষচন্দ্র National Will বা জাতীয় ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'আমাদের জাতীয় দৈবের প্রধান

কারণ-ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং যদি আমাদের National Will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয়.....তাহা হইলে জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না।' (পৃঃ ১৬৭ তরুণের স্বপ্ন)। আর ...'আদর্শের প্রেরণাতেই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়।'(ঐ পৃঃ ১৬৪)।

প্রাচীন জাতীয় সত্যতার ঐতিহ্যে মহান ভৌগোলিক ভারতবর্ষের জনতা ভাবাদর্শময় ইচ্ছার আকুতিতে অথগু ভারতের অথগু সাম্য-স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিভাড়নের উদ্দেশ্যে উত্তাল জাতীয় আন্দোলনে সামিল হ'য়েছিলেন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে ভারতীয় জাতিসত্তা নূতন ক'রে সংগঠিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসের সুযোগও মৃত্যু আর চক্রান্তের পাহাড়ে ভেঙ্গে পড়ে।

[ক্রমশঃ]

সেদিন শান্তি কই প্রভাতে

ডায়েরী

না শহর না গ্রাম কিন্তু ঠিক শহরতলিও নয়, কারণ শহর বলতে যা বোঝায় তা এখান থেকে অনেক দূরে। প্রায় ৪০৫০ মাইল। শহর ও গাঁয়ের ভাল এবং মন্দ, এর আকাশে-বাতাসে ও ধূলিকণায়। তবুও এর অবস্থা দেখলে মনে হয়, না ঘরকা না ঘাটকা। দিনের বেলায় টেরিলিন, টেরিকোট, লুঙ্গি, শাড়ী এবং রঙবেরঙের চটকদার বেশভূষা দেখলে, শহরের কথাই মনে পড়ে যায়। আবার সূর্য ডুবতে না ডুবতে গাছে গাছে বাহুড়, আকাশে বাতাসে জোনাকির দল, ঘরের আনাচে কানাচে শেয়ালের ছকাজিয়া, নির্জন পথপ্রান্তর, ঘরে ঘরে কেরোসিনের আলো, তাও মাত্র রাত্র ৮-৯টা পর্যন্ত, গণগ্রামের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মামুষগুলোও অদ্ভুতভাবে ছয়ের মেশামিশি, শহরের ও গাঁয়ের শহরের নিষ্পৃহতা যেমন এর আনাচে কানাচে তেমনি গ্রামের মত পরচর্চা—পরিনিন্দায় কিছু কম নয়। প্রায় শুদ্ধ ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীর সঙ্গে সমান ভাবেই ভাল রেখে চলেছে—নাই খাবো, নাই যাবো এবং অশ্লীল ভাষাও। রাস্তায় কান পাতলে ঝগড়ার সময় যেমন শোনা যায় Stupid, Nonsense ইত্যাদি গাল, তেমনি শোনা যায় এমন অনেক গালাগালিই যা শুনেলে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে যায়।

অতীত কি মৃত? তাকে তো দেখা যায় না? কিন্তু সেই অতীতের উপর নির্ভর করেই পড়ে ওঠে বর্তমান, ভবিষ্যতের স্বপ্নে ঘেরা। জায়গাটিরও অতীত একদিন ছিল, অশ্লীল বহু আপাতদৃষ্টিতে অখ্যাত নানা জায়গার মতই। কোন ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্ববিদ হয়তো একদিন এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেন, না পারলেও ক্ষতি নেই। অশ্লীল ৫-১০টা সাধারণ গাঁয়ের মতই এরও বেঁচে থাকবার অধিকার নিশ্চয় আছে। তবে বিভিন্ন পাড়াগুলোর নামকরণ এবং দুরত্ব রাখবার প্রচেষ্টা দেখে মনে হয়, বর্ণ-কৌলীজের যুগেও এরও অস্তিত্ব ছিল। বামুন পাড়া, ভূমিজপাড়া, মুচিপাড়া ইত্যাদিগুলি হয়তো জাত-বামুনদের ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভের সহায়তা না করলেও, বল্লাল সেন মার্কী জাত একদিন বজায় রাখতো। বর্তমান অর্থকৌলীজের যুগে এখানেও অবশ্য সবাই অনেকটা একাকার হয়ে গেছে। যেমন বামুনপাড়াতে জমি নিয়েছে মুসলমান, তেমনি মুসলমানপাড়াতে আশ্রয় পেয়েছে ভূমিজরাও। যেমন পেয়েছে পূজাপার্বণ এবং অনাস্ত্র অমুঠানে পরস্পরের যোগ দেবার অধিকার, অবশ্য অর্থের বিনিময়ে। তাই আজ এখানে যেমন মুসলমানের কাছ থেকেও টাঁদা নেওয়া হয় হুর্গাপূজায় তেমনি টাঁদা দিতেও হয় হিন্দুদের পীরের দরগায় উৎসবের

জন্মও। তাছাড়া তো আছেই প্রধান নেতৃ এখানকার নারীরা। বহুক্ষেত্রেই একই নারী হয়তো কয়েকবছর বাস করেছে গোঁড়া মৌলবীর হারেমে, অল্পতম বিবি হিসাবে। আবার সেই নারীকেই দেখা গেছে কিছুদিন বাদে ভোল পাগ্লেটে বর্ণকুলীন ব্রাহ্মণের শয্যাসঙ্গিনী হতেও।

জায়গাটির অবস্থানও বড় বিচিত্র। যেন একটি ত্রিভুজের কেন্দ্রবিন্দু, সমান দূরেই রয়ে গেছে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা। একদিন জায়গাটি ছিলও বাঙলাতে। আজ তা নেই। তার জন্ম এখানকার বাঙালী অধিবাসীদের কোন্‌ভাও নেই। অবশ্য প্রথম দিকে খামখেয়ালী সীমাবর্তনের সময়, প্রতিবাদ যে না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু হয়নি প্রতিরোধ।

কিন্তু প্রদেশই সমান ভাবেই চেষ্টা করে চলেছে, নিজেদের কৃষ্টি সম্প্রসারণ করতে এবং বাঙলা ছাড়া অল্প দুটি প্রদেশ সুপারিকল্পিত নীতি অনুযায়ী নিজেদের অধিবাসীদের বাড়িয়েই চলেছে। বাঙালীর ঐতিহ্য যে আজ এখানে একেবারে নেই তা বললে ভুল হবে। অন্ততঃ দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি দেখলে। কিন্তু নেই বাঙালীর সেই পরিচিত আত্মাভিমান এবং মর্যাদাবোধ।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখানে অল্পতম সংমিশ্রণ। দুর্গাপূজাতে যেমন ভীড় হয় তেমনিই ভীড় হয় রাম নবমী, জগন্নাথদেবের রথযাত্রায়, মকর সংক্রান্তি, আদিবাসীদের পাহাড় পুজায় এবং ছট পুজাতেও। এইসব উৎসবে শুধু স্কুলগুলিই বন্ধ থাকে না, বন্ধ থাকে এমনকি অল্পতম কেন্দ্রীয় সংস্থা পোষ্ট অফিসও,

মধ্যাহ্ন গৃহস্থের পক্ষে তাই ঘটি বাটা বিক্রি করেও ছেলেপুলেদের দুর্গাপূজায় এবং মকর নূতন জামা কাপড়ও কিনে দিতে হয় এবং চাঁদাও দিতে হয়, না খেয়েও, প্রতিটি অল্পতানেই। তবে স্নেহের বিষয় অর্থ শাস্ত্রের মতে, মধ্যাহ্ন বলতে বা বোঝায় তা এখানে নেই বললেই হয়।

নিশ্চিহ্ন প্রায় পুরাণো বাসিন্দাদের দেখলে মনে হয় একদিন এদের অবস্থাও সচ্ছলই ছিল। গোয়াল ভর্তি গরু, মাঠ ভর্তি ধান, পুকুর ভর্তি মাছ এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে হারেমে ভর্তি জরু হয়তো সবার ছিল না, কিন্তু অভাবও ছিল না, যেমন ছিল না বিদ্যা বা কৃষ্টির। আজ নূতনের আগমন পুরাতনকে হটিয়ে দিয়েছে। এসেছে অভাব, পেয়েছে পর্তমান সভ্যতার আশ্বাদ। গ্রাম্য সম্পর্কের দাদা, খুড়োর পরিবর্তে চালু হয়েছে বাবু এবং মিস্টার।

কয়েক মাইল দূরে নামজাদা ইল্পাত নগরী। দিনরাত্রি ঘলছে তার বড় বড় ফারেনসগুলো। অসংখ্য ক্রীতদাসের দল ভরিয়ে চলেছে তাদের বড় বড় গহ্বরগুলো, কয়লা এবং লৌহ দিয়ে আকাশে বাতাসে সর্বদাই অল্পরণ—“ম্যায় তুখা ছুঁ,” সাদা এবং কালো টাকার শ্রোত চারিদিকেই।

আছে এখানে একটি মাঝারি ধরনের রেল-স্টেশনও। না, যাত্রীর সুখসুবিধার জন্ম নয়। মাল সরবরাহ আর রেলকর্মচারীদের সুখ সুবিধার জন্ম। এখানকার রেল কতৃপক্ষ যাত্রীদের টিকিট কাটাটাও পছন্দ করেন না। এমনকি যাত্রীরা টিকিট

কাটেন তাঁদের কাছেও বিনা Punch করা টিকিটগুলি যদি পাওয়া যায় তাও ফেরৎ নেন। না, বিনামূল্যে নয়, কিছু অর্থ তাদেরও ধরে দেন। ফলে এখানকার রেলের কুলি থেকে আরম্ভ করে স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত, সকলের সঙ্গেই এখানকার লোকেরদের সম্পর্ক বেশ শ্রীতিকরই।

ভাড়া নিতাই বেড়ে চলেছে। যাত্রীও কিছু কম নয়। শুধু কমে চলেছে টিকিট বিক্রয়ের সংখ্যা। ফলে আগের থেকে ট্রেনের সংখ্যা অনেক কমেও গেছে। কিন্তু এখানকার জনসাধারণ তাতে প্রতিবাদ জানায়নি। প্রয়োজনও নেই। অজস্র মাল গাড়ির ট্রেন এখানে আসে। কিছু পয়সার বিনিময়ে সদাশিব রেল কর্তৃপক্ষ তাতে যাত্রীদের তুলেও দেন। পয়সা না পেলেও তাঁরা আপত্তি করেন না। কল্যাণী মূল্যটা পেলেও চলে।

ওয়াগান ত্রেকিং-এ জায়গাটি ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এখানকার রেল কর্তৃপক্ষ তাতে সহায়তা করতেও কার্পণ্য করেন না। তাই রাতের অন্ধকারে বছরে প্রায় কোটি টাকা লোকসান দেয় রেলওয়ে। গঞ্জিয়ে ওঠে ভূঁইয়াদের ধনীরা দল। লোকে বলে এখানকার প্রতিটি ধনী পিছনে আছে এই কালোরাতির কালো টাকার সহায়তা। তাই রেল কর্মচারীদের পক্ষে জায়গাটি স্বর্গবিশেষ। কোনরকমে একবার পাঁচ বছর এখানে কাটিয়ে দিতে পারলে, লাখ খানেক টাকা নিশ্চয়ই এসে যাবে, তা যে কোন পদে থেকেই হোক না কেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৮২-৭

ট্রেন চলাচলের সময় ঘণ্টা এখানে প্রায়ই বাজে না, বাজলেও একসঙ্গে তিনটি ঘণ্টাই। প্রয়োজনও হয় না। বর্তমানে কোন ট্রেনই অস্বতঃ ৩:৪ ঘণ্টা লেটের কমে আসা যাওয়া করে না। তাই খেয়ে দেয়ে বেশ লম্বা ঘুম দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে যাত্রীরা এসে অনায়াসেই টিকিট করে পাড়ীতে উঠতে পারে। ঘণ্টা শুনে ছুটাছুটি করবার দরকার হয় না।

রেলকর্মচারীদের চাকরীর ব্যাপারেও, জায়গাটি ভীষণ বিশেষ। উপরি তো মোটা আছেই এবং তার সঙ্গে নেই কোন অভিযোগও। তাড়াহুড়া করবার দরকারও হয় না। এমন কি কোন কোন সময়ে ট্রেন এসে পৌঁছেলেও টিকিট বাবুরা, হয় কোনো কোয়ারটারে নয় কোন বস্তিতে বেশ আরামে নিদ্রাস্থও উপভোগ করেন। তাঁদের ভাষায় প্যাসেঞ্জার নামক জীবরা ফালতু মাত্র, বিশেষ করে South Eastern রেলের বেলায়। কর্মতৎপরতা শুধু দেখা যায় ট্রেনের সময়, অশিক্ষিত আদিবাসীদের কাছে, তখন অনায়াসেই ২০ পয়সার পুরানো টিকিট ২-৩ টাকায় বিক্রি হয় বলে। তাছাড়া খুচরো পয়সা ফেরত দেওয়ার বামেলাও নেই। টিকিটবাবুরা জ্ঞানেন পয়সার থেকে যাত্রীদের যাওয়াটা বেশী প্রয়োজনীয়, তাই তাঁরা স্টেশনে গাড়ী ঢোকবার আগে টিকিট বিক্রির জানালা খোলেনও না।

মালগাড়ী এলে কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমস্ত রেলকর্মচারী এসে হাজির হন প্ল্যাটফর্মে। কেউ

কাউকে বিশ্বাস করেন না বলে। জায়গাটির অভিজ্ঞাত মহলের মধ্যেও অন্ততম হলেন স্টেশনের মালবাবু, এঁদের বোলবোলাও কিছু কম নয়। এমনকি ছুধ খাবার জন্ত গরু বা তার খাবারের জন্ত পয়সাও তাঁদের খরচ করতে হয় না। দেন এখানকার শেঠরা। জানিনা পরুটি মরলে তার ফেলবার খরচ কে দেয়। কোন জিনিষই তাঁদের পারত পক্ষে কিমতে হয় না। অকুপণ হস্তে তা জোগান এখানকার ব্যবসায়ী মহল-ই। জায়গাটির একটি মায়াও আছে। একবার এসে গেলে দশ বছরের জন্ত নিশ্চিন্ত। বদলি এখানে প্রায়ই হয় না, হলেও তা রোধ করবার উপায় এঁদের জানা আছে। শুধু হাত বদল হয় কিছু নম্বর নোটের।

মহেশবাবু এখানকার একজন টিকিট বাবু। এসেছেনও বেশ কয়েক বছর। যেমন এসেছেন এখানকার মালবাবু রামবাবু। এসেছেন একই জায়গা থেকে। উদ্দেশ্য নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করা। তবে দৃষ্টিভঙ্গি হয়েছে ছুধনের পৃথক পৃথক। মালবাবুর উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে। তাঁরই ভাষায় অধস্তন দশ পুরুষের ছুধে ভাতের যোগাড় তিনি এই পাঁচশতেরই করে ফেলেছেন। আশা আছে আরও বিশ পুরুষের করে যাবারও। মহেশবাবুও খুবই খুশী। অকরণ সরকারী আইন তাঁর জেনানা মহলকে বাড়িতে দেয়নি, তাতে তাঁর লোকমানও হয়নি। ২০৩০টি এখানকার নারী অন্ততঃ তাঁকে ২১ সপ্তাহের জন্তও পতি হিসাবে বেছে নিয়েছে, কিছু অর্থের বিনিময়ে। ছুধনেই তাই আপ্রাণ

চেঁটা করেন জায়গাটির থেকে যেন বদলি না হতে হয়।

ধানাও অংশ একটি আছে। তবে তার মুখ্য উদ্দেশ্য চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি বন্ধ করা নয়, এখানকার দুইটা বিশিষ্ট পক্ষের ঝগড়ার ইন্ধন জোগানো। রাজনৈতিক ব্যাপারে এখানকার ধানার সাধারণ ভাবে চিন্তাও নেই, দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া। কাণ রাজনৈতিক চিন্তাধারা বলতে যা বোঝায় তা এখানে নেই বললেই চলে। রোজগার এখানে তাঁদের বেশ ভালই। তাই বদলির খবর এলে, সাধারণ কনস্টেবল থেকে আরম্ভ করে কারুরই ২০-৩০ হাজার টাকা খরচা করতে আটকায় না। উপরের দিকে তো ক্ষেত্র বিশেষে লাখখানেক টাকাও চলে যায়। আর তা নিষ্ফলও হয় কদাচিত-ই।

চুরি এখানে প্রায় রোজই হয়। হয় না, চুরির কিনারা। এখানকার লোকের এটা গা সওয়া হয়ে গেছে, তাই চুরি হলেও লোকে ধানায় সহজে যায় না। যায় না প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ এখানকার ধানার বরাবরের রেওয়াজ-ই হল অভিযোগকারীকেও কিছু টাকা দিতে হয় এবং জানাতেও হয় চোরের নাম ঠিকানা। না, তাতে চোরের সাজা হয় না। শুধু তাকেও দিতে হয় রেহাই পাবার জন্ত, বেশ কিছু অর্থ। আর শুরু হয় প্রকাশ্য শত্রুতা, বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে। লাভ হয় শুধু ধানী বর্জ্যপক্ষের এবং তাদের ভবিষ্যৎ আয়ের পথও খুলে যায়। তাছাড়া বড় চোরদের

হয়তো ছোট চোরদের বিরুদ্ধে কিছু বলতেও লজ্জা লাগে। Departmental inquiry এখানে কিছু হয় না, অবশ্য যদি মাসকাবারি বরাদ্দ ঠিক থাকে তবেই।

পাশোয়ানজী এখানকার ছোটবাবু। তিনি পুরানো লোক বলে তাঁর খাতিরও সবচেয়ে বেশী। মুখেও লেগে আছে দিবারাত্রই তুলসী দাসের—রাম কহ, রাম কহ ভাইরে। কপালেও মস্ত বড় তিলক, হাতের ক্ষমতাও অসীম। সামান্য একটা বিড়ি থেকে আরম্ভ করে বড় বড় নোটের বাণ্ডিল এই ছুটি হাতের সাহায্যেই পকেটে পিয়ে ঢোকে। না তিনি মদ খান না। তবে নারীর সম্বন্ধে তাঁর লজ্জা নেই। তুলসী দাস তাঁর কণ্ঠস্থ। তাই নারীর জাত নিয়েও তাঁর মনে দ্বিধা জাগে না। তবুও ইয়ার দোস্তের দলরা অনুযোগ করলে তাঁর মনুসংহিতা আবৃত্তি করতে আটকায় না। বলেন মনুসংহিতাতেই তো মনু বলেছেন নারী, জল-আর অর্থ সর্বদাই পবিত্র।

রাজঘোটক বলতে যা বোঝায় তাঁর ভাগ্যে ভা জুটেছে। জ্ঞীও কিছু কম নয়। সিপাইদের কাছে খৈনি থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই ভাগ তিনি নেন, অবশ্য বলিষ্ঠ চেহারার সিপাই হলে মাঝে মাঝে তাদের খুশীও করেন। অশুবিধাও হয় না। কারণ স্বামী বেশীর ভাগ দিনই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাড়ীর বাইরে কাটান। তিনি অবশ্য স্বামীর মত পূজা আর্চনা করেন না, খরচা হবে বলে। লোকে বলে, তাঁর মুখ দেখলে নাকি সেদিন অন্ন জোটে না।

এখানে এমন বহু সংস্থা আছে, যাদের না আছে

অফিস, না আছে অফিসিয়াল কাজ। আছে কেবল মোটা মাহিনার বেশ কিছু সংখ্যক অফিসার, আর মোটা T. A. অবশ্য মাসে মাত্র একবারই সম্ভাব্য ট্রেনে উঠতে হয়, তাও ভাইপোদের সহায়তাসেই, মাহিনার বিলের টাকা ভাঙ্গাতে। কাজ না থাকলেও রোজগার কিন্তু খুব বেশীই। মাহিনার টাকাটা নাস্তা পানিতেই লাগে। ঘর খরচা বা ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্তে নয়।

এমনি একজন অফিসার মিঃ প্রসাদ। বেসিক মাইনাটাও মনে হয় ৪০০ টাকার কম নয়। তাছাড়া D. A., T. A. এবং উপরিতো আছেই। কারণ এখানে পিয়ন থেকে আরম্ভ করে ষাটশত গোলার ওজনদার পর্যন্ত সবাই স্থানীয় লোকদের কাছে অফিসার বিশেষ। পাওনাও পদ অনুযায়ী সবাইয়েরই। মিঃ প্রসাদের যে কি কাজ তা সঠিক অনেকেই জানে না। যদিও তিনি গেজেটেড অফিসার। অফিস তাঁর নেই কিন্তু আছে অফিসের খরচায় বাড়ীর সব কাজ করবার জন্ত একজন পিয়ন। তাঁকে শুধু প্রতিমাসে প্রথম সপ্তাহে দেখা যায় বিভিন্ন দোকানে তাঁর নজরানা আদায় করতে। আর বিকেলের দিকে মাসিক প্রতিটাকায় ১০ পয়সা হিসাবে তাঁর পাওনা সুদ আদায় করবার জন্ত ঘোরাঘুরি করতে। এখানে ধীরেই পয়সা আছে তাঁরই অন্ততম পেশাও হল চড়াহুদে টাকা খাটানো। মামুঘটা কিন্তু এমনিতে খুবই ভাল। ভিজরে যাই থাক না কেন মুখে হাসি সর্বদাই লেগে আছে। হিন্দি, বাংলা এবং উড়িয়া ভাষায় লোকের

সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতেও তাঁকে সর্বদাই দেখা যায়।

এমনি একজন অফিসার মিঃ তেওয়ারীও। এক বিশেষ ধরনের রোগীদের জন্য একটি সরকারী হাসপাতালের ইনি না-পাশ করা কম্পাউণ্ডার। বাহিরে অবশ্য পরিচয় ডাক্তারবাবু বলেই, হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কারণ এখানে হাসপাতালের এমন কি যে, ঝাড়ুদার সেও ইনজেকশন দিয়ে বেড়ায় এবং চিকিৎসাও করে, টিপসই দিয়ে মাহিনার টাকা নেওয়া সঙ্গো। সেই তুলনায় ইনি অনেক বেশী শিক্ষিতও।

শোনা যায় তিনি নাকি ক্লাশ VIII পর্যন্ত পড়েও ছিলেন। মাতৃভাষায় কথা বলা ইনি পছন্দ করেন না। কথা বলেন এক নূতন ধরনের ইংরাজীতে, ইংরাজী অভিজ্ঞ লোককেও স্বীকার করতেই হয় তাঁদের অজ্ঞতা। বাঁকা পথে রোজগারও এঁর কিছু কম নয়। শুধু রুগীদের ঔষধ বিক্রি করেই নয়, অস্ত্রাস্ত্র বহু পাবেই। বদলিও এঁর হয় না। মামার জোর যথেষ্ট আছে বলে। তাছাড়া লোকে বলে ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ছোড়া মরে। একথাটার জাজ্জল্যমান প্রমাণও তিনি। তাঁর থেকে বয়সে অনেক বড় এবং চাকরীস্থলে তাঁর ওপর ওয়ালা ছিলেন তাঁর স্ত্রী, তিনি মরে নিজে বেঁচেছেন এবং বাঁচিয়েও দিয়েছেন মিঃ তেওয়ারীকে। প্রায় লাখখানেক টাকা রেখে।

কালোপথের কালোটাকাকে সাদা করবার জন্য জায়গাটি-তীর্থস্থান বিশেষ। “রত্নপতি” রাঘব,

রাজারামেশ্বর ভক্তবৃন্দগণ বেশ বহুদিন থেকেই এখানে আস্তানা গেড়েছেন। চারিদিকে শুধু তাঁদেরই জয় জয়কার। এখানকার প্রকৃত মালিকও তাঁরাই। এসেওছেন বহু দূর থেকেই। সুদূর রাজস্থান, উত্তর বিহার, গুজরাট এবং পাঞ্জাব শুধু আজ স্মৃতিতেই পর্যবসিত। উদ্দেশ্য নাকি এখানকার নিরন্ন অধিবাসীদের সেবা করা। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের, তলিতল্লা গুটিয়ে, বেশীর ভাগকেই স্থানান্তরে যেতে হয়েছে। ধীরে ধীরে প্যারেননি তাঁদের পরিণত হতে হয়েছে এঁদের ক্রীতদাস হিসাবে, নিছক বাঁচবার জন্যই।

এই বিভিন্ন প্রদেশজাত শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ছুটি দল।

ছুই দলের মুখ্যব্যক্তিত্ব একই প্রদেশ থেকে এসেছেন এবং গতানুগতিক লোটা কন্ডল নিয়েই। ছুই দলের মধ্যে একদল নিজেদের ভিতরেই নেতৃত্ব রেখেছেন, অন্যদল খাড়া করেছেন শিখণ্ডী হিসাবে একজন বাঙালীকে। চাবিকাঠি রেখেছেন অবশ্য নিজেদের হাতেই এবং তাঁর দৌলতেই দশবছরের আগেকার মূলধন লোটা কন্ডল আজ পরিণত হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকায়। অপর একটি দলও আছে এবং তা অস্ত্র সম্প্রদায়ের। এঁদের কাজ হল এ দল থেকে ও দলে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা।

জায়গাটিতে আজও প্রচুর ধান হয়। আশে পাশের গাঁওলিতেও। তাই গড়ে উঠেছে ১২।১৪টি ধানের কল। তাছাড়া প্রমিকের মজুরীর হারও বর্তমান দুমূল্যের বাজারেও প্রায় শায়েস্তা খাঁর

সময়ের মতনই। তাবলে চাল এখানে সুলভ নয়। গড়ে সাড়ে তিন টাকার কমে ১ কেজি চালও পাওয়া যায় না। সমস্ত চালই চলে যায় ইস্পাত নগরীতে, এখানকার লোকেরা না খেয়েই মরে।

মিল মালিকরা কিন্তু অবিবেচক নন। অন্ন তাঁরা না দিতে পারলেও অন্নজাত পানীয়ের অভাব তাঁরা রাখেন না। ফলে গড়ে উঠেছে আনাচে কানাচে বহু ভাঁটিখানা। কুসংস্কারও এখানে মানুষের নেই বললেই হয়। তাই যে ধর্মে সুরা নিষিদ্ধ, সেই তাদেরই হাতে ৩৫২টি ভাঁটিখানা। না, মালিকরা এই সব পানীয় খাননা, তাদের জন্তু আসে সুদূর Solon এবং অছাচ্ছ জায়গা থেকে তাঁদের উপযুক্ত পানীয়।

এদের মধ্যমণি হলেন শেখ আজিজ। তাঁর পেশা মদ সরবরাহ করা। আর নেশা হারেমের অতিথিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোন গোড়ামিও নেই, নারীর ক্ষেত্রে। তাই তাঁর হারেমে সন্ধান করবে পাওয়া যাবে আদিবাসী, মাহাতো থেকে আরম্ভ করে, ইরাণ, তুরান থেকে না হলেও লক্ষ্মী, ফয়জাবাদের রূপসী স্ত্রী নারীদের।

আগেই বলা হয়েছে জায়গাটি তিনটি প্রদেশের সঙ্গেই সংলগ্ন, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনটি প্রদেশেরই লোক এখানে যথেষ্ট। এমনি একটি প্রদেশের মানুষদের এখানকার নেতা হলেন বিজয় যশু। প্রভু জগন্নাথের অকৃত্রিম ভক্তও। মাছটা নিয়মিতই খান, কিন্তু মাংস খাওয়াকে করেন ঘৃণা। লোকে বলে স্থানীয় মিলগুলির বয়লারের আগুন

জ্বলে ঐরই টাকাতে। অসম্ভবও নয়, টিপছাপের কৌশল তাঁর মত অল্প কারুরই জানা নেই। নিরীহ আদিবাসীদের ভুলিয়ে বছরে কয়েক শ বিঘে জমি অনায়াসেই এসে যায়। তাছাড়া তো এত বড় স্রদের মহাজনও সচরাচর দেখা যায় না। চাষ, স্রদের টাকা এবং ছোটখাট ছুচরাটি কলকারখানা থেকে মাসে প্রায় লাখখানেক টাকা তাঁর এসে যায়।

খুব ধার্মিক প্রকৃতির লোক। সবসময়ই কপালে তিলকের ফোঁটা এবং ধর্মের কথা লেগেই আছে, অস্ত্রের, বিশেষ করে বাঙালীর, হাতে জল তিনি খান না, তবে অনাচ্ছ পানীয় তেলে-ভাজার সঙ্গে তিনি অস্ত্রের হাতেও খান। নারী সম্বোধনে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের বাড়ীর চৌকাঠ তাদের তিনি মাড়াতে দেন না। রাতও তিনি বাইরে কাটান না সকালবেলা পূজা অর্চনার অনুবিধা হবে বলে। অযথা পয়সা খরচা করার পক্ষপাতীও তিনি নন, তাই ছপুর বেলাটাই তিনি বেশী পছন্দ করেন, ক্ষেত খামারে কাজ করার সময় এবং সম্পর্ক তাঁর গড়ে ওঠে মেঝান কামিনদের সঙ্গেই। পানীয়টাও হাড়িয়ার উপর কদাচিৎ-ই ওঠে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে স্নান করে নিত্য জগন্নাথের পূজাও করেন। দানখানও যে না করেন তা নয়। নিজের প্রমায়ু ও স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্তু দৈবজ্ঞ ও গণংকারদের মাঝে মাঝে ভাল টাকাও দেন।

ছবেজীও একটি দলের নেতা, গোঁয়ার গোবিন্দ লোক। আজও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন “জিসকা

লাঠি, উসকা ভ'ইস"। নিজস্ব বলতে কিছু নেই। তাই যখন যেটা মাথায় কেউ ঢুকিয়ে দেয়, তখন সেইটা নিয়েই বেশ কিছু দিন মাতামাতি করেন। আর গায়ের বেশ জোর আছে বলে, বহুলোক ভয়ে ভক্তিও করে। ঘরে অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী। পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু ছবেজী-শুধু খুবই সন্দেহগ্রবণই নন, বেশ কিছুটা কানপাতলাও। পাশেই বাঙালী পাড়া। ছবেজীর সব সময় মনে হয় তাঁর স্ত্রী বোধ হয় অল্প কোন বাঙালী যুবককে ভালবাসে, এখানকার শেঠরাও এ সন্দেহটিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। শুধু তাই নয় বাঙালীদের বিরুদ্ধে যখনই কিছু করার প্রয়োজন হয় তখন তাঁরা একে কাজেও লাগান।

ছাত্রদেরও একজন নেতা যে নেই তা নয়। তবে তার কাজ ছাত্রদের স্বার্থ দেখা, নয়, দেখা শেঠদের স্বার্থ। তাই যখনই কোন আন্দোলন গড়ে ওঠবার চেষ্টা হয়, তখনই একে পাওয়া যায়, হয় শেঠদের অন্দর মহলে বা ধানার নিভৃত কক্ষে। লোকে বলে মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্তেও ধানার থেকে একটা মোটা মাসকাবারিও সে পায়। শুধু কিছু নিরীহ ছেলে, আন্দোলন হলেই বিপদে পড়ে। তাই সচরাচর ছাত্ররা কোন আন্দোলন করে না। এমনকি যে অভূতপূর্ব বিহার বনধু হয়ে গেল তাতেও এখানে বিন্দুমাত্র সাড়ার কথা শোনা যায়নি, কাগজে যাই বেরক না কেন।

(ক্রমশঃ)

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ত

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সন্ডাক ১২'০০। বাৎসরিক ৬'০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্ত

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বপ্রথমে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলছাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।
৩. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স গোলান মহাস্থান রোড

কলিকাতা-২৬

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পুঁতি

উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। দু'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও দুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপুঁতি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩-র বৈশাখে (মে ১৯৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভাশুভায়ায়ী যাঁরা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে-যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক

জয়ন্তী

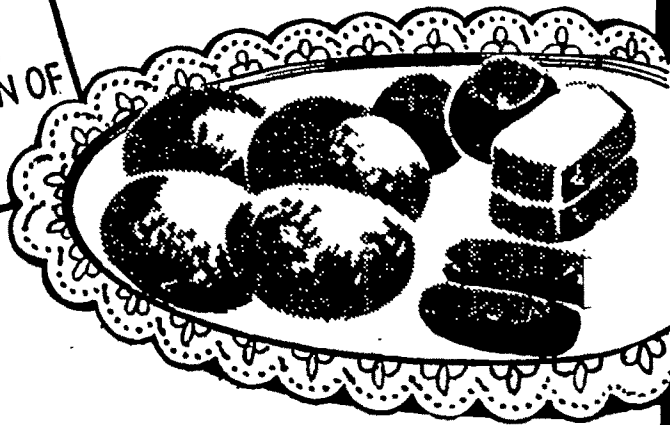
২০-এ-প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০

ADDS A SMILE
TO YOUR DISHES

IT'S NOT ONLY
ALL GOODNESS
BUT ALSO A SIGN OF
GOOD TASTE



**LAKHMI
GHEE**

*makes
your dishes
delicious
and
pleasing
too!*



Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1.00 with Regtd Postage
Rs 1.70 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-1710 46-4116.

সম্পাদক—সুনীল দাস

13 JUL 1975



80 ବର୍ଷ
ଆଷାଢ଼ ୦ ୧୦୪୨

ସମ୍ପାଦକୀ-ମହାଦିକୀ : ଲୀଳା ବାପୁ

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর শ্রুতি উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। দু'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও তুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। স্বয়ংকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষশ্রুতি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩-র বৈশাখে (মে-১৯৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভাহুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক
জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

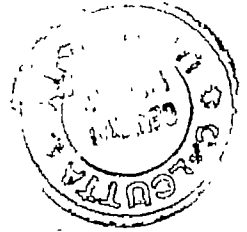
ফোন : ৪৬-১৭১০

সূচাপত্র

জয়ন্তী : আঘাত : ১৩৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিজয়িনী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৯	নেতাজী-স্মৃতি	অধ্যাপক অমলাভূষণ সেন	
আপংকালীন সরকারী ঘোষণা			(নাট্টীকৃত ইতিহাস)		১৫১
	(বর্তমান প্রসঙ্গ)	১৩০	ভারতের জাতীয়তা ও স্মৃতিচিহ্ন		
প্রাকৃত (কবিতা)	বাসুদেব দেব	১৩৪	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	কর্ণেশ্বর ঘোষাল	১৬১
প্রভু (কবিতা)	মঞ্জু দাশগুপ্ত	১৩৫	চীনের কৃষি-অভিযন্তা ও		
বিশ্বস্ত দশকের স্মৃতিতে	বিজয়কুমার দত্ত	১৩৬	সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য		
(কবিতা)			(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অধ্যাপক রাখাল দত্ত	১৬৫
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শিক্ষার			সেদিন শারদ স্বচ্ছ প্রভাতে উষ্মধারী		
ক্রমবিকাশ	শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৩৭	(সত্যঘটনা অবলম্বনে গল্প)		১৬৯
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)					
নরেন গোঁসাই যেদিন					
রাজসাকী হলেন	পুলকেশ দে সরকার	১৪৫			
(বিপ্লব-যুগের এক বলক)					

সম্পাদক : সুনীল দাস



নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য



গর্ভনিরোধক
খাবার বড়ি বা
'পিল'

ভাগনার নিকটতম কেন্দ্রে চলে যান : সেখানে
পরামর্শ পাবেন এবং বিনামূল্যে বড়িও

এখন পৌর প্রাধিকার সমন্বিত
পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে
পাওয়া যায়

ଜାୟଞ୍ଚୀ

୫୦ ବର୍ଷ • ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା • ଆଷାଢ଼ ୧୩୫୨

ଓ

ବିଚାରିନୀ ନାହିଁ ତର ଡ଼ର,
ନୁହେଁ ତ ନାହିଁ ତର ଡ଼ର।
ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ
ଅନ୍ୟାୟ ଚାରିଟି ଦାସ,
କହିଲେ ଏହି ନାହିଁ ଡ଼ର ॥

ସୁବିରାମସାହୁ

୩୦ ଜାନୁଆରୀ

୧୯୭୮

বর্তমান প্রসঙ্গ

আপেক্ষাকালীন সরকারী ঘোষণা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (জুন ১৯৭৫) জয়ন্তী প্রকাশিত হবার পর দেশে আপেক্ষাকালীন অবস্থা এবং আনুমানিক কয়েকটি গুরুতর বিধান ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্যও জরুরী কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে। নীচে ২৬শে জুন থেকে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত দিনানুক্রমিক ঘোষণা সমূহ সন্নিবেশিত হল—

২৬শে জুন

রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দিন আলী আহমদ ভারতবর্ষে আপেক্ষাকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

২৭শে জুন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাপাক্ষী জাতীয় উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেন শিল্প জাতীয়করণের কিস্তি নূতন কন্ট্রোল আরোপের কোনো সরকারী পরিকল্পনা নাই।

২৯শে জুন

তিন দিনের মধ্যে প্রতিদোকানে বিক্রয়ের জন্য মজুদ অত্যাবশ্যক জবা-

সমূহের দাম (বিক্রয় কর এবং স্থানীয় কর সমেত) ও মজুদের পরিমাণ ঘোষণা করে তালিকা টাঙাতে হবে। অস্থায়ী সংশ্লিষ্ট দোকানদারের বিরুদ্ধে আইন সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি এবং পণ্যের অভাব সৃষ্টি-কারীদের বিরুদ্ধে রাজ্যসরকারগুলিকে কঠোরভাবে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, ভারতরক্ষা আইন এবং মিসা আইন প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩০শে জুন

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার দাবীতে বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার প্রয়োগ সাময়িকভাবে রহিত করে ২৭শে জুন তারিখের রাষ্ট্রপতির ঘোষণা জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ করে আদেশ জারী করা হল। সংবিধানের ১৪, ২১, ২২ ধারায় বিবৃত মৌলিক অধিকারগুলি এই আদেশের আওতায় রয়েছে।

আত্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে—মিসা আইন

আটক বন্দীদের আটক রাখবার কারণ দর্শাবার বাধ্যবাধকতা থেকে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে অব্যাহতি দিয়ে অর্ডিনাল জারী করা হোলো। আপেক্ষিকীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আটক রাখবার অনিবার্যতা সম্পর্কে ঘোষণা করতে হবে এবং এই ঘোষণার একটি নকল সংশ্লিষ্ট আটক ব্যক্তিকে দিতে হবে।

১লা জুলাই

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করলেন তার কতকগুলি নূতন আর অগ্রগতি অনেক আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু আরও বেশী দৃঢ়তার ও উজ্জ্বল সঙ্গী রূপায়িত করতে হবে।

মূল্যস্তর কমানোর জন্ত সরকারের পর পর ব্যবস্থা গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, খাত সংগ্রহ স্বাধীন করতে হবে এবং অত্যাবশ্যক ত্রুটি বর্জনের স্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন বোধে পণ্য আমদানী করে যথোপযুক্ত যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পণ্য বিক্রয়কারীদের মূল্য ও মজুদতালিকা টাঙানো আবশ্যিক করার জন্ত এবং মজুদদারদের এবং এ বিষয়ে নির্দেশ ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তি দেবার জন্ত রাজ্যসরকারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারী বিভাগগুলি এবং শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলিকে ব্যয় সঙ্কোচের নূতন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখতে হবে, বাছাই করে ঋণ দিতে হবে।

জমির উচ্চ সীমা সংক্রান্ত আইন সমূহ বাস্তবে রূপ দিতে হবে। ভূমিহীনদের দ্বিগুণ উত্তোগে উদ্ধৃত্ত জমি বণ্টন করতে হবে। জমির খতিয়ান/নিভুলভাবে সম্পূর্ণ করতে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য চাই। উপজাতিরা তাদের জমি থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ের বেশী সময় ভূমিহীনদের অধিকারে তাদের ভূ-স্বামীদের জমি থাকলে সেই জমির ওপর তাদের মালিকানা দেবার জন্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা বর্বরোচিত এবং তা রদ করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করার ঠিকা বা অল্প কোনো ব্যবস্থা বে-আইনী ঘোষিত হবে।

গ্রামীণ ঋণ ক্রমাগত বাড়তে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভূমিহীন চাষীদের, গ্রামীণ কারিগরদের এবং ছুই হেক্টরের কম জমির মালিক ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের জন্ত ঋণের সুযোগের বিকল্প প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা রচিত হবে এবং এদের বিরুদ্ধে ঋণের মামলা কিম্বা ঋণ আদায়ের ভিত্তি অনির্দিষ্টকালের জন্ত স্থগিত রাখা হবে।

অবশিষ্ট কো-অপারেটিভ, কর্মশালা ব্যাঙ্ক এবং

সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ এই ব্যবস্থার আওতায় পড়বে না।

কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী সম্পর্কিত আইন-গুলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজন বোধে তাদের নিম্নতম মজুরীবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

অতিরিক্ত পঞ্চাশলক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা বিস্তারের কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। মাটির নীচে সঞ্চিত জল অবিলম্বে কাজে লাগানো হবে এবং সেচ ও পানীয় জলের সন্ধানে সার্ভে শুরু করা হবে।

২৬০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনারূপে কেন্দ্রীয়সরকারের আওতায় বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎপর্ষদগুলি টেলে সাজা হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের ব্যাপকতায় কৃষির পরই হস্তশিল্প শিল্পের স্থান। তাদের নায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হবে। হস্তশিল্প শিল্পের জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত করা হবে।

কর্ণাট্টাণ্ডে মিল বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে যাতে উন্নত ধরনের ধুতি, শাড়ী ও জামার কাপড় সহর ও গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া যায়।

শহরে খালি জমির মালিকানার উদ্ধারসীমা বেঁধে দিয়ে অতিরিক্ত জমিদখল করে, নতুনবাড়ীর ভিত্তর

বর্গ পরিমাণ বেধে দিয়ে শহরে জমি সমাজীকরণের জন্য আইন করা হচ্ছে।

বিলাসবহুল শহরে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য বিশেষ স্কোয়াড গঠন করা হবে। সম্পত্তির মূল্য কম করে দেখানো হয়ে থাকলে কঠিন সাজা দেওয়া হবে।

স্বাগলিং এর বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর করা হবে। যে সব শিল্পে সরকারী সাহায্যের কিন্না কাঁচামাল আমদানীর প্রয়োজন নাই, তাদের লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হবে। আমদানী-রপ্তানি বিধি সংশোধন করা হচ্ছে। বিধান ভঙ্গের জন্য কঠোর সাজা দেওয়া হবে।

শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণে ডাকা হবে। এটা হবে উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে (Shop level) এবং সেখানে উৎপাদনের কর্মসূচীও নির্ধারিত করা হবে।

ট্রাকের সাহায্যে মাল পরিবহনের জন্য শ্রাশনাল পারমিটেব ব্যবস্থা করা হবে।

আয়কর ছাড়ের নিম্নসীমা ৬০০০ টাকা থেকে ৮০০০ টাকা নির্দিষ্ট করা হোলো।

দরিদ্র ছাত্রদের সুবিধার জন্য ছাত্র হস্টেলে এবং অন্ত্রমোদিত বোর্ডিং-এ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে অত্যাৱশ্যক পণ্য সরবরাহ করা হবে।

স্কুল,কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নায্যমূল্যে বই এবং ষ্টেশনারী সরবরাহ করা হবে। বই ব্যাক্স স্থাপন করা হবে।

এপ্রেনটিসশিপ আইনের সংশোধন করে সংগঠিত

শিল্পে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এপ্রেনটিস নিয়োগ অনুমত শ্রেণী, উপজাতি সংখ্যালঘু এবং শারীরিক অসমর্থদের স্বার্থের প্রতি নজর রাখা হবে।

রাষ্ট্রপতি ১লা জুন আর একটি অর্ডিনাল জারী করেছেন। এই অর্ডিনালের বলে আগলিং নিরোধের ক্ষমতা বাদে আর আটক করা হবে তাদের আটকের কারণ দর্শাতে হবেনা Conservation of Foreign Exchange and prevention of smuggling activities Act. —এ আটক

ব্যক্তিদের নথিপত্র উপদেষ্টা বোর্ড-এর নিকটও পাঠাতে হবেনা।

৪ঠা জুলাই

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, জম্মনিরাপত্তা এবং জনজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার পরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ আনন্দমার্গ এবং ভার সংশ্লিষ্ট সংগঠন সমূহ জামাতে-ইসলামী, এবং বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠীদের বে-আইনী ঘোষণা করেছেন।

প্রাকৃত

বাসুদেব দেব

ঘামপঙ্ক হাই তোলা পিঠের ঘামাচি রোমশ উচ্ছ্বাস
সব নিয়ে পুরুষ ক্রমশ যায় অন্ধকার প্রকৃতির দিকে
একাকী নারীর আত্মপীড়নের খেলা ভেদ করে
কুয়াশার কাঁদে ধরা বুলন্ত চাঁদের ঠিক নিচে
বাস্তবসম্মত প্রোট কানে বিড়ি চলে আসে শরীরের টানে

ঘাসের বিছানা থেকে জ্যোৎস্নার মশারি সরিয়ে
মাঝরাতে বেদনার মত জাপে সেই অন্ধকার
স্টেশনে ঘুমিয়ে থাকে লাল উর্দি খুলে রেখে পাশে
উঁচু পুলে হাওয়া খেলে তারাদের ট্রেন থেকে নীল
আলোর সঙ্কেত কারা ক্রমাল ওড়ায় ফিকে স্বপ্নের ভিতর

গুদামের পিছে

বাস্তব সম্মত বেশী পেটেখিদে চলে আসে শাস্ত নিয়মে।

প্রভু

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

লিফটে চড়ে উঠে যাই বত্রিশ তলায়
এসকালেটেরে করে নেমে যাই পাতালের টিউব স্টেশনে
সমতল থেকে ক্রান্ত পর্বতে পৌঁছাই
ফিউনিকুলারে ।
অনায়াস ক্ষিপ্ৰতায় সিঁড়ি না ভেঙেও
গন্তব্য যে সহজ-সম্ভব ।

অথচ এখন মনে পড়ে
মাত্র যদি আঠারটি সিঁড়ি ভেঙে সেদিন যেতাম
...না থাক, সে সব পুরোনো কথা ভেবে
হে প্রত্নতাত্ত্বিক বলো—লাভ আছে কী গবেষণায় !

বাইরে বরফ পড়ে এখানে প্রবাসে বড় শীত
কোথায় পদ্মের পাতা, মালতীলতার ফুল দোলে !
কখনো কি ছুলেছিল—হায় !
হে প্রত্নতাত্ত্বিক বলো—লাভ আছে কী গবেষণায় !

বিধ্বস্ত দশকের স্মৃতিতে

বিজয়কুমার দত্ত

দশটি ক্যালেন্ডার থেকে, শুধু লাল অক্ষরের
নরম আলস্তভরা ছুটির সকাল
তোমার পায়ের কাছে করেছি উজাড়—
করণ দাক্ষিণ্যে তুমি সমস্ত সংশয়
দূর করে, দিয়েছ আমায়
ঘরে ফেরা স্বদেশ-রক্ত, গ্রানির সম্মোহ ঘেরা, ওই
ধূলি-সমকীর্ণ পথ, গোধূলি বেলায়।

দশটি ক্যালেন্ডার থেকে হাজার হাজার দীর্ঘ দিবস-রজনী
একে একে অস্থি-মাংসে। বাঁকানো মজ্জায়
অভ্যাস স্বভাবে শুধু করেছি সঞ্চয়—
ঘন কালো অক্ষরের সমারোহে জেনেছি অক্ষের
হাত বাঁড়ানো ব্যাকুলতা সমস্ত যৌবন,
আমাকে অন্ততঃ তুমি ঘুমের আবেশে নীল, অগ্নির নিবিদ্ধ দেশে, ফিরিয়ে দিয়ে যাও।
সেই লাল অক্ষরের ফেনিলতা, রঙীন স্মারক ঝাঁজে মেশা
চৈতন্তের ধারালো উদ্ভাস।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শিক্ষার ক্রমনিকাশ

শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

তথ্যানুসন্ধান পত্র

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত প্রশ্নমালা পাঠান হয়েছিল : —

প্রশ্নমালা

১. বিদ্যালয়ের নাম.....
২. বিদ্যালয়ের নমুনা—উচ্চবিদ্যালয় / উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় / শিক্ষণ কেন্দ্র :—
৩. শিক্ষণীয় শিল্পের নাম : (ক) (খ) (গ)
৪. সময়.....

শিল্প	প্রতি সপ্তাহে হাতে কলমে কাজের ক্ষমতা নির্ধারিত সময়	প্রতি সপ্তাহে বিষয়বস্তু শিক্ষার ক্ষমতা নির্ধারিত সময়	শিক্ষণ কালের সময়	সমস্ত বৎসরে শিক্ষার নির্ধারিত সময়	
				প্রাকৃতিকাল	খিওরি
দারুশিল্প					
বয়ন শিল্প					
অন্যকোন শিল্প					
ক.					
খ.					

৫. কাঠের কাজের বেঞ্চের সংখ্যা.....
 ৬. তাঁত ও চরখার সংখ্যা.....
 ৭. একটি শিল্প শ্রেণীতে সর্বাধিক ছাত্র সংখ্যা.....
 ৮. একটি শিল্প শ্রেণীতে সর্বনিম্ন ছাত্র সংখ্যা.....
 ৯. উল্লিখিত শ্রেণীতে শিল্প শিক্ষা দেওয়া — হইতে — পর্যন্ত
 ১০. শিল্প শিক্ষকের যোগ্যতা বিষয়ানুসারে
- ক. দারুশিল্প

১৩৮ জয়ন্তী, আষাঢ় ১৩৮২

খ. বয়নশিল্প

গ. অস্ত্রাশ্র শিল্প

১১. শিক্ষকের বেতন

১২. অস্ত্রাশ্র তথ্যাদি

(ক) যন্ত্র ও উপকরণাদি : পূর্ণরূপে উপকরণ সম্পন্ন/আংশিকরূপে উপকরণ সমূহ ইত্যাদি

(খ) উপকরণ দ্রব্যের সংখ্যা : (১) (২) (৩)

(গ) ব্যবহৃত দ্রব্যাদি :

(১) কাঠের নমুনা

(২) বিভিন্ন ধরনের আঁশ (বয়ন)

১৩. প্রতি বৎসরে দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ :—

(ক) দারুশিল্প.....টাকা / বয়ন শিল্প.....টাকা / অস্ত্রাশ্র শিল্প.....টাকা

১৪. পরীক্ষা গ্রহণের রীতি.....বাৎসরিক/ষাণ্মাসিক

১৫. যদি কোন ধারাবাহিক কার্যবিবরণী রক্ষা করা হয় তবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

১৬. অথবা যে কোন তথ্য . . .

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছিল ; বিদ্যালয়গুলিতে শিল্প শ্রাবতিত হয়েছে কিন্তু সেখানে শিল্পের শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই দেওয়া হয়। হাতে কলমে কাজ একেবারেই শেখান হয় না। এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে হাতে কলমে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে নেই, শিল্প শিক্ষার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতির অভাব। শিল্প শিক্ষককে সেই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের অস্ত্রাশ্র শিক্ষণীয় বিষয় শেখাতে হয়। এই রকম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে কত তা সঠিক জানবার উপায় নেই। সে উদ্দেশ্যে মুদালিমের কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কারের সুপারিশ করেছিলেন শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সন্তুষ্ট : এখনও অনেকেই বুঝতে পারেন নি। কিন্তু যে সকল তথ্যানুসন্ধান পত্রের উত্তর পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে এখানে শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

সেলাই

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে হাতের কাজকে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হিসাবে গ্রহণ করবার পরিকল্পনা বহুদিন ধরে করা হলেও তা সফল হয়ে উঠতে পারছে না। এ

অসাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে ক্রটি পূর্ণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রেই এই ক্রটি দেখা যায়।

সাধারণতঃ মেয়েদের স্কুলগুলিতে সেলাইও ছাঁটকাটকে হাতের কাজের স্থান দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রায় কোন স্কুলেই সেলাই শেখাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

১। প্রাকটিকাল : যে কোন শিল্পই হাতে কলমে শিখতে বা শেখাতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই প্রতিটি শ্রেণীর জম্ম সপ্তাহে একটা করে পিরিয়ড সেলাইয়ের জম্ম দেওয়া হয়। কাজেই এই সমস্ত স্কুলে সেলাই এর ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য দেখা যায় না। অবশ্য কয়েকটি স্কুলে এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে প্রতিটি ক্লাসের জম্ম সপ্তাহে তিনটি বা চারটি করে পিরিয়ড হাতের কাজের জম্ম দেওয়া হয়। এই রকম গুরুত্ব প্রতিটি বিদ্যালয়েই দেওয়া প্রয়োজন।

২। থিওরি : হাতে কলমে কাজ শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের সেলাই এর বিষয় বস্তু সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বলা বাহুল্য এই বিষয়টি প্রায় প্রতিটি স্কুলেই অবহেলিত হচ্ছে। কোন কোন স্কুলে একটা করে পিরিয়ড এর জম্ম বরাদ্দ করা হলেও অধিকাংশ স্কুলে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই।

৩। সময় : সাধারণ পাঠ্য বিষয় অপেক্ষা যে কোন শিল্প শিখতেই বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। সেলাই এর ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। মাত্র ৪০ অথবা ৪৫ মিনিটের পিরিয়ডে এই কাজ করা যায় না। এক সঙ্গে দেড় অথবা দু'ঘণ্টা কাজ করার পর ছাত্রীরা কিছু শিখতে পারে। এই দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

৪। ছাত্রীসংখ্যা : পশ্চিম বঙ্গে স্কুলের সংখ্যা কম হওয়ায় প্রতিটি স্কুলেই ছাত্রী সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। অধিকাংশ শ্রেণীতেই ছাত্রী সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ জনের মত। একজন শিক্ষিকার পক্ষে এক পিরিয়ডের মধ্যে সমস্ত ছাত্রীদের সেলাই শেখান কখনওই সম্ভব হয় না। প্রতিটি ছাত্রীর জম্ম দু'মিনিট করে সময় দিলেও অন্ততঃ পক্ষে ৮০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন। সময় বাড়ান সম্ভব না হলেও ছাত্রীদের ছোট ছোট ভাগ করে দিয়ে সেলাই শেখান যেতে পারে। এক ক্লাসে কুড়ি জনের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৫। শ্রেণী : ঠিক কোন শ্রেণী থেকে কি ধরনের হাতের কাজ শেখান যেতে পারে সেলাই শেখান কোন শ্রেণী থেকে আরম্ভ করা প্রয়োজন এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ—মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিবেচনা করে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কম পক্ষে কি কি টেকনিকের কতখানি কাজ শিখবে তাও স্থির করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

৬। শিক্ষিকা : শিক্ষিকার শিক্ষাগত যোগ্যতাও সমস্ত স্কুলে সমান দেখা যায় না। কোন কোন স্কুলে সেলাই-এ শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষিকাই নিয়োগ করা হয় কিন্তু এমন স্কুলের দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে বি এ পাশ করা শিক্ষিকাই সেলাই শেখান, সেলাই সম্পর্কে তিনি মোটেই শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। ফলে এই সমস্ত স্কুলে সেলাইর কাজে সাফল্য আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই বিষয়েও শিক্ষা পরিষদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

৭। বেতন : কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষিকাদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হয় না। যা দেওয়া হয় তা দিয়ে নিম্নতম উপায়েও জীবন ধারণ করা যায় না। যে সমস্ত বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের বেতনের হার সর্বত্র সমান নয়, প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই ১১৫/- থেকে আরম্ভ করে ১৫০ টাকা ১৬০/- বা ১৮৫/- বেতন দেওয়া হয়। একটি বিদ্যালয়ে ১২৫/- থেকে আরম্ভ করে ২০০ টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে এর চেয়েও কম মাত্র ৬০ টাকা দেওয়া হয়। এই বিষয়ে বিবেচনা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের এই জ্ঞাত একটি নিয়ম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেলাই-এ শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষিকাদের অন্ততঃ গ্রাজুয়েট স্কেল দেওয়া উচিত।

৮। উপকরণ : অধিকাংশ স্কুলেই উপকরণের একান্ত অভাব দেখা যায়। যা থাকে তা ছাত্রী সংখ্যানুযায়ী সামান্য। যে কোন স্কুলেই সাধারণতঃ দেখা যায় ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সেলাই শেখানো হয় এবং প্রতিটি শ্রেণীতেই ছাত্রী সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ পর্যন্ত থাকে। স্কুল সমস্ত ছাত্রীদের ছাঁট কাট বা সেলাই শেখাবার জন্য মাত্র এক বা দুই এর বেশী মেশিন থাকে না। এই অবস্থায় কখনওই ভাল করে কাজ শেখান সম্ভব নয়। কাজেই কোন স্কুল থেকেই এমন কোন নির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না। যার সাহায্যে জানা যেতে পারে যে মেয়েদের কি কি জিনিস তৈরী করতে শেখান হয়।

৯। ব্যায় : সেলাই শেখানর জন্য বছরে কত টাকা খরচ করা উচিত তারও কোন নির্দিষ্ট হার না থাকায় এক একটি স্কুলে এক এক রকম খরচ হয়। একটি স্কুলে যেখানে প্রায় ১৫০০/- ব্যায় করা হচ্ছে, সেখানে কোন কোন স্কুলে মাত্র ২০/-২৫/- ব্যায় করা হচ্ছে। আবার কোন কোন স্কুলে এই শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কোন খরচই হয় না। এই ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১০। কার্যবিবরণ : প্রত্যেকদিন মেয়েরা কতটুকু সেলাই এর কাজ শিখল তার বিবরণী প্রায় কোন স্কুলেই নিয়মিত রাখা হয় না।

১১। পরীক্ষা : প্রায় কোন স্কুলেই মেয়েদের সেলাই সম্পর্কিত জ্ঞানকে যাচাই করবার জন্য কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে মেয়েদের জ্ঞানের যথার্থ মান নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

দৈনন্দিন কাজের সুপরিকল্পিত রেকর্ড কোন বিদ্যালয়েই রাখা হয় না। দৈনন্দিন কাজের নির্ভর যোগ্য রেকর্ড রাখা হলে পরীক্ষার প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিল্পের ক্লাস পরিদর্শনের জন্য অন্ততঃ প্রতি জেলায় একজন করে পরিদর্শিকা বা ইন্সপেক্ট্রিস থাকার নিত্যস্থ বাঞ্ছনীয়।

চামড়ার কাজ

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চামড়ার কাজকে হাতের কাজের স্থান দেওয়া হয়েছে এটি একটি লাভজনক শিল্প। কাজেই ভালো করে আয়ত্ত্ব করতে পারলে ছেলে-মেয়েরা ভবিষ্যতে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রেও সুবিধা করতে পারবে। অবসর বিনোদনের জন্য এই রূপ শিল্পকে উপযুক্ত স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু নানা কারণে কোন স্কুলেই ভাল করে এই শিল্পটি শেখাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

১। পিরিয়ড ও সময় : হাতের কাজ শেখাবার জন্য বই পড়ার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হাতে কলমে কাজ শেখান, কারণ মাত্র বই পড়ে কোন শিল্প সম্পর্কেই যথার্থ জ্ঞান হতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই দেখা যায় যে হাতে কলমে কাজ শেখার চেয়ে বই পড়ার কাজই বেশী হয়। প্রায় স্কুলেই প্রত্যেকটি ক্লাসের জন্য সপ্তাহে একটা করে পিরিয়ড হাতে কলমে কাজ শেখাবার জন্য দেওয়া হয়। পিরিয়ডগুলি প্রায় ৪৫ মিনিটের হয়। ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় কিছুই শেখান সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে একাধিক পিরিয়ডও ব্যবস্থা করেন কিন্তু পিরিয়ডগুলির বিস্তার কাল অল্প হওয়ায় সেখানেও প্রায় কিছুই হয় না। এমন স্কুলের দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেখানে আদৌ হাতে কলমে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা নেই। বস্তুতঃ পক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে ব্যবস্থা করা উচিত।

২। ছাত্রসংখ্যা : প্রায় প্রতিটি স্কুলের অধিকাংশ ক্লাসেই ছাত্রের সংখ্যা মাত্রাধিক হয়। বেশীর ভাগ ৩৫ থেকে ৫০ জন ছাত্র থাকে। আবার কোন কোন স্কুলে এর চেয়েও বেশী দেখা যায়। একটি স্কুলে একটা হাতের কাজের ক্লাসে প্রায় ৫০০ ছাত্রের হিসাব পাওয়া যায়। অথচ এই বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়েকে হাতের কাজ শেখাবার জন্য মাত্র একজন শিক্ষকই নিযুক্ত হন। ফলে হাতের কাজ শেখাবার কাজ যথার্থ সাফল্য লাভ করতে পারে না।

৩। শিক্ষক : চামড়ার কাজ শেখাবার জন্য স্কুলে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন তাঁরা প্রায় কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে শিক্ষণ লাভ করেছেন। কিন্তু বেশীরভাগই সাধারণভাবে বিশেষ

শিক্ষা গ্রহণ করেননি। কিন্তু যেহেতু তাঁদের ছেলে মেয়েদের খিওরি ক্লাসও নিতে হয় সেই জন্য অন্ততঃ পক্ষে ম্যাট্রিক পাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু লেখাপড়া জানা না থাকলে ছাত্রদের ভাল করে পরিচালনা করা যায় না।

৪। বেতন: কোন কোন স্কুলে চামড়ার কাজের শিক্ষকদের বেতন মোটামুটি ভাল দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই বেতনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে সমস্ত স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষককে মাত্র ৬০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। অবশ্য তিনি বিশেষভাবে পার্টটাইম শিক্ষক হিসাবেই নিযুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য স্কুল শিক্ষকদের ৮০ থেকে ১৫০ অথবা ১৬০ বেতন দেওয়া হয়। একটিমাত্র বিদ্যালয়ে ১৬০ থেকে ২৯৫ টাকা বেতন দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ থেকে কোন নির্দিষ্ট বিষয় প্রচলিত না হওয়ার ফলে বেতনের হারের এই তারতম্য দেখা যায়। এই বিষয়ে পরিষদের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

৫। উপকরণ: অধিকাংশ স্কুলেই উপকরণের বিশেষ অভাব দেখা যায়। বিপুল ছাত্র সংখ্যামুযায়ী ঐ উপকরণ অত্যন্ত সামান্য। মাত্র একটা স্কুলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে আবশ্যিক সমস্ত উপকরণই চামড়ার কাজ শেখাবার জন্য রয়েছে।

৬। ব্যয়—চামড়ার কাজ যদিও একটা লাভবান শিল্প কিন্তু অত্যন্ত ব্যয় বহুল। এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। কোন স্কুলে ১০০।১৫০ টাকা, আবার কোন স্কুলে ২৫০ টাকা এর জন্য ব্যয় করা হয়। কোন কোন স্কুলে এর চেয়েও বেশী প্রায় ১১০০ ব্যয় করা হয়। কিন্তু এমন স্কুলের অভাব নেই যেখানে মোটেই অর্থ ব্যয় করা হয় না। বস্তুতঃ পক্ষে এই সমস্ত স্কুলে কোন কাজই করা সম্ভব হয় না অত্যধিক ছাত্র সংখ্যার জন্য।

৭। প্রাপ্ত জ্ঞান—অধিকাংশ স্কুলেই ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত চামড়ার কাজ শেখান হয়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েরা কি তৈরী করতে শিখল তার হিসাব অনেক স্কুল থেকেই পাওয়া যায় না। আবার অনেক স্কুলে নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিস তৈরী করতে শেখান হয়, যেমন চামড়ার বেগ, ব্যাগ, চশমার খাপ ইত্যাদি। যদি সমস্ত স্কুলেই চামড়ার কাজের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য সূচী রাখা হয় তবে এই ক্ষেত্রে সমস্ত স্কুলেই সাফল্য দেখা যেতে পারে।

৮। পরীক্ষা—সমস্ত বছরে ছেলে মেয়েরা কি প্রাপ্ত করতে শিখল তাদের সেই জ্ঞানকে পরিমাপ করার জন্য কোন কোন স্কুলে বার্ষিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন স্কুলে আবার বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।

৯। রেকর্ড—যে কোন হাতের কাজের মত কার্যাবলীর হিসাব রাখা প্রয়োজন। এর সাহায্যেও ছাত্রদের জ্ঞানের মান, উন্নতি অবনতির হিসাব করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত চুঃখের বিষয় এই দিকে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষই সচেতন নন। প্রায় কোন স্কুলেই এই ধরনের হিসাব রাখার ব্যবস্থা নেই।

ধাতব শিল্প

পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে কেবলমাত্র কারিগরী বিভাগ জগু ছেলেদের ধাতব শিল্প সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়ার পথ খোলা আছে। নিঃসন্দেহে এজাতীয় হাতের কাজের শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং লাভজনকও বটে। কিন্তু এই রকম হাতের কাজ খুব কম স্কুলেই শেখান হয়।

১। পিরিয়ড—ধাতুর কাজ শেখাবার জগু সপ্তাহে আটটি পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিরিয়ডের সংখ্যাবুযায়ী এই সময় নেহাৎ কম না হলেও একই সময়ে হাতে কলমে কাজ শেখাতেও খিওরি ক্লাস করতে হয়, ফলে কোন কাজই ভাল ভাব ছাত্রদের শেখান হয় না। যেহেতু কেবলমাত্র কারিগরী বিভাগ জগুই এই শিল্পটি শেখান হয়। সেইজগু হাতে কলমে কাজ শিখবার সুযোগ ছেলেদের বেশী করে দেওয়া প্রয়োজন।

২। সময়—অগ্ণাশু শিল্পের মত ধাতব শিল্পের জগুও মাত্র ৪০ মিনিটের পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন রকমেই ধাতুর কাজ শেখা সম্ভব নয়। এর জগু আরও বেশী সময় করা প্রয়োজন।

৩। ছাত্রসংখ্যা—অগ্ণাশু হাতের কাজের ক্লাস অপেক্ষা এই হাতের কাজের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা অনেক কম থাকে। এক একটি ক্লাসে আঠারোজন করে ছাত্র থাকায় শিক্ষকের পক্ষে মোটামুটিভাবে সকলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কোন হাতের কাজের ক্লাসেই কুড়িজননের বেশী ছাত্র থাকা উচিত নয়। তবে শিক্ষকের পক্ষে যথার্থভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না।

৪। শ্রেণী—প্রায়ই নবম দশম ও একাদশ শ্রেণীতে ধাতুর কাজ শেখান হয়। যদিও ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে এই কাজ শেখা কিছু কঠিন তবু সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণী থেকে এই কাজ শেখান যেতে পারে। যে কোন কাজই ছেলেমেয়েদের এমনভাবে শেখান প্রয়োজন যাতে পরবর্তী জীবনে তারা স্বনির্ভর হয়ে কাজ করতে পারে এবং এই জগু শিক্ষণ কালও সামান্য দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন। মাত্র দু'তিন বছরে কোন হাতের কাজই স্বনির্ভর হয়ে করবার মত শেখা যায় না। অতএব এই বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা প্রয়োজন।



৫। শিক্ষক—শিক্ষক নিয়োগের সময় কতৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু আছে, সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান যথেষ্ট না থাকলে ছাত্রদের শেখানোর কাজ যথার্থভাবে হতে পারে না। নিযুক্ত শিক্ষককে অবশ্যই নির্দিষ্ট শিল্প সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষাজ্ঞান করতে হবে। খাতব শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের সময় মোটামুটি ভাবে এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

৬। বেতন—অগ্ণাশু শিল্প শিক্ষকদের মত খাতব শিল্প শিক্ষকের বেতনও সামান্য। ৭০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা বেতন দেওয়া হয় সঙ্গে ৪৫ টাকা D. A.। এই স্বল্প বেতনে বর্তমান যুগে কোন ব্যক্তির পক্ষেই জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাপূর্ণিমেন্টান সম্ভব নয়। উপযুক্ত বেতন বা দক্ষিণা না পাওয়ার ফলেই শিক্ষকদের নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও অবহেলা জন্মে, পরিণামে শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে সরকার ও শিক্ষা বিভাগের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

৭। উপকরণ—উপকরণ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্র সংখ্যাও বেশী না হওয়ার ফলে অগ্ণাশু শিল্প অপেক্ষা এই ক্ষেত্রে উপকরণের অভাব কম দেখা যায়।

৮। প্রস্তুত সামগ্রী—সমস্ত বছরে ছেলেরা কি কি জিনিস প্রস্তুত করতে শিখল তার মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নিম্ন প্রয়োজনীয় জিনিসই প্রস্তুত করতে শেখান হয়। যেমন বর্টু, নটি ইত্যাদি। খাতব পাতের কাজ (Sheet metal work) অনায়াসে স্কুলে প্রবর্তন করা যায়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে এই শিক্ষার ফলে ছেলেরা উত্তর জীবনে লাভবান হতে পারে।

৯। যন্ত্র—খাতব শিল্পের কাজ করবার জন্ত কি ধরনের কতগুলি যন্ত্রের প্রয়োজন হয় সেই সম্পর্কে কোন তালিকা না পাওয়ার ফলে এই বিষয়ে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়।

১০। ব্যয়—এই শিক্ষা বাবদ বৎসরে কত কত ব্যয় হয় সেই সম্পর্কেও কোন নির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না।

১১। পরীক্ষা—ছেলেদের পরীক্ষার মান ও জ্ঞান যাচাই করবার জন্ত বৎসরে দু'বার পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এজাতীয় পরীক্ষার সাহায্যে হাতের কাজের যথার্থ মান নির্ণয় করা যায় না। এর জন্ত দৈনন্দিন কার্যক্রমের হিসাব রাখাই প্রয়োজন। তার থেকেই সহজে বোঝা যায় যে কোন ছেলে কতটুকু বা উন্নতি অবনতি করেছে, কতটুকু কাজ সে শিখেছে। কিন্তু প্রায় কোন স্কুলেই এই জাতীয় রেকর্ড বা হিসাব রাখার ব্যবস্থা নেই।

(ক্রমশঃ)

লৈখ্য সংখ্যার পর

বিপ্লব-যুগের এক বলক

নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

পুলকেশ দে সরকার

হে কানাই, হে সত্যেন্দ্র

৭ই সেপ্টেম্বর আবার এপ্রভার হত্যার মামলা শুরু হল। কিন্তু তার আগে বন্দী সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থক উকিল বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু একটি আবেদনপত্র পড়ে শোনালেন :

হে ধর্মাবতার, এই অধীনকে আলিপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডবলিউ এ মার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা বলে ১লা সেপ্টেম্বর দায়রা সোপর্দ করেছেন।

সোপর্দাদেশটি আলিপুরের মিঃ সি পি বিচক্রফট পেয়েছেন এবং নথিভুক্ত করে গুনানীর জন্ম ১৪ই সেপ্টেম্বর দিন ফেলেছেন; ফৌজদারী কার্যবিধির ৩২৬ ধারা বলে জুরীদের নামে সমন জারি করেছেন।

এরপর ধর্মাবতার মামলাটি অতিরিক্ত দায়রা জজের ফাইল থেকে নিজের ফাইলে তুলে এনেছেন এবং তারিখ বদলে ১৪ই থেকে ৭ই করেছেন; স্থির করেছেন এর বিচার আপনিই করবেন।

আইনে কিন্তু এমন কোন বিধান নেই যে একজন দায়রা জজ আর একজন দায়রা জজের

আখ্যাত ৮২—৩

ফাইলভুক্তির পর সেই মামলা তুলে আনতে পারেন।

আবেদনকারী জানতে পেরেছেন যে, অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বিচক্রফট জেলার সাধারণ দায়রা আদালতের মতই অন্য একটি মামলার বিচার করছেন এবং একই দিনে আরও দু'জন দায়রা জজ একই দায়রার মামলা গুনছেন; এটি অবৈধ।

এই অবস্থায় ধর্মাবতারের এই মামলা বিচারের প্রক্রিয়ার নেই; আবেদনকারী তাই তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, অতিরিক্ত জেলা জজ দিন ধার্য করে এই মামলা করুন।

সরকারী উকিল তখন ফৌজদারী কার্যবিধির ৯২৮ ও ৩২৬ ধারা পড়ে শোনান এবং বলেন যে, আদালতের উভয়াধিকার আছে। কোন মামলা সোপর্দ করলে ধর্মাবতারের প্রক্রিয়ার বিনষ্ট হয়না।

জজ সরকারী উকিলের মতেই সায় দেন।

এরপর পেস্কার কানাইলাল দত্তকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পড়ে শোনান : কানাইলাল দত্ত

১৯০৮ এর ৩১এ আগষ্ট নাগাদ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নরেন্দ্রকে গুলী করে হত্যা করেছেন।

কানাইলাল : আমার যা বলার তা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেছি, আর কিছু বলতে আমি রাজী নই।

এরপর সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনানো হ'ল।

আদালত : আপনি দোষী, না, নির্দোষ ?

সত্যেন্দ্রনাথ : নির্দোষ।

আদালত (কানাইকে) : আপনি কি উকিল চান ? আইন মতে আপনার পক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। (কানাই কোন উকিল দেননি)।

এরপর জুরী স্থির হ'ল এবং জুরী হলেন মিঃ অসলি, মিঃ এইচ নিকেলস, বাবু আশুতোষ দত্ত, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, বাবু বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য এবং বাবু শশীভূষণ মুখার্জী।

জজ জুরীদের নিয়ে জেলের ঘটনাস্থল দেখতে চললেন ; উকিলরাও গেলেন। আধঘণ্টা পর সবাই ফিরে এসে বসলেন।

বাবু আশুতোষ বিশ্বাস বললেন, অভ্যস্ত গুরুত্ব-পূর্ণ এই মামলা। আসামীদের বিরুদ্ধে, হত্যায় সহায়তা ও প্ররোচনা এবং কয়েদী হিগিন্স-লিটনকে জখম করবার অভিযোগ রয়েছে। আমি শুধু বলতে চাই যে, সেই-মামলারই হত্যা করেছে বলা হয় যে, কোন ব্যক্তিকে মারবার অভিপ্রায়েই ঐ কাজ করে ; এবং এই সময় যারাই উপস্থিত থাকে তারাই

ঐ অপরাধে ছুট হয়, কে এই অপরাধ করেছে জানা না গেলেও। একটি বিষয় মাত্র স্থির করতে হবে, ঐরা এই অপরাধে সংশ্লিষ্ট কি না। বন্দীরা আরও একটি মামলায় জড়িত আছেন ; সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তমের।

মিঃ এ সি ব্যানার্জি আপত্তি জানিয়ে বলেন : মামলা এখনও বিচারার্থীন এবং যার কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি আমি জানিনে বন্ধুবর তাঁর উল্লেখের অধিকারী কিনা।

আশুবাবু : আমার মন এর দ্বারা প্রভাবিতও হয়নি। মনে কোন বন্ধমূল ধারণাও হয়নি অথবা এর দ্বারা আমি জুরীদের বা ধর্মাবতারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইনে, তাঁদের মনে কোন ধারণাও সৃষ্টি করতে চাইনে। যিনি মারা গেছেন তিনি ঐ মামলার আসামী ছিলেন, প্রাক-সোপর্দ তদন্তে তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছিল।

আদালত (আশুবাবুকে) আপনি সোপর্দপত্রের নকল দাখিল করতে পারেন।

আশুবাবু : ৩১এ তিনি যেমন থাকেন তেমনই ছিলেন আলিপুর জেলের ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারে। ২৯এ আগষ্ট সত্যেন্দ্র তাঁর কাছে খবর দেন যে, তিনি স্বীকারোক্তি করবেন এবং সে জন্ত তিনি নরেন্দ্র গোসাঁই'র সঙ্গে দেখা করতে চান। হিগিন্স একথা জানতে পেরে গোসাঁইকে জেল হাসপাতালে দেখা না করবার জন্ত সতর্ক করে দেয়। ৩১এ আগষ্ট সত্যেন্দ্রনাথ অরূপ নামে এক বয়েদী মারকৎ খবর পাঠান; অরূপ নয়নকে না পেয়ে চিঠিটা হিগিন্সের

কাছে রেখে আসে। পরে নরেন তাঁকে দেখতে যান এবং হিগিন্সকে অমুরোধ করেন সত্যোজ্ঞকে নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু সত্যোজ্ঞ ছিলেন না ব'লে হিগিন্স ফিরে এসে জানায় যে, সে কানাইলাল দত্তকে বারান্দায় দেখেছে। নরেন তখন সেখানে যান ও কানাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। এমন সময়ে সত্যোজ্ঞ আসেন এবং একটা খাটে বসেন। হঠাৎ হিগিন্স দেখতে পায়, গোসাঁই টেঁচিয়ে উঠে ছুটছে এবং সেই সময় কম্পাউণ্ডার গুলিতে পান একটা গুলীর শব্দ। তিনি জেলারকে খবর দেন। জেলার তক্ষুণি এগোন এবং দেখতে পান হিগিন্স গোসাঁইকে আগলাতে চেষ্টা করছে; এমন সময় একটা গুলী হিগিন্সের হাত ভেদ করে যায়। এরপর কানাই ও নরেনে ধ্বস্তাধ্বস্তি স্রষ্ট হয়; গুলী চলে। নরেন গোসাঁই উঠে পড়তে সমর্থ হয় এবং আত্ননাদ তুলে হিগিন্সের সঙ্গে সিঁড়ি ধরে ছুটতে থাকেন। তাদের ঠিক পেছনেই কানাই একটা রিভলভার হাতে আসতে থাকেন। ইতিমধ্যে লিটনে-সত্যোজ্ঞে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। লিটনেও কানাইর গুলী করার শব্দ শোনে। সে নরেন্সকে রক্তাশ্লুত অবস্থায় দেখতে পায়। সেই সময় কানাই গুলী করেন, নরেন্স পড়ে যান; কানাই নরেন্সকে গুলী করতে দেখেন।

মিঃ ব্যানার্জি : স্মার, এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

আদালত আশুবাবুকে সংক্ষেপ করতে বললেন। আশু বললেন, নরেন তক্ষুণি মারা গেলেন; তাঁর

শেষ জবানবন্দী নেবার অবকাশ পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের সময় শরীরে গুলী পাওয়া যায়। একটা ক্ষত হয়েছে গুলী ভেদ করে যাওয়ায়, আর একটা পেটের সামনে ও পেছনে। সিভিল সার্জেন ক্যাপ্টেন ডালি হিগিন্সের জখম দেখেছেন, গুলীর চিহ্ন। আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট খবর পেয়ে ব্যাপারটা হাতে নেন এবং তদন্ত করে বন্দীদের দায়রা সোপর্দ করেন। মিঃ বার্জি ৪টি কার্তুজের খোল পান, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ব্ল্যাক পান ৫টি কার্তুজের খোল, একটা তাক্সা কার্তুজ। তল্লাসী করে আলমারীতে দুটি বুলেট পাওয়া যায়। দেখতে হবে ওগুলো বড় রিভলভার থেকে বের করা কার্তুজের মতই কি না।

অতঃপর তিনি একটা বড় একটা ছোট রিভলভার দাখিল করেন।

আশুবাবু বলেন, আর অশ্রান্ত বিচার্য বিষয় হচ্ছে : বন্দী হু'জ্জন হত্যার আপে পরামর্শ করেছিলেন কি না। হু'জ্জন বন্দীর মধ্যে কে মরণাস্তিক গুলীটা করেছেন। যদি তা না স্থির করা যায় তবে হু'জ্জনকেই হত্যার জন্ম দায়ী করতে হবে।

সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা

এর পর সাক্ষীদের জবানবন্দী আরম্ভ হ'ল।

শ্রামাচরণ নন্দী বললেন, আমি একজন ড্রাফট-ম্যান (নজ্জাকার), আপে পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। আমি জেলের কতকাংশেব

নজ্জা টেনে দি। ডাঃ বৈজ্ঞান্য চ্যাটার্জি ও মিঃ লিট্টন আমাকে জায়গাগুলো দেখিয়ে দেন। আমি তদনুসারে নজ্জার চিহ্ন দিয়েছি। আমি ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার ও হাসপাতালের দোতারাটাও দেখিয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট বার্গির জবানবন্দী

এল বার্গি : আমি আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। আমি বন্দী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দেখেছি। ষড়যন্ত্র মামলাসূত্রে প্রথম আমি এঁদের কথা জানতে পারি। তাঁদের দু'টি দলে ভাগ করা হয়েছে। কানাইলাল প্রথম, সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় দলের। আমি নরেন গোসাঁইকে জানি। সে প্রথম দলের আসামী ছিল। প্রথম দলটিকে ৪ঠা আমার কাছে হাজির করা হয়; ১৮ই মে প্রাক্সোপর্দ তদন্ত করি। আমি নরেন্দ্রকে ক্ষমা করেছি এবং প্রথম দলের রাজসাক্ষী রূপে ২৪এ মে তার সাক্ষ্যও নিয়েছি।

আশুবারু : আমি নরেন্দ্র গোসাঁইর সাক্ষ্য দাখিল করছি।

মিঃ ব্যানার্জি : আমি আপত্তি জানাই

আদালত : আচ্ছা।

মিঃ বার্গি : কানাই প্রথম দলের-স্বীকারোক্তিকারী বন্দী নন। প্রথম দলটি ১৯এ আপষ্ট দায়রা সোপর্দ হয়। আমি ২৪ তারিখ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য নেওয়া শুরু করি।

আদালত : দ্বিতীয় দলে নরেনগোসাঁইকে ক্ষমা করা হয়েছে কি ?

আশুবারু : না, স্তার।

মিঃ বার্গি : মিঃ উইদালের (Withal) এক আবেদনের ওপর আমি ২৬ তারিখে সত্যেন্দ্রের উপস্থিতিতে জেলে নরেন্দ্রকে দেখবার অনুমতি দি। আমি এই রকম একটা আদেশ দিয়েছিলাম মনে পড়ছে : আলিপুর জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্যবস্থা করবেন। নরেন্দ্রকে ক্ষমা করার পর তাকে জেলখানায় আটক রাখা হয়। ৩১এ সকালবেলায় আমি ৭টা নাগাদ শুনি, নরেন্দ্রকে জেলে গুলি করে মারা হয়েছে। একথা শুনে আমি জেলারের অফিসে যাই। তখন ৮টার কাছাকাছি। ওখানকার একটা টেবিলে দু'টো রিভলভার দেখি। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ক্লার্ক আমার সঙ্গে ছিলেন। মিঃ ক্লার্ক আমার হুমুখে একটা তাজা কাতুজ, বড় রিভলভারটার ৫টা কাতুজের খোল, আর ছোট রিভলভারটার চারটে কাতুজের খোল তুলে নেন। বোতলের মধ্যে যে বুলেট সেটা আমি প্রথম দেখি ডাঃ ড্যালি যখন মিঃ মারের সামনে দাখিল করেন। পরদিন আমি মৃতদেহটি দেখিনি।

জেরার উত্তরে বলেন, দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য নেওয়া এখনও চলছে। সত্যেন্দ্রকে প্রথম ২১এ জুলাই আমার কাছে হাজির করা হয়। মিঃ উইদাল আমার কাছে মৌখিক আবেদন জানান। বন্দীরা তখন কি করছিলেন বলতে পারব না। সত্যেন্দ্র ২৬এ ও ২৮এ অনুস্থ ছিলেন, এই দুদিন আদালতে আসেন নি। পিস্তল ছোটো পেয়ে আমি তক্ষুনি নাড়াচাড়া করিনি, করেছি

১৪৯ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

মিনিট পাঁচেক পর। ছোট রিভলভারটা তখন গরম ছিল না।

ইন্সপেক্টর বি কে গুপ্ত : আমি ষড়যন্ত্র মামলার কথা জানি। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সে মামলা এখনও চলছে। আমি ও স্যামুয়েল আলম সাক্ষীদের হাজির করতে সমর্থ হয়েছি। আমি নরেন্দ্র গোসাঁইকে চিনি। যে জায়গার কথা বলেছি সে জায়গা ছাড়া আর কোথাও রক্ত চিহ্ন দেখিনি। এই বুলেটের বোতলটা ওখানে পাওয়া যায়। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে ওটা দেন, আমি ওটা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাখি। পরীক্ষার সময় আমি ছিলাম না।

নরেন গোসাঁই প্রথমে ছিল প্রথম দলের অস্থায়ী আসামী ; পরে সে রাজসাক্ষী দাঁড়ায়। ৩১এ আগষ্ট যে ঘটনা হয় তা আমার মনে আছে। সকাল ৭টা কি ৮টা হবে, সেদিন খবর পাই নরেন গোসাঁইকে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে আমি আলিপুর যাই। দেখলাম নরেন গোসাঁইর মৃতদেহ। জেলের একতলায় তদন্ত-বিচার দেখলাম। দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মার অফিসে তদন্ত-বিচার চালাচ্ছেন। সকাল ১১টা নাপাদ আমি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ পেলাম তদন্ত শুরু করতে। এই আদেশ মত আমি প্রথমে জেলে ঢুকলাম, তারপর জেল হাসপাতালের ঘরে এবং ভেতরে লক্ষ্য করলাম। রক্তের চিহ্ন চলে গেছে একেবারে দক্ষিণ জানালা অবধি। ঘরের পশ্চিম দেওয়াল লাগোয়া আলমারীতে দুটি বুলেট পেলাম। বুলেট দুটো একে অপরের এক বিঘত ব্যবধানে।

বিছানার ওপরও রক্তচিহ্ন দেখলাম, ঘরের পূর্ব দেওয়ালের কাছে, গদীর সবটায়ও। বারান্দা লাগোয়া পশ্চিম দেওয়ালে গুলীর গর্ত।

জেরার উত্তরে : জেলে পৌঁছাবার আগে আমি জানতাম না কার ওপর এ মামলার তদন্ত ভার ছিল। কেউ যদি থাকতেন আমি জানতে পারতাম। আমি হিগিনেসের কাছে কি ভাবে কি হ'ল জানতে চাইলাম। সে আমাকে বলল যে, কানাইয়ের দুটো রিভলভার ছিল। খুব যত্নের সঙ্গে খোঁজখোঁজ নিলাম, গুলী দেখলাম, জেল কর্তৃপক্ষ খুব সাহায্য করলেন। আমি মোট দুটির বেশী রিভলভারের হাদিস পেলাম না। বেঙ্গল পুলিশের স্যামুয়েল আলম ছিলেন দু'দল বন্দীরই ভারপ্রাপ্ত। জেলে যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হয়েছিল আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম না।

আশুবাবু : মিঃ মার কি ভাবে তদন্ত করেছেন তা দেখবার জন্য সেই সব নথিপত্র পেশ করছি।

মিঃ ব্যানার্জি আদালতকে আর সাক্ষীর সাক্ষ্য না নৈবার জন্য অসুযোগ জানালেন, কারণ, আদালতে এসে সব কাগজপত্র পেয়েছেন ; বড্ড তাড়াহুড়ো করে মামলাটা দাঁড় করানো হয়েছে।

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ বেল (Bell) বললেন, আমি ছিলাম উপস্থিত যখন মিঃ ড্যালি নরেন গোসাঁইর দেহের ময়না তদন্ত করেন। আলিপুরের মর্গে ৩১ তারিখে এই ময়না তদন্ত হয়। দেহ থেকে গুলী বের করতে আমি দেখেছি। এই সেই গুলীর বোতল ; আমি এটি ইন্সপেক্টর বি কে, গুপ্তকে দিই।

আদালত কানাইকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোন প্রস্তাব করবেন কি না।

কানাই : না।

কয়েদী গোপাল মাইতির সাক্ষ্য

গোপাল মাইতি : আমি আলিপুর জেলের একজন মেট। গত সোমবার আমি হাসপাতালের ওপরতলার ওয়ার্ডে ছিলাম। বৈজ্ঞানিক তখন ঐ ওয়ার্ডে রোগী দেখছিলেন। সাড়ে ছ'টা কি সাড়ে সাতটার সময় আমি একটা শব্দ শুনি। আমি বাইরে এলাম এবং দেখি দুজন বাবু ও গোসাঁই বাবু ডিসপেন্সারিতে স্বস্তাস্থি করছেন। ঐ দুই বাবু এখানে আছেন। তখন সাহেব এবং চারজন ডিসপেন্সারিতে ঢুকলেন। একটা শব্দ শোনা গেল। আমি ভাবলাম বোমা বিস্ফোরণ। ডাক্তার রোগী দেখছিলেন, তিনিও ছুটে এলেন উদের সামলাতে। আমি ডিসপেন্সারি ঢুকতে বাচ্ছি এমন সময় শব্দ শুনে পিছিয়ে এলাম। আমি ডিসপেন্সারির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন ডাক্তারবাবু ডিসপেন্সারিতে ঢুকলেন। আমি শব্দ শুনলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি ভয় পেয়ে পেলাম, ডাক্তারবাবুকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এমন সময় প্রথমে বেরিয়ে এল সাহেব, সাহেব বলছে : 'হাত পেল'। আমি সেখানে দাঁড়িলাম না। আমি জেলারকে খবর দেবার জন্ত গেটের দিকে ছুটলাম। আমি গোসাঁইবাবুকে ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখিনি। আমি গেট পর্যন্ত যাইনি, তবে

জমাদার হোসেন বজ্জের সঙ্গে দেখা হল, তাকে সব বললাম। আমি যখন ফিরছি হাসপাতালে, দেখলাম গোসাঁইবাবুর গায়ে লয়েন ব্রুথ জড়ানো। এগোতে এগোতে বলছেন : "শালারা কোন্নে কি?" আমি কিছু দেখিনি। তিনি চলে গেলেন, আর আমি হাসপাতালে ঢুকলাম। হাসপাতালের দরজা খুলে দেখি ঐ বাবু (কানাই) হাতে একটা রিভলবার নিয়ে ঘুরছে। একতলার সিঁড়ির পাশে। তিনি যেই আমার কাছাকাছি এলেন, জিপপেস করলেন, গোসাঁই কোন দিকে গেছে? আমি জানিনে বলতে তিনি আমার গলার দিকে তাঁর রিভলভারটা ধরলেন এবং বললেন, গুলী করব। আমি তখন তাঁকে হাসপাতালের শৌচাগার দেখতে বললাম। আমি ছুটে ওপরতলায় এলাম। কানাই কি করলেন আমি জানতে পারিনি। আমি তাঁকে নামতে দেখলাম। আমি আর এক বাবুকে (সত্যেন্দ্রকে) দেখিনি। এমন হট্টগোল হয়েছিল যে, ডিসপেন্সারি থেকে কি পোলমাল আসছিল ধরতে পারিনি। সাহেব যখন জখম হাত নিয়ে নেমে যাচ্ছিলেন তখন কানাই বাবুর হাতে আমি পিস্তল দেখেছি। এর আগে আমি কারও হাতে কিছু দেখিনি। কাউকে গুলী করতেও দেখিনি। গোসাঁই বাবুকে দেখলাম টলছেন। আমি ডিসপেন্সারিতে গেলাম, আমি ওখানেই কাজ করি। আমি বলিনি তো যে, আমি ডাক্তার বাবুকে রক্ষা করতে ঘরে ঢুকেছিলাম, নিজেকে বাঁচাবার জন্তই বাইরে ছিলাম। আমি নিজে চোখে কানাইকে গুলী করতে দেখিনি।

১৫১ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

সরকারী উকিল সাক্ষীর পূর্বেকার বিবৃতি পাড়ে শোনান।

মিঃ বানার্জি এই বলে আপত্তি করলেন যে, সাক্ষীকে বিরুদ্ধাচারী (হোস্টাইল) ঘোষণার আগে এ রকম করা উচিত নয়।

আদালত; নিম্নতর আদালতের নথি দেখবার অধিকার দায়রা আদালতের আছে।

সাক্ষী বলল, আমি প্রথমে দেখি কানাইবাবু ও গোসাঁই বাবু ধস্তাধস্তি করছেন। এই দুই বাবুর ধুতি মাজায় বাঁধা ছিল। আর আমি কিছু দেখিনি। আমি প্রথম শব্দ শুনি। গোসাঁইবাবুর গায়ে সার্ট ছিল। কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে আমি ঠাহর করতে পারিনি। আমি বারান্দায় ছিলাম। মিনিট দুই আমি ওদের ধস্তাধস্তি করতে দেখলাম। বাবু আমাকে জিগগেস করলেন, কি হচ্ছে হে? আমি বললাম, বোমা মামলার বাবুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন। সত্যেন্দ্র আমার ওয়ার্ডে সকাল সাড়ে পাঁচটা কি ছটায় ছিলেন। আমি তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখিনি। আমি সত্যেন্দ্র নাথকে হাঁটতে দেখেছি। ওয়ার্ডটা পূর্ব দিকে দুই রশি দূরে। আমি সত্যেন্দ্রকে খুঁজে পেলাম না। হাসপাতালে যাবার মুখে আমার সঙ্গে কানাইর দেখা। হাসপাতালে ঢুকে আমি ডিসপেন্সারিতে কাউকে দেখলাম না। আমি যখন আসি তখন গোসাঁইর দেহে কোন রক্তচিহ্ন দেখিনি। তিনি টলতে টলতে যাচ্ছিলেন। আমার তাড়া ছিল বলে সাহেব কখন এসেছে দেখিনি। যখন বেরিয়ে আসছিল তখনই

প্রথম সাহেবকে দেখি, হাতের তালুটা ধরে আছে আর বাংলায় বলছে : “হাত গেল”। প্রথম শব্দ শুনে আমি যখন বেরিয়ে এলাম তখন কোন ধোঁয়া দেখিনি। ডিসপেন্সারিতে যে পক্ষ আমি পাই তা রাস্তাবরের ধোঁয়ার গন্ধের মতো। আমি সত্যেন্দ্রকে আমার হাসপাতালে যাবার পথেও দেখিনি, হাসপাতালেও দেখিনি।

জুরীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, নরেন সচরাচর যেমন চলেন তেমনি ধীর চলেই চলছিলেন, ঐ সময় আমার সঙ্গে দেখা, গালমন্দ করছিলেন। তিনি কারও নাম বলেননি; সাহেব তখন নেমে যাচ্ছিলেন। তিনি কারও নামোন্মেষ করেননি। আমার মুখ ছিল পশ্চিম দিকে, দোরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কানাইবাবুর হাতে একটা পিস্তল দেখলাম। পরে সত্যেন্দ্রনাথের হাতেও একটা দেখি। আমি সত্যেন্দ্রনাথকে নেমে আসতে দেখিনি। তখন আমি কানাইলাল দত্তের সঙ্গে কথা কইছিলাম।

সিভিল সার্জেন বললেন

ডাঃ ড্যালি (Daly) বললেন, আমি আলিপুরের সিভিল সার্জেন। ৩১এ আমি নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইর শব্দ পরীক্ষা করি। আমি আগে থেকেই তাকে জানতাম। আলিপুর জেলে তার মৃত্যুর আগে তাকে দেখেছি। তার দেহে কয়েকটি ক্ষত পেয়েছি। আমি বুলেট বের করে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ব্রেটের (Brett) হাতে দিয়েছি। রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে।

বুকের ডান দিকে একটা গুলী পাই। গুলীটা পিঠের বাঁ দিক দিয়ে ঢুকেছে এবং কুসফুস ভেদ করে গেছে। গুলীটার গতি ছিল ওপর দিকে। আরও বুলেট ক্ষত পেয়েছি; গোলপানা। ঠোটে একটা আঘাত চিহ্ন ছিল হু' আনির মত *। হু' একটা জায়গায় সামান্য কেটে গেছিল। আমার মতে হাতের ক্ষতচিহ্নটা ছিল সিকি ইঞ্চি পরিধির।

পিঠের ক্ষত চিহ্নটা হু' আনি আকারের। আঁচড় কাটবার মত দাগও ছিল, ওগুলো ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় হয়ে থাকবে। আমি হিপিনসকেও পরীক্ষা করেছি। হাসপিটাল এসিস্ট্যান্ট তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। গুলী ভেদ করার ফলে ঐ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। আমি যখন ঐ ক্ষত পরীক্ষা করি, হাতটা বঁকে ছিল। আমি ঠিক করতে পারিনি গোলসাইর দেহে যে গুলী পাওয়া গেছে এগুলীও তারই একটা।

* সকালে হু' আনি ছিল রূপোর আর খুবই ছোট।
গোল।

কি না। দিন কুড়ির মধ্যেও সে কাজ করতে পারবে না।

জেরার উত্তরে বললেন, কোন গুলীই ছোট পিস্তলটা থেকে নির্গত হয়েছে মনে হয় না। তার দেহের কোথাও ছুঁড়ে যায় নি। আমি বন্দী দুজনকেও পরীক্ষা করেছি। আমি কানাই লালের উরুতে একটা ক্ষত চিহ্ন দেখেছি। এটা কোন গুলী থেকেও হ'তে পারে। সত্যেন্দ্রের দেহে কোন ক্ষত বা আঁচর দেখিনি। সচরাচর আমরা ধ্বস্তা ধ্বস্তিতে ছুঁড়ে যাবার চিহ্ন পাই।

মিঃ ব্যানার্জি : আপনি কি অসুস্থতার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে যেতে পারছেন না বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন?

উ : কিছু একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম, কিন্তু সে কি, রেজিস্টার না দেখলে তা বলতে পারব না। তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন, ধূম খর হয়েছিল ও হাঁপানি হয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

নেতাজী-পুস্তান

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন

নবম দৃশ্য

[সিঙ্গাপুর আজাদ হিন্দের সরকারী ভবন।
রাত্রিবেলা নেতাজী ও তাঁর সহচরবর্গ বসে
আছেন। সামনে একটি রেডিওসেট খোলা
আছে। সংবাদ শুনছেন সবাই।]

‘টোকিও রেডিও থেকে বলছি। আজ ১৫ই
আগষ্ট ১৯৪৫। মহামান্য সম্রাটের আদেশানুসারে
এই ঘোষণা করা হচ্ছে যে জাপান বিজয়ী মিত্রশক্তির
কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। নিপ্পনের চিরচিত্রিত
নীতি অনুসারে এই বিপর্যয়ের সংবাদ জাপান-
নাগরিকবৃন্দ দৃঢ় অ-চঞ্চল চিত্তে গ্রহণ করবে, এবং
সময়োচিত্ত কর্তব্য করে যাবে—মহামান্য নিপ্পন সম্রাট
এই আশা রাখেন।’

(আইয়ার রেডিও বন্ধ করলেন। গৃহে

অলৌকিক স্তব্ধতা নেমে এলো। তারপর—)

নেতাজী—“নামিল আঘাত / এই মাত্র ? আর
কিছু নয় ? / ভেঙ্গে গেল ভয় / যখন উদ্ভত ছিল
তোমার অশনি / ভোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে
নিরেছি গণি / ভোমার আঘাত সাথে নেমে এলে
তুমি / যেথা মোর আপনার ভূমি। / ছোট হয়ে
আঘাত’ ৮২- ৪

গেছ আজ। / আবার টুটল সব লাজ। / যত
বড়ো হও, / তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও। /
‘আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো—এই শেষ কথা বলে / যাব
আমি চলে। /”

(স্তব্ধতা বিরাজমান—কান পেতে শোনাগেল

নেতাজীর আবৃত্তির রেশটুকু)

আইয়ার—(একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন অলৌকিক
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত নেতাজীর বদনমণ্ডলে)—এবার
সত্যই বজ্র নেমে এলো। তার সঙ্গে নেমে এলেন
কি বজ্রপাণি আরও আঘাত হানতে ?

নেতাজী—(আশ্চর্য প্রশান্তিতে) আইয়ার, তুমি
সত্যি বাংলা বুঝতে পারো। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়
মর্ম ধরতে পেরেছো।—কিন্তু আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো
—এই শেষ কথা বলে / যাবো আমি চলে।” /—দিস্-
মাই মেসেজ লাস্ট আই আটার, / ছাট্‌ আই তান ডেথ্-
এ্যাম গ্রেটার। / এ্যাম আই ডিস্-এ্যাপিয়ার (This
my message last I utter / That I than
Death am greater. And I disappear)*

* ইংরাজী অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

আলাপাঙ্গান—নেতাজী, সম্মুখে নিরাশার নিরঙ্ক তমসায় আমাদের সামগ্রিক অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে।

নেতাজী—অবলুপ্তি নয় আলাপাঙ্গান, অভ্যাদয়—“তিমির বিদার উদার অভ্যাদয়”। এই তো নব-অন্দের লগ্ন। তমসার পারে বসে আছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। “বেদাহম্ এতং পুরুষং মহাস্তম্ / আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাং।”—আমরা যে অমৃতের পুত্র আলাপাঙ্গান। আবার আসবো আমরা, গড়বো মুক্তি কোল, আধীন হবে ভারতবর্ষ।

(ভাস্কর্যের প্রবেশ)

ভাস্কর্য—নেতাজী, কর্ণেল ষ্ট্র্যাচি ও ক্যাপ্টেন মালিক এসেছেন।

নেতাজী—(সোৎসাহে) এসেছেন! এ ঘরে তাদের একুণি পাঠিয়ে দাও।

(ভাস্কর্য ‘আচ্ছা’—বলে চলে গেলেন।

ষ্ট্র্যাচি ও মালিক এসে অভিবাদন করলেন।

ষ্ট্র্যাচির হাতে একটি মডেল এবং নজ্জার ব্ল্যুপ্রিন্ট।)

ষ্ট্র্যাচি—মডেলটি এবং ব্ল্যুপ্রিন্ট এনেছি নেতাজী।

নেতাজী—থ্যাঙ্ক্‌য়্যু, থ্যাঙ্ক্‌য়্যু ইনজিনিয়ার ষ্ট্র্যাচি।—কিয়ানী, এই দেখো মডেলটি। (কিয়ানীর হাতে দিলেন)—অজানা অনামা হাজার হাজার আজাদ হিন্দ সৈনিকদের স্বরণে সিজাপুরের সমুদ্র তীরে নির্মিত হবে শহীদ মিনার—এই তার মডেল। গত ২রা জুলাই এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম।

কিয়ানী—বাঃ। কী চমৎকার মডেলটি। তখনটি

শীর্ষ খাড়া উঠে গেছে—তিনটি বাণী অঙ্কে ধারণ করে—‘ইন্ডেক্সাক্, ইতমদ্, কুরবানি’।

আইয়ার—(দেখে) সত্যি অপূর্ব। সরল, অনাড়ম্বর কিন্তু ভাবব্যঞ্জনায় গভীর এই আশ্চর্য শহীদ মিনার। কারো বিরুদ্ধে কোন বিষোদ্যপার নেই। যে কোন যুগে, যে কোন দেশে এই স্মৃতি স্তম্ভ শোভা পাবে—তিনটি পবিত্র শব্দ দিয়ে গড়া যার শিরোনাম—‘একতা, সত্যতা, আত্মদান’।

শ্রী ৩মুসিং—কিন্তু এই সুন্দর মিনারটির নির্মাণ-কার্য শেষ করা যাবে কি? ইংরেজ সৈন্য তো শ্রোণানের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে।

নেতাজী—মালিক, শ্রী ৩মুসিং-এর প্রশ্নের জবাব দাও।

মালিক—নেতাজী, সবার সম্মুখে ষ্ট্র্যাচি ও আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—ইংরেজ আসবার আগে শহীদ মিনার নির্মাণ কার্য সমাধা করবোই। মিস্ত্রী কুলি শ্রোণানে যোগাড় করা এখন খুব কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমরাও কণিক ধরতে জানি, কুলির বোঝা বইতে পারি। (ষ্ট্র্যাচি সম্মতিসূচক বাড় নাড়লেন)

নেতাজী—থ্যাঙ্ক্‌য়্যু মালিক, থ্যাঙ্ক্‌য়্যু ষ্ট্র্যাচি।—শোনো তোমরা। শ্রোণানে এই আমাদের শেষ কাজ। আমরা কেউ থাকবো না, থাকবে এই স্মৃতিস্তম্ভটি। যুগ যুগ ধরে নিঃশব্দ সুরে গাইবে—আজাদ হিন্দ শৌর্যগাথা।

আজা—কিন্তু নেতাজী, এতটা আশঙ্কা রয়ে যাবে। এই মুহুর্তে আপনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

‘এনিমি নাশ্বার ওয়ান’। আপনার নাগাল না পেয়ে হয়তো ব্রিটিশ পুঙ্গবেরা অন্ধ ক্রোধে এই শহীদ মিনারটি ধূলিসাৎ করে দেবে।

আইয়ার—ঠিক বলেছেন মিঃ আলাগাপ্পান।

নেতাজী—আইয়ার, ইংরেজের চরিত্র আমি ভালভাবে জানি।—তবু মনে হয়, আন্তর্জাতিক আইন এবং সৌজ্ঞেয়তার খাতিরে হয়তো ইংরেজ এতোটা নীচে নামবেনা। ভবিষ্যৎ যাইহোক, আমরা কিছুতেই বিরত হবো না—কী বলো স্ট্রাচি।

স্ট্রাচি—নিশ্চয়ই নেতাজী।—এ পবিত্র কার্য সুসম্পন্ন হবেই।—আমরা যাচ্ছি নেতাজী। সময় অল্প। আজ রাত থেকেই নির্মাণ কার্য শুরু হবে।—জয় হিন্দ।

(ছ’জনে অভিবাদন করে চলে গেলেন।)

মডেল ও ব্রাশ্রিকটটি স্ট্রাচির হাতে।)*

নেতাজী—(ঘড়ি দেখে) আইয়ার, রাত দশটা বেজে গেল! দেখো, সরকার এলো কিনা।

(সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন একটি ভারি স্ট্রটকেস নিয়ে। এ, এন্স সরকার।)

সরকার—আই গ্রাম সরি নেতাজী। মালায়ে

জরুরি সরকারী কাগজপত্র বেছে বার করতে দেরি হোলো, তারপর স্লেন পেতে দেরি। রাত অনেক হয়ে গেছে।

নেতাজী—আমাদের কাছে দিন ও রাত্রি সমান সরকার। বোসো। পরিষদেরও এই তো শেষ সভা। আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দিন।

সরকার—হ্যাঁ, এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। (একটু থেমে) নেতাজী, শুনেছেন, মার্কিন পাশবিকতার কাহিনী?—আকাশ থেকে অ্যাটম বোমা ফেলে জাপানের ছুটি সমৃদ্ধ নগরী হিরোসিমা ও নাগাসাকি-কে নাকি একেবারে আশানে পরিণত করেছে।

নেতাজী—ও! দিঙ্ ইনফারনাল ব্রুটস্। (Oh! These infernal brutes!)

আইয়ার—এ সংবাদ কোথায় শুনলেন মিঃ সরকার?

সরকার—মালায়ে, জাপানিবিরে। একজন ষ্টাফ অফিসার—আমার বিশেষ পরিচিত—আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন—এ সাম্প্রতিক সংবাদ। এখনও নাকি এ সংবাদ গোপন রাখা হয়েছে। কী কী ঘটেছে, কতটা ক্ষতি হয়েছে তা প্রধান সেনাপতি ছাড়া আর কেউ শিবিরে জানে না। ষ্টাফ অফিসারটি আমাকে তাঁর সঙ্গে এখন দেখা করতে নিবেদন করলেন। তিনি পাথর হয়ে বসে আছেন একটু দূর থেকে দেখলাম। সমগ্র শিবিরটি ভূতুরে পরিবেশে যেন থন্ডম্ কচ্ছে। ‘হারিকিরি’ ক’ব্যর

* ওদের আশঙ্কা সত্য হয়েছিল। দিঙ্গাপুরে প্রবেশ করে শহীদ মিনারটি ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ইংরেজরা।

জন্ম প্রস্তুত হচ্ছে অনেকে—আমি চলে এলাম বিমান বন্দরে, অতি কষ্টে বিমানে একটি আসন যোগাড় করে এই মাত্র এলাম সিঙ্গাপুরে।

আলাগাপ্পান—এতক্ষণ ভাবছিলাম, কেন এই দুর্ভাগ্য গর্ভিত জাপ জাতি এতো শীঘ্র আত্মসমর্পণ করলে। এখন বুঝতে পাচ্ছি, কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে এ ছাড়া আর পথ ছিল না। মার্কিনরা গর্ব করে, তারা অসম্ভব জাতি—জ্ঞান বিজ্ঞানে আর্থিক সমৃদ্ধিতে তারা সবার শীর্ষে এই ওদের সভ্যতার-নমুনা।

নেতাজী—“দেখিলাম একালের / আত্মঘাতী মৃত উন্নততা, দেখিছু সর্বদে তার / বিকৃতির কদম্ব বিক্রপ /...এদিকে দানব পক্ষী ক্ষুধা শূন্য / উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈজ্ঞানী নদী পার হতে / যন্ত্র-পক্ষ হুকারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি, / আকাশেরে করিল অশুচি।”—

(নেতাজীর আবৃত্তি যেন সমগ্র আবহাওয়াকে ঝঙ্কত করলে। তিনি যেন ধ্যানস্থ।—আপন মনে বলে উঠলেন হাতজোড় করে নমস্কার করে—)

হে ফ্রান্সদর্শী মহাকবি, তোমাকে নমস্কার করি।
—(একটা অলৌকিক নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো।)

শ্রীতম—(নীরবতা বিদ্বিত না হয় তেমনি নীচু স্বরে) নেতাজী, আমাদের আলোচনা খানিকক্ষণ মূলভূমি থাক। আমরা পাশের ঘরে বাই।

নেতাজী—(প্রার্থনার স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে) না শ্রীতমসিং, এক্ষুণি আলোচনা হবে। ‘টাইম এ্যান্ড টাইড্ ওয়েট্ ফর নান্’। কাজ আপন পতিবেশে চলে, কারো মুখের দিকে সে তাকায় না।

সরকার—অত্যন্ত সত্য কথা। আমাদের করণীয় কী, এক্ষুণি তা স্থির করতে হবে। নেতাজীর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরী করা চলে না।—মিঃ আইয়ার, এ সম্বন্ধে আপনারা কিছু ভেবেছেন?

আইয়ার—হ্যাঁ। মোটামুটি কথা হয়েছিল—অবশ্য আপনাদের সমর্থন সাপেক্ষে—যে সিঙ্গাপুর দখল করলে আমরা নেতাজীকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করবো। আর যুদ্ধ চালায়ে যাওয়ায় তো কোন লাভ নেই।

সরকার—হুঃ। এতে নেতাজীর সম্মতি আছে?

আইয়ার—সম্ভ্যার ওই ঘরোয়া আলোচনা সভায় নেতাজী উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুচকি মুচকি হাসছিলেন আর রসিকতা কচ্ছিলেন।

সরকার—তার মানে সোজাসুজি তাঁর মতটা জানতে পারেননি। মেজর জেনারেল কিয়ানী, আপনার কী মনে হয়?

কিয়ানী—আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ সরকার।

সরকার—নেতাজী, আপনার মত কী, আমাদের বসুন।

নেতাজী—(মুচকি হেসে) সময় পরিষদের সদস্য

জামান কিয়ানী, আলগাপ্পান, প্রীতম্ সিং উপস্থিত
আছেন, আছেন আমার মুখ্য প্রচার সচিব এস, এ,
আইয়ার, সর্বোপরি রয়েছেন আজাদ হিন্দ সরকারের
প্রধান কর্মসচিব কুশাগ্রবুদ্ধি এ. এন্. সরকার।
তোমরাই বলো, এখন কী করা উচিত।

প্রীতম্ সিং—মিঃ সরকার, আজাদ হিন্দ ফৌজ
সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ করে তো করুক। কিন্তু
কয়েকজন বাছাই করা অমুচর নিয়ে নেতাজীর
আত্মপোষন করা উচিত।

আলা—আমারও তাই মত।

কিয়ানী—আপনারা সমীচীন কথাই বলেছেন।
নেতাজী বলেন, একদিকে ধনাত্মিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
এবং রক্ষণশীল বামু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন, অপরদিকে
কম্যুনিষ্ট রাশিয়া। এরা আজ একজোট বটে, কিন্তু
সে শুধু ফ্যাসিবাদের ভয়ে। এদের না আছে মনের
মিল, না আদর্শের বা লক্ষ্যের সমতা। ফ্যাসিবাদ
আজ পরাজিত, পুয়ুদন্ত। সুতরাং আমেরিকার
সমর্থনে ব্রিটেন এবং রাশিয়া পরস্পরের শত্রু হয়ে
দাঁড়ালো বলে। এই সুযোগ তখন কাজে লাগানো
যাবে যদি নেতাজী ধরা না দেন। হিন্দুস্থানের
স্বাধীনতা যুদ্ধের নতুন ক্ষেত্র রচিত হবে ব্রিটেনের
শত্রু রাশিয়ার আনুকূল্যে।

আলা—কিন্তু ঠিক আজ কি এটা সম্ভব?
রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে
মাকুরিয়া অধিকার করেছে। আজাদহিন্দ জাপানের
মিত্র। ধরুন, আজাদহিন্দের সর্বাধিনায়ক আত্মপোষন
করে রাশিয়ার কোন অঞ্চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর

পক্ষে বর্তমানে সেখান থেকে কোন কাজ করা সম্ভব
হবে কি?

আইয়ার—ঠিক বলেছেন মিঃ আলগাপ্পান।

সরকার—কিন্তু আপনারা দু বছর ধরে দেখে
আসছেন যে নেতাজী অসম্ভবকেও সম্ভব করতে
পারেন। যুক্তি দিয়ে আমরা ধরতে পারবো না
কোথায় তাঁর অফুরন্ত শক্তির উৎস। তিনি
মহামানব, অধ্যাত্মবাদের বলিষ্ঠ সাধক, অনন্ত ভারত
পথিক। তাঁর বিচারে ধারা যে পথ বেয়ে চলে,
তা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অপোচরেই
থাকে।

নেতাজী—এবার তবে আমার অভিলাষ ব্যক্ত
কচ্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও তোমাদের
জানাচ্ছি যে তোমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে
আমি যাবো না। এবং আমার মত জানিয়ে
তোমাদের সিদ্ধান্তের উপর কোন প্রভাব বিস্তার
করতেও চাই না। সুভাষ বোস ফ্যাসিষ্ট নয়,
স্বৈরতন্ত্রীও নয়। যদিও আমার ভারতীয়
সাম্যবাদী বন্ধুরা দল বা ব্যক্তি হিসেবে তা মনে
করেন।

আইয়ার—নেতাজী, কী জঘন্য মিথ্যা ওরা
আপনার নামে ছড়িয়েছে, তা তো আমি জানি।
ভ্রুৎ হয়, রাগও হয়। যদি ওরা জানবার চেষ্টা
করতো, তা হলে জানতে পারতো এতবড়ো
গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ভারতীয় সত্তা আর কোন
রাজনৈতিক নেতার জীবনচর্যায় এমন করে মূর্ত
হয়নি। জানি নে, ভবিষ্যতে হবে কি না।

আলা—মিঃ আইয়ার, ওদের আর কতটুকু প্রভাব ভারতের জনসাধারণের উপর। থাক না ওরা মূর্খের স্বর্গরাজ্যে। আমাদের ‘নেতাজী’ সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের নেতাজী।

সরকার—নেতাজী, বলুন আপনার অভিলাষ কী।

নেতাজী—(সবার দিকে তাকিয়ে) আমি ধরা দেবার পক্ষপাতী। তবে এই সর্তে ইংরেজের কাছে ধরাদেবো যে আমার হাজার হাজার সতীর্থদের উপর কোন অমানুষিক নিগ্রহ ওরা করবে না। ভারতে নিয়ে গিয়ে আইন অনুসারে ওদের বিচার করুক, তারপর শাস্তি দিতে হয় দিক। ইংরেজ আমার শত্রু বটে, কিন্তু এ্যাংলো-স্নাক্সন আইন ব্যবস্থাকে আমি শ্রদ্ধা করি। রাজনৈতিক কারণে এই আইনের পিক্তি ও অপব্যবহারই ভারতবাসীর দুর্গতি ও দুর্ভোগের মূল।

শ্রীতম—কিন্তু নেতাজী, ওরা তো আমাদের বিচারের নামে গ্রহসন করবেই—এই তো ওরা বরাবর করে আসছে ভারতের জাতীয় জাগরণের পর থেকে।

নেতাজী—সত্য শ্রীতম্ সিং। কিন্তু তবুও সেটা মন্দের ভাল। বেশির ভাগ আজাদ হিন্দ বন্দীরা তাহলে বিচারে খালাস পাবে এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে ওদের পরম শত্রু স্নাক্স বোস যখন ওদের বন্দী, তখন অল্পপ্রসাদে ওদের মনও খানিকটা উদার হতে পারে।

সরকার—আর আপনার পরিণাম ?

নেতাজী—সরকার, এইমাত্র তুমি বলছিলে অধ্যাত্মবাদের কথা, যার উপর নির্ভর করে আমি সকল কাজ করি—আমাকে নীলকণ্ঠ হতে দাও।

আলা—না নেতাজী প্রাণ থাকতে আমরা তা হতে দিতে পারিনে, আপনাকে একা ওই দুশমনদের হাতে সঁপে দেবো না।

নেতাজী—ভুল কোরোনা আলাপালা। আমাকে তোমরা কি শুধু নামেই ‘নেতাজী’ বলা ? আমাকে ‘নেতাজীর’ দায়িত্ব মৃত্যু পর্যন্ত পালন করতে দাও, আমাকে পেতে দাও গৌরবের ক্রেশ।

আইয়ার—এ কথা ভাবলেও আমার কান্না পায় নেতাজী।

নেতাজী—কিন্তু এই তো একনিষ্ঠ দেশ সেবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আইয়ার। যুদ্ধ শেষে ওরা আমার বিচার করবে, সম্ভবত সামরিক আদালতে। কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় নয়, নিশ্চয় ভারতের মাটিতে—হয় তো দিল্লীর লাল কেল্লায়। বিচারে সব সত্য প্রকাশ পাবে। আজাদ হিন্দ কী করতে চেয়েছিল, কী করেছে তখন আমার দেশবাসী প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারবে। জানতে পারবে—আমরা জাপানের পঞ্চম বাহিনী নই সম্পূর্ণ ভারতীয় একটি বিরাট ব্রতচারী সৈনিকের দল, যার একমাত্র ব্রত ভারতের মুক্তি। স্বাধীন আমাদের সরকার, স্বাধীন আমাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলা ফেরা, জাপান সমান পর্ষায়ে মিত্রদেশ

মাত্র। ব্রিটিশ অপপ্রচারের ঠাস বুনাি কাহিনী তখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষ পরিণত হবে এক প্রকাণ্ড বারুদের জুপে। যদি ওরা আমাকে মুক্তাদণ্ড দেয়, তবে সেই মুক্তা আমার অগ্নিগ্ন্যোপ করবে বারুদের জুপে। তখন আমার দেশের স্বাধীনতা লাভে ছ' বছরের বেশি দেরি হবে না। আর এ অগ্নিকায় যদি ওরা আমাকে মুক্ত দেয়, ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই আমি চালাবো কোটি কোটি দেশবাসীদের পাশে নিয়ে আমৃত্যু সংগ্রাম। সরকার! আমার তাই করা কি উচিত নয়?

সরকার—নেতাজী, আপনার ভাববৃত্তী সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত এই যুক্তি ও সম্ভাবনায় কি কোন প্রশ্ন তুলতে পারি? আমরা শুধু আপনাকে অনুরোধ করতে পারি।

নেতাজী—অনুরোধ নয় সরকার, তোমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত আমি নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো। মনে পড়ে মিক্‌টিলায় সেই ভীষণ রাত্রির কথা। অদূরে পোপার যুদ্ধে আমাদের সৈনিকদের আসন্ন বিপর্যয়ের সংবাদ শুনলাম। আমার মন তখন বলে উঠলো ওখানে আমার অর্গোণে যাওয়া উচিত। তাহলে আমরা ফৌজীরা পারবে বিপর্যয়কে পরিণত করতে মহান শৌধের অপূর্ব গৌরবে—যা শত অহবের বিজয় গৌরবকেও স্থান করে দেবে। কিন্তু শাহনেওয়াজ আমাকে কিছুতেই যত্ন দিলে না। তার কথা আমি শুনেছিলাম। তাতে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে প্রশ্ন আজ অবাস্তব হয়ে গেছে সরকার।

শ্রীতম্—নেতাজী, আমাদের হিসেব খুল হিসেব। বাস্তবতার পরিধিতে সামরিক শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা হিসেব নিকেশ করি। শাহনেওয়াজ তাই আপনাকে পোপায় যেতে দেন নি। আপনার হিসেব মুসল্লি আধ্যাত্মিকতার পথ বেয়ে চলে—আমাদের তো বোঝবার সাধ্য নেই নেতাজী।

নেতাজী—শ্রীতম্ সিং, শুধু আমার নয় সকল মানুষেরই শক্তির উৎস আত্মা, প্রধান ইচ্ছাশক্তিই মানুষকে কর্মপথে চলার প্রেরণা দেয়। যখন এই ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিগুলি সংহত ও সমন্বিত হয়ে একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে কর্মপথে তখন সে জাতি হয় হুর্ধ্ব, অপরাধেয়। এ আমার কথা নয়, যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের, ভারতের ভবিষ্যৎ রচনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে একদা একথা বলেছিলেন। এ যে কতো সত্য তা প্রমাণ করেছে তোমরা—আমার আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংকটে ঐক্যবদ্ধ শৌর্যবান সৈনিকেরা। তাই আমাদের পরাজয়েও এতো গৌরব। ভারতের স্বাধীনতা আমাদের কার্যকলাপের ফাঁকে ফাঁকে উকি দিচ্ছে শ্রীতম্। আমাকে তার আগমনীর শঙ্কস্বনি করতে দাও।

সরকার—নেতাজী, ভারত ভাগ্য বিধাতা আপনার পথের দিশারী। এ চরম মুহূর্তে আপনার তদুগত চিন্তের বাণীকে কার সাধ্য উপেক্ষা করে।

আলা—কিন্তু মিঃ সরকার, নেতাজীর কাছেই আমরা শিখোচ্ছ আশাবাদী হতে, কখনও বিশ্বাস না হারাতে। তাই আমাদের উৎকণ্ঠা নেতাজী ধরা দিলে যদি আমাদের আশা ও বিশ্বাসের আলো

নিভে যায়! আমরা নেতাজীর অনুগামী বলে আর কি তাহলে গর্হ করতে পারবো! আমাদের—শুধু আমাদের কেন—সমগ্র ভারতবাসীর সকল আশা, সকল বিশ্বাস যে এই একটি অসামান্য মানুষকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।

সরকার—ঠিক বলেছেন মিঃ আলাগাপ্পান।—এতকণ ধরে আলোচনা করার পর যে মতৈক্যে আমরা পৌঁছোলাম, নেতাজীর অলৌকিক আলোক দীপ্ত বাণীর উপর অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখেও আমি বিনীত প্রস্তাবাকারে তা নেতাজীর কাছে পেশ করছি। নেতাজী, আপনি আত্মগোপন করে থাকুন—অন্তত তিন মাস কাল। আমরা ধরাদি' ইংরেজের কাছে। বিচারে ফাঁসীতে বা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে হোক আমাদের গৌরবের মৃত্যু। এখনও আজাদ হিন্দের ত্রিশ হাজার কর্মী আছেন। তাদের সবাইকে তো ব্রিটিশরাজ মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে না। আমাদের কয়েকজনের, শহীদ হওয়ার ফলেই প্রচণ্ড আলোড়ন জাগবে আসমুজ্জ হিমাচল ভারত ডুখণ্ডে, বিদ্রোহ করবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সিপাহীবৃন্দ। আপনার অভীক্ষিত বারুদের স্তূপ তখন গড়ে উঠবে, আত্মগোপনের জাল ছিন্ন করে রাজ সমারোহে প্রকাশিত হবেন আপনি আমাদের প্রিয়তম নেতাজী, লাগবে আগুন সেই বারুদের স্তূপে নেতাজী, আপনি ছাড়া আর তো কেউ পারবে না সে আগুন জ্বালাতে।

কিয়ানী—নেতাজী, আপনি দয়া করে রাজি হোন এ প্রস্তাবে।—মিঃ সরকার, একটা প্রশ্ন

কিন্তু থেকে যাচ্ছে। নেতাজীর অজ্ঞাতবাস কোথায় হবে এবং কী ভাবে তিনি যাবেন? সিঙ্গাপুর অবস্থা তাঁকে অগোণে ছেড়ে যেতে হবে। তারপর?

শ্রীতম্—রাশিয়ার কোন অঞ্চল বোধ হয় নেতাজীর অজ্ঞাত বাসের যোগ্য স্থান। মালায়ে, শ্রামদেশে কিংবা ইন্দোচীনে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

আইয়ার—কিন্তু যেতে হবে তো জাপ বিমানে। জাপান যতই বিপাকে পড়ুক নেতাজীর প্রয়োজনে তাঁকে নিশ্চয় বিমান দেবে।—কিন্তু জাপানের আত্ম-সমর্পণের পর জাপ বিমানে যাতায়াত কি যুক্তিযুক্ত হবে?

নেতাজী—সে সব ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দাও আইয়ার। তোমাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার পদ্ধতি আমাকেই স্থির করতে দাও।—জানো তো, আমি শুধু আশাবাদী নই, অদৃষ্টবাদীও। প্রশ্ন শুধু এই—বিমান পাওয়া যাবে কি না এবং আমার সঙ্গে আর কে যাবেন।

আলা—নেতাজী, আপনার গন্তব্য স্থল কী হবে?

নেতাজী—(হেসে) এতো আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা আলাগাপ্পান। অথবা বুঝে আমি লক্ষ্যমুখ বদলাতে পারবো, বিধাতা পুরুষের ইচ্ছিতে।

আইয়ার—লক্ষ্যমুখ তো আজীবন আপনার একটাই নেতাজী। সে লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা।

(নেতাজী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।)

তারপর—

(ক্রমশঃ)

ভারতের জাতীয়তা ও সুভাষচন্দ্র

কণেশ্বর বোষাল

জাতীয় আন্দোলন ও বিভেদ নীতি

‘ভারতবাসীরা বিদেশীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না।’ (I. S.-p-17) সেক্ষত্রেই অনেক জাতি ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকর্মতা করায়ত্ত করার সময় থেকেই সেখানে তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছে এবং বহুসংখ্যক ধর্মপ্রচারক আমদানী করে ভারতবাসীকে ইংরেজী ধর্মে সভ্য করার ধর্মীয় কাজে বিপুল উদ্যোগ আয়োজন করেছে। (জঃ I. S. p-19) ব্রিটিশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাতি ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠল এবং এর থেকেই ভারতবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহের সূচীমুখ রচিত হ’ল। (জঃ-এ) স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র নূতন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার শুরু হ’ল এবং দীর্ঘস্থায়ী অম্লরূপ শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা হ’ল। নূতন আশ্রাসী-সংস্কৃতি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে গ্রাস করতে উদ্বৃত্ত হ’লে স্বভাবতঃই সমাজের চিন্তানায়কেরা অস্বস্তিত হ’লেন। ভারতের অন্তরাঙ্গার বিদ্রোহ^১

প্রথম রূপ নিল রামমোহনের আবির্ভাবে। বেদান্ত-দর্শনকে ভিত্তি করে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হ’ল যিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শোনাগেল এবং ধর্মে ধর্মে বিরোধের অবসান ঘটাতে বললেন। ভারতের প্রাচীন মূল্য নূতন রূপ পেল তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে, যার ত্যাগ ও সেবার জ্বলন্ত আদর্শে সমগ্র জাতি উজ্জ্বল হ’ল। উত্তর পশ্চিম ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্থ সমাজ আন্দোলনও বিপুল প্রভাব বিস্তার করল। এই সব ধর্মীয় নবজাগরণের আন্দোলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচার না করলেও তা জাতির মনে দ্রুত আত্মসম্মান বোধ এবং দেশাত্মবোধ জাগিয়ে দিল।

ভারতবাসী জানল নূতন আক্রমণকারীরা শুধু বাণিজ্য করতে আসেনি এসেছে শাসন করতে এবং ভারতে তারা ভারতবাসী হিসাবে নয় বিদেশী বিজ্ঞতা রূপে দেশীয় সম্বন্ধে গ্রাস

swallowed up by a new religion and a new culture, the soul of the people revolted, (I. S. p 20)

(১) Traced with the menace of being

করতে উদ্বৃত্ত হয়েছে। এই বোধের অন্ততম পরিণতি হ'ল—সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)। এই বিদ্রোহে একজন মুসলমান শাসকের নেতৃত্বে ভারতের হিন্দু মুসলমান জনতা একসাথে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। (জঃ I. S. p-22) নানা ঘাত প্রতিঘাত অনৈক্য ও বিশ্বাসঘাতকতায় সে সংগ্রাম ব্রিটিশ বিতাড়নে উত্তীর্ণ হ'ল না। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি সমগ্রজাতিকে অন্ধহীন ক'রে কঠোরতর শাসনের শৃঙ্খল পরিচালনা দিল। দীর্ঘ কয়েক বৎসর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের রূপে নতুন জাগরণী আন্দোলন রূপ নিল বিচারপতি এম. জি. রাণাডের নেতৃত্বে। গোখল, তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটল এবং ডেকান এডুকেশন সোসাইটি, সারভেইস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি, পণপতি উৎসব, শিবাজী উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে সে আন্দোলন অঞ্চলে অঞ্চলে সঞ্চারিত হলো। ভারতের সংস্কৃতি সভ্যতার এই নব জাগরণে অ্যানি বেসান্টের থিও-সোফিক্যাল সোসাইটিও অংশ গ্রহণ করল। পরবর্তী কালে অ্যানি বেসান্ট হোমরুল আন্দোলনে (১৯১৬-১৭) আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয় কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে।

বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের কঠোরতায় অতীতের গ্রামীণ সমাজের স্বায়ত্তশাসন কাঠামো বিধ্বস্ত হয়ে পেল, ভারতের মানুষ বুঝতে পারলেন শাসকপোড়ীর

বজ্র-মুষ্টি গ্রাম ও শহরের সমস্ত মানুষকে এক ব্যাপক শাসন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। (জঃ I. S. p-24) ভারতের নতুন জাগরণকে ব্রিটিশ শাসকেরা নানাভাবে দমন করতে উদ্বৃত্ত হলে জাতীয় আন্দোলন গোপনচারী বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করল; যার অন্ততম প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, পরবর্তীকালের স্ববি অরবিন্দ। তিনি জাতিকে উচ্চ আদর্শে শিক্ষিত ক'রে ভোলায় কথা এবং জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণের কথা বলেন। 'আমাদের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "সমস্ত জগৎ আর্ঘ্যদেশ সন্তুত ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানধর্ম শিক্ষা-প্রার্থী হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনতি মস্তকে তাহার প্রাধিকার স্বীকার করিবে। সেইদিন আনয়নের জন্ত ভারতবাসীর জাগরণ।" অশ্রুত বললেন, "আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। (ধর্ম ও জাতীয়তা—পৃঃ ৭৭) ১ ভারতের স্বাধীনতা গোণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তিপ্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার..." জাতীয়তার জাগরণকে অরবিন্দ এক উদ্দেশ্যময় মিশনের দিকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। এ সুর আমরা বিবেকানন্দে লক্ষ্য করেছি। সূভাষচন্দ্রও ভারতের 'মিশনে' দৃঢ় প্রত্যয় হ'য়ে ভারতের বিশিষ্ট অবদানকে বিশ্বের ভাণ্ডারে তুলে দিতে চেয়েছেন।

সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলনের যুগের পর ইংরেজ

(১) ধর্ম ও জাতীয়তা—শ্রীঅরবিন্দ

বিদ্যেব গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২০ সাল থেকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। স্বভাবচন্দ্র ১৯২১ সালে সে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। গান্ধীজীর আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হল আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফত আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এরূপ আন্দোলনকে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা বিষয়ে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মনে করতেন ভারতীয় মুসলিমদের কাছে ট্রিপলি, আলজিরিয়ার মুসলিমগণ হিন্দুদের চেয়ে বেশী আত্মীয়। ব্রিটিশ শাসকেরা হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্থক্যের রক্ষণাবে বিভেদের বীজ বপন করতে অনেকদিন থেকেই উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁদের প্ররোচনায় ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খাঁ ব্রিটিশ ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞাত স্বতন্ত্র সদস্যপদ দাবী করেন, যে পদগুলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মুসলিম ভোটারদের দ্বারাই নির্বাচিত হবেন। এখন নিশ্চিত জানা গেছে এই প্রতিনিধিত্বের চক্রান্ত সরকার বা সরকারী অনুপ্রেরণায় ইংরেজদের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল। (RCM II p-224)^১

এই বিষয়ে Mr Archbold, নবাব মহসীন-উল-মুলককে ১০ই আগষ্ট ১৯০৬ তারিখের এক চিঠিতে লেখেন, “...এই সব ব্যাপারে আমি পর্দার

অন্তরালে থাকতে চাই এবং আপনার কাছ থেকেই যেন উদ্যোগের অবতারণা করা হয়।” (RCM II-p-225) উক্ত ডেপুটেশন ব্রিটিশ প্রেসে আনন্দের রোল জাগিয়ে তোলে, ভারতের এক জাতিত্বের কল্পনা ফেটে গেল এই ভেবে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। (জঃ ঐ-p-227) একটি পুস্তকে লেখা হ’ল, “৬২ মিলিয়ন লোককে গুপ্ত বিদ্রোহী দলে যোগদান করা থেকে নিরস্ত করা হ’ল...” (ঐ p-226) ঢাকায় ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রস্তাবে হিন্দুদের ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারকে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবে দৃঢ় থাকতে অনুরোধ করা হয় কারণ—তা পূর্ববঙ্গে মুসলিম অধিবাসীদের মুক্তি এনে দিয়েছে। এই ভাবে ব্রিটিশ শাসকবর্গ গোপনে মুসলিম ধর্মীয় ও স্বার্থীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ’য়ে ভারতবর্ষে বিভেদের বীজ রোপন করে দিলেন। মালিমিক্টোর ১৯০৬ এর প্রশাসন সংস্কার পরিকল্পনা ১৯০৯ এ কাউন্সিল আইনে রূপ গ্রহণ করলে ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রনির্বাচনের বিষয়ক উত্ত হ’য়ে গেল। এরপর জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষ প্রসারিত হ’লো। অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বহু স্বনামধন্য মুসলিম নেতার বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।

তারপর এলো স্বভাবচন্দ্রের আজাদহিন্দ আন্দোলন। গঠিত হ’ল ভারতের অস্থায়ী

(১) RCM II—History of the Freedom Movement in India—Volume II by R. C. Majumdar,

আজাদহিন্দ সরকার—যার অধীনে পূর্বএশিয়ার ত্রিশলক্ষ ভারতীয় অধিবাসী—সর্বধর্ম, সর্বপ্রদেশের অধিবাসী—এক সামগ্রিক সংগঠনে সামিল হ'য়ে সেই সরকারের আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সহায়তায় ভারতের অশ্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। এ ইতিহাস আজ আর কারো অজানা থাকার কথা নয়। এই সরকারী সংগঠনে ও আজাদহিন্দ ফৌজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের লেশমাত্র ছিলনা। তাঁরা যে সংক্ষিপ্ত মহাভারত গড়ে তুলেছিলেন সে সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন, “আই, এন, এ অনেক গর্বের বস্তু অর্জম করেছে।...তাঁরা ভারতের বিভিন্ন ধর্মের ও

জাতির জনগণকে এক পতাকা তলে সমবে ক'রেছে এবং সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক ও সঙ্ঘর্ষের মনোভাবকে নির্মূল ক'রে সকলের মনে জাগিয়েছে ঐক্য ও একাত্মতা। এই আদর্শ আমাদের গ্রহণ করতে হ'বে।” (Foot Note to p 209-K. K. G) ১৯৪৫ এর ১৬ই আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহেরুজীও আই এন এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করেন। (জঃ ঐ)

(ক্রমশঃ)

- (১) K. K. G—History of the Indian National Army by K. K. Ghosh.

চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য

রাখাল দত্ত

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট চীনে কৃষির ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান হয়েছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। প্রথম যুগের এই কর্মকৌশল সামগ্রিক দিক থেকে দেখলে যে মোটামুটি ভাবে বার্থ হয়েছিল সে কথাও আলোচিত হয়েছে। ১৯৬১ সালের পর থেকে চীনের কৃষিতে যে কর্মপন্থা অনুসৃত হয়ে আসছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রথম যুগের কর্মকৌশলের স্থায়ী প্রভাব কৃষিতে কতদূর পড়েছিল তা জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এ সময়ের কৃষির উন্নয়ন প্রচেষ্টা চীনের গতানুগতিক উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে। আগেই বলা হয়েছে কৃষির উপর জোর কম থাকায় এই কয় বছর আপেক্ষিক ভাবে কৃষিতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল সামান্যই। গ্রামীণ উন্নয়নের গোড়ার দিকের প্রয়াসগুলি তাই সাধারণভাবে এমন সব প্রকল্পে সীমিত ছিল যেগুলি একবার মাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেই ফুরিয়ে যায়। অথবা এসব প্রকল্প হয়তো এরকমের ছিল যেগুলিতে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রমহাসমান উৎপাদনের নিয়ম বলবৎ হয়ে পড়ে।

কিন্তু তাহলেও ১৯৫৭ সাল নাগাদ কৃষির উৎপাদন যে কিছুটা বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। চীনের সরকারী মহলের হিসাব থেকে জানা যায় ১৯৫২ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন। ১৯৫৭ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে। এ কয় বছরে যে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন উৎপাদন বাড়ে তার ৩৮ শতাংশ কৃষিত জমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্ত এবং ৬২ শতাংশ জমির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির জন্ত ঘটেছিল মনে করা যেতে পারে। কিন্তু ১৯৫৭ সালের পর জমির পরিমাণও আগের মত বাড়ানো যায় নি বা জমির উৎপাদনশক্তিতেও বিশেষ ভারতম্য করা সম্ভব হয় নি।

১৯৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে কৃষিত জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর বেশি। এর মধ্যে ৩৯ লক্ষ হেক্টর জমি নতুন করে চাষের কাজে লাগানো হয়েছিল এবং ১ কোটি ২১ লক্ষ হেক্টর জমি বেড়েছিল একই জমিতে একাধিকবার চাষের রেওয়াজ চালু করিতে। ১৯৫৭ সালের পর দুই ই কমে যায়। জল সংরক্ষণ প্রকল্প,

শহরাঞ্চলের প্রসার, শিল্প, পরিবহন ও সামরিক উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে জমির ব্যবহার কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। একই জমিতে একাধিকবার চাষও খুব বেশি দিন ধরে অনেক জায়গাতেই সম্ভব হয়নি? কারণ, শিল্পজাত আধুনিক উপাদান ব্যবহার না করলে এ ধরনের চাষে প্রায়ই মোট উৎপাদন কমে আসে।

কম্যুনিষ্ট চীনের কৃষি-নীতির প্রথম যুগের সাদামাটা কর্মকৌশল অনির্দিষ্ট কালের জন্য উৎপাদন শক্তি বাড়াতে পারে নি বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নও সম্ভব করে তুলতে পারে নি। ধরা যাক একই জমিতে একাধিক বার চাষের কথা বা কম ফলনশীল শস্যের তুলনায় উচ্চ ফলনশীল শস্যের প্রবর্তনের কথা। সহজেই বোঝা যায় এ ধরনের কর্মকৌশল মাত্র একবারই কাজ করে এবং এগুলির ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। জমিতে কতটা জৈব সার বা কম্পোষ্ট দেওয়া যায় তার একটা নির্দিষ্ট সীমা বর্তমান। এই সীমা অতিক্রম করলে জৈব পদার্থের পাছলো জমিতে এত বেশি অক্সিজেন থাকি যে তাতে গাছের চারা বাড়তে পারে না।

কৃষিতে প্রথম যুগের কর্মকৌশলে ছোট ছোট এবং স্থানীয় ভিত্তিতে রচিত জলসেচ প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। মূল সমস্যাটি এই রয়ে গেল যে বৃষ্টিপাতের উপরই প্রত্যক্ষভাবে ছোট ছোট পুকুর বরাদ্দ বা বাঁধের জল নির্ভর করত।

কাছেই ধরার সময় বা অনাবৃষ্টির সময় এসব ছোট ছোট প্রকল্প থেকে বিশেষ কোনও সুবিধা পাওয়া যেত না। অগভীর কূপ বা নলকূপের বেলায়ও এই একই অসুবিধা ছিল। ধরার সময় খুব বেশি জল ভোলার চেষ্টা করলে জলের স্তর মারাত্মক ভাবে নেমে যেতে বাধ্য ছিল। ফলে কৃষোগুলি একে বারেরই অকেজো হয়ে যেত। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে দশ বছরে সেচের ব্যবস্থা অতিরিক্ত ৫ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল বলে সরকারী হিসাবে দাবি করা হয়। ১৯৪৯ সালে সেচসেবিত অঞ্চলের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর। সরকারী হিসাব মতে এধরনের জমির আয়তন ১৯৫৯ সালে ছিল ৭ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টর। এই অতিরিক্ত ৫ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর জমির প্রায় সবটাকেই ২ কোটি ৯০ লক্ষ ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। বলা হয়েছিল ১৯৫০-৫৮ সালে সেচ ব্যবস্থাসম্বন্ধিত জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হয় এবং “সামনের দিকে বিরাট লাফের” সময় আবার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু বহু প্রকল্পই যে যথাযথভাবে কাজ করে নি এবং অসংখ্য প্রকল্প (বিশেষ করে “সামনের দিকে বিরাট লাফের সময়ের প্রকল্পগুলি”) কোনও কাছেরই লাগেনি। ১৯৬৩ সালে সরকারীভাবে জানানো হয় যে সেচসেবিত জমির আয়তন ছিল ঐ বছর ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ হেক্টর। কাছেই ১৯৫৯ সালের সেচসেবিত জমির প্রায় অর্ধেক জমিতে ১৯৬৩ সালে আর সেচের জল

পাওয়া যায় নি। পরবর্তী বছরগুলি সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেচ সেবিত জমির পরিমাণ আর বাড়ানো যায় নি, বরং চীনের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে কমেই গেছে। কাজেই সেচের ছোট প্রকল্পগুলি প্রায় সর্বত্রই অসম্ভব: আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রথম দশকের কৃষিনীতি আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘ সময়ের দিক থেকে চিন্তা করলে চীনের কৃষি ব্যবস্থার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে

সাহায্য করে নি। আইন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসায় এবং জমি ও শ্রমের আরও নিবিড় ব্যবহার সম্ভব করে তোলায় কিছু কিছু স্বল্পমেয়াদী লাভ হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনের কৃষি কর্মকৌশলের প্রথম যুগে নতুন প্রযুক্তি বিচার প্রবর্তন বা কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য শিল্পজাত উপাদানের উৎপাদন বা সার্বিক প্রয়োগ কোনটাই সম্ভব হয়নি।

(ক্রমশঃ)

জয়ন্তী প্রকাশনের কলেক্টিভ নই

নেতাজী প্রসঙ্গে :

—অন্যান্য বই—

স্বভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০
৩ ও ৪য় খণ্ড ১৩.৫০
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়
সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০
স্বভাষচন্দ্র ও আশনাল প্ল্যানিং
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬.০০
NETAJI SPEAKS
Volume One
A collection of speeches & writings
Paper back 4/- Board 5/-

ঐ মহামানব আসে : চারদিক ৬.০০
চিন্তাজয়ী চিন্তরঞ্জন
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০.০০
রামমোহন
সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত ৪.০০
সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ
অনিল রায় ৪.০০/৬.০০
বাংলাদেশের বিপ্লব
সুনীল দাস ১.২৫
ধর্ম ও বিজ্ঞান
অনিল রায় ২.০০

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

এত কামল স্মার্ম জীব্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সত্ত্ব
প্রসুতিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমারি সুন্দর দেখাই
এই মেখেই তো।



মাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরঙ্গ

মাধনা প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৫

সেদিন শান্দক কচ্ছ প্রভাতে

ডম্বরধারী

জায়গাটিতে মাহাতোদের সংখ্যাও কিছু কম নয়, তবে এদের মধ্যে প্রকৃত মিল বলতে কিছু নেই। শিক্ষিতের সংখ্যাও খুবই অল্প। যাওয়া আছে তাদের হাবভাব ও অশিক্ষিতদের মতই। অনাগ্র হাবভাবও আদিবাসীদের মতই। কিন্তু নেই তাদের মত চরিত্রবল। সমাজের কথা উঠলে তারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে তারা কূর্ম ক্ষত্রীয় এবং শিবাজীর বংশধর। পৈত্রেও অনেকে নিয়েছে, অবশ্য সন্ধ্যা আহ্নিকের প্রয়োজন হয় না। আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা ঝাড়খণ্ডী। স্কুল, কলেজের মাহিনা মকুব করবার জন্য একজোটে তখন সবাই Scheduled Caste এঁদের অগ্রতম নেতা হলেন গরল মাহাতো। ইনি শিক্ষিত। অসাধারণ বুদ্ধিমানও। দিনে এবং রাত্রে ভোল পাণ্টাতে তাঁর জুড়ি নেই বললেই হয়। দুই পক্ষই তাঁকে নিজেদের দলের বলেই জানেন। আবার ভেতরে ভেতরে তিনি ঝাড়খণ্ডের টিকিটের চেষ্টাও কম করেন না। মাতৃভাষা বাংলা হলেও, নিজেকে বাঙালী বলতে লজ্জা বোধ করেন। তবে নীতি বলতে কিছুই নেই। স্বার্থের খাতিরে বাঙালীর পায়ে পড়তেও তাঁর আটকায় না। টুডু, বেশা, মাণ্ডি, হাঁসদা, সরেন, হেমব্রোম, কিসকু ইত্যাদি এখানে

আষাঢ় ১৮২-৬

অনেক। কিন্তু চেহারা বা কথা না বললে তাদের আদিবাসী বলা সম্ভব নয়। শুধু টেরিলিন, টেরিকটই নয়, ছেলেমেয়েদের প্রসাধন দ্রব্য সস্তাদরে হলেও কলকাতাকে হার মানিয়ে দেয়। কাঁধে শ্রায় প্রত্যেকেরই দেখা যায় যে ট্রানজিষ্টার সেট এবং মুখে চারমিনার। মাদলের আওয়াজে আজকাল এরা আর ভিড় জমায় না। ভিড় জমায় হিন্দি বইয়েতে আর মূলতঃ এখানকার আদিবাসী বলতে এরা এবং মাহাতোরাই।

আদিবাসীদেরও একজন নেতা আছেন। অবশ্য তাদের স্বার্থে নয়। নিজের এবং শেঠেদের। তাই ভোটার সময় ঝাড়খণ্ডের থেকে দাঁড়িয়েও শেষ মুহুর্তে শেঠেদের স্বার্থে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতেও দেয়ী হয় না। যদিও বেশ কিছু মোটা অর্থের বিনিময়ে। আদিবাসীদের নিয়ে যে তিনি আন্দোলন করেন না তা নয়। তবে কোন সময়ই টেবিল-চেয়ার ছেড়ে নয়। আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য 'অলচিকি' ভাষার জন্য মোটা মোটা চাঁদা আদায় করা এবং সেই চাঁদা স্কুদে খাটানো। ছেলেমেয়েদেরও ইনি ইংরেজী স্কুলে ছাড়া পড়ান না। এবং মিশতেও দেন না অথ কোন আদিবাসীদের সঙ্গে।

সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ইত্যাদি থেকেও এসেছেন বেশ

কিছু মানুষ। এখানে বিড়ির পাতা পাওয়া যায় প্রচুর। এই ব্যবসাতেই তাঁরা বেশীর ভাগ নেমেছেন। রোজগারও বেশ মোটাই হয়। সুবিধাও অনেক, কারণ এখানে কারিগরদের যা দেওয়া হয়, তা ভারতবর্ষে সব চেয়ে কম, মাড়োয়ারীদের সঙ্গে এঁদের বনে না। তাই এঁরা নিজেদের সমাজ পৃথক করে নিয়েছেন। অবশ্য মুখে এঁরা স্বগড়া করেন না। বরং বলা যায় শাস্তিপ্রিয়ই। এঁদের মধ্যে একজন হলেন কেশব ভাই। অনেকদিন ধরেই এখানে রয়ে গেছেন। দেশে ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবকিছুই আছে। মাঝে মাঝে খরচাও পাঠান এবং মুখ পালটাতেও যান। তবে সত্যিকার ঘরসংসার এখানেই। বয়সও হয়েছে। তাই ঘরসংসার অনবরত পাতলেও বাড়তি দায়িত্বের ভার বহন করতে হয় না, শাড়ীটা, জামাটা দিলেই চলে। সমাজে স্থানও করে নিয়েছেন। পূজার্চনাতেও মোটাটাকা খরচা করেন, যেমন করেন হাঁড়িয়াতেও।

দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ ক'য়ের লোকরাও বেশ কিছু এখানে এসেছেন। ট্রাভের কারবারে আজও এঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য কেউ কেউ কাপড় ইত্যাদির দোকানও করেছেন। কিন্তু সবই এহ বাহ্য। এঁদের প্রধান ব্যবসা নারী কেল্লিকা ইম্পাত নগরীতে বেশ চড়া দামে নারী সরবরাহ এঁরাই করে থাকেন। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে ভাড়াও দেন। বাঙালী নারীদের জন্তু দামও পাওয়া যায় প্রচুর। তাই এখানকার বাঙালী

অধিবাসীদের অর্থকষ্ট দেখা দিলেই, এঁরা হাজির হন অকুপণ হস্তে সাহায্য করতে। দাদনও দেন ক্ষেত্র বিশেষে। তাঁরপর হঠাৎ কিছুদিন বাদে নিখোঁজ হয় উদ্ভিন্ন যৌবনা থেকে আরম্ভ করে ৩০।৪০ বছর বয়সের নারীরাও। কেউ কেউ আবার কিছুদিন বাদে ফিরেও আসে আপন আপন গৃহে। কোন বাদবিসংবাদও হয় না। খড়্গ সিং এঁদের নেতা। না, তাঁর কিন্তু এসব বদনাম নেই। অর্থের জন্তু এসবের প্রয়োজনও তাঁর নেই। এখানকার শেঠীদের তিনি ঘরের লোক। কাউকে গুম করতে বা খুন করতে কিছুদিন আগেও এঁর জুড়ি ছিল না। এখন তাঁর কার্যস্থল ইম্পাতনগরীতে। শুধু সপ্তাহে নূতন নূতন মধুচন্দ্রিমার জন্তু তিনি এখানে একবার করে আসেন। না এখানকার নারীদের উপর তাঁর কোন লোভ নেই। এসব ব্যবসায় টাকাও খাটান না। তবে লোকে বলে ওয়াগান ব্রেকিং এ তাঁর তুলনাও নাকি নেই।

বাঙালী সমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা পিনাকীবাবু। সত্যিই সদাশিব লোক তবে অত্যধিক কুপণ এবং বোকা। তাঁর হাতে যে কিছু কিছু শেঠরা বরাবরই তামাক খেয়ে যাচ্ছেন, তা তিনি বোঝালেও বুঝতে চান না। আর কার্পণ্যের ফলে বড় বড় সুযোগ সুবিধা প্রায়ই হারিয়ে ফেলেন। মানে, খাতিরে, পদমর্যাদায় এবং চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে বড় হয়তো এখানে কেউই নেই। কিন্তু তবুও তিনি কোণঠাসা হরে থাকেন নিছক কার্পণ্যের জন্তুই। তবুও তাঁকে মানুষ ভাল না বাসলেও শ্রদ্ধাই করে।

অবশ্য এ শ্রদ্ধা আরও বাড়তো যদি তাঁর ভাইরা
অন্ততঃ তাঁর মত হতো, কিন্তু তা হয়নি।

স্কুল হাসপাতাল ইত্যাদি এখানে সবই আছে।
Buildingগুলি দেখলে লোকে অবাকই হয়। কিন্তু
না হয় লেখাপড়া, না হয় রুগীর চিকিৎসা। সবই
কালোটাকাকে সাদা করবার যত্ন বিশেষ। কলেজও
এখানে একসময় হয়েছিল কিন্তু চলেনি। কলকাতার
বেয়াড়া অধ্যাপকরা একজন B. A পাশ
ভ্রমলোকের অধীনে চাকরী করতে রাজী হননি
বলে। এই অধঃপতনের যুগেও শিক্ষায় পতিতাবৃত্তি
তাঁরা মানতে পারেন নি।

এখানকার কর্ণধাররা সাংস্কৃতিক দিকটার উপর
খুবই কড়া নজর রাখেন। অজস্র বান্দাদের মনের
খোঁরাকও তো জোগান দেওয়া দরকার। তাই
সারা বছর ধরে যাত্রা, খেমটা নাচ, কাওয়ালী,
আদিম পরিবেশে নারী নৃত্য তাঁরা পরিবেশন করেন
তবে অর্থের বিনিময়ে। কুলোকেরা বলে এঁরা
এই সমস্তের মাধ্যমে, বছরে ৫০৬০ হাজার টাকা
কামিয়েও নেন।

না, এঁরা অধার্মিক নন, বিরতির সময়গুলিতে
নিঃ খরচায় রামলীলাও করে থাকেন। ইহকাল
এবং পরকালকে ভোগ করবার এমন প্রকৃষ্ট
পন্থা সাম্যবাদী চিন্তনায়কও কল্পনা করতে
পারেননি। ষাঁ এঁরা পেরেছেন রামায়ণ,
মহাভারত থেকে। শুধু বান্দাদের জন্তুই
নন, হেলে সাপদের জন্তুও এটা তাঁরা করে
থাকেন। জাতসাপ বা গোখরোদের বেলায় এসবে

কিছু কাজ হয় না। তাই তখন তাঁরা সাহায্য নেন
প্রথমে দালার এবং তাতেও যখন কোন কাজ হয় না
তখন এক বাঙালী দালালের সাহায্যে তাদের চরম
পন্থী বলে ধরিয়ে দেবার চেষ্টাও করা হয়।

গলায় কণ্ঠী না রাখলেও, ধর্মে এঁরা বলা যায়
বৈষ্ণব। প্রকাশে মাছ, মাংস, ডিম কোনটাই
খাননা, তবে পানীয়টা চলে, নিরামিষ ছোলাভাজার
সঙ্গে। বিষ্ণুর ভক্ত এঁরা নন। বরং বলাচলে
বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। তাই একাধিক নারী
সম্মুখে এঁদের দ্বিধা নেই, যেমন নেই বৈধ অবৈধ,
সংস্কারও। ছাগীছক খাওয়ার ফলে ধর্মেও এঁরা
ছাগের মতনই, যদিও খান না ছাগ মাংস প্রকাশে
ছাগ হত্যাও এখানে নিষেধ। মাংস এঁদের লালসার
তৃপ্তির জন্তু অসুবিধাও কিছু হয় না। অর্থের
বিনিময়ে বহু স্বামী, ভ্রাতা, এবং পিতা নিজেদের
প্রেমসী, ভগ্নি এবং ছহিতাকে এঁদের হাতে অর্পণ
করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। রোজগারও
এতে কিছু কম হয় না। এখানের এক কুখ্যাত
ওয়াগান ত্রেকারের কথায় বলতে হয় সমস্ত বড় বড়
বাড়ীগুলির পিছনের ইতিহাসে রয়ে গেছে রেলের
পাইপ এবং নারী বিক্রয়ের টাকা। অনাথ নারীও
মুজার বিনিময়ে সহজলভ্য। প্রেম এঁদের কাছে
কেতাবের বস্তু, জৈষক্ষুধাই সব।

অবশ্য প্রেম প্রেম খেলা যে শেঠেদের ছেলে-
মেয়েদের মধ্যে চলে না তা নয়, বরং বেশীই চলে।
Lyndol ইত্যাদির সহায়তায় বাড়তি মাশুলও কিছু
দিতে হয় না। তাই খেলার অবসানে, পাত্রপাত্রীর

নৃতন করে আনন্দে ঘর বাঁধতেও দেবী হয় না। বিপদ হয় যখন অশু সমাজের মধ্যেও অশুপ্রবেশের ঝাঁরা মাহ মাংস নিয়মিত খান, তাঁরাও হিংসাকে প্রস্রায় দেননা। প্রয়োজনও নেই। লাঠি বাজী গুণ্ডাবাজীর বিপদও অনেক। তা এঁরা জানেন। তাই সকলেই গদীয়ান তোয়াজ করেন। আপদে বিপদে তাঁদেরই ত্রীচরণ ভরসা করে এঁরা রামেরাম রামে ছুই করে জীবনটাও কাটিয়ে দিতে চান।

এখানে রাজস্থানের শেঠেদের মুখ্য ব্যক্তি হলেন শেঠ গাণ্ডেরী লাল। তাঁর বোলবোলাও সবচেয়ে বেশী। প্রতিপক্ষ হলেন হিম্মৎ সিংকা। তবে এঁদের ভিতরে প্রকাশ্য কোন ঝগড়া নেই। আছে তাঁদেরই শিখণ্ডী পিনাকী বাবুর সঙ্গে তাঁর খাতিরও কিছু কম নয়। ছপক্ষের প্রকাশ্য দিবালােকে মুখ দেখাদেখিও নেই। মন্দলোকে কিন্তু অশু কথা বলে। তারা বলে খানের দাম কমাবার সময়, চালের দর বাড়ার সময় বা ইনকামটাক্স ও পোখরো সাপেদের ক্ষেত্রে এঁরা নাকি ছুজনেই হরিহর আস্রা। মুখ দেখাদেখ না থাকলেও, ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁদের কথা বলতে আটকায় না।

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য ছুদলের প্রচণ্ড রেবারেখিই দেখা যায়। একজন হাসপাতাল করলে অপর জন দরখাস্তের পর দরখাস্ত প্রেরণ করেন। আর অপরজন যদি রাস্তা করতে চান, তবে অশুপক্ষ সেই করবার যুক্তি মেতে ওঠেন। নিত্য নৃতন কুংসা

রটনাও করে চলেন এক অপরের। ছেলে-মেয়েদেরও পড়াশুনাও করতে দেওয়া হয় না বিপক্ষ দলের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে।

সবই ঠিক চলছিল। রামায়ণ গান, কাঙালী-ভোজন মানুষের অখাত চাল বিতরণ অল্লীল যৌন আবেদনপূর্ণ নাচ, পান ইত্যাদি এখানকার মানুষকে বাস্তব থেকে অনেক দূরে সরিয়েও রেখেছিল। পশ্চিমবাংলার অশনিসংকেতকে এঁরা গ্রাহ্যও করেননি। ছু একজনও যে একথা আলোচনা না করেছিলেন তা নয়, কিন্তু ক্ষীতোদর টাকার থলি-গুলির উপর তাকিয়ে এবং স্থানীয় কতৃপক্ষের পদ-যুগল ভরসা করে তাঁরা এতে পা করেননি। তবুও এদের মনগুলিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেবার জন্তু একই সঙ্গে এক বাঙালী কাগজের এজেন্ট মারফৎ “সুন্দর জীবন” “দেহ ও মন” ইত্যাদির গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া আর একমাস বাপি রাম নাম যজ্ঞও শুরু করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন অবোধ মেঘ শিশুদের জন্তু আর কিছুই প্রয়োজন নেই।

সেই বাঙালী কাগজের এজেন্ট হাত করেই অন্যায় এমন কি তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অবশ্য প্রকৃত ‘পক্ষে গদীয়ান কণ্ঠি’ কাগজগুলি গুলির আমদানীও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিতেই এখানকার ছেলেমেয়েদের পারত পক্ষে ‘ভ্রষ্ট’ এবং নজ্রালদের দেশ কলকাতায় যেতেও দেওয়া হয় না। এখন কড়াকড়িটা আরও কিছু বাড়িয়েও দেওয়া হয়। (ক্রমশঃ)

২০২বি, বিধান সরগিষিত কলি-৬ শোবর্ধন প্রেস হইতে ত্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২'০০
পকেট গীতা	৫'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০'০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭'৫০
Soul of India Speaks	৭'৫০
কর্মবাণী	১'৫০
শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা	১'৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২'০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.	
বিভাসাগর	৩'০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩'০০
ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের	
তরুণ তুর্কী	৩'০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড	৩'২৫
বেহুইনের দেশে	৩'০০
নিবেদিতা	১০'০০
বিভাসাগর	১০'০০
শিবরামের কিশোর নাটক	২'০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪'০০

মুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০
বীরসে বাঙালী	৩'৫০
বিভ্রান্তে বাঙালী	৫'৫০
বাংলার ঋষি	৫'০০
বাংলার বিদুষী	৩'৫০
বাংলার মনীষী	১'৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩'০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২'৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪'০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২'৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩'০০
জীবনগড়া	৭৫
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪'০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান	
৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত	
সংস্করণ)	
শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	
সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬'০০

আয়রনমান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ	শরীর ও শক্তি	৩'০০
নিবারণ	সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩'০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	২'৫০
হাতীদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	১'০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২

29 JUL 1975

ADDS A SMILE TO YOUR DISHES

IT'S NOT ONLY
ALL GOODNESS
BUT ALSO A SIGN OF
GOOD TASTE



LAKHMI GHEE

*makes
your dishes
delicious
and
pleasing
too!*





୮୦ ବର୍ଷ
ଆବଣ : ୧୦୪୨

ଅଭିଯନ୍ତ୍ରୀ-ଅନୁାଦିକା : ଲିଳା ବାହା

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

মূলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২.০০	ব্যায়ামে বাঙালী	৪.০০
পকেট গীতা	৫.০০	বীরসে বাঙালী	৩.৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০.০০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৫.৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭.৫০	বাংলার ঋষি	৫.০০
Soul of India Speaks	৭.৫০	বাংলার বিদুষী	৩.৫০
কর্মবাণী	১.৫০	বাংলার মনীষী	১.৭৫
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১.৫০	রাজর্ষি রামমোহন	৩.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২.০০	মৃগাচার্য বিবেকানন্দ	২.৫০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.		আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪.০০
বিভাসাগর	৩.০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২.৫০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩.০০	রবীন্দ্রনাথ	৩.০০
ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাসের		জীবনগড়া :	৭৫
তরুণ তুর্কী	৩.০০	ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪.০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড	৩.২৫	(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান	
বেজুইনের দেশে	৩.০০	৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত	
নিবেদিতা	১০.০০	সংস্করণ)	
বিভাসাগর	১০.০০	শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	
শিবরামের কিশোর নাটক	২.০০	সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬.০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪.০০		

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ		শরীর ও শক্তি	৩.০০
নিবারণ	৫.০০	সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩.০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩.০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	২.৫০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩.০০	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	১.০০

প্রসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২

সূচীপত্র

জয়ন্তী : শ্রাবণ : ১৩৮২

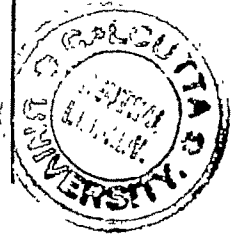
বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিজয়িণী নাই ভব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭৩	ভারতের জাতীয়তা ও শ্রুতযজ্ঞ		
বর্তমান প্রসঙ্গ		১৭৪	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ক্ষণেশ্বর ঘোষাল		২০৩
আন পারসন্	অভয়শঙ্কর শর্মা	১৭৯	ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সান্নিধ্যে		
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শিক্ষার			জ্যোতিরীন্দ্রনাথ মজুমদার		২০৫
ক্রমবিকাশ	শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৮০	চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও		
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)			সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য		
নরেন গোঁসাই যেদিন			(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) অধ্যাপক রাধাধর দত্ত		২০৮
রাজসাক্ষী হলেন	পুলকেশ দে সরকার	১৮৯	সেদিন শারদ স্বচ্ছ প্রভাতে ডিম্বকধারী		২১১
(বিপ্লব-যুগের এক বলক)			(সত্যঘটনা অবলম্বনে গল্প)		
নেতাজী-সুভাষ	অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন				
(নাট্যীকৃত ইতিহাস)		১৯৬	সম্পাদক : সুনীল দাস		

শারদীয় জয়ন্তী

জয়ন্তীর শারদীয় সংখ্যা প্রতিবারের মত
এবারেও নানাবিধ উপকরণ নিয়ে মহানয়ার পূর্বে
প্রকাশিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণ ভাদ্র সংখ্যায় থাকবে।

কর্মধ্যক্ষ, জয়ন্তী



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

* সংস্কৃতি বিষয়ক *

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

৫.৫০

বাংলার লোকনৃত্য

২.৯০

বাংলার উৎসব

১.২৫

* পুরাকীর্তি বিষয়ক *

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি

২.৫০

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

৪.০০

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

৩.৭৫

* শিল্প বিষয়ক *

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা

(হস্তশিল্প)

১.২৫

* বিবিধ বিষয়ক *

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

৫.০০

বাংলার শিকার-প্রাণী

৩.০০

দেশের গান

০.৫০

চিত্রে ভারতের ইতিহাস

৪.৬২

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব

২.০০

* বিভিন্ন জেলা সম্পর্কিত *

(ইংরেজী গ্রন্থমালা)

জগলী জেলা গেজেটায়ার ৪০.০০

বাঁকুড়া জেলা গেজেটায়ার ২৫.০০

পশ্চিম-দিনাজপুর

জেলা গেজেটায়ার

১৫.০০

মালদা জেলা গেজেটায়ার ২০.০০

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়,

৫৮, পোপালনগর রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭



প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন,

১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

ଜାୟଜୀ

୪୦ ବର୍ଷ • ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା • ଜୁଲାଇ ୧୯୮୨

୩

ବିଚାରିନୀ ନାହିଁ ତବ ଡର,
ନୁହେଁ ତ ଶରଣ ତର କର।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପରାଧ
ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ,
କହିଲୁ ଏହି ନୀତିକର ॥

ସିଦ୍ଧିବିଧାନାୟକ

୩୦ ଜାନୁଆରୀ
୧୯୮୨

বর্তমান প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার শতবর্ষ পূর্তি

১৪ই জুলাই রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের গীতি-রচনার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সম্পন্ন হল। রবীন্দ্র সঙ্গীতের নয়। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত সঙ্গীতের শতবর্ষ এখনো কিছু বাকী আছে। তাঁর প্রথম গান ১৩ বছর বয়সের লেখা 'পগনের খালে' এটা বাংলা অমুবাদ—নিজের প্রথম রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক 'সরোজিনীর' জন্ত।

সংবাদ নিয়ন্ত্রণ

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বিষ্ণুচরণ গুপ্তা ৯ই জুলাই ১৯৭৫ দিল্লীতে এ সম্পর্কে বলেন ; সংবাদ পত্রে ভিত্তিহীন গুজব কিম্বা সরকারী কর্মচারী এবং সশস্ত্র-বাহিনীর লোকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এমন কোন মতামত বা সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না।

তিনি আরও বলেন ; অপ্রাসঙ্গিকভাবে মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জাতীয় নেতাদের উদ্ধৃতি চলবে না।

দামবাড়লো

১০ই জুলাই দিল্লী থেকে সরকারী ঘোষণায় কয়লার দাম প্রতি মেট্রিক টনে সারে ১৭ টাকা। ইম্পোর্টের দাম প্রতি মেট্রিক টনে ৮০ টাকা ১লা

জুলাই থেকে বাড়ানো হল। কয়লার দাম মণ প্রতি প্রায় ৬৫ পয়সা বাড়বে, খুচরা ক্রেতার জন্ত আরও বাড়বে। আর ১৪ই জুলাই থেকে সুপিরিয়র কেরোসিনের দাম বাড়লো লিটার পিছু ৫ পয়সা, হাই স্পিড ডিজেল তেলের লিটার পিছু ৮ পয়সা এবং এল, পি, গ্লির (গ্যাস) সিলিন্ডার পিছু ২.৫০ টাকা।

১৫ই জুলাই থেকে অ্যালুমিনিয়াম মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারের হাতে উৎপাদনের শতকরা মোট ৫৫ ভাগ তুলে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের অবশিষ্ট ৪৫ ভাগের উপর কোন মূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, ফলে খোলাবাজারে অ্যালুমিনিয়ামের দাম বাড়বে।

ট্রাম ও বাসের ভাড়া

১লা আগষ্ট থেকে ভাড়া বেড়েছে। ট্রামে প্রথম শ্রেণীর ন্যূনতম ভাড়া কুড়ি পয়সা, ১৮ পয়সারটা ২৫ পয়সা, ২০ পয়সারটা ৩০ পয়সা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০ পয়সারটা ১৫ পয়সায় ১৫ পয়সারটা ২০ পয়সা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কনশেশন অপরিবর্তিত থাকবে।

১লা আগষ্ট থেকে সরকারী ও বেসরকারী বাসের ভাড়াও বেড়েছে, ন্যূনতম ভাড়া ২০ পয়সা। ছাত্রদের কনশেশন চলবে।

সংসদ অধিবেশন

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা লোকসভায় ৩৩৬—৫৯টি এবং রাজ্য সভায় ১৩৫—৩৩ ভোটে গৃহীত হয়।

জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে বিচারালয়ের এজিয়ারের বাইরে রাখবার সংবিধানের ৩৯ তম সংশোধনী বিলটি লোকসভায় ২৪৪-৬৩ ভোটে উত্থাপনের মঞ্জুরি পাওয়া যায়। এই সংশোধনীতে রয়েছে একই সময়ে বিভিন্ন কারণে একাধিক জরুরী অবস্থা জারি থাকতে পারে। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকদের এ-বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারী করার অধিকার চূড়ান্ত, কোনো কারণেই আদালতে এর বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাবে না। বিলটি লোকসভায় ৩৪২—১ ভোটে এবং রাজ্য সভায় ১৬৪ ভোটে গৃহীত হয়। বিপক্ষে কেউ ভোট দেন নাই। বিলে সংবিধানের ১২৩, ২১৩, ২৩৯খ, ৩৫২, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬০ ধারা সংশোধন করা হয়। সংসদে প্রস্তোত্তর, দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাব কিম্বা কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত প্রশ্ন জ্ঞাতার অধিকার বাতিল করে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রঘুরামাইয়া যে প্রস্তাবটি আনেন দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর ৩০১—৭৬ ভোটে তা গৃহীত হয়। রাজ্য সভায় অম্লরূপ প্রস্তাব খনি ভোটে গৃহীত হয়। তার আগে ডাঃ ম্যাথু কুরিয়ানের একটি প্রস্তাব ৩২-১৪৭ ভোটে বাতিল হয়।

মিসা সংশোধন করে ২৯ জুন এবং দ্বিতীয়বার সংশোধন করে ১৫ই জুলাই যে অর্ডিন্যান্স জারি

করা হয়, সেটি বিল আকারে লোক সভায় প্রেরণ করার অধিকার ২৮০-৫৩ ভোটে দেওয়া হয়। এই বিলের উদ্দেশ্য যতদিন জরুরী অবস্থা জারি থাকবে ততদিন মিসায় আটক বন্দীরা—বিদেশী নাগরিকসহ—সাধারণ আইন, আভাবিক স্থায় বিচারের বিধিগুলির অথবা ব্যক্তিগত অধিকারের আশ্রয় নিয়ে বিচারালয়ে যেতে পারবেন না। মিসায় আটক এড়ানোর জন্ত যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের সম্পত্তি ক্রোক করার ব্যবস্থাও আছে। এই সংশোধনী ২৫শে জুন থেকে কার্যকর হবে।

ভারত রক্ষা আইনেরও একটি সংশোধনীর ফলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগও এই আইনের আওতায় এলো।

বহিষ্কার

চন্দ্রশেখর, মোহন ধারিয়া, কৃষ্ণকান্ত, রামধন, লক্ষ্মী কণ্ঠায়ামা, এস, এন, মিশ্র, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শের সিং গুজরাতে প্রাক্তনমন্ত্রী আমূল দেশাইকে কংগ্রেস দল থেকে সামপেণ্ড করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিধানসভার সদস্য বিজয় সিং নাহার, অধ্যাপক শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, কালীকান্ত মৈত্র, কৃষ্ণকুমার গুপ্তা, রামদাস ব্যানার্জি, পরিষদীয়-দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, দল থেকে বহিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছেন অমিয়কুমার কিসকু এম. পিও।

রাশিয়া মার্কিন গণের চড়া খন্ডের

১৯৭২ সালের মত ১ কোটি ৯০ লক্ষ টনের

স্বতঃ এয়ারও সোভিয়েত রুশ বিশ্বের বাজারে অস্বাভাবিক পরিমাণ গম কিনছে। জুলাই মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার বাজার থেকে গম কিনেছে, সেই গম আনবার জন্য ১৯টি জাহাজ ভাড়া করেছে। উত্তর ককেশাসের কুবান অঞ্চলে অত্যধিক গরমের জন্য রুশে অসুস্থিত গমের লক্ষ্য-মাত্রার চাইতে ১ কোটি খাত্তশস্ত টন কম উৎপাদন হবে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের অনুমান আগামী বারমাসে ভারতবর্ষ ৬০ লক্ষ টন খাত্তশস্ত আমেরিকার বাজারে খরিদ করবে। কিন্তু সোভিয়েতের খাত্তশস্ত জন্মের ফলে বাজারে খাত্তশাস্তে ঘাটতি মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় জীবনের চেয়ে গণতন্ত্রের গুরুত্ব বেশী নয়

১০ই জুলাই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে লায়ল ক্লাব ও লায়ল ইন্টারন্যাশনাল সদস্যদের নিকট গণতন্ত্রের এই মূল্যায়ন করেছেন। গণতন্ত্র কী জীবন-বোধ নিরপেক্ষ?

মহাকাশে বৌধ অভিযান

তিন বছর পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহাকাশে রুশ-মার্কিন মিলনের ঐতিহাসিক শুভারম্ভে ১৫ই জুলাই মস্কোর ২২৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সোভিয়েত মহাকাশ ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত মহাকাশযান স্যুয়জ-১৯ উৎক্ষিপ্ত হল, ১৯৬১র ১২ই এপ্রিল এই ঘাঁটি থেকেই মহাকাশে পাড়ি

দিয়েছিলেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী কর্ণেল ইউরি গাগারিন। স্যুয়জ ১৯ মস্কো সময় বেলা ৩টা ২০ মিনিটে, ভারতীয় সময় ৫টা ৫০ মিঃ কমান্ডার আলেক্সি লিওনোভ এবং ইনজিনিয়ার ভ্যালেরি করশেভকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয়। রুশ নাগরিকরা টি, ভি, তে প্রথম এই ধরনের অভিযানের ছবি দেখতে পেলো।

আর মার্কিন মহাকাশ ঘাঁটি থেকে এপোলো মহাকাশ যান ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ২০ মিঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস ষ্ট্যাফোর্ড ডানস ব্রান্ড ও ডোনাল্ড স্পেটনকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমায়। ১৭ই জুলাই সর্বপ্রথম দুই দৈনের মহাকাশ যান এ্যাপোলো ও স্যুয়জ-১৯ পৃথু গালের নিকটবর্তী আতলাস্তিকের ১২৪ কিলোমিটার উর্ধ্বাকাশে ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ৩০ মিঃ (১৬.০২ জি এম টি) মিলিত হয়ে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করে। ৪৪ ঘণ্টা যুক্ত অভিযানের পর স্যুয়জ-১৯ ১৯শে জুলাই ১৫.২৮ জি. এম. টিতে আধ ঘণ্টার জন্য এপোলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষবারের মত তিন ঘণ্টার বৌধ অভিযান সেরে ২১শে জুলাই কাজাগাস্থানের কারাগুণ্ডায় নেমে আসে আর এ্যাপোলো নেমে আসে ২৪শে জুলাই হাওয়াইয়ের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে।

আর একটি সোভিয়েত রুশ মহাকাশ অভিযান

২৪শে মে স্যুয়জ ১৮ উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশে ভ্রাম্যমান রুশ মহাকাশবিজ্ঞানাগার স্যালয়ুট-৪ এ

প্রবেশ করে ৬৩ দিন ব্যাপী নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গত ২৬শে জুলাই কাজাগানহানের পূর্ব নির্দিষ্ট এলাকায় অবতরণ করেছে। দ্বিতীয় মার্কিন মহাকাশবিজ্ঞানাগার Skylab-১৯৭৩-এ ৫৯ দিনের মহাকাশে অবস্থানের সীমানা স্যালুট-৪ এর রুশ-যাত্রীরা গত ২৩শে জুলাই অতিক্রম করে যায় কিন্তু ১৯৭৩ এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৪ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৮৪ দিন ১ঘণ্টা ৪ মিঃ এর আমেরিকার তৃতীয় স্কাইল্যাবের (Skylab) রেকর্ড স্নায়জ-১৮র যাত্রী পিওটর ক্রিমেনক ও ভিটালি সেভাসটিয়ানভ ডিঙাতে পারেনি। রুশমহাকাশ যান স্নায়জ-১৭ ইতিপূর্বে ১৮ঘণ্টা ৩০দিন মহাকাশে অবস্থান করেছে।

রুশ ঐতিহাসিক

আনতেই অমলরিক বলেছেন গ্রেগোরের ভয় দেখিয়ে তাঁকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মস্কো ছাড়তে বলা হচ্ছে। এ পি. মস্কো থেকে ২৩শে জুলাই এই সংবাদ দিচ্ছেন। ইতিপূর্বে অমলরিকের তাঁর লেখার জন্ত পঁচবছর কারাদণ্ড ও নির্বাসন জুটেছে। তাঁর কাছে রুশ দেশে বাস করবার কোন আভ্যন্তরীণ ছাড়পত্র নেই। “Will Soviet Union Survive in 1984?” এই বইটি লিখে অমলরিক কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এই বইটিতে অমলরিক ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন ১৯৮০র পূর্বে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধবে, রাশিয়ার অভ্যন্তরে দারুণ রক্তাক্ত অভ্যুত্থান হবে যার ফলে মোন্ডিয়েত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবে এবং এই ভয়ঙ্কর দুর্ধোগ সারা পৃথিবীতে হিংসার বজ্রা বইয়ে দেবে।

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ম

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১২'০০। ষাণ্মাসিক ৬'০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্মস্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্ম

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাপেক্ষে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে স্কলস্কাপের একপৃষ্ঠার লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
- কবিভা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।
৪. রচনা কেয়ং চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্ম আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬

‘আন্-পারসন্’

অভয়শঙ্কর শর্মা

আন্-পারসন্! কথাটা আনকোরা না হলেও নতুন। মাত্র কয়েক বছরের পুরাণো বটে, তবে বহুল ব্যবহার নেই। তার কারণ কি এই যে কথাটার ব্যবহারের ক্ষেত্র তেমন প্রশস্ত নয়? অথবা কথাটা বলতে কি বোঝায় তা বেশী লোকের জানা নেই?

‘আন্-পারসন্’ কথাটা কি একেবারে ভুঁইফোড়? বানানো? না, এর কোনো ব্যুৎপত্তিগত পটভূমি রয়েছে? ভাবের ব্যাঞ্জনা, শব্দের উৎপত্তির উৎস। নতুন শব্দের পটভূমিই তাই। সার্বক শিল্পীরা তাঁদের লেখাতে এই ভাবেই নতুন নতুন শব্দের যোজনায় তাদের নিজ নিজ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কথাটাতো একটি ইংরেজী শব্দ: ‘Un-Person’। Person, অর্থাৎ ব্যক্তি, এই শব্দটির পূর্বে মাত্র একটি উপসর্গের যোগফল ‘Un-Person’ বা ‘আন্-পারসন্’। ‘un’ বা ‘আন্’ মাত্র এই একটি উপসর্গ যোগে ‘ব্যক্তি’ বা ‘পারসন্’ তার স্বভূমিচ্যুত হল।

কিন্তু ‘ব্যক্তি’ বা ‘পারসন্’ অতঃপর কোথায় গিয়ে পৌঁছালো? সেটাই তো প্রশ্ন। একটি মাত্র উপসর্গ যোগে সে ব্যক্তি আর সে-ব্যক্তি রইলো না।

তার চূড়ান্ত রূপান্তর ঘটে গেছে। একটি মাত্র শব্দের ষাটতে পূর্বকার ব্যক্তিকে একেবারে নতুন ভূমিকায় ঠেলে দেওয়া হল। একটি মাত্র শব্দ বা উপসর্গের যোগে ব্যক্তির রূপান্তর ঘটলো, রূপান্তরিত ব্যক্তি একটি নতুন শব্দের আড়ালে আত্মগোপন করে আত্মীয় পেলো। তা যদি না হতো, যদি একটি নতুন শব্দের ঘেরা-টোপে স্বভূমিচ্যুত ব্যক্তিটি নিজেকে জড়ো-সড়ো করে না রাখতো, তার ঠাই হয়তো জুটতো না। সে-ব্যক্তি একেবারে হারিয়ে যেতো। হয়তো বিস্মৃতির তমিস্রায় আবৃত হয়ে ‘আন্-পারসন্’-এর দিন কাটতো।

‘পারসন্’ আর ‘আন্-পারসন্’-এর লুকোচুরি ডায়ালেকটিকের কোনো ছলনা নয়। ডায়ালেকটিক বিচার-পদ্ধতিতে কুঁড়ি এবং অ-কুঁড়ি অর্থাৎ চারা-পাছের সহ-অবস্থান চলতে পারে। ‘কিশোরও বটে সুবাস বটে’—একব্যক্তির এই দ্বৈত-সম্বন্ধ চলতে পারে কিন্তু পারসন্ আর ‘আন্-পারসন্’-এর তেমন সহ-অবস্থান একেবারে অসম্ভব, অকল্পনীয়, অবাঞ্ছনীয়। এই দুইটি শব্দের দুইটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান। স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্ব-ভূমিচ্যুত

হলেই নতুন ভূমির ব্যক্তিরূপে তার রূপান্তর ঘটতে পারে—'পারসন'-এর মেরু থেকে 'আন-পারসন'-এর মেরুতে আশ্রয় পেতে পারে।

'আন-পারসন' শব্দটির বাংলা ভাবান্তর কি হতে পারে? 'কেউ-কেটা নয় ব্যক্তি'! কিন্তু সাদা-মাটা পারসান বা ব্যক্তি তো সচরাচর 'কেউ-কেটা' হয়ে থাকে না। শতকরা নিরানব্বই জন ব্যক্তিই তো 'কেউ-কেটা-নন', তবেই কি তারা সবাই 'আন-পারসন'। না তাও নয়। সমাজে যারা 'কেউ-কেটা' অর্থাৎ 'ভেরী ইম্পরট্যান্ট পারসন'—Very Important Person—সংক্ষেপে 'ভিপ্'—না হয়েও স্বকীয়তায় বিশিষ্ট, তারা সাধারণের সমতলে মিশেও তাদের বৈশিষ্ট্যের স্বভূমিতে স্থান করে নেয়। সাধারণের মধ্যেও কম-বেশী ব্যক্তিক্রমরূপেই তাদের সামাজিক পরিচয়। জীবনে তাদের পরিপূর্ণতা না এলেও তারা রিক্ততা-বোধের পীড়ন-দহন থেকে মুক্ত, পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষ্যপথে তাদের অক্লান্ত যাত্রা চলে অব্যাহত গতিতে।

'ভিপ্'-রা অবশিষ্ট স্বতন্ত্রজাতের ব্যক্তি। যারা একবার 'ভিপ্'-এর শিরোনাম পেয়েছেন সেটা রক্ষা করাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অনিবার্য-ভাবে। তাদের নীতিই হবে—'একদা 'ভিপ্' তাই সর্বদাই 'ভিপ্'—once a VIP, always a VIP।' ভিপ্-এর স্বভূমিতে অবস্থানটাই শেষ-পর্যন্ত তাদের জন্মগত অধিকারের দাবী নিয়ে মাথা উচিয়ে দাঁড়ায়। এটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা ভুল হবে। এটাও একটা সামাজিক

ঘটনা, মনুষ্যচরিত্রের একটি স্বীকৃত পর্যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন 'তোরা রসে বশে থাকিস।' 'কেউ-কেটারা' তাদের স্বকীয় ভূমিতে হয়তো বা এতো স্বাচ্ছন্দ্য রসের সম্ভান পেয়ে থাকেন, যে সে-ভূমি থেকে তাদের সরে যাবার সামান্ত্রতম আঁচ তারা সহিতে না পেয়ে সেই ভূমিতে অবস্থানের জন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠেন। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ তাদের আঙ্গিনায় বেঘোরে মারা যাবে। আর কেনই বা তারা নাছোড়বান্দা হবেন না। এই ভূমি থেকে তাদের প্রস্থান তাদের একেবারে বিপরীত ভূমিতে ঠেলে দেবে—'কেউ-কেটা'র মেরু থেকে একেবারে 'কেউ-কেটা নন'—ওই অপরিজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, হিমশীতল মেরুতে—এটা তারা সহজে মেনে নেবেন কেন, যদিও অনেককেই নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হয়েছে। ইতিহাসে তার নজীরও রয়েছে। সর্বশক্তিমান সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ অকস্মাৎ 'কেউ কেটার' মেরু থেকে 'কেউ-কেটা নন'-এর—'আন পারসন'-এর মেরুতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। যুক্তা এসে তাকে অবজ্ঞাত অস্তিত্বের পরিহাস থেকে মুক্তি দিয়েছে। ষ্ট্যালিনের উত্তরাধিকারী সোভিয়েত রুশ প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকভ আজও 'আন-পারসান'-এর অপরিজ্ঞাত জীবন যাপন করছেন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার তদারকরূপে। আর চেকোস্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধান আলেকজান্ডার ডুবচেঙ্ক একটি কার-পারক্-এর তত্ত্বাবধায়ক-এর কাজ করছেন। তার অপরাধ ছিল

কমুনিজমকে দানবীয় বাস্তবিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে তার একটি মানবীয় রূপান্তর ঘটানোর প্রায় সার্থক উদ্ভোগ। সোভিয়েত রুশের প্রাক্তন ডাক-সাইটে পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ আর এক ব্যক্তি, তিনিও 'আন-পারসন'-এর জীবন যাপন করছেন।

কমতার শীর্ষবিন্দু থেকে যারা বিতাড়িত হয়ে 'আন-পারসন'-এর জীবন যাপন করছেন তারা হলেন 'আন-পারসন'-এর মধ্যেও শীর্ষস্থানীয়। এ-ছাড়া আরও অজস্র ব্যক্তি রয়েছেন যারা সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, কবি, স্থপতি, শিল্পীরূপে প্রখ্যাত ছিলেন কিন্তু গ্রহ-বৈপ্লব্যে রাষ্ট্রীয় বিধানে 'আন-পারসন'-এর জীবনে মেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কোনো কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার, বিশেষভাবে যে-সব রাষ্ট্রে সমাজটা একটা বিরাট কারাগার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে সমাজে মানুষের স্বাধীনতা বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই—লৌহযবনিকার আড়ালে উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলি সম্বন্ধে একথা খাটে—সেখান 'আন-পারসান' হওয়া মানে সব কিছু অধিকার খোঁয়ানো এবং শেষ পর্যন্ত বন্দীশিবিরের কয়েদীর পরিচয়ই তার প্রথম এবং শেষ পরিচয়।

আরও কয়েক ধরনের আন-পারসন রয়েছে। এরা স্বচ্ছায় স্বভূমিচ্যুত হয়ে 'আন-পারসান'-এর জীবন গ্রহণ করেছেন। কোনোও ব্যক্তি পেরুম-ধারণ করে গৃহত্যাগী হলেন তার পূর্বাশ্রমের পরিচয় নিজেও ভুলতে চান অপরকেও ভোলাতে চান। স্ফায়িকভাবে তিনি একজন স্বচ্ছাত্রতী 'আন-পারসান', যতদিন না তিনি নূতন ভূমিতে

প্রতিষ্ঠিত হয়ে কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর নামে পরিচিত হন।

ভূপতি কিশ্বা রাষ্ট্রনায়কদের অজ্ঞাতবেশে প্রজার সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষ করবার অভিযানের ইতিহাস রয়েছে। ভগবান বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে রাজাসন থেকে এই রকম 'আন-পারসন'-এর নৈশ অভিযানে বার হয়ে নিজের চোখে প্রজাদের সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষ করতেন। তার সংসার বিরাগী হবার কারণও এই অজ্ঞাত-অভিযানগুলিতে মানুষের দুঃসহ দুঃখে বেদনার্ত হৃদয়।

পরিচয় গোপন রেখে অনেকে সংসারে চলাফেরা করেন। দেশের কিশ্বা বিদেশের গুপ্তচরদের এই ধরনের কাজ করতে হয়। তবে তাদের আসল পরিচয় গোপন থাকলেও অল্প একটা সামাজিক পরিচয়ের আড়ালে তারা কাজ করে থাকেন। আন-পারসন বলতে যাদের বোঝায় এরা তাদের দলে নয়। আত্মগোপনকারী বিশিষ্টের সারি থেকে সাধারণের সারিতে নেমে এলেও সকল ক্ষেত্রেই আন-পারসন-এর সারিতে প্রবেশাধিকার নাও হতে পারে তার।

আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা কি আন-পারসন? যুগে যুগে দেশে দেশে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে আদর্শ উদ্‌যাপনে ত্রুতী হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা, ভারতবর্ষের বাইরে ইউরোপের বিপ্লবীরাও আত্মগোপন করে সাধারণের জীবনে মিশে গেছেন। লেনিন আত্মগোপন করে দেশান্তরী হয়েছিলেন। আবার আত্মগোপন করে বিপ্লবের প্রাকালে দেশে

কিসে এসেছিলেন জার্মানদের বন্ধ ট্রেনে। আইরিশ বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে স্বাধীনতার লড়াই গড়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ‘জিয়াউদ্দিন’-এর পরিচয়ে আত্মগোপন করে কলকাতা থেকে কাবুল গেছেন এবং সেখান থেকে ‘মোজাট্রার’ পরিচয়ে সোভিয়েত রূপ হয়ে জার্মানীতে পৌঁছান। যে ব্যক্তি ১৯৪০-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী জার্মানীর কিয়ল বন্দর থেকে U-180 জার্মান সাবমেরিনে জার্মান নাবিকদের বিশ্বয়াবিষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে তিনমাস ব্যাপী দীর্ঘ সময় যাপন করেছেন নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে, তাকে কি আন-পারসন বলা যায় ঐ সময়-টুকুর জন্ত? মাদাগাস্কারের নিকটবর্তী সমুদ্রে জাপানী সাবমেরিন I-29-এ স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত U-180-এর যাত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচয় জার্মান নাবিকদের কাছে অপরিজ্ঞাতই ছিল। সেই অসাধারণ যাত্রীকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে নাবিকরা বুঝে নিলেও তার পুরো পরিচয় না জানা পর্যন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাদের কাছে সেই কয়েক-মাসের জন্ত একজন আন-পারসন বৈ আর কেউ ছিলেন না—এক অজ্ঞাতনামা পুরুষ মাত্র।

যাদের আন-পারসান-এর গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হোলো, আর যারা স্বচ্ছায় আন-পারসান-এর জীবন তুলে নিলেন নিজের পরিধেয়রূপে—এই দুই দলের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক রয়েছে।

আন-পারসান-এর জীবন যাদের ওপর অভিশাপ-রূপে নেমে এলো তাদের জীবনের আনন্দ-নিরাপত্তা-আত্মসম্মান নিমেষে বিসর্জিত হোলো, অজানা

প্রাবণ '৮২—২

অন্ধকারের সর্পিণ ক্রুরতার জীবন তাদের অবিলম্বে ঘিরে ফেলে নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়বে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই,—এ বড় অমোঘ, বড় অশ্রান্ত, বড় নির্দয়—মৃত্যুই একমাত্র যা থেকে মুক্তি দিতে পারে অথবা অত্যাচারীদের অকস্মাৎ পত্তনে পটপরিবর্তন হোলো।

আর যারা আন-পারসন-এর গৈরিক নিলেন স্বচ্ছায় সাময়িক ব্রতরূপে, তাদের কথা ভিন্নতর। ব্রত উদ্ভাপনের জন্তই তাদের এই সাময়িক ব্রত গ্রহণ। আন-পারসনদের ভিড়ে মিশে যেতে না পারলে, তারা চিহ্নিত হয়ে যাবেন, ব্রত মাঝপথে ফেলে রেখে তাদের যবনিকার অন্তরালে বিদায় নিতে হবে। এই ব্রতে রোমাঞ্চ আছে, আত্ম-নিবেদনের আনন্দ আছে আবার অ-পরিচয়ের লাজ্জনার অগৌরবও তাদের জন্ত পথের বাঁকে বাঁকে অপেক্ষা করে থাকে কাঁটার মত। স্বচ্ছাত্রতা আন-পারসনকে ভুলে যেতে হবে তিনি ‘কেউ-কেটা’ বা বিশিষ্ট বা সাধারণের সমতলের চাইতে খানিকটা উঁচুতে তার অবস্থান। সুতরাং, অ-পরিচয়ের অবহেলা এবং অপৌরব তাকে কুঁড়োতেই হবে—এটা তার অনির্দিষ্ট পতিপথ। এই অবরোধ ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাবার মত মানসিক গড়ন রয়েছে বলেই বিপ্লবীর পক্ষে এই অবরোধ উত্তরণ সম্ভব এবং মানসিক শক্তির অধিকার বলেই স্বচ্ছাত্রতা বিপ্লবী আন-পারসান অথবা আন-পারসনদের চাইতে স্বতন্ত্র স্বকীয়তায় ভাস্বর।

ভারতীয় জীবনে স্বচ্ছাত্রতা আন-পারসন-এর

আবেদন নিহিত রয়েছে। 'অহং'-এর প্রাচীর ভেঙে জীবাত্মা পরমাশ্রয় লীন হবে, ভারতীয় জীবনবেদের এটাই হোলো অস্তিম ইতিহাস। ভারতীয় অধ্যাত্ম-বাদীরা তাই একদিক থেকে আন-পারসন-এর উদ্বোধক, আন-পারসন-এর 'স্বচ্ছাত্র' তাদের নিরন্তর হাতছানি দেয়। কোনোও পশুশক্তি তাদের আত্মিকশক্তিকে পরাস্ত করে আন-পারসন বানাতে পারে না, অনন্তের প্রেরণায় স্বচ্ছাত্র তারা আন-পারসন বনে যেতে পারেন। এই প্রেরণা তাদের জীবনের গভীরে রয়েছে। যেখানে পশুশক্তির জ্বল

হাতের অবলম্বন কোনোদিন পৌছাতে পারেনি, আজও পারবে না। পরমপুরুষের নিকট নিরাত্মরূপ আন-পারসনরূপে পৌছাতে পারলেই ভারতীয় সাধকের সিদ্ধি লাভ হবে। এই সাধনা পশুশক্তিকে চিরকাল উপহাস করে এসেছে। পরমপুরুষের দরবারেও 'কেউ-কেটা'র ও 'কেউ-কেটা-নয়'-এর —'ভিগ' ও 'আন-পারসন'-এর ভেদাভেদ মুছে যায়। সে-দরবারে সকলকেই আন-পারসনের অস্তিম পরিচয় নিয়ে হাজির হ'ত হয়।

জয়ন্তী প্রকাশনের কলেক্টিব নই

নেতাজী প্রসঙ্গে :

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯'০০ ২য় খণ্ড ১২'০০
ও ৩য় খণ্ড ১৩'৫০
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়
সাধারণ ২'৫০, বাঁধাই ৩'৫০
সুভাষচন্দ্র ও আশনাথ প্যানিং
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬'০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

Paper back 4/- Board 5/-

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

—অন্যান্য বই—

ঐ মহামানব আসে : চারশিক ৬'০০
চিন্তাজয়ী চিন্তরঞ্জন
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০'০০
রামমোহন
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৪'০০
সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ
অনিল রায় ৪'০০/৬'০০
বাংলাদেশের বিপ্লব
সুনীল দাস ১'২৫
ধর্ম ও বিজ্ঞান
অনিল রায় ২'০০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শিক্ষার ক্রমবিকাশ

শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

বয়ন শিল্প

পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে যে সমস্ত হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মধ্যে বয়ন শিল্পকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অস্ত্রান্ত শিল্পের মত ব্যবস্থার অভাবে এটিও প্রায় সমস্ত স্কুলেই অবহেলিত হচ্ছে।

১। পিড়িয়ড—অস্ত্রান্ত শিল্পের মত বয়ন শিল্পের জন্তও হাতে কলমে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কোন কোন স্কুলের কর্তৃপক্ষ মহাশয় যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গে এর ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিটি ক্লাসের জন্ত সপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে দুটি করে পিরিয়ড ছেলেমেয়েদের হাতে কলমে কাজ শেখাবার জন্ত রাখা হয়। এমন স্কুলের দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে হাতে কলমে কাজ শেখাবার জন্ত কোন পিরিয়ড দেওয়া হয়না। অর্থাৎ এই সমস্ত স্কুলে ছেলেমেয়েদের বয়ন সম্পর্কিত ও বই পড়ান হয়। কিন্তু এ জাতীয় শিল্প শিক্ষা নিরর্থক।

২। সময়—প্রায় সমস্ত স্কুলেই অস্ত্রান্ত পাঠ্য বিষয়ের মত বয়ন শিল্পের জন্তও মাত্র ৪০ অথবা ৪৫ মিনিটের পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কোন শিল্পই এই অল্প সময়ের মধ্যে শেখানো যেতে পারে না। অবশ্য কোন কোন স্কুলে শিল্প শিক্ষার জন্ত এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়; ফলে এই সমস্ত স্কুলে কিছু কিছু কাজ শেখান সম্ভব হয়। বস্তুতঃ পক্ষে দেড় ঘণ্টা সময় দেওয়া যে কোন শিল্পের পক্ষে অন্ততঃ প্রয়োজন।

৩। ছাত্রসংখ্যা—প্রতিটি স্কুলেই ছাত্র সংখ্যা মাত্রাধিক হওয়ার ফলে সমস্ত ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা ৫০।৬০ জন হয়। সমস্ত স্কুলেই একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত হন শিল্প শেখাবার জন্ত। ৪০ কিংবা ৪৫ মিনিটের পিরিয়ডে কোন ক্রমেই একজন শিক্ষকের পক্ষে ৫০।৬০ জন ছেলেমেয়েকে হাতে কলমে কাজ শেখান সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থায় বই পড়ানর কাজ হয়ত বা চলতে পারে কিন্তু শিল্প শেখান যায় না। ফলে কোন স্কুলেই ছেলেমেয়েদের বয়ন শিল্প শিক্ষা যথার্থ বা সম্পূর্ণ হয় না।

৪। উপকরণ—প্রতিটি স্কুলেই বয়ন শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরণের একান্ত অভাব দেখা যায়। কোন স্কুলেই আনুসঙ্গিক সমস্ত যন্ত্র থাকে না, যা থাকে তা ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী যথেষ্ট নয়। ফলে শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়েকে হাতে কলমে বোনার কাজ শেখান সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৫। **রেকর্ড**—প্রায় প্রতিটি স্কুলেই পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে নবম শ্রেণী পর্যন্ত হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা হয়। তাঁত বোনার কাজও এই ক্লাস থেকে আরম্ভ হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তারা কি শেখে বা কি তৈরী করে সেই সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণাই পাওয়া যায় না, কেন না প্রায় কোন স্কুলেই এই সমস্ত কাজের হিসাব বা রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা থাকে না। অথচ দৈনন্দিন কার্য কলাপের হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন।

৬। **পরীক্ষা**—ছেলেমেয়েরা সমস্ত বছরে কি শিখল তাদের শিক্ষা কতখানি সার্থক হ'ল তা যাচাই করবার সুব্যবস্থা প্রায় কোন স্কুলেই নেই। ফলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কোন স্কুলে বাৎসরিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে শিল্প শিক্ষার যথার্থ মান নির্ণয় করা যায় না।

৭। **শিক্ষক**—অস্ত্রাশ্র শিক্ষা অপেক্ষা বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের সময় একটা একটা সাধারণ নিয়ম দেখা যায় যে, প্রায় প্রতিটি স্কুলেই যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছেন তাঁরা কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে অস্ত্রাশ্র শিক্ষা লাভ করেছেন। বয়ন শিল্প সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সুব্যবস্থার অভাবে তাঁদের পক্ষে কোন কাজই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কর্তৃপক্ষ এবং অস্ত্রাশ্র সহকর্মীদের সহযোগিতার অভাবে তাঁরা কিছু করতে পারেন না।

৮। **বেতন**—অস্ত্রাশ্র শিল্প শিক্ষকদের মত বয়ন শিল্পের শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হয় না। শিল্প শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হয় তা সাধারণ জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকটি স্কুলেই শিল্প শিক্ষকদের নিয়োগ সহ শিক্ষকের মাননুযায়ী হওয়া উচিত। বিভিন্ন স্কুলে বয়ন শিল্প শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের বেতন দেওয়া হয়। একটি স্কুলে ১১৫/- ও অপর একটি স্কুলে ১১৫/-—১৫০/- বেতন দেওয়া হয়। অপর একটি স্কুলের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে সেখানে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্প শিক্ষকদের ১৬০/-—২২৫/- + ১০ ডি. এ. দেওয়া হয় এবং অশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ১১৫/- + ১৮৫/- + ১০/- ডি. এ. দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ থেকে এর জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

৯। **ব্যয়**—বয়ন শিল্পের জন্য কোন স্কুলে বৎসরে কত ব্যয় করা হয় তারও কোন নির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না। কোন কোন স্কুলে দেখা যায় বৎসরে ৬০০/- পর্যন্ত ব্যয় এই জন্য করা হয়। আবার কোন কোন স্কুলে এর চেয়ে কম। এমন স্কুলের সংখ্যাও কম নয় যেখানে এর জন্য কোন ব্যয়

হয় না। যে হেতু এই সমস্ত স্কুলে কাজ প্রায় কিছুই হয় না সেই জন্য কোন হিসাবও পাওয়া যায় না। এই বিষয়েও শিক্ষাপরিষদের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মাটির কাজ

পশ্চিম বঙ্গের কতকগুলি মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে মাটির কাজকে ও হাতের কাজের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এই শিল্প শিক্ষার জন্য ব্যয় কম হয় অথচ এটি একটি লাভবান শিল্প। এই জন্য অনায়াসেই ছেলেমেয়েদের ভাল করে মাটির কাজ শেখান যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের মত যুৎশিল্পেরও সুব্যবস্থার একান্ত অভাব থাকায় ছেলেমেয়েদের ভাল করে কাজ শেখান সম্ভব হয় না।

১। পিরিয়ড—হাতে কলমে মাটির কাজ শেখানোর জন্য প্রায় প্রতিটি স্কুলেই অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা বেশী সময় দেওয়া হয়। এর জন্য কোন কোন স্কুলে তিনটি বা চারটি করে পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন স্কুলে এর চেয়েও বেশী সময় দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য হাতে কলমে কাজ শেখাবার জন্য এই জাতীয় ব্যবস্থা সর্বত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু হাতে কলমে কাজ শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বিষয় বস্তু সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য কিছু নির্ধারিত সময় থাকা উচিত। কোন কোন স্কুলের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সচেতন এবং সেই সব স্কুলে পড়া ও হাতের কাজ একই সঙ্গে হয়। কিন্তু তথিকাংশ স্কুলেই মাটির কাজ হাতে কলমেই বেশী শেখান হয়, ছাত্রদের বিষয় বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কোন জ্ঞান দেওয়া হয় না। ফলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

২। সময়—অন্যান্য হাতের কাজের মত মাটির কাজের জন্যও ৪০ অথবা ৪৫ মিনিট পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে একজন শিক্ষকের পক্ষে অধিক সংখ্যক ছেলে মেয়েকে কাজ শেখান কখনই সম্ভব হয় না। কোন রকম হাতের কাজের জন্য এই সময় যথেষ্ট নয়। কোন কোন স্কুলে আবার খিওরি বা প্র্যাকটিকালের জন্য আলাদা পিরিয়ড দেওয়া হয় না।

৩। ছাত্রসংখ্যা—পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় প্রতিটি শ্রেণীতে গড়ে ৪৫ থেকে ৬০ জন পর্যন্ত ছেলেমেয়ে থাকে। বিশেষতঃ নীচের ক্লাসগুলিতে ছাত্রসংখ্যা আরও বেশী হয় এবং হাতের কাজও সাধারণতঃ পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শেখাতে আরম্ভ করা হয়। অথচ কোন স্কুলেই হাতের কাজ শেখাবার জন্য একাধিক শিক্ষক রাখা হয় না। ফলে একজন

শিক্ষকের পক্ষে ৪০ অথবা ৪৫ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের কাজ দেখিয়ে শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। শিক্ষক—মাটির কাজ শেখাবার জন্য যে সমস্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় তাঁদের প্রত্যেকের শিক্ষণীয় যোগ্যতা সমান থাকে না। কলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মানও সমান হয় না। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদ থেকে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকই সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান আবশ্যিক যাতে তারা ছেলেমেয়েদের ভাল করে কাজ শেখাতে ও বিষয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারেন।

৫। বেতন—বেতনের সমস্যা অস্বাভাবিক শিল্প শিক্ষকদের মত যুৎ-শিল্প শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বর্তমান। তাঁদের যোগ্যতামুযায়ী বেতন দেওয়া হয় না। প্রায় স্কুলেই যে বেতন দেওয়া হয় তাতে জীবন যাত্রার নিম্নতম চাহিদা মেটান সম্ভব নয়। একটি স্কুলে ১৭৫—৩২৫ পর্বন্ত বেতন দেওয়া হয়। যে সমস্ত স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে কোন স্কুলেই শিল্প শিক্ষককে এইরূপ সম্মানজনক বেতন দেওয়া হয় না। যদিও বর্তমান যুগের পক্ষে এজাতীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক তবু এই বিভাগের কর্মকর্তাদের এই জন্য প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু কোন কোন স্কুলে ১১৫—১৮০ টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। আবার এমন স্কুলেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে মাত্র ৬০ টাকা শিক্ষকের বেতন। এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় এই তারতম্য দেখা যায়। এই বিষয়েও শিক্ষাপরিষদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৬। উপকরণ—যদিও যুৎ শিল্পের জন্য বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন হয় না তবু এ সামান্য আনুষঙ্গিক উপকরণও যথেষ্ট পরিমাণে সমস্ত স্কুলে থাকে না। কোন কোন স্কুলে তাও থাকে না। কলে শিক্ষকেরা ভাল করে ছেলেমেয়েদের কাজ শেখাতে পারেন না।

৭। ব্যয়—উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য কত ব্যয় হয় তার কোন নির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না। এক একটি স্কুল নিজ সামর্থ্যমুযায়ী এর জন্য ব্যয় করে। কোন কোন স্কুলে আবার এই জন্য কোনরকম ব্যয়ই হয় না। সম্ভবতঃ এই সমস্ত স্কুলে কোন কাজই হয় না। সেইজন্য ব্যয়েরও কোন হিসাব পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা প্রয়োজন।

৮। প্রস্তুত সামগ্রী—অধিকাংশ স্কুলেই পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মাটির কাজ শেখান হয়। কিন্তু অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যে কোন স্কুল থেকেই এমন কোন হিসাব পাওয়া যায় না যার থেকে জানা যেতে পারে ছেলে মেয়ের এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কি কি

১৮৭. পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ

জিনিস প্রস্তুত করতে শিখল। এর মূল কারণ হচ্ছে যদিও হাতের কাজ শেখাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তার জন্য কোন নির্দিষ্ট লিখিত পাঠ্য তালিকা নেই। ফলে এই বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

৯। ব্যবহৃত উপকরণ—যুগ শিল্পের জন্য কোন জাতীয় সামগ্রীর প্রয়োজন এবং কোন স্কুলে কি কি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে কোন তালিকাই কোন স্কুলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। এর থেকেই আন্দাজ করা যায় যে প্রায় কোন স্কুলেই যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এই কাজ শেখান হয় না।

১০। রেকর্ড—যে সমস্ত স্কুলে মাটির কাজ শেখান হয় সেই সমস্ত স্কুলে প্রায়ই ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন কাজের হিসাব ধারাবাহিক ভাবে রাখা হয় না। ফলে তার এক বৎসরে কতটুকু কাজ কত স্বল্প সময়ের মধ্যে শিখতে পারল সেই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। এই জন্য দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া হাতের কাজের ক্ষেত্রে বাৎসরিক বা বার্ষিক পরীক্ষা অপেক্ষা এই জাতীয় হিসাবের বেশী মূল্য রয়েছে, কেন না এর সাহায্যে ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ শিক্ষার চিত্রটি পাওয়া যায়।

১১। পরীক্ষা—অধিকাংশ স্কুলেই ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের মান যাচাই করে নেবার জন্য বিশেষ কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না। কোন কোম স্কুলে বার্ষিক এবং সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু হাতের কাজের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরীক্ষার বিশেষ কোন মূল্য নেই। কেন না শিল্প এমন একটি বিষয় যার সৃষ্টি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পন্থায় করে সমস্ত লোকেই নিজ নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে না। এরজন্য স্বাধীন চিন্তা শক্তির একান্ত প্রয়োজন আছে।

(ক্রমশঃ)

এই সৌন্দর্য স্মারক জীবন বিকশিত হয়

মিশ্রিত স্নিগ্ধ সস্ত
অশ্রুতি গোলাপের
পাণ্ডুর মত কোমল ও
ভারপ্রাপ্ত আভাষ উজ্জ্বল
আমার স্নান দেহতী
এই মেখেই তো !



মাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাজ

মাধনা ঔষধালয়-৩
কলিকাতা-৫

আধাট সংখ্যার পর

বিপ্লব-যুগের এক ঝলক

নরেন গোসাঁই যোদন রাজসাক্ষী হ'লেন

পুলকেশ দে সরকার

হিগিনসের সাক্ষ্য গোপন কক্ষে

৮ই সেপ্টেম্বর আবার শুনানী আরম্ভ হলে ইউরোপীয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার হিগিনসকে অভ্যন্তর অস্থিতার জন্য ইউরোপীয়ান সার্জেন্টদের সাহায্যে ফ্রেচারে করে আনা হল এবং আলাদা ঘরে রাখা হ'ল। অজ্ঞকে সে খবর দেওয়া হ'লে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি হিগিন্স যে-ঘরে আছে সেই ঘরে যাবেন, কেন না, হিগিন্স দাঁড়াতে পারবেন না। তাই উকিলেরা, জুরীরা ও কৌশলি আদালতের বাইরে এলেন; প্রেস রিপোর্টারদের সঙ্গে যেতে দেওয়া হ'ল না; তবে তাঁদের এই আশ্বাস দেওয়া হ'ল যে, তাঁরা নথি থেকে একটি ক'রে নকল পাবেন। ঐ প্রাইভেট চেম্বারে হিগিনস ফ্রেচারে শুয়ে ছিল; অজ্ঞ তার মাথার কাছে বসলেন, উকিলেরা ও জুরীরা তার পাশে বসলেন।

গুজব রটেছিল যে হিগিনসের হাতটা খুবই ফুলে গেছে, হয়তো কেটে ফেলতে হবে; তার স্বাস্থ্যও উদ্বেগজনক।

হিগিনসের সাক্ষ্য নিতে এক ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময় লাগল।

আবণ ৭০২-৩

হিগিনস বলেছে, আমি এখন আলিপুর জেলের একজন কয়েদী। আমি নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইকে চিনি। সে ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারে আমার তদারক ছিল। যোদন তাকে গুলী করা হয় সেদিনের কথা আমার মনে আছে, ৩১শে আগষ্ট সোমবার। আপের শনিবার বন্দী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক ব্যবস্থা হয়। ছপুরে কি সন্ধ্যায় সম্ভবতঃ। নরেন্দ্রনাথ গোসাঁই আমাকে যথারীতি জানায় যে, ঐ মানুষটি তার কাছে এক স্বীকারোক্তি দেবে; তাতে মেদিনীপুর বোমা ছুঁটনার ব্যাপারে গবর্নমেন্টের খুব সুবিধে হবে। আমি সত্যেন্দ্রকে শনিবার কিন্না মঙ্গলবার দেখিনি। আমাকে শনিবার এ খবর দেওয়া হয়। এর আগে আমি সত্যেন্দ্রকে দেখেছি। সে প্রায়ই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে থেকেছে। ঘটনার মাসখানেক আগে আমি সত্যেন্দ্রনাথকে ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারের একতলায় দেখেছি; সত্যেন্দ্র ও নরেন হামেসাই উঠানে এসে আলাপ করত।

আমি শনিবার নরেন্দ্রকে বলি, সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলো এবং তাঁর পরামর্শ নাও। আমি নরেন্দ্রকে নিয়ে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে যাই। এক

রোববারে। দিন পনেরো আগে হবে। সেখানে নরেন সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করে। নরেন যখন আমাকে বলে, দেখার ব্যবস্থা হয়েছে, তখন লিফট উপস্থিত ছিল। আমি জিগগেস করলাম, এর আগে যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাতে কি ফল হয়েছে? সে বলেছিল, না তেমন সুবিধের নয়। সত্যেন্দ্র আবার তাকে শনিবার আসতে বলেছে।

আমি এ জ্ঞানভাম, কেননা, আমি তার সঙ্গে হাসপাতাল গেছিলাম। শনিবার দিনের দেখা সাক্ষাতের সময় আমি ডিসপেন্সারিতে ছিলাম; সত্যেন্দ্র ও নরেন্দ্রের মাঝখানে আমি ছিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তারা একত্রে আলাপ করছে। আমি নরেনকে নিয়ে ফিরি। সে আমাকে বলল, সোমবার সকালে আবার দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। সোমবার সকালে আমি আমার চা খাচ্ছিলাম এমন সময় একজন ওয়াচম্যান (রাতের কয়েদী পাহারাদার) হাসপাতালে আসে ও একটি বিবৃতি দেয়। এই লোকটি আমাকে বলে যে, সত্যেন্দ্র নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ঐ ওয়াচম্যান আমাকে সত্যেন্দ্রের খতটা দেয়। নরেন্দ্র নিজে বেরিয়ে এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্তু আমায় অনেক করে ধরল। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর আমি রাজী হ'লাম নরেনকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে। আমরা যখন অঙ্গন পার হয়ে আসছি তখন দেখি সত্যেন্দ্র দোতলার বারান্দার লোহার জালের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ১নং ওয়ার্ডের

দিকে চলে গেলেন। আমি নরেন্দ্রকে নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। সিঁড়ির মাথায় দেখলাম এক দাড়িওয়া বাবু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। তাঁকে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আমি আর নরেন্দ্র ডিসপেন্সারি ঘরে গেলাম। নরেন আমাকে যেতে বলল ও সত্যেন্দ্রকে ডাকল। আমি ১নং ওয়ার্ডের দিকে ঘুরলাম। আমি দেখে অবাক হ'লাম ১নং ওয়ার্ডের দিক থেকে কানাইলাল দত্ত আসছেন ডিসপেন্সারির দিকে। সত্যেন্দ্র তাঁর কয়েক পা পেছনে আসছেন।

কানাই ও সত্যেন্দ্র ডিসপেন্সারিতে গেলেন। আমাকে পাশ কাটিয়ে যখন ওঁরা তিনজন চলে গেলেন তখন আমি ডিসপেন্সারিতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা বেরিয়ে এলেন এবং বারান্দায় গেলেন; সেখানে একটা বিছানা, একটা টেবিল ও একটা চেয়ার ছিল। নরেন বলল দেখে আমি ডিসপেন্সারির ভেতরে গেলাম। সেখানে পণ্ডিত নামে আর একজন কয়েদী ছিল। আমার মনে হয়, সেও চলে গেল। তারপরই একটা বন্দুক ছোঁড়বার শব্দ শুনলাম। ওঁদের আলাপ আরম্ভ হবার পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই।

“দোহাই ভগবান, হিগিনস, বাঁচাও” (for God's sake, Mr Higgins, save me) বলে আত্ননাদ তুলে পোস্টাই ডিসপেন্সারি থেকে ছুটে আসছিল, বলল, “ওরা আমাকে গুলী করবে।” শুনে আমি গোসাঁইকে ধরলাম ও আমার পেছনে ঠেলে দিলাম ডিসপেন্সারির দিকে। আমি ঘুরে

১৯১ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

দাঁড়ালাম এবং দেখলাম কানাই আর সত্যেন্দ্র আমার দিকে রিভলভার বাগিয়ে ধরছে।

হিগিন্স বলল, তিনটে রিভলভার ছিল। দুটো কানাইয়ের হাতে, আর একটা সত্যেন্দ্রের হাতে। আমি কানাইকে আগলাবার জন্য এগোলাম; তাঁকে নিরস্ত্র করবার, সম্ভব হলে তাকে অক্ষম করে দেবার চেষ্টায় তাঁর হাত ধরলাম। তাঁর হাতের ছোট রিভলভারটা ফেলে দিতে পারলাম, তারপর অপরটাও নেবার জন্য হাত বাড়ালাম; কিন্তু কোন রকমে তিনি হাত ছাড়িয়ে নিতে পারলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে গুলী করলেন। গুলীটা আমার কঙ্গী ভেদ করে গেল। টেবিল ও বেড-এর মাঝখানে পড়ে গেলাম; কানাই আমাকে লাথি মারলেন। সত্যেন্দ্র কিছুই করেন নি। নরেন্দ্র ঘরের এক কোনে ডিসপেন্সারির দরজার দিকে মুখ করে কাঁপছিল। আমি যখন কানাইয়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিলাম তখন সত্যেন্দ্র তাঁর রিভলভারটা আমার দিকে ধরে ছিল। আমি উঠে দাঁড়ালাম ও লক্ষ্য করলাম গোসাঁই ডিসপেন্সারি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে; আমিও আমার হাতটা ধরে তার পিছু নিলাম। সে যখন গেটের দিকে গেছে আমি চেষ্টা করে তাকে কোয়ার্টারাইন ওয়ার্ডের দিকে ছুটতে বললাম। সে কিন্তু জুটমিলের দিকে ছুটতে লাগল। আমি তার পেছনে চেষ্টা করে জুট মিলের বাঁক নিতে বললাম।

হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম কিন্তু একটু পরেই চেতনা ফিরে পেলাম এবং মনে হল কেউ

আমার হাতটা ধরেছেন। তিনি হলেন ডাক্তার বাবু।

আমি ইতিমধ্যে গেটের দিকে যাবার জন্য বাঁকটা ঘুরেছি। লক্ষ্য করলাম গোসাঁই মারা যাচ্ছে, শরীরের আঁকড়াটা ড্রেনে, আঁকড়াটা রাস্তায়। বাঁকটা ঘুরতেই আমি কানাইকে গুলী করতে দেখলাম। সব কিছু কেমন ঝাপসা হয়ে গেছিল, বলতে পারবনা কতবার গুলী ছুঁড়েছেন। ডিসপেন্সারিতে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল সাতটার সময়, হয়তো কিছু আগে। সম্ভবতঃ এরই মিনিট কুড়ি পর গোসাঁই ড্রেনে পড়ে মারা যাচ্ছিল। আমার মনে হয়, যে-রিভলভারটা কানাইর হাত থেকে ছিটকে ফেলেছিলাম, সেটি নন্দী নামে একহাত-ওয়ালা একজন তুলে নিয়েছিলেন। তিনি ওয়ার্ডে ছিলেন। আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে নরেনকে গুলী করা ছাড়াও আর একটা গুলী হোঁড়া হয়েছিল ডিসপেন্সারিতে।

হিগিন্সের জেরা

আসামী পক্ষের কৌশলির জেরার উত্তরে বলল, আমার যতটা মনে পড়ে আমরা যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিলাম তখন সত্যেন্দ্র কোন গুলী করেননি। তিনি কেবল রিভলভারটা গোসাঁইর দিকে তুলে রেখেছিলেন। নরেন্দ্র চার পাঁচ বার সত্যেন্দ্রকে দেখতে পেছিল। আমি জ্ঞানতাম, নরেন্দ্র সত্যেন্দ্রকে দেখতে যাবার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি পেয়েছিল। গোপাল মাইতি আমার

মুখ-চেনা। তাকে আমি সকালবেলার ঘটনা বলেছিলাম বলে মনে পড়ে না। আমি শামূল্য হাজামকে চিনি। আমি তাকে দোতলার বারান্দায় দেখেছিলাম। তখন সবে আমরা হাসপাতালে এসেছি। সে নাপিত, আমাকেও কামাত। আমি সাধারণতঃ বাংলা বলিনে। আমাকে গুলী করার পর “হাত গেল” বলে, চৈচিয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার খাঁটি ইউরোপীয়ান রক্তে জন্ম। আমি দেখেছিলাম, কোন একজন মেট গোসাঁইর আগে আগে দৌড়োচ্ছে। সেই মেটই গোপাল কি না বলতে পারব না। সে সময় আমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। যদি ঐ মেটের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হত আমি বলতে পারতাম কে সেই মেট। যখন আমরা প্রথম ডিসপেন্সারি ঘাই সেখানে একজন কম্পাউণ্ডার ছিলেন। আমাদের প্রথম ঢোকবার পর এবং স্বস্তাস্বস্তির পর পশ্চিম অথবা কম্পাউণ্ডারকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বলতে পারছি, স্বস্তাস্বস্তি আরম্ভ হবার সময় তাঁরা ছিলেন কি না। স্বস্তাস্বস্তির সময় আমি খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম। সেখানকার লোকদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কি হচ্ছে কেউ বুঝতে পারেনি। সত্যেন্দ্র ও কানাইকে ছাড়া আর কাউকে গোসাঁইর পেছনে ছুটতে দেখিনি। সত্যেন্দ্র ও কানাই আমার ঠিক পেছনেই ছিলেন। আমি কানাইকে সেখানে দেখে অবাক হয়ে গেছি। কেন না, এর আগে আমি কখনো নরেন্দ্রর সঙ্গে কানাইকে কথা বলতে

দেখিনি। যেই দেখলাম গোসাঁই ডিসপেন্সারি ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমিও সামলে নিয়ে গোসাঁইর পেছনে ছুটলাম। আমি কানাইকে পথ থেকে সরিয়ে দিলাম। তাঁরা রিভলভার ছুটো হাতে নাড়াচাড়া করছিলেন। গোসাঁইই প্রথম ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। এই সময় আমি কানাইকে ঠেলে দিয়েছি। বৈজ্ঞানিক বাবু আমাকে গेट অবধি যেতে সাহায্য করেন।—এর আগে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন বলে মনে পড়ে না। আমার মনে হয় কেউ আমার হাত ধরেছিল যখন আমি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলাম। যে হাত ধরেছিল সে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ রক্ত পড়ছে কেন? আমার দণ্ডকাল হাসের জন্তু আমাকে কোন আশ্বাস দেওয়া হয়নি। আমার এত যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, আমি অল্প কোন কথা ভাবতে পারিনি।

জুরীদের মুখপাত্রের প্রয়োগের জবাবে সাক্ষী বলল, আমি গোসাঁইকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, এসব লোক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আমি যখন পড়ে গেছিলাম তখন গোসাঁইকে লক্ষ্য করে আর একটা গুলী ছোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু কে ছুঁড়েছিল আমি বলতে পারব না। বারান্দা থেকে আমি একটা মাত্র গুলী শুনেছিলাম।

কয়েদী অনুপ দাস

এরপর জজ আবার আদালতে এসে বসলেন। এবং কয়েদী অনুপ দাসের সাক্ষ্য নেওয়া আরম্ভ হ'ল।

১৯০ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাকী হ'লেন

অনুপ বলল, আমি জেলে নরেন্দ্র গোসাঁইকে চিনতাম। আমি এই দুইজন বন্দীকে জেলের ডকে দেখেছিলাম। একজন হচ্ছেন কানাই বাবু আর একজন সত্যেন্দ্র বাবু। যেদিন নরেন্দ্র গোসাঁইকে গুলী করা হয় সেদিনকার কথা আমার মনে আছে। সেদিন সকালবেলা আমি টিকিট দেবার জন্ত হাজতে আসছিলাম। দৌতলার ডিসপেন্সারির বারান্দায় আমার সঙ্গে সত্যেন্দ্রের দেখা হল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম টিকিট নিয়ে হাজতে যাচ্ছি। তিনি আমাকে অমরোধ করলেন আমি যেন নরেন্দ্রকে আগের কথামত তাঁর সঙ্গে হাজতে দেখা করার জন্ত বলি। আমি তখন গোসাঁইর সঙ্গে দেখা করার জন্ত তাদের কোয়ার্টারের দোতলায় যাই। কিন্তু তাকে সেখানে পেলাম না। সাহেবরা জিগ্গেস করলে আমি বললাম, আমি নরেন্দ্রের কাছে এসেছিলাম।

জেরার উত্তরে বলল, আমার সঙ্গে যখন সত্যেন্দ্রের দেখা হয় তখন তিনি দোতলায় ছিলেন। তিনি টেঁচিয়ে কি যেন বলেন। সেখানে অনেক অনেক লোক বসে ছিল। তা একশ মত হবে; তারা সব ওষুধ নিতে এসেছিল। সেখানে যাবার জন্ত সাহেবরা আমাকে গালমন্দ করেনি। আমি একবারই গেছিলাম। সেদিন আর সত্যেন্দ্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি সত্যেন্দ্রকে গোসাঁইর সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। এর আগে কখনো সত্যেন্দ্র আমাকে নরেন্দ্রের কাছে যেতে বলেন নি।

সত্যেন্দ্রের সঙ্গে এর আগে আমার আলাপ হয়েছে। সে সব জেল-সংক্রান্ত।

জুরী শশীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলল : গোসাঁই কোথায় থাকতেন আমি জানতাম না। যেখানে সাহেবরা থাকে আমি তার গেট অবধি পেছিলাম। সাহেবরা বলল, গোসাঁই শৌচাগারে গেছেন।

আমেদ হোসেন বলল, আমি জেল হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। যেদিন গুলী চলেছিল সেদিনকার কথা আমার মনে আছে। সেদিন সোমবার, ডিসপেন্সারির, পশ্চিম দেওয়ালের কাছে ওষুধ তৈরী করছিলাম : এই সময় গোসাঁই ছুটে আসেন ; আমি একটা গুলী ছোঁড়ার শব্দ শুনলাম। আমি তখন জেলারের অফিসের দিকে ছুটলাম। এরপর কি হয়েছে আমি দেখিনি। আমি জেলারকে জানাই যে, বোমার আসামীরা বড্ড গোলমাল করছেন। এরপর যারা ঘটনার জায়গায় যায় আমিও তাদের পেছনে যাই এবং নরেনকে পড়ে থাকতে দেখি।

মিঃ ব্যানার্জির জেরার উত্তরে বলে, আমিও একজন রোগী ডিসপেন্সারীতে ছিলাম। ঐ রোগী আমার কাছ থেকে ওষুধ নিচ্ছিল ; ঐ সময় গোসাঁই ছুটে আসেন। আমি যখন পালালাম তখন সে কি করল আমি দেখিনি। বৈজ্ঞানিক বাবু সেখানে ছিলেন না। আমি সেখানে পণ্ডিতকে দেখিনি। আমি যখন পালিয়ে যাই তখন ঐ রোগীটি ছাড়া আর কেউ ডিসপেন্সারিতে ছিল না। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে

নেমে আসি তখন ডিসপেন্সারির বারান্দায় আমি কাউকে দেখিনি।

শশীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলল, যে-লোকটি ওষুধ নিতে এসেছিল, আমি যখন পালাই, সে ডিসপেন্সারিতে থেকে গেছিল। কোন সাহেব তখন ডিসপেন্সারিতে ছিল না।

ম্যাক্টন এণ্ড কোম্পানীর ই আই ব্রাউন :—
রিভলভার ইত্যাদি পরীক্ষা করবার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি রিভলভার হুটো পরীক্ষা করেছি। বড়টা আর আই সি ৪৫০ বোরের; ছোটটা ৩৮০ বোরের, বের-বোয়েনের (Berboene) তৈরী। এগুলো ইঞ্জেক্টার নয়। গুলী বেরোবার পর খোলগুলোকে একটা লোহার শিক দিয়ে খুঁচিয়ে বের করতে হয়। ছোটটার শিক ভাঙা। দেখে মনে হয় ওগুলো থেকে গুলী ছোড়া হয়েছে। আমি নল হুটো পরীক্ষা করেছি। ব্যবহারের পর ওগুলো পরিক্ষার করা হয়নি।

জেরের প্রশ্নের উত্তরে বলল, রিভলভার হুটি থেকে কতকগুলো গুলী ছোড়া হয়েছে আমি বলতে পারব না। গুলী বেরোনে খোলগুলোর ওজন ১৪১ গ্রেন। এই খোলগুলোর কোন কোনটিকে বলা হয় ৪৫৫, কোন কোনটি ৪৫০। এগুলো বড় রিভলভারেরই উপযোগী। দেওয়াল ও অস্ত্রাস্ত্র জায়গার গুলীর চিহ্ন দেখে মনে হয় তিনটি গুলী ছোড়া হয়েছিল।

মিঃ ব্যানার্জির জেরার উত্তরে বলল, হ্যাঁ,

দেওয়ালের দাগ একটা ভোতা লাঠি দিয়েও হতে পারে।

জুরী শশীবাবু প্রশ্নের উত্তরে বলল, ভালো শিকারী হুটো রিভলভারই ব্যবহার করতে পারেন। ওস্তাদ ছাড়া দশ পনেরো গজ দূর থেকে কেউ অনায়াসে গুলী ছুড়তে পারেন না। আমি ছোটর চাইতে বড় রিভলভারই ভাল ছুড়তে পারি। সিড়ি থেকে নীচের লোককে গুলী করা সহজ।

কয়েদী শামুলা হাভাম : আমি জেল হাসপাতালের ২নং ওয়ার্ডে কাজ করি। আমার কাজ রোগীদের ওষুধ দেওয়া। যেদিন জেলে গুলী চলেছিল সেদিনের কথা আমার মনে আছে। আমি ২ নং ওয়ার্ডে ছিলাম। আমি প্রথম একটা পোলা কাটার আওয়াজ শুনলাম। আমি তখন সেদিকে ছুটলাম। কানাই বাবু একটা গুলী ছুড়লেন। ডিসপেন্সারীর দরজায় এটা ঘটেছিল। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ ডিসপেন্সারি গেছলেন ও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গোসাঁই বাবু ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর হাতে আমি তখন কিছু দেখিনি। আমি কানাইকে ধরলাম। এর আগে আমি ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেছিলাম। দেখলাম, ডাক্তারবাবু আসছেন। তখন ডাক্তারবাবু ও আমি ছুটতে লাগলাম এবং আমরা দুজনেই ডিসপেন্সারিতে ঢুকলাম। সেখানে কানাই বাবুকে দেখলাম গোসাঁইবাবুকে ঠেলছেন। ডাক্তারবাবু কানাই-বাবুকে ধরে ফেললেন। দেখে, সত্যেন্দ্রবাবু ডাক্তারবাবুর দিকে একটা ছোট রিভলভার

১৯৫ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

ধরেছেন। যখন ডাক্তারবাবু কানাইবাবুকে ধরেন, আমিও ধরি; কিন্তু যখন আর এক বাবু রিভলভার দিয়ে ডাক্তারবাবুকে ভয় দেখালেন তখন আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম ও ২নং ওয়ার্ডে গেলাম। ডাক্তারবাবু নীচে নেমে গেলেন। আমি তারপর গোসাঁইবাবু ও সাহেবকে (হিঙ্গিনস) আসতে দেখলাম। দেখলাম, গোসাঁইবাবু ডিসপেন্সারিতে ঢোকবার চেষ্টা করছেন; কিন্তু কানাইবাবু ও আর একবাবু (সত্যেন্দ্র) তাঁকে আর একদিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কানাইবাবুর হাতে একটা রিভলভার ছিল, কিন্তু তখন আর এক বাবুর হাতে কিছু ছিল না। এরপর কি ঘটল বলতে পারব না। আমি কানাইবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুকে নীচে নেমে যেতে দেখলাম। পাঁচ সাত মিনিট পর গোসাঁই ও সাহেব নীচে নেমে গেলেন। আমার ওয়ার্ড থেকে দেখলাম। তাঁরা সব নেমে যাবার পর আমি যেদিকে ছিলাম সেই পূর্ব দিক একটা আওয়াজ শুনলাম।

জেরার উত্তরে বলল, যেদিন হত্যাকাণ্ড হয়, সেদিনই আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটা বিবৃতি দিয়েছিলাম। আমি যে বলেছিলাম, আমি কানাই গুলী করবেন ভয়ে চলে গেছিলাম একথা সত্যি নয়।

তুই বাবুর হাতেই রিভলভার ছিল এবং কানাইবাবু ডিসপেন্সারি থেকে আমাদের দিকে রিভলভার ধরেছিলেন। তখন ডাক্তারবাবু ও সাহেব তাকে ধরে ফেলেন। গোসাঁইবাবু ও কানাইবাবুকে ধরেন। সাহেব চলে গেলে আমরা কানাইবাবুকে ধরি। বলতে পারবনা কে কানাইবাবুকে প্রথম ধরেন। আমরা যখন ডিসপেন্সারি ঢুকি তখন কম্পাউণ্ডার বাবু ছিলেন না। বলতে পারব না, কে আগে নীচে নেমে গেলেন—সাহেব, না গোসাঁই। আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখন সাহেব সেখানে ছিলেন। সাহেব সত্যেন্দ্রবাবুকে ধরেছেন দেখিনি।

জজ : চারজনে মিলে কানাইকে ধরল, সত্যেন্দ্রকে কেউ ধরল না কেন ?

সাক্ষী : আমি তা বলতে পারব না।

জুরী শশীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলল : তাঁরা যখন বারান্দায় ছিলেন তখন আমি সত্যেন্দ্রের হাতে কিছু দেখিনি। কেবল কানাইবাবুর হাতেই একটা রিভলভার ছিল। ডিসপেন্সারির দরজায় দেখলাম সত্যেন্দ্রের হাতে একটা রিভলভার, কানাইর হাতে আর একটা।

(ক্রমশঃ)

নেতাজী-স্মৃতি

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন

নবম দৃশ্য

নেতাজী—ভাসি! ভাসি!

ভাস্করণ—(প্রবেশ করে) আমাকে ডাকছেন
নেতাজী?

নেতাজী—হ্যাঁ।—ভাসি, কাগজ কলম নিয়ে
বোসো। (ভাস্করণের তথ্য করণ)—জামান
ভাই!

কিয়ানী—বলুন নেতাজী।

নেতাজী—আমার অবর্তমানে তুমি হবে আজাদ
হিন্দের সর্বাধিনায়ক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার
দায়িত্ব সব তোমার। জামান ভাই, আমার শেষ
কথা তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি। (উচ্ছ্বাসে
গলা কেঁপে যাচ্ছে)—দেখো শুধু এইটুকু দেখো
আমার আজাদ হিন্দের গায়ে কোন কলঙ্কের দাগ
না লাগে।

কিয়ানী—আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম
নেতাজী।—

নেতাজী—ভাসি। ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুন বাসের
শেষ দিনে যখন ছুটি আবেদন ও আদেশনামা প্রতি
লিখন করেছিলে আমি বলেছিলাম—এই আমার

শেষ ডিক্টেশন। একটি মেজর জেনারেল জামান
কিয়ানীকে আদেশ নামা, আর একটি পূর্ব এশিয়ার
ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে আবেদন, আর তৃতীয়টি—
(উচ্ছ্বাসে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে) তৃতীয়টি আমার
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আজাদ হিন্দ ফৌজকে সম্বোধন
করে আমার শেষ আদেশ বা অনুরোধ। তারপর
তোমার ছুটি—হ্যাঁ, আমারও, আমারও,—(কথা
শেষ করতে পারলেন না।)

(আন্তে আন্তে পর্দা পড়ে গেলো)

সুত্রধার—গভীর রাতে ভাঙলো ওই অধিবেশন।
কিন্তু বিমান কোথায়? সিঙ্গাপুরে অবশিষ্ট জাপানি
বাইরে শান্ত নির্বাক, কিন্তু অন্তরে তার সমুদ্রের ঝড়।
চললো 'হারিকরির' ভয়াবহ উৎসব সিঙ্গাপুরে, মালয়ে।
মুষ্টিমেয় বারা কর্তব্যের তাপিদে বেঁচে রইলো, তাদের
উদ্ভাস্ত চিত্ত, অস্বাভাবিক চোখের দৃষ্টি। কে তখন
ভাববে আজাদ হিন্দের কথা!—অবশেষে অতি
আয়াসে স্থির মস্তিষ্কে একজন জাপান সেনাপতির
আনুভূত্যে কয়েকটি আসন পাওয়া গেল একটি
ব্যাঙকক্ গামী জাপান বিমানে। নেতাজী চলে এলেন

ব্যাঙককে (১৬ই আগস্ট), সঙ্গে আইয়ার, হবিবুর রহমান, শ্রীতম্ সিং এবং দোভাষী নিগেশি। রটে গেল নেতাজীর আগমন বার্তা, ভিড় করে আসে মানুষের দল তাঁকে শেষ দর্শনের আশায়। কাজের অস্ত নেই—কাজ গোটানোর কাজ। 'তবু নেতাজী হাসি মুখে, শাস্ত চিত্তে, কখনও পরিহাস তরল, কঠিন সবার সঙ্গে কথা বলছেন, যথাসম্ভব নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাঁসি রাণী বাহিনীর চারটি মেয়েকে যার যার গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। ভৌসলে তাদের সব দায়িত্ব গ্রহণ করে নেতাজীকে চিন্তামুক্ত করলেন। সামগ্রিক অনিশ্চয়তারও উদ্বেগের পাছাড় প্রমাণ বোঝা তাঁর চিত্তে, তবু একটি কোণে তাঁর রয়েছে মধুর স্নেহময় উৎকর্ষাও চারটি মেয়ের জন্ত। এই নেতাজী! পরদিনই গেলেন সাইগনে। আইয়ার, হবিব, শ্রীতম্ সিং এবং একজন জাপ অফিসার যথারীতি সহযোগী। ভিন্ন একটি বিমানে গুলজারাসিং, আবদ হামান, দেবনাথ দাস এবং দুজন জাপ সামরিক অফিসার। এই তিনজন জাপ দালাল শিবিরে চলে এলেন জাপ বাহিনী প্রধানের কাছে নেতাজীর যাবার জন্ত প্লেনে আসনের বন্দোবস্ত করতে। নেতাজী অপেক্ষা করে রইলেন সাইগন শহরে নারায়ণ দাসজীর গৃহে। বিজ্ঞানের সময় নেই।—ওই নির্দারুণ সঙ্কটে বিমান যোগাড়কল্পে চললো ঘন ঘন জাপ অফিসারের আসা বাওয়া দালাল থেকে সাইগনে নারায়ণ দাসের গৃহে। অবশেষে স্বয়ং জাপ বাহিনীর প্রধান তেরাওচি নেতাজীর কাছে এলেন এই সংবাদ নিয়ে যে একটি জাপানি—৮২—৪

মাত্র আসন পাওয়া গেছে সাইগন ভাইহাকু দাইরেনগামী একটি জাপফৌজী বিমানে যা অবিলম্বে ছাড়বে নেতাজীর অন্তরঙ্গ অনুচরবৃন্দ কিছুতেই রাজী নন নেতাজীকে একা ছেড়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত অনেক কথা কাটাকাটির পর দুটি আসন পাওয়া গেল। স্থির হোল নেতাজীর সহযোগী হবেন হবিবুর রহমান।

দশম দৃশ্য

[সাইগন বিমানবন্দরের লাউঞ্জ। ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৫-এর অপরাহ্ন কাল। দৃশ্যের অন্তরালে জাপ জঙ্গী বিমান যাবার জন্ত প্রস্তুত। লাউঞ্জে প্রবেশ করলেন নেতাজী, হাববুর রহমান এবং এস, এ, আইয়ার। হবিবের হাতে একটি ভারি স্টুটকেস। স্টুটকেসটি নেতাজীর কাছে নামিয়ে রাখলেন।]

নেতাজী—পেছনের পাড়ীটি আমাদের অনেক পেছনে পড়ে গেছে দেখছি। ওটি না আসতে আমি তো প্লেনে উঠতে পারছি নে।

আইয়ার—নেতাজী, এই ফাঁকে একটু দেখুন না, যদি আর একটি 'সীট' প্লেনে যোগাড় করা যায়।

নেতাজী—(হেসে) কেন, তুমি যাবে বুঝি। ভুলে গেছ আইয়ার, তোমার সংকল্প? আমার সঙ্গে গেলে আমার ওপর বই জিববে কী করে?

আইয়ার—কেন? আপনার সামিথ্য যত পাবে,

ততই তো আমার বই লেখা সহজ হবে, সার্থক হবে।

নেতাজী—তবেই হয়েছে! আইয়ার, আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার সাথী হলে, তোমার বই আর ছাপা হবে না। এই তো ভাল। পূর্ব এশিয়ায় আমার ছ'বছরের অবিস্মরণীয় কাহিনীকে তুমি তুলে রাখবে কাগজের বুকে, পূর্ণচ্ছেদ টানবে আজ এই ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৫-এর অপরাহ্ন বেলায় যখন তোমার কাছ থেকে গুলজারা সিং, শ্রীভূম সিং, আবদ হামান আর দেবনাথ দাসের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে আমি আর হবিবুর রহমান গ্যেনে আরোহন করছি। তোমার গ্রন্থের সমাপ্তি তাহলে হবে নাটকীয়।

আইয়ার—আমি তো নাটক লিখবো না নেতাজী, সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি সত্যসন্ধ সাংবাদিক আপনার পরবর্তী জীবনের 'দৈনন্দিন কাহিনীও তুলে রাখবো আমার ডায়ারিতে। তারপর চেষ্টা করবো আপনার অপূর্ব জীবনকে পরিবেশন করতে তথ্যের সূদূত ভিত্তির ওপর সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে। এই তো আমার অভিলাষ। ঈশ্বর আমাকে সেই ক্ষমতা দিন।—নেতাজী, আমাকে আপনার সঙ্গে নিন দয়া করে।

নেতাজী—(স্নেহে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে) আর একটি আসনও গ্যেনে পাওয়া পেল না আইয়ার তুমি তো জানো, নারায়ণ দাসজীর বাড়ীতে বসে জেনারেল তেরাণ্ডটিকে আমি বার বার অনুরোধ করেছিলাম। এবং তিনি আর একটি মাত্র আসন

দিতে পারলেন। আমার সহযোগী হবে একজন বিশ্বস্ত কুশলী ফৌজী এ ছিল আমাদের সম্মিলিত দাবি। আমি বেছে নিলাম হবিবুরকে।

হবিব—নেতাজী, ৪৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ডুবে জাহাজে জার্মানি হতে জাপান আসবার পথে আপনার সঙ্গে ছিলেন আবদ তাই। এবার আমি আপনার দেহরক্ষী। আমি ধন্য।

নেতাজী—হবিব, তখন বিরাট সম্ভাবনার আশায় বুক বেঁধে এসেছিলাম সাবমেরিণে হস্তর সমুদ্র গর্ভ পথে। শত্রুর মাইন পাতা বিস্তীর্ণ ব্যুহকে অতিক্রম করে এসেছিলাম তোমাদের সান্নিধ্যে। তারপর এই ছ'বছরের ঘটনাবলি অপূর্ব কাহিনী। সাক্ষ্য ও ব্যর্থতা, জয় ও পরাজয়, আশা ও নিরাশা—কতো বিপরীত দোলায় তুলেছে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সন্তানবৃন্দ। এ সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে তোমাদের আত্মত্যাগ ও অসামান্য শৌর্য, তোমাদের পরস্পর শ্রীতি ও অনন্ত সৌভ্রাতৃত্ব, তোমাদের নেতাজীর উপর নির্ভরতা ও অপরিণীত ভালবাসা। এই অমূল্য সম্পদ বুকে পুরে নিয়ে চলেছি নিরুদ্দেশ যাত্রায়। সঙ্গে আমার আজাদ হিন্দের কর্ণেল হবিবুর রহমান।

আইয়ার—এ দারুণ আপৎকালে এটুকুই আমাদের সাঙ্গনা নেতাজী—কিন্তু—

নেতাজী—(হেসে) আর 'কিন্তু' নেই আইয়ার।—(হালকা স্বরে) ও, তোমার বই লেখার ব্যাপার! আচ্ছা, এক কাজ করো।—গ্রন্থের নাম দিও—পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী (প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ)

প্রথম খণ্ড প্রণেতা এস, এ, আইয়ার, দ্বিতীয় খণ্ড কর্ণেল হবিবুর রহমান। (হো হো করে হেসে উঠলেন)

হবিব—(হাসতে হাসতে) লিখতে গেলে আমি কলম ভাঙবো নেতাজী। ও সব আমার আসেনা। আমি জানি শুধু কামান বন্দুক ছুঁতে।

নেতাজী—নাঞ্জির আহমেদও তোমারই মতো ফৌজী ছিল হবিব। তার ওপর সে ছিল কবি।—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) দেওয়ানা নাঞ্জির ফৌজীর কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মৌলমিনের পুখে প্রাণ হারালে।—হবিব, ইংরেজের মেশিন পানের গুলি সে বুক পেতে নিলে, ভাই আজও তোমাদের নেতাজীকে দেখতে পাচ্ছো।

হবিব—অমর শহীদ নাঞ্জির আহমেদ! আল্লা তাকে কোল পেতে নিয়েছেন, বেহেশত তাঁর নসীব হয়েছে।—আইয়ার সাব, আমার ফৌজী কলিজার ভাঁজে ভাঁজে আমি লিখে নেবো নেতাজীর নিরুদ্দেশ যাত্রার কাহিনী। যদি আল্লা আমাদের দোয়া করেন, নেতাজীকে নিরাপদে নিয়ে যাবো হিন্দুস্থানে, কলিজা উজাড় করে জানাবো সকল কথা, আপনি কি ভাবে লিখে রাখবেন।

নেতাজী—এবার তা হলে নিশ্চিত হলে তো আইয়ার। (ঘড়ি দেখে) কিন্তু এখনও ওরা আসছে না কেন? কুড়ি মিনিট হয়ে গেল আমরা এ্যারোড্রোমে এসেছি। পথে কিছু হোল না তো?

(দ্রুত প্রবেশ করলেন একজন জাপানি অফিসার)

জাপ—ইয়ার এক্সেলেন্সি, লেফটেনেন্ট-জেনারেল শিদেয়ী প্লেনে বসে আপনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আপনি আসুন।

নেতাজী—আমাদের দ্বিতীয় জীপটি এখনও আসেনি। ওতে আমার দরকারী কাগজপত্র রয়েছে। ও পাড়ীটা না আসতে আমি যেতে পারছি নে। মিঃ শিদেয়ীকে বলুন গে। (জাপ অফিসার অভিবাদন করে চলে গেলেন)

আইয়ার—আর একটু সময় আপনার কাছে তবু থাকতে পারবো।

নেতাজী—আইয়ার ১৯৩৯ সালের একটি রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। তখন ভারতবর্ষে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন করতে উদ্ধার মতো ছুটে বেড়াচ্ছি—উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। বসাইতে এসেছি আমার বন্ধু ও সহকর্মী নাথালাল পারেশ্বর গৃহে অতিথি হয়ে। সে রাত্রে কাজের চাপে রাত ছুটো বেজে গেল। ক্লান্ত শরীর, বিনিদ্র চোখ—নাথালালজীকে সঙ্গে নিয়ে ওই পভীর রাত্রে এলাম তাঁর মেরিণ ড্রাইভের বাড়ী থেকে সমুদ্রের তীরে। নির্মল নীলাকাশে জ্যোৎস্না ভেসে বেড়াচ্ছে, রাত্রির নিস্তরতার বুক চিরে সমুদ্র ছঙ্কার দিয়ে সহস্র ঢেউ-এর বাছ মেলে নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে রইলাম নিচে সমুদ্রের দিকে, হঠাৎ চোখ তুলে তাকালাম নীলাকাশের দিকে। আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। চাঁদ তখন মুঠো মুঠো জ্যোৎস্নার আবীর ছড়িয়ে মুহু মুহু হাসছে। নাথালালজী জিজ্ঞেস করলেন

অমন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন
সুভাষ বাবু ?

হবিব—আমারও প্রশ্ন নেতাজী, কী দেখছিলেন
অমন করে ?

নেতাজী—আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললাম—
নাথালাল জী, আমার বাংলার কবি নাট্যকার জিজ্ঞেস
লাল এমনি জ্যোৎস্না রাতেই একদা পেয়ে উঠেছিলেন
“এমন চাঁদের আলো/ মরি যদি সেই ভালো/ সে
মরণ স্বরণ সমান।”—আমার অভিলাষ কি জানেন ?
মরণ কালে রাজরাজেশ্বর বেসে যেন মৃত্যু এসে
আমার সম্মুখে দাঁড়ায়। আরোপ্তেনে উড়ে যাচ্ছি
এমনি জ্যোৎস্না প্রাবিত আকাশের বুক চিড়ে, হঠাৎ
এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ব্যাহত হোলো তার সম্মুখ
পতি, তীর বেগে সে ধরাপৃষ্ঠে নামতে লাগলো।
তার সঙ্গে সমানে ছুটে চলেছি আমি—নিচ থেকে
আরও নিচে। অবশেষে সজোরে আলিঙ্গন করলে
আমার মা’টি। আমি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে
পড়লাম।—

আইয়ার—এ কী অমঙ্গলের কথা! দোহাই
নেতাজী, এই নিদারুণ সঙ্কটকালে আরোপ্তেনে
চড়বার মুহূর্তে ওসব কথা ভাববেন না।—ঈশ্বর
আপনার যাত্রা পথ নির্বিশ্ব করুন।—

নেতাজী—(মুচকি হেসে) না আইয়ার, এখন
মৃত্যুর কথা ভাববো কেন!—এ নিরুদ্দেশ যাত্রার
একদিন ইতি হবে, ত্রুত উদ্ঘাপনের নূতন ক্ষেত্র
তৈরী হবে, যিহে আসবো আমি হবিবকে নিয়ে
আমার প্রিয়তম আজাদ হিন্দের কাছে, আবার তুমি

হবে আমার পরম শ্রীতি ভাজন প্রচার সচিব, ভাসি
আমার শ্রুতি লেখক। এ সংহতনবোত্তমের প্রচণ্ড
আঘাতে ভেঙ্গে পরবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, শৃঙ্খলযুক্ত
আমার দেশের মাটি। মায়ের কোলে তখনই
পাতবো আমার শেষ শয্যা।

আইয়ার—তবে পুরাতন কাহিনী শুনিযে
আমাদের মন খারাপ করেদিচ্ছেন কেন ? হবিব
ভাই, আপনার মহান দায়িত্ব আমাদের প্রিয়তম
নেতাজী। তিনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই,
কিছু নেই। (বাপ্প রুদ্ধ হোলো আইয়ারের কণ্ঠ)

হবিব—নিশ্চিত থাকুন আইয়ার সাব।—জান
কবুল।

(প্রবেশ করলেন গুলজারা সিং, প্রীতম
সিং, আবিদ হাসান এবং দেবনাথ দাস।
দেবনাথ নেতাজীর হাতে একটি কাইল
দিলেন।)

নেতাজী—দেবনাথ, এতো দেরি হোলো যে
তোমাদের আসতে ?

দেবনাথ—গাড়ীটা রাস্তায় খারাপ হয়ে
গিয়েছিল।—ভাগ্যিস, গুলজারা সিং সঙ্গে ছিলেন,
তাই আসতে পেরেছি।

গুলজারা—গাড়ীর ইঞ্জিন বড্ড গড়্‌বড়্‌ হয়ে
গিয়েছিল নেতাজী। আনাড়ী ড্রাইভার। তাই
গাড়ীটা সমান করে নিজে চালিয়ে নিয়ে এলাম।

আইয়ার—নানা কথা ভাবছিলাম। সাইপন
এখন আতঙ্কগ্রস্ত। জাপবাহিনী তো প্রধানকার
পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে নিয়ে গেছে। ফরাসী ছপলের

বাহিনী ইংরেজের সহযোগিতায় এসে ইন্দো-চীন কজা করতে শুরু করেছে। সাইগণ এখন অরাজক।—

শ্রীতম—তাতে আর আমাদের কী ক্ষতি হবে! জীপটা নড়বড়ে, ড্রাইভার আনাড়ী—তাতেই বা অসুবিধে হয়েছে।

আবিদ—হবিব ভাই, আমার সৌভাগ্যটুকু তুমি এবার কেড়ে নিয়েছো। আমি এনেছিলাম নেতাজীকে সমুদ্রের তলা দিয়ে দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথে জার্মানি থেকে জাপানে। আজ তুমি হয়েছে আকাশ পথে তাঁর সাক্ষী। নেতাজী ইজ্‌ ইয়ার সেক্রেড্‌ ট্রাষ্ট্‌ নাউ। বিপদ আরও বেড়েছে। খুব সাবধান।

হবিব—আম্মা নেতাজীকে রক্ষা করেন আবিদ ভাই। আমি আল্লার শ্রদ্ধামত্‌গার।

নেতাজী—এবার যাত্রা করতে হবে। তোমরা সবাই আমার কাছে এসো। (সবাই কাছাকাছি হলেন) “যাবার সময় হল বিহঙ্গের / এখুনি কুলায় রিস্ত হবে। / স্তব্ধ গীতি ভঙে নীড় পড়বে ধূলায়। অরণ্যের আন্দোলনে / শুক পত্র-জীর্ণ পুষ্প সাথে পথচিহ্ন হীন শূন্যে যাবো উড়ে রজনী প্রভাতে / অন্ত সিঁধু পরপারে।”—(রবীন্দ্রনাথ)

আইয়ার—(আতঙ্কে) নেতাজী।—

দেবনাথ—“রজনী প্রভাতে অন্ত সিঁধু পরপারে” নয় নেতাজী, পূর্ব দিগন্তের উদয় শিখরে। জয় হোক নবাবনোদয়ের, জয় হোক নেতাজীর। আজ আমাদের শুধু প্রার্থনা—‘শিবাস্তে সন্তু পহানঃ’।

নেতাজী—(চোখ বুজে ইটনাম জপ করলেন। —চোখ খুলে—) আইয়ার, গুড্‌ বাই! গুড্‌ বাই ট্রাষ্ট্‌ অল্‌। (কোজীরা এ্যাটেনশন হয়ে তাঁকে সামরিক কায়দায় স্তম্ভটি করলে। নেতাজী স্তম্ভটি গ্রহণ করলেন। আইয়ার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন নেতাজী তাঁকে ধরে মুখে হাসি রেখে বললেন—)

নেতাজী—আইয়ার, জয়হিন্দ!

আইয়ার—(অস্ফুটে) জয় হিন্দ! (সবাই এক সঙ্গে ধ্বনি দিলেন-জয় হিন্দ! নেতাজী জিন্দাবাদ!)

নেতাজী—এসো হবিব। [হ’জনে অগ্রসর হলেন কুইক মার্চ করে। নেতাজীর হাতে কাইলটি, হাবিবের হাতে স্ট্রিকেস্‌। সবাই অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন সেদিকে। নেতাজী ও হবিব প্রবেশ করলেন বিমানের পর্তে। প্রপেলারটি আগে থেকেই ঘুরছিল। এবার বিকট শব্দ করে বিমানটি আকাশে উঠতে লাগলো।—দেবনাথ দাসের কণ্ঠ থেকে আপনি বেরিয়ে এলো শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী প্রশস্তি বাক্য—]

দেবনাথ—“তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও। তুমি দেশের জন্তু সমস্ত দিয়েছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সঁতার দিয়া তোমাকে নদী পার হইতে হয়। তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিক্কাইয়া চলিতে হয়। কোন্‌ বিশ্বত অতীতে তোমারই জন্তু তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে

মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল। সেই তো তোমার গৌরব। তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার।.....হুঃখের হুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো। বলিয়াই তো ভগবান প্রতবড়ো বোকা তোমার স্বক্ষে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তি পথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিজোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার।”

(দেবনাথের দেখাদেখি আর সবাই হাত জোড় করে নমস্কার করলে। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে গেল।)

সমাপ্ত

যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে—

১। আমি নেতাজীকে দেখেছি—নারায়ণ

সান্দাল

২। The History of Freedom Movement in India (Vol. III)

Dr. R. C. Majumdar

৩। When Bose was Ziauddin—

Uttamchand

৪। Unto Him A witness—

S. A. Ayer

৫। Subhas Chandra Bose—
The Springing Tiger—Hugh Toye.

৬। On To Delhi—Ed. Narayan Menon.

৭। Important Speeches and writings of Subhas Bose—

Ed. Jagat, S. Bright.

৮। The Roll of Honour—

K. C. Ghosh

৯। My Memories of I. N. A and Its Netaji—

Khan Mj-General Shah Nawaz.

১০। An Indian Pilgrim—

Subhas Chandra Bose

১১। রবীন্দ্র রচনাবলী—(বিভিন্ন কবিতাংশ উদ্ধৃতির জন্য)—বিশ্বভারতী

১২। পথের দাবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩। শ্রীমদ্ভাগবতদঙ্গীতা—

১৪। ঋষিদের প্রার্থনা—

ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত

১৫। The Indian Struggle—

Subhas Chandra Bose (Vol. 2)

ভারতের জাতীয়তা ও স্বাধীনতা

কণেশ্বর ঘোষাল

১৯৪৫ এর মাঝামাঝি ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেল থেকে যখন মুক্তি পেলেন তখন আন্দোলন করার মত কোন রাজনৈতিক বিষয় ছিল না। (ড্রঃ p-104—M. Edwardes)^১ আই. এন. এ-র ঘটনাবলী এবং লালকেল্লায় শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলনের বিচার সে সুযোগ এনে দিল। আই. এন. এ. হল বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তির বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতীক। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভাবলেন দেশে বৈপ্লবিক চেতনা ফিরিয়ে আনতে হ'লে ব্রিটিশ কর্তৃক আই. এন. এর সৈনিকদের বিচারের ব্যাপারে নিজেদের জড়িত করতে হবে। তার উপর ভবিষ্যতের নির্বাচনে (১৯৪৫-৪৬) অসাম্প্রদায়িকতা ও স্বাধীনতাকে গামনে রাখতে হবে এবং এর জন্ত আই. এন. এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য কংগ্রেসকে সাহায্য করবে। (ড্রঃ K, K. G-p 209) আই.

- (১) M. Edwardes—The Last years of the British India by Michael Edwards. (Mentor Edition)
২. K. K. G. History of the Indian National Army by K. K. Ghosh

এন, এ-র পক্ষ সমর্থনের জন্ত 'ডিক্লেশন কমিটি' গঠিত হ'ল এবং এই কমিটিতে সদস্য হিসাবে ছিলেন স্তার ভেঙ্ক বাহাদুর সাগ্রা, জহরলাল নেহেরু, ভূলাভাই দেশাই, ডঃ কে. এন. কাটজু, রঘুনাথ শরণ ও আসফ আলী। মহম্মদ আলী জিন্নাও আই. এন. এ-র পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেন। আই. এন. এতে বহুসংখ্যক মুসলিম সৈনিক থাকায় লীগও আই. এন. এ-র বিচার বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারেনি (ড্রঃ ঐ p-212 & 221)। আই. এন. এ-র ক্যাপ্টেন রসিদ আলীর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে লীগ রসিদ আলী দিবসের ডাক দিলে (১১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) ভারতের দিকে দিকে হিন্দু মুসলিম জনতা একত্রে প্রতিবাদ মুখর হ'য়ে ওঠে। আই. এন. এ সৈনিকদের বিচার কালে সারা ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে.....আন্দোলনের জোয়ারে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলতে পারেনি। এর উপর আই. এন. এ'র প্রভাব ব্রিটিশ 'ভারতীয় বাহিনী-গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আই. এন. এর সৈনিকগণ (অধিকাংশই) পূর্বে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতেই ছিলেন সুভাষ-নেতাজীর নেতৃত্বের স্পর্শে তাঁরা বিপ্লবী

আজাদ হিন্দ বাহিনীতে সামিল হন। শ্রীধোষ এ সম্পর্কে বলেছেন, যে সৈনিকদের মধ্যে এই ব্যাপক আত্মপত্নের পরিবর্তন এক অভূতপূর্ব ঘটনা যা এক বিপ্লবের থেকে নূন ঘটনা নয় (জঃ KKG-p-254)। এর দীর্ঘ এবং ঐতিহ্যময় ইতিহাস আজ অনেকটা প্রকাশিত যদিও.....তা ছিল প্রচারিত নয়।

যাই হ'ক, ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলি আই. এন.এর পক্ষ সমর্থন করলেন। ব্রিটিশ সংসদ সদস্য Woodrow Wyatt বলতে বাধ্য হলেন, “যদি ব্রিটিশ শক্তি সত্ত্বর সহজ ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় বের করতে না পারে তবে প্রথমে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান তাদেরকে দূর করে দেবে।” (জঃ K. K. G p-241) অতঃপর একজন ব্রিটিশ সংসদসদস্য Sorensen মন্তব্য করেন যে বিপ্লব ঘটলে বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈনিক ও তাদের অফিসারগণ জাতীয়তাবাদীদের দলে যোগদান করবে। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলিতে বিদ্রোহমূলক ব্যাপক বিক্ষোভ এবং বন্দরে-বন্দরে নৌবিদ্রোহের বৈপ্লবিক কাহিনী আজ আর কারো অবিদিত নয়। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন এক বৈপ্লবিক জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্যে বৈপ্লবিক জাতীয়তায় উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হ'য়ে গেছে। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তা প্রতারণিত হলো। (জঃ K. K. G. p-237)। দ্বিতীয়

অন্তর্ধানের পূর্ব পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বেকার মাধ্যমে ভারতের অভ্যুত্থানে ব্রিটিশের নানা চক্রান্তের বিশদ সমালোচনা করে ভারতের জাতীয় নেতৃত্বকে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে সাবধান করে বলেন, “ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে তার রাজনৈতিক, আর্থিক সাংস্কৃতিক বিনষ্টি ঘটবে।” (Selected Speeches-Govt of India publication p-223).....

.....দেশ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে দ্বিখণ্ডিত হলো। ইতিহাস বিধাতা আড়াল থেকে হাসলেন। ১৯৭১ সালে ইতিহাসের রথ মোড় নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নূতন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে—বাংলাদেশ। ধর্মকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানসৃষ্টির চক্রান্ত কঠিন আঘাত পেল। বর্তমানের পাকিস্তানের ভিতরেও ভারতের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্বের আবেদনের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব ও বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির ভারত বিরোধী আচরণ। ইতিহাস উভয় দেশের অদূরদৃষ্টি দিয়ে রচিত বন্ধুর বিপথকে ভৌগোলিক ও ঐতিহ্যগত বোধের সরলতায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে কিনা—কালই তার পরিচয় দেবে।.....(ক্রমশঃ)

ডক্টর সবপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সান্নিধ্যে

জ্যোতিরীন্দ্রনাথ মজুমদার

ডিসেম্বর ১৯৫৫ কিছু কাজ নিয়ে দিল্লী গেছি। জনকয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর, হঠাৎ মন চাইলো একবার ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন উপরাষ্ট্রপতি।

চিঠি লিখে জানাতেই উত্তর এল। ৯ই জানুয়ারী ১৯৫৬ বিকেলে তিনি মোলাকাত মঞ্জুর করেছেন। চিঠি পেয়ে খুশিতে ভরে গেলাম। খুশির রোদ্রুর আবার ভাবনার স্নানয়মান গোধূলীতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ভয় হল নানা চিন্তায় নানা ভাবনায় মনে অস্থিতি দেখা দিল; কী বলবো—কী কথা হবে এই ভাবনাতে আমার দেহ তখন আক্রান্ত। কিন্তু খুশির ঝিলিকও বইছে তলে তলে। ভাবনার ট্রেনের বগিগুলো যেন চিন্তার ষ্টেশনে এসে থামছে আর চলছে। কি করে নিবেদন করব সেই পরম দার্শনিককে আমার মনের কথা হৃদয়ের স্রজ্জা। এমনি করে আমার ভাবনার ট্রেন পশ্চিমারী ষ্টেশনে এসে থামলো। একটা সঙ্কেত পেলুম। মনে হলো যেন আমি শ্রীঅরবিন্দের একটি ফোটো নিয়ে সেই দার্শনিকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় বন্ধুর শ্রীমতী ভট্টাচার্য মহাশয়কে শ্রীঅরবিন্দের একখানা ফোটো পাঠাবার

প্রাণ ৮২-৫

অনুরোধ করে সব জানিয়ে চিঠি লিখলুম। ফোটো ঠিক সময়ে এসে পৌঁছুল। ভাল করে বাঁধিয়ে সফোটো নয়ই জানুয়ারী বিকেলে উপ-রাষ্ট্রপতির বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালুম।

পৌঁছেই দেখি ডঃ রাধাকৃষ্ণন জনৈক বিদেশী অতিথিকে বাড়ীর দরজায় এগিয়ে এসে বিদায় জানাচ্ছেন। যেতেই তিনি আমাকে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে ঘরে নিয়ে আমায় প্রায় সোফায় বসিয়ে দিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। আর আমি অবাক হয়ে শুধু দেখছি। তিনি কথা বলতে বলতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। আমার কাছে ঘুরে আসতেই আমি বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছি। আমি যেন সহজ হতে পারছি নে। আবার উঠে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন “Please be seated and make yourself comfortable. I am taking only a little exercise.”

এ অবসরে আমি আমার প্যাকেটটি খুলে শ্রীঅরবিন্দের ফোটোটি তাঁর হাতে দিতেই তিনি তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে এক ঝলক দেখে আমার পাশে এসে বসলেন। আমার সব ভাবনা যেন সঙ্গে সঙ্গে থামলো। ঘরভরা ছবি, ফুল, আসবাব সব যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল। মনে হল প্রাচীন ভারতের

এক স্থির পাশে বসে আছি। তিনি আস্তে আস্তে শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে আলাপ শুরু করলেন। বুঝতে দেবী হলোনা যে তিনি আমাকে তাঁর কথায় অনেক উচ্চমান দিয়ে, ধর্ম ও দার্শনিকতার তুরীয়তায় পাখা মেলালেন। আমার মনে কে যেন শক্তি জুগিয়ে চলছিল। শ্রীঅরবিন্দের Life Divine এর প্রসঙ্গে তিনি শুধালেন যে, বইখানা আমার পড়া কিনা। যদি পড়ে থাকি এ সম্বন্ধে আমার মত কি?

সবিনয়ে বললুম যে আমার পড়াশোনা কম। বইখানি আমি বারবার পড়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু এক নাগাড়ে আত্মসাৎ করার মতো জ্ঞান, ধৈর্য ও শক্তি আমার নেই। তবে আমি প্রায়ই বইটি রাতে শোবার সময় পড়তে পড়তে খুঁলেই বুকের কাছে রেখে ঘুমই। মনে হয় কে যেন আমার মনকে আলোয় আলোকময় করে তোলে। না পড়ার বেদনা-মাধুরী অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কথা শেষ না হতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমার তখন থামবার ফুরসত কোথায়। বলে চলছি—তিনশোবছর আগে যদি কেউ বলতেন, “Every thing would be guided by Electricity in coming time” লোকে তাঁকে পাগল বলেই উড়িয়ে দিতেন। আজ কেউ আর তাকে পাগল বলে না। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ জীবনের আমাদের সমস্ত চলার ছন্দ ঐ দিব্য জীবনে স্পন্দিত হবে।

তিনি আমাকে ছাডতেই চাননা। তাঁর ব্যক্তি-স্বকপের প্রজ্ঞায় আমি যেন প্রভিঞ্চলিত। তিনি আমার স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কাছে আমার কোন প্রার্থনা আছে কি? আমি হকচকিয়ে একটু থেমে, যেন মনের অতলে ভর দিয়ে বললুম—ধন্যবাদ আপনাকে কাছে কোন ঐহিক দরবার ব্যপদেশে আসিনি। আমাব চাওয়া ও পাওয়ার কিছু নেই। শুধু আশীর্বাদ করুন, তাঁর প্রার্থনার আলোয় আমার জীবনের অবশিষ্ট দিন যেন আনন্দ আর শাস্তির নিবিড় সুধায় কানায় কানায় ভরে ওঠে। আশীর্বাদ করুন আমি যেন তাঁর কৃপায় হই। আমাকে দেখলে সকলেই যেন খুশি হন, আমিও আপামর সাধারণকে দেখে আনন্দিত হই এবং তাঁর কথা যেন সকলের চৈতন্যে ভেসে ওঠে।

আমার সব দম এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ফুরিয়ে গেল। কথার দেউটি নিভে পেল। প্রসন্নদৃষ্টিতে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর পি, এর টেবিলে এসে আমার জন্য একখানা চিঠি ডিক্টেট করে দিলেন। চিঠি সহি কবে আমার হাতে নিতেই, ভুমিষ্ট হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। সেই চিঠি আজও আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্পর্কে একাধারে আনন্দের নতুন ও মৌলিক কোন মন্তব্য আমার পক্ষে সাজে না। কেননা আমার যোগ্যতার একান্ত অভাব। ধর্ম ও দর্শনের আমি ছাত্রও নই। কেবল নির্খুঁত ইংরেজীর ভাষায় ব্যয়োগ ও সুরিধা পোষে

জীবনে তাঁর বক্তৃতা বরাবর শুনতে গেছি। ভারতীয় মনীষীর মধ্যে অমন অপূর্ণ “ক্ষম্ম মেকার” কোটিকে গোটিক মেলে। তাঁর ইংরেজী স্টাইল চিরদিন আমার চেনা ও জানা মনে হত—কিন্তু কিছুতেই তাঁর পেতুমনা কার সঙ্গে তাঁর মিল আছে। সেও অনেক কালের কথা, খুব কম করে তিরিশ পঁইত্রিশ বছরত হবেই। একদা গ্রীষ্মের রাতে অসহ্য গুমটে ঘুম ভেঙে গেল। ভাড়াঘুম জোড়া দেওয়াব পক্ষে অনেক মনে করেন। বই শুধু ঘুমপাড়ানী নয়, ঘুমের মহোষদ। পচন্দসই মনে মতন বই, আমার কাছে চিরদিনই ঘুমপাড়ানী। ঘুমত গেছেই, গরম তাড়বার বা ভোলবার জ্ঞান বৈঠকখানায় গিয়ে শেলফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে বসলুম। বইটি হলো প্লেটোর বিখ্যাত সংবাদ বা “গ্রেট ডায়লগস্ অব প্লেটো” বই পড়তে পড়তে ভোর হল, কলে জল এল, চোখ করকর করছে। প্লেটোর অপকৃপ অফুরাণ কথোপকথন তখনো শেষ হতে অনেক বাকি। নিশা-সাগরের ঐতিষ্যিক হল ঠাণ্ডাজলে থচুর স্নান। স্নান করে স্নিগ্ধশুচি হয়ে মনে হল, শুধু ভিতরে নয়, “আনন্দময় জগৎ তোমার বাইরে খেলা করে” বাইরের আনন্দ কদাচিৎ ভিতরে এসে ঢোকে কিন্তু ভিতরের আনন্দ সচরাচর বাইরকে ঐতাবিহ করে। সেই দিনই হঠাত আবিষ্কার করেছিলুম, আমি এই বই সাকুল্যে যদি দশ-বা পনেরবার পড়ে থাকি, ডক্টর সর্বপল্লী

রাধাকৃষ্ণন কম করে তা হাজারবার পড়েছেন। কাজেই প্লেটোর সাবলীল রচনামূল্যের আনন্দ ও স্বচ্ছতা তাঁর রচনাবলীতে গভীর ছায়াপাত করেছে।

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শ্রেষ্ঠ দান ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের নিখুঁত নিখরকিচ ইংরেজী তর্জমা। ইংরেজির মারফৎ তিনি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন জগৎ-সভায় তুলে ধরেছেন। আমাদের ধর্ম ও দর্শনের ফলশ্রুতি আগামী শতকের গোড়ায় নতুন করে দেখা দেবে। উত্তর স্বাধীনতা পর্বে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশ্বের আগ্রহ বাড়ছে এবং বিশেষ করে বাড়ছে ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আগ্রহ। ভারত পথিক রামমোহন থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের আধুনিক রূপান্তর বেদনা-দিক্শু পৃথিবীকে শাস্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একদা ঔপনিবেশিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভ না করলে মনে হত—জীবন বিফল হয়েছে। শীঘ্রই সারা বিশ্বের বিজ্ঞাপীঠ হবে ভারতবর্ষ।

শুধু অভ্যন্তরীণ ভিন্দেশীয় নন, আমাদের স্বদেশের মানুষ ও নতুন করে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পড়তে ও উপলব্ধি করতে শিখবে। আজ থেকে আরও পাঁচশবছর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দেশে ও বিদেশে বিশেষ করে সমাদৃত হবেন।

চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সমুদ্র নিপ্লনের তাৎপর্য

রাখাল দত্ত

কৃষি কর্মকৌশলের দ্বিতীয় যুগ ১৯৩২

১৯৬১ সাল নাগাদ চীনের কৃষিব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল একথা আগেই বলা হয়েছে। ধীরে ধীরে নানা সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিটি কৃষকের আয়তনে ছোট করে দেওয়া হল এবং দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব কৃষক প্রশাসনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গ্রামাঞ্চিত্তক উৎপাদন দলের উপর স্থাপন করা হল। চাষীদের ব্যক্তিগত জমিও ফিরিয়ে দেওয়া হল। ১৯৫৮ সালে কৃষকের সংখ্যা ছিল ২৪,০০০। ১৯৬২ সালে এই সংখ্যা এসে দাঁড়াল ৭৪,০০০ এ। আগে যেভাবে কৃষির ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল, এখন একইভাবে ক্ষমতা কিছুটা বিকেন্দ্রীভূত করা হল। প্রকৃতপক্ষে চীনের কৃষিব্যবস্থার সমাজীকরণের অভিজ্ঞতা এই বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করে। যৌথ খামারগুলি একত্র করে কৃষক সৃষ্টি করা হয়; আর গ্রাম কেন্দ্রিক প্রাথমিক সমবায় উৎপাদন সামন্তিকগুলির সময়সই ছিল যৌথ খামারে বা কালোচিহ্নিত খামারে। অধিকাংশ কৃষকই আগের সংস্থাগুলি পরিবর্তিত নামে বিদ্যমান ছিল। প্রতিটি কৃষকের অন্তর্গত যৌথ খামারগুলিকে বলা হত

উৎপাদন ব্রিগেড এবং প্রতিটি উৎপাদন ব্রিগেড আবার কয়েকটি উৎপাদন দলে বিভক্ত ছিল। ১৯৬১ সালের পর অনেকটা ক্ষমতা বিশেষ করে কৃষি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হল উৎপাদন ব্রিগেড ও উৎপাদন দলকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার উৎপাদন দলগুলিকেও আগের পারস্পরিক সাহায্য দলে ভাগ করে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরও বিকেন্দ্রীভূত করা হল।

নতুন ব্যবস্থায় খুব সম্ভব কৃষকগুলি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থায় পরিণত হল। অবশ্য উৎপাদন ব্রিগেড ও দলগুলিকে কেন্দ্রের অর্থনীতির পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত করা এবং কর সংগ্রহ করাও এসব কৃষকের কাজের মধ্যে হ'ল। ভ্রাতাভাড়া আপেক্ষিক ভাবে বড় শিল্প ও সেচ গ্রন্থগুলিও কৃষকের তত্ত্বাবধানে থেকে গেল। উৎপাদন ব্রিগেডের কাজ হল প্রধানত কৃষক প্রশাসন ও উৎপাদন দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

একই ভাবে সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা গেল। আগে কৃষকই ছিল গ্রামাঞ্চলে সব সম্পত্তির মালিক। সে জায়গায় সম্পত্তি এখন তিন শ্রেণীতে ভাগ করে কিছুটা

২০৯ চীনের কৃষি-অভিজ্ঞতা ও সবুজবিপ্লবের তাৎপর্য

কম্যুনের হাতে, কিছুটা উৎপাদন ত্রিগেডের হাতে এবং বাদ বাকি উৎপাদন দলের হাতে দিয়ে দেওয়া হল। ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাস থেকে ত্রিগেডকে অধিকাংশ সম্পত্তির মালিক করা হয়। আবার ১৯৬১ সালের নভেম্বর থেকে উৎপাদন দলই হয়ে দাঁড়াল সম্পত্তির মৌল অধিকারী।

এই সঙ্গে ব্যক্তিগত জমি চাষীদের ফিরিয়ে দেওয়া হল। এসব জমিতে যে শুধু মালিকানা ব্যক্তিগত ছিল তাই নয়। এগুলি বিক্রি করা যেত বা অস্থায়ী ভাড়া দেওয়াও যেত। এ ভাড়া এ সময় তথাকথিত “জমির দায়িত্ব ব্যবস্থা” চালু করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি চাষী বা চাষী পরিবারকে এক এক খণ্ড জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছিল ঐ জমি থেকে একটা পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করতে। চাষী স্বাধীনতার কাজ করত। ফসল কাটার পর পূর্বাক্ত কোটা অঙ্কসারে উৎপন্ন শস্য বণ্টনের জন্য উৎপাদন দলকে দেওয়া হত এবং বাকিটা চাষীর কাছেই থাকত।

এই সময়ে চাষের যন্ত্রপাতি ও গরুঘোড়া ও চাষী পরিবারদের মালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে একটা সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে একটা উৎপাদন দলে ৩৪টি চাষী পরিবার ছিল এবং তাদের মোট ৮২৬টি চাষের হাতিয়ার ছিল। এসব যন্ত্রের মাত্র ৮.১ শতাংশ সাধারণ মালিকানায় ছিল; আর ৯১.৯ শতাংশই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়।

এই উৎপাদন দলটিকে ব্যতিক্রম মনে করার কোনও কারণ নেই।

মোট কথা এই যে ১৯৬৪-৬৫ সাল নাগাদ চীনের কৃষিতে এক নমনীয় ব্যবস্থা দেখা দিল। এই ব্যবস্থায় কম্যুন ও ব্যক্তিগত চাষের এক সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। তবে দেশের সর্বত্রই যে এক রকম কৃষিব্যবস্থা ছিল তা নয়। মোটামুটিভাবে সাধারণ একটা কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য নিয়ে আসা হয়েছিল। এদিক দিয়ে চীনের মত বিরাট দেশের পক্ষে তা খুবই সুবিধাজনক হয়। কারণ, এক এক অঞ্চলের অবস্থা এক এক রকম হওয়ায় এক ধরনের কাঠামো সব অঞ্চলের পক্ষে উপযোগী হতে পারত না। সবচেয়ে বড় কথা ১৯৬১ সালের পর বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে উৎপাদনে চাষীর উৎসাহ ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ব্যক্তিগত জমি ও অবাধ গ্রামীণ বাজারের মাধ্যমে চাষীরা উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পায়।

১৯৬২ সালে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হয়। কম্যুন ব্যবস্থার বড়াকড়িও শিথিল করা হয়, এই দুটি কারণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে যায়। ব্যক্তিগত জমি চাষীদের ফিরিয়ে দেওয়ায় তরিতরকারী ও পশুজাত খাদ্যের সরবরাহও অনেকটা বাড়ে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৫৯—৬১ সালের বাৎসরিক গড় ১৬ কোটি বা ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন থেকে বেড়ে হয় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ১৮ কোটি টন। অবশ্য ১৯৫৭ সালের উৎপাদন মাত্রার চেয়ে তাও প্রায় ৫০ লক্ষ টন থেকে ১ কোটি টন রয়ে যায়।

আর এরই মধ্যে জনসংখ্যা বেড়ে যায় প্রায় ৭ কোটি ফলে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ বাড়াতে হয় এবং শিল্পের জন্য দরকারী কাঁচা মাল তৈরী থেকে বেশ কিছুটা আনতে হয়।

এই অবস্থাতেই ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের কম্যুনিষ্ট দলের দশম প্লেনামে অতীতের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাতিল করে নতুন একটি পরিকল্পনা চালু করার কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনাকে “কৃষি প্রথমে” পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। এই কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের আরও বড় অংশ কৃষি-বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং শিল্পবিভাগের এমন পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয় যাতে কৃষির জন্য যে সব শিল্পজাত উপকরণ প্রয়োজন সেগুলি উৎপাদন করাই হবে শিল্পের প্রধান কাজ। শুধু তাই নয় আরও বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার বিদেশ থেকে আমদানিও শুরু করা হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চীন প্রতিবছর ৪০ লক্ষ টন থেকে ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যও নিয়মিতভাবে বিদেশ থেকে আমদানী করে।

১৯৬৩ সালে তুলোর চাষও বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। খাদ্যশস্যের অভিজ্ঞতা থেকে চাষীরা যে শিক্ষা পেয়েছিল তাতে তারা তুলো চাষ বাড়াতে আগ্রহী ছিল না। এদের সন্দেহ দূর করার জন্য সরকার যে সব কৃষি উৎপাদন দল তুলো চাষ করবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে গম সরবরাহ করতে রাজী হয়। কিন্তু ১৯৬৩ সালে উত্তর চীনের সমতল ভূমি সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক বন্যার প্রকোপে পড়ে। ফলে তুলোর চাষের জন্য

ভূমির পরিমাণ বাড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠে। তাছাড়া হুলুদ নদীকে (ইয়েলো নদী) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে ১৯৬১ সালে যে সানমেন খাদ বাঁধ প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছিল তাও ১৯৬৩ সালে পলিমাটি ভরে প্রায় সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে।

১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালকে “কৃষি প্রথম” নীতির ছুটি বছর বলা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালে কৃষি নীতিতে আরও পরিবর্তন আনা হয়। এবছর থেকেই বেশি জোর দেওয়া হয় কৃষি উৎপাদনে স্থিরতা আনার লক্ষ্যের দিকে। বণা বাহুল্য ১৯৬৩ সালের তিন্ত অভিজ্ঞতা থেকেই নতুন এই কার্যক্রমের জন্ম। ১৯৬৪ সাল থেকেই চীনের সব কৃষিক্ষেত্রে “সাধারণ” ও উচ্চ ফলনশীল” এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা শুরু হয়। সেচ ও জল নিকাশের জন্য যে সব প্রকল্প সরকারী বিনিয়োগ করা হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই “উচ্চ ফলনশীল” অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলে বন্যা বাধরা হলেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য এই অঞ্চল থেকে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়। একই সময় শিল্প কৃষির জন্য যেসব উৎপাদনের উপাদান যেমন রাসায়নিক সার উৎপাদন করছিল, তারও অধিকাংশ নিয়ে যাওয়া হয় এসব উচ্চ ফলনশীল অঞ্চলে।

উৎপাদনে স্থিরতা অর্জনের এই নীতির ফলে উত্তরের সমতল ভূমি থেকে বেশি জোর দেওয়া হয় চীনের দক্ষিণাঞ্চলের উপর। প্রধানত দক্ষিণের ধানের ভূমিতেই লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

সেদিন শান্তি স্বপ্ন প্রভাতে

ডায়েরী

বিজন গাঙ্গুলী প্রকৃত পক্ষে এখানকারই ছেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। চাকরীও করে কলিকাতাতেই, ১০টা টোকার করানী। ছুটি পেলেই এখানে আসে। এলেও বাড়ী থেকে একেবারেই বেরোতে চায় না। বাড়ীতে আছেন বাবা, মা, জী শীলা এবং তার ছুটি ছোট ছোট ছেলে। সারা দিন কেটে যায় ছুজনে মুখোমুখি, সারা বছরের না পাওয়ার বিচ্ছেদ পুরিয়ে নিতে চায় কয়েকদিনের মিলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু মিলনী সংঘের বার্ষিক সভায় তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হয়।

মিলনী সংঘে একটি নয় দুটি। একটি বাঙালী-দের, অপরটি বিহারীদের। দুটোর টাকাই জোটান এখানকার শেঠেরা। দিবারাত্রি রেযারেসিবে ইফ্কনও দেন তাঁরাই। ছপকের সাক্ষাতে গালাগালির অস্ত থাকে না। তবে কখনও হাতাহাতি হলে মিটিয়েও দেন শেঠেরাই। ঘেন কই নাহকে জলে জ্বিয়ে রাখা।

দিনটি ছিল শান্তিদায়ক নবমী। গত বছরও এই শুভ দিবসে প্রতিটি বাঙালীর বাড়ীতে ছিল কত না উৎসব। আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। সপ্তমার দিনেও সাড়ে ৪ টাকা দরে কিছু চাল পাওয়া গিয়েছিল। আজ সমস্ত চালই শেঠেদের অন্দর-

মহলে। চিনি পাওয়া পেলেও ৭ টাকার বমে নয়। শেঠেদের দালাল এখানকার সবচেয়ে বড় কর্তাও খোদ পুলিশের সহায়তাতেই সমস্ত চাল এবং গম রাতের অন্ধকারে সপ্তমীর রাতে ইম্পাতনগরীতে পাচার করে দিয়েছেন, সেখানে দর এখন আকাশ ছোঁয়া।

বাবার অসুখ হওয়াতে বিজনকে বাধ্য হয়েই সেদিন বাজারে বেরোতে হয়, গত রাতে সে শীলাকে কথা দিয়েছিল যে তার প্রিয় খিচুড়ি সে এবার খাওয়াবেই। বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ীতে একবেলা ফেন ও একবেলা ভাত খাওয়া চলছিল, ফেন আজকাল কেউ ফেলতে পারে না। কিন্তু আজ তাও সম্পূর্ণ বন্ধ। ভাইকে হয়তো সে পাঠাতে পারতো কিন্তু সে কলকাতার অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল যে কালো ব্যাপারীর কালোহাত কে কিছু রক্ত মুজা দিয়ে সাদা করা যায়। তাই সে নিজেই বাজারে যায়।

সকাল থেকেই বিজনের মন ও মুখ ভিক্ত হয়ে রয়েছে, ঠোঙ্গা বানাবার জন্য বে কাগজ এনেছিল তা থেকে গতকাল রাতে অত্যাচার নিপীড়নের নানা ঘটনা পড়ে তার মন ভরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই কি স্বাধীনতার ফলশ্রুতি, হাজারে হাজারে প্রজুটিত

তরুণ তরুণী বিশ্বুতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, যা একতাত্ত্বিক শাসনেই সম্ভব।

মুখ বিশ্বাদ, কলকাতা থেকে ভাল চা এনেছিল শুনেছিল চিনি পাওয়া যায়, কিন্তু সবই ভুলে সংবাদ স্যাকারিনের দৌলতে মুখও হয়ে উঠেছে তিক্ত। চাল নেই যাওয়া দেওয়া হয় তা কেবল শেঠেদের মোসাহেবদেরই।

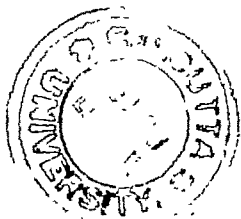
বিজ্ঞান বাজারে এসে পৌছল, চারদিক ভীড় উদ্বেগনা, শুনেলা কিছুক্ষণ আগে পুলিশ টহল দিয়ে গেছে এবং সাতদিনের মধ্যে কিছু চালের সুরাহা হবে এ আশ্বাসও নাকি পুলিশ অফিসার দিয়ে গেছেন।

সমস্ত জায়গাটিতে স্থানীয় ভাষায় বাদের বলা হয় চাটু চামচে, তারাই ছড়িয়ে আছে। বাপ হয়তো শেঠ গাংগুরী লালের চাটু আর তারই ছেলে পিনাকী বাবুর চামচে। এ জায়গায় দল বলতে তারাই। তাদের রেবারেঘিই বাঁচিয়ে রেখেছে দুটি দলকে। তাই বিজ্ঞান পায়ত পক্ষে কারুর সঙ্গেই কথা বলতে চায় না। সে জানে একজনের সঙ্গে কথা বললে অপরপক্ষ তৎক্ষণাৎ তার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রথমেই দেখা হল বন্ধু অমুকুলের। আজ কাল কেউ দেখা হলেই প্রথম প্রশ্ন বাজার দর কত? অমুকুল বলে কীরে

কলকাতায় চালের দর কত? দেখ না আমাদের কি হাড়ির হাল। উত্তর দেবার আগেই এগিয়ে আসে হামিদমিঞা। এক সময় অনেক অপকর্মই সে করেছে। ওয়াগান ভাঙা থেকে আরম্ভ করে, জোর টুকরে জমি দখল পর্যন্ত সবকিছু করেই সে শেঠেদের মনোরঞ্জন করেছে। আজ তার বয়স হয়েছে। কেউ তাকে পৌছেও না তাড়াড়া গত বছর তার জোয়ান ছেলে আবহুল যখন রেলের সাত্রীদের হাতে গুলিতে মারা যায়, তখন থেকেই সে যেন অস্ত্র মাফুষ হয়ে গেছে। সেও এসেছিল চালের জন্ত আবহুলের ফেলে যাওয়া ছোট মেয়ে তুকতিমা আজ একমাস ভোগার পর, চাটু ভাত খাওয়ার জন্ত কৌণিক ধরেছে। সেও বিজ্ঞানকে দেখতে পায়, বলে “আদা” বিজ্ঞান ভাই। দেখতা তো কেইসা হাল, কালালোগ আদমী কো একদম জানবার বানা দিয়া।” বিজ্ঞান উত্তর দিতে যাচ্ছিল সেই সময় হঠাৎ চমকে ওঠ, তার কাঁধে হাত পড়ায়। ঘুর দেখে ছবেজী। বিহারী মিলন সংঘের প্রেসিডেন্ট। ছমাস আগেও বাঙালী মিলন সংজ্ঞের বাড়ীতে আগুন লাগাতে এসেছিল। বিজ্ঞান ঘাবড়িয়ে যায় ছবেজী দেখে। ছবেজী হেসে বলে ঘাবড়াও মাত্।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



AUG 1975

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর গুণ্টি

উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। দু'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও দুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। তার এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩-র বৈশাখে (মে ১৯৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভানুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক
জয়ন্তী

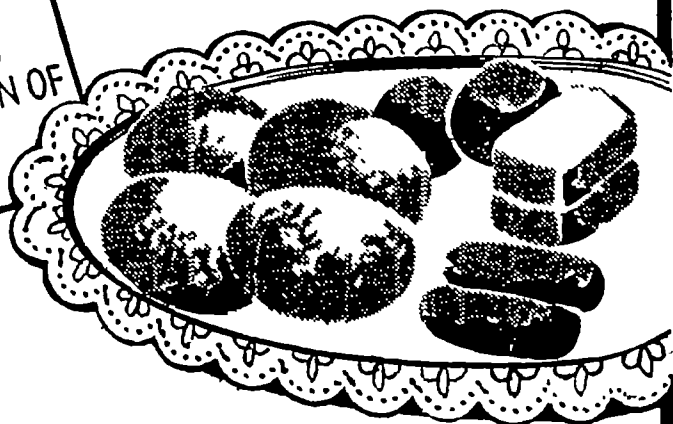
২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০

ADDS A SMILE TO YOUR DISHES

IT'S NOT ONLY
ALL GOODNESS
BUT ALSO A SIGN OF
GOOD TASTE



LAKHMI GHEE



*makes
your dishes
delicious
and
pleasing
too!*



Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1.00 with Regtd Postage
Rs 1.70 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-1710 46-4116



୪୦ ବର୍ଷ
ଭାଦ୍ର : ୧୦୪୨

ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ-ସମ୍ପାଦକ : ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧା

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পূর্তি উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ছ'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও তুচ্ছ সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আঙ্গ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩-র বৈশাখে (মে ১৯৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভানুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে ইচ্ছা রাখছি।

সম্পাদক

জয়ন্তী

১০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০

সূচিপত্র

জয়ন্তী : ভাদ্র : ১৩৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিজয়িণী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১৩	শ্বেত পদ্ম : দেশনেত্রী লীল রায়কে নিবেদিত		
চীনের চতুর্থ শ্রাশমাল			(কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	২৪১
পিপলস্ কংগ্রেস (সমীক্ষা)			না বলা (কবিতা)	মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	২৪৩
	অভয়শঙ্কর শর্মা	২১৪	বর্তমান প্রেক্ষ		২৪৫
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শিক্ষার			সেদিন শারদ স্বচ্ছ প্রভাতে 'উষ্মরুধারী		২৪৯
ফ্রমবিকাশ	শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	২২২	(সত্যঘটনা অবলম্বনে পল্ল)		
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)					
নরেন গোসাঁই যেদিন					
রাজসাক্ষী হলেন	পুলকেশ দে সরকার	২২৭			
(বিপ্লব-যুগের এক ঝলক)					

সম্পাদক : সুনীল দাস

বিজ্ঞাপ্তি

অনিবার্য কারণবশত এই : সংখ্যায় ধারাবাহিক
প্রবন্ধ 'ভারতের জাতীয়তা ও সুভাষচন্দ্র' এবং 'চীনের
কৃষি অভিজ্ঞতা ও সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য' ছাপা
গেলনা, একান্ত আমরা হঃখিত। কার্যাবধি, জয়ন্তী

জয়ন্তী

নানাস্থানের রচনা

শরৎ-মুখোপাধ্যায়
ছই শিল্পীর নিবিড় চিত্র, সাহিত্য
সংস্কৃতি বিষয়ে অন্তরঙ্গ কথা।

মহাবিশ্ব-মহাকাশ
চারণিক-এর
এক বিস্ময়কর ভ্রমণ

বিপ্লবী অনিল রায়-এর পত্রাবলী

—এছাড়া লিখেছেন—

অন্নদাশঙ্কর রায়,
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
অভয়শঙ্কর শর্মা
শিবদাস চক্রবর্তী
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শারদীয়া : ১৩৮২
গল্প

শচীন্দ্রনাথ বসু
মিহির মুখোপাধ্যায়
বিজয় কুমার ঘোষ
অন্নদামোহন বাগ্‌চী
রুচিরা মুখোপাধ্যায়
মানসী দাশগুপ্ত

রসরচনা

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

দাম : সাড়ে তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান

জয়ন্তী : ২০-এ প্রিন্স গোলাম

মহম্মদ-রোড কলিকাতা-৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন :

১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

কবিতা

গোপাল ভৌমিক
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
শান্তশীল দাস
নটিকেন্দ্র ভট্টাচার্য
মানস রায় চৌধুরী
কৃষ্ণ ধর
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
বান্ধুদেব দেব
বিজয় কুমার দত্ত
মঞ্জু দাশগুপ্ত
রাধারানী দেবী ও
আরো অনেকে

ଦୟା

୪୦ ବର୍ଷ • ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା • ଭାଦ୍ର ୧୩୫୨

୩୧

ବିଚାରିନୀ ନାହିଁ ତବ ଡ଼ର,
ନୁହେଁ ତ ବାଧ୍ୟ ତବ କର।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପରାଧ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କବିର ଦାସ,
କହିଲୁ ଏହି ମାରିଛୁ ॥

ସିବିସିଆନାହାଡ଼ି

୩୦ ଡ଼ାମ୍ବର
୧୯୭୮

চীনের ৪র্থ আশ্বিনাল পিপলস কংগ্রেস

অভ্যুদয়শঙ্কর শর্মা

চীনের খুঁচিনাটি সংবাদের জন্তু পোটা পৃথিবী যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তারই মধ্যে আবার চীনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর খবরই চীনের সেরা খবর। আর এক ব্যক্তি যার স্থান মাও-সে-তুং-এর পরই, তার খবরের জন্তুও পৃথিবীর দেশগুলি কম উৎকর্ণ হয়ে থাকে না। চীনের ভাঙা-গড়ার মহানায়ক যেমন মাও-সে-তুং তেমনি চীনের রাষ্ট্রিক-সামাজিক ভারসাম্যের দায় বহন করে এসেছেন চৌ-এন-লাই। ১৯২১-এ সাংহাই-এর একটি বালিকা বিদ্যালয়ে চীনা কমুনিষ্ট পার্টির জন্মকাল থেকে মাও-সে-তুং তার নিয়ন্তা-সদস্য। মাও সে-সময় চাংসায় একটি স্কুলের শিক্ষক। আর সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত যিনি চীনা কমুনিষ্ট পার্টিতে মাও-সে-তুং-এর সহযাত্রী তিনি হলেন তুং-পী-উ, (Tung-Pi-Wu) চীনা পিপলস রিপাবলিকের এককালীন উপরাষ্ট্রপতি। সে-সময় চৌ-এন-লাই প্যারিসে ছাত্রাবস্থায় মার্ক্সবাদের পাঠ নিচ্ছেন। অনতিবিলম্বে ফিরে এসে চীনা কমুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোতে যোগ দেন। তার পর থেকে তিনি পলিটব্যুরোর নিয়লস সদস্য হাজারো উত্থান-পতনের মধ্যে অব্যয়, অক্ষয়।

মাও-এবং চৌ এরা চীনের দ্বৈতরূপ যেমন ঐক্যরূপও তেমনি। মাও-এর নীতির প্রবণতার বিপ্লব নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হবে, বিরামহীন অব্যাহত হবে তার গতি। তাঁর মানসিকতায় বিপ্লবের বিরতি নাই। ঘরেই হোক, বাইরেই হোক। রুশ কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে তার বিরোধের মূল অনেকটা এই খানে; সমাজবাদে শাস্তিপূর্ণ উত্তরণ মাও-এর বিপ্লবী চিন্তায় অসম্ভব এবং অবাস্তব। অথচ আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট রাজনীতিতে ত্রুশ্চন্দ-আমল, স্ট্যালিন-আমল থেকে এই ভেদরেখা দিয়েই চিহ্নিত। দেশের অভ্যন্তরে সার্থক বিপ্লবে যেমন চীনের গ্রাম আর শহরের আর্থিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্যকে সংঘাতে পরিণতি দিয়ে, গ্রামকে দিয়ে শহর ঘেরার রণকৌশল নিয়েছিলেন চীনের কমুনিষ্ট নেতৃত্ব। তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচীমুখ তৈরী করবার উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বিশ্বের গ্রামাঞ্চল এবং উন্নত দেশগুলিকে বিশ্বের শহরাকলরূপে চিহ্নিত করে এই ছই-এর মধ্যে বৈপ্লবিক বৈপরীত্যের সংঘাত সৃষ্টি করতে চেয়েছেন চীনা কমুনিষ্ট নেতৃত্ব।

বৈষম্য ও বৈপরীত্যের সংঘাত এক ক্ষেত্রে থেকে

আর এক ক্ষেত্রে গড়িয়ে পড়ে। যা ছিল বাইরে আন্তর্জাতিক শিবিরে। তাই গড়িয়ে এলো চীনের রাষ্ট্র-সামাজিক জীবনে। শুরু হলো ১৯৬৬ সালের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার আশু এবং অব্যবহিত লক্ষ্য চীনা বুরোক্রাসী। এরা বিপ্লব থেকে দূরে সরে গেছে, নিজেদের সৃষ্ট মন্বণ-কোমল জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে ভাগ্যবানদের জীবন যাপন করছে, চীনের জনতার জীবন থেকে, চীনের সংস্কৃতি থেকে এদের বিচ্ছিন্ন এক জীবন, বিপ্লব এদের নিস্তরঙ্গ জীবনের নিখরতায় প্রতিহত হয়ে বার্ষ হয়ে গেছে। বিপ্লবের পরিপূর্ণতা চাই সার্থকতা চাই। তাই এদের অর্থাৎ বুরোক্রাসিকে বৈপ্লবিক আবর্তে টেনে আনতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজন হলে জোর-জবরদস্তি করে চীনের মাটির কাছাকাছি তাদের ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।

শুরু হয়ে গেলো চীনা-জীবনে সে-এক ছুঃস্বপ্নের তাণ্ডব। বহু পদাধিকারী তাদের মান হারালো, পদ হারালো কেউ বা জীবনও হারালো। চীনের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লিউ সাও চি সোভিয়েত রুশের নীতিকে স্মরণে দেখতেন। তার পদ-মানই শুধু গেলো না, বোধ হয় প্রাণও পেছে। কেউ কেউ আবার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাণ্ডবে উৎসাহভরে যোগ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাদের অনেকেরই একুল-ওকুল ছুই কুলই গেছে। চেন-পো-টা পিং-এর কম্যুনিষ্ট পার্টির কেউ-কেটা ছিলেন, মাও-এর সহচর ১৯৩৭ সাল থেকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবী গোষ্ঠীর মাধ্যম তাকে বসিয়ে

দেওয়া হয়েছিল; সেই সঙ্গে ১৯৬৯-এ পলিট ব্যুরার ষাণ্ডিং কমিটিতে তাকে স্থান দেওয়া হয়। এরকম একটি শীর্ষস্থানীয় নেতার ভাগ্যবিপর্যয় হয়। ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায়। তারপর থেকে চেন-পো-টা নিরুদ্দেশ চীনের প্রান্তরে মিলিয়ে গেছে। আবার তেমনি চ্যাং-চুং-চিয়াও (Chang'Chu-Chiao) ১৯৩০ সালে সাংহাইতে বামপন্থী সাংবাদিক মাত্র কিন্তু মাও-এর সহধর্মিণী চিয়াং চিং-এর ছত্রচ্ছায়ায়—যিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেত্রী—তরতর বেগে উর্বরতন পদ দখল করেছেন। চিয়াও এখন পলিট ব্যুরোর সদস্য, অত্যন্ত উপপ্রধান মন্ত্রী।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝাপটা চৌ-এন-লাইকেও গ্রাস করতে চেয়েছিলো। সাংস্কৃতিক বিপ্লবীরা শুধু যে এদিক দিয়ে বার্ষ হয়েছে তাই নয়। অসীম ধৈর্যের প্রতীক, বহু চীনা সংগ্রামের উত্থান-পতনের এই কুশলী নায়ক চীনের বাম ও দক্ষিণের মধ্যে সেতু-বন্ধনের কাজ করেছেন। উগ্র বামদের চোখে চৌ দক্ষিণ-বৈষা; কিন্তু চৌকে বাম-দক্ষিণের ছকে ফেলে বিচার করলে কেউ খেই পাবেন না। চৌ হলেন চীন বিপ্লবের নিরবচ্ছিন্নতার দূত, হেঁচট খেয়ে বার্ষ হওয়া থেকে বিপ্লবকে যেমন চৌ রক্ষা করে এসেছে—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উগ্র আশ্বাত্তকে তাই কৌশলে প্রতিহত করতে এই কারণেই তিনি সক্ষম হয়েছিলেন—আবার প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকেও বিপ্লবের পতিপথ অবরোধমুক্ত করে রেখেছেন। চৌ-এর পরিচয় এই কারণেই বাস্তব-

বাদীরূপে—প্রাগমাটিকরূপে। আর তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন রাজধানী এই সংঘাত, যুদ্ধভাবী চীনা নেতাটি যত পরিচিত, চীনের আর কোনও নেতাই সেই পরিচয়ের দাবী রাখতে পারেনা। বর্তমানে অবশিষ্ট চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির অস্তুতম সহ-সভাপতি চীনা সরকারে চৌ-এন-লাই-এর পরেই প্রধানতম উপ-প্রধানমন্ত্রী টেং সিয়াও-পিং (Teng Hsiao Ping) দেশে এবং বিদেশে অস্তুত চৌ-এর প্রতিনিধিত্ব করে বহির্জগতেও অনেকটা পরিচিত হয়েছেন।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত চীন-রুশ মৈত্রী পর্যায়ে যেমন চৌ-এন-লাই-এর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব প্রবল ছিল, তেমনি চীন-রুশ বৈপরীত্যে মাও-সে-তুং-এর আদর্শগত তাত্ত্বিক ভূমিকা প্রবল ছিল। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট দলের ২০-তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ ষ্টালিনকে দেবতার আসন থেকে গ্রাস শয়তানের আসনে নামিয়ে আনলে মাও-সে-তুংও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে দাঁড়ান। ষ্টালিনকে এরকম অপদস্ত করে নিজেদের মুখে কালিমালপন, মাও-এর কাছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দিক থেকে অত্যন্ত অসঙ্গত মনে হয়েছে। সোভিয়েত রুশ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে আন্তঃ রাষ্ট্র ক্ষেপণাস্রের চাবিকাঠি তার করায়ত্ত হয়েছে সুতরাং আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে, অস্তুত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সংঘাতের কিনারায় নিয়ে উপনিবেশিক শক্তিগুলির হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে এসব দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনের সহায়ক হবে—এটাই

ছিল মাও-এর ধ্যান-ধারণা। কিন্তু ক্রুশ্চেভের আমল থেকে সোভিয়েত রুশ যুদ্ধের অনিবার্যতা (inevitability of war) অস্বীকার করে পূজিবাদী সমাজের শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের নীতিকে (peaceful transition) গ্রহণ করলো, এর পর পারমাণবিক অস্ত্র-বিজ্ঞানের মন্ত্রগুপ্তি সোভিয়েত রুশ চীনকে দিতে অস্বীকার করলে, চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রুশের মৈত্রীতে চূড়ান্ত ভাঙন ধরলো। অতঃপর চীন অস্ত্রমুখীন জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে মার্ক্সবাদ—লেনিনবাদের মাওবাদী সংস্করণ প্রচার করে, তাদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করে কিছুটা কৃতকার্য হোলো।

কিন্তু তারপরই ১৯৬৬ সালে এলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্‌গততা। সে প্রচণ্ড উদ্‌গততায় মারমুখী লাল পোষাক পরা যুবকেরা (Red Guard) চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দারুণ বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এলো। পার্টির কাঠামো জেলায় জেলায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো, পরীক্ষিত পুরাণো নেতৃত্বের বহু নামী-মানী নেতা বিধ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন। এর পেছনে মাও অবশিষ্ট ছিলেন এবং সামনে ছিলেন মাও-এর উত্তরাধিকারীরূপে চিহ্নিত ও চীনের তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও এবং যিনি চীনে মাও-এর 'রেড বুক'-এর প্রবর্তক এবং প্রচারক, যে রেড বুক চীনের জীবনের অজান্তে নিয়ামকরূপে আপামর জনসাধারণ পবিত্রজ্ঞানে বন্দনা করতো। আরও এর নেতৃত্বে ছিলেন মাও-এর সহধর্মিণী চিয়াং চিং।

চীনের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধাক্কায় অটল হয়ে গেলো। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে এবং চীনা সরকারে যখন সম্মানের অস্বৈর্য মারাত্মক আকার ধারণ করলো তখন সেই তাগুওর মধ্যেও অক্ষত থেকে চীনা সেনাবাহিনীকে দিয়ে লাল কোর্তাধারী উচ্ছ্রাস বাহিনীকে (Red Guards) চৌ-এন-লাই-ই এগিয়ে এসে দমন করলেন। চীনা-প্রশাসনের স্থায়িত্বের প্রতি দেশে এবং শিদেশে যে সংশয় দেখা গিয়েছিলো, তা দূর করতে সফল হলেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মুখে চীনা কুটনীতিকদের বিভিন্ন দেশ থেকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগুনে বৈপ্লবিক চেতনা তীক্ষ্ণতর করবার জন্য। চৌ-এন-লাই ১৯৬৯ মে মাসে ১৭ জন রাষ্ট্রদূতকে তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনা-প্রশাসনের স্বৈর্য সম্পর্কে আস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন।

বলাই বাহুল্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উৎসমুখ যেমন ছিলেন মাও, তেমনি তার উদ্ধামতা দমনে চৌ-এন-লাই-এর পেছনে মৌন-সম্মতি ছিল মাও-এর।

কিন্তু ১৯৬৯ সালে তার কিছুদিন পূর্বে উসুরি নদীর ধারে সর্বপ্রথম চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষে ছুই দেশের সম্পর্কের উত্তাপ বৃদ্ধি, পেয়েছে চীন-সোভিয়েত সামরিক সংবাদের সম্ভাব্যতা অতঃপর আর অবাস্তব রইলো না। সেই সঙ্গে সিন কিয়াং-এর (Sin-Kiang)

লগ্নের অঞ্চলে চীনা পারমাণবিক, ধাঁটিতে সোভিয়েত রুশের স্বরিত প্রথম আঘাতের (pre-emptive strike) আতঙ্কে চীনা নেতাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলো।

১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর মাসে মাও-এর উত্তরাধীকারী লিন পিয়াও-এর পতন চীনে আর একটি নূতন সঙ্কট সৃষ্টি করলো। সে-বছর জুন মাসের পর লিন পিয়াওকে আর প্রকাশ্যে দেখা গেলোনা। আর ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরের এগার তারিখ রাতে চীনের সেনাধ্যক্ষ হুয়াং ইয়ুং শেনগ, (Huang yung-Sheng) বিমানাধ্যক্ষ উ-ফা-হসিয়েন (Wu Fa-hsien) ও নৌবাহিনীর রাজনৈতিক তদারককারী লি সা-পাং (Li Tsa-Pang) সহ লিন-পিয়াও সোভিয়েত রুশে পলায়নের সময় মঙ্গোলিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়। লিন, মাও-সে-তুং-এর বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং বড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হবার ফলেই দলবল সহ লিনের পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা। যে লিন ছিল মাও-এর সর্বসময়ের সঙ্গী, সেই লিন এইভাবে নিষ্ফাস্ত হবার পর মাও দ্বিতীয় কোনো উত্তরাধিকারী বাছাই করেন নাই; আর সেই সঙ্গে চৌ-এন-লাই-এর প্রভাব যে বৃদ্ধি পাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিন্তু আর একটি তাত্ত্বিক ঝড় এসে দেখা দিলো চীনের আকাশে। ১৯৭৩-এর শেষার্ধ্বে। এই ঝড় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মত উদ্ভাস না হোলোও, চীনে যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি করেছে। এবং সেই আঁচে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পার্টির নেতা—অনেককেই কিছু

না কিছু বলসে দিয়ে গেছে। এবারকার ঝড়ের পেছনেও মাও আছেন। কারণ মাও-এর আশীর্বাদ-পুষ্ট না হলে চীনে কোনো তাত্ত্বিক ঝড় বইতে পারে না। এবার লিন পিয়াও ও কনফুসিয়াস—এই দুজনকে দুই আদর্শের প্রতীকরূপে খাড়া করিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঝড় বয়েছে। লিন পিয়াও সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের প্রতীক, মাও-এর আদর্শের প্রতি যারা আস্থাহীন হয়ে সোভিয়েতের ক্রৌড়ানকরূপে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঝড়ঘন্ট করে। আর বেচারী কনফুসিয়াস। চীনের নৈতিক জীবনকে কয়েক শতাব্দী ধরে যার জীবনচর্যা শ্রেয়ের পাখে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কনফুসিয়াস তো মার্ক্সবাদী-মাওবাদী নয়। প্রাচীনপন্থী—যে প্রাচীন চীনা মূল্যবোধগুলিকে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি কম্যুন জীবনের মধ্য দিয়ে চীনা জীবন থেকে উৎসাদিত করতে চেয়েছে। কিন্তু চীনা জীবনের সহজ ভাল-মন্দবোধ, তার সহনশীলতা, তার ঐশ্বর্য ও বিনয় নতুন অনাড়ম্বর ছন্দ ভেঙে টেলে সাজতে ব্যর্থ হয়ে চীনা কম্যুনিষ্টরা কনফুসিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলো। এই পর্যায়কে বলা চলে দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। র‍্যাডিকাল আর মডারেটদের এই লড়াই পোষ্টার অভিযান দিয়ে শুরু হয়। প্রাচীন পন্থী ও নবীনপন্থীদের এই সংঘাতে চৌ-এন-লাইও লক্ষ্য ছিলেন নবীনদের এবং কনফুসিয়াস-এর বিরুদ্ধে অভিযান মূলত চৌ-এন-লাই এবং তার প্রভাবের বিরুদ্ধে অভিযান। কনফুসিয়াসের মত চৌ-এন-লাই চীনা জীবনের পরম্পরার প্রতীক,

এবং চীনা জীবনের ঐতিহ্য ও শ্রেয়বোধ তার চরিত্রে মূর্ত হয়ে আছে, সেখানে নবীন ও প্রাচীনের সমন্বয়েরও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা কার্যকর রয়েছে। এবারকার অভিযানেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে সংসদ দেখা দিয়েছিলো। এই কারণে ১৯৭৪-এর গোড়ায় দুইটি উপলক্ষ্য-সৃষ্টি করে চৌ-এন-লাই বহির্বিষয়কে আশ্রয় করে বলেছিলেন চীনের অভ্যন্তরে কনফুসিয়াস ও লিন পিয়াওর বিরুদ্ধে যে ব্যাপক রাজনৈতিক অভিযান চলেছে তাতে চীনা পররাষ্ট্র নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না। আলজিয়ার্স-এর প্রেসিডেন্ট বুমেভিয়ানকে ১৯৭৪-এর ১লা মার্চ একটি জোঙ্গে আপ্যায়নকালে চৌ এই ধরনের আশ্বাস দেন। তার পূর্বে দিয়েছিলেন জাঙ্গিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউণ্ডার সম্মানে অনুষ্ঠিত ভোজ সভায়।

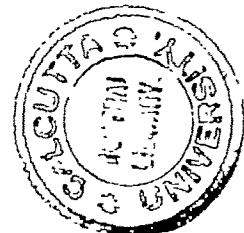
এরই মধ্যে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেস ১৯৭৩-এর আগষ্ট মাসে সেরে ফেললেও শ্রাশনাল পিপলস্ কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন বসাবার সুযোগ চীনা নেতারা করে উঠতে পারেন নাই। চীনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা কতদূর গড়িয়েছিলো, তাঝেঝা যায় ১৯৬৯-এর গ্রিশলে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নবম পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসে এবং ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে আর একটি বৈঠক বসে তারপর এ সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায় নাই।

উত্তরোত্তর সঙ্কট ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে চতুর্থ শ্রাশনাল পিপলস্

কংগ্রেস অর্থাৎ চীনা প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ জাতীয় সংসদ বা আইন পরিষদের অধিবেশন ডাকা সম্ভব হয় নাই। তার উপর সাংস্কৃতিক বিপ্লব সামলাতে সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের ডাক পড়েছিল এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তেছিল। উপরন্তু কমুনিষ্ট পার্টির কাঠামোগুলিও জীর্ণ-বিধ্বস্ত। সুতরাং সেই সময় সেনাবাহিনীর কমান্ডাররাই আইন-শৃঙ্খলার নিয়ামক, তাদের প্রভাবও সর্বময়। ১৯৭৪-এর গোড়ায় পাঁচ বছর পর মাও সেনাবাহিনীর ওপর কেন্দ্রীয় অনুশাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিলেন, সেনাবাহিনীতে অদল-বদল করলেন। যে সব কমান্ডাররা ছেকে বসেছিলেন যার যার অঞ্চলে তাদের অস্থায়ী বদলি করে দিলেন। এই সময় দলে মধ্যপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে, কেন্দ্রীয় শক্তিবাদী ও আঞ্চলিক শক্তিবাদীদের মধ্যে, সেনাবাহিনী এবং ক্ষমতার অস্থায়ী কেন্দ্রে অস্বস্তি চলছিল। মাও-এর নীতি হল: 'দল বন্দুক আগলাবে, বন্দুককে কখনও দলকে আগলাতে দেবেনা'—“The Party Commands the gun but the gun must never be allowed to Command the Party.” সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর বন্দুক-ই দলকে আগলাচ্ছিল—সে-পরিস্থিতির পরিবর্তন করলেন মাও ১৯৭৪-এর গোড়ায় ৪র্থ জাতীয় জন কংগ্রেসের প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপরূপে। পার্টির ৩১৯ সদস্য বিশিষ্ট সেন্ট্রাল কমিটি এবং ২৫৯ সদস্য বিশিষ্ট পলিটব্যুরোরও অদল-বদল হল। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন

ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পলিটব্যুরোর ৭ জন সদস্যকে বিদায় দেওয়া হল।

৪র্থ জাতীয় পিপলস কংগ্রেসের অধিবেশন পিকিং-এ বসে ১৯৭৫-এর জানুয়ারীর শেষাংশে। চারদিন ব্যাপী অধিবেশন চলে। কংগ্রেস ১৯৫৪-এর পর চীনের নতুন সংবিধান গৃহীত হল। নতুন সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদ বিলোপ করা হয়। এই প্রথম প্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার এবং কৃষকদের জমির মালিকানার এবং সেই জমিতে চাষের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হল। প্রধানমন্ত্রী-চৌ-এন-লাই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হলেন, দলের অগ্রতম সহসভাপতি টেং-সিআও-পিং Teng ২৯শে জানুয়ারী ১৯৭৫ উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। মার্শাল ইহে চিয়েন-ইং (Yeh Chien Ying) লং মার্চে মাও-এর সম্মতি লিন পিয়াও-এর স্থলবর্তী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে সাংহাই-এর প্রাক্তন সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নামী চ্যাং চুন-চিয়াও (Chang Chun Chiao) ডজন খানেক উপপ্রধানমন্ত্রীর একজন। চীনা পদাধিকারীরূপে নতুন আবির্ভাব হলেও নতুন সংবিধান ৪র্থ জাতীয় পিপলস কংগ্রেসে উপস্থাপনের সম্মান চ্যাং চুনকে দেওয়া হইবেছিল। তাই চ্যাং চুন অনেকের নজর কেড়ে নিয়েছে, আর অনেক সম্মানের শিরোপা তার জন্ত অপেক্ষা করছে কিনা সেটাই কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। চ্যাং চুন ৬৩ বছর বয়স্ক। হুয়া কুয়ো-ফেঙও (Hua Kuo-feng) একজন উপপ্রধানমন্ত্রী



অধিকন্তু পুলিশ প্রধান। এই ব্যক্তিও চীনা চোখে উদীয়মান। কারণ মাও-এর প্রদেশ ছনানের অধিবাসী সে এবং মাত্র ১৯৭৩-এ পলিট ব্যুরোতে স্থান পেয়েছে। বয়স ৫৩। তবে পুলিশ প্রধানের মুকুটের কাঁটা অনেক। জয়ার পূর্ববর্তী দুজন আততায়ীর গুলিতে লুটিয়ে পড়েছে।

আর একটি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি চেন্ সি-লিয়েন (Chen Hsi-Lien) পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং অস্ত্রতম উপপ্রধানমন্ত্রী। চেন্ পিকিং সামরিক অঞ্চলের কমান্ডার। সোভিয়েত আক্রমণ থেকে আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া এবং উত্তর চীন রক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ। সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে যে মুষ্টিমেয় সেনাধ্যক্ষরা অক্ষত বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, চেন্ তাদের একজন। ৬২ বছর বয়স্ক এই সেনাধ্যক্ষটি চীনের পরবর্তী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য।

কিন্তু র্যাডিকাল নামে দলে পরিচিত যারা তাদের কার্যর ভাগ্যে আশঙ্কাল পিপলস্ কংগ্রেসে কোনো পদ জুটলো না। যদিও পার্টিতে তাদের প্রভাব রয়েছে। এদের মধ্যে ৩৯ বছর বয়স্ক ওয়াং হুং-ওয়েন (Wang Hung-Wen) পলিট ব্যুরোতে যুবশক্তির একমাত্র প্রতিনিধি, আর রয়েছেন বামপন্থী ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান (Yao Wen-Yuan) এবং মাও-এর সহধর্মিণী চিয়াং চিং। তাকেও কোনো সরকারী দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই।

বিতর্ক উঠেছে ৪র্থ আশনাল পিপলস্ কংগ্রেসে কাদের জয় হোলো। চীনা র্যাডিকালদের না

মডারেটদের? প্রশ্নটা আরও জটিল ও তীব্রতর হয়েছে এই কারণে যে মাও-সে-তুং এই কংগ্রেসে অল্পপন্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে যে তার এই অল্পপন্থি নয়, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে ঠিক একই সময়ে চীনের গ্রামাঞ্চলে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রানজ্ জোসেফ্ স্ট্রাউসকে, (Franz Josef Strauss) অভ্যর্থনা জানাতে মাও স্ট্রাউসের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। মাও-এর অল্পপন্থিতে নূতনভাবে বোঝা গেলো, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির ভেতরের দ্বন্দ্ব মাও আপাতত পিছু হটেছেন। মাও নিরস্তর বিপ্লবে বিশ্বাসী, তাঁর নীতি হল চীনা জনগণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাপক্ষে চীনের অর্ধনৈতিক উন্নয়ন করতে হবে। আর প্রতিপক্ষ বলেছেন আর্থিক উন্নতি ব্যতিরেকে চীনের জনগণের বৈপ্লবিক মানসিকতার উত্তরণ সম্ভব নয়। চীনা তাত্ত্বিকদের সঙ্গে বাস্তববাদীদের এই বিরোধে চৌ-এন-লাই বাস্তববাদীদের মুখপাত্ররূপে কংগ্রেসে রিপোর্ট পেশ করতে হাসপাতালের রোগশয্যা ছেড়ে কংগ্রেসে আসেন এবং কংগ্রেসের রিপোর্ট পেশ করার সময় স্বার্থহীনভাবে বলেছেন যে রিপোর্টটি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মতি ক্রমেই পেশ করা হচ্ছে।—চেয়ারম্যান মাও-এর স্বয়ম্ভরতার —‘self-reliance’—উল্লেখ করেও একবার এই শতাব্দীর অবশিষ্ট বছরগুলিতে চীনকে বিশ্বের প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য এক হুঁসে বাঁধা জাতীয় প্রেরণা, বর্ধমান উৎপাদনী ক্ষমতা এবং উপযুক্ত আর্থিক উন্নয়নের জন্য চৌ আবেদন জানান।

মাও-এর স্বয়ম্ভরতার নীতি এবং দাস্তর্জাতিক

অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে দূরে থাকবার নীতি সম্বন্ধে চীনের দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য চতুর্থ কংগ্রেসে তেলের এবং অস্থায়ী পণ্যের রপ্তানির সাহায্যে সম্পদ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই হংকং-এর অর্থনীতিবিদ বলছেন : এ-সবই রাষ্ট্রীয় স্বৈর, সংগঠন ও পরিকল্পনার ভিত্তি ব্যতিরেকে হবেনা—যার ধারণা মাও নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক দূরের বস্তু—“everything will have to be conducted in an atmosphere of stability, organisation and planning—a far cry from the approach that Mao has long advocated.”

৪র্থ কংগ্রেসের পর র‍্যাডিক্যালদের সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেসে কৃষকদের জমির মালিকানা দিয়ে সেই জোত চাষের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং শ্রমিকদের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমের স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক (‘material incentive’) দেবার দাবী উঠেছে। আরও দাবী উঠেছে তাদের মজুরী উৎপাদনের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। মাওবাদী তাত্ত্বিকরা এই ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদের পস্তনরূপে চিহ্নিত করতে চান। কারণ এই ব্যবস্থা স্বীকৃতি পেলে মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের (Profit-motive) নীতি চীনা অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করবে। তার ফলে শুধু কৃষক ও শ্রমিক নয়, পার্টির কর্মকর্তারাও ব্যক্তিগত লাভের ছিড় খুঁজবে, সাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করবার কথা ভুলে যাবে। এই ভাবে অজিত অধিক ক্ষমতা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতায়

ভাদ্র ৮২-২

রূপান্তরিত হলেই পুঁজিবাদের উৎপত্তির পথে কোনো অন্তরায় থাকবে না। সুতরাং আর্থিক উন্নয়ন সব চাইতে অগ্রাধিকার পাবে, না তাত্ত্বিক শিক্ষা ও সংগঠনগত প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার পাবে, না ভবিষ্যৎ বাস্তব পাশাপাশি চলবে—৪র্থ কংগ্রেসের পরও সে প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ৪র্থ কংগ্রেস অবশিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দ্ব্যর্থহীনভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

চীন-সোভিয়েত রুশ সম্পর্কের উপর নির্ভর করবে শেষ পর্যন্ত চৌ-এন-লাই-এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাবে, না মাও-সে-তুং-এর। যদি চীন সোভিয়েত সংঘাত অব্যবহিত না হয়ে পড়ে, যদি চীন আরও কিছু সময় যুদ্ধ এড়িয়ে থাকতে পারে, তবে চৌ-এন-লাই-এর কর্মসূচী পরিণতি পাবে, আর আগামী দিন যদি যুদ্ধের সূচনা করে মাও-এর পথে চীন পুরোপুরি ফিরে যাবে।

যদি চীনা নেতারা মনে করেন রুশের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া যাবে, তবে তারা ভ্রমগ্নত বৈদেশিক কূটনীতিকদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আশ্রয়গুলি দেখতে আমন্ত্রণ জানান কেন? এই বছর এই জাহাজ্যারী ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভ্যান ডের স্টোয়েলকে (Van der Stoel) চীনা উপপ্রধানমন্ত্রী টেং সিয়াও-চাং পিকিং-এর এই আশ্রয়স্থলগুলি দেখালেন কেন? সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়াতে, না বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে দিতে?

এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করবে চীনের তাত্ত্বিকরা এমোবে, না বাস্তববাদীরা। র‍্যাডিক্যালরা না মডারেটরা? ৪র্থ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিক নিঃসংশয়ে বাস্তববাদী বা মডারেটদের দিকে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শিক্ষার ক্রমবিকাশ

শ্রীলক্ষ্মীসিংহ

ছাঁটকাট

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে সেলাই ছাড়াও ছাঁটকাট শেখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে হাতের কাজের জায়গায়। এই কাজ ছেলেমেয়েদেরও শেখান হয়।

১। পিরিয়ড—হাতে কলমে ছাঁটকাট শেখাবার জন্য স্কুলে বিশেষ পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয়। এই জন্য সপ্তাহে তিনটি করে পিরিয়ড দেওয়া হয়। নিখুঁত ছাঁটকাট শিখবার জন্য কিছু অঙ্কও জানা প্রয়োজন। স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই দিকেও দৃষ্টি দিয়ে সপ্তাহে আরও দুটি পিরিয়ড খিওরির জন্য দেন। যে কোন শিল্পেরই খিওরি এবং প্র্যাকটিকাল উভয় দিকেই ভাল করে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

২। সময়—যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাঁটকাটের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পিরিয়ডের ব্যবস্থা করেছেন। তবু শিক্ষকেরা যে ভাল করে ছেলেমেয়েদের কাজ শেখাতে পারেন না তার মূল কারণ হল সময়ভাব। একজন শিক্ষকের পক্ষে ৪০ মিনিটের পিরিয়ডে কোনক্রমেই ৪০ থেকে ৬০ জন ছেলেমেয়েকে কাজ শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ছাঁটকাট শিখবার জন্য সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হতে হয় কেননা এই ক্ষেত্রে স্বয়ং কিছু করবার চেষ্টা করলে মাপ ও কাটাতে যথেষ্ট ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব ছেলেমেয়েদের ভালকরে কাজ শেখাবার জন্য অন্তত পক্ষে হাতে কলমে কাজ শেখাবার ক্লাসগুলির সময় আরো বাড়ান প্রয়োজন।

৩। ছাত্রসংখ্যা—প্রতিক্লাসেই ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪০ থেকে ৬০ পর্যন্ত থাকে। হাতের কাজ আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হওয়ায় সকলকেই শিখতে হয়। সেই তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম থাকে। ছাঁট কাজের ক্ষেত্রে কখনই একজন শিক্ষকের পক্ষে এই বিপুল ছাত্র সংখ্যাকে ভালকরে হাতে কলমে কাজ শেখান সম্ভব নয়। এই জন্য কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থাবলম্বন করা উচিত।

৪। শিক্ষক—ছাঁটকাটের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যে শিক্ষক এই কাজের জন্য নিযুক্ত হন তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যেহেতু

এই সমস্ত শিক্ষকের খিওরি ক্লাসও নিতে হয় সেইজন্য এঁদের অন্তত পক্ষে মাস্ট্রিক পাশ হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

৫। বেতন—অগ্ৰাণ্য হাতের কাজের শিক্ষকদের মত হাঁটকাট শেখাবার শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত বেতন দেওয়া হয় না। এই সমস্ত শিক্ষকদের মাত্র ৮০ বেতন দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য বর্তমান যুগে এই অর্থে একজন ব্যক্তির জীবন নির্বাহ কখনই সম্ভব নয়। শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে শিক্ষাপরিষদের যথেষ্ট বিবেচনা করবার অবকাশ রয়েছে এবং এই অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন।

৬। উপকরণ—বলাবাহুল্য অগ্ৰাণ্য শিল্পের মত হাঁটকাটের ক্ষেত্রেও উপকরণের একান্ত অভাব দেখা যায়। হাঁটকাট শেখাবার জন্য স্কুলে সেলাইয়ের কল থাকা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই তা থাকে না বা থাকলেও তা ছাত্রসংখ্যার তুলনায় এতই নগণ্য যে তা দিয়ে বিশেষ উপকার হয় না। যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকলে ভালভাবে হাতের কাজ শেখান কখনই সম্ভব নয়।

৭। প্রস্তুত জব্বা—যদিও সপ্তম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা হাঁটকাটের কাজ শেখে কিন্তু সারা বছরে তারা কি শিখল তার কোন নির্দিষ্ট হিসাব শিক্ষকেরা দিতে পারেন না। তার মূল কারণ হ'ল কোম নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার অভাব। কোন নির্ধারিত পাঠ্য তালিকা থাকলে শিক্ষক মহাশয় তা অনুসরণ করে ছেলেমেয়েদের শেখাতে পারেন এবং তাতে কাজে শৃঙ্খলাও আসে। হাঁটকাট শেখাবার জন্য কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয় তারও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮। ব্যয়—এই কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় সমস্ত বছরে তা ঐ বিপুল ছাত্র সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। ৪০ থেকে ৬০ জন ছেলেমেয়ের জন্য বছরে মাত্র ৪০ টাকা ব্যয় করা হয়।

৯। পরীক্ষা—সমস্ত বছর ধরে ছেলেমেয়েরা কি শিখল তা যাচাই করে নেবার জন্য কোন রকমের পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না। অথচ মাঝে মাঝে তাদের জ্ঞানের যাচাই হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য পরীক্ষা না নিয়ে যদি নিয়মিত দৈনন্দিন কার্যকলাপের হিসাব প্রতিটি ছেলেমেয়েকে দিয়ে রাখান যায়, তবে তার সাহায্যেও তাদের জ্ঞানের মান নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে হাঁটকাটের এই জ্ঞাতায় কোন হিসাবই রাখা হয় না।

বাগান

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে যে সমস্ত বিষয়কে হাতের কাজের স্থান দেওয়া হয়েছে বাগান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। খাচ্চ সমস্তা জর্জরিত ভারতের স্কুলগুলিতে যদি ছেলেমেয়েদের নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি শেখান যায় তবে নিঃসন্দেহে দেশের উপকার হবে। কিন্তু অত্যন্ত হুঃখের বিষয় যে এই দিকে কতৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ দেখান না। সম্ভবতঃ সেইজন্যই এই কাজটি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারছে না।

১। প্র্যাকটিকাল—‘বাগান’ এমন একটা বিষয় যার জন্ত হাতে কলমে কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। কোন্ অবস্থায় কি ধরনের মাটিতে কোন জাতীয় ফসল উৎপন্ন করা যায় তার জন্ত কি কি কাজ করা উচিত এই জ্ঞান ছেলেমেয়েদের শুধু মাত্র বই পড়ে নয়, হাতে কলমে কাজ করে অর্জন করতে হবে। কোন কোন স্কুলে সপ্তাহে ৪০ মিনিট বা ১ ঘণ্টা করে সময় প্রতিটি ক্লাসকে দেওয়া হয় এই কাজের জন্ত। কিন্তু এমন স্কুলেরও অভাব নেই যেখানে প্র্যাকটিকাল ক্লাসের কোন ব্যবস্থা নেই; মাত্র বই এর মাধ্যমে ছেলেরা বাগান করতে শেখে।

২। থিওরি—হাতে কলমে কাজ শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পুঁথিগত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অধিকাংশ স্কুলেই কতৃপক্ষ এই বিষয়ের জন্ত বিশেষ পিরিয়ডের ব্যবস্থা করেছেন। সপ্তাহে প্রতি ক্লাসের জন্ত ৪০ মিনিট করে দেওয়া হয় থিওরি পড়বার জন্ত।

৩। সময়—অধিকাংশ স্কুলেই প্রতিটি ক্লাসের জন্ত সপ্তাহে একটি করে পিরিয়ড বাগানের জন্ত দেওয়া হয়। এক পিরিয়ডের মধ্যে বাগানের কাজ শেখান যেতে পারে কিন্তু তারজন্ত কিছু বেশী সময়ের প্রয়োজন। মাত্র ৪০ মিনিট বা ১ ঘণ্টার পিরিয়ডে একজন শিক্ষকের পক্ষে ছেলেমেয়েদের বিশেষ কিছু শেখান সম্ভব হয় না।

৪। ছাত্র সংখ্যা—বেশীর ভাগ স্কুলেই বাগানের ক্লাসে ২০ থেকে ৪০ ছেলেমেয়ে থাকে। কোন হাতের কাজের ক্লাসেই ২০ জনের বেশী ছেলেমেয়ে থাকলে একজন শিক্ষকের পক্ষে সকলের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে পরিকল্পিত কাজটিও সাফল্য লাভ করতে পারে না। কোন ছাত্র কাজ করতে গিয়ে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা যদি শিক্ষক মহাশয় জানতে চান তবে আরো বেশী সময়ের প্রয়োজন, আর সময় যদি বাড়ান সম্ভব না হয় তবে ছাত্রদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে কাজ করাতে হবে।

৫। শিক্ষক—অল্প বিস্তার বাগানের কাজ হয়ত সকলেই করতে পারেন কিন্তু ছাত্রদের সেই কাজ শেখাবার জন্ত বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও শিক্ষণের একান্ত আবশ্যক। এই জন্ত এই বিষয়ে শিক্ষক

নিয়োগের সময় তাঁর যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাগানের কাজের জন্য যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন তাঁদের হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে যথার্থ শিক্ষণ প্রাপ্ত কমই থাকেন, অধিকাংশই বি. এ.সি. বা বি. এ. পাশ করে এই বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। আবার এমনও দেখা যায় যে উচ্চ ক্লাসগুলিতে পড়বার জন্য শিক্ষক—শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। অবশ্য একটি স্কুলে কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এমন শিক্ষকও পাওয়া যায়।

৬। বেতন—সাধারণতঃ অগ্রাঙ্ক শিল্প শিক্ষকদের মত বাগানের শিক্ষকদের বেতনও অত্যন্ত সামান্য। একটি স্কুলে ১১৫—১৮৫ টাকা বেতন দেওয়া হয়। অবশ্য এই জাতীয় শিক্ষকদের নিয়োগ প্রায়ই পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে হয়। কতকগুলি স্কুল এই সমস্ত শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। লক্ষ্য করে দেখা গেছে প্রায় সমস্ত শিক্ষকই বি. এ. অথবা বি. এ.সি. করে অথবা শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করছেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে সম্ভবতঃ এই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষকদের দিয়ে প্রধানতঃ অগ্র বিষয় পড়ান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ছেলেমেয়েদের বাগানের কাজ কিছু কিছু দেখান। সম্ভবতঃ এই জন্য তাঁদের শিল্প শিক্ষকের শ্রেণীতে রাখা হয় না।

৭। উপকরণ—অধিকাংশ স্কুলেই বাগানের কাজের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন তা থাকে না বা থাকলেও তা ছাত্র সংখ্যার তুলনায় এতই সামান্য যে সেই উপকরণের সাহায্যে যথেষ্ট ভাবে কাজ করা যায় না। কতৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের যুক্ত প্রয়াসেই এই অভাব দূর করা সম্ভব।

উৎপন্ন জব্য—প্রায় প্রতিটি স্কুলেই যষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অগ্রাঙ্ক হাতের কাজের মত বাগান করান হয়। অবশ্য কোন কোন স্কুলে মাত্র নবম ও দশম শ্রেণীতেই এই কাজ শেখান হয়। সময়ের দিক দিয়ে বিচার করলে এই সময় নেহাৎ কম নয় কোন হাতের কাজ শেখার পক্ষে। কিন্তু সম্ভবতঃ পক্ষে ছেলেমেয়েরা কোন কাজ শেষে কি না এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা কি উৎপন্ন করে তার কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব কোন স্কুলেই দিতে পারে না। এর থেকে অনুমান করা যায় সম্ভবতঃ কোন স্কুলেই ছেলেমেয়েরা উল্লেখ যোগ্য কিছু উৎপন্ন করে না।

৯। ব্যয়—বাগানের কাজ শেখাবার জন্য যে সমস্ত জব্যাদি সংগ্রহ করতে হয় তার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার নির্দিষ্ট হিসাব প্রায় কোন স্কুল থেকেই পাওয়া যায় না। যে সমস্ত স্কুল থেকে সেই হিসাব পাওয়া যায় তাতেও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। যেমন কোন স্কুলে মাত্র ২৫ট

২২৬ জয়ন্তী, ভাদ্র ১৩৮২

এর জন্য বরাদ্দ করা হয়, আবার কোন কোন স্থলে ১০০—১৫০ টাকা পর্যন্ত আবার কোন স্থলে এর চেয়েও বেশী প্রায় ২০০ টাকা। এই ক্ষেত্রে একটা নিয়ম থাকা আবশ্যিক।

১০। ব্যবস্থিত জব্য—বাগানের কাজ শেখাবার জন্য কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন তার হিসাব কোন স্থল থেকেই পাওয়া যায় না।

১১। পরীক্ষা—ছেলেমেয়েরা বাগানের কাজে কতটুকু দক্ষতা অর্জন করল তা যাচাই করবার জন্য কোন কোন স্থলে বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য এই জাতীয় পরীক্ষা বাগানের কাজের ক্ষেত্রে একেবারে প্রযোজ্য নয়; যে সমস্ত স্থলে খিওরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় সেই সমস্ত স্থলেই বিশেষতঃ এই জাতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। সারা বছরে ছেলেমেয়েরা বাগানে যে সমস্ত জব্য উৎপাদন করল তাই সব সময় লক্ষ্য করে সেই অনুযায়ী তাদের জ্ঞানের মান নির্ণয় করা উচিত। সুখের বিষয় সেই রকম ব্যবস্থাও কোন কোন স্থলে দেখা যায়।

জয়ন্তী প্রকাশনের কলেক্টিবই

নেতাজী প্রসঙ্গে :

—অন্যান্য বই—

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০
৩ ও ৩য় খণ্ড ১৩.৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়
সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০

সুভাষচন্দ্র ও আশনাল প্ল্যানিং
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬.০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

Paper back 4/- Board 5/-

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

ঐ মহামানব আসে : চারণিক ৬.০০

চিন্তাজয়ী চিন্তারঞ্জন

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০.০০

রামমোহন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৪.০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

অনিল রায় ৪.০০/৬.০০

বাংলাদেশের বিপ্লব

সুনীল দাস ১.২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অনিল রায় ২.০০

শ্রাবণ সংখ্যার পর

বিপ্লব-যুগের এক বলক

নব্বেন গোসাঁই বোদ্ধন রাজসাক্ষী হ'লেন

পুলকেশ দে সরকার

জিজ্ঞাসা : বিশ্বভূষণ চ্যাটার্জি কে ?

বিশ্বভূষণ চ্যাটার্জি : আমি আলিপুর জেলের একজন কয়েদী। যেদিন জেলে গুলী চলে সেদিনের কথা আমার মনে আছে।

জেরায় বলল : আমি সত্যেন্দ্র হাতে এ ছুটির কোন পিস্তলই দেখিনি। হিগিন্স ও গোসাঁই নেমে আসার আগে আমি তৃতীয় আওয়াজটা শুনি। শব্দ শুনে আমি নিজেই ওপরে উঠে যাই। আমি মোট দুটো শব্দ শুনি। আমি যখন নীচে ছিলাম তখন একটা আওয়াজ শুনি। আমি জুট মিলের দিক থেকে কোন আওয়াজ আসতে শুনি। আমি শামুগ্য হাজামকে চিনি। আমি তাকে নীচে আসতে দেখিনি। আমি যে চারজনকে দেখি বলেছি তা বাদে আর কাউকে দেখিনি। কম্পাউণ্ডার নেমে আসার মিনিটখানেক পর বৈজ্ঞানিকবাবুকে নেমে আসতে দেখি। কি হিগিন্স কি ডাক্তারবাবু অথবা কম্পাউণ্ডার কেউই কিছু বলেন নি।

জিজ্ঞাসা : এই রিভলভারটাই কি কানাইয়ের হাতে ছিল :

সাক্ষী : হ্যাঁ।

জুরীদের মুখপাত্র : যখন সত্যেন্দ্র আপনার পাশ কাটিয়ে গেল, তাঁর হাতে কিছু দেখেছিলেন ?

সাক্ষী : হ্যাঁ, আমি বলেছি, তাঁর হাতে একটা রিভলভার ছিল।

বৈজ্ঞানিক চ্যাটার্জি : আমি জেলের একজন হাসপিটাল এসিস্ট্যান্ট। আমি সত্যেন্দ্রবাবুকে চিনি।

আন্তবাবু : দরকারী কাগজপত্র সব এনেছেন ?

হ্যাঁ। ঊর্কে ১৯০৮-এর ১৭ই জুলাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি হাসপাতালের রেজিস্টার রাখি। ঐ দিনই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার ২৭এ জুলাই ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তির আগে তিনি ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারের সেলে ছিলেন, নীচের ডলার কোয়ার্টারেই। তিনি নিশ্চয়ই কোয়ার্টারেই ১০ দিনের মধ্যে এসেছিলেন। আমি রোগীদের মেডিকাল অফিসারের সামনে হাজির করলাম। তিনিই ওয়ারেন্ট সহ করেন। আমি ওয়ারেন্ট থেকে দেখেছি, তাঁকে ২৬ এ ও ২৭এ আগষ্ট জেলে পাঠানো হয়নি। আমি তাঁকে ৩০শে আগষ্ট দেখেছি। তাঁর স্বর হয়েছিল।

৩১শে তাঁকে দেখার কোন উপলক্ষ হয়নি আমার। এই সময়টা তিনি হাঁটতে পারতেন। খোলা হাওয়া ও ব্যায়ামের জন্তু তাঁদের হাঁটতে দেওয়া হ'ত। দিনের বেলায় রোগীদের বারান্দায় হাঁটতে দেওয়া হয়। সত্যেন্দ্রের বিছানা ছিল প্রথম ঘরে।

প্র : ইস্র নন্দী নামে কোন রোগী ছিলেন ?

মি: ব্যানার্জি : আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

জজ আপত্তি খারিজ করে দিলেন।

সাক্ষী : তিনি বোমা মামলার দ্বিতীয় দলের আসামী। তাঁর হাত উড়ে গেছে। তাঁর আসন ছিল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে।

প্র : তাঁকে কবে ভর্তি করা হয় ?

মি: ব্যানার্জি : অগ্রাসঙ্গিক বলে আপত্তি জানাই।

জজ : বেশ।

সাক্ষী : তিনি ৩০ এ ও ৩১ এ হাসপাতালে ছিলেন। আমি জানি, কানাই দত্ত দায়রা সোপর্দ হয়েছেন। তিনি বৃকে ব্যথার নালিশ করছিলেন। তাঁকে বিশেষ ক'রে ইস্র নন্দীর পরিচর্যা জন্তু ঐ ওয়ার্ডে আনা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের দিন আমি ডিসপেন্সারি গেছলাম। আমি সত্যেন্দ্রকে লক্ষ্য করিনি। সেখানে আমি গোসাঁইর মাথা টেনে কানে কানে বললাম, “কি হুঃসাহসে আপনি এখানে এসেছেন?” তিনি বললেন, “আমি অসুস্থতি পেয়েছি।” আমি তখন তাঁকে ছেড়ে ১নং ওয়ার্ডে এলাম। তখন একটা গুলার আওয়াজ শুনলাম। ওয়ার্ডের ভাৱ আমার ওপর। কয়েকজন পরিচারক

আমার কাছে ছুটে এল এবং আমাকে একথা বলল। আগিও তাঁড়াতাড়ি বারান্দায় চলে এলাম। কিন্তু কানাই বা সত্যেন্দ্র কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি তখন ডিসপেন্সারির দিকে আর একটা আওয়াজ শুনলাম। আমি ছুটে ডিসপেন্সারিতে ঢুকলাম। ঢুকে দেখলাম কানাই লাল দন্ধ ও গোসাঁই ধস্তাধস্তি করছেন। আমি সত্যেন্দ্রকেও পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু তিনি কিছু করছেন না। আমি হিগিনসকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ডিসপেন্সারির দক্ষিণ পূর্ব কোণে। ছ এক জন হাসপাতাল পরিচারক ছিল কিন্তু কারা তা বলতে পারব না। আমি কানাই ও গোসাঁইকে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কানাই গুলী ছুড়লেন। আমি পিস্তলের মুখটা দেখলাম। কানাই পিস্তলটা আমার মাথা লক্ষ ক'রে ধরলেন। বললেন “আমায় ছেড়ে দিন নইলে গুলী করব।” আমি তখন অফিসে পালিয়ে গেলাম এবং জেলারকে খবর দিলাম। তিনি অফিসের বাইরে বসেছিলেন। ফেরবার পথে আমি গোসাঁইকে গলিতে দেখলাম। তাঁর জামাকাপড়ে রক্তের দাগ ছিল। তাঁর তিন পা পেছনে দেখলাম হিগিনসকে। সেও পূর্ব দিকে যাচ্ছিল। হিগিনস ও গোসাঁই আমায় পাশ কাটিয়ে যাবার পর আমি কানাইকে একটা লেনে দেখলাম, তিনি হিগিনস ও নরেন্দ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। আমি গোসাঁইর দিকে ছুটে গেলাম, লক্ষ্য করলাম, তিনি হাঁপাচ্ছেন। তখন আমি তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ালুম, সেখানে তাঁর পরিচর্যা করলাম কিন্তু

২২৯ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

হু'তিন মিনিটের মধ্যেই মারা গেলেন। আমি কানাইর হাতে বড় রিভলভারটা দেখেছি এবং ছোটটা সত্যেন্দ্রের হাতে।

জেরার উত্তরে বললে : ঘটনার দিনই আমি মিঃ মারের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি। সত্যেন্দ্রের হাতে রিভলভার পাওয়া সম্পর্কে আমি কিছু বলেছি বলে মনে পড়ছে না। আমি যদি তা না বলে থাকি তো তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি নে।

কানাইয়ের পক্ষে উকিল

৯ই সেপ্টেম্বর মামলার আবার শুনানী আরম্ভ হ'লে উকিলবাবু দীনেশচন্দ্র সেন এক আবেদন পেশ করে বলেন, কানাইয়ের মামলাটা লক্ষ্য করবার জ্ঞাত্য তিনি অনুরুদ্ধ হয়েছেন। আদালত রাজী হলেন। এবাবৎ কানাইয়ের পক্ষে কেউ ছিলেন না।

আলিপুর জেলের কয়েদী শ্রিয়নাথ আগরওয়াল বলল, আমি নরেন গোসাঁইকে জানতাম, বন্দী সত্যেন্দ্র ও কানাইকেও চিনি। ঘটনার দিন আমার সঙ্গে সকাল সাতটা নাগাদ নরেন্দ্রর দেখা হয়, জুট মিলের দিকে যাচ্ছেন; দেখলাম বন্দীরাও তাঁর পেছন পেছন যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে একটা পিস্তল দেখলাম, কার হাতে বলতে পারব না। আমি জুটমিলের দিকে ছুটে গেলাম এবং লুকিয়ে পড়লাম। আমি দেখলাম নরেন্দ্র গোসাঁই টলছেন। কিছু শব্দ শুনলাম কিন্তু তা বন্দুকের না আর কিছুর তা বুঝলাম না।

ভাঙ্গ ৭২—৩

জেরার উত্তরে বলে : আমার সঙ্গে যখন গোসাঁই বাবুর দেখা হয় তখন হু'জুন বন্দী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। আমি প্রথম দেখি গোসাঁইকে, তাঁর পেছনে কানাই বাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু।

জেরার প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের সব-কিছু দেখা যাচ্ছিল।

উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি বললেন, আমি আলিপুর জেলের ডেপুটি জেলার। আমি নরেন্দ্র গোসাঁইকে চিনতাম। আমি ঘটনার দিন জেলে ছিলাম। সকাল সাতটা নাগাদ যখন আমি বারান্দায় বসে জেলারের সঙ্গে কাজ করছিলাম, একটা গোলমালের শব্দ কানে এল। আমি আর দ্বিধেন্দ্র বাবু বারান্দার দিকে ছুটে গেলাম। আমি যেন গুনলাম হাসপাতালে কয়েকটা বোমা বিস্ফোরণ হল। আমরা উইন্ডিং ও স্পিনিং শেডটার মধ্য দিয়ে ছুটলাম। ওটার দক্ষিণ পাশে যে-গলিটা হাসপাতালের দিকে গেছে তার বাঁক নিভেই দেখলাম নরেন্দ্র হাসপাতালের দিক থেকে পূর্ব দিকে ছুটছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, “আমি গেলুম, আমাকে নিলে।” তিনি পশ্চিমপানে দৌড়ালেন। আমরা হাসপাতালের দিকে ছুটছিলাম; তিনি চার পা যেতেই দেখলাম কানাইলাল দত্তকে, হাতে রিভলভার; হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে রিভলভারটা উত্তত করলেন। বৈতন্য বাবু আমার পেছনে ছিলেন, তিনি আমাদের

না মারবার জন্তু অমুরোধ করলেন। কানাই তখন পশ্চিম দিকে ছুটে গেলেন; তাঁর পেছনে পেছনে সত্যেন্দ্র; তাঁর হাতেও একটা পিস্তল ছিল। তিনিও পশ্চিমদিকে গেলেন। আমরা হাসপাতালের দিকে গেলাম। আমাদের হাসপাতালে গেটে পৌঁছবার আগেই—আমরা তিন চারটা বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ শুনলাম। আমরা হতচকিত হয়ে গেলাম এবং গেটের কাছটায় থেকে গেলাম। আমরা তখন সেখান থেকে ঘুরলাম, দেখলাম ওয়ার্ডারেরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নরেন্দ্রকে দেখলাম তিনি একটা গলিতে পড়ে আছেন এবং সত্যেন্দ্র ও কানাই বন্দী। আমি তখন সুপারিন্টেন্ডেন্টকে খবর দেবার জন্তু এগেলাম।

জেরার উত্তরে বলল, হাসপাতাল ফিরে যাবার পথে কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হিগিনসকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, কেননা, আমার মনের অবস্থা তখন ছিল ভয়ঙ্কর। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি কানাইকে চিনেছি; এটা ঐ শব্দ শোনবার আগে। সত্যেন্দ্র কখনো আমার দিকে অথবা, জিজ্ঞেসের দিকে রিভলভার তোলেননি, আমাদের ভয়ও দেখান নি।

জুরীর ফোরম্যান জিজ্ঞাসা করলে বলল, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম এবং যেখান থেকে আওয়াজ শুনেছিলাম তা হাসপাতাল থেকে তিন রশির মত দূরে হবে। আমি মিনিট পাঁচেক বাঁকটায় ছিলাম। ইতিমধ্যে কেউ আসেনি।

জজের প্রশ্নের উত্তরে বলল : হিগিনস এসেছিল

কিনা অথবা সে এখান দিয়ে গেছে কি না লক্ষ্য করিনি। আমি নিশ্চয় করে বলছি, আমি তাকে দেখিনি। তাঁদের কোট বা ট্রাউজারে কোন পকেট ছিল না।

আশুবাবু : হাজতী বন্দীদের কোন ট্রাউজার থাকে না। কানাই ছিলেন হাজতী বন্দী।

মিঃ ব্যানার্জি : আমি ধর্মবতারকে অমুরোধ করি লিখে রাখতে যে, আমার মক্কেল তার পোষাকে ছিলেন।

আদালতকে—হাজতী বন্দীদের নিজের পোষাক থাকে। সত্যেন্দ্র জেলের পোষাক পরেন নি। আমি এ বিষয়ে অনিশ্চিত যে, দুজনই নিজের জামা কাপড় পরে ছিলেন।

মিঃ ব্যানার্জিকে—কবে সত্যেন্দ্র বদলি হয়ে আলিপুর জেলে এসেছিলেন আমি জানি নে। আমি তখন আলিপুর জেলে ছিলাম না।

লিগটনের বাহাদুরি

এলফ্রেড লিগটন : আমি এখন আলিপুর জেলের একজন কয়েদী। আমার ৩১ এ আগষ্ট তারিখটা মনে আছে। আমি সেদিন এক দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। শুনে ছুটে বেরোই এবং কি হয়েছে খোঁজ নি। শুনলাম, এক ভদ্রলোককে গুলী করা হয়েছে। আমি প্যাসেঞ্জ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটলাম, আমি তারপর হাসপাতালের দিকে ঘুরলাম। দেখলাম, গোসাঁই বাবুকে ডাক্তার বাবু হিগিনস ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি নতুন তৈরী

২৩১. নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

দেওয়ালটার কাছে ছিলাম। দেখলাম একটি লোক আসছে। লোকটি নামছে আর বলছে, সরে যাও তানা হ'লে মারব। লোকটি কানাইলাল দত্ত। আমি দ্বিতীয় বন্দীকেও দেখলাম। তাঁরা ছুটে গোসাঁইর দিকে গেলেন। দুজনের হাতেই রিভলভার ছিল। আমি এগিয়ে গেলাম এবং দ্বিতীয় বন্দীকে জাপটে ধরলাম। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনলাম। আমি তখন কানাইকে দেখিনি। কারণ আমার দৃষ্টি গোসাঁইর দিকে নিবদ্ধ ছিল। একই সঙ্গে আমি আর একটা গুলীর আওয়াজ শুনলাম। আমি দেখলাম সত্যেন্দ্র রিভলভারটা তুলে ধরেছেন। আমি তাঁকে ফেলে দিলাম এবং তাঁর রিভলভারটি হিনিয়ে নিলাম। গোসাঁই বাবু যে-ড্রেনটায় পড়েছিলেন তাঁকে সেদিক পানে ধাক্কা দিয়েছিলাম। জমাদার রিভলভারটা তুলে নিয়েছিলেন। এর পর দেখলাম আর একজন জেলার বাবুর দিকে একটা রিভলভার তুলে ধরেছেন। আমি তাঁকে জাপটে ধরলাম। তিনি রিভলভারটার মুখ দিয়ে আমার মাথায় মারলেন। আমি তাঁকে জাপটে রইলাম যতক্ষণ না জেলার বাবু এসে গেলেন। এর একটু পরেই কানাই আর একটা গুলী ছুঁড়লেন গোসাঁইর দেহ লক্ষ্য করে। আমি তখন রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরলাম। আমি যখন সত্যেন্দ্রকে ধরি তখন তিনি একা ছিলেন কিনা লক্ষ্য করিনি। ছোট রিভলভারটা সত্যেন্দ্রের কাছে ছিল এবং বড় রিভলভারটা ছিল কানাইয়ের কাছে। আমি তখন

কানাইকে অফিসে নিয়ে গেলাম। আর একজনকে জমাদার নিয়ে গেলেন। রিভলভার দুটো তখন সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে নিয়ে আসা হয়। বন্দীদের হাতে যে অবস্থায় ছিল রিভলভার দুটোর সেই অবস্থা ছিল। ঘটনার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক ঘণ্টা কি পৌনে এক ঘণ্টা ধরে আমার জবান-বন্দী নেন। আমি জানি, ঘটনার দিন একজন কয়েদীকে দিয়ে গোসাঁই বাবুকে ডেকে পাঠানো হয়েছিলো। সে আমাকে বলেছিলো, সত্যেন্দ্র বাবু গোসাঁই বাবুকে ডেকেছেন। তখন সকাল সাড়ে ছয়টা হবে। গোসাঁই বাবু ছিলেন না। গোসাঁই ফিরলে আমি সে কথা তাঁকে বললাম। বললাম, একটি লোক এসেছিল এবং বলেছিল যে, সত্যেন্দ্র বাবু গোসাঁই বাবুকে ডেকেছেন। আমি তাঁকে সাবধান হতে বললাম। গোসাঁই বাবু অস্বাভাবিক উপলক্ষেও সত্যেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন। রোববার তিনি গেছিলেন সত্যেন্দ্রকে স্বীকারোক্তিতে সাহায্য করতে। রিভলভারের মুখের গুলীতে আমার কপালে একটা ক্ষত হয়েছিল।

জেলার উত্তরে বলল, ৩০এ সন্ধ্যাবেলা কেউ এলে নরেন্দ্র গোসাঁইকে দেখে গেছেন বলে শুনেছিলাম। গোসাঁই রোববার সকালবেলা আমাকে বলেছিলেন তিনি সত্যেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সত্যেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণ পরই গোসাঁই ফিরে এসেছিলেন। গোসাঁই যখনই সত্যেন্দ্রকে দেখতে গেছেন তখনই আমি সতর্ক করে দিয়েছি। কারণ, আমার সর্বদাই

আশঙ্কা ছিল একটা কিছু অঘটন ঘটেতে পারে। হাসপাতালে যাবার পথে আগার সঙ্গে তাঁদের যখন দেখা হ'ল তখন ডাক্তার বাবু গোসাঁইর শরীরে একটা হাত রেখে তাড়াতাড়ি চলেছেন। হিগিন্স তাঁদের কয়েক পা পেছনে ছিল। আমি যখন শুনলাম এক ডাক্তারকে গুলী করা হয়েছে আমি ভাবলাম, বোধ হয় হিগিন্স। হিগিন্সকে গুলী করা হয়েছে শুনে আমি আতঙ্কিত হ'লাম। যখন ঐ পথে আমার সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় তখন কারও সঙ্গে আমার কথা হয় নি আমি হিগিন্সকেও কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তার হাতে আমি রক্ত লক্ষ্য করিনি, তার হাতটাই শুধু দেখেছি। হয়তো হিগিন্স কিছু বলেছিল কিন্তু হৈ হট্টগোলে আমি শুনতে পাইনি। মিঃ মারের কাছে আমি বলেছি কানাই ঢেঙ্গা, অজ্ঞান বঁটে। হাসপাতাল থেকে আসবার সময়ই প্রথম আমার সঙ্গে ডাঃ চ্যাটার্জির দেখা হয়।

প্রথম দিন আমি বলেছিলাম আমি সত্যেন্দ্রের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছি; সেই সময় তিনি গোসাঁইর দিকে একটা গুলী ছেঁড়েন। পরে বলেছিলাম, সত্যেন্দ্র গোসাঁইকে একটা গুলী মারলে গোসাঁই টলছেন। বলতে পারবো না ঐ গুলীটায়ই গোসাঁই ড্রেনে পড়ে যান কি না, কারণ, আমি যখন প্রথম গোসাঁইকে দেখি তখনই তিনি ড্রেনের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছেন ও টলছেন।

মিঃ ব্যানার্জি তখন তার আগেকার জবানবন্দীটা তাকে পড়ে শোনালেন। জিজ্ঞেস

করলেন, নরেন্দ্রের ওপর তিনটি গুলী ছোঁড়া হয়েছিল কি?

সাক্ষী : দুটি গুলী ছুঁড়েছিলেন কানাই এবং একটি সত্যেন্দ্র। আমি সত্যেন্দ্রকে পেছন থেকে ধরেছিলাম, তিনি আমার হাত ছাড়িয়ে পালাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে রীতিমত ধস্তাধস্তি হয়েছিল। আমি সত্যেন্দ্রকে আটকালে তিনি বলেছিলেন, “তোমরা দুটো ধরেছ, আরও একটি আছে।” আমি কানাইকে আত্মসমর্পণ করতে দেখিনি। আমার ওজন ১৪ পাউণ্ড (?)। আমি সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনি নি। আমি তখন গেটের বাইরে ছিলাম। সত্যেন্দ্রের পরণে জেলের ট্রাউজার ছিল। কানাইয়ের পরণে ছিল নিজের কাপড়। তাঁর একটা চাদর ও শাল ছিল (?)।

জুরী শশীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমি পথে ডাক্তারবাবু ও গোসাঁইকে দেখেছিলাম। আমার সঙ্গে তখন জেলার বাবু কোন কথা হয়নি।

আশুবাবু : জেলের পৌরাক সম্পর্কে আমি নিম্ন আদালতে কয়েকজনের সাক্ষ্য দাখিল করতে চাই।

মিঃ ব্যানার্জি : আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

জজ সে আপত্তি অগ্রাহ্য করে দিলেন।

আরও অনেকে

দেও নারায়ণ সহায় : আমি এমিস্ট্যান্ট জেলার। আমি ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গেছিলাম। আমি দেখলাম, বন্দীরা মহাবীর পাণ্ডুর হেফাজতে আছে।

২৩৩ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

জেরার উত্তরে বললেন : লিটন ষাঁকে ধরেছিল আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। লিটন ষাঁকে ধরে ছিল তাঁকে ছেড়ে দিলে দেখলাম তাঁকে আটক করা হয়েছে। আমি তাদের ১০০ পা পেছনে ছিলাম। এর পর আমি কাউকে তাঁকে ধরে রাখতে দেখিনি। যদি তাই হ'ত আমি লক্ষ্য করতাম।

আনন্দচন্দ্র দাস : ওপর থেকে নেমে আসবার পর আমি হিগিনসকে দেখেছি। আমি ৩নং ওয়ার্ড থেকে আসছিলাম। ওটা নৌচের তলায়। আমি খানিকটা দূর গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম, কানাই রিভলভার হাতে আসছেন। তাই আমি পাগিয়ে গেছিলাম। আমি সত্যোজ্ঞ, কি গোসাঁই কি বৈজ্ঞান্য বাবু, কাউকে দেখিনি।

জেরার উত্তরে বলল, আমি কানাইকে হাসপাতালের গেট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি। তিনি পূর্ব দিকে দৌড়ালেন। আমি মেন গেটের দিকে পালালাম। আনি নরেন গোসাঁইকে দেখিনি। আমি জুট মিলের দিকে পালালাম। আমি প্রথমে পূর্বে, পরে গেট পার হ'লাম।

জুদীদের মুখপাত্রের উত্তরে : আমি যখন হিগিনসকে ছাড়িয়ে এলাম, কানাই তখন আমার পেছনে। আমি গোসাঁইকে দেখতে পাইনি।

আশু বাবু : ইতিমধ্যে আমি বোমা মামলায় প্রথম দলে, কানাইয়ের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ এবং দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে হুকুমনামা (অর্ডার শীট) দাখিল করছি।

মিঃ বানার্জি : আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

পাঁচকড়ি চৌবে : আমি একজন ওয়ার্ডার। সত্যোজ্ঞের হাত থেকে একজন সাহেব-রিভলভার ছিনিয়ে নেয় এবং আমি তুলে নি। গোসাঁইবাবুকে প্রথম গুলী করেন সত্যোজ্ঞ ; দু' মিনিট পর-কানাই বাবু একটা গুলী ছোঁড়েন। আমি পিস্তলটা কুড়িয়ে নি।

জেরার উত্তরে : আমি ডাক্তারবাবুর কাছে গোলমালের কথা শুনি। গোলমাল হয়েছিল হাসপাতালের দোতলায়।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে : আমি লিটনকে চিনি। গোলমালের দিন সে হাসপাতালে ছিল। হিগিনসও হাসপাতালে ছিল। হিগিনসের হাতে ও কাঁধে গুলী মারা হয়েছিল।

মিঃ বানার্জি বাহাদুরদ্বিনের সাক্ষ্য নেবার অনুমতি চাইলেন আদালতের কাছে।

আশু বাবু বললেন, আমি তাকে চাই নে। আমি তাকে প্রস্তুত রেখেছি। অপর পক্ষ যদি সাক্ষ্য নিতে চান নিতে পারেন।

বাহাদুরদ্বিন : আমি একজন কয়েদী-ওয়ার্ডার। যখন গোলমাল হয় তখন আমি জেলের বাইরে ছিলাম। আমি কোন রিভলভার তুলে নিই নি।

জেরার উত্তরে : ম্যাজিস্ট্রেট যখন লিনটনের সাক্ষ্য নেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

সেকামান্না : আমি চীফ ওয়ার্ডার। আমি বন্দীর গায়ে এই পোষাক দেখেছিলাম। তাঁদের অকসিমে নিয়ে আসবার পর ওগুলো খুলে নেওয়া হয়।

অসাধারণ অসামান্য কানাই

এরপর জজ যেসব সাক্ষ্য মিঃ মার নথিভুক্ত করছেন তা পড়লেন। কানাইকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কিছু বলবার আছে কি না।

কানাই বললেন : আমি জবাব দেব না।

যা বলেছিলেন তা কি প্রত্যাহার করতে চান ?

হ্যাঁ, মশাই।

কি প্রত্যাহার করবেন ?

সেই জায়গাটা যেখানে আমি বলেছিলাম আমি ও সত্যেন্দ্র এই চেষ্টার জন্ত দায়ী।

বদলে কিছু বলতে চান ?

হ্যাঁ। আমি একাই এরজন্ত দায়ী। আমি ছাড়া এই চেষ্টার কথাটা কেউ জানত না।

পরবর্তিত্ত বিবৃতিটি বন্দীকে স্বাক্ষরের জন্ত দেওয়া হল।

সত্যেন্দ্রকে সম্বোধন করে জজ বললেন, আপনি মিঃ মারের কাছে আপনার বক্তব্য মূলত্ববী (রিজার্ড) রেখেছিলেন। এখন আপনাকে দুটো প্রশ্ন করব; ইচ্ছে করলে জবাব নাও দিতে পারেন। যদি না দেন জুরীরা মনে করতে পারেন আপনার প্রতিকূল হত বলেই আপনি জবাব দেন নি। প্রথম প্রশ্ন : আপনাকে যখন প্রেস্তার করা হয় তখন কি আপনার হাতে রিভলভার ছিল ?

সত্যেন : না, মশাই।

কোন সাক্ষী ডাকবেন ?

না।

এর পর বাবু আন্ততঃ বিশ্বাস তাঁর সওয়াল

আরম্ভ করলেন। জুরীদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, সতর্ক করে দেবার জন্ত তিনি একটা কথা নিবেদন করবেন। জেলের বাইরে এ যথেষ্ট চেষ্টা সৃষ্টি করেছে। সংবাদপুত্র ও অন্যান্য এ নিয়ে অনেক কথাই হয়েছে। আপনাদের কাছে আমার সামান্য অমুরোধ আপনারা মন থেকে পূর্বের ধারণাগুলো মুছে ফেলে দিন এবং আপনাদের সামনে যে সাক্ষ্যসাবুদ উপস্থিত করা হয়েছে তাতেই নিবদ্ধ থাকুন। বন্দীদের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তাই বিচার করবেন।

আপনাদের স্থির করতে হবে, বন্দী দু'জনই অথবা ওদের একজনই নব্বেনাথ গোসাঁইর হত্যার জন্ত দায়ী। প্রশ্ন উঠেছে, এমন একটা ভয়াবহ ঘটনা জেলের মধ্যে দিনের বেলা কি করে ঘটল। জেলের ভেতরে কি করে রিভলভার, কার্তুজ পাচার করা সম্ভব হ'ল।

অদ্ভুত মনে হয়, যেন উপচাস, সত্য ঘটনা নয়। কিন্তু এ থেকে নিস্তার নেই যে, ৩১ এ আগষ্ট সকালবেলা জেলের ভেতর নরেন গোসাঁইকে গুলী করে মারা হয়েছে। তাঁর দেহে দুটি রিভলভারের ক্ষত পাওয়া গেছে, মাংসে বিদ্ধাবস্থায় আর একটা। ফরিদাদী পক্ষ এখনও বের করতে পারেন নি কি ভাবে জেলের ভেতর রিভলভার পাচার করা সম্ভব হ'ল। তবে একটা কথা বলা যায় যে, জেলের নিয়ম-কানুন যথাযথ পালন করা হ'লে এই হত্যাকাণ্ড হ'ত না।

কিন্তু বন্দীরা কিভাবে এ অস্ত্র পেল তা যদি

২৩৫ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

নাও দেখানো যায় তবু তাঁরা আইনের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। হিগিনস যে তৃতীয় একটি রিভলভারের কথা বলেছিল ফরিয়াদী পক্ষ সেটি দাখিল করতে পারেনি। হিগিনস বলেছিল, তৃতীয় একটি ছোট রিভলভার ছিল এবং সেটি ছুড়ে ফেলা হলে আর একজন সম্মানবাদী বন্দী—ইস্রাঈল মন্সী তুলে নিয়েছিল। অমেক খোঁজ করা হয়েছে কিন্তু তার কোন পাণ্ডা পাণ্ডা যায়নি। কিন্তু এতে মূল ফরিয়াদীদের ইত্তর-বিশেষ হয় নি।

বন্দী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অসুস্থতার কথা উল্লেখ ক'রে ক্রীবিশ্বাস বলেন, তিনি খুব একটা অসুস্থ ছিলেন না। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ঘটনার কয়েকদিন আগে তিনি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেছেন এবং তাঁর অসুখ এমন ছিল না যে তিনি এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে পারেন না। সত্যেন্দ্র গোসাঁইর সঙ্গে বন্ধুর আচরণ করেছেন বলেই তাঁর মনে একপ্রকারের প্রতি কোন বিরূপ অভিসন্ধি ছিলনা এমন কথা বলা যায় না।

তিনি ফরিয়াদী সাক্ষীদের যে গড়মিল তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। গুলীচালনার ফলে জেলে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল; কারও কারও ধারণা হয়েছিল সম্মানবাদীরা বোমা ছুঁড়তে লেগেছে। সেই উত্তেজনায় ফলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গড়মিল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। লোকের গোসাঁইকে বাঁচাবে কি, সবাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত। তখন কি ঘটছে লক্ষ্য করবার জন্য কেউ থাকছে না। এমন অবস্থায় সাক্ষ্যের কিছু গড়মিল হয়ই।

এরপর মিঃ এসি ব্যানার্জি উঠলেন এবং জুরীদের সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য বললেন। তার পর বললেন, ধর্মাবতার, ফরিয়াদী পক্ষ তর্ক তুলেছেন যে, কানাই সত্যেন্দ্রকে সরাসরি চেয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন: সত্যেন্দ্র কি জানতেন যে, গোসাঁই দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে চলেছে? কানাই ছিলেন প্রথম দলের বন্দী। মিঃ উইদাল যখন জেলে ২৬ ও ২৭এ আগষ্ট গোসাঁইর সঙ্গে দেখা করার আবেদন করেন তখন সত্যেন্দ্র অসুস্থ ছিলেন। ফরিয়াদী পক্ষ এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নি যে, সত্যেন্দ্র ও কানাই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সত্যেন্দ্র বদলী হয়ে ১৭ই তারিখে জেলে আসেন। সেদিনই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ২৪এ আগষ্ট অবধি ছিলেন। আবার তাঁকে ৩০এ আগষ্ট ভর্তি করা হয়। হ'তে পারে, কানাই গোসাঁইকে অপসারণের উদ্দেশ্যে হাসপাতালে এসেছিলেন কিন্তু কি প্রমাণ আছে যে কানাই ও সত্যেন্দ্র পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গোসাঁইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্র যদি চাইতেন তো অনেক দিন আগেই তা করতে পারতেন। কেননা এ ঘটনার আগে গোসাঁই বার কয়েক সত্যেন্দ্র সঙ্গে এসে দেখা করেছেন। কিছু ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় হিগিনস গোসাঁইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আমি ধর্মবতারের বিচার-বুদ্ধির ওপরেই ছেড়ে দেব সত্যেন্দ্র কোন কুমতলবে চলছিল কি না। হিগিনসের কথা নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা সে

বিভ্রান্ত চিত্ত হয়েছিল : অবশ্য এমন মানসিক অবস্থা প্রায় সকলেরই হয়েছিল। এবং যদি তৃতীয় একটি রিভলভারের অস্তিত্ব থেকে থাকত পুলিশ তা খুঁজে বের করতে পারত। সত্যেন্দ্র যদি সত্য কিছু করতে চাইতেন অনায়াসে তা করতে পারতেন যখন কানাই ও হিগিনস ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন ও গোসাঁই ধরতর করে কাঁপছেন।

হিগিনস ও গোসাঁই হাসপাতালে ঢুকেই দেখে কানাইকে। সত্যেন্দ্র এসে একটা খাটে বসলেন, তখন নরেন্দ্র হিগিনসের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা যখন কথা বলছেন তখন হঠাৎ গুলীর আওয়াজ শোনা যায়। নরেন্দ্র ছুটে যায় এবং বন্দী সমস্ত তাকে অনুসরণ করেন। ডাঃ বৈজনাথ বাবু ও অজ্ঞাত লোকের মত সত্যেন্দ্র ছুটে বেরোন। তাঁর যদি কোন মতলব থাকতই কানাইকে গিয়ে ধরতে পারতেন। লিফটের সাক্ষাটী বিবেচনা করে দেখবেন ; সে বলেছে, সে সত্যেন্দ্রকে যখন পেছন থেকে ধরেছে, তখন সত্যেন্দ্র একটা গুলী ছুঁড়েছেন। এমন হ'তে পারে কানাই পিস্তলটা ফেলে দিয়েছেন সেটিই জেল কর্তৃপক্ষকে দেবেন বলে তিনি ভুলে নিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্র কখনো গুলী চালাননি। কানাই-ই সবাইকে ভয় দেখিয়েছেন। যখন কানাই গোসাঁই কোথায় জিগগেস করছেন তখন সত্যেন্দ্র কানাইর কথায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে যান এবং তিনি যদি এতে লিপ্তই থাকতেন তবে কানাইকে ঐ ভাবে কালক্ষেপ না করতেই পরামর্শ দিতেন।

এমন হ'তে পারে তিনি নরেন্দ্র গোসাঁইকে দেখে শ্লথগতি হয়ে যান। ডাঃ ডালি সত্যেন্দ্রের দেহে আঘাতচিহ্ন পান নি এবং এই অন্তিমত প্রকাশ করেছেন যে কোনরকম ধ্বস্তাধ্বস্তি করে থাকলে তাঁর দেহে তার চিহ্ন থাকত।

কৌতুহলি তারপর নিবেদন করেন যে, এই মামলায় যে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে তা যে কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জুরীই বিবেচনা করবেন। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, এই রাজনৈতিক উত্তেজনার দিনে ধর্মাবতার এই জীবন যুদ্ধের কথাটা স্মরণে রাখবেন।

জজ ও জুরীদের রায়

এরপর জজ দীর্ঘকাল ধরে বন্দীদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব সাক্ষ্য আছে তা জুরীদের ব্যাখ্যা করে বোঝান এবং তাঁদের নিরপেক্ষ রায় দেবার জন্ত অনুরোধ জানান।

জুরীরা পরামর্শের জন্ত স্থানান্তরে যান। আধ-ঘণ্টা পর তাঁরা ফিরে আসেন। তাঁরা সর্বসম্মতি-ক্রমে সকল অভিযোগে কানাইকে দোষী সাব্যস্ত করেন ; সত্যেন্দ্রকে নির্দোষ বললেন তিনজন, দোষী বললেন দু'জন।

জজ কানাইলাল দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার কিছু বলার আছে ?

কানাইলাল বললেন : না।

জজ আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কানাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা কি তবে নিষ্পত্তি করে দেব ? সত্যেন্দ্রের বিষয় তো হাইকোর্টে পাঠাতে হবে।

২৩৭ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজবন্দী হ'লেন

জজ : কানাইলাল দত্ত, আমি আদেশ দিচ্ছি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে কানী দেওয়া হবে। আর সত্যোজ্জ্বের বিষয়টি আমি হাইকোর্টের বিবেচনার্থ পাঠাচ্ছি।

অশুভাবু : ধর্মাবতার, হাইকোর্ট সমর্থন না করা পর্যন্ত, আপনি দণ্ড ঘোষণা না করতে পারেন।

জজ (কানাইকে) : আপনি ইচ্ছে করলে আপীল করতে পারেন।

এরপর কয়েকটি টুকরো-টাকরা সংবাদ :

পরের বুধবার কানাই লালের কানী দিন স্থির হয়েছে। কিন্তু হাইকোর্টের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তারিখটা পাকা করা যায়নি। এম্পায়ার “ধবর” দিলেন, জেলের সেলে বসে বেষ্পতিবার কানাইয়ের-ভাই কানাইয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করেন।

যে রিভলভার দিয়ে নরেনকে হত্যা করা হয়, সেটি ওয়েবলি রিভলভার ; ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিক্রী হয়েছিল। গুজব ছিল যে, পুলিশ মালিকের কাছ থেকে ওটা নিয়ে নষ্ট করেছে।

সিভিল হসপিটাল এমিস্ট্যান্টকে (সন্দেহবশে) সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হয়েছে এবং তাঁকে কোয়ার্টার ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আর কিছু বাঙালী কর্মচারীকে সব ব্যাপারে সন্দেহ করতে লাগলেন। কি করে জেলে হুঁহুটো রিভলভার এল, গুলী এল, গুলী চলবার মত যোগাযোগ হ'ল কিনারা না করতে পেরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ক্ষেপে গেলেন। ঐক মজফরপুরে বোমা

বিস্ফোরণের পর প্রফুল্ল-কুদিরাম বাঙালী বলে বাঙালী সাধারণের যে দুর্গতি হয়েছিল এম্ব্রোও তাই হ'ল। ইউরোপীয়েরা চালু করে দিল, এজ্ঞা ভারতীয় কর্মী, কর্মচারীরাই দায়ী। ইউরোপীয়ান দুই কয়েদী সাক্ষী—লিটন ও হিগিন্সকে পুরস্কার স্বরূপ বন্দীদশা থেকে একেবারে ছেড়েই দেওয়া হ'ল।

ভেকেসান বেঞ্চের সামনে

হাইকোর্টের ভেকেসান বেঞ্চে বিচারপতি সরকুদ্দিন ও বিচারপতি কোজ্জের সামনে ১৫ই সেপ্টেম্বর আলিপুর জেলে হত্যার মামলাটা উঠল।

মিঃ গার্ডলি নর্টন সরকার পক্ষে এই নিবেদন করলেন যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জেলে আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ রো যে সমর্থন চেয়ে পাঠিয়েছেন তাড়াতাড়ি তার একটা নিষ্পত্তি হ'লে ভাল হয়। এই মামলায় বন্দীকে বোমা মাথলার প্রভাব নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইর হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ জুরী তাঁকে নির্দোষ বলেছেন। কিন্তু দায়রা জজ অধিকাংশ জুরীর সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। এই জজ হাইকোর্টে পাঠিয়েছেন তাঁদের অভিযত জানতে। সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল দত্তের আপীলও আসতে পারে। জুরীরা সর্বসম্মতি-ক্রমে দোষী সাংস্কৃত করায় তাঁর মুহূদণ্ড হয়েছে। জানতে পারলাম ধর্মাবতারেরা হুটোরই শুনানীষ তারিখ ধার্য করেছেন ২৮এ। সম্রাটের পক্ষে আমার আবেদন, ছজুরেরা মামলা হুটির শুনানী কিছু

২৬৮ জয়ন্তী, তারিখ ১৩৮২

স্বরাধিত করুন। সম্রাট পক্ষের এই স্বরার পেছনে প্রবল যুক্তি আছে।

বিচারপতি সরফুদ্দিন : পূজাবকাশের জন্য আমাদের ২৫এ থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

নর্টন : ধর্মবতারেরা যদি ২২এ মে এই মামলা ছুটো নিতেন তো ভালো হ'ত।

বিঃ সরফুদ্দিন : সেটা কি বার হচ্ছে ?

মিঃ নর্টন : পরের মঙ্গলবার।

মিঃ পি মিত্র : আমি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পক্ষে দাঁড়াচ্ছি। ২২এ তারিখ এই মামলা নেওয়া হলে আমার আপত্তি আছে। পূজাবকাশের পর মামলাটা নেবার অনুমতি দিন।

মিঃ নর্টন : অনেক কারণে তা অনুবিধে জনক হবে। সাধারণ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বোমা মামলার যে দ্বিতীয় দলটি দায়রা সোপর্দ হয়েছে সত্যেন্দ্র নাথ বসু তাঁদের একজন।

মিঃ সরফুদ্দিন : কত সময় লাগবে সে শুুনানীতে ?

মিঃ নর্টন : একদিনের বেশী নয়।

বিচারপতি কোজ্জ : আলিপুর দায়রায় কবে সাক্ষ্য নেওয়া শুরু হবে ?

মিঃ নর্টন : হাইকোর্ট খোলবার পরেই ১৯এ অক্টোবর। আমরা এই মামলার ফলাফল জেনে স্থির করতে চাই আদৌ ঐ মামলায় অগ্রসর হওয়া দরকার আছে কি না। এই মামলার পরিণতির ওপরেই মামলার কার্যক্রম নির্ভর করছে। স্বভাবতঃই আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হাইকোর্টের শুুনানী না হওয়া

পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ষড়যন্ত্র মামলায় সোপর্দ করবেন না।

মিঃ মিত্র : আমাকে ২০এ শহর ছেড়ে যেতে হচ্ছে। ধর্মবতারেরা আগামী শুক্রবার যদি মামলাটা নেন আমার আপত্তি নেই।

মিঃ নর্টন : যত আপে হয় ততই ভাল।

বিঃ সরফুদ্দিন : আমি ইতিমধ্যেই অনেক ক'টি দেওয়ানী মামলার দিন শুক্রবার ধার্য করেছি। সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নোটিশ দেব-বেস্পতিবার ঐসব বিষয় নেওয়া হবে ব'লে।

মিঃ মিত্র : যে উকিল আমাকে মামলার প্রস্তুতিতে সাহায্য করেন, তিনি বলেছেন যে, (পেপার বুক) নথি-কেতাব তৈরী হয়নি, তাঁর আশঙ্কা ঐ সময়ের মধ্যে তা তৈরী হবে না।

বিঃ সরফুদ্দিন : মিঃ নর্টন নথি কেতাব যদি তৈরী না হ'য়ে থাকে তবে আমরা মামলা কি ক'রে নেব ?

মিঃ নর্টন : আমি জানতাম, বসুবার মামলার নথি-কেতাব পেয়েছেন।

মিঃ মিত্র না :।

মিঃ নর্টন : সেক্ষেত্রে আমি ধর্মবতারদের বলব তাঁরা ২২ তারিখে হাইকোর্টের অভিমত সংক্রান্ত বিষয়টি নিন।

বিঃ সরফুদ্দিন : নথিকেতাব ছাড়া মামলার শুুনানী ভারী অনুবিধেজনক হবে।

মিঃ নর্টন : ধর্মবতার তাহলে নথিকেতাব ?

২৩৯ নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

মুদ্রণের কাজ বরাহিত করতে নির্দেশ দিন। বিষয়টা খুবই সংক্ষিপ্ত।

বিঃ সরফুদ্দিন : নথি কেতাব তৈরী হলে আমরা দিন ধার্য করব। আপাততঃ নথি কেতাব মুদ্রণ সাপেক্ষে শুক্রবারই দিন স্থির থাকল ; অপর পক্ষ মামলা বুকে নেবার সুযোগ পাবেন।

মিঃ নর্টন : ধর্গাবতারেরা যা ভাল মনে করেন।

ফিরিঙ্গী কাগজে গবেষণা

জেলে রিভলভার পাচার নিয়ে ফিরিঙ্গীদের কাগজে যে বিস্তারিত গবেষণা বেরোয় অমৃত বাজার পত্রিকা ১৬ই সেপ্টেম্বর তার ওপর এক মন্তব্য বলেন :

কোনরকম অনুসন্ধান না করেই তাঁদের কোন কোন কাগজ সোজা এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে, আগ্নেয়াস্ত্রের পাচার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মারফৎই হয়েছে। অপরাধ অনুষ্ঠানের আগের দিন অনেক মহিলা এসেছিলেন বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে। ভারতীয় ষ্ট্রাফ নাকি এ ব্যাপারে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেনি। এমন আভাসও দেওয়া হয়েছে যে, গরুর গাড়ী ও ঐ জাতীয় অনেক জিনিস দিবারাত্র সর্বক্ষণ জেলে আনাগোনা করে। এই ভাবে আততায়ীদের হাতে রিভলভার এসে থাকতে পারে। সরকারী ভাষ্যরূপে সাধারণকে একথাও বলা হয়েছে যে, এপ্রভার হত্যার ক্ষয় কতৃপক্ষ দায়ী নন ; কেননা, সে কতৃপক্ষের বিনামূল্যে ও অজ্ঞাতসারে হাসপাতালে গেছিল। দেখা যাচ্ছে,

এসবই হচ্ছে এক ধরনের গবেষণা, সারবস্ত্র কিছু নেই। জেলের কর্মচারীরা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ-অনুসারেই হাজতী বন্দীদের সম্বন্ধে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। কারাবিধিতে এমন কথা নেই যে, প্রত্যেক সাক্ষাৎ প্রার্থীকেই তল্লাসী করতে হবে। সন্দেহের যুক্তি সম্ভব কারণ থাকলেই কেবল জেল কতৃপক্ষ তল্লাসী করে থাকেন। কিন্তু তা করতে হবে গোপনে। সুতরাং জেল কতৃপক্ষ তাল্লাসীর কাজ বিধিমতই করেছেন। একথাও সত্য নয় যে, অপরাধ অনুষ্ঠানের আগের দিন ৭০ অথবা তারও বেশী সাক্ষাৎ প্রার্থী আলিপুর জেলে এসেছিল। এটি সুবিদিত যে, সাক্ষাৎ একটা বিশেষ সময়ে ওয়ার্ডারের দৃষ্টি গোচরে অফিসারদের আনাগোনার মধ্যে হ'য়ে থাকে। জেলখানার নজায় দেখা যায়, এটি প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর অপরাধীদের ক্ষয় তৈরী ; আজ যেমন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগে রাখা হয়েছে তাদের ক্ষয় নয়। সুতরাং কতৃপক্ষের কর্তব্য ছিল এঁদের সম্পর্কে বিশেষ যত্ন ও ব্যবস্থা নেওয়া। না, এখন যেসকল ব্যবস্থা আছে সেসকল নয়—এখন তো তাঁদের নিঃসঙ্গ সেলে থাকতে জেলের ঐ মোটা অপরিষ্কার খাচ্ছিল খেতে বাধ্য করা হয়। সে বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলছেন। কারাবিধিতে এরকম নির্দেশও নেই। সেইরকম বিশেষ ব্যবস্থার কথাই বলছি যা তাঁদের নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটাও স্পষ্ট যে, যদিও একজন সিভিল হাসপিটাল এসিস্ট্যান্টকে সাময়িক ভাবে

বরখাস্ত করা হয়েছে তথাপি ঐ ইনফরমারকে রক্ষার জন্ত যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। এই সতর্কতার অভাবেই তার মৃত্যু ঘটেছে, সে মৃত্যুর দায় দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের ওপরেই বর্তাচ্ছে। অধস্তন কর্মচারীরা একেবারেই নিরুপায়; তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে আইন মেনে চলেছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর আবার ফরিয়াদী পক্ষ হাইকোর্ট তাঁদের ভাড়া প্রকাশ করলেন; সত্যোনের মামলাটার একটা ছিলে না হ'লে নাকি ভারী অসুবিধে।

বন্দীদের পক্ষে বাবু নরেন্দ্র কুমার বসু অবশ্য বললেন, তিনি আগের রাতে নথিতে পেয়েছেন। কিন্তু যে ভদ্রলোক আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেছেন, তিনি চান একজন কৌতিলি নিয়োগ করতে। সেটা আমি এখনও ক'রে উঠতে পারিনি।

নথি কেতাব দেবার কথাটা অবশ্য মিঃ নর্টনই পেড়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি প্রস্তুত।

বিচারপতি সবফুদ্দন বললেন : আমার আশঙ্কা, মিঃ নর্টন, পূজাবকাশের পর অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ধর্মাবতাররা কি তার আগে এর নিষ্পত্তি করতে পারেন না? বললেন নর্টন। বিষয়টা খুব বড়-কিছু নয়। আমি কাল রাতে নথি-কেতাব পেয়েছি এবং আমি প্রস্তুত।

বিঃ সরফুদ্দিন : পূজাবকাশের আগে বুধবারই শেষদিন। মিঃ নর্টন : পূজাবকাশের পরে যদি এর শুনানী হয় তবে বড়ই অসুবিধে হবে। আলিপুর দায়রায় ১৯এ থেকে বড়ঘর মানলা আরম্ভ হচ্ছে।

বিঃ কোজ্জ : হয়তো ১০।১১ তারিখ নেওয়া যায়।

বিঃ সরফুদ্দিন : পূজাবকাশের পর।

মিঃ নর্টন, এর আগে যদি নিভাস্তাই না তারিখ পাওয়া যায় তো আমাদের তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বিঃ কোজ্জ : পূজাবকাশের আগে দুদিন 'মোশন' শোনাই রীতি।

বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু : আদালতের নিয়মানুসারে যে তারিখ বন্দীদের জানানো হয়েছে তা ২৮এ সেপ্টেম্বর। সেই তারিখ অনুসারেই বন্দী প্রস্তুত হচ্ছেন।

মিঃ নর্টন : ধর্মাবতারেরা কি তরে পূজাবকাশেরই পরই দিন ধার্য করতে চান?

বিঃ সরফুদ্দিন : আমরা ১৫ই অক্টোবর মামলাটা নেব।

মিঃ নর্টন। বেশ।

শ্বেত পদ্ম

দেশনেত্রী লীলা রায়কে নিবেদিত

নৃত্যকেতা স্তরদ্বাজ

জন্মদিন মৃত্যুদিন আজ সব এক হয়ে গেছে
সুখ দুঃখ আশা উচ্ছাস সমস্ত কর্মের বলয় বন্ধন
প্রত্যহ প্রকৌর্ণ আয়ু সব অবসান
প্রত্যাহের জীবনের সমস্ত বিপরীত তরঙ্গ ছড়িয়ে
এখন অপাপবিদ্ধ শান্ত স্নিগ্ধ,

অথ এক স্বচ্ছ সরোবরে

পরিস্ফুট শ্বেত পদ্ম—নীল নয়্র আকাশের নীচে,
অনিরল সূর্যোদয়ে যে আকাশ সম্পন্ন ভাস্বর
ভিনি সে আকাশ-অভিমুখী।

তীর হৃদয়ের আলো তবু সে কি বিচ্ছুরিত

জীবনের দিকে

এই দুঃখী বাংলাব, বাংলার মানুষের কথা

এখনো কি মনে আছে তাঁর ?

অথবা কি নতুন জন্মের আয়োজনে

আবার চলেছে তাঁর আগ্নেয় প্রস্তুতি—

নবজাতকের জন্ম, বসবাসযোগ্য করে দিতে !

পরিচিত বাংলার ঘরে—

আবার কি কোথাও শুরু হয়ে গেছে পবিত্র এ পথ-পরিভ্রম।

দানবের বিকল স্থির সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে

আবার নতুন করে নিচে কোনো অগম্য

সৈনিকের দুর্জয় ভূমিকা

তিনি কি আসবেন ?

কে জানে ? জানি না আমরা কিছু তার,

শুধু জানি আজ তিনি শ্বেতপদ্ম

জন্ম-মৃত্যু পরিশ্রুত আকাশের অগ্নি এক স্বচ্ছ সরোবরে

শুদ্ধ সেই শ্বেতপদ্ম, স্বর্ণ রশ্মি-নীলাকাশ

আজন্ম তাঁহার সেই বহুজনহিতায় চ অগতিতায় ভূমিকা

সমস্ত বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযাত্রীর হৃদয়—

পৃথক্রমা !—এখন আশ্চর্য এক শ্বেত পদ্ম হয়ে

আমাদের সকলের বুকের ভিতরে

স্তব্ধ ফুটে আছে : পূণ্য রূপায়ত আহা সে উজ্জ্বল

স্মৃতির সমীপে : আমরা সবাই আজ নতজান্ন

শ্রদ্ধায় ব্যাধায় প্রেমে বিস্মিত আনত :

আপাততঃ পূণ্য কীর্তি তাঁর সব জীবন রচনা

আমাদের সবার বুকে—অবিকল যেন

শ্বেত পদ্ম হয়ে আছে ।

না বলা

মধুসূদন দাসগুপ্ত

সব কথা বলেছিস তুই
গোপন শুড়ঙ্গে ডাক দিলি
আমি প্রস্তুতাত্বিকের মত
তোর সঙ্গে হাঁটি নিরিবিলি ।
তুই চোখ ঝলে ওঠে তোর
ডেভিস ল্যাম্পের মত ঠিক
তোর কাঁধে প্রচণ্ড শাবল
অস্ত্র হাতে সোনালী কনিক ।
তোর ঘুম ভেঙেছে একদা
অশুদ্ধ পৌঁচার ডাকে রাতে
মা তখন জ্যোৎস্না ছড়ালো
পল্ল করে মেয়েটির সাথে ।

যুদ্ধ মৃত্যু অত্যাচার থেকে
জন্ম নিল নতুন জীবন
ফাস্কনে আমার বনে তোর
মৌমাটির গুঞ্জন এখন ।
কার বাঁশি বাজে আজ দূরে
অপেক্ষা যে মর্মরিত হয়
ভ্রমর কাজল তুই চোখে
আজো তবু নতুন বিশ্বয় ।
সব কথা বলে তো ফুরোলি
তবু জানি বলি না কিছুই
গোপন বেদনা আরো থাকে
আরো সুখ—কণ্ঠলগ্ন যুঁই ।

জয়ন্তী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র

২য় খণ্ড ১১.০০

পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১৩.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ তুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী-সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বস্তু

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাথের করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করিতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূমেন্দ্র চৌধুরী

পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের খিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অস্বতম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান: জয়ন্তী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

বর্তমান প্রসঙ্গ

সংবিধানের ৩৯ তম সংশোধন

৪০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলরূপে উপস্থাপিত হলেও, সেটির সংখ্যা পরিবর্তন করে ৩৯ তম সংবিধান সংশোধন বিলরূপে লোকসভায় ৩৩৬-০ ভোটে ৭ই আগষ্ট গৃহীত হয়েছে। অপর একটি সংবিধান সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার জন্ত অগৃহীত থাকায় এই বিলটির সংখ্যা পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এই বিলটিতে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারের নির্বাচন সম্পর্কে কোন বিরোধ মীমাংসার অধিকার আদালতের এজিয়ার বহির্ভূত করে সংসদ কর্তৃক গঠিত একটি 'নূতন কর্তৃপক্ষের' ('a new forum') উপর হস্ত করা হবে এবং এ নিয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।.....

এই বিল অমুযায়ী সংবিধান নবম তপশিলের সংশোধন করে ৪০টি আইন অন্তর্ভুক্ত করা হল— তার মধ্যে রয়েছে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক আইন, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংশোধনী আইন (১৯৭৪), নির্বাচনী আইনসমূহ সংশোধনী আইন (১৯৭৫), মিসা প্রভৃতি।

নির্বাচনী আইন সমূহ সংশোধনী আইন, ১৯৭৫

৭ই আগষ্ট ১৯৭৫-এ পাশ হয়েছে এবং এই আইন

ভাঙ্গ '৮২-৫

অমুযায়ী (১) প্রার্থীর সংজ্ঞার (২) নির্বাচনে অসচ্ছায় অংশগ্রহণের জন্ত দণ্ডবিধানের এবং (৩) সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীতে ইচ্ছা দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে যার প্রয়োগ হবে পেছনের বছরগুলি থেকে। নবম তপশিলে অন্তর্ভুক্তির ফলে এই আইনগুলিতে সংবিধানের ৩১ (বি) ধারা প্রভাবাধীন হলেও মৌলিক অধিকার হরণের কারণ দেখিয়ে আইনগুলিকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে না।

৪১ তম সংবিধান সংশোধন

সংবিধানের ৩৬১ ধারায় রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার আওতায় পড়েন না। এই ধারাটি সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীও যাতে সেই ধারায় না পড়েন তার বিধান দেওয়া হয়েছে। এই সংবিধান সংশোধন বিলটি ৯ই আগষ্ট রাজ্য-সভায় গৃহীত হয়। নূতন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপাল তাদের পদ থেকে সরে গেলেও ক্ষমতাসীন থাকার সময়কার কাজের জন্ত তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনা যাবে না। তাদের পদত্যাগের পর তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা আনা যাবে।

মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা

১৯৭৬-এর জামুয়ারী থেকে দশক্রাসের সীমানা পেরোবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষায় বসবেন তাকে মাধ্যমিক পরীক্ষা বলা হবে, স্কুল ফাইনাল নয়। এই মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠক্রমের কোনো চূড়ান্ত মূল্যায়ন এখনই সম্ভব না হলেও, এই পাঠক্রম যে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে গুরুভার হয়ে পড়ছে, সে সম্পর্কে আলোচনা বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই পরীক্ষার প্রস্তুতের গড়ন কি হবে, সেই পড়নের সঙ্গে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং পরীক্ষার্থীদের কতক্রমে পরিচিত করানো যায়, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা ব্যস্ত-এস্ত হয়ে উঠলেও, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নাই। অথচ ১৯৭৬-এর জামুয়ারী আর কয়েকমাস বাকী। তাই সর্বত্রই একটা অনিশ্চিতি ও উদ্বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ওপর ওয়ার্ক এডুকেশন নামক বিষয়টির অভিনবত্ব এবং তার তত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠক্রম পরিচালক এবং স্কুল-কর্তৃপক্ষদের ধোঁয়াটে ধারণায় বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে মনে করবার কারণ আছে। কোথাওবা সেই কারণে এই বিষয়টির অমূল্য দায়সাদা গোছের করবার প্রবণতা রয়েছে। এটা অবশ্য অনুমান করা যায় কোন নূতন বিষয় শুরু করবার পথে এরকম বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। তবে এই ধরনের বিষয় শুরু করবার আগে তার তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে চুলচেরা আলোচনা করে সংশ্লিষ্টদের বিষয়টির গভীরে

প্রবেশের অবকাশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল সে-কাজটি হয় নাই।

এগার-বার ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিক নিয়েও এখনও কোনও স্পষ্ট কাঠামো দানা বেঁধে উঠতে দেখা যাচ্ছে না। এই শিক্ষার জন্য একটি পৃথক সংস্থা গঠিত হয়েছে সভ্য কিন্তু এই শিক্ষার ভার বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হবে না নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে সে-সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে আরও অনেক বিলম্ব হবে মনে হচ্ছে। অথচ ১৯৭৬ এর জুলাই থেকে এই পাঠক্রম শুরু হবার কথা।

এ-ছাড়া এই ব্যবস্থার পাঠক্রমে শুধু মাত্র ইংরাজীই নয়, বাংলাকেও একটি ঐচ্ছিক পাঠ্য-বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে, যা আবশ্যিক করবার অনিবার্যতা রয়েছে। ফলে পাঠক্রমে অবশ্য পাঠ্য দুটি ভাষার মধ্যে ইংরাজী বা বাংলা না নিয়েও অন্য যে কোনো দুটি ভাষা নিয়ে পরীক্ষায় বসতে পারবে। এই ব্যবস্থার সংশোধন করে বাংলাকে আবশ্যিক করতে হবে। প্রথম ভাষা গোষ্ঠীর ১৪টি এবং দ্বিতীয় ভাষা গোষ্ঠীর ১২টি ভাষার মধ্যে পরীক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষাকেও—বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের জন্য—আবশ্যিক করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে বাংলাকে আবশ্যিক করার কোনো বিবোধ তো নাই-ই, বরং বাংলা আবশ্যিক না হলে এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমান নিহত

‘বাংলাদেশ’-এর স্রষ্টা ও নির্ভীক নায়ক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান ১৪ই আগষ্ট শেষরাত্রে সাময়িক অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেও এই অভ্যুত্থানের কবলে নিহত হয়েছেন। এই শোকাবহ ঘটনার অল্প সময়ের মধ্যেই শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দীর্ঘ সংগ্রামের সহকর্মী, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ীমন্ত্রী এবং শেখ মুজিবর রহমানের সকল মন্ত্রীপরিষদের সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমানের মন্ত্রীসভার দশজনকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ছয়জন উপমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও শেখ মুজিবরের মন্ত্রীসভার অস্থায়ী মহামন্ত্রীরূপে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেছেন।

রাষ্ট্রবিপ্লব একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও শেখ মুজিবর রহমানের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাকে অতি অল্পকালের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সুতরাং তাঁর শোকাবহ মৃত্যু বিভিন্ন দেশের মানুষকে বিষাদময় করে তুলবে।

বিজ্ঞা ণগরের ১৫৫ তম জন্মবার্ষিকী

আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর

বিজ্ঞানাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য। আশাকরি এই সাধু উদ্যোগের প্রস্তাবকরা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিজ্ঞানাগরের নামাঙ্কিত একটি গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে দেখতে চাইবেন না। জাতীয় জীবনের বর্তমান সামাজিক জীর্ণতাকে অতিক্রম করে সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ভিত্তিতে উদার মানবতাবোধের বলিষ্ঠ রূপায়ণ, বিজ্ঞানাগরের জীবন জিজ্ঞাসাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

পার্লোকে নানু ঘোষ

হাওড়া জেলার সুভাষবাদী নেতা নানু ঘোষ ৬৬ বৎসর বয়সে ১১ই আগষ্ট ১৯৭৫ লোকান্তরিত হয়েছেন।

নানু ঘোষ বিপ্লবী নেতা ও সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী ঘনিষ্ঠ সহযোগী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের অন্তরঙ্গ সহকর্মীরূপে হাওড়া জেলার কৃষক, শ্রমিক ও যুবকদের নেতাজীর আদর্শে একজন বলিষ্ঠ সংগঠকের ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে পরিচিত হন। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃস্থানীয়দের অস্থায়ী হয়েও সুভাষবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পশ্চিম বাংলা বিধানসভা ও বিধান পরিষদেও কয়েকবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। লোকান্তরিত স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাতর্পণ করছি।

৩৫ রাষ্ট্রবিশিষ্ট হেলসিঙ্কি সম্মেলন

গত ৩০শে জুলাই থেকে ১লা আগষ্ট হেলসিঙ্কিতে যুক্তরাষ্ট্র ক্যানডা সমেত ৩৫ রাষ্ট্র বিশিষ্ট

ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলন অমুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ১৬০ বছর পূর্বে ১৮১৪-১৫ সালে নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর ভিয়েনায় যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সম্মেলন অমুষ্ঠিত হয়েছিল এই সম্মেলনটিকে সেই গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। দশ দফা নীতির ভিত্তিতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রস্তুত চুক্তিতে ৩৫-রাষ্ট্র রাষ্ট্রনায়করা এবং অস্থায়ী প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর দান করলেও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড পূর্বেই ঘোষণা করেছেন যে এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব বা চুক্তির কোনো আইনগত কার্যকারিতা আমেরিকা স্বীকার করবে না। অপরপক্ষে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক ব্রেজনেভ এই সম্মেলনের জন্য গত কয়েক বছর অক্লান্ত চেষ্টা করে এসেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩-এর ৩রা জুলাই হেলসিন্কে সম্মেলনের উদ্বোধনে সফল হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেনাবাহিনীর সাহায্যে সোভিয়েত রুশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমান্ত যে ভাবে পুনর্বিস্তার করে নিয়েছে, সেই পুনর্বিস্তার রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত পাকাপাকিভাবে এই সম্মেলনে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ব্রেজনেভ-এর দিক থেকে অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। ব্রেজনেভ সেদিক থেকে সফল হয়েছেন বলা যেতে পারে। এই সম্মেলনের পূর্বে ও পরে বিতর্ক উঠেছে সম্মেলনে জিতলো কে—ব্রেজনেভ না ফোর্ড? যুক্তরাষ্ট্রের অনেকের মতে স্বাধীন মতামতের, প্রচার পত্রের

অবাধ বিনিময় পূর্ব ও পশ্চিমে, সম্মেলনের অগ্রতম সূত্র হলেও সোভিয়েত রুশ ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি তা পালন করবেনা। কিন্তু পতু'গালে গত বছর ২৪শে এপ্রিলের সামরিক বিপ্লবের সম-সাময়িক পরিস্থিতিতে সেখানকার সামরিক বিপ্লবী পরিষদের 'নেতৃত্বে কমুনিষ্টপন্থী সরকার' গঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পতু'গালে কমুনিষ্ট বিরোধী সশস্ত্র অভিযানে হেলসিন্কে সম্মেলনের প্রথম পরীক্ষা চলছে। বিপ্লবী পরিষদের কমুনিষ্ট পন্থী সরকার গঠনের উত্তোগের পেছনে সোভিয়েত রুশের প্ররোচনা ও সামরিক সহায়তার সরাসরি অভিযোপ ইউরোপের আটটি সমাজবাদী সরকার এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ফোর্ড উত্থাপন করেছেন। সুতরাং পতু'গালে যদি সেখানকার জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক বিপ্লবী পরিষদ সোভিয়েত রুশের সমর্থনে কমুনিষ্ট সরকার গঠন করে—হেলসিন্কে সম্মেলনের ভাবাবেগের বাষ্প সেই সংঘাতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভুল সংশোধন

প্রাণ সংখ্যা জয়ন্তী ১৭৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের পঞ্চম লাইনে 'সংবিধানের ৩৯ তম সংশোধনী'র পরিবর্তে 'সংবিধানের ৩৮ তম সংশোধনী' হবে।

সম্পাদক, জয়ন্তী

সেদিন শান্তি দক্ষ প্রভাতে

উত্তরধারী

বিজ্ঞান ছাপোষা করানী। সে এইখানেই
বরাবর মানুষ হয়েছে। তার সম্বন্ধে এখানকার
কোন লোকেরই কোন মোহ নেই। কিন্তু সে
যখানে থাকে সেই অঞ্চল সম্বন্ধে এদের মোহ
প্রচুর। কলকাতার দমদম দাওয়াইয়ের কথাও এরা
মনেছে।

বিজ্ঞান স্বভাবতই ভীষণ। রাজনীতির আশে-
পাশে সে পারতপক্ষে যায় না।.....

বাড়ী ফেরার পথে তার হঠাৎ পাওয়া নেতৃবৃন্দের
উদ্বেজনাক্রমেই কমতে থাকে। চলার গতিও
নিখিল হয়ে আসে। চল না পাওয়ার অভাব
নেতৃবৃন্দের পাওয়াতে দূরে ঠেলে দেয়। জনতার
খুশি আনন্দ হয়ে শুধু ভেসে ওঠে শীলার মুখ।
দৈনন্দিন চালের পরিবর্তে খিচুড়ির কথাই বেশী মনে
পড়ে। ভগবানকে মনে মনে প্রার্থনা জানায়
মজ্জাবেলা কেউ যেন না আসে। জনতা এবং
বিজ্ঞানের কথাবার্তাগুলো ডালপালা ছড়িয়ে
ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছতেও দেয় না।
কোনগুলিও ঘরে ঘরে বেজেই চলে। ইম্পাত-
নগরীতে এবং রাজধানীতেও ট্রান্সকল হতে থাকে।

কারণ এখানকার শিক্ষিত দারোগাবাবুর উপর খুব
বেশী নির্ভর করা যায় না। পুরানো রামরাজ্য
এঁর আমলে অনেকটা কমে গেছে। তাই যাদের
সঙ্গে এঁদের অনেক দিনের পরিচয় সেই দূরের কেউ
দেখুদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান চলতে থাকে।
চাটু চামচেদেরও জরুরি তলব দেওয়া হয়।
খোদ গাণ্ডারী লালের ভায়ের কালোগাড়ীখানা
দিবালোকেই দর্শকদের অবাক করে দিয়ে, পিনাকী
বাবুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের
অবিসংবাদী নেতা শেখ আজিজ। উড়িষ্যাবাসীদের
মধ্যমণি বিজয় যশু, এবং বিহারী সম্প্রদায়ের
দালাল প্রসাদজীও সেখানে গিয়ে পৌঁছান। নিরামিষ ও
আমিষ আহারেরও ছড়াছড়ি পড়ে যায়। তার সঙ্গে
অজস্র পানীয়ও।

প্রথমে ঠিক হয় বিজ্ঞানকেই সরিয়ে দেওয়া,
প্রয়োজন হলে ঝাড়ে বংশে, কিন্তু তাতে বাধা আসে,
আজিম সাহেব রাজী হন না। তাঁর মতে বিজ্ঞান শুধু
উপলক্ষ্য মাত্র। যশু মশাইয়েরও সেই মত।
বৈষ্ণব কুলতিলক গাণ্ডারী লালের ভায়ের মতই শেষ
পর্যন্ত নেওয়া হয়, বুধবৃক্ষের আমূল উৎপাটন।

বাজারের কাছে দু'তিনটি দোকানও খালি করে

দেওয়া হয়। বস্তার পর বস্তা আসে তুষ, কুঁড়ো, কিছু গম এবং এক বস্তা পাচা চাল। সঙ্গে কয়েক-টিন আলকাতরা, বহু ধর্মূল্য একটিন কেরোসিন এবং পেট্রোল। বাকী সমস্ত দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভাঁটিগুলিতে মাল মজুত করবার চালাও ছকুম যায়। চৌধুরীদের পোড়ো বাড়ীর পাশেই গাণ্ডেরীলালের যে বিলাসকুঞ্জ, সেখানে খানাপিনারও বন্দোবস্ত করা হয়। জানিয়ে দেওয়া হয় চৌধুরীদের বাড়ী ঘিরে যে আমবাগান, সে পথ দিয়ে খাবার যেন না যায়। খিড়কির দরজা দিয়েই যেন সেগুলি পৌঁছায়। এছাড়া ভোগের অল্প উপাদানেরও আয়োজন রাখা হয়। এসব ব্যাপারে গাণ্ডেরীলালকে যাঁরা পরামর্শ দেন অর্থাৎ একজন বিহারী ও একজন বাঙালী, তাঁদের উপরই সমস্ত ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। পিনাকী বাবুরাও আপত্তি করেন নি। তাঁরা জানেন এই দুই ভদ্রলোকের ক্ষমতাও অসীম।

খিচুড়িতো দূরের কথা মহানবমীর দিনে একমুঠো চালও জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে শীলা শুধু যথেষ্ট শিক্ষিতাই নয়, রন্ধন কার্যে নিপুণও। আলু এবং অনান্য শাক সবজী দিয়ে সে অনেক রকম মুখরোচক খাবারও তৈরী করে। দেরীতে ও বেশী খাওয়ায় বিজন বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার পরও ঘুমিয়ে থাকে।

কতকণ ঘুমিয়েছিল তা বলা যায়না। শীলার ডাকে সে ধরমড় করে উঠে বসে। শীলা জানায় বাইরে বহুলোক এসে জমা হয়েছে। তারা নাকি

বলছে বিজনই তাদের আসতে বলেছে। শীলা এও জানায় বিজনের ভাই সজল ছুটি হাঁসের দিনিময়ে এক কেজি চালও জোগাড় করে এনেছে। শীলা এবং বিজনের মা সেগুলিকে রেখে পরিষ্কার করে রেখেছে, রাত্রে খিচুড়ী হবে।

কোনরকমে পায়ে একটা গেঞ্জি দিয়ে বিজন বাইরে আসে। এক্ষণক বাদে তার মনে পড়ে, সকালের কথা। বিজন ভেবেছিল ওটা নেহাতই কথার কথা। কোন গুরুত্বই দেয়নি। এখন সে ব্যাপারটা দেখে ভাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। জ্বর কাছে তার ভীকতা যেন না প্রকাশ পায় এই ভেবে এবং বাড়ীতে স্থানান্তরের জন্তুও সে তাড়াতাড়ি তাদের বলে চৌধুরীদের আমবাগানে যেতে। সেখানেই সে যাবে। লোকগুলোরও কোন অপরাধ নেই। তাদের এখন ডুবন্ত মানুষের মতনই অবস্থা। খড়কুটোকে আশ্রয় করে সে যেমন বাঁচতে চায় তেমনি এরাও বাঁচতে চেয়েছে বিজনকে আশ্রয় করে। কিন্তু বিজন যে কত অসহায় তা দারিদ্র ও ক্ষুধায়, দিশেহারা মানুষেরা বোঝার চেষ্টা করেনি। বিজন শীলাকে জানায় সে এসে চা খাবে এবং রাত্রে খিচুড়িও খাবে। আধ ঘণ্টার ভিতরেই সে ফিরে আসবে।

এখানকার প্রকৃত মালিকদের কালোবাজারের কালোকে, সাদা করবার জন্তু, অন্ততঃ লোকের চোখে যেন তাই মনে হয় তার জন্তু কয়েকটা কারখানাও খুলতে হয়েছে। লাভের আশা না থাকলেও। যেমন খুলতে হয় কলকাতার অলিতে

গলিতে অল্প ছোট ছোট দোকান। যেখানে ব্যবসার বাহ্যিক 'শোর' অন্তরালে থাকে রেসের স্লিপ কাটবার আড্ডা।

আমবাগানের পিছন দিকে নিঃশব্দে পর পর কয়টি কালো ভ্যান এসে দাঁড়ায়। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে চকচকে বেয়োনেট নিয়ে শাস্তি রক্ষার গ্রহরীরা। আরও নিঃশব্দে তারা গুলিগুলি পায়ে বিলাস কুঞ্জের একটা ঘরে গিয়ে জমায়েত হয়।

সমবেত জনতা তাকিয়ে দেখে বাজাবের একটা কোণে আগুনের শিখা। হঠাৎ শোনে কারা যেন চিৎকার করছে “লুঠ লিয়া-লুঠ লিয়া।” কেউ কেউ বলে ওঠে—“শালা হারামি বাচ্চা কো ঠিক ছয়া”। তামাম ছুনিয়াকো এলোপ জানসে মার দেতা” বেশীর ভাগই অবশ্য লুঠের বধুরা নিতে মিটিং এর দিকে না তাকিয়ে বাইরে যাবার জন্ত তড়াহুড়ো শুরু করে দেয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক ছুটে ছুটে এদিকটাতাই এগিয়ে আসে। পুরোভাগে রয়েছে দশমনি লাশ গাশুরী লালের চাচাকী। বহুলোকের মেদ তিল তিল করে সংগ্রহ করে সময়ে তিনি বপুটি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বলতে বলতে আসছেন— “হামরা সবেবানিশ হোগিয়া, পুরা চাউল আউর গেঁছ লুঠ লিয়া” চিৎকার করে বলতে থাকে হাম আখো সে দেখ। বড়াবড়া বোরা লেকর এলোগ ইধার ভাগা। কলকাতাওয়ালা বাঙাল বাচ্চা বিজ্ঞন ইসকো নেতা ছায়। মায় খুদ স্তনা

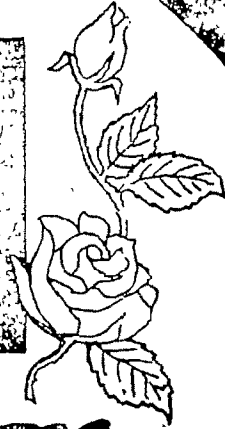
এহি সলা দিয়া” বলতে বলতে তারা এগিয়ে আসে প্রায় ঘরের কাছেই।

না তাদের আসার প্রয়োজন হয় না। কালো রাতে কালোটাঁকায় ক্রয় করা কালো সাত্তীরকীর দল নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। ঝলকে ঝলকে শুরু হয় অগ্নিবৃষ্টি। লুটিয়ে পড়ে একের পর এক। অগণিত সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র গুলি কয়েক লোক কতক্ষণই বা টিকে থাকতে পারে। মৃত্যু-কালীন চিৎকারও চাপা পড়ে যায় বাইরের কোলাহলে। কাজ শেষ করে বীরদর্পে ফিরে যায় সাধুপুরুষেরা, তাদের পদক্ষেপ তখন দ্রুত, অপেক্ষা-মানা নারীদের বা খাণ্ডবস্তুর মর্যাদা রক্ষা ভো করতেই হবে এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

লাশ ঘরে এসে জমা হয় কাঠ, কেরোসিন এবং পেট্রল, চাটু চামচেদের দল পা দিয়ে লাশগুলিকে ঠেলে ঠেলে একজায়গায় জড়ো করে। মূখে খিস্তি খেউড়ের অভাব হয় না। বিজ্ঞনের মাথাটার উপরেই যেন সবচেয়ে বেশী রাগ। বীরদর্পে সবাই এসে তাতে একবার করে লাথি মেরে যায়। ইতিমধ্যে এসে হাজির হন অল্পতম সময় নায়ক বিজয় যুগ সঙ্গে কয়েক মুঠো পোকায় খাওয়া চাল। বলেন “ওরে এরা চাল চাল করে মরেছে, দে ব্যাটাঁদের শেষ চাল খাইয়ে। আবার জন্মে যেন না আমাদের ছালায়” ছড়িয়ে দেওয়া হয় চালগুলি। পেট্রল এবং কেরোসিনে ভরে যায় সমস্ত জায়গাটা। সিমেন্টের জমাট কালোরক্তের উপরেও গিয়ে পড়ে কয়েক কোঁটা। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে শিখা।

এই বিশাল স্মার্ম সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সত্তা
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার স্নমর দেখলী
এই মেখেই তো!



মাদানা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরঙ্গ

মাদানা ডিস্ট্রিবিউশন-৯
কলিকাতা-৫

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ) ১২'০০

একট গীতা ৫'০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১০'০০

ভাবত-আত্মার বাণী ৭'৫০

Soul of India Speaks ৭'৫০

কর্মবাণী ১'৫০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১'৫০

শ্রীশ্রীচণ্ডী ২'০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিজ্ঞানসাগর ৩'০০

ছোটদের গল্পগুচ্ছ ৩'০০

ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী ৩'০০

ভাংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড ৩'২৫

সুহৃৎত্বের দেশে ৩'০০

নিবেদিতা ১০'০০

বিজ্ঞানসাগর ১০'০০

ব্রাহ্মের কিশোর নাটক ২'০০

ছোটদের সেরাগল্প ৪'০০

মূললেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী ৪'০০

বীরত্বে বাঙালী ৩'৫০

বিজ্ঞানে বাঙালী ৫'৫০

বাংলার ঋষি ৫'০০

বাংলার বিদুষী ৩'৫০

বাংলার মনীষী

রাজর্ষি রামমোহন ৩'০০

যুগাচার্য বিবেকানন্দ ২'৫০

আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪'০০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ২'৫০

রবীন্দ্রনাথ ৩'০০

জীবনগড়া ৭৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪'০০

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান

৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত

সংস্করণ)

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী ৬'০০

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যোগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ

নিবারণ ৫'০০

যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৩'০০

পুত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন ৩'০০

শরীর ও শক্তি ৩'০০

সরল যোগ ও ব্যায়াম ৩'০০

নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন ২'৫০

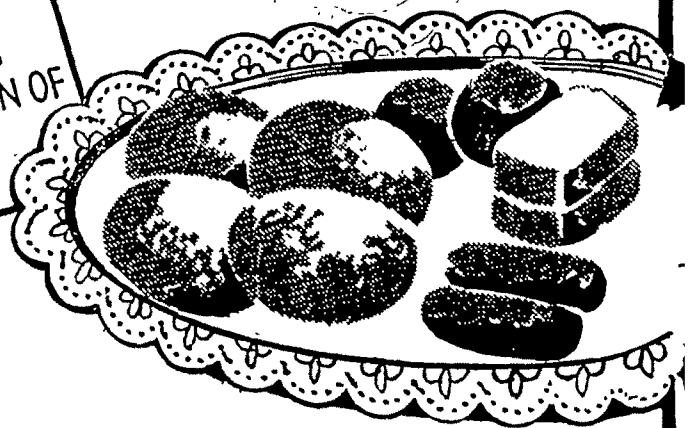
আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট ১'০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫-কলেজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২

9 SEP 1975

ADDS A SMILE TO YOUR DISHES

IT'S NOT ONLY
ALL GOODNESS
BUT ALSO A SIGN OF
GOOD TASTE



LAKHMI GHEE

*makes
your dishes
delicious
and
pleasing
too!*



Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1.00 with Regtd Postage
Rs 1.70 : 20-A, Prince Golum Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-1710 46-4116

श्री. वार

शरदपौष : १०४२

- জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পূর্তি

উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। দু'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও ছুঁয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদা, সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩-র বৈশাখে (মে ১৯৭৩) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভানুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

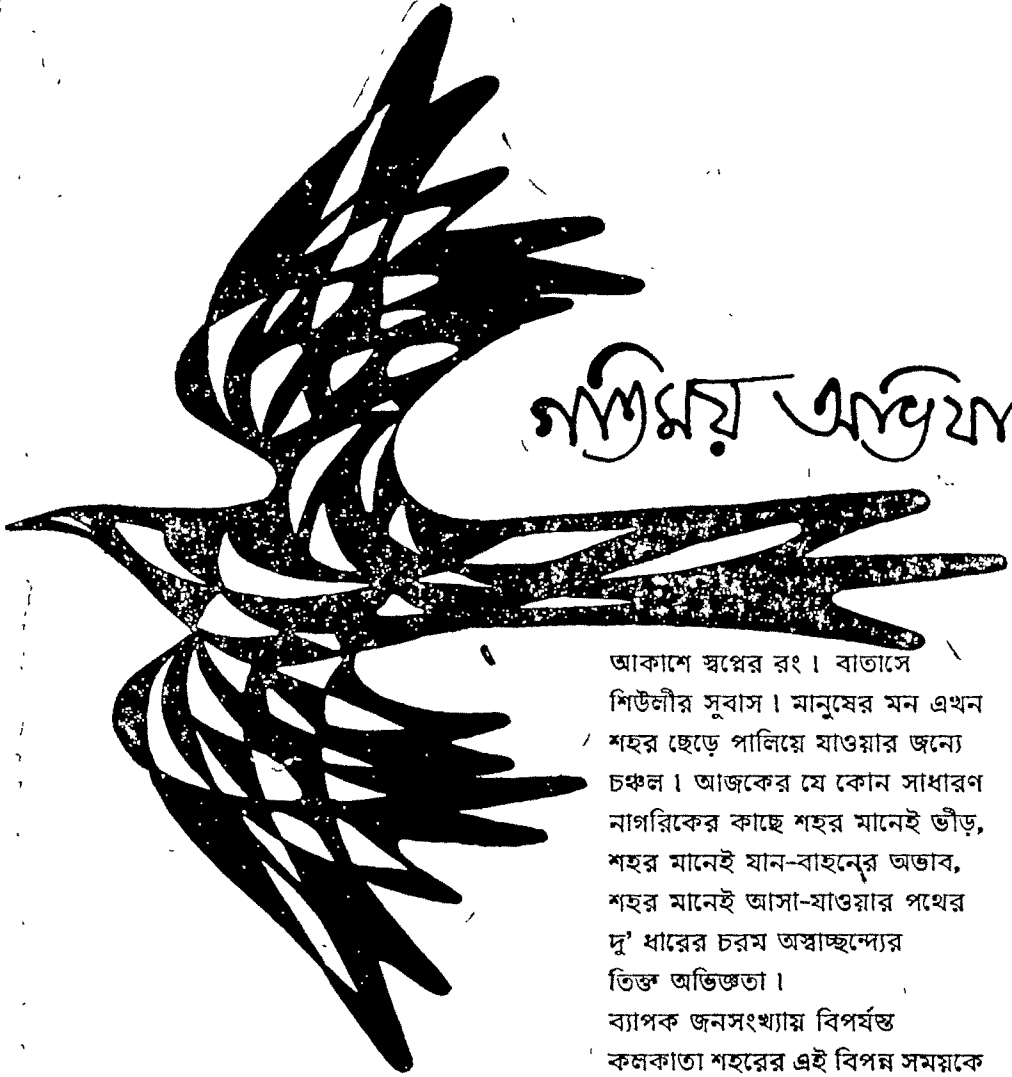
সম্পাদক

জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০



গতিময় অভিযান

আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে
শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে
চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ
নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়,
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব,
শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের
দু' ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের
তিক্ত অভিজ্ঞতা।

ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত
কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে
পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ রেলের
ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ
রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ
যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের
প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই
জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক
গতিময় অভিযান।



কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

With best compliments of :

Western India Dyestuffs Corporation

61/5 RAM CHANDRA LANE

MALAD (West)

BOMBAY 400064

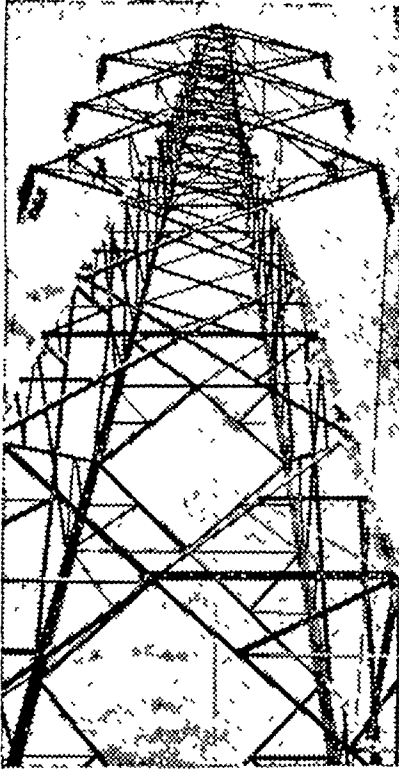
গুণেচ্ছাসহ :—

ট্র্যা ক ট র জ্ ই ণ্ডিয়া লি মি টে ড

১, তারাতলা রোড,

কলিকাতা - ২৪

ফোন : ৪৫-৫৭৭১



প্রগতির পথে ২০ বছর

আমাদের দুর্ভাগ্যবশত অনেক কিছু ঘটে গেছে। ১৯৫৫ সালে প্রায় শূন্য হাতেই আমরা কাজ শুরু করেছি এবং ব্যাঙে আমাদের প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তাই এক দশক বাদে। এরপর ১৯৭৪ সালে সাঁওতালভিহি ডাণ্ড বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। ২৫০ কি.মি. দীর্ঘ ২২০.কেভি ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে সাঁওতালভিহির বিদ্যুৎ সরাসরি কলকাতায় আসতে শুরু করেছে। এই সময়ের মধ্যে, জলচাকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও চালু হয়ে গেছে। সাঁওতালভিহির ১২০ মেগাওয়াটের খিড়ী ইউনিটও বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে।

মাত্র ৪.০৯ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে কাজ শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা দাঁড়াবে ৬৬২.১৭ মেগাওয়াট। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১,০০০ থেকে বেড়ে ৩,০০,০০০ এর বেশী দাঁড়িয়েছে এবং কর্মীসংখ্যা ৭০০ থেকে এখন দাঁড়িয়েছে ৩৩,০০০ এ।

সাঁওতালভিহি এবং ব্যাঙে—দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রেই বর্তমানে সম্প্রসারণের কাজ চলছে। কোম্বাঘাটে ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন তিনটি ইউনিট স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে। উপরন্তু উত্তরবঙ্গে জলচাকার ও কাদিয়াওয়ে দুটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সম্প্রসারণের কাজও ভাবোজাবেই এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আবেকটি উল্লেখজনক অগ্রগতি গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে। তিনবছরের কম সময়ের মধ্যে পর্ষৎ ৭০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে, ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০,০০০টি গ্রামে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ দিয়ে পৌঁছেছে।

আর্থিক অনটন প্রায়ই পর্ষদের কাজকর্ম জোরকদমে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাসত্ত্বেও, দৃঢ়প্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠা নিয়ে পর্ষৎ এ বাজার বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



বিদ্যুৎ উৎপাদনের
লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

With best compliments of :

**ALLIANCE MILLS (LESSEES)
PRIVATE LIMITED**

Quality Manufacturers and Leading Exporters
of Hessian Cloth & Bags, Sacking Cloth & Bags

and twine

Special in Russian & Japanese Quality.

Office :

18 NETAJI SUBHASH ROAD
CALCUTTA - 700001

Phone : 22-34001 (5 Lines)

Telegram : ALJUTLES
CALCUTTA

Telex : EIC CA 7023.

FOR FLAVOUR & QUALITY
DRINK

OODLABARI TEA
IT IS DELICIOUS AND FRESH

OODLABARI TEAS ARE MANUFACTURED
UNDER STRICT SUPERVISION TO ENSURE
THAT IT SUITS YOUR TASTE

**The Oodlabari Company
Limited.,**

“NILHAT HOUSE”

11, Rajendra Nath Mukherjee Road,
Calcutta - 700001.

Telephones : 23-1101
23-4093

ইউকোব্যাক্স কাছেই আছে, ইউকোব্যাক্সে টাকা জমায়

যেখানেই থাকুন কাছাকাছি ইউকোব্যাক্সের শাখা নিশ্চয়ই
পাবেন। এখানে এলে বুঝতে পারবেন, সংরক্ষণ কতো সহজে



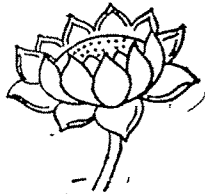
হতে পারে। সারা দেশ
জুড়ে ইউকোব্যাক্সের শাখা
ছড়ানো, আপনার সংরক্ষণ
যেখানে বেড়ে ওঠে।
ইউকোব্যাক্সে আপনার
সাদর নিমন্ত্রণ—

বিশদ বিবরণের জন্য
যে কোন শাখায় চলে আসুন।

**ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক**

গুডেচ্ছা, জহ

বিচিত্রা



অভিজাত পোষাক প্রস্তুতকারক

২৩, বাগবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৩

শিশুর মুখে হাজি ফোটাতে
ছোট পরিবার গড়ে তুলুন

আজই যে কোন পরিবার কল্যাণ
পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে ছোট
পরিবার সম্পর্কে খবর নিন।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা—295/75-76

পঃ বঃ পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা থেকে প্রচারিত

জ্ঞান প্রী
শা র দা য়া ১ ৩ ৮ ২
সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিজয়িণী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫৩	আমার কবিতা	কোতাকু তাকা মুড়া	
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম	অভয়শঙ্কর শর্মা	২৫৪	অন্তত প্রণাম	অম্বুবাদ : কৃষ্ণ ধর	২৮৯
বন্দীজীবনের চিঠি	অনিল রায়-লীলারায়	২৬১	মুঠো খুলে যায়	বাসুদেব দেব	২৮৯
দিন আগত ঐ	চারণিক	২৬৫		শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	২৯০
বৈদিক সমাজে নারী (প্রবন্ধ)	হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৯	নিরবধি প্রাণের বিষয়ে	নচিকেতা ভরদ্বাজ	২৯১
শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র	রাধারাণী দেবী	২৭৩	প্রতিমা কোথায়	মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	২৯১
(স্মৃতিচারণ)			সৌম্যরেশা	বিজয়কুমার দত্ত	২৯২
মুজিববাদ : পুনশ্চ	অন্নদাশংকর রায়	২৭৫	গল্প		
স্মরসিক আশ্রমিক (রসরচনা)	সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৭৮	অলৌকিক	মিহির মুখোপাধ্যায়	২৯৩
পরশমণির সন্ধানে	রাজবিরঞ্জন দাশগুপ্ত	২৮২	জঘন্না	বিজয়কুমার ঘোষ	৩০৪
কবিতা			অকেজো	রুচিরা মুখোপাধ্যায়	৩০৭
ছবি	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	২৮৬	পৌরুষ	অন্নদামোহন বাগচী	৩১০
কামনা	মূল : পদ্মা সচদেব		সোনালী মাছ	মানসী দাশগুপ্ত	৩১৬
	অম্বুবাদ : গোপাল ভৌমিক	২৮৬	খোলা জানলা	মূল : সাকী	
গবেষণা	মানস রায় চৌধুরী	২৮৭		অম্বুবাদক : শচীন্দ্রনাথ বসু	৩২৭
আলো থেকে সরে এসে	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৭	সংজীবনের আদিকল্পকার		
কয়েকটি প্রাশ্নোত্তর	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	২৮৮	শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)	শিবদাস চক্রবর্তী	৩৩১
			চিঠি	শান্তশীল দাশ	৩৩৫
			আমাদের কথা		৩৩৭
	সম্পাদক :		সুনীল দাস		

সাধনা

বিউটি

ক্রীম



ঔর মনোহারিনী মৌসুম!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
মৌসুমুলভ কমনীয়তা
তার অপরূপ নাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অন্য তৎপরগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য



সাধনা

ঔষধালয়

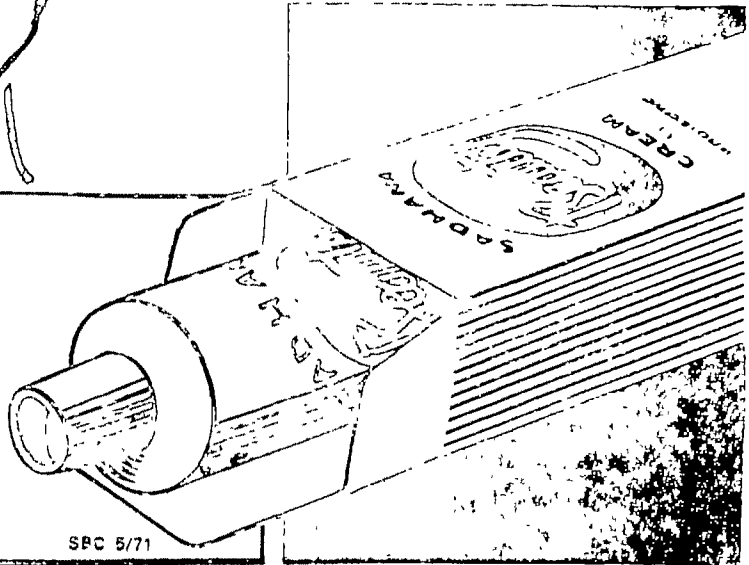
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮



Dr. Ghose

শাখা ভারতের সর্বত্র



SBC 5/71



ମୋନା ବଂ
ଶରତ ଦିନେ
ଆଜି ଓଂସବେର
ମୂର ବାଂକାର

ମାରାଫି

ରେଡିଓ

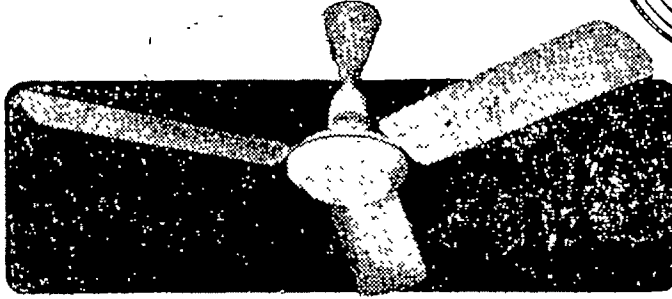
ମୋହି ମୂର ଲହରୀ
ନିଧେ ଯାକ
ଆପନାର ଘରେ

ଦେବସନସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

କଲିକତା • ପାଟନା • ଉଦ୍ଧବନପୁର • ଗୋହାଟୀ • କଟକ

8EEVAS/759

ক্যালকাটা ফ্যান



আমনার
জীবনের
সহযোগী



ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

CFW/PN/4-72-9

দৈব আশীর্বাদের মত



দুর্গাপূজা হলো নানারঙের আলো-ঝলমল শ্বশির উৎসব। কিন্তু স্বাভাবিক প্রতিমা গড়ন, উৎসবের অন্তরালে সেই মৃৎশিল্পীদের দিন কাটে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে। ব্যবসার মরত্তমে পুজির জন্যে বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পীকেই হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। ফলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত টাকার অনেকটাই চলে যায় চড়া সুদের ধার মেটাতে। পরিশ্রমের অনুপাতে লাভ থাকে না।

একটা বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯ সাল থেকে ইউবিআই মৃৎশিল্পীদের সাহায্য করে আসছে। ইউবিআই-এর আর্থিক সহায়তায় এখন তারা ব্যবসার মরত্তমে প্রতিমা-নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ একবারেই কিনে নিতে পারেন। মাটি, খড়, রঙ, সাজপোষাক, অলংকার—এমনি কতকিছুই তো সময়মত কিনে রাখতে পারলে ভালো। পুজোর বিক্রির পর ব্যাকের টাকা শোধ করতে হয়।

পুজোর সময় ইউবিআই-এর সাহায্য তাই মৃৎশিল্পীদের কাছে দৈব আশীর্বাদের মত নেমে আসে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান)

টানিক থেকে আই-ড্রপ—

লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের আমরা পারিবারিক বন্ধু

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্—লক্ষ লক্ষ
দেশবাসীকে যুগিয়ে চলেছে উৎকৃষ্ট ওষুধ

‘পড়লে ঠেকায় আসল বন্ধু চেনা যায়’—যে কেউ প্রবাদ অনুযায়ী আমাদের যাচাই করে নিতে পারেন। শুধু জনকল্লেক ডায়াবানদের কাছে নয়, এদেশের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের কাছে ছোটবড় সকলেরই আমরা পারিবারিক বন্ধু। বড়ো তাঁকুরদার জন্যে যেমন আই-ড্রপ, তেমনি বাড়ন্ত শিশুর জন্যে টানিক—আমরা যুগিয়ে থাকি। তাছাড়াও আমরা তৈরি করি বিস্তর ধরনের আধুনিক ওষুধপত্র—সকলের সাধো কলোয় এমন দামে।

এ কাজে আমরা হাত দিই সেই ১৯৩৬ সালে। আদর্শবান কয়েকজন বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ আর ভেষজতত্ত্ব দেয় সাধারণ মানুষকে ওষুধ যোগাবেন বলে গড়ে তুলেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড। ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন আর বিলিবারস্বায় নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো—এই ছিল তাঁদের দ্রত।

ইস্ট ইন্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
কলিকাতা ১৬

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড আপনাদের সেবায়

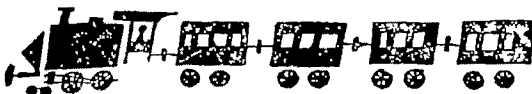


EIPC.PR.13 BEN

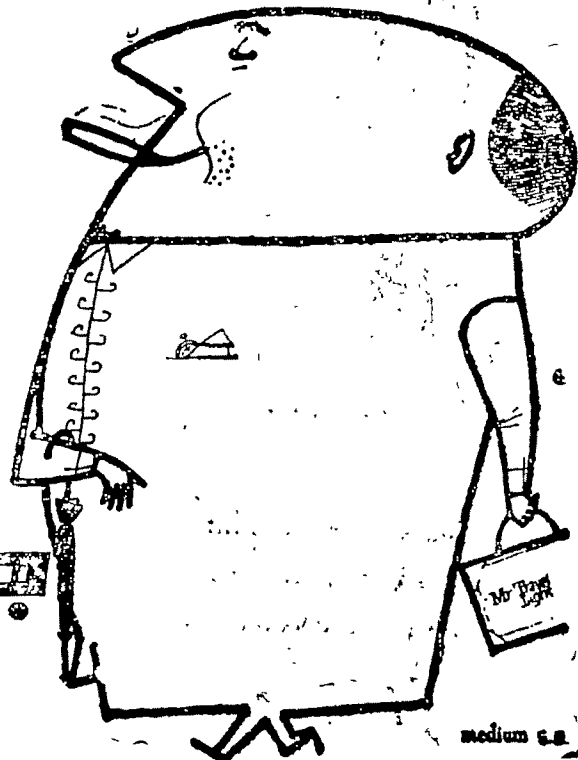
অল্প মাল নিয়ে

চলুন

এই নির্বাক পথটিকে প্রায়ই বাইরে
ঝেরোতে হয়। ভ্রমণে তিনি যেমন তৃপ্ত
এবং আগ্রহী, সহযাত্রী হিসেবেও তিনি সদা-
আকাজ্জিত। এর কারণ অল্প মালপত্র নিয়ে
তিনি ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত। অল্প মাল নিয়ে
ভ্রমণের অর্থ হচ্ছে আপনার ও আপনার
সহযাত্রীদের জন্য প্রশস্ততর জায়গা,
অধিকতর আরাম।



দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে





বাঙলা ও বাঙালীর সেরা উৎসবের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে।
এ কটি দিন সবার জীবনে আনুগত আনন্দের মুহূর্তনা। যাত্রী যারা—তাদের যাত্রা
হোক নির্বিকল। প্রবাসের দিনগুলি হোক মধুময়।

পূর্ব রেলওয়ে



With best Compliments from :

BALUBHAI PHARMACEUTICALS

16, POLLOCK STREET

CALCUTTA - 1

With best compliments from

**M/s Nireka Engineering & Co
Private Limited**

Manufacturers of High Tension Fastners

29, THE MALL
CALCUTTA - 28

Phone : 57-2389

With best wishes of :

North Brook Jute Co. Ltd

Chartered Bank Building

Calcutta-1

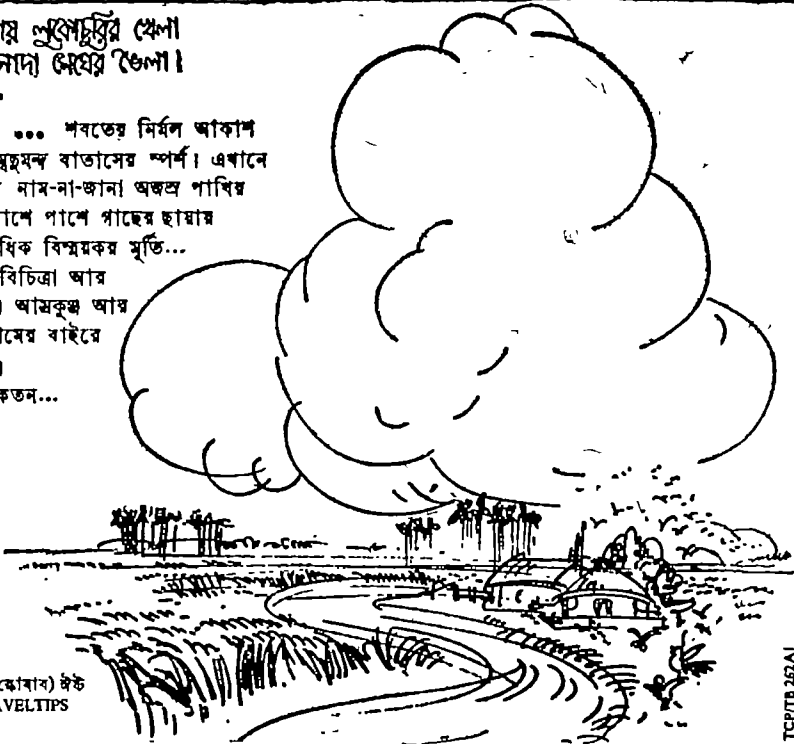
শ্রোতা ধীরে ধীরে প্রৌঢ়ায় প্রৌঢ়ায় ফেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের তৈলা।

শান্তিনিকেতন ...

শবতের নির্মল আকাশ
আর ধানক্ষেতে দোলা লাগানো মুহূর্তের বাতাসের স্পর্শ। এখানে
এখানে হাজীবো গাছের আড়ালে নাম-না-জানা অজস্র পাখির
ভীড়। সুরকি-চালা লাল রাস্তাব পাশে পাশে গাছের ছায়ায়
প্রাচীন তপোবনের ঐতিহ্য। একাধিক বিস্ময়কর সৃষ্টি...
ভাস্কর্যের বিমূঢ় প্রতীক। উপরন্তু বিচিত্রা আর
উদয়ন... কবিশুভকর পূণ্য স্মৃতিধন্য। অস্বকুল আর
শালবীথিতে পথিকের ভীড়। আলস্যের বাইরে
মেঠো পথে রাধাশিখা বাঁশির সুর।
এ সব নিয়েই আজকের শান্তিনিকেতন...
আপনার আমার 'প্রাণের আরাম,
মনের আনন্দ, আশ্বাস শান্তি'।
আজই চলে আসুন। আরামদায়ক
আর মনোমত্ত জায়গার জন্তে
ট্যুরিস্ট লজ আর কটেজ বৌদ্ধ
নিন। বিজ্ঞানভেদেও জন্তে
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ইন্সটিটিউট বুয়েল

৩/২, বিমর-বাড়ল-বীদেশ বাস (ডালহৌসি কোয়ার্টার) ঊর্ধ্ব
কলিকাতা-১ কোন : ২৩৮২১১ গ্রাম : TRAVELTIPS
ঘরাই (পরিটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার



TCPTB 2621

With best compliments of :

**The Eastern Manufacturing Co.
Limited.**

Registered Office :
9, BRABOURNE ROAD, 3rd Floor,
CALCUTTA-700001

Manufacturers of :
Quality Jute Goods, Hessian, Sacking,
Webbing, Twines, Sash Cord etc.

Jute Mills :
TITAGHUR : 24-PARGANAS
Phone : 22-8301/3 Gram : "WEBLINE"

With best compliments from :

**B. S. ENGINEERING
ENTERPRISE**

**Manufacturers of quality rubber
Products**

17/10E, MALL ROAD
CALCUTTA - 28

PHONE : 57-5206

With the compliments of :

The Indian Tube Company Limited

A Tata-Stewarts And Lloyds Enterprise

With best compliments from :

**Consolated Engineers'
Co-Operative Society LTD.**

DESIGNERS, INTERIOR DECORATORS
AND GOVT. CONTRACTORS.

**27, Manohar Pukur 2nd Lane,
Calcutta-700029**

With Compliments From :

**National Coal Development
Corporation Limited**

(A SUBSIDIARY OF THE COAL MINES
AUTHORITY LIMITED)

**DARBHANGA HOUSE
RANCHI.**

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যটন কী কী করেছে :

- * বন্যার জল নিকাশ ও সেচের ধারণের জন্য বহু মজা খাল ও পুকুর সংস্কার।
- * যাতায়াত সুগম করার জন্য ফেরীঘাট, পথ ও সেতু নির্মাণ।
- * সুন্দরবনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রায়োগিক—অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে বিষয় সমীক্ষা।
- * সতেরটি বিকাশ-কেন্দ্র স্থাপন। উন্নত প্রাথমিক ও দো-ফসলী চাষ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানো হয়েছে।
- * সাধাায়ায়ী কর্মসংস্থান।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যটন আশু কী কী করতে চায় :

- * নতুন রেলপথের প্রসার।
- * যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
- * এক-ফসলী জমিকে দো-ফসলী করার কাজে সাহায্য করা
- * মৎস, বন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্যবহার করা
- * উৎপাদন ভিত্তিক বিকাশ কেন্দ্র সংগঠন
- * জোয়ার থেকে বিছাৎ উৎপাদন সম্পর্কে অনুসন্ধান
- * নোনা জলকে মিষ্ট জলে পরিণত করার কেন্দ্র স্থাপন
- * পর্যটনের সুবিধা গড়ে তোলা

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যটনের দশসালী প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হলে :

- * সুন্দরবন উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গকে অধিকতর যোগাবে—
চাল, সজ্জী, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কাগজ ও অন্যান্য শিল্প

সুন্দরবনের জনসাধারণ পাবে :

- * লবণাক্ত জলের প্রাকোপ থেকে মুক্তি ও জল নিকাশের সমস্যার সমাধান
- * বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষির সাহায্যে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ
- * মৎস উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ
- * অরণ্য নির্ভর ও অন্যান্য শিল্প প্রসারের সুযোগ
- * কর্মসংস্থান
- * উন্নততর জীবনযাত্রা

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যটন কর্তৃক প্রচারিত

ଭାରତୀ

ସାହିତ୍ୟ

୪୦ ବର୍ଷ • ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା • ଆଶ୍ୱିନ ୧୩୫୨

୩୩

ବିଜୟିନୀ ମାହିତର ଡ଼ା,
ଦୁଃଖ ଓ ଶକ୍ତିର ଡ଼ା କଥା
ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ
ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ
ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ
ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ ॥

ସିଦ୍ଧିଚାନ୍ଦ୍ରମାହାନ୍ତି

୩୩
୨୨୮

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম

অভিশঙ্কর শর্মা

মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালায় অরগানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি—সংক্ষেপে ও. এ. ইউ—সম্মেলনে যোগদানের জন্য আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা মিলিত হয়েছেন। ১৯৬৩ সালে এই সংগঠনটি গঠিত হবার পূর্বে এটা ছিলো তাদের দ্বাদশতম সম্মেলন। কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকার ও আরব গোষ্ঠির রাষ্ট্রদের নিয়ে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৪৬। এদের মধ্যে পরস্পরের মতবিরোধ থাকলেও এবার এদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে ১৯৬৭র আরব-ইসরাইল সংঘাতে ইসরাইল যে আরবভূমি বেদখল করে নিয়েছে, সেগুলির পুনরুদ্ধার! জাতি সংঘ থেকে ইসরাইলকে বহিষ্কার নিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত প্রধানরা একমত হতে পারছিলেন না। আলোচনা চলছিল সর্বসম্মত কি ধরনের প্রস্তাব গ্রহণীয় হয়। এমন সময় শোনা গেলো সম্মেলনে উপস্থিত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল গাওয়ান, তার দেশের সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। গাওয়ানও ঐ পথেই ক্ষমতার আসনে আরোহণ

করেছিলেন, তবুও গাওয়ান এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে নীরবে বিদায় নিলেন। রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনে এ-ধরনের বাছাই এক স্বীকৃত পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও কাছের ঘটনা, পেকতে রাষ্ট্রশক্তির একই পদ্ধতিতে সাম্প্রতিক বাছাই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ১৯৭৫-এর আগস্টের ২৫ তারিখে পেরুর রাজধানী লিমাতে (Lima) ৭৮-টি নন-এলায়েন্ড, অর্থাৎ জোট নিরপেক্ষ, দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা তাদের আন্তর্জাতিক, অর্থ নৈতিক স্বার্থরক্ষার নীতি নির্ধারনের জন্য সমবেত হয়েছেন। পেরুর প্রেসিডেন্ট জেনারেল আলভারাদো (Alvarado) সম্মেলনে প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু হরি, হরি! সম্মেলনের কাজ শেষ হোল না, প্রস্তাবের দীর্ঘ খসড়া নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থানে ২৯শে আগস্ট প্রেসিডেন্ট আলভারাদোকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারই প্রধানমন্ত্রী জেনারেল বারমুডেস (Bermudez) ক্ষমতা দখল করলেন। রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে জ্যো-পুত্র-

২৫৫ কঠিনেই ভালেবাসিলাম

পরিজন নিয়ে অনাড়ম্বর বিদায় নেবার সময় সমবেত ক্ষুদ্র এক জনতাকে “পেরু দীর্ঘজীবী হোক”, এই সম্ভাষণ জানিয়ে আলভারাদো বিদায় নিলেন।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার স্থিতিশীল দেশগুলি ছাড়া অন্তর্গত রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিবর্তনে, এই ধরনের বাছাই-এর প্রয়োগ প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এই বাছাই প্রক্রিয়ার অঙ্কন দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানরা বিদেশ সফরে গেছেন সদলবলে, এমন সময় চমকপ্রদভাবে তাদের ক্ষমতাচ্যুতির দুইটি ঘটনা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বেশ কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা; ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা আফ্রিকার সত্ত্ব স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রথম সারির নেতা। নক্রুমা চীন সফরে গেছেন, পিকিং-এর রাজপথে যে সময় চীনা সরকার তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল, অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস ঠিক সেই সময় ঘানাতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ফলে পিকিং-এই তাকে নির্বাসিতের জীবন যাপন করে কয়েক বছর পর সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স সিহানুকও উনিশ শ সত্তরে ইউরোপ সফর-কালে ক্ষমতাচ্যুত হন। সিহানুক হাল ছাড়লেন না। পাঁচ বছর পিকিং-এ বসবাস করে চীনা সরকারের সাহায্যে কাম্বোডিয়ার বিপ্লবীশক্তির সঙ্গে সমবেতভাবে সংগ্রাম করেন এবং কাম্বোডিয়ার আমেরিকার

তীব্রদার লননল সরকারকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।

রাষ্ট্রবিপ্লব ও সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এর আরও অনেক নমুনা রয়েছে। চীনের চিয়াং-কাই-শেক্, ইন্দোনেশিয়ার বাও দাই ও নূর ক্ষমতাচ্যুতি এই বাছাই-এর পথেই সম্পন্ন হয়েছিলো। বর্মার উ-নুকে এক দশক আগে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল নে-উইন-এর ক্ষমতাদখল, ১৯৭৭-এর ১২ই সেপ্টেম্বর পঞ্চাশ বছর শাসনের পর ইথিওপিয়ার রাজা হেই লে সেলাসের সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুতি। সে-বছর ২৫শে এপ্রিল মালয়ালমের পঞ্চাশ বছরের ডিক্টেটর শাসনের অবসান ঘটিয়ে উদারপন্থী সামরিক শক্তির ক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এর কয়েকটি বিরল নমুনা।

বাছাই একা চলে না, জোড়-এ চলে হাঁটাইকে নিয়ে। বাছাই হাঁটাই এর জোড়-এর গতিপথ আঁকা-বাঁকা।

একটি অতি পুরাণো কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাছাই-এর ক্ষুরপতি ঘটনাটিকে বক্ষে ধারণ করে আছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। ফরাসী বুরবৌ রাজবংশের ষোড়শ লুই রাজ্যপাট ভোগ করছেন। বিলাস, বাসন, সম্ভোগ ও মত্তপানের মত্ততা তার দিনযাপনের সঙ্গী। রাণী আঁতোনিয়াতে ততোধিক ভ্রষ্টাচারিণী এবং দুর্নীতি-গ্রস্ত, অসং পারিষদদের সহযোগে তার ভোগ-বিলাসের অর্থ ঘোগাতে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেছে।

অর্থাভাবে ও অন্নভাবে—ক্লিষ্ট বিদ্রোহী জনতা রাজপ্রাসাদের সামনে সমবেত হয়ে ক্ষুধার অন্ন দাবী বরছে। রাজা ষোড়শ লুইয়ের ছাঁস নেই। অসংলগ্নভাবে আমাত্যদের প্রশ্ন করছেন ওরা কারা, কি চায়? অমাত্যদের শঙ্কিত জবাব : ওরা বুভুক্ষু, ওরা ক্ষুধা চায়। স্পৃহিত রাণী বুভুক্ষুদের বুভুক্ষাকে উপহাস করে সেই ঐতিহাসিক ক্রুর জবাব : ‘কিটো নাই তো কেচ্ছা!’—জনতাব মনে আগুনের হৃদয় দহন জ্বালিয়ে দিলো। জনতা ফরাসী বুরবৌদের অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল কারাগার ধ্বংস করতে ছুটে চললো, তাদের মুখে ধ্বনি ‘টু বাস্তিল’। বাস্তিল-এর প্রাচীর ভেঙে বুভুক্ষু জনতার রোষ ছুটে চললো রাজ প্রাসাদের দিকে। বিদ্রোহী জনতার উন্মত্ত কলরোলে মোহনত্ব ষোড়শ লুই প্রশ্ন করেন, ‘এটা কি বিদ্রোহ?’ অমাত্যদের জবাব এলো : ‘নো স্তার ইট ইজ রেভলুশান।’ অনন্তোপায় রাজা, রাণী পুত্রসহ জনতার বিক্ষোভে নেমে আসতে বাধ্য হলেন। উল্লাসে জনতা ফেটে পড়লো। এবার কেচ্ছা আদায় করতে হবে। তাদের মুখে অট্টহাসি ; “উই হ্যাভ দি ব্যেকার, ব্যেকারস ওয়াইফ এণ্ড দি ব্যেকারস বয়” (‘We have the baker, baker’s wife and the bakers boy’)। তারপর নির্মম মৃত্যুর পথে বাছাই হয়ে গেল রাষ্ট্র-শক্তির।

হিংস্রপথে রাষ্ট্রশক্তির বাছাই অনিবার্য না হয় সে-দিকে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কদের প্রখর দৃষ্টির অম্লপম স্বাক্ষরও ইতিহাসে রয়ে গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর

মারামারি মধ্য ইউরোপে প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক দি গ্রেট একজন বেনাভোলেন্ট ডেসপটরূপে (benevolent despot) পরিচিত ছিলেন। তার সম্বন্ধে কিস্বদন্তী রয়েছে, সাধারণ নাগরিকদের তার শক্ত্যতের শাসন সম্বন্ধে মতামত জ্ঞানবার জন্ত গভীর রাত্রে সাধারণ নাগরিকের বৈশে ফ্রেডরিক নিঃসঙ্গ পদযাত্রায় বার হয়ে পড়তেন। নিঃশব্দ কানে শুনতে চাইতেন তার কঠোর শাসন সম্পর্কে নাগরিকরা ভাল-মন্দ কি আলোচনা করেন। এমনি এক নৈশ অভিযানে ফ্রেডরিক দেখতে পেলেন একজন ছেলে দেয়ালে তার শাসন-বিরোধী পোষ্টার লাগাচ্ছে। একটি পোষ্টারে লেখাই রয়েছে, ‘ফ্রেডরিক নিপাত যাক’। সুন্দর অক্ষরে লেখা পোষ্টারগুলি ছেলেরা উঁচুতে লাগাতে পারছে না। ফ্রেডরিক এগিয়ে তাদের বল্লেন, ‘অমন সুন্দরভাবে লেখা পোষ্টারগুলি দেয়ালে নীচুতে লাগালে সকালে কাগজ-কুড়ুনিরা ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। তোমরা একটা টুল নিয়ে এসো আমি উঁচুতে লাগিয়ে দিই। ছেলেরা টুল এনে দিলে ফ্রেডরিক বেশ উঁচুতে ‘ফ্রেডরিক নিপাত যাক’ পোষ্টারটি লাগিয়ে দিয়ে চলে যেতেই ছেলেদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পেরে হাঁক দিয়ে ওঠে “ফ্রেডরিক দীর্ঘজীবী হোক।” বেনাভোলেন্ট ডেসপট ফ্রেডরিকও জনমতকে উপেক্ষা করতেন না, এই কিস্বদন্তী তার ইমারা দেয়। এই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এ হিংস্রতার কোনো ভূমিকা থাকে না। শান্তিপূর্ণ পথেই তা সম্ভব হতে পারে।

হিংস্রতার পথে রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এর শেষতম নিদর্শন বাংলাদেশ-এর সাম্প্রতিক ঘটনা। জন-প্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, বাংলাদেশের যিনি স্রষ্টা, সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হোলো এবং তারই স্থলবর্তী রাষ্ট্রশক্তিতে বাছাই হজেন, তার অপর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। এ-বাছাই যেমনি নির্মম, তেমনি বিস্ময়ের। ১৯৭৩ সালে চিলিতেও রাষ্ট্র-শক্তির বাছাই হয়েছিল হিংস্রতার পথে। চিলির রাষ্ট্রপতি আলেন্দে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন এবং সামরিক বাহিনী তার স্থলবর্তী রাষ্ট্রশক্তি দখল করে। চিলির রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র বাছাই-এর পেছনে বৈদেশিক শক্তির হাত ছিলো কি না, সে-বিতর্কে না গিয়েও দেখা যায় রাষ্ট্রপতি আলেন্দে'র বিরুদ্ধে, দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্ম বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। বাংলাদেশ-এ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রকাশ্য বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করেনি। যদিও ১৯৭৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর সে-দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এবং ১৯৭৫-এর ২৫শে জানুয়ারীতে সংবিধান সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পরিষদীয় ও বিচার বিভাগীয় সর্বাত্মক ক্ষমতা তার হাতে কেন্দ্রীভূত হবার পর এবং সেই সঙ্গে তারই সভাপতিত্বে এক-দলীয় শাসন পত্তন হবার পর এবং গত জুনমাসে সকল স্বাধীন সংবাদপত্র বিলোপ করে মাএ চারটি সংবাদপত্র সরকারী পরিচালনায় প্রকাশের ব্যবস্থার

পর সেখানে শাস্তিপূর্ণ গণবিক্ষোভ প্রকাশের কোন অবকাশই আর অবশিষ্ট ছিল না। ১৯৭৪-২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ এর জুন-এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ একটি অবাধ, মুক্ত (open) সমাজব্যবস্থায় থেকে একটি অবরুদ্ধ (closed) সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। তবুও এ-কথা বলতেই হবে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তির গতকিত বাছাই-এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতার নির্মম পরিণতি বিষাদ ও বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

হিংস্রতার বিপরীত মেরুতে শাস্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথে রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এর অবিস্মরণীয় নজীর সৃষ্টি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের উভয় সভা,—সেনেট এবং প্রতিনিধি সভা,—মার্কিন বিচারালয় এবং স্বাধীন ও নিষ্ঠুর মত প্রকাশের বাহক আমেরিকার সংবাদ পত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের এই পথগুলি অব্যাহত থাকার দরুণই হিংস্রতার পথে রাষ্ট্রশক্তি বাছাই-এর জন্ম সেখানে কেউ পা বাড়ায় না। রাষ্ট্রপতি কেনেডির হত্যা কিংবা মার্কিন লুথার কিং-এর হত্যা—রাষ্ট্রশক্তি বাছাই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই হত্যাগুলি মার্কিন সমাজের এক মসৌকফ দিকের অভিব্যক্তি। সংসদে দলীয় আনুগত্যের কাছে যেখানে বিবেকের প্রতি আনুগত্য পরাস্ত, যেখানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংশয়াচ্ছন্ন, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা অবরুদ্ধ, সেখানেই অব্যাহত পথে রাষ্ট্রশক্তির বাছাই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে গরিষ্ঠতম সংখ্যক ভোটে

নির্বাচিত প্রবলতম রাষ্ট্রপতিকেও, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে সাংবিধানিক পথে ক্ষমতাচ্যুতি অনিশ্চিত হয়ে উঠলে, দুর্নীতির দায়ে কারাদণ্ডের প্লানি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নিকসনকে পদত্যাগ করতে হয়। আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি মার্কিন সামরিক দপ্তরের ভিয়েনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত গোপন দলিলপত্র 'পেন্টাগন পেপারস'-এর এবং ওয়াশিংটন পোস্টের 'কেনেডির নথিপত্র' নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে এবং মার্কিন বিচারালয়ের দিক থেকে গোপন সরকারী দলিলের অব্যাহত প্রকাশে বাধা না থাকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাস্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথে রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এর পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

রাষ্ট্রশক্তি যত গোপনীয়তা অবলম্বন করবে, জনসাধারণের কাছ থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃত অবস্থা যত গোপন রাখবার জন্য উদ্বিগ্ন হবে, ততই গোপনীয়তা রাষ্ট্রশক্তির শারক ও বাহকদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে এবং সেই গোপনীয়তাকে রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। ব্রিটেনের শ্রমিক দলের প্রাক্তন মন্ত্রী পরলোকগত রিচার্ড ক্রসম্যান (Richard Crossman) তার রোজনামচায় প্রশাসনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখতেন। এই রোজনামচা ধারাবাহিকভাবে লণ্ডনের 'দি সানডে টাইমস' এবং 'নিউস্টেসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু মাত্র দুটি কিস্তি প্রকাশিত হবার পরই ব্রিটিশ সরকারের এটর্নি জেনারেল 'জনস্বার্থের খাতিরে' (Public Interest) 'ক্রসম্যান ডায়ারী'র প্রকাশ বন্ধ করে

দেবার জন্য আদালতে আবেদন করেন। ক্রসম্যান তার ডায়ারীর এক জায়গায় লিখেছেন : The British system sees to it that there is always truth for the few insiders, but only propaganda for the masses."

জনস্বার্থের খাতিরে কতটা গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, তা নিয়ে ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকায় তুমুল বিতণ্ডা হচ্ছে। ঠিক একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সি. আই. এ সম্পর্কে রকিফেলার কমিটির রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশের দাবীতে আমেরিকায়ও সংবাদপত্রে আলোড়ন চলছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার সেনেট-সদস্য 'ফ্রাঙ্ক চার্চ'-এর অভিমত হচ্ছে "সরকার ভাল মন্দ, শ্রায় অশ্রায় যাই করে থাকুক না কেন, মার্কিন জনগণের তা জানবার অধিকার আছে। সকল বিষয়ে জনগণের কাছে সরকারের কৈফিয়ৎ দেবার বাধ্যবাধকতা আমাদের গণতান্ত্রিক, অবাধ এবং মুক্ত সমাজকে লৌহ বেষ্টনীতে আবদ্ধ সমাজ থেকে স্বাভাবিক দান করেছে।" সরকারের এই গোপনীয়তাকে তীব্র কষাঘাত করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রয়োগ মানুষকে চূড়ান্ত ভাবে কলুষিত করা সম্পর্কে লর্ড গ্র্যাকটন যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তারই অম্লসরণে আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক বিল ময়্যার্স (Bill Moyers) বলেছেন : It is secrecy that corrupts, not power alone, and absolute secrecy corrupts absolutely."

লর্ড গ্র্যাকটন শুধুমাত্র বলেছিলেন : Power Corrupts and absolute power Corrupts

absolutely' স্তূত্রাং রাষ্ট্রশক্তির কাছে কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্ত গোপনীয়তা একটি প্রধান অবলম্বন এবং স্বৈরাচারী বা দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রশক্তি, গোপনীয়তার শেষ ঘাঁটি থেকে উৎপীড়ন, সন্ত্রাস ও দমন-গীড়ন প্রয়োগ করে ক্ষমতা বজায় রাখতে দ্বিধা করে না। রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এর জন্ত যে এই সব ক্ষেত্রে হিংস্রতার পথ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবার হিংস্রতা দিয়েই তারা বিকোভকে নির্মমভাবে দমন করে থাকে। হিটলার ও স্ট্যালিনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিরঙ্ক গোপনীয়তা ছিল রাষ্ট্রপরিচালনার প্রেরিতম নীতি। তারই ফলে হিটলারের বিরুদ্ধে কাল্পনিক বা বাস্তব অভ্যুত্থান হিংস্রতার পথে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলো এবং হিংস্রতার পথে তাকে নিমূল করা হয়েছে। স্ট্যালিনের বিরুদ্ধেও কাল্পনিক ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছেন তারই সহকর্মীরা এবং শেষ পর্যন্ত কামেনেভ জিনোভিয়েভ ও বুখারিনের মত ঘনিষ্ঠ-তমদেরও সে-পথেই বিদায় দিয়েছেন লৌহবেষ্টনে অবরুদ্ধ এক-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (closed society) এবং অবাধ মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার (open-society) ছই মেরুতে অবস্থিত রাষ্ট্রশক্তির বাছাই-এর পথও নিজ নিজ সমাজ-ব্যবস্থাই নির্ধারিত করে দিয়ে যায়।

শুধু রাষ্ট্রশক্তির ক্ষেত্রেই নয়, বাছাই সর্বত্রগামী, প্রকৃতি থেকে মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাছাই-এর আনাগোনা রয়েছে। মানুষের মনও নিরলগভাবে বাছাই করে চলেছে। ভোগ্যপণ্যের বাছাই পরিধেয়ের বাছাই, বাসস্থানের বাছাই, শিক্ষাগত

জীবনের বাছাই, বৃত্তির বাছাই থেকে প্রণয়ে ও পরিণয়ে বাছাই—নানা আকাঁকা পথে মানুষের জীবনকে টেনে নিয়ে চলেছে। এই পরিক্রমায় মানুষ আনন্দ-বিষাদের মহড়া দেয়, বিপদের বুঁকি নেয় এবং জীবনের পেছনে কোন্ সত্য নিহিত রয়েছে, তাকে অনাবৃত করতে এগিয়ে যায়।

প্রশ্ন ওঠে মানুষের মনে বাছাই-এর প্রক্রিয়া কি বস্তু নিরপেক্ষ? মানুষের মনের মুকুটে নিহিত কোনো নিরীক্ষ মাত্র। বাছাই একটি অমোঘ প্রক্রিয়া। মানুষের মনে নিরন্তর হিসাবনিকাশ চলে—কোনটা ছাড়ি, কোনটা রাখি। কোনও ক্ষেত্রে হতেও বা পারে, বাছাই নিছক মনের একটি খেয়াল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শের বাছ বাছাই-এর সংঘেত দেয়। কিন্তু যেখানে বাছাই-এর ঘাত প্রতিঘাত জীবনে উপচে পড়ে, সেখানে বাছাই একটি দৃষ্টিকোণ সাপেক্ষ, একটি মাপকাঠি সাপেক্ষ, যে মাপকাঠির সঙ্গে বাছাইকারীর জীবন সম্পর্কে ধারণা জীবনবোধ বা আদর্শ নৈতিক চেতনা ওতো-প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাছাই চলে সেখানে জীবনের গভীরে। সত্য, সুন্দর, শিব ও আনন্দের দিশারী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের অস্ফাটল গোধূলিতে উপনীত হয়ে জীবনের অব্যবহিত সত্যের স্বরূপ চৈতন্যের গভীরে উপলব্ধি করে বলেছেনঃ

‘সত্য ঘেঁ কঠিন,

কঠিনের ভালোবাসিলাম—’

সে কখনো করে না বঞ্চনা।’

কঠিনকে ভালোবাসার বাছাই-ই জীবনের

২৬০ জয়ন্তী, আশ্বিন ১৩৮২

সর্বোত্তম বাছাই। এ-পথে কেবল পাওয়া নয়।
বিলিয়ে দেওয়া, নিঃশেষে উজাড় করে নিঃশেষে টেলে
দেওয়া 'ব্যক্তি মানুষের জীবনে যে অন্তিম শ্রেয়োবোধ
মানুষের হাতছানি দেয়, জাতিপত বা রাষ্ট্রগত
জীবনেও সেই শ্রেয়োবোধই হবে অন্তিম দিশারী।
সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবন লোহ-বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ না
হয়ে, অব্যাহত মুক্ত হলেই সেটা সম্ভব। ইতিহাসেরও
এটাই শিক্ষা। তবুও এই শিক্ষা গ্রহণে মানুষের
নিদারুণ অনীহা। বার্নার্ড শ এক সময় যথার্থই
বলেছিলেন : 'আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ
করি না। এটাই ইতিহাসের বড় শিক্ষা।'

অমোঘ বাছাই-এর অনিবার্ণ শিক্ষা কি চিরকালই
অবহেলিত থেকে যাবে ?

With Compliments From :

S. N. Paul & Bros.
186, OLD CHINA BAZAR STREET,
CALCUTTA-1.

Phone : 22-3541, 22-7446

Pharmaceutical-Distributors & Stockists

ICI * Hoechst * Pfizer * Roche M. S. D.
(Volta) * S. K. & F * Squibb *
May & Baker * Glaxo * Alarsin
I. H. R & S Co

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়ন্তী-প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয়
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সন্ডাক ১২'০০। বাৎসরিক
৬'০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে
হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের অযোগ্য
সর্বপ্রায়ে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত।
কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পরিকার দায়িত্ব
নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।
৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার
সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের
সহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স গোল্ডার্ড মহাস্থান রোড
কলিকাতা-২৬

বন্দীজীবনের চিঠিপত্র

[[১৯৪২ এর ১১ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায় দ্বিতীয় বার কারারুদ্ধ হন এবং মুক্তিপান ১৯৪৬-র জুন মাসে।

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন ১১ই এপ্রিল, ১৯৪২ এবং মুক্তি পান জুন ১৯৪৬।

এই দীর্ঘ বন্দীজীবনে দুজনের চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয়েছিল প্রচুর। অনিল রায় বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন, এমন কি সবে লিখতে শিখেছে শিশুদের চিঠিও সবসময় কালাহুত্রে সঞ্চয় করে রাখতেন। সেই সঞ্চয়ের পরিমাণ, বৃহৎ আকারের কয়েক তোরঙ্গ ছিল। কিন্তু চিরবিপ্লবী লীলা রায় বীর জীবনের মর্মকথা 'পেছুটান আমি রাখি না'—তিনি একদিন এই সম্পদ নিজহাতে পুড়িয়ে ফেললেন। সময়টা পঞ্চাশ দশকে। ভ্রাতৃপুত্র বিজয় নাগ এক তোড়া চিঠি সেদিন তার বোধনমোর অতীত হলেও অমূল্য জ্ঞানে সরিয়ে রেখে ছিল, আজ তা থেকেই অনিল রায়ের একটি চিঠির অংশ উদ্ধার করা হল।

লীলা রায়—এর চিঠিটি তাঁর নিজেরই রেখে বাওয়া স্মৃতি। তিনি কয়েকটি চিঠি নিজেরই বেছে বেছে গিয়েছিলেন, প্রকাশিত চিঠিটি তারই একটি।

জঃ সঃ]

অনিল রায়—লীলা রায়কে
হামদম জেল ১১১১ ৪৪

সারা জীবনের স্মৃতি-তুর্পণ হবে। এ পানটি
লিখে ও গুরে তালে গেয়ে আমার নিজের তৃপ্তি
হয়েছিল।

...রবীন্দ্রনাথ উদ্দেশ করে যে গানটা রচনা
করে ওই আগষ্ট গেয়েছিলাম প্রাতে। তোমাকে
আজ পাঠাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ জীবনে যা দিয়েছেন
অন্য শোধ হবার উপায় নেই। তবে তাঁর কথা
ভাবতে মন ভরে ওঠে, এই ছন্দরায়ভূতিওই
আধিন ৮২-২

মিশ্র জোনপুরী—দাদরা

ওগো কবি, আজ কণে কণে

রয়ে রয়ে

শাউন সমীর বরে বয়ে

আনে, গোখলি-অরুণ বেদনা-করণ তব স্মরণ
হৃৎ-মস্তুর অন্তর, করে উন্নয়ন সারা তুমুন।

দূর সাগরের পার হতে আসে বার বার তব
হৃৎ অহবান,

মেঘে মেঘে বাজে

বজ্রের মাঝে

তোমার ভেঁরির রক্ত অধীর মৃত্যুঞ্জয় গান।

বিজলী-ছন্দে, বিপুলানন্দে

রক্তে রক্তে, দীপক মস্ত্রে,

ফন্দসী

ওঠে উচ্ছ্বসি,

দূরে, গুরু গুরু তাল বাজে উদ্ভাল,

তাল তমাল নাচন-মাতাল,

তব মঞ্জীর ঝঙ্কার গানে ঝংকারে ঝনঝন।

বেহাগে ললিতে তোমার যে সুর

কখনো তীব্র, কখনো মধুর,

কখনো শান্ত, কখনো বিধুর,

কতু অন্তরে, কখনো সুদূর

সে সুর চমক

পানের গমক,

চঞ্চলি চলে

জলে স্থলে,

আর, নিখিল জ্বনের আঁখিজলে

চির বরষাধারায় চলছে।

যতো অতীত দিনের স্মৃতিতে

যতো মৌন মনের গীতিতে

যত চাওয়া আর পাওয়া

ভুলে যাওয়া,

যতো আকাশ-ভুবন জনম-মরণ

দিনের কর্ম রাতের স্বপন,

তব, মর্শ্বের রাগে

অমুরাগে

ওগো, রাঙালে তোমার সপ্ত সুরের

রামধনু-স্বমায়

হায়

সজল হাওয়ার

ডাক দিয়ে যায়

তব কণ্ঠের শাস্ত সুরের সংগীত কলগুঞ্জন।

...তুমি লিখেছ জীবন সঙ্ক্ষে conception-

এর কথা। আছে বই কি Conception!

মাতৃষের urge আছে, আনন্দের দিকে স্বাভাবিক

প্রবণতা ও প্রেরণা আছে, সেই প্রেরণার বশে মাতৃষ

জন্ম থেকে, মৃত্যু পর্যন্ত কী হৃদয় চেঁচা করে চলেছে

সার্থক হবার। সামনে একটা আদর্শ ধরে তার

পেছনে বিরাম নাই। আদর্শটা আনন্দের।

আনন্দ থেকেই মাতৃষের আদি, এবং এর মধ্যেই তার

সব চেঁচার অবসান। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এককোঁটা

আনন্দের জন্ত আকুলি ব্যাকুলি। অথচ কোথায়

আনন্দ? ব্যক্তিগত সুখ, তৃপ্তির জন্ত তৃষ্ণা আছে,

কিন্তু কালের একটা ঝাঁপটায় সব শেষ হয়। পৃথিবী-

ব্যাঙ্গী হানাহানি, রক্তপাত চলেছে। এক এক সময়

সেই ধ্বংস জীলার ছবি মনে মনে আঁকবার চেষ্টা করি। নিজেকে আশ্চর্য হয়ে যাই। ভাবি, কেন? কী চায় মানুষ, আর কী করে। স্নেহমমতা প্রেম সব চাইতে আনন্দের উৎস মানুষজীবনে। কিন্তু এরই জন্তে পথ খোঁজে সে রক্তপাত আর ধ্বংসের শ্মশানে। মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্বব্যবস্থা চলে না। সবাই তার ব্যক্তিগত তৃপ্তি চায়, তাই হানাহানি। বিশ্বব্যবস্থার পিছনে আছে যে বিশ্বমনের বিরাট ইচ্ছাশক্তি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সামঞ্জস্য না স্থাপন করলে, দুঃখের ফল ফলবেই। জীবনে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী না তৈরী করতে পারলে, ব্যক্তিগত দুঃখের অবসান নাই। একথা আমি মনে প্রাণে বুঝতে পারছি। আমরা মনে প্রাণে স্বকীয় পৃথক সার্বকতা চাই। তাই দুঃখ হয় তার ফল। বিশ্বমনের কাছে সম্ভানে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে জীবনকে অনেকটা নির্লিপ্ত disinterested হয়ে না দেখতে পারলে শান্তি নাই। যুহু সব চাইতে বড় সত্য।.....

লীলা রায়—অনিলা রায়কে

প্রেসিডেন্সী জেল। ৬/৯/৪৫

.....জীবনকে গভীর ভাবে অনুভব না করলে গভীর প্রশ্ন জাগে না—এবং তা না জাগলে—তার গ্রহণও স্বাভাবিক বা সুন্দর হয় না।

আচ্ছা আমার ব্যক্তিগত মতামত বাদ দিয়েই লিখছি। Idealism or Materialism বাদ দিয়ে সমাজ গড়া যায় কি না? Idealism বলতে যদি

বুঝি মনপ্রধান ও materialism বস্তুপ্রধান—বা অল্প ভাষায় whether mind or matter is ultimate reality অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থায় মন-ধর্মকে বা বস্তুধর্মকে স্থান দেবো এই যদি প্রশ্ন হয়—তবে সে প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? মানুষকে যদি person বলি ও তার individual self কে স্বীকার করি—তবে সেই individual self এর sphere রইলো কোথায়? জীবনের মধ্য দিয়ে সত্য বলে তার কাছে কি প্রকাশ পাবে—নিজস্ব জীবনের স্বাভাবিকতার মধ্যে সে আবিষ্কার করবে কি? যেটা তার সারা জীবনের সাধনার বস্তু যেটাকে সে তিলে তিলে আবিষ্কার করে করে সত্য হয়ে উঠবে নিজের কাছে নিজেদেরও যার ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করবে সে।—আগে থেকেই সেটা যদি বলে দেওয়া হয়—যে তোমাকে এই পথে যেতে হবে তবে তা তার পক্ষে শুভ বা সত্যিকি। সেখানেও কি রাষ্ট্র ও সমাজ বলবে তোমার “সত্যের রূপ এই হোতে হবে” আগে বাছাই কর কোন্ সত্যকে তুমি নেবে তোমার সমস্ত অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি হিসেবে—” তা না হলে তুমি চলতে পারবে না একপাও। এ আমার কাছে অসহ্য দুঃসহ regimentation—আমি এ স্বীকার করতে পারছি না। সমাজ ব্যবস্থা—রাষ্ট্রিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা as a whole কল্পনা করে সেদিক দিয়ে অগ্রসর হোতে হয় ঠিক—কিন্তু সে whole abstract whole নয়—partial whole—কারণ ঐ ব্যবস্থা বা institution গুলো মানুষের বা ব্যক্তির ব্যবহারিক দিক। ব্যক্তির

একটি অ-ব্যবহারিক দিক থাকবে—সেটা হচ্ছে—
নিজের আঙ্গিক অঙ্গুতি সেখানে encroachment
কখনো শুভ হতে পারে না—তাতে stunted
কতকগুলো uniform automaton হোতে বাধ্য
সে idealismই হউক আর materialismই
হউক! আর Ideal-Realism কে আমার ঠিক
fundamental মতবাদ মনে হয় না। মনে হয়
একটা necessary compromise। আর যদি
বল ওটা একটা স্বার্থ harmony তবে কি ঠিক
বলা হবে—কারণ ওখানেও তো মনকেই ultimate
fundamental বলা হয়েছে। তারপর
লিখেছো—spiritual ethical or human
values স্বীকৃত না হোলে সে সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত
আত্মবাসী হবে। এই যে সব values এ কি
মানুষেরই সৃষ্টি নয়—কাজেই মানুষের ক্রমোন্নতি বা
ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে change করছেই।
মনপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় এই values গুলো
অধিকতর উচ্চস্তরের ও বস্তুপ্রधानে নিম্নস্তরের হবে
এটা কি assumption নয়। Marx Lenin
তো materialists—কিন্তু কোনো idealist-এর
কাছে সে injustice ধরা পড়লো না—মানুষকে
পশু করে রাখার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেখানে কোনো

idealist দাঁড়ালো না সেখানে কি ওরা মানুষকে
মানুষ হিসাবে চরম value দিতে গিয়েই ঐ নূতন
Communitistic সমাজব্যবস্থার পত্তন করেন নি,
সেটা কি human বা spiritual values বলব না
যেহেতু ওরা materialists? আমি ওঁদের মতকে
সমর্থন করি না তবে সে অস্তিত্ব দিয়ে কিন্তু
মানুষের পক্ষে উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়া সম্ভব নয়
যদি সে আগে থেকে idealist বা materialist
কোনো একটা না হয় এও আমি স্বীকার করতে
পারছি না। আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি এ নিয়ে।
আমার মনে হয় একটা দিক থাকবে—সেটা per-
sonal quest এর দিক—সেটার শেষ নেই—
যার যার প্রবৃত্তি সমস্তা ও বিশ্বাস অনুযায়ী তার খোঁজা
চলবে। কোনোখানে কেউ হয় তো সিদ্ধান্তে
আসতে পারেন বেশীর ভাগ লোকে সিদ্ধান্তে আসতে
পারবেন না—খুঁজে যাবেন নূতন নূতন পথে—
খোঁজার পেছনে—ওঁদের কোনো বিশেষ ধরনের
urge থাকতে পারেও বা। আমার মন থেকে একটা
দাবী উঠছে সেটা হচ্ছে—real democracy to
differ এটাই দরকার নূতন যুগের মানুষের।
তাতেই সে spiritual values খুঁজে পাবে।....

দিন আগত ঐ

চারণিক

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

চারণ প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। কয়েকটি ধারাবাহিক লেখা সে লিখছিল, এমন সময় এক বিপত্তি ঘটলো। প্রতি সাতকালেই মহাকাল চারণকে বলতেন, তোমরা একাগ্রচিত্তে বসলে সহজেই কয়েক ঘণ্টায় একটি বিজ্ঞা অর্জন করতে পার, তোমার সূক্ষ্ম শরীরকে তোমার স্থূল শরীর থেকে বের করে আনতে পার। আর বিজ্ঞেটা রপ্ত হলে তুমি যা ভাববে তাই বাস্তবায়িত হবে। তুমি ভাবলে ‘তুমি শত সহস্র মাইল দূরে একটি স্থানে’ ‘you resolve and you are there’ এই ভাবনা ও ফলপ্রাপ্তির বিশ্বাসের বিজ্ঞার্জনের সাধনা চারণের সহজ সাধ্য মনে হয়নি। কিন্তু মহাকাল প্রায়শই বলেন, একাজটা তোমরা নিজের অজ্ঞাতমারেই [মহাকালের ভাষায় : প্রত্যেক মানুষই কিন্তু, নিজাববাহ্য (সে বুঝতেও পারে না। কেউ-কেউ বুঝলেও, সঠিক ভাবে ধারণা কোরে—একটা স্থির ধীরভাবে ব্যাপারটা জেনে, লাভবান হতে পারে না) প্রাণময় (বা সূক্ষ্মশরীরে) শরীরের, স্থূল শরীর থেকে উদগমন (উদগমন = বাহির হওয়া) দুই রকমে হয় (১) বিজ্ঞাত উদগমন (২) অজ্ঞাত উদগমন। নিজাকালে হয়। অজ্ঞাত উদগমন মানব মাত্রেই—নিজাববাহ্য এক অতি আবশ্যিক কর্ম। এ সত্য তোমাদের বৈজ্ঞানিক চর্চাও প্রমাণিত হয়েছে যে, জাগ্রত অবস্থায় প্রাণশক্তির যে কয় ক্ষতি হয় তারই পূরণ হেতু নিজাববাহ্য অজ্ঞাত উদগমন হয়।] কিছুটা কর, যখন ঘুমিয়ে থাক, তোমরা যে স্বপ্ন দেখ তা প্রকৃত সত্য, তোমার স্থূল শরীরের বিশ্রামাবকাশে সূক্ষ্ম সত্ত্বাটি তোমার ভাবনা নিয়ে বাইরে আসে এবং তখন সে দেখতে পায় বাড়ীর আলসেতে তেমনি আরও অনেক সত্ত্বা পা কুলিয়ে বসে আছে। এই বসে থাকা পর্যন্তই তার ক্ষমতা, কারণ ঐ সূক্ষ্ম সত্ত্বা কোনও অল্পশীলনের ফল নয়।

চারণ আনমনে বসেছিল নানাভাবনা আলোড়িত করছিল মন। একটি দৃশ্য উদ্ভেলতা আসছিল একটি প্রেক্ষাপৃষ্ঠে একটি সামাজিক ছায়াচিত্র হচ্ছে, সে সময় স্বাধীনতা পূর্বকালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালীন জাতীয় নেতাদের নানা ঘটনার উপস্থাপন হচ্ছে। প্রথম এলেন জাতির জনক কোনও বৃহৎ সভায় ভাষণ দিচ্ছেন, তারপর এলেন তাঁর প্রিয় জগৎহর। তারপর আজাদ, ইত্যাদি, কিন্তু দর্শকেরা

২৬৬ জয়ন্তী, আশ্বিন ১৩৮২

নীলব নীধর প্রাণহীন, এমন সময় চারণের চমক ভাঙলো প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে গমগম করে উঠলো, তাকিয়ে দেখলো পর্দায় দেশনায়ক সামরিক বেশে অভিবাদন গ্রহণ করছেন—সিঙ্গাপুরে। জনমনের এই আবেগ মধিত সাড়া চারণকে ব্যাকুল করে তোলে। কী অপরাধ, কী হিমালয় প্রমাণ বাধায় একে দেশবাসী দূরে সরিয়ে রেখেছে।

আকস্মিক ঘটনা ঘটল, মহাকাল চারণের সামনে দণ্ডায়মান, আর চারণ ছুটি সন্ধ্যা বিভক্ত, একটি স্থূল শরীরী সন্ধ্যা অছাটি স্থূল-দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্ম সন্ধ্যা। নিমেষে মহাকাল এক জ্যোতির্ময় আলোক-সন্ধ্যা রূপান্তরিত হলেন আর চারণ তাঁরই অনুগমন শুরু করলো।

চারণ চলছে, মহাকাল নিয়ে চলেছেন, অথবা চারণ কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।—

‘আকাশের অ-নে-ক স্তর আছে। এমনিতে তো, চলতি কথায় ওপরের আকাশকে বোম বলা হয়। কিন্তু আকাশের সবটাই-ই বোম। এই আকাশের, (বোমের) ব্যাপ্তির পরিধির শেষ হোল মহাবোমে অথবা, অন্তর্শব্দে মহাবোমকটাকে (এই শব্দটাই ঠিক)। মহাবোম কটাহারা এক একটা ব্রহ্মাণ্ড ঘেরা থাকে। বোমের বা আকাশের অনেক গুণ—অনেকরূপ—অনেক ক্রিয়াকর্ম—অনেক রকমের শক্তি অনেক Duty আছে। প্রাণদায়ী—মৃত্যুদায়ী—ধারক বাহক সঞ্চারক—রূপ-অরূপ কারক—রূপ অরূপদায়ক—প্রতিফলক—RECURRENT—সংরক্ষক etc ইত্যাদি ওস্তাদি প্রভৃতি...

তাহলেই তোমার বুঝতে একটুও অসুবিধে নেই যে, এই আকাশ OR বোম তোমার আমার, (সর্ব জীববোনি) প্রাণীরই মধ্যেও রয়েছে। তোমার তৈরী হওয়ার একটি প্রধান ওষু= আকাশ, এটা তো জানোই।

এই আকাশ OR বোম (কিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-বোম) তুমি আমি ঘোড়া গাছ মাটি পৃথিবী ভেতোর-বাহির—সব কিছুই : ভেতরে-বাইরে-চারিদিকে-দশদিকে—বাপু; এটা বুঝতে তোমার মোটেই অসুবিধে নেই। সুতরাং : তোমার দ্বারা যা কিছু মনন-বচন-শরীর দ্বারা হচ্ছে, তা সবই তো অতি স্বাভাবিক ভাবেই “রেডিয়েশন” (রেডিয়েশন) টেলিভিশন—টেপমেগনেটিভ-রেকর্ডার—ডিস্করেকর্ডার—গুণধর্ম বিশিষ্ট,—তোমারই বোম OR আকাশতত্ত্ব দ্বারা (তোমারই ভেতরে-ও-এবং) বাইরে ও—বাইরের বোমে i.e, আকাশে : রেডিয়ে-টেড—টেলিভাইজড—ম্যাগনেটিক্যালিটেপরেকর্ডেড—এবং ডিস্করেকর্ডেড হচ্ছে এবং হবেই।

মনে রেখ সৃষ্টির অনুপরমাণু, তুমি আমি সবকিছুই=ম্যাগনেট এবং—ম্যাগনেটিভ গুণধর্ম-বিশিষ্ট।

আসল সত্য এই যে (যদি না জানো, তবে চমকে উঠো না। আমি নিজে জানি এবং হামেশাই এটি দরকার মত ব্যবহার করি ; কোর্টে হয় Rather) তুমি আমি সবাই সবকিছুই হচ্ছি— ভাইব্রেশনস্ মাত্র (আর কিছু নয়) যাকে সলিড বলো—তা সবকিছুই “ভাইব্রেশনস্-এর ভয়ঙ্কর ডেল-অ্যাণ্ড-গ্রাস ফ্রিকুয়েন্সির-স্পন্দন—সমষ্টি মাত্র।

“কায়ামনসা বাচা যা কিছু হয়” তার কোয়ালিটি ভেদ আছে। অনেকগুলোই উপরের দিকে চালিত হতে পারে ; উপরের কোনো কোনো স্তরে হয়তো, তার রেডিয়েশন ফ্রিকুয়েন্সী অবজরবন্ড হয়ে যায় মানে ধরা থাকে। কতগুলো খুবই অল্প, আরো উপরে ধরা থাকে। আবার দু'একটা মাত্রই একেবারে মহাব্যোম—রিসিভার রেকর্ডার তৃপ্ত পাড়ি দিলো।

—মহাব্যোমে এই পৃথিবী-এবং সম্পূর্ণ সৃষ্টির সবকিছুই প্রতিফলিত হোয়ে ধৃত হয়ে চলে। (কত যুগ i.e সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,) নিত্য নৈমিত্তিক খণ্ড প্রলয়-মহাপ্রলয়—জুইটি সন্ধি শক্তি etc সব কিছুই।....

চারণ মহাকালের সঙ্গে ভেসে চলেছে। স্তরের পর স্তর। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। নির্মল আনন্দে হাঁফা হোয়ে চারণ আনন্দ সাগরে ভেসে চলেছে। আর মহাকাল এক জ্যোতির্ময় প্রাণময় আলোক সত্ত্বা। সেই জ্যোতির্ময় সত্ত্বা অতি দ্রুত বেগে কোথায় অদৃশ্য হল, চারণ তা অসুমান করার পূর্বেই এক তপস্বীর ভপোবনে উপস্থিত। চারণ মুগ্ধ বিশ্বয়ে তাকিয়ে রইলো, সেখানে কত পরিচিত জ্ঞান, প্রথমেই চারণের দেখা হল বিপ্লবী দার্শনিকের সঙ্গে। তিনি শ্মিত হেসে বলেন মনে নেই বড় ব্যস্ত। চারণ মনে মনে ভাবছে এখানে কীসের ব্যস্ততা, এই বিশ্বয়কর রাজ্যে তো কাউকেই বোধকরি মুখে প্রকাশ করতে হয় না, এই অমুভূতির রাজ্যে, বিপ্লবী দার্শনিক অমুভব করতে পারলেন চারণের ভাবনা ‘তোমাদের জন্তাই, আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী সকল স্তরের সত্ত্বারা এবং উদ্ধতন সত্ত্বারাও একই কর্মে লিপ্ত। কিছু ভেবনা, শুধু সাবধানে থেক, তিনি (মহাকাল) ফিরে পাবেন তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।’ মনে পড়ে যায় চারণের মহাকাল বর্ণিত ভূতত্ত্বের কথা, নলরাজার উল্লেখ ইত্যাদি—একী ভূত লোক?—এঁরা যে সবাই ব্যস্ত একই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্ত। এদের না আছে বার্ষিক্য, না আছে জড়া, এঁরা চির যৌবনের দূত, অসীম অনন্ত শক্তির অধিকারী এঁরা।’ চারণের দেখা হোল দেশনেত্রীর সঙ্গে, মহাকাল বহুবার বলেছেন—তোমাদের দেশনেত্রী আমার এখানেই আছেন। আজ তা মনে প্রাণে বিশ্বাস না করে পারো না চারণ। দেশনেত্রীর প্রিয় গান হচ্ছে, কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে, জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, আর বিপ্লবী দার্শনিক তাঁর পুরনো বন্দীজীবনের এসরাজটি নিয়ে বসেছেন শাইতে—‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথী।’

চারণের সমস্ত শরীরে ব্যথা। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আচমকা যেন নিদ্রাভঙ্গ হল, এ কি এত দীর্ঘ সময় কোথায় ছিল? কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, সবারই কণ্ঠ রুদ্ধ, ভীত সন্ত্রস্ত। কীসের ভয়? চারণ বুঝতে পারে না।

১৯৪৭ সালে যে রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি দেশে স্বাধীনতা এসেছিল স্বাধীনতার পূর্ণতা পূরণের মাধ্যমে, সেই মসৌলিগু দিনটিতে প্রত্যয়ে সংবাদ এলো স্বাধীনতালব্ধ স্বজাতি শাসিত রাষ্ট্রের কর্ণধার তার আত্মীয় পরিজনসহ যত্নের কোলে ঢলে পড়েছেন। চারণের মনে পড়ে যায় যেমন স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে এক একটি অঞ্চল মুক্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কাতারে কাতারে এপার বাংলার মানুষ ছুটেছিল ওপারে, সে সময় চারণের কাছে মহাকালের বক্তৃনির্দেশ 'ওপারে যেওনা' মনে পড়ে। তেমনি শেষ সাক্ষাৎকারের সময় মহাকাল অকস্মাৎ একদিন বলেছিলেন তোমাদের সকল ক্রিয়াকর্ম, আত্মীয়পরিজন সম্বন্ধন ইত্যাদি সবই ১৯৭৫ সালের অষ্টম মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে সারবে। ১৪ইর পর ওদিকে কিছুতেই থাকবে না। এ কথার তাৎপর্য এবং তার গভীরতা আজ চারণের মনে বিষ্ময় জাগায়।

কণ্ঠস্থায়ী সাময়িক চাকল্যকর কী হয় না হয় এই দোলায়িত যে জীবন যাত্রা, জীবনভর এই যে নৈরাশ্রময় দিন গোনা তার সমাপ্তি সংগীত বোধ হয় শুরু হয়েছে, নিত্য নবীনের আপমনী ধ্বনি চারণ শুনতে পাচ্ছে, তাই মহাকালের চিরন্তন লোকতীর্ণ জীবন চর্চা জীবনভাবনার কথা চারণ বারবার দেশবাসীকে শোনাচ্ছে, শ্রবণ করিয়ে দিচ্ছে।

মায়ের কথা

বাল্যালীর সংস্কৃতি, বাঙালী গৃহস্থ ঘরের অমূল্য দৃশ্যগুলি কখন সখনও যখন মহাকাল অঙ্কিত করেন তখন বিষ্ময়কর লাগে এই বাউতুলে ভবনুরে মানুষটি কখন এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের পার্শ্ব-জীবন দেখলেন। মহাকালের বৈঠকে একদিন বাঙালী ঘরের গৃহীরা কীভাবে স্বামীকে পরোক্ষে ইশারায় তাদের সব কথা বলেদেন, এবং সেই বলার মাধ্যমে বর্ণনায় মহাকাল মায়ের একটি রূপ চিত্রিত করলেন।

বলেছেন বাঙালী মা বলে আছেন, তার কোলে একটি, একটি পিঠের দিক থেকে চড়ছে, একটি হয় তো অঁচল ধরে আঙুলই চুষছে আর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আরো একটি হয় তো মার খুঁতনি ধরে টেনে কিছু একটা বোকাতে চাইছে, আর সেই মুহূর্তে পতীর ঘেঁষে সিন্ত মাড় মুখ-মুহুরে অগার মহিমা বর্ণনাকালে মহাকাল বলেছেন—

[শেবাংশ ৩২৬ পৃষ্ঠায়]

বৈদিক সমাজে নারী

প্রবন্ধ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান বৎসরটি আন্তর্জাতিক নারীবৎসর হিসাবে পালিত হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সহিত সমান অধিকারে স্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে এই বৎসর নারী উন্নয়নের নানা দিক আলোচিত হচ্ছে। শত শত বৎসর ধরে নারী জাতি পুরুষ চালিত সমাজে অত্যাচারিত এবং অধঃপতিত ছিল। তার উন্নয়নের প্রচেষ্টা বলবতী হয়েছে; তবু আদর্শ রূপায়িত হয় নি। তাই বর্তমান বৎসরের এই আন্দোলন। এই পল্লিবেশে বৈদিক যুগের সমাজে নারীর অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয় আলোচনার একটা প্রয়োজন আছে। আমার ধারণা তা হতে আমরা কিছু মহৎ প্রেরণা লাভ করতে পারি।

আমরা দেখব বৈদিক যুগে নারী সমাজে একটি সম্মানের স্থান অধিকার করত। তারা সেকালে এমন অধিকার ভোগ করত যা হতে তাদের পরবর্তী কালে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য বৈদিক সাহিত্য হতেই প্রধানত সংগ্রহ করা যায়।

আমরা জানি নারীকে সহধর্মিণী বলে। কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুন্দর। সংসারে নারী ও পুরুষ সংসারধর্ম পালনে পরস্পরের সহায়ক। তাই তারা

সহধর্মিণী। বৈদিক যুগে নারী সত্যই সহধর্মিণীর স্থায় আচরণ করত। সেকালে যজ্ঞনিষ্পাদন ছিল ধর্মের বিশিষ্টতম অঙ্গ। আমরা দেখি বেদের একাধিক সূক্তে উল্লেখ আছে যে নারী ও পুরুষ এক সঙ্গে যজ্ঞনিষ্পাদন করছে। পত্নী শব্দটির অর্থও তাই সূচিত করে। পানিনি বলেন পতির সহিত যজ্ঞসংযোগ বোঝাতে পত্নী শব্দের উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে এই উক্তিটি পাই :

“হে উগ্র ইন্দ্র, মর্ত্য হোতা স্তোত্রাভিলাষী দেবতাদের স্তব করে স্ত্রী-পুরুষ যজ্ঞনিষ্পাদন করছে।”

(১।১৭৩।২)

এ হতে অনুমান করা যায় যে নারী ও পুরুষ উভয়ে এক সঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করত। উভয়েরই হোতা হবার অধিকার ছিল।

পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছে :

“যখন তুমি (অগ্নি) দম্পতীকে একান্তঃকরণ করে দাও, তারা তোমাকে বজ্র মত গব্যদ্বারা সিন্ধু করে।” (৫।৩।২)

পানিনিতে আচার্যের জ্যোতিষ রূপ হিসাবে দুটি শব্দ পাওয়া যায় : আচার্যী ও আচার্যণী। দুটির অর্থ ভিন্ন। আচার্যার অর্থ হল এমন মহিলা যিনি স্বয়ং আচার্যের কর্তব্য সম্পাদন করেন, অর্থাৎ অধ্যাপনা করেন। অপর পক্ষে আচার্যণীর অর্থ হল আচার্যের পত্নী। তিনি নিজের অধ্যাপনা করেন না, আচার্যের পত্নী হিসাবেই তাঁর মর্যাদা। এর একটি তাৎপর্য আছে। তা দেখায় সেকালে নারী বিদ্যাচর্চা করে অধ্যাপনার কর্তব্যও সম্পাদন করত।

এর থেকে আর মনে হয় সেকালে পুরুষের মত নারীর একাধিক সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল। তা না হলে নারী যজ্ঞকরবার বা অধ্যাপনা করবার অধিকার আসবে কি করে? আমরা জানি পুরুষের জন্ম অন্নগ্রাশন হতে বিবাহ পর্যন্ত দশটি সংস্কার এখনও চালু আছে। অপর পক্ষে নারীর বিবাহই একমাত্র সংস্কার রূপে স্বীকৃত। অল্প কোন বৈদিক সংস্কার মনু স্বীকার করেন না। কিন্তু একটি শ্লোক পাওয়া যায় যা বলে যে সেকালে মেয়েদেরও উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার ছিল। এটিও মনুর উক্তি বলেই প্রচলিত। শ্লোকটি এই :

পুরা কল্পে কুমারীণাং মৌজী বন্ধনমিযুতে।

অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা ॥

এ হতে বোঝা যায় বৈদিক যুগে মেয়েদের জন্ম মৌজীবন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে মৌজীবন্ধ উপনয়নকে সূচিত করে। তাদের সাবিত্রী মন্ত্র জপ ও অধ্যাপনেরও অধিকার ছিল। গুরুর কাছে শিক্ষা না পেলে এ সব অধিকারের যোগ্যতা

আসবে কি করে? সুতরাং এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে নামকরণ প্রভৃতি সংস্কারে পুরুষের যেমন অধিকার আছে, নারীরও বৈদিক যুগে তেমন অধিকার ছিল। পরে অমুদার দৃষ্টি প্রণোদিত হয়ে পুরুষচালিত সমাজ নারীকে সে সব অধিকার হতে বঞ্চিত করে কেবল মাত্র বিবাহ সংস্কারকেই অপরিবর্তিত রেখে দিয়েছে।

বৈদিক যুগে পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সম্প্রতি হিন্দুকোড প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সে ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই ঋষি ষাণ্ময়ঙ্ক্যর মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন। এমন কি বেদের সূক্ত অংশেও বহুবিবাহ প্রথার উল্লেখ পাই। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সংখ্যক সূক্তটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সূক্তটির দেবতা হলেন সপত্নীবানন, অর্থাৎ যে দেবতা সপত্নীকে বাধ্য করে বা অপমৃত করে। তা হতেই বোঝা যায় সেকালে বিবাহিতা নারী সপত্নী দ্বারা নিপীড়িত হত এবং অতিষ্ঠ হয়ে দেবতার কাছে তার অপসারণ প্রার্থনা করত। আরও কোতুকের কথা এই সূক্তের ঋষি হলেন নিজেও মহিলা, নাম ইন্দ্রাণী। নারী না হলে নারীর সমস্তা কে ভাল রকম অনুভব করবে?

সে কালে পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে কেউ আশ্চর্য হবে না; কিন্তু নারীর বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে অনেকেই নিশ্চিত অবাক হবেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে সে

প্রথা প্রচলন থাকার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অষ্টম মণ্ডলের ২৯ সূক্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে প্রসঙ্গত অশ্বিনী কুমার-দ্বয়ের বিষয় উল্লেখ আছে এবং তাঁরা যে একই সঙ্গে বাস করেন তা সরসভাবে বোঝাতে একটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশটির অনুবাদ উদ্ধৃত করলে উপমাটির পরিচয় সহজেই মিলবে। বলা হয়েছে :

“তুই জন অশ্বী, একই স্ত্রীর সহিত বাস করেন
এমন তুই পুরুষের মত, এক সঙ্গে বাস করেন!”

(ঋগ্বেদ ৮।২৯।৮)

উপমা সংগ্রহ হয় কল্পিত নয়, বাস্তব অবস্থায় দৃষ্ট দৃষ্টান্ত থেকে। স্মরণ্য এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে একই নারীর একাধিক স্বামী

বৈদিক যুগে থাকা সম্ভব ছিল।

আমার মনে হয় বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে একটি সূক্ত পাই যেখানে একটি মৃত পুরুষ এবং তার বিধবা পত্নীর কথা বলা হয়েছে। সেখানে যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় মৃত স্বামীকে ভূমির মধ্যে প্রোথিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। পরে তার স্বামীকে সমাহিত করা হলে বিধবা পত্নীকে সংসারে ফিরে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রে সূক্তটির প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

“এই সকল নারী বৈধব্যা হুঃখ অনুভব না করে
মনোমত পতিলাভ করে অঞ্জন ও ঘূতে স্পৃষ্ট হয়ে,
গৃহে প্রবেশ করুন।

“হে নারী সংসারে ফিরে চল, গাত্রোথান কর।
তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ সে গতানু-
অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যে তোমার
পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিল সেই পতির পত্নী
হয়ে যা যা কিছু কর্তব্য ছিল সবই তোমার করা
হয়েছে।”

(ঋগ্বেদ ১০।১৮।৭-৮)

এই ছুটি মন্ত্র এক সঙ্গে পড়লে মনে হয় পতির মৃত্যুর পর পত্নীকে আবার বিবাহ করে সংসারধর্ম পালনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পতির মৃত্যুর পর পত্নীর তারপ্রাপ্তি কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। কাজেই বৈধব্যজীবন যাপন করা অর্থহীন এমনই একটা ধারণা সেকালে সমাজজীবনে ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়।

হিন্দু মনে ঋষির স্থান সবার উচ্চে; কারণ তিনি বৈদিক মন্ত্রের জষ্ঠী। ঋগ্বেদে যে অসংখ্য সূক্ত আছে তাদের মধ্যে কতকগুলির ঋষি হিসাবে কয়েক জন মহিলার নাম উল্লিখিত হয়েছে। এঁরা হলেন অগস্ত্যের পত্নী লোণামুদ্রা অত্রিকণ্ডা বিশ্ববারা, অত্রিকণ্ডা অপালা, কক্ষীবৎ কণ্ডা ঘোষা, অজুণ কণ্ডা বাক এবং ইন্দ্রাণী। স্মরণ্য আমরা ছয়জন মহিলা ঋষির নাম পাই। এঁদের মধ্যে বাক ঋষির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য; কারণ এই সূক্তের মধ্যে গভীর তত্ত্বকথা আছে। পরবর্তীকালে উপনিষদেও যুগে ব্রহ্ম বা আত্মার যে পরিকল্পনা বিকাশলাভ করেছিল এই সূক্তে বীজাকারে তার চিন্তা বিদ্যুত হয়েছে। এর মূল কথা হল আত্মা সর্বব্যাপী। পুরাণের যুগে এই



সূক্তটিকে বৈদিক দেবীসূক্ত বলে গ্রহণ করে শক্তি পূজক তার মহত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমরা দেখি বৈদিক যুগে যেমন নারীকে সূক্তরচনার ভার দিয়ে তাকে সর্বাপেক্ষা সম্মানের কাজে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, উপনিষদের যুগেও সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। সে সময় মহিলারা ব্রহ্মবাদিনী দার্শনিক হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্ম বিজ্ঞায় অনুরাগী দুই মহিলার উল্লেখ পাই। প্রথমা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী। তিনি স্বামীর সম্পদকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারিণী হতে চেয়েছিলেন। এই কাহিনী বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী হল যতি আশ্রম অবলম্বন করবার আগে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই পত্নীকে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন “যেনাহং না মৃত্যু স্মাং কিমহং ভেন কুম্যাম্।” যা নিয়ে অমৃত্যু হতে পারবেন না তা নিয়ে তিনি কি করবেন? তার জগুই ব্রহ্ম

বিজ্ঞার অংশ চেয়েছিলেন। এ কাহিনী সেকালের নারীর পরাবিজ্ঞার প্রতি আকর্ষণের পরিচয় দেয়। তা বলে যে সে যুগে নারীর চিন্তা এবং ভাবনা সংসারকে অতিক্রম করে দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি ও আকৃষ্ট হয়।

অপর মহিলাটির নাম হল গার্গী। একই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর বিষয় উল্লেখ আছে। তাঁর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। সেকালে জনক রাজা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার জগু বিতর্ক সভা ডাকতেন। তাতে বিখ্যাত দার্শনিকরা নিমন্ত্রিত হয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। যিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে প্রমাণিত হতেন তাঁকে রাজা পুরস্কৃত করতেন। আমরা দেখি এই বিতর্ক সভায় গার্গীই যাজ্ঞবল্ক্যের সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নিয়েছেন। সুতরাং সে যুগে নারী ব্রহ্মবিজ্ঞা চর্চা করত এবং সে বিষয় পারদর্শিতা দেখিয়ে খ্যাতিও অর্জন করত। কাজেই প্রমাণিত হয় যে নারীর বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি সে যুগে পুরুষের সহিত সমান বলেই স্বীকৃত হত।

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র

স্মৃতিচারণ

রাধারানী দেবী

সময়টা উনিশ শো চৌত্রিশ থেকে সাইত্রিশের মধ্যে হবে। সঠিক সন তারিখ আমার মনে নেই। একদিন বিকেল বেলায় আমরা দুজনে অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎদার কাছে বেড়াতে গেছি—দেখি তিনি সেজেগুজে চুল আঁচড়ে, কোট পরে লাঠি হাতে নিয়ে একতলার বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। অচিরেই কোথাও বেরুবার জন্তে তৈরী।

আমাদের আসতে দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন,—“তাই তো, তোমরা এখন এলে! মুশকিল হোলো, আমি যে এখুনি বেরুচ্ছি। একটা জরুরী মীটিং-এ যেতেই হবে, সুভাষ এখুনি এসে পড়বে, আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সে। তোমরা এলে, অথচ আমি থাকতে পারছি না—”

শরৎদাকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখে আমার স্বামী বললেন—“তাতে কি হয়েছে। বিকেলে আজ কোথাও যাবার ছিল না, তাই এলুম। কোনো কাজে তো আসিনি। আপনি যেমন যাচ্ছেন যান, আমরা অন্য কোথাও ঘুরে আসি।” তখন শরৎদা

বললেন—“তা হলে যতক্ষণ সুভাষ না আসে, ততক্ষণ অস্বস্তি বোসো।”

আমরা বসলুম। গল্প করতে করতেই গেটের সামনে মোটর এসে দাঁড়ালো। গাড়ীর দোর খুলে নামলেন সুভাষচন্দ্র। শরৎদা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে গেলেন—“আরে আরে সুভাষ তুমি কেন নামলে, তুমি কেন নামলে, আমি তো রেডি! একদম রেডি হয়েই বসে আছি তোমার জন্তে। তুমি আবার কষ্ট করে নেমে আসচো কেন—আমি তো যাচ্ছিই।”

শরৎদার অতিরিক্ত ব্যস্ততায় সুভাষচন্দ্র একটু বিব্রত বোধ করলেন বলে মনে হোলো। মুখে বললেন—“আমি একটু জল খেতে নামলুম দাদা!” শরৎদার তখন আরও ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেলো। এক গ্লাস জলের জন্য চৌকামেচি ছোটোছোটো গুরু করে দিলেন। অন্যদের দিক থেকে জল আনতে নিজেই ছুটলেন। তাঁকে নিবৃত্ত করতে আমি গেলাম জলের ব্যবস্থায়। জল এলো। শরৎচন্দ্র আর সুভাষচন্দ্র ততক্ষণে বৈঠকখানায় বসে কংগ্রেসের তৎকালীন সমস্যা নিয়ে জরুরি আলোচনায় ডুবে গেছেন,

প্রদেশ, কংগ্রেসের ভিতরে তখন বেশ উত্তেজনাপূর্ণ সময় চলছে। শরৎদার বিচলিত কণ্ঠে সেই হুশিয়ারি উদ্বেগ, উত্তেজনা প্রতিকলিত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রের মুখের ভাবটি কিন্তু যেমন প্রশান্ত, তাঁর বাচনভঙ্গিও তেমনি সুস্থির, অনুভূত। তিনি শ্রিত মুখে, শাস্ত্র স্বরে আলোচনা করে চলেছেন। শরৎদার অঙ্গভঙ্গিতে, মুখাবয়বে, কণ্ঠস্বরে সর্বতঃ চাক্ষুষ্য পরিষ্কৃত।

বয়স্ক মানুষটির অনুপাতে অল্পবয়সী মানুষটিকেই বেশী স্বস্থ, শাস্ত্র দেখে সেদিন আমাদের যেন একটু লজ্জাই করতে লাগলো। কিন্তু শরৎদার কোনদিকে দৃকপাত নেই। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি এমন ভাবে বাক্যালাপ করছেন যেন তিনি একটি ছোট, সামান্য, দীনহীন ব্যক্তি, সুভাষচন্দ্রের মতো মহৎ নেতার সান্নিধ্যে আসতে পেয়ে ধস্ত হয়েছেন। এই বিসদৃশ আচরণ যে কেবল আমাদের মত নীরব দর্শকদের পক্ষেই অস্বস্তিজনক ঠেকেছিল তা নয়; সুভাষচন্দ্রকেও কম পীড়িত করছিল না শরৎচন্দ্রের এই আত্মহারা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কনিষ্ঠের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধায় তিনি নিজের বয়স ও পদের মর্যাদা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

সামাজিক রীতিনীতির চিরচরিত মানদণ্ডটি শরৎচন্দ্রের স্বভাবের ধারে কাছেও স্থান পায়নি। লেখক হিসেবে তাঁর হীনমন্ত্রতা ছিল না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো লেখকের চেয়ে তিনি নিজেকে নিম্নজ্ঞান করতেন না। কিন্তু জীবনের অস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তাঁরা সার্থক ও অস্বস্তি ছিলেন—

তাঁদের প্রত্যেকের তুলনাতেই শরৎচন্দ্র নিজেকে তুচ্ছ, দীনাত্তরীন অনুভব করতেন। এ জগতে আমাদের মনে দুঃখ ও ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করা অর্থহীন। সুভাষচন্দ্রের স্বীয় ক্ষেত্রে তাঁর মহত্বের বোধের নিশ্চয় তুলনা খুঁজতে যাবোনা। কিন্তু, শরৎদার ক্ষেত্র তো ভিন্ন। সেখানে তিনিও ছিলেন অনগ্র। অথচ নিজেকে তিনি সেদিন সুভাষচন্দ্রের কাছে যেভাবে স্বেচ্ছায় নীচে নামিয়ে রাখাছিলেন, তাতে সুভাষচন্দ্রেরও যথেষ্ট অস্বস্তি ও সংকোচের কারণ ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্রের ভদ্র বিনীত আচরণে সেই অস্বস্তি চাপা ছিল না। জল পাওয়ার পরে আরও কয়েক মিনিট রাজনীতি আলোচনা করে ওঁরা দুজনে উঠতে গেলেন গাড়ীতে। শরৎদা সমানেই সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে গাড়ীতে ওঠার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন,—প্রায় সেই প্রবাদ—কথিত লক্ষ্মীয়েব লৌকিকতার মতই দেখাতে লাগলো ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত গাড়ীতে দুজনে উপবিষ্ট হলেন, গাড়ীটি রওনা হয়ে পেল।

এই ঘটনাটি পরে আমরা স্বামী জীতে অনেক বার আলোচনা করেছি। দুজনের চরিত্রের আশ্চর্য বৈপরীত্য এমন ফুটে উঠেছিল সেদিন, সেই বিকেলের আর্চরণে। একজন সংযত, ধীর-স্থির—অথচ তিনিই কর্মবাস্ত, সক্রিয় সৈনিক। অস্বস্তি বাহ্যত অস্থির, চঞ্চল—কার্যতঃ যদিও তিনি ধ্যানী, শিল্প-তপস্বী।

মুজিববাদ : পুনশ্চ

চিঠি

অন্নদাশঙ্কর রায়

(খোন্দকার মোহাম্মাদ ইলিয়াসকে লিখিত পত্রের অংশ)

উভয়পক্ষের মধ্যে যখন একটা এগ্রিমেন্ট হয় ও সেই অনুসারে ক্ষমতার হস্তান্তর হয় তখন তাকে বিপ্লব বলে না। অথচ ভারতে কোনো বিপ্লব হয়নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করে ব্রিটিশ ভারতকে দুই ডোমিনিয়নে ভাগ করে ও দুই ডোমিনিয়নকেই আত্মকর্তৃত্বের স্বাধীনতা দেয়। একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত ছিল যে এরা ব্রিটেনের সঙ্গে একই কমনওয়েলথের শরিক হবে। তার মানে এরা কখনো ব্রিটেনের বিপক্ষে যাবে না বা ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে জোট পাকাবে না। জবাহরলাল এই শর্তে রাজী হয়ে যান। মাউন্টব্যাটেনও রাজী হন যে ভারতের যে অংশ জবাহরলালের ভাগে পড়বে সে অংশ রিপাবলিক হবে। কমনওয়েলথ নামক গোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় রিপাবলিক থাকবে। ইংরেজরা জোর করেনি, কিন্তু আশা করেছিল যে “ভারত” নামক রিপাবলিক আত্মকর্তৃত্বক ব্যাপারে ইংরেজ মার্কিনদের সঙ্গে জোটবন্দী হবে, কিন্তু “ভারত” তাতে নারাজ হয়। সে কোনো শিবিরেই জোটবন্দী হয় না। সে হয় জোটনিরপেক্ষ।

ইংরেজ বা রুশ কেউ তার শত্রুও নয়, কেউ তার মিত্রও নয়। এর নাম নন-অ্যালাইনমেন্ট।

যেদেশে বিপ্লবই ঘটল না সে দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বিপ্লব ঘটেছে বলা যায় কি? সেটা ঘটে পারত, যদি হিন্দু মুসলমান আত্মঘাতী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত না হতো। যদি কলকাতায় নোয়াখালীতে বিহারে ও পাঞ্জাবে জনগণই জন-গণকে হত্যা না করত। তা হলে শুধু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবও ঘটতে পারত। গান্ধীজী তো ১৯৪২ সালেই লুইস ফিশারকে বলেছিলেন যে প্রজারা জমিদারের জমি দখল করতে পারে ও জমিদাররা পালিয়ে গিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। গান্ধীজীর ১৯৪২ সালের কথাবার্তা মোটামুটি লেনিনেরই মতো। সেদিন তিনি কোনো আপস প্রত্যাশা করেননি, ক্ষমতার হস্তান্তরে তাঁর রুচি ছিল না, কারণ তার প্রচ্ছন্ন শর্ত ছিল যুদ্ধে যোগদান, তাতে তাঁর নৈতিক আপত্তি। যুদ্ধের পরে তাঁর সে আপত্তি তিনি প্রত্যাহার করেন, ক্ষমতার হস্তান্তরে সম্মত হন,

কিন্তু দেশভাগে নয়। শেষপর্যন্ত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীরা সে কাজ করেন। গান্ধীজী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল গ্রামে ও তাঁত চরকায়, শহরে নয়, কলকারখানায় নয়। সুতরাং ধনোৎপাদনের খুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নয়। বুর্জোয়াদের প্রধান ভরসা হচ্ছে আমি। তিনি আমার সাহায্য চাননি ও নেননি, নিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র ভরসা জনগণের অহিংস আত্মশক্তি। অহিংস পদ্ধতিতে যদি বিপ্লব ঘটত তবে সেটা হতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নয়, নিরস্ত্র জনগণতান্ত্রিক। সৈদিক থেকে গান্ধীজীর কাজ অসমাপ্ত পড়ে রয়েছে। হয়তো আর একদিন আর কেউ সমাপ্ত করবে। কিংবা আরো আগে সশস্ত্র জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটবে। তখন সেটা মার্কসের শিক্ষায় ঘটবে, না আর কারো শিক্ষায় তা এখন থেকে অনুমান করা যায় না সেটা যে আদৌ ঘটবেই এমন কোনো কথা নেই। ঘটলে যে সারা ভারত জুড়ে ঘটবে তাও বলা শক্ত।

মার্কস লেনিন নিশ্চয়ই মহাপুরুষ ও মহাকীর্তিমান, কিন্তু তাঁদের শিক্ষা সব দেশ মেনে নেয়নি, রাশিয়াতেও যে-ছুটি কারণে সফল হয়েছে ভবিষ্যতে সে-ছুটি কারণ কার্যকরী না হতেও পারে। যথা, কমিউনিস্ট পার্টি ও রেড আমি। কমিউনিজম বরণ না করেও বহু দেশ সোশিয়ালিস্ট হয়েছে, সোশিয়ালিস্ট না হয়েও বহু দেশ শ্রমিক কৃষকদের

অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম যেমন সব দেশ গ্রহণ করেনি মার্কস লেনিনবাদও তেমনি সব দেশ গ্রহণ করেনি। করবেও না। সুতরাং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যে সেই পথে তা আমি জোর করে বলতে পারব না। যতদূর বুঝতে পারি মুজিব সাহেব সেটা পরিহার করতেই চান। কিন্তু সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কী বোঝেন সেটা তাঁর বক্তৃতা বা লেখা বা কার্যকলাপ থেকে এখনো স্পষ্ট হয়নি। ব্যাঙ্ক বীমা বড় বড় কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করাই সমাজতন্ত্র নয়। ফ্রান্সে তো ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেছে। রেনোর মোটর কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেছে। ইংলণ্ডে তো বহু ব্যাপার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেছে। অধিকাংশ ক্যাপিটালিস্ট দেশেই এখন ক্রমবর্ধমান পাবলিক সেকটর। আসল পরীক্ষার সময় আসবে যখন চাষবাস রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হবে, মুজিব সাহেব কি জনগণের ভোট নিয়ে সে কাজ করতে পারবেন? যদি ভোট নিয়ে করতে না পারেন তবে তাঁকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতি ছেড়ে ডিক্টেটরী করতে হবে। তা হলে চারটি স্তরের একটি স্তর ভেঙে পড়বে। বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র নির্ভর করছে চাষীর সহযোগিতার উপরে, কারণ দেশের চৌদ্দ আনা লোকই চাষী। এরা কি রাষ্ট্রীয় খামারে বা যৌথ খামারে রাজী হবে? এদের উপর কি রেড আমি জেলিয়ে দিতে হবে? সে কাজ কি মুজিব সাহেব পছন্দ করবেন?

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের কাছে কী আশা করতে করতে পারা যায়, কী পারা যায় না এ বিষয়ে

আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। কারণ আমরা এর সঙ্গে অল্পদিন হলো পরিচিত। নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কেউ ভোট দেয় না। চাষীরাও এর ব্যতিক্রম না। কোনো একটি পার্টি যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে জমিদারি স্বত্ব বা মধ্যস্বত্ব লোপ করবে তবে চাষীরা খুশি হয়েই ভোট দেবে। কিন্তু সে যদি বলে রায়তী স্বত্ব কোর্ক স্বত্ব লোপ করবে ও সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয়কৃত করবে তা হলে ভূমিহীন চাষী বা বর্গাদার ভিন্ন আর কোনো চাষী ভোট দেবে না। তার উপর সে দল যদি বলে যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমি ছেড়ে দিতে হবে তো চাষীরা রীতিমতো ক্ষেপে যাবে। আর নির্বাচনের ব্যালট বাক্সে অপর কোনো দলকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেবে, যে দল চাষীর রায়তী স্বত্ব হাত দেবে না। এ রকম দল ভারতেও আছে, বাংলাদেশেও আছে। সমাজতন্ত্র বলতে যদি বোঝায় উৎপাদনের যাবতীয় উপায়কে রাষ্ট্রীয়কৃত করা ও ক্ষতিপূরণ দিতে না পারলে বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্রীয়কৃত করা তবে চাষীরা বলবে, আমরা তেমন সমাজতন্ত্র চাইনে। যতদূর পরের উপর দিয়ে সমাজতন্ত্রের রথ চলবে ততদিন আমরাও রথের দড়ি টানব। কিন্তু যেই আমাদের উপর দিয়ে চলতে আরম্ভ করবে অমনি আমরা সে রথকে অচল করে তুলব।

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর দ্বারা ভূমি ব্যবস্থার

পাদটীকা : এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। কিন্তু ইলিয়াস সাহেবকে পাঠানো হয়নি কিংবা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশের জন্য পাঠাবার পরে সংবাদ পাই যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব নিহত। তাঁর জন্য আমি শোকাবুল। ইলিয়াস সাহেবের জন্যও চিন্তাকুল।

অমদাশঙ্কর রায়

আমূল পরিবর্তন সম্ভব না হলে একদিন সোভিয়েট রাশিয়ার মতো বা চীনের মতো বিপ্লবের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু সেটা এতট রক্তক্ষয়ী যে শান্তির সময় তার দায়িত্ব নিতে কোনো দলই আগ্রহ হব না। হবে যুদ্ধের সময়। ভূমিহীন চাষী ও ক্ষুদ্র চাষী হয়তো বলবে সব জমি রাষ্ট্রীয়কৃত হোক, তাতেই আমার স্বার্থরক্ষা। কিন্তু অধিকাংশ চাষী তাতে নারাজ হবে। সুতরাং বিপ্লবটা অচিরেই গৃহযুদ্ধের আকার নেবে ও দুই শিবিরই থাকবে চাষীদের দুই দল। আমি নিজে চাষীর মালিকানায় বিশ্বাস করি। সেইজন্মে সমাজতন্ত্রে যোল আনা বিশ্বাস করিনে। বড় বড় মালিকদের মালিকানা রাষ্ট্র তার স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারে ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। এই পর্য্যন্ত যেতে আমি রাজী। কিন্তু বিনা ক্ষতিপূরণে সাধারণ চাষীর দুই বিঘা জমি বাজেয়াপ্ত করা আমার মতে সামাজিক জায় নয়, সুতরাং সমাজতন্ত্রের যেটা সারবস্তু সেটা তার মধ্যে নেই। সারবস্তু হচ্ছে সামাজিক জায়। সোশ্যাল জাস্টিস্।

তা ছাড়া রেড আর্মির সাহায্যে জমি বাজেয়াপ্ত ও কৃষক বিভাগ বা নিধন আমি কখনো সমর্থন করতে পারব না। চাষী সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তাঁতী সম্বন্ধেও তাই। মুদি সম্বন্ধেও তাই। রুই কাঙালকে ধরতে চান ধরুন, চুনোপুঁটিকে রেহাই দিন। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের কোন্‌খানে দাঁড়ি টানতে হবে সেটা স্থির করুন। [১৯৭৩]

স্মরসিক

আশ্রমিক

রসরচনা

জুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

“সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।”

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যেমন দুই ছুঁদাস্ত
বালকের সমাগম হতো, তেমনি বেশ রসিক ছেলেও
আসতো।

স্মরসিক রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে নিতান্ত
নীরস বালকের মধ্যেও রস সঞ্চার হতো।
সত্যিকারের রসিক বালকের অন্তরেই রসতো
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো।

১৯১৩-১৪ সালের এমনি একটি রসিক ছেলে
ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এসে জুটেছিলেন।

১৯২৪ সালে তিনি যখন বিশ্বভারতীর প্রবীণ
বিদ্যার্থী আমি তখন সবেমাত্র প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীর
ছাত্র।

একদিন তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন।

আমি গিয়ে দেখি—তিনি আরামে বেশ খোস
মেজাজে হাসিমুখে বসে আছেন। দেখেই মনে
হলো, আজ বেশ জমাবেন।

হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন :

“গুরুদেবের ‘সামান্য কতি’ কবিতাটা মনে আছে
তো?”

আমি বললাম, “নিশ্চয়ই! ও কবিতা কি
ভুলবার?”

“শেষের দিকটা মুখস্থ আছে?”

বলেই তিনি নিজেই আরম্ভ করলেন!

“—যতদিন তুমি আছ রাজ্যরাণী
দীনের কুটরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—

বুঝাব তোমারে নিদয়ে।”

রাজার আদেশে কিংকরী গাসি

বসন ফেলিল খুলিয়া—

অরুণ বরন অম্বর খানি

নির্মম করে খুলে দিল টানি,

ভিখারি নারীর চীরবাস আনি

দিল নারীদেহে তুলিয়া।—

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,

‘মাগিবে ছয়ায়ে ছয়ায়ে’—

এক প্রহরের লীলায় তোমায়

যে-কটি কুটির হল ছারখার
যতদিনে পার সে-কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে !
বৎসর কাল দিলেন সময়
তারপর ফিরে আসিয়া—”

আবুস্তি শেষ করে তিনি বললেন :
“এরপরের ঘটনা কিছু জান ?”

প্রশ্ন শুনে আমি হতবাক ।

তিনি বললেন : “আরে একটা আন্দাজই
করো না !”

আমিও নিতান্ত হাঁদা ছিলাম না । একটু ভেবে
উত্তর দিলাম :

“বেশি দিন তাঁকে ভিক্ষা করতে হয়নি ।
রাজরাণী তো ? প্রত্যেক বাড়ী থেকেই যথেষ্ট
সাহায্য পেয়ে গেলেন । শেঠেরা তো ছপ্পর ভরে
দিল !”

“ভুল ! ভুল ! একেবারে ভুল !”

তিনি আমার কল্পনার গোড়াতেই কোপ
মারলেন ।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম :

“আপনিই বলুন ।”

“রাজরাণী ! তার উপর ঐরূপ দাস্তিক । তিনি
করবেন প্রজার ঘরে ভিক্ষা ! তুমি কি পাগল ?”

“তাহ’লে করলেন কি ?”

“রাজরাণীর হাঁটারই শক্তি নাই । রাজপ্রাসাদের
‘পুষ্প বাটিকায় বড় জোর ছ’চার কদম হাঁটতেন ।
তিনি হেঁটে হেঁটে কতদূর আর যেতে পারেন ।

সিকি মাইল কোনো রকমে হেঁটে নির্জন এক
‘আরাম’-এর ছায়াছন্ন বিটপীমূলে বসে পড়লেন ।

অপরাজে পার্শ্ব দিয়ে এক রথ যেতে দেখে, তার
সারথিকে ডাকলেন । রথটি ভাড়া খাটে । তখন
খালি যাচ্ছিল ।

সারথি কাছে এলো । কিন্তু ভিখারিণীকে দেখে
তখনই রথ ঘুরিয়ে নিলো ।

রাণীর বজ্র কঠিন আহ্বানে আবার সে ফিরে
এলো । ভিখারিণী বেশে থাকলেও রাণী ভো !
তাঁর গাদেশের সুরই আলাদা ।

সারথি বিনীতভাবে বললে :

‘আর্যে আরোহণ করুন ।’

রাণী রথে চড়ে তার দরজা জানালা বন্ধ করে
দিলেন ।

সারথি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে :

‘আর্যে, কোন্ স্থান আপনার গন্তব্য ?’

‘কাশীরাজের রাজ্যের সীমান্ত ।’

‘আর্যে, সে যে বহু যোজন ।’

‘তোমাকে আশাতীত পারিশ্রমিক দেব ।’

সারথি এদার সাহস সঞ্চয় করে বললে :

‘আর্যে, এক শত দীনারের কমে যেতে
পারবো না ।’

সারথির সন্দেহ হলো এক শ’ দূরে থাক, ছ’
একটা দীনারই এর কাছে আছে কি না সন্দেহ !

‘দীনার কি জানো ?’ হঠাৎ তিনি আমাকে
প্রশ্ন করে বললেন ।

আমি সবে কলেজে ঢুকেছি—‘দীনার’ কী

জানি না। তিনি স্নাতকোত্তর বিভাগের গবেষক, অনেক কিছু জানেন। বললেন :

“দীনার হলো স্বর্ণমুদ্রা—সোনার মোহর! এখন তো চোখেই দেখা যায় না। সে-যুগে রৌপ্যমুদ্রারই ‘চল’ ছিল না। আজকের মত এই নিকট ধাতুর মুদ্রা! এ তাঁদের কল্পনাতেও আসতো না।

যাক। রাণী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন :

‘তথাস্তু!’—অর্থাৎ তাই পাবে।

সারথির মনের সংশয় যায় না। সে করজোড়ে বজ্র :

‘আর্ষে! আমি দরিদ্র! এই আমার জীবিকা। গৃহে সম্ভান-সম্ভতির অভাব নাই! তারা সব আমারই পোস্ত!

‘তুমি কি আমাকে নিষ্কিঞ্চন মনে করেছ? এই দেখ! এর মূল্য জ্ঞান?’ এই বলে তিনি একটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় বের করলেন।”

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম :

“সমস্ত অলংকার? এমন কি ভালো শাড়ীখানি পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়েছিল! আংটি কি রাজার নজরে পড়েনি?”

তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন :

“তুমি নিতান্ত সরল। কড়া করে বললে বলতে হয় নির্বোধ। নারী চরিত্রের তুমি কিছুই বোঝো না।”

বছর খানেক আগে তিনি বিবাহ করেছেন—সুতরাং আমাকে একথা বলার অধিকার তাঁর আছে। তাই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম :

“আংটি টি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?”

“মুখের ভিতর!

ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে রাণী একটি কথাও বলেন নি। সুতরাং মুখের ভিতর আংটি থাকলেও ধরা পড়েন নি। যাক! তার পরে কী হোলো শোনো।

রথ তখন এক আলোকোজ্জ্বল ‘রথ্যা’^২ দিয়ে চলেছে। ছ’পাশে সারি সারি সুসজ্জিত বিপণি। রাণী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন!

‘ওই শ্রেষ্ঠী স্বর্ণকারের বিপনীতে গিয়ে, এই অঙ্গুরীয় দেখাও। মূল্য জ্ঞানতে পারবে!’

সারথি আদেশ পালন করলে।

অঙ্গুরীয় দেখে শ্রেষ্ঠী স্তম্ভিত। সে বললে—
‘এ যে মহার্য বস্ত্র! এর মধ্যের হীরার মূল্যই, সহস্র দীনার।’

সারথি পরিতুষ্ট হয়ে রথ চালাতে লাগলো। জোর কদমে অশ্বযুগল চলেছে, যোজনের পর যোজন অতিক্রম করছে। রাত্রি অতিক্রান্ত! পরদিনও কেটে গেলো! তার পরের দিন সন্ধ্যায় পান্থবর্তী রাজ্যে রথ অবশ্য করলো।

পশ্চিমঘো সারথি এবং অশ্বযুগল স্নানাহার করে। রাণীর কিন্তু উপরাসে কাটে। সারথির শত অতুরোধ—উপরোধেও তিনি কোন খাণ্ড গ্রহণ করেন নি। অন্তরে তাঁর প্রতিজ্ঞা—কাশীরাজ্যে জলম্পর্শ করবেন না।

সারথিকে তিনি আদেশ দিলেন :

‘রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বারে রথ নিয়ে চলে!’

✓ রথ থামা মাত্র রাণী নেবে পড়লেন। অতঃপর
ক্রম পদে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ।”

১) “দ্বাররক্ষী বাধা দিলেন না।” আমার বিস্মিত
প্রশ্ন।

“গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যদি ভিখারির বেশে
কোনো রাজবাড়ীতে ঢোকেন—কোনো দ্বাররক্ষী
বাধা দেবে?” দাদার শাপটা প্রশ্ন!

“রাজরাণী যে-বেশেই থাকুন, তাঁর আকৃতি-
প্রকৃতি চাল-চলন সবই রাজকীয়—সামান্য দ্বাররক্ষী
তাঁকে বাধা দেবে কি?”

২) প্রাসাদে প্রবেশ করে, মহলের পর মহল
অতিক্রম করে চলেছেন। ক্রান্ত বিশ্বস্ত! ক্ষুধাও
তৃষ্ণাও ক্রিয়! কিন্তু রাজরাণীর মানসিক ভেজ যাবে
কোথায়?

৩) শেষে সম্রাজ্ঞীর স্বকীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে
তাঁর ফ্রোড়ে নিজের শ্রান্ত অবসন্ন দেহ সমর্পণ
করলেন। হৃদয়ের অবরুদ্ধ ক্রন্দন আর-বাধা
মানলো না।”

“এ রাজ্ঞী কি তাঁর পূর্ব পরিচিত?” আমার
প্রশ্ন।

মূর্খ! সেই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী তাঁর জননী।”

“তারপর—”

“এর পরেও আবার তারপর। তুমি বাপু বড়
বেরসিক?”

এই বলে দাদা উঠে পড়লেন।

১. আরাম—আরামপ্রদ, স্থান, রমণীয় ফুলফলের
বাগান।

২. রথ্যা—রথচলার পথ, রাজপথ, রাস্তা।

কিন্নরশঙ্কর সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ

এই এক সময়

গত দশ বছরের সময়সীমায় প্রকাশিত কবিতাবলী
থেকে অর্ধশতাব্দিক কবিতার সুনির্বাচিত সংকলন।
‘স্বপ্ন-কামনা’ ‘স্বর ও অস্বাস্থ্য কবিতা’ ও দিনযাপন’-এ
কবি যে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন সমকালীন
সমাজ-জীবনের গ্রেম ও অপ্রেমের মধ্যে তা আরো
উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কবি
অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায়: ‘এ বড়ো আশ্চর্য দেখা।’

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত অঙ্কিত মনোরম প্রচ্ছদ

দাম : পাঁচ টাকা

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬ বিধান সরণি কলিকাতা-৬

লেখক : মবায় গ্রন্থ বিপণি

ই-৯২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২



পরশমণির সন্ধানে

রাজবিরজ্ঞান দাশগুপ্ত

মানুষ অমৃত পিয়াসী। সৃষ্টির প্রথম প্রহরেই শুরু তার অমৃতের সন্ধান। এই অমৃত সন্ধানের ইতিহাসই মানুষের মুখ্য ইতিহাস, অজস্রব গোণমাত্র। এরই জগৎ সে যুগে যুগে খুঁজে ফিরছে পরশমণি, যার স্পর্শে মানুষ নিমেষে উত্তীর্ণ হবে আনন্দময় অমৃত লোকে, জীবনের দ্বন্দ্ব, দুঃখ গ্লানি পিছে ফেলে। জীবন যুদ্ধে পর্যুদন্ত মমুর সন্ততি বার বার ভ্রম করে হলাহল পান করেছে, তবু কিন্তু সে থামে নি, পরাজয় মানেনি, কখনও মানবে না। দুঃখকে সে জয় করবেই অমৃত সে খুঁজে বার করবেই, তবেই বিধাতার বিজ্ঞোহী আত্মজ্ঞ শাস্ত হ'বে, এই হ'ল মানবের বিধিলিপি।

যুগ যুগান্ত ধরে মানুষের মিছিল চলেছে “সেনার হবিণের” খোঁজে। এতকাল ধরে যাজ্ঞিক পুরুতের দলই শোভা পেয়েছেন মিছিলের পুরো ভাগে। মনোমন্দিরের ছায়ায় এতদিন তাঁরাই প্রহরা দিয়ে রেখেছে, কিন্তু তাঁরাও রয়েছে ছায়ার বাইরে, অন্তর মহলে তাঁই পাননি তাঁরা। সেখানকার নিঃসপ্ত অধিকার ছিল সাধক মরমীদের। সাধক সহজিয়া কবি প্রশ্ন করেছিলেন “ওরে নিষ্ঠুর

গরজি তাই মানস মুকুল ভাজবি আগুনে?” সাধক বলেন—ওরে! এত তাড়াছড়োর ব্যাপার নয়, একে পাঁচনি মেরে তাড়িয়ে নেওয়া চলে না, তোমার গরজের ধার সে ধারে না, ফোটে না সে “সবুর বিহনে।” “মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।” ধৈর্য ধরে তার সাধনা করো, অপেক্ষা করো পরম লগ্নের জগৎ। খুলে যাবে স্বপ্নলোকের দ্বার, তোমার মনের ছায়া, তখন শুধু আনন্দ, কেবল আনন্দ।

আবার আরেকদল, তারাও সাধু সন্ন্যাসী, চলেছেন কুচ্ছসাধনের পথে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে বসেছেন যোগাসনে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, প্রাকৃতিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছেন প্রায় অনাহারে ও অনিদ্রায়, চলেছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দেহের চরম নির্যাতন। আশা এই পথে দেহের শৃঙ্খল থেকে মনের মুক্তি। এই পথেই নাকি শুরু করেছিলেন শাক্যসিংহ বোধিষ্ঠের অন্বেষণ, এবং এ পথেও কেউ কেউ সফল হয়েছেন। এই কিছু সংখ্যকের সাফল্য, আরও আগ্রহ ব্যাকুল করে তুলেছে বৃহত্তর বিফল গোষ্ঠীকে, তাই চলেছে সেই চিরন্তন অন্বেষণ মানুষের

ইতিহাসের মর্মধারা রূপে। সেই ধারা বেয়েই এগিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক-আধুনিক জ্ঞানার্থক। প্রতিজ্ঞা তাঁদের স্বপ্নলোকের চাবিকাঠি খুঁজে বার করা, তত তাঁদের আপামর সাধারণের হাতে সেই সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। এতদিন এই অমৃতের আশ্বাদ পেয়েছে অতি স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবানেরা, বলা চলে কোটিতে গোটিক, এ ছিল বহুজনের সাধের অতীত। এবারের সাধনা এই সাধারণের জন্ত, বহু জনের হিতকামনায়।

প্রথম দিকেই বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়ল সাধু সন্ন্যাসীদের ক্রিয়া কাণ্ডের ওপর। এক দিকে তাদের কঠোর কৃচ্ছ সাধন—জপতপ, উপবাস অনিদ্ৰা, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় প্রকৃতির প্রকোপকে উপেক্ষা করে দেহের কঠিন নিগ্রহ, অপরদিকে রয়েছে সেমরসাদি অমৃতের বিকল্প সেবন। উভয়ের উদ্দেশ্যই এক—অতীক্ষ্মিয়ার সাযুজ্য লাভ। দুটি প্রক্রিয়াই অঙ্গাদি ভাবে যুক্ত। আলডুঙ্গ হাক্সলি লিখেছেন—In many societies at many levels of civilization attempts have been made to fuse drug intoxication with God intoxication. প্রতিদেশে অতি জ্ঞাতির ধর্মীয় তথা সংস্কৃতিতে, লোক গাঁথায় এবং ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু কেন এই কঠোর কৃচ্ছসাধন, কেন এই কঠিন দৈহিক নিগ্রহ? এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন বৈজ্ঞানিক। তাঁদের মতে এই উপবাস, অনিদ্ৰা প্রমুখ প্রক্রিয়াগুলি দেহাভ্যন্তরস্থ জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া কলাপে

প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটায়, বিশেষ করে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডলীতে এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তন সাধকের অনুভূতিতে ভোলে প্রবল আলোড়ন, যেটাকে সাধক মনে করে দিব্যানুভূতি। মাদকদ্রব্য সমূহেরও এ একই মৌলিক ক্রিয়া। সুতরাং বৈজ্ঞানিকদের প্রথম ও প্রধান প্রচেষ্টা হল বিভিন্নদেশের সভ্য ও তথাকথিত অসভ্য অধিবাসীদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা করে তাদের ব্যবহৃত ঔষধি এবং ঔষধি সংগ্রহ করা এবং বৈজ্ঞানিক বিধিমত সেগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। বিগত তিন দশক ধরে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যাপারে যুক্ত হয়েছেন রসায়নিক, জৈব রসায়নিক, ভেষজবিদ এবং মনোবিদগণ। সঙ্গে রয়েছেন শারীরবৃত্তবিদ এবং শারীরস্থানবিদ মহাশয়েরা। এঁদের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন কতকগুলি অদ্ভুত প্রক্রিয়াজীবী ভেষজ আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি আবার এই ভেষজগুলির মাধ্যমেই মানব মনের গভীর রহস্য ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। আবার এই ভেষজগুলির ছায়াবলম্বনে, অথবা এদের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নতুন নতুন ঔষধও তৈয়ারী হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মানুষের হাতে এক অমোঘ অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন।

এই নবপর্যায়ের ঔষধগুলির মধ্যে দুইটির সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। একটি এসেছে সুদূর অতীতের অন্ধ গুহা থেকে অপরটি সৃষ্টি করেছে রাসায়নিক সাম্প্রতিক কালে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তিক রাজ্য ও উত্তর মেক্সিকোর সাধারণভাবে রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত আদি

বাসীরা তাঁদের ধর্মালুষ্ঠানে স্থানীয় একরকম ফণীমনসার ফল বা বীচি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করত এবং সেই প্রসাদীরা প্রসাদে এক আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হত। এই ফণীমনসার চলতি নাম হ'ল পিয়োট (Pyote) এবং বীচিগুলিকে বলা হয় Pyote buttons. বৈজ্ঞানিকেরা পিয়োট বাটনের মধ্য থেকে Mescaline নামে একটি দ্রব্য আহরণ করেছেন, এবং বর্তমানে mescaline ল্যাবরেটরিতেই সংশ্লেষিত (Synthesise) হচ্ছে। এই mesca-line সেবনে মনোজগতে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে, সেবনকারি যে অচিন্তনীয় আনন্দরসে মগ্ন হয় তার অপূর্ব বর্ণনা পণ্ডিত প্রবর আলডুস হাক্সলি পর পর দুখানি গ্রন্থে বিবৃত করে তার বিচার করেছেন। বই দুখানার নাম হ'ল The Door of Perception এবং Heaven & Hell.

অপর ঔষধটি হ'ল Lysergic Acid Diethylamide এবং সংক্ষেপে L. S. D. এবং এটি সংশ্লেষণ করেছেন হফম্যান নামে (Hoffman) সুইজারল্যান্ডের এক রাসায়নিক। এর মৌল উপাদান হচ্ছে বহু পরিচিত জরায়ু রক্তক্ষরণে যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত আর্গট (Ergot) নামক ঔষধ। এই আবিষ্কারের কাহিনী উপজ্ঞানের মতই রমণীয়।

Mescaline সম্বন্ধে William James বলেছেন—it stimulates the mystical faculties in human nature. Huxleyর মতে mescaline মানব মনকে চৈতন্যলোকে উত্তীর্ণ

করে :—it introduces the taker into the other world of visionary experience and it gives him a sense of solidarity with his fellow worshippers, with human beings at large and with the divine nature of things. L. S. D. সেবনেও এই রকম উত্তরণ সম্ভব। সজ্ঞান (conscious) এবং অসজ্ঞানের মধ্যকার ঘরনিকা উত্তোলন করে L. S. D.। মানুষ তখন মনের গভীরে ডুব দেয়। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। স্বপ্নালোকে অবগাহন করে মানব অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ লাভ করে। মানুষ তখন অনুভব করতে পারে যে ঈশ্বরই প্রেম, প্রেমই ঈশ্বর।

তাহলে কি মানুষ সত্যি সত্যিই পরশমণির সন্ধান পেয়েছে বা পেতে চলেছে? চতুর্দিকে একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেল। এ যে সহজিয়া পন্থার চাইতেও সহজতর পথ। একেবারে তুড়ি মেয়ে আকাশের ঘুড়িকে পেছনে ফেলে মহাশূণ্ডে আলোক-সাগরে ভেসে বেড়ানোর আহ্বান। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল মেসকালিন, এল. এস. ডি নিয়ে। গড়ে উঠল দেশে বিদেশে মৈত্রী সত্ত্ব, ভ্রাতৃসত্ত্ব, এই সকল অমৃত-পিয়াসীদের।

অস্তদিকে শুরু হ'ল অন্বেষণ, নূতন নূতন ঔষধি ঔষধির। সকলেরই দৃষ্টি পড়ল সনাতন ভারতের ওপর। সেখানে সব তৈয়ারীই ছিল একেবারে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদী গঞ্জিকা আর সেই অবিচ্ছেদ্য ত্রয়ীর অপর দুটি ভাগ ও চরম। এক

লহমায় হরিজন পংতি থেকে উত্তীর্ণ হ'ল গঞ্জিকা বর্ণ
সোপানের উচ্চতম পৈঠায়। জুফে নিল সমাদরে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলি। গাঁজার কিন্তু নাম
পাণ্টে গেল, তার সংস্কৃত নাম করণ হল মরিছানা
(Marijuana) এই অঘেষণ পর্বেই আরও
কয়েকটি ভারতীয় ওষধি পাওয়া গেল যারা অল্প-
বিস্তর ঐ উৎসারিনী শক্তির আধার। একটিকে
পাওয়া গেল বঙ্গললনার পানের বাটায়। নাম যার
(জায়ফল বা Nutmeg)। আর একটির সন্ধান
এল কবরেজী গাছ গাছড়ার মধ্যে তার নাম
বচ, সর্দি কাশি ও কফের ঔষধ হিসেবে যার
প্রসিদ্ধি। ছ ছ করে দাম বেড়ে গেল বচ এবং
জায়ফলের। গাঁজা ভাং-এর চোরাচালানির খবর
এখন সারা পৃথিবীর সেরা খবর। বড় বড়
রাজপুরুষ এবং তাঁদের পুত্রকলত্র থেকে
একেবারে চুনোপুঁটি পর্যন্ত এই রমরমা কারবারে
জমজমা। কিন্তু এদিকে যে বচের তোলার দাম
আকাশ ছুঁতে চলেছে, জায়ফল যে পানের কোটরা
ছেড়ে কবে নিরুদ্দেশ হয়েছে তা নিয়ে কেউ মাথা
ঘামাচ্ছে বলে মনে হয় না। গঞ্জিকা এবং পিয়োট
ধর্ম-সংস্কৃতির অদ্ভুত অবদানের পর স্বাভাবিক
কারণেই সন্ধান চলল পৃথিবীর চতুর্কোণে আরও ঐ
রূপে কোন ধর্ম সংস্কৃতি পাওয়া যায় কি না। এই
অল্পসন্ধানেই পাওয়া গেল মেক্সিকোর ছত্রাক সংস্কৃতির
ছত্রাক অর্থাৎ ব্যাণ্ডের ছাত্তা, তারই পাঁচম পান
করে পৃথিবীর নানাদেশে, নানা প্রান্তে বহুবিভিন্ন
মানবগোষ্ঠী ভ্রম্যমানে মাতোয়ারা হয়ে বান।

এই বিশেষ ছত্রাকই বর্তমানের সাইলোসাইবিন
(Psilocybin) এর আকর। ব্যাণ্ডের ছাত্তারই
যখন এমন কোলিগ্ন তখন ব্যাণ্ড অয়ং-ই—বা বাদ
যাবে কেন। অতি সঙ্গত ভাবেই সন্ধান মিলল
চীন দেশে। ব্যাণ্ডের পিঠে যে পিচ্ছল এক রকম
ক্ষরণ হয়, যা দেখে আপনার আমার গা ঘিন ঘিন
করে, তারই মধ্যে পাওয়া গেল অয়ুত নাম যার
বুফোটেনিন (Bufotenene), তাঁ-ই পরমানন্দে
সেবন করে সাদা কালা হলদে সভ্য অসভ্য মানুষের
নাকি হল ভ্রয়োদর্শন লাভ। কিম্বাকর্মম অতঃ
পরম্।

এইভাবে একের পর একের সন্ধান পাওয়া যেতে
লাগল, আজও যার গতি অব্যাহত রয়েছে। দলের
পর দল মানুষ জাতি কুল দেশ নির্বিশেষে সজ্জায়
বাজীমাৎ করে দেবার আশায় এসব রোডিমেন্ট
উপকরণ উপাচারের শরণ নিচ্ছেন।

বিজ্ঞানী কিন্তু চিন্তিত হলেন। তাঁর চিন্তার
কারণ অগ্ন্যত্র। তিনি দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন
যে আসল জিনিস এখনও পাওয়া যায় নি, মনের
অন্তঃপুরের দ্বারোদঘাটনের চাবিটি এখনও তাঁর
হাতে আসে নি। তিনি কিন্তু নিরাশ হন নি। তিনি
যে পথের সন্ধান পেয়েছেন এ বিষয়ে তিনি কৃত
নিশ্চয়। তাঁর-কাজ এখন মেক্সিকো-আসলটি
বেছে নেওয়া। তাঁর নিজের ওপর আস্থা
স্থিতবান প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, সঙ্কল্পে দৃঢ় বিজ্ঞানী
কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে চলছেন, সেই পরশমণির
সন্ধানে।

কবিতা

ছবি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অনেক কিছুই করবো ভেবে মনে মনে
প্রস্তুত হয়ে উঠি,
কবিতার সার্থক চিত্রকল্পের মতো শূন্যের ছবি
ভেসে ওঠে কল্পনায় চোখের সামনে ;
একটি গাছ,
দূরের ঐ নদী,
পাহাড়ের নীল আর বনের সবুজ...
সব আছে ওই ছবির মধ্যে,
আছে প্রেমসীর ভালোবাসা,
প্রতিবেশীর হৃদয়,
শিশুর চোখের ঐশ্বর্য আর উজ্জ্বলতা।

অথচ ছবিটা বেশীকণ ধরে রাখা যায় না,
এক নিমেষেই কখন স্মৃতির অঙ্ককারে
পড়ীর সমুদ্রে রত্নবোঝাই সওদাগরী নৌকোর মতো
ভলিয়ে যায়।

ছবি আর শেষ হয় না,
জীবনের পর জীবন যোগ হতে থাকে ক্রমাগতই,
চলতে থাকে ছবি আঁকা হৃদয় থেকে হৃদয়ে,
অনন্ত কাল ॥

কামনা

(ডোগরী কবিতা)

মূল : পদ্মা সচদেব। অনুবাদ : গোপাল ভৌমিক

কামনা মন্থন করে
কামনা ব্যখিত করে
কামনা নিয়ে আসে
তোমাকে আমার কাছে, আমাকে তোমার
যখন কোন পথে ছল্লনের
মুখোমুখি বাবার উপায় নেই।
প্রতিদিন

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে
আমার দরজার উপর
যখন ক্ষীরমান দিবালোক
অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
বার বার
আমার পায়ের কাছে লুটোপুটি করে
মনে হয় সব আগুন ধরে গেছে !

সেই আলোকই
প্রতিদিন আসে
আমার পা স্পর্শ করে
বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করে
যেন তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ ?
কারণ প্রতীকায় তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ ?
কেউ কি এসেছে ?

তোমার কি আছে
আমার কি আছে
তোমার রক্ত দিয়ে
লেখা এক পাতা কাগজ
এক পাতা রঙীন কাগজ
দোমড়ানো মোচড়ানো এক টুকরো কাগজ।

গবেষণা

মানস রায়চৌধুরী

গ্রন্থাগারে যে মেয়েটি নিহত কবির বুকে মুয়ে
ধারালো পেন্সিল দিয়ে একমনে করে চলে ব্যবচ্ছেদ
আত্মার, ভাষার
তার নাম মনেই পড়েনা।
একদিন বাদে সেই গ্রন্থাগার অত্যাঙ্কল হয়ে ওঠে
উদ্ভলতা স্মৃতির আগুন বিস্ফোরণে
অথচ পড়ে না মনে কোনকিছু স্পষ্টভাবে
শুধু সেই কবি ও কবিতা
ব্যবচ্ছেদ করেছিলো যে মেয়েটি ক্লান্ত মুখে শাণিত নথরে
কবির বুকের নীল অরণ্যপ্রাকার
তার সেই গ্রন্থ বর্জন আজ মনেই পড়েনা।

গ্রন্থাগারে আজও দেখি
কৌটদষ্ট কবিতাগ্রন্থের অন্তরালে
মর্মস্পর্শী বিষাদের ছায়া
ভাষা নয় মসিবর্ণ খনিজের নির্জন সম্ভাপ
স্মৃতিতে শুধুই কোন্, অর্থহীনতার
মূলার শিখরে যায় ক্রত ডুবে যায়
মেয়েটির ক্লান্ত মুখ শল্যের ধারালো নখ পেন্সিলের ফলা।

আলো থেকে সরে এসে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো থেকে সরে এসে নক্ষত্রশাস্তির বেদিমূলে
আমি বসেছিলাম, আমার
চারিপাশে মুহূর্তাপ কানাকানি জোনাকিমালার
শাদা শাদা ফুলে

কী আমি খুঁজেছিলাম ফুলের তিমিরে সারারাত
শঙ্কিনী মদীর পায়ে পায়ে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে আমি ফুলের গহন—কৌসা দাহে
পুড়ে গিয়েছিলাম... হু-হাত

জোনাকিবিকৃত, নখে নখে
চাপা অভিমান, আমি জলের কিনারে নিচু হয়ে
কম্বুই ডুবিয়ে দেখেছিলাম গহন জলে কয়ে
যায় আঁজলার রেখা, ঢেউ এসে ঢোকে

নাড়ীর ভেতর রাত্রিকরণার মতো ফুলে ফুলে...
সারা দেহে নিশ্চিহ্ন আধার
কী আমি খুঁজেছিলাম জলের বহুরি চুঁড়ে, তার
শাদা শাদা ফুলে

কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১

১ কী তোমার নেশা ? প্রজ্ঞাপতি ধরা ।

২ তোমার ? অসতী অতসী পসরা ।

৩ এবং তোমার ? আমার, নিছক

ভূপর্ষটক পাখির পালক

আলবামে রেখে আর-সমস্ত

পারিবারিকতা

মেরুণ শূণ্ণে ছড়িয়ে ঝালিয়ে

প্রশ্ন যে করে তাকে বলি গিয়ে

‘করো প্রণিপাত’ ॥

২

তাঁর সার্ভিস-বয়ঃক্রম ৫৩

ওদিকে হরোস্কোপ অনুযায়ী ৬১

আবার গত সপ্তাহে প্রেমে পড়েছেন ব’লে বয়স মাত্র সাত দিন

এবং গত সপ্তাহে প্রেমে পড়েছেন ব’লে বয়স অন্তত সাত সহস্র :

তাঁর বয়স কতো ?

আমার কবিতা

(জাপানী থেকে)

কোতরু তাকামুরা

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

আমার কবিতা প্রতীচীর কাব্যের মতো নয়

গায়ে গায়ে পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়

কিন্তু কখনো ঠিক মেলে না।

প্রতীচীর কবিতার প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ

কিন্তু কবুল করতেই হবে

আমার কবিতা তা থেকে আলাদা।

আথেলের জলহাওয়া আর খ্রীস্টীয় ধর্মের অন্তর প্রবাহ

দিয়ে তৈরি পাশ্চাত্য কবিতার জগত,

তার বাকভঙ্গি

তার অপার সৌন্দর্য আর ভেজ

আপ্ত করে আমার হৃদয়।

কিন্তু গমের রুটি আর পনীরে গড়া তার শরীর

চলে আমার ভাষার বিপরীতে।

আমার কবিতার উৎস, আমার জন্ম

দূর প্রাচ্যের দূরতম কোণে তার জন্ম

মাছ ভাত আর সয়াবিন খেয়ে সে আছে বেঁচে বর্তে

এক বিশাল দেশের গীত সভ্যতার

আলোকে উদ্ভাসিত

এবং জাপানী ক্রপদী শিল্পের মর্মরিভ

প্রবাহে অবগাহিত

এখন পরমাণু বিদ্যারণের আঘাতে হতচকিত।

আমার কবিতা আমি যা তা ছাড়া কিছু নয়

এবং আমি দূর প্রাচ্যের এক স্থপতি মাত্র

আমার কাছে ব্রহ্মাণ্ড একটি নিমিত্তরই প্রতিচ্ছবি

এবং কবিতা হল সেই নির্মাণের সুসঙ্গতি।

প্রতীচীর কবিতা আমার প্রিয় প্রতিবেশী

কিন্তু আমার কবিতার গতিপথ আলাদা

অন্তত প্রণাম

বাসুদেব দেব

অতৃপ্ত জীবন কার খুঁটে খায় কাক

আচ্ছন্ন সবুজ থেকে উড়ে এসে ভুল প্রজ্ঞাপতি

ছুঁয়ে দেয় কার বুক

গোধূলির ম্লান আলো

রবীন্দ্র সঙ্গীত

কাদের পিপড়েরা আজ খেয়ে যায় চিনি

হেনেছ বস্তুর মধ্যে দুঃখের স্বপ্নের অভিমান

ভেঙেছ পৃথিবী তুমি নিজে থেকে ভেঙেছ কখন

দুগ্ধের রোদে বাউলুগে একখণ্ড পড়ে আছে

অশ্রুভাগ শাস্ত ঘরে কে রেখেছে তুলে

ফুলকাটা বিছানায়

দুঃখ দিয়ে সকলকে ঋণী

করেছ তবুও কেন

গেলে কাশিয়াড

গেলে যদি কেন তবে

লিখলে না চিঠি

চুমু নয় অন্তত প্রণাম

মুঠো খুলে যায়

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

মুঠো খুলতে না খুলতে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ঝড় এলো

মুঠোর ভেতর রোদ ছিল আবহের মাসে

সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যেমন বকুল পড়ে থাকে

মধ্যে মধ্যে কুচো পাতা

ছস করে ট্রেনের বাগটানি

পড়ে-পড়ে যাত্রীর পাদানি

সব খসখস শব্দ করতে করতে উড়ে যায়

যেন কে ট্রামের থেকে এক ঝলক পড়ন্ত বেলায়

জু-স্পেস্টাল থেকে ফেরা

অথবা, উত্তর কলকাতার ঠিক কলকাতাই ধরণ

কাপড়ের দোকানে দোকানে, কুষ্টি সৌধে

উনবিংশ শতাব্দীর রাজামহারাজা

যাদের ফিটন চড়ার শব্দ ট্র্যাফিক জ্যামের ভলায় কতদিন

সমস্ত মুঠোর মধ্যে ছিল

আমাদের ইতিহাস সমস্ত সুন্দর জিনিস মুঠোতেই রাখা যায়

আংটির ভেতর দিয়ে চলে যায় মসলিন কাপড়

স্বামরা বিবস্ত্র হওয়ার কালে

মরণোন্মুখ সময়ে

দেখি, হাতের ভেতর থেকে প্রিয় নস্ত্র ডিবেধানি

গড়িয়ে যায়, গড়িয়ে যায়

মুঠো আপনি খুলে পড়ে।

নিরবধি প্রাণের বিস্ময়ে

নটিকেশা ভরস্বজ

উজ্জল অনন্ত থেকে সরে পড়ে কল্লোলিনী নদী
সে নদীর অক্ষ নাম অপার নীলিমা ।
সে নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেই জীবনের সমস্ত 'সম্প্রতি'
মুছে গিয়ে—স্থান-কাল-পাত্রের অতীতে
চলে যায় মুগ্ধ মন ; অভিস্রবনে আনন্দে সঙ্গীতে
আর এক নতুন জগৎ নন্দিত তখন ।

তোমাকেই দেখে মনে হয় কেন এসেছি এখানে
এই রৌদ্র-করোজ্জল পৃথিবীর স্বপ্নভূমিকায়,
এই চন্দ্র-স্নাত রাত্রি, কেন এই নক্ষত্র চারণ ?
জীবনের কী কী বোধ অলৌকিক চেতনার দানে
সমৃদ্ধ হয়েছে কিংবা হতে পারে আলোকমালায় ?
আমার হৃদয় কেন প্রত্যাহের প্রতি-ভূমিকায়
তৃপ্ত নয় ? অথচ প্রত্যাহ-স্নাত আলোর আকাশ
আমাদের কত শুদ্ধ সমাহিত করে ।

একক আশ্চর্য তুমি প্রত্যাহের পরিচিত ঝড়ে
বার বার ফিরে দাও অনিন্দিত বাঁচার বিশ্বাস
রক্তের গভীর বুকে । উপরের অব্যক্ত না হলে
হয়তো জীবন লুপ্ত হয়ে যেত কবে রসাতলে !

ছোটখের নীল তৃপ্তি, অঘাচিত কৃষির প্রত্যাশা,
কে কোটাঁবে বর্ণগন্ধ আমাদের প্রাণের উদ্ভানে,
গুচ্ছ গুচ্ছ মৌনা ধাম, উজ্জল শিশুর উচ্চাশা,

বেগবতী দৃপ্ত নদী, স্নিগ্ধ ঘাস, সবুজ শ্রান্তির
বলীয়ান বনস্পতি, অরণ্য উচ্ছল বয়ে আসে
তোমারই উদ্দেশ্যে নত প্রণিপাত শ্রদ্ধা সমর্পণে :
বৃক্ষলতা ফুল পাখী মাছেদের রূপালী গ্রহর
তোমারই দাক্ষিণ্য ঢালা সমস্ত প্রাণের
অস্তুরালে : আমাকেও প্রাণ থেকে মনে
মন থেকে বিজ্ঞানে ও মহাজীবনের
প্রদীপ আনন্দভূমি দিয়েছ কী গভীর সাহসে
হে নীল, নীলিমা তুমি নদী হয়ে নিরবধি প্রাণের
বিস্ময়ে

প্রতিমা কোথায়

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সে বালক মূর্তি গড়ে পলিমাটি দিয়ে
যে কোনো আকার পেলে মুহূর্তেই অফুরাণ খুশী
হয়ে উঠে
এই শেখা জীবনের প্রথম বেলাতে—
ভারপর চলে প্রতিদিন
অবয়ব বানানোর খেলা ।

উস্তর তিরিশে পৌঁছে শুরু হয় পিছনে ভাকানো
আমার পুতুল গড়া অসম্পূর্ণ—আজ্ঞো অবিকল
সেই জ্যোৎস্না—সেই নদী—সেই বেলপথ—
বুকের ভিতরে রক্তে কত খড়—খড়ের কাঠামো
মুখশ্রী ধূসর তার—হীহরের ছোট্টাছুটি ক্ষত
বরফের স্তম্ভতায় লীনদেহ প্রতিমা কোথায় !

সীমারেখা

বিজয়কুমার দত্ত

পায়ের অনেক নীচে, নেমে গিয়েছে যাদের শিকড়
এবং তার শাখা-প্রশাখা
তাদের কাছাকাছি, নিরর্থক তুমি এতকাল
শিকড় ওপড়ানো অমূল্যবে
গিয়েছ' এসেছ'।

এখনো কি পেয়েছ' তাদের বরাভয়ের মাটি
কিংবা করুণার বৃষ্টিধারা ?
অথবা প্রসন্ন রোজের, উজ্জ্বল স্বচ্ছতা ?
ভিতরে ভিতরে, তুমি সারাক্ষণই চেয়েছ'
উদ্ভিদের ক্রমাগত হয়ে ওঠা—

নত ডালে, পাতাবাহারে, ফোটা ফুলে
ফের নতুন কুঁড়িতে
অফুরান শিল্পের কারুকার্য, — প্রাকৃত লিপির
ক্ষোদিত অক্ষরে, পৃথিবীর অজস্র কবিতা।
অথচ বাইরে তোমার, প্রাগৈতিহাসিক বহু প্রাণীর
জুঁদম অস্থির, ঘোরাফেরা স্থলে জলে।
ঘন অরণ্যের মাঝখানে, মরুবালাকায়।

জীবন তোমাকে কেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীর
সীমারেখা, কোনদিন শেখাতে পারেনি !
এই রহস্যের, মুখোমুখি এসে
তুমি কি ভেবেছ, এইবার হাতবাড়ালেই
পেয়ে যাবে, প্রার্থিত তোমার ?

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

তার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের নানা কথা সংগ্রহ
করেছেন।

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু,
'এই গ্রন্থখানি এই মহাপুরুষের একখানি শ্রেষ্ঠ
জীবনী বলে গৃহীত হবে।'

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
এই বই-এর মাধ্যমে দেশের লোক দেশবন্ধুর
কথা আরো বেশী করে জামুক।'

উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন
পুস্তকের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

অধ্যাপক পি. কে. গুহ
উৎথের দিক থেকে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।'

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন একটি অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি।'

ডঃ রমা চৌধুরী
৬০০ পৃষ্ঠার ২৬টি আর্টপ্লেট সহ একটি অমূল্য
জীবনী। দাম ২০.০০

প্রাপ্তিস্থান

জয়ন্তী প্রকাশন : ২০-এ প্রিন্স মোলাম মহম্মদ
রোড, কলি-২৬।

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন : ১৮-এ, টেমার
লেন, কলি-৯।

অলৌকিক

মিহির মুখোপাধ্যায়

আমাদের এই গল্পটা বলেছিলেন তারক জ্যাঠামশাই।
আমরা অর্থাৎ আমি আর দিদি। আমরা
বলতুম—“তারক জ্যাঠা।” সামনে ডাকতুম—
“জ্যাঠামশাই।”

পুরো নাম, তারকনাথ চৌধুরী। সাহেবী কায়দায়
ভিজিটিং কার্ড রাখতেন। একখানি কার্ড আমাকে
দিয়েছিলেন। আমি তখন ক্লাশ সিল্পে পড়ি, বয়স
এগারো। দিদি ক্লাশ সেভেন, বয়স তেরো।
তুঁতনেই একটু আধটু ইংরেজি পড়তে পারি। তবে
খটোমটো শব্দগুলির উচ্চারণ জানি না। মধ্যে মধ্যে
বানান করে পড়তে হয়।

তারক জ্যাঠার কার্ডে লেখা ছিল—“টি, এন, চাউচুরি
(বড় হরফে)। তার পাশে—বি. এ. জেমিগার
(ছোট হরফে)। তারপর নিচে লম্বা খটমটে
ইংরেজি শব্দের মিছিল। আমি আর দিদি অনেক
কসরৎ করে পাঠোদ্ধার করেছিলাম, ভাইস-প্রেসিডেন্ট,
ল্যান্ড-হান্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন (ছোট হরফে)।
ব্যাপারটা কি আমরা বুঝতে পারিনি। তারক
জ্যাঠা বলে দিয়েছিলেন, ওটা হল জমিদার সমিতি।
সরকার বাহাদুরের কাছে জমিদারদের অভাব-
অভিযোগ জানাবার জন্তু ওই সমিতি হয়েছে।

আখিন ৯২—৩

তারক জ্যাঠা সহ-সভাপতি। আর সভাপতি ছিলেন,
কোথাকার কোন্ মহারাজা, নামটা ভুলে গেছি।
কিন্তু ব্যাপার শুনে আমার হাসি পেয়েছিল।
জমিদারদের আবার অভাব কি ?

জমিদার মানেই তো পায়ের উপর পা তুলে ছকুম
দাও। আমলা-কর্মচারী, নায়েব-গোমস্তা, প্রজা-
পাইকদের গমগমে গলায় ধমকাও আর কমান্ডম্
টাকা আদায় কর। সারাদিনের কাজ কি ? সকাল
বেলা তাম-পাশার আড্ডা জমাও, ছপুয়ে ভুরি-
ভোজনের পর নাক ডেকে ঘুমোও। সন্ধ্যায় নাচ-
গানের আসর বসাও।

এই তো জমিদারের জীবন (অন্ততঃ তিরিশ-চল্লিশ
বছর আগের কথা)। এর মধ্যে অভাব কোথায়,
অভিযোগই বা কি ?

আমাদের তারক জ্যাঠামশাই বেশ বড় জমিদার
ছিলেন। কলকাতায় থাকতেন। সেখানে তার
মস্ত বাড়ি ছিল। আমার বাবা ছিলেন তার এস্টেটের
বাঁধা উকিল।

আমাদের বরিশাল জেলার দক্ষিণে সুন্দরবনের
আবাদ অঞ্চলে অনেক সম্পত্তি ছিল তারক জ্যাঠার।
পটুয়াখালি থেকে ষ্টিমারে আট ঘণ্টার পথ খেপুপাড়ার

সেখান থেকে নৌকায় যেতে হ'ত তারক জ্যাঠার জমিদারী হরিণখালির কাছারীতে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—“ওখানে বুঝি খালি হরিণ পাওয়া যায়?”

“এককালে খুই পাওয়া যেত। আমার বাবার আমলেও দেখেছি মধ্যে মধ্যে হরিণ ভেট পাওয়া যেত—তারক জ্যাঠার জবাব—“তবে ওসব অঞ্চলের নামই ওইরকম। পটুয়াখালি, কাউখালি, টিয়াখালি, তারপর যা বলছিলুম শোনো”—

তারক জ্যাঠামশাই বাঘ আর কুমীর শিকারের গল্প বলতেন।

প্রতিবছর শীতের মরশুমে সুন্দরবনের মহালে খাজনা আদায় করতে বাবার পথে আমাদের বরিশালের বাড়িতে হ'ত এক দিন থাকতেন।

আবার একমাস পরে কলকাতা ফেরার মুখে হ'তিন দিন বিশ্রাম করে যেতেন। ওই কটা দিন আমাদের বাড়িতে যেন উৎসব লেগে যেত। ওই কটা দিন রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর ইঞ্জিচেরারে বসে গড়গড়া টানতে টানতে আমাদের কাছে নানারকম গল্প বলতেন তারকজ্যাঠা। তার খাস চাকর বৃন্দাবন তামাক সেজে দিত। বরাবর দেখেছি তারক জ্যাঠামশাইর সঙ্গে তিনজন লোক আসত। একজন রান্নার ঠাকুর কটক জেলার দিনমণি। দ্বিতীয়জন তার দারোয়ান, নেপালী ইল্লাবাহাজুর, যার কোমরে ভোজালী, বুক বুন্টের বেণ্ট, আর হাতে দোনলা বন্দুক। এবং তৃতীয়জন এই বৃন্দাবন।

এক শীতের রাতে ইঞ্জিচেরারে বসে গড়গড়া টানতে টানতে তারক জ্যাঠামশাই গল্পটি আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে—“প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা, তখন আমার বয়স বত্রিশ। আমার বাবা তখন বেঁচেছিলেন, তবে বছরের বেশীর ভাগ সময় তিনি কলকাতাই থাকতেন, না হয় তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন, জমিদারী দেখাশোনার কাজ, বিশেষতঃ ঢাকা, বরিশাল ফরিদপুরের বিষয়-সম্পত্তির আদায়-আমিই তদারক করতুম, আমার ছোটভাই বীরেশ্বর তখন কলেজে পড়ে”—আস্তে আস্তে গড়গড়া টানছিলেন তারক জ্যাঠা। থেমে থেমে গল্প বলছিলেন—“হ্যাঁ যা বলছিলুম, সে বছর এরকম শীতের সময় হরিণখালির কাছারীতে গেলুম। দোতলা পাকাবাড়ি। কিন্তু দোতলায় ছাদের বদলে লাল টালির ছাউনি। দোতলায় হ'ত ঘর, সঙ্গে বাথরুম। পাশে অনেকটা খোলা ছাদ।

আমার ঠাকুরদার আমলে এই কাছারী ছিল একতলা দালান। তারো আগে নাকি গোলপাতার ঘর ছিল, আমার প্রপিতামহর সময়, সে সব আমি দেখিনি।

বাবা দোতলার ঘর দুটি করিয়েছিলেন। উনি এলে ওখানেই থাকতেন। আমিও বরাবর ওই ঘর হ'তানি ব্যবহার করতুম, এখনও করি। সে সময় আমার সঙ্গে থাকত ওই ইল্লাবাহাজুরের দাদা ভেজবাহাজুর আর বৃন্দাবনের বাবা বঙ্কিম, বঙ্কিম সন্ন্যাসতু।”

—“সন্মামত্ কি জ্যাঠামশাই?”—দিদি জিজ্ঞেস করেছিল।

—“ওরা কায়স্থ, ওদের পদবী সন্মামত, নরোত্তম-পুত্রের সন্মামত ওরা, আমার বাবার আয়ুগের লোক।”

—“আর দিনমণি?”—আমি জানতে চেয়েছিলুম।

“দিনমণি তখনো আমার কাছে বহাল হয়নি, তাছাড়া সে বয়সে আমার রান্না কিংবা খাওয়ার অত বাছ পিচার ছিল না, তখন জোয়ান বয়স, লোহা খেয়ে লোহা হজম করতে পারতুম। হরিণখালির কাছারীর এক রান্নার বায়ুন ছিল সবাই ডাকত মদনঠাকুর, চমৎকার কচ্ছপের মাংস রাঁধতে পারত, সেই আমাকে কচ্ছপ খাওয়া শিখিয়েছিল, তার রান্নাই খেতুম। তারপর যা বলছিলুম শোনো, আমার নিয়ম ছিল, সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত সেরেস্তায় বসতুম, প্রজারা সব আসত, খাজনার টাকা দণ্ড, নজরানা দিত, আরো দিত নানারকম জিনিস, খাঁটি মধু, খেজুরের গুড়, হরিণের চামড়া, জাস্ত পাঁঠা। সেবার এক মাতব্বর প্রজা একটা হারুণের গাছা দিয়ে গেল। ঠিক বাচ্চা নয়, কচি কচি শিশু পজিয়েছে, কাঞ্চল কালো চোখ, চমৎকার রঙের চিতল হরিণ। কাছারীর কম্পাউণ্ডে বেঁধে রাখার জুকুম দিয়েছিলুম। আমি বারান্দায় চেয়ারে বসতুম। পাশেই একটা নিচু তক্তাপোষে নায়েব নীলমণি চাটুজ্ঞ আর খাঞ্চা বিধুমল্লিক বসত। বিধুব সামনে একটা কাঠের হাত-বাক্স থাকত। ওই বাক্সে টাকা পয়সা সব জমা পড়ত।

কাছারীর গেটের পাশে একটা তমাল গাছ আছে। সেই গাছের ছায়ায় সাধারণ প্রজারা অপেক্ষা করত। নীলমণির নির্দেশে পেয়াদাদের সর্দার বারিক মণ্ডল, একেকজন প্রজাকে আমার সামনে ডেকে আনত। এখনো এই নিয়মই চালু রেখেছি, তবে সে আমলের অনেক পুরনো কর্মচারী এখন আর নেই। নায়েব নীলমণি ছিল এই কাছারীর সর্বসর্বা। আমাদের অল্পপস্থিত কালে ওই সব চালাত। বাবা ওকে খুব স্নেহ করতেন। লোকটা কাজে কর্মে ঘুণ ছিল বটে, কিন্তু স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না।—

—“ভাল ছিল না মানে কি?”—দিদির প্রশ্ন শুনে তারক জ্যাঠা যেন থতমত খেলেন, ঠিক কি বলবেন হয়তো ভেবে না পেয়ে বলে ফেললেন—“মানে ইয়ের দোষ ছিল আর কি?”—“ইয়ের দোষ কি জ্যাঠামশাই?”—আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম।

জ্যাঠামশাই যেন অধৈর্য হয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ কোন কথা না বলে গড়গড়ার নলে ওষা লম্বা টান দিয়ে মুখে চারপাশে খায়া জাময়ে তুললেন, শেষে ভেবেচিন্তে বললেন, “এই চুর টার করত আর কি নেণা টেশারও অভ্যেস ছিল।”

জবাবটা খুব মনঃপুত হল না আমাদের। মনে হল কি যেন গোপন করলেন জ্যাঠামশাই।

“হ্যাঁ যা বলছিলুম শোন”—একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন—“সেবার দু’দিন কাঁহারী বগার পর তিনদিনের দিন বেলা নটা নাপাদ একখানি গরুর গাড়ি এসে গেটের বাইরে থামল। কাছারী দালানের বারান্দা থেকে কম্পাউণ্ডের শেষে দেউড়ি প্রায় পঞ্চাশ

ষাট গজ হবে। গাড়িটির পাশে পাশে ছাতা মাথায় আগছিল একজন।

ছাতাটা সে গুটিয়ে নিল। কারণ কাছারীর এলাকার মধ্যে কোন প্রজা ছাতা মাথায় দিয়ে ঢুকতে পারত না। ছুই-চাকা গরুর গাড়ীর ভেতর থেকে লাল পাড় গরদের শাড়ি পরা একটি মহিলা নামলেন। পুরুষটি আগে আগে, পেছনে মহিলাটি দেউড়ি পার হয়ে ভেতরে এল। তাড়াতাড়ি ওদের আগ, বাড়িয়ে আনতে গেল নীলমণি। ওর এই যাওয়ার ভঙ্গাটা আমার ভাল লাগল না। এস. ডি. ও সাহেব কিংবা বড়বাবু এলেও নীলমণি এতটা বিগলিত হয় না। ঠিক যেন পোষা কুকুরের মত ছুটে গেল।

কে এই লোকটি? আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হল না।

কাছাকাছি আসতে দেখলুম, লোকটির পাকানো চেহারা, কপালে বলি-রেখা, চোখের কোণে কুচকোনো চামড়ার ভাঁজ। হলদেটে ফর্সা রঙ।

সঙ্গের মহিলাটির মুখ দেখে অবাক হলাম। মাথায় লাল পাড় আঁচল, খুব ফর্দা গোল মুখ, চাপা নাক, চোখের গড়ন সফর তেরছা, চোখের রঙ কটা, একেবারে মঙ্গোলিয়ান টাইপের মুখ।

—“মঙ্গোলিয়ান টাইপ কাকে বলে, জ্যাঠামশাই?” আমি জিজ্ঞেস করছিলাম।

—“চীনেমান দেখেছোত’, ওদের মতো চেহারা। যা বলছিলাম শোনো, সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে লোকটি হাত তুলে নমস্কার করল, আমিও ত্রাতি নমস্কার

দিলুম, নীলমণি আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে হাত কচলাতে কচলাতে পরিচয় দিল, আঞ্জে ইনি হলেন বেণীমাধব বড়ুয়া, আর এর জ্যী। বড়ুয়া অর্থাৎ অসমীয়া। এতক্ষণে আকৃতির রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হ’ল। বেণীমাধবের চেহারায় কিছুটা বাঙালীয়ানা থাকলেও, বৌটির চেহারা একেবারে খাসিয়া মেয়েদের মতো।”

আমি আর দিদি দু’জনেই আগের বছর পুজোর ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে শিলঙে ঘুরে এসেছিলাম। স্মরণে খাসিয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলুম না। জ্যাঠামশাই বলে যাচ্ছেন—বেণীমাধব আমার সামনে আট টাকা নজর রাখল। কাগজের নোট নয়, খাঁটি রূপোর টাকা, মহারানী ভিকটোরিয়া আর সপ্তম এডওয়ার্ডের মুগ্ধ আঁকা। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম, নজরের পরিমাণ হ’ত একটাকা কিংবা দু’টাকা, অবস্থাপন্ন প্রজাদের কেউ কেউ বড়োজর পাঁচটাকা পর্যন্ত নজর দিত, এটাই রেওয়াজ ছিল।

আমার সামনে একটা নিচু বোঁকিতে বসল বেণীমাধব। মাতব্বর প্রজারা এলেই ওই বোঁকিতে বা মোড়ায় বসত। বেণীমাধবের জ্যীকে একটা মোড়া এনে দেওয়া হয়েছিল। সে কিন্তু বসল না। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখাচ্ছিল।

নীলমণি তখন বেণীমাধবের হয়ে ওকালতী করছিল। ওর মুখেই শুনলাম, বেণীমাধবের দেশ আসামের কামরূপ জেলায়। ওখানে ওদের নানারকম ব্যসা রয়েছে। অস্ত্রাণ্ড ভাইরা সে ব্যবসা দেখাশোনা

করে। বেণীমাধব এ অঞ্চলে এসেছে ধান চালের ব্যবসা করতে।

আটমাস আগে এখানে এসে ঘরদোর তুলে বসবাস করছে। অর্থাৎ গত বছর আমি আদায়-উত্তল করে কলকাতায় ফিরে যাবার পর বেণীমাধব এসেছিল। নীলমণি ওকে এক বিঘে বাস্তুজমির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন কিছু ধানজমির বন্দোবস্ত আর বাজারের পাশে চালের আড়ত খোলার জন্য কিছু জমি চাইছে বেণীমাধব। বুঝতে পারলুম লোকটির হাতে বেশ টাকাকড়ি আছে। নীলমণির কথা শুনে শুনে আমি বেণীমাধবের বউ-এর চালচলন লক্ষ্য করছিলাম। বোটা তখন আমার হরিণটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। সামনেই ঘাস-জমিতে একটা খেঁটার সঙ্গে বাঁধা ছিল হরিণটা। একটু পরেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড করল বেণীমাধবের বউ। আমাদের উপেক্ষা করে, কাছারীর-আদব কায়দা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হরিণটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। নিচু হয়ে একমুঠা ঘাস ছেঁড়ে নিল। তারপর সেই ঘাসে অল্প থুথু ছিটিয়ে হাত বাড়িয়ে হরিণটাকে চাপা গলায় আন্তে আন্তে ডাকল—আয়, আয়। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করতে লাগল। হরিণটাও দেখলুম আন্তে আন্তে এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে সেই থুথু ছেঁটানো ঘাস একটু মুখে দিল।

এমন সময় বেণীমাধব হঠাৎ পেছন ফিরে ধমকের সুরে বললো—“এই ফুলমণি, ওসব কি হচ্ছে, এদিকে এসে বোসো।”

তাড়াতাড়ি বাকিঘাসগুলি হরিণটার সামনে ফেলে দিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আমার সামনে এসে মোড়ায় বসল ফুলমণি। আমার দিকে তাকিয়ে ফিৎ করে একটু হেসে মুখ নিচু করল। অল্প কারো এরকম বেয়াদপি দেখলে আমার মাথায় আগুন ধরে যেত। তখন জোয়ান বয়স, রক্ত গরম ছিল। প্রজা-পাইক, আমলা কর্মচারীরা সকলেই আমার মেজাজকে ভয় করতো। লক্ষ্য করলুম, নায়েব নীলমণি, খাজাঞ্চী বিধুমল্লিক, পেয়াদা বারিক মণ্ডল ওরা সকলেই সজ্জ হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

আমার কিন্তু রাগ হয়নি, বরং অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, বেণীমাধবের বউ-এর কি মাথা খারাপ? নাকি খাম-খেয়ালী। পাঁচশ-ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ের পক্ষে তো এরকম ছেলেমানুষী স্বাভাবিক নয়। তা'ছাড়া ওর ঘাসে থুথু ছিটানো আমার কাছে অস্বস্তি তৈরি করেছিল। ওই ব্যাপারটা আর কেউ বোধহয় লক্ষ্য করেনি। যাই হোক, আমি খুব সহজভাবেই বেণীমাধবের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করলুম। নদার ধারে বাজারের কাছে ওকে ধান-চালের আড়ত খোলার অনুমতি দিলাম। ধানজমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ক'দিন পরে ভেবেচিন্তে জানাবো বলে দিলাম।

যাবার সময় বেণীমাধব বেশ বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে গেল। বোটা আর একবার মোজাছাঁজ আমার দিকে তাকিয়ে নমস্কার দিল।

ওর কটা চোখের চাউনটা অদ্ভুত, কেমন যেন

অস্বস্তি হয়। নীলমণি ওদের সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কেন ঠিক বোঝাতে পারবো না, নীলমণির এই বিনয়-বিগলিত ভাবটি আমার ভাল লাগলো না।

পরের দিন। কাছারী ভাঙার সময় বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ বেণীমাধব আবার এলো। একাই এসেছিল। কোনরকম ভণিতা না করে সোজা মুক্তি জিজ্ঞেস করলো—“হুজুৰ আপনি কি এই হরিণটা বেচবেন, আমি ভাল দাম দেব।” দামের কথা শুনেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কোন প্রজা যদি জমিদারের কাছে এসে কিছু চায়, তবে সেটা অল্পগ্রহ প্রার্থনার মত ভিক্ষে চাইবে জমিদারের মঞ্জি হলে এমনিই দিয়ে দেবেন। এখানে টাকা দিয়ে কেনার প্রসঙ্গ নেই। এটাই রেওয়াজ। লোকটার সাহস কম নয়। আমার কাছারীতে এসে আমার সমান-সমান হয়ে আমারই সখের জিনিস কিনে নেবার কথা বলছে। টাকার লোভ দেখাচ্ছে।

তথাপি আমি যতখানি সম্ভব সংযতভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলুম—“হঠাৎ হরিণ দিয়ে কি হবে?”

—“আজ্ঞে আমার জ্বর হরিণের মাংস খাবার সখ হয়েছে, কাছে পিঠে কোথাও পেলুম না, তাই ভাবলুম, আপনি যদি—”

আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। আগের দিন ভক্ততা করে আপনি-আপনি বলেছিলুম। সেদিন আর ভক্ততার ধার ধারলুম না। সোজা মুক্তি টেঁচিয়ে বললুম—“তোমার তো স্পর্ধা কম নয়, তোমার বউ

মাংস খাবে বলে, আমার পোষা হরিণ কিনে নিতে চাইছ, অস্ত্র লোক হলে জুটিয়ে লম্বা করতুম, তুমি এক্ষুণি চলে যাও, দূর হও আমার সামনে থেকে—

তামাক টানার ক্ষমতা নীলমণি আর বিধু একটু আড়ালে গিয়েছিল। চিংকার শুনে হুজুৰনেই ছুটে এসেছিল। নীলমণি আমাকে শাস্ত করার চেষ্টা করল, বেণীমাধবকে ভাড়াভাড়ি চলে যেতে বললো। চোখে মুখে একটা ভাচ্ছের হাসি ফুটিয়ে, নমস্কার না দিয়েই গটগট করে চলে গেল বেণীমাধব। নীলমণি আমাকে বোঝাতে লাগল—“বেয়াদঙ্গী মাক করে দিন, বিদেশী লোক, এখানকার আদবকায়দা জানে না।”

আমি কঠিন গলায় বললুম—“আপনি ওই লোকটাকে এত খাতির করেন কেন, আপনি এখানকার নায়েব, এটা মনে রাখবেন, সবসময় নিজের ওজন বুঝে চলবেন, একটা উটুকো বিদেশী লোক আর তার স্বর্কে আপনি যে ভাবে তোয়াজ করেন, সেটা অভ্যস্ত দৃষ্টি পুটু, আমি বাবাকে সব কথা জানাতে বাধ্য হব।”

বাবার নাম করতেই নীলমণি যেন জলে ভেজা তুলোর মত চূপসে গেল। আমতা আমতা করে তখনকার মত চূপ করে রইল।

হুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দোতলার ঘরে ইঞ্জি-চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি। বন্ধিম আমার পা টিপে দিচ্ছিল। এমন সময় খাজাঞ্চী বিধু মল্লিক এল। প্রায় নিঃশব্দে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গলা-খাঁকারি দিল।

আমি বললুম—“কি খবর খাজাঞ্চী মশাই, কিছু বলবেন? আশুন, ভেতরে আশুন।”

সসংকেচে ভেতরে এল বিধু মল্লিক। বঙ্কিম একটা মাহুর পেতে দিল। মাহুরে বসে একটু ইতি-উত্তি করে এদিক-ওদিক দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় বললো, “আজ্ঞে একটা কথা বলতে এলুম।”

“বলুন।”

—“আজ্ঞে হরিণটা আপনি বেণীমাধবকে দিয়ে দিলেই পারতেন।”

“কেন বলুন তো?”—এবার আমি সোজা হয়ে বসলুম।

“আজ্ঞে, শুনিছি বেণীমাধবের বোঁটা খুব সহজ মেয়েমানুষ নয়, অনেক রকম তুচ্ছতাক জানে, কি জানি, যদি আপনার কোম ক্ষতি করে—”

আমি বাধা দিয়ে বললুম—“কি ক্ষতি করবে?”

—“আজ্ঞে, ওরা হ’ল কামরূপ-কামাখ্যার মেয়ে, শুনিছি ওই মেয়েটার মা নাকি ডাকিনী-সিদ্ধা ছিল, মায়ের কিছু ক্ষমতা ওই মেয়েটাও পেয়েছে, ও নাকি বাণ মারতে পারে, যাকে মারবে, তার আর রক্ষা নেই, তিনদিনের মধ্যে গলায় রক্ত উঠে মারা যাবে—”

—“আপনি এসব বিশ্বাস করেন?”

“আজ্ঞে, অবিশ্বাসও করি না, ওই মেয়েছেলেটা, শুনিছি, ইচ্ছে করলে যে কোন জন্তুজানোয়ারের চেহারা নিতে পারে।” বিধু মল্লিকের উদ্ভট কথা

শুনে আমি হেসে ফেললুম, হাসতে হাসতে বললুম—
—“খাজাঞ্চীমশাই, বাদা অফলো থেকে, এই সুন্দরবন

এলাকার লোকজনের সঙ্গে মিশে নানারকম কুসংস্কারে আপনার বিচার বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। যাই হোক, হরিণটাকে আমি কলকাতা নিয়ে যাব, নায়েব মশাইকে বলবো, সে রকম ব্যবস্থা করতে—”

—“আজ্ঞে, ওইখানেই তো হয়েছে মুন্সিল, ওই মেয়েমানুষটা নায়েবমশাইকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে, নিজের চোখেইতো দেখলেন—”

—“সত্যিই, নায়েবমশাইর হাশভাব দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি।”

“আশ্চর্য হবার কিছু নেই ছোটকর্তা, এসব হ’ল বশীকরণের ব্যাপার, আমার মুখ থেকে কথাটা প্রকাশ পেয়েছে দয়া করে কাউকে বলবেন না, বঙ্কিমকেও বারণ করে দিন, আমি এখন চলি।” নমস্কার দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তেমনি চুপচাপ চলে গেল বিধু মল্লিক।

আর অবাধ কাণ্ড, পরের দিন সকাল থেকেই হরিণটাকে পাওয়া গেল না। কাছারী দালানের পেছনে সরকারী রান্নাঘরের পাশে আলানী কাঠ রাখার একটা চালাঘর ছিল। রাস্তিরে সেখানে হরিণটাকে বেঁধে রাখা হ’ত। বঙ্কিমই ওর দেখাশোনা করত। সকালবেলা সে-ই প্রথম খবর দিল। দড়ি খোঁটা যেমনি ছিল, তেমনি আছে, হরিণটা উধাও। গলা থেকে ওর দড়িটা খুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিল কি ভাবে? কে নিল? কার এত সাহস?

নায়েব নীলমণিকে বললুম, হরিণ পাওয়া না গেলে আপনার চাকরি যাবে। শুধু নায়েব নয়, খাজাঞ্চী, গোমস্তা, আমীন, তশিলদার—কাছারীর যত কর্মচারী ছিল সবাইকে ধমকালুম। পাইক-পেয়াদারা ছুটল এদিক-ওদিক। ঘণ্টা তিনেক খোঁজাখুঁজির পর হরিণটার হদিশ পেয়েছিল ওরা। কিন্তু ভয়ে কেউ আমার কাছে বলতে সাহস পায়নি।

শেষে তেজবাহাদুর এসে খবর দিল। গাঁয়ের প্রান্তে একটা খাল আছে। সেই খালের পাশে একটা ঝোপের মধ্যে হরিণটা মরে পড়েছিল। খবর পেয়ে তেজবাহাদুর আর বারিক মণ্ডলকে নিয়ে আমি নিজেই চললুম ব্যাপারটা দেখতে। পেছনে পেছনে আরো দু'জন পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে খাজাঞ্চী বিধু মল্লিক আর গেমিস্তা রাশোল সমাদ্দার এল। কিন্তু নায়েব নীলমণি এল না। হয়তো আসতে সাহস পেল না। সকালবেলা ধমক খাওয়ার পর থেকেই আর আমার সামনে আসছে না। আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল হরিণটাকে সরিয়ে ফেলার পেছনে নীলমণির হাত আছে। কিন্তু এতখানি সাহস পেল কি করে?

আমার কাছারী থেকে মাইল খানেক দূরে সেই খাল। খালের পাশে ঝোপের মধ্যে পড়েছিল হরিণটা। খানিকটা মাটি চাপা দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা যে সহসা চোখে পড়ে না। বাড়টা মোচড়ানো। গলার কাছে সোরাহু কতচিহ্ন। শুকনো রক্তের দাগ। ঝোপটার পরেই খালপারের মাঝাল জমি।

শীতের সরু খাল। কাছেই একটা বাঁশের সঁকো। এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই চোখে পড়ল, ওপারে নারকেল গাছের গুড়ি ফেলা ঘাট। গাছ গাছালির আড়ালে একখানি নতুন টিনের ঘর দেখা যাচ্ছে।

—“ওই ঘরখানি কার?—আমি জানতে চেয়েছিলুম। বিধু মল্লিক আমতা আমতা করে বললো—“আজ্ঞে বেনীমাধব বরগয়ার, ওপারেই এক লগ্গে এক বিঘে জমির বন্দোবস্ত নিয়েছে।”

আমার ধারণা দৃঢ় হল। নীলমণি আর বেনীমাধব দু'জনে হরিণটাকে মেরে এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। হরিণের মাংস বাসি করে খেতে হয়। সামান্য পচিয়ে নিলে হরিণের মাংস স্বাদু হয়। সেই মতলবেই ওরা এখানে লুকিয়ে রেখেছে। সুবিধে মত সময়ে সরিয়ে নেবে। বাড়ির মধ্যে নিয়ে রাখতে সাহস পায়নি বেনীমাধব।

তেজবাহাদুর আর বারিক মণ্ডলকে কড়া হুকুম দিলুম “পালা করে হরিণটাকে পাহারা দিবে, কেউ যদি নিতে আসে, হাতে নাতে ধরবি, বাধা দিলে লাঠি মেরে তাড়াবি, তাতেও না হলে সোজা গুলি চালাবি। তেজবাহাদুরের হাতে গুল ভরা দোনগা বন্দুক, কোমরে ভোজালি, আর বারিক মণ্ডলের হাতে পাকা বাঁশের লাঠি।

ওদের মোতায়েন করে চলে এলুম। সেদিন আর কাছারীতে বসলুম না। আমলা কর্মচারীরা কেউই আর ভয়ে আমার সামনে এলনা। সারাদিনটা একরকম কেটে গেল।

সন্দের পর দোতলার ঘরে বসে আমি কিছু দলিল পস্তর দেখছিলাম।

হঠাৎ একটা সোরগোল কানে এল। একটু পরেই সিঁড়িতে খুঁধাপ পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াবার আগেই তেজবাহার এসে ঘরে ঢুকল। বন্ধুটো আমার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। উস্‌কোখুস্‌কো চুল, চোখ দু'টো লাল, সেই নীতের সন্ধ্যায় দরদর করে ঘামছিল তেজবাহার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—“কি রে, কি হয়েছে, তেজা?”

ও কোন জবাব দিতে পারল না। ওর পেছন পেছন বন্ধিম উঠে এসেছিল, তার পেছনে বিধু মল্লিক। ওদের পেছনে আরো অনেকে ছিলেন, কিন্তু আর কেউ দোতলায় ওঠেনি। নায়েব, খাজাকী, তেজবাহার আর বন্ধিম ছাড়া অণু কারো দোতলায় ওঠার জরুম ছিল না। ছ'বেলা মদনঠাকুর আমার খাবার দিয়ে যেত। আর কেউ নয়। অবশ্য আমি যদি কাউকে ডেকে পাঠাতুম, সে কথা আসাদ।

যাই হোক, তেজবাহার কোন কথা বলতে পারছিল না। মাটিতে বসে পড়ে, বন্ধিমের কাছে এক পেলাস জল চাইল। বিধুর মুখে শুনলাম, তেজা নাকি বেগীমাধবের বউকে গুলি করেছে। খবরটা শুনে আমি হতভম্ব। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দেখি একপাল লোক জুটেছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে নীলমণি হাত-পা ছুড়ে হসি-তসি করছিল।

আমাকে দেখে চুপ করলো। ওর মুখে শুনলাম,

আশ্বিন '৮২—৭

বেগীমাধবের বউ ফুলমণি সন্দের মুখে খালের ঘাটে জল নিতে এসেছিল, তখন তেজবাহার গুলি করেছে। সে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। বেগীমাধব আর পড়শী মেয়েরা তাকে দেখাশোনা করছে।

কিন্তু তেজবাহার পাগল নয়, তার চোখের দৃষ্টি খারাপ নয়। সে কেন এরকম কাণ্ড করবে। তার উপর জরুম ছিল, হরিণটাকে কেউ নেবার চেষ্টা করলে বাধা দেবে। কিন্তু খালের ওপারে কেউ জল নিতে এলে তাকে গুলি করবে কেন?

যাই হোক আমি কাছারীর ডাক্তার রামেশ্বর দত্তকে পাঠিয়ে দিলাম। নীলমণি সঙ্গে গেল।

খাজাকী বিধু মল্লিকের হাতে ছ'শো টাকা দিয়ে পাঠালুম, দরকার হলে বেগীমাধবের বউকে পটুয়াখালি নিয়ে যাবার জরুম বললাম। অবশ্য তখনো জানি না, বেঁচে আছে; না মরে গেছে। গুলিশ কেস হবে, মরে গেলে আরো বিপদ। এখন টাকা পয়সা দিয়ে সামলানো যায় কি না ভাবছি। কাছারীর সামনে প্রায় পঁচিশ তিরিশজন লোক জড়ো হয়েছিল। হাতে হাতে সাত-আটটা লগ্নন।

অনেকের হাতে লাঠি, বজ্র।

ওদের মধ্যে থেকে বারিক মণ্ডলকে ডেকে আমি কি ঘটেছে জানতে চাইলাম।

ওর মুখেই শুনলাম, বেগীমাধবের বউ প্রাণে মরেনি, কাঁধে গুলি লেগে জখম হয়েছে।

নীলমণি নাকি বেগীমাধবের বাড়িতেই বসেছিল। গুলির শব্দ শুনে সেই ডাকাডাকি করে লোকজন জড়ো করেছে, কিংবা হয়তো আগে থেকেই কিছু

লোক ভৈরী রেখেছিল, সঠিক বলতে পারলো না বারিক মণ্ডল। নীলমণির লোকেরা তেজবাহাদুরকে মারবার জন্ত লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করেছিল। ভাগ্যিস, তেজা আর গুলি না চালিয়ে অত লোকজন দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল। না হলে হয়তো আরো খুন জখম হ'ত।

আমি ওকে ধমক দিয়ে বললুম—“তুই কোথায় ছিলি তখন, কোথায় গিয়েছিলি?”

বাঁশপাতার মত কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল বারিক মণ্ডল—“হুজুর, আমরা মোটে ছ'জন, হয়তো সারারাত বসে থাকতে হবে, আরো ছ'একজন থাকলে ভাল হয় ভেবে, আমি উজির আলি আর কালী শিকদারকে ডাকতে গিয়েছিলুম, তখনো সন্ধ্যা হয়নি, বেশ বেলা ছিল, আমি বড়জোর আধঘণ্টার জন্ত পেছি, তার মধ্যে এই কাণ্ড, আমার কোন দোষ নেই হুজুর মা-বাপ—”

বোঝা গেল ঘটনার সময় বারিক মণ্ডল উপস্থিত ছিল না। ওর কাছ থেকে আর কোন হদিশ পাওয়া যাবে না। কাছারীর সামনে থেকে ভীড় হটবার হুকুম দিয়ে আমি দোতলায় এলুম। এবার তেজবাহাদুরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করলুম। ও তেমন গুছিয়ে বলতে পারল না, এলোমেলো ভাবে যেটুকু বললো, একেবারে অলৌকিক ব্যাপার, তোমরা বিশ্বাস করবে কি না, জানি না,—তবে তেজবাহাদুর সরল স্বভাবের নেপালী, বানিয়ে মিছে কথা বলার লোক সে ছিল না—হঠাৎ চুপ করে তারক-জ্যাঠা ঘন ঘন তামাক টানতে

লাগলেন। গল্পের মেজাজ এখন তুলে উঠেছে। এ সময় খেমে যাওয়া কারো সম্ভব হয়। আমি তাড়া দিয়েছিলুম—“তারপর কি হ'ল, জ্যাঠামশাই?”
—হ্যাঁ যা বলছিলুম, তেজবাহাদুরের মুখে যা শুনলুম, একেবারে অসম্ভব কাণ্ড।

সেদিন বিকেলে বারিক মণ্ডল নাকি বলেছিল, সারারাত এখানে থাকা সম্ভব নয়, মালিক যাই হুকুম দিন, বরং বাঁশ আর দড়ি এনে আরো ছ'জন পেয়াদা, উজির আলি আর কালী শিকদারকে ডেকে এনে মরা হরিণটা তুলে কাছারীতে নিয়ে যাওয়া যাক। তেজা ওর কথায় রাজি হয়ে যখন লোকজন ডাকার জন্ত আসছিল, তখন সামনেই নায়েব নীলমণির সঙ্গে দেখা। নীলমণি নাকি জিজ্ঞেস করেছিল—“তোরা কোথায় যাচ্ছিস?”

বারিক মণ্ডল এখন হরিণটাকে কাছারীতে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল।

কোন মন্তব্য না করে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল নীলমণি। তেজা দেখেছিল নায়েব মশাই বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে বেগীমাধবের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

খানিকটা পথ আসার পর তেজার মনে হ'ল, পাহারা ছেড়ে ছ'জনের এক সঙ্গে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। বারিককে সে বলেছিল, তুই গিয়ে লোকজন ডেকে আন, আমি পাহারায় ফিরে যাচ্ছি। তেজবাহাদুর যে মাঝপথ থেকে পাহারায় ফিরে এসেছিল, এটা বারিক মণ্ডল ছাড়া আর কেউ জানতো না। নীলমণি নিশ্চয় ভেবেছিল, ওরা

হু'জনেই চলে গেছে। হরিণটা যে খোপের মধ্যে ছিল, তার কাছেই একটা মস্ত জারুল গাছ। সেই গাছটার নিচু একটা মোটা ডালে চুপে চুপে উঠে ঘনপাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল তেজবাহাদুর।

এরকম লুকিয়ে পাহারা দেবার কারণ সম্পর্কেও বলেছিল, নায়েবমশাইর হাবভাব ওর ভাল লাগেনি। ওর ধারণা হয়েছিল, ওরা লোকজন্ম ডেকে আনার আগেই নীলমণি হয়তো হরিণটাকে সরিয়ে ফেলবে। তেজবাহাদুর যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে খোপের মধ্যে হরিণটাকে দেখা যাচ্ছিল। খালের ওপারে গাছ-পালার আড়ালে বেগীমাধবের বাড়িটা নজরে না এলেও, নারকেল গাছের গুড়ি ফেলা ঘাট চোখে পড়ে। ওর সামনেই বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর ওপাশে ওই ঘাট।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কাছে পিঠে জনমানুষের সাড়া নেই। শুধু পাখিদের চৈচামেচি। বারিক মণ্ডল ফিরে আসছে না দেখে তেজা একটু অধির হয়ে উঠেছিল, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, ওপারে খালের ঘাটে বেগীমাধবের বউ এসে নামল। কাঁখে মাটির কলসী। তেজা নজর রাখছিল। অবাক হয়ে দেখল, বেগীমাধবের বউ কলসীটা নামিয়ে রেখে একবার এদিকওদিক দেখেনি, তারপর জামা কাপড় খুলে একেবারে উদ্যম হয়ে জলে নামল। নিঃশব্দে সাতার কেটে খালের মাঝামাঝি এল। তারপর আরো অবাক হয়ে তেজা দেখল, বাঁশের সাঁকোটোর নিচ দিয়ে ও ভেসে আসছে, ওর মাথাটুকু জলের উপর রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা তখন আর মানুষের মাথা নেই।

তেজা বলেছিল—“হজুর পরিষ্কার দেখলুম কালো কুচকুচে একটা কুকুরের মাথা, এপারে যখন উঠল

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কালো মোটামোটা মস্ত একটা কুকুর, গায়ে বড় বড় লোম, এপারে উঠে ঠিক কুকুরের মতো গা বাড়ান দিল, তারপর হরিণটার ঘাড় কামড়ে ধরে জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম। গাঁক করে শব্দ করে হরিণটাকে ছেড়ে দিল, তারপর যেন শুনলাম ঠিক মান্নুষের গলায় ‘মাগো’ বলে চৈচিয়ে উঠে জলে ঝাপিয়ে পড়ল। আমি খুব ভয় পেয়ে গাছ থেকে নামতে গিয়ে ছমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম, হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গেল। কোনরকমে উঠে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে কাছারীর দিকে ছুটে এলাম, পেছনে গোলমাল শুনেছিলাম, মনে হচ্ছিল একপাল কুকুর যেন তাদা করে আসছে, হজুর মালিক, বিশ্বাস করুন, আমি একটুও মিছে কথা বলছি না।” এই হ’ল তেজবাহাদুরের জবানবন্দী।

রামেশ্বর ডাক্তারের মুখে ধবর পেলাম, বেগীমাধবের বউ এর আঘাত গুরুতর কিছু নয়: বাঁ-কাঁধের চামড়া ছিড়ে গুলিটা বোরিয়ে গেছে। রামেশ্বর ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেধে দিয়ে এসেছে। পরের দিন আমি বেগীমাধবকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিলাম। নীলমণিও চাকরি ছেড়ে ওদের সঙ্গে চলে গেল। আমি হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম বটে, কিন্তু তেজবাহাদুরকে বাঁচাতে পারলাম না।

সেই দিন রাতেই ভীষণ জ্বর হ’ল। তিনদিন জ্বর বিকারে ভুগে ভুল বকতে বকতে মারা গেল তেজবাহাদুর।

তারক-জ্যাঠামশাইর এই অদ্ভুত গল্প শোনার পর বহুদিন পর্যন্ত আমি আর দিদি আগাগোড়া কালো কুচকুচে কুকুর দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠতুম।

বিজনকুমার ঘোষ

এ পাড়ার বড় জলের অভাব, এক আমাদের বাড়িটা ছাড়া। মুস্কিল হচ্ছে, আমাদের কলটা রাস্তার পাশে, তাই অনেকে ভেবে বসে এটা বুঝ করপোরেশনের কল। ভিড় লেগেই আছে। অনেক সময় আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রাগারাগি করি। বলি, এটা রাস্তার কল নাকি? সরে যান।—সরে যায় বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্তে। আবার যে কে সেই। ইট দিয়ে টেম্পোরারি পেট বানিয়ে দিয়েছি। ছুঁচার দিন জল নেওয়া বন্ধ হল হয়ত, কিন্তু পরে একদিন দেখা গেল পুরো পেটটাই হাওয়া। আবার বালতি, কলসি, হাড়ির লম্বা লাইন। তাই এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছি, আমরা ভাড়াটে, আমাদের এসব ঝামেলা পোহাবার দরকার কি। কোথাও ভাল বাসা পেলে উঠে যাব।

সকাল বেলা। ঘরের সামনে টুল পেতে বসে খবরের কাগজ পড়ছি আর মূছ পায়ের শব্দের জন্তে প্রতীক্ষা করে আছি। শব্দটা হবে আমার জ্বর পায়ের। চা দিয়ে যাবে। চা খেয়ে বাজারে যাব। শব্দ পেলাম। কিন্তু জ্বর নয়, মধ্য বয়সী এক ভদ্র মহিলার। ভদ্র মহিলাকে চিনি, প্রায়ই জল নিয়ে

যান। বেশ ধীর স্থির, আমাকে দেখলেই সরে দাঁড়িয়ে জল নিতে স্তুবিধে করে দেন। অল্পদের সে বালাই নেই। সে জন্তেই ভদ্র মহিলা সম্পর্কে আমার একটা সম্মম বোধ ছিল। একটা কিছু আশা করে মুখের দিকে তাকালাম।

—দাদা একটা কথা বলব?—ভদ্র মহিলার যেন এটুকু বলতেও ভারী কষ্ট হচ্ছে।

—বলুন।

—দশটা টাকা হবে? আমার জেলের মাইনে হবে পরশু দিন, পরশু দিনই টাকাটা দিয়ে যাব।

মাসের শেষ। দশটা টাকা ফালতু বের করা খুবই কষ্টকর। তবু ভদ্র মহিলার সঙ্কোচ দেখে না করতে পারলাম না? হয়ত ভীষণ দরকার পড়েছে, তাই প্রায় অপরিচিত এক জনের কাছে টাকা চাইতে হচ্ছে। আমি কোন কথা না বলে উঠে গিয়ে ব্যাগটা খুলে দশটা টাকা দিলাম।

—দাদা, আপনি কি রাগ করলেন?

—না না।

—কিছু মনে করেননি তো?

—না না।

এই সময় আমার জ্বর চা নিয়ে এল। ভদ্র

মহিলা চলে যেতেই মস্তব্য হল, শুধু জল নয়, এবার টাকাও—।

আমি চোখের মণি ছুটোকে এদিক সেদিক করলাম। অর্থাৎ, মাষ্ট্রের কখন কি হয়।

এরপর ব্যাপারটা ভুলে গেলাম। খেয়াল হল সাত দিন পর, আরে, পরশু দিন তো কবেই পেরিয়ে গেছে। বাজারের যাবার মুখে উনি ফের হাত কচলে দাঁড়ালেন।

—দাদা, আমার ছেলের মাইনের বিলটা আটকে গেছে, তাই টাকাটা দিতে দেরী হচ্ছে। কিছু মনে করলেন?

—ঠিক আছে।—এ ছাড়া আর কি বলা যায়!

এরপর আরও অনেক দিন চলে গেল। এক মাস, দুই মাসও যায় যায়। ভদ্র মহিলার ছেলের বিল আর কিছুতেই পাশ হয় না। জল নিতে গিয়ে চোখাচোখি হয়, ভাড়াভাড়ি চোখ সরিয়ে নি। যে কোন কারণেই হোক, দিতে পারছেন না। সুতরাং চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় ফেলে কি লাভ?

তবে টাকাটা যে মেরে দেবেন না, তা পয়লা দিনে চেহারা দেখেই বুঝছি। সর্বশক্তিমান লাল ফিতের কাছে তাই প্রার্থনা করি, হে লাল ফিতে, ভাড়াভাড়ি বিলটা পাশ করিয়ে দাও—।

রাত প্রায় দশটা। ইভিনিং ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছি, দেখি মোড়ের মাথায় উপছে পরা ভিড়। কি ব্যাপার, এখানে কোন ফিল্ম স্টারের আসার কথা

আছে নাকি? পরিচিত একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে ভাই?

ছেলেটি বলল, হারুদা সুইসাইড করেছে, জানেন না? সেকরেটারিয়েট বিলডিংয়ের সব চেয়ে ওপরের তলা থেকে বীপ দিয়েছে। বেলা ছুটোর সময়।

বস্তুত পাড়ায় আমার যোগাযোগ যৎসামান্য়। সুতরাং হারু কে, এ কথা জিজ্ঞাসা করতেই দশ দিকে বিশ্বয়-ঠিকরে পড়ল, সে কি, হারুকে চেনেন না? সব চেয়ে ওপরের তলা থেকে বীপ দিয়ে হারু এই মুহূর্তে মধ্যমাণ হয়ে পড়েছে। অতএব হারুকে না চেনা অপরাধ। একজন বলল, ওই যে পাতলা, ছিপছিপে, ফরসা, বাঁ গালে একটা আঁচিল আছে—

আর এক জন বলল, কেমিসার ট্রিতে অনাস নিয়ে বি, এস, সি পাশ করেছে। এক এক জনের কপালই এই রকম!

আর এক জনের মস্তব্য, তিন বছর বেকার আছে বটে, কিন্তু তাই বলে সুইসাইড করতে হবে? এ কি একটা শিক্ষিত ছেলের কাজ!

—আহা, কি সুন্দর চেহারা! সেদিনও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। দেখলে হাতের সিগারেট ফেলে দিত! হু, আজকালকার ছেলেদের সহবৎ শিখিয়ে দিতে পারে।—দাছ পোছের এক জনের মস্তব্য।

—পুরো এক্সেপিস্ট। ছাঃ ছাঃ—

—না হয়ে উপায় ছিল?—শক্ত চোয়ালের একটা লোক প্রতিবাদ জানাল: পাড়ার সবার

কাছে ধার। এই নিয়ে তাগাদা, আর নিত্বি অপমান। এখন যে এত সিমপ্যাথি, তখন তো কেউ এগিয়ে আসেনি ?

এই সব স্বগতোক্তি, আলোচনা আর বাদ প্রতিবাদে আমার ভিতরে একটা নিটোল ছবি তৈরী হয়ে গেল। পঁচিশ-ছাবিশ বছরের একটি ছেলে, রূপবান, কেমিসট্রিতে অনার্স নিয়ে বি, এস, সি পাশ করেছে। গুরুজন দেখলে সিগারেট খেলে দেয়, হয়ত গানও জানে। জীবনে 'শালা' ছাড়া আর কোন খারাপ কথা মুখেও আনেনি। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে হাত ছুটো ক্রমাগত কচলাতে থাকে। কিন্তু হলে হবে কি, চাকরী পাচ্ছে না। এ দিকে পাড়ার সবার কাছেই ধার দেনা। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছে, পরশু দিন হরিপদ মুদি বা নয় তাই বলে মুখ করেছে। শত হলেও ভর্জলোকের ছেলে। আহা, পাড়ার কারও কাছে এতটুকু সিমপ্যাথি পায়নি বেচারী। সুতরাং সুইসাইড না করে উপায় কি!—এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলাম। কিন্তু এত কিছু পরেও ছবির খোদ মালিককে

কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। এটা লজ্জারই কথা। পাড়ায় বাস করছি, অথচ পাড়ার কাউকে চিনি না। যাই হোক, এবার থেকে সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব, সবার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করব। বাঁ পালে আঁচিল, ডান কান কাটা, গঁটে বাতের জন্তু খুঁড়িয়ে হাঁটা—কোন কিছুই বাদ দেব না।

ঘরে ঢুকতেই স্ত্রী বলল, কি সবোনাশটা হয়ে গেল, চারু মাসিমার !

আমি বললাম, চারু মাসিমা টানিমা বাদ দাও, হারু ছেলেটা কে বল তো ? আমার সঙ্গে আলাপ ছিল ?

—আলাপ ছিল কি না বলতে পারব না, তবে দেখলেই চিনবে।—হঠাৎ যেন স্ত্রীর কি মনে পড়ে গেল : ওই যে, জল নিতে এসে যে ভজ্জ মহিলার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল তাঁরই ছেলে। এবার বুঝতে পারলে ?

হ্যাঁ, সবার আগে আমার দশটা টাকার কথাই মনে পড়ে গেল। হায়রে, ফেরৎ পাওয়ার আর আশা নেই। হারুটা অতিশয় জবজ্ব।

অকেজো

গল্প

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

কস্তা গিন্নীর কোনো কাজ নেই। কস্তা প্রায় পনেরো বছর হ'ল রিটারার করেছেন। হার্ট ও বাতের রুগী। প্রায় পণ্ডু। গিন্নীর অবস্থাও প্রায় একই রকম। তিনি বাত ও প্রেশারের রুগী। আগে গিন্নী সংসারের সমস্ত কাজ কন্ম করতেন। বছর খানেক হ'ল কিছুই করতে পারেন না। দিন রাত দোস্তলা ক্ল্যাটের এককোণের এক চিলতে বারান্দা ঘেরা ঘরে শুয়ে বসে কাটান। নিষ্কর্ম বসে বসে সময় কাটতেই চায় না। কয়েকদিন আগে ছোট মেয়ে উমা বোম্বাই থেকে এসেছিল। সে একটা ট্রানজিস্টার দিয়ে গেছে। ওটা পাওয়ার পর থেকে কস্তা-গিন্নীর চমৎকার সময় কাটছে। কস্তার তবু খবরের কাগজ পড়বার বাই আছে, গিন্নীর তাও নেই। কাজেই তাঁর এখন ঐ ট্রানজিস্টারটাই সম্বল। সারাদিনের সঙ্গী। সমস্ত অমুষ্ঠান শোনেন। খবর, গান, নাটক, কথিকা। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী। বুঝুন না বুঝুন, ভাল লাগুক না লাগুক সারাক্ষণ শুনছেন। পাড়ার লোক বুড়োবুড়ীর রেডিও শোনার ঠৈলায় অতিষ্ঠ। ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি একনাগারে রেডিও চলে।

বাড়ীর লোককে কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ বিরক্ত

হতে দেখা যায় না। হয়তো ভাবে, যাগ পে বুড়োবুড়ী তবু একটা কিছু নিয়ে আছে তো।

কস্তা-গিন্নী পরম আনন্দে আছেন। সময় কাটানোর আর কোনো সমস্যা নেই। দিন পনেরো বেশ চলল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কীর্তন হচ্ছিল। গিন্নী ফুলফোর্সে রেডিও চালিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর পনেরো বছরের নাতি ছুম ছুম করে পা ফেলে ঘরে ঢুকল। কিছু না বলে ট্রানজিস্টারটা বন্ধ করে দিল।

গিন্নী বললেন—হেই-হেই। রেডিও বন্ধ করলি কেন? 'আ হা কী চমৎকার কেতনটা হচ্ছে।' নাতি চীৎকার করে উঠল—'না বন্ধ করবে না। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ তোমরা। একবারও রেডিও বন্ধ করবে না। তবু আস্তে চালালে হয়, তা না পাড়া কাঁপিয়ে রেডিও শোনা। পড়ার বারোটা বেজে গেল। নিজেদের কোনো কাজ নেই তো যেন আর কারো কোনো কাজকন্ম নেই। দু'দিন পরে আমার পরীক্ষা। তা খেয়াল নেই।'

নাতির পরীক্ষার খবর শুঁরা কেউই রাখেন না।

গিন্নী বললেন—‘তা’বলে কেস্তনটা বন্ধ করে দিবি।’

ক্লাস নহিনে-পড়া নাতি লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বলল—‘কেস্তনের নিকুচি করেছে। আমার পরীক্ষার চেয়ে তোমার কীর্তন শোনা বেশী হ’ল। ফের যদি রেডিও চালাও তো আমি রেডিও জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দেব।’

কস্তা নাতির মেজাজ দেখে বড় বড় চোখে তাকে দেখতে লাগলেন। নাতির মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। কস্তার যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। গিন্নীর অবশ্য কস্তার মত ভয় টয় হয় নি। তাই বললেন—‘হ্যাঃ! জানলা গলিয়ে ফেলে দেবে। খুব তোর ক্ষমতা। বড় একেবারে পরীক্ষার পড়া করছিস। কেন নিজে যখন সারা পাড়া জানিয়ে সিনেমার গানগুলো শুনিস তখন কী হয়। আমরা রেডিও চালালে অমনি তোর পরীক্ষার পড়া যায় যায়।’

—‘বেশী বাজে বকো না ঠাকুমা। এখন আমি পাশের ঘরে রাত দশটা অবধি পড়ব ততক্ষণ তোমরা একেবারে রেডিও চালাবে না। ব্যস। এই আমাব সাফ কথা।’

বলে নাতি জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল।

গিন্নী আবার ট্রানজিস্টার চালাতে উত্তত হতেই কস্তা বললেন—‘ধাক্কা না, সস্তুর পড়ার ক্ষাত হবে।’

—‘পড়ে একেবারে উদ্ধার করেছে। গেল বছর তো ফেল করেছে।’

—‘কে বলল?’

—‘উমা বলে গেল। বোমা তো কোনো কথাই আমাদের বলে না। উমাই বলছিল, সস্তুর বধাটে হয়ে গেছে। পড়াশুনা নেই, কেবল সিনেমা দেখা আর আড্ডা দেওয়া! বিত্ত-বোমা ওকে নিয়ে মহা চিন্তায় পড়ে গেছে।’

বলে আন্তে করে রেডিও চালিয়ে দেন। কস্তা ব্যস্ত হয়ে বলেন—‘আবার চালালে।’—‘না চালাবে না। আমরা সমস্ত দিন বুড়োবুড়ী কী নিয়ে কাটাব। এই পায়রার খুপীর মত ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে। একটা কথা বলবার লোক নেই। কেউ ভুলেও এ ঘরে পা মাড়ায় না। ভাগ্যিস উমা রেডিওটা দিয়ে গেছিল।’

রেডিও আবার যথারীতি একনাগাড়ে চলতে লাগল। অবশ্য গিন্নী এখন আন্তেই চালান। তাঁদের নাতি আর কোন ঝামেলা করে নি।

মাস খানেক পর হঠাৎ গিন্নী একদিন রেডিও চালাতে গিয়ে দেখেন রেডিওতে কোনো আওয়াজ হচ্ছে না। কী হ’ল। খারাপ হ’ল নাকি?

কস্তা বললেন—‘ব্যাটারী ফুরিয়ে গেছে।’

গিন্নী বললেন—‘এত তাড়াতাড়ি।’—‘বেশী চালানো হয়েছে যে।’

গিন্নীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাঁর নিত্য সঙ্গীর হঠাৎ নিঃসঙ্গতায়। বললেন—‘বিত্তকে বলব ব্যাটারী এনে দিতে।’

ছেলে বিত্ত অফস থেকে ফিরতেই গিন্নী ‘উঃ’ ‘আঃ’ করতে করতে কোনোরকমে তার কাছে

গেলেন। ব্যাটারীর কথা বললেন। বিণ্ড বলল—
'সে কী! এর মধ্যে ব্যাটারী শেষ হয়ে গেল! উমা
তো নতুন ব্যাটারী লাগিয়ে রেডিও দিয়ে গেছিল।'।
সন্ত কাছেই ছিল। ফোড়ণ কাটল—'চব্বিশ ঘণ্টা
রেডিও চালালে ব্যাটারীর আর দোষ কী।'

বিণ্ড বলল—'আচ্ছা। কাল ব্যাটারী এনে
দেব খন।'

সন্ত পট করে বলে ফেলল—'আবার কান
ঝালাপালা হবে।'

বিণ্ড পরদিন ব্যাটারী আনতে ভুলে গেল।
প্রায় এক হপ্তা কেটে গেল। বিণ্ড ব্যাটারী আনল
না। গিন্নী অধৈর্য হয়ে উঠলেন। সময় যে কিছুতেই
কাটে না। বিণ্ডকে তড়া দিলেন। যাক, এবার
বিণ্ড আর ভুলল না। ব্যাটারী এল। গিন্নী আবার
পূর্বের মত এক নাগাড়ে রেডিও চালাতে লাগলেন।
সময় চমৎকার কাটতে লাগল।

একমাস যেতে না যেতে আবার রেডিও জ্বাব
দিল। বিণ্ডকে ব্যাটারীর কথা বলতেই ও চেচিয়ে
উঠল—'এই তো সেদিন ব্যাটারী আনলাম। এর
মধ্যে শেষ করলে! আমি আর ব্যাটারী কিনতে
পারব না। ব্যাটারীর দাম কত জানো? এত
বয়স হ'ল একটু বুকে শুনে চলবে তো! এই বাজারে
সংসার যে কী ভাবে চলে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

গিন্নী সত্যিই লজ্জিত হলেন।

বৌমা কাছে ছিল। বলল—'তোমার বোন মী
বাবাকে রেডিও দিয়ে বেশ উপকারটি করল যা
হোক। তা ও-ই ব্যাটারী জোপালেই পারে।'

গিন্নী নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। উমাকে চিঠি
লিখলেন। ব্যাটারী পাঠিয়ে দেবার জন্ত। উমা
উত্তরে লিখল, 'এত দূর থেকে আমি কী করে
ব্যাটারী পাঠাব! দাদাকে বললে সে-ই কিনে এনে
দেবে।'

চিঠি পড়ে গিন্নীর চোখ জ্বালা করতে লাগল।
নিঃশব্দ সন্ধ্যার দিকে চাইলেন। সে বেচারী মাত্র
বোধহয় সাত আট টাকার জন্ত সরব হতে পারছে
না। গিন্নী তাঁর বোবা সন্ধ্যাকে হাতে নিয়ে নাড়া-
চাড়া করলেন। 'নব' ঘোরালেন, কিন্তু টু শব্দটি
করল না সে।

দিন কাটে, মাস কাটে। দিন মাস তো ঠিকই
কেটে যায়। কিন্তু সময় যেন কাটতেই চায় না।
গিন্নী মাঝে মাঝে ট্রানজিস্টারটা হাতে তুলে নেন।
অকারণ 'কাটা'টা এ প্রাস্ত থেকে ও অপ্রাস্ত অবধি
ঘোরান। 'নব' তিনটে নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া
করেন। ট্রানজিস্টারের উপরে-পড়া ধুলো মোছেন
কাপড়ের খুঁট দিয়ে। সুইচটা ধরে অনবরত 'অফ-
অন' করেন। গিন্নী বোঝেন, ওটা আর বাজবে না।

ট্রানজিস্টার অকেক্সো হয়ে ঘরের এক কোণে
পড়ে রইল। ঠিক কস্তা-গিন্নীর মতই।

অমদামোহন বাগচী

নতুন বৌ দেখে সবাই একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগল। হ্যাঁ—সত্যি দেখবার মত বৌ হয়েছে শশিনাথের। এত সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী লেখাপড়া জানা বৌ—এ তল্লাটে আর কারও ঘরে আসেনি আজ পর্যন্ত! শুনে শুনে শশিনাথের বুক জ্বী পোরবে ফুলে উঠতে লাগল। আজ আর নাইবা রইল জমিদারী, কিন্তু এককালে—আর সেও খুব একটা বেশিদিনের কথা নয়—তার পূর্ব-পুরুষ জমিদার বলেই খ্যাত ছিলেন এ অঞ্চলে, এবং আজও জমিদারী না থাকলেও—সবাই তাদের বাড়ীকে জমিদার বাড়ী বলেই জানে ও মানে। তার পূর্ব-পুরুষ জমিদারীর দৌলতে একদা যে আভিজাত্যের মিনার তুলে গিয়েছেন, তা এখনও বহুদূর থেকে লোকের মনে সজ্জম-আর শংকা জাগায়।

নতুন বৌ প্রভা যুগপৎ লোকের অকুণ্ঠ প্রশংসা, আর এ কালের বেণীঝুলানো মেয়েদের বাঁকাচোখের ইর্ষায় আঁচল ভরে নিয়ে, নিজের গতির মধ্যে বিন্মিত আর অভিভূত দৃষ্টি মেলে যখন সর্ব প্রথম তাকাল, —তখন প্রথমেই তার নজর পড়ল পাশে দাঁড়ান শশিনাথের উপর। সুন্দর—কিন্তু স্বাস্থ্যহীন, আর মেয়েলী ধাঁচের মুখ। পিঠের ঈড়টা ঈষৎ বাঁকানো

—প্রথম দর্শনেই অবিকল কৃপাপ্রার্থীর কুষ্ঠানুভ অভিব্যক্তিকে মনে করিয়ে দেয়। মুখের চেহারায় নারীমূলভ সলজ্জ—একটা অমায়িকতার স্পষ্ট ছাপ! গ্রামের সখের খিয়েটারে অবিরাম নারীভূমিকায় অভিনয় করে করে—অনেক সাধ্যসাধনা আর কসরৎ করে, কণ্ঠস্বরটাকেও শশিনাথ অবিকল মেয়েলী পর্যায়ে এনে ফেলেছে। ইচ্ছা করলেও আজ আর তাতে কিছুতেই পুরুষের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ ফুটে উঠতে চায় না। সব দেখে শুনে প্রভার বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড হতাশা গুমনে গুমনে ফিরতে লাগল।

স্কুল আর কলেজের বার্ষিক স্পোর্টসের বিভিন্ন বিভাগের ফাষ্ট প্রাইজগুলো যাকে প্রতিবছর—মুটের মাথায় বয়ে বাড়ী আনতে হত, আর তারই স্বামী এই শশিনাথ! হোক না লেখাপড়া জানা জমিদারের বংশধর, হোক না বংশগৌরবে অভিজাত কিন্তু একী নির্জীব চেহারা। প্রথম দর্শনে শশিনাথকে দেখে—তার ছোট ভাই মনে করা আদৌ কঠিন নয়—অজানা কারও পক্ষে। এই তার স্বামী। তার সুখ দুঃখ, তার ব্যথা বেদনার আজীবনের সংগী! তার জীবন মরণের সহচর, পতি দেবতা। একটা

নাম না জানা বিতৃষ্ণা আর অতৃপ্তির দাবিদাহ তাকে যেন অগুরুণ পুড়িয়ে মারতে লাগল !

কয়েকটা দিন চলে গেল এইভাবে। প্রথম পরিচয়ের ব্যবধানটুকু ঘুচে যাবার সংগে সংগে—বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞানে প্রভার সঞ্চয়ের তহবিল ক্ষীণতর হয়ে উঠতে লাগল দিনের পর দিন। বাবা মা অনেক দিন পত হয়েছেন শশিনাথের। আত্মীয় স্বজন যারা এসেছিল বিয়ে উপলক্ষে, একের পর এক তারা বিদায় নিতে নিতে সর্বশেষ পরিবারটিও যে দিন চলে গেল—এবাড়ী ছেড়ে, সেদিন প্রভার বিষ্ময় চরমে উঠল। এতবড় সেকলে জমিদার বাড়ী, কিন্তু সে অল্পপাতে লোকজন একদম নেই বললেই চলে। শশিনাথ, সে আর বছর পনেরো বয়সের এক মামাতো দেওর নির্মল।...ছেলেটি প্রতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় এই বাড়ীতে আশ্রয় পায়, আর সেই অবধি এই বাড়ীরই একজন হয়ে বসবাস করছে। ছেলেটি ভাল। পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী। ক্লাশে প্রতি বছরই প্রথম স্থান অধিকার করে। এতদিন একরকম কাটছিল তার, কিন্তু প্রভা এ বাড়ীতে নতুন বোঁ হয়ে আসবার পর থেকে—সে যেন নতুন করে তার মাকে ফিরে পেল প্রভার মধ্যে। প্রভাও পরম স্নেহে তাকে বুকে টেনে নিল। নির্মলের সব আদর, আবিদার প্রভার কাছে কিন্তু অমন যে অমায়িক আর ব্যক্তিগত হীন শশিনাথ—তাকে দেখলেই নির্মল কেমন যেন ভয়ে কঁকড়ে যায়, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। এর পিছনে একটা ছোট্ট কাহিনী আছে। কিছু দিন

আগে শশিনাথের নিজস্ব আর প্রিয় সাইকেলটা নিয়ে—ভার সম্পূর্ণ অগোচরে সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে, একটা খাদে পড়ে গিয়ে, নির্মল নিজেও জখম হয়—সাইকেলটাকে গুরুতর রকম জখম করে নিয়ে আসে। শশিনাথ বাড়ীতে এসে এই দৃশ্য দেখে—রেগে গিয়ে নির্মলকে কয়েকটা চড়চাপড় লাগায়। আর সেই থেকেই শুরু হয়েছে নির্মলের শশিনাথ-আতঙ্ক। প্রভা অনেক চেষ্টা করেছে—ওকে আতঙ্কমুক্ত করতে, কিন্তু পারেনি। নির্মল এই বছরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে, আর তার জন্ত মাঝে মাঝেই বইখাতা নিয়ে এসে বসে প্রভার কাছে—তার সাহায্য নিতে। তবে শশিনাথের অগোচরে।...

এই কয়জন ছাড়া—আর একজন ঠিক কি আছে এ বাড়ীতে। সে ছবেল! এসে খালাবাসন মেজে দিয়ে চলে যায়। আর একজন আছে সরকার—জমিজমার তদারক আর আদায় পত্রের জন্ত। সে বাহির মহলে থাকে।

এই নিঃসংগ নির্জনতা হয়তো বা একদিন ধীরে ধীরে সয়ে যেত, কিন্তু প্রভার অন্তরাখ্যা বিজ্ঞোহ করল—যখন সে দেখল যে শশিনাথ—সমস্ত লজ্জা, সম্ভ্রম আর শিক্ষা, ভাব্যতা ভুলে গিয়ে, জাহাজের পিছনে পাখাবোটের মত উদয়াস্ত তারই পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কী—সে যখন রান্নাঘরে কাজ করছে, তখনও তারই পাশে হাংলার মত বসে শশিনাথ হাতে হাতে এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছে, গল্প করছে, কত রকমের হাসি, তামাসা, আর

কৌতুকের তুফান তুলে তাকে মাতিয়ে রাখছে।
বা কিছু করছে শশিনাথ—সবই তাকে কেন্দ্র করে।
শশিনাথের সব কাজ আর কথা—সেই হচ্ছে মধ্য
মণি।

সে কায়া—আর শশিনাথ যেন তারই ছায়া।
শয়নে-স্বপনে জাগরণে—সব সময়।

কত বলে, কত রকম করে মিনতি জানায় প্রভা :
লক্ষ্মীটি রাগ করো না আমার কথা শুনে। দিনরাত
তুমি যদি এভাবে অনন্দে বসে থাক, তা হলে বাইরে
ওরা যে ছুহাতে লুটেপুটে ছুদিনেই তোমাকে ফঁতুর
করে ছাড়বে।

এক তুড়ি মেরে সমস্তার সব জটিলতাকে
এক মুহূর্তে জল করে দিল শশিনাথ : খেৎ !
সরকার মশাই থাকতে কারও বাপের সাধ্য আছে
যে, একটা পয়সা এদিক ওদিক করে? তার চোখকে
কাঁকি দিতে পারে—এমন বাপের ব্যাটা আজও
জন্মায় নি। সরকার মশাই বাব আর বকুরিকে
এক ঘাটে জল খাওয়াতে জানে।

সরকারের দক্ষতা, সন্ততা আর কর্মকুশলতার
আরও কতকগুলি ফিরিস্তি বোধ করি আঙড়াতে
যাচ্ছিল শশিনাথ, এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল
প্রভা। বিরস কণ্ঠে বলল : ধামো বাজে কথা
বলোনা। তোমার সরকার মশাই বুঝি সাধু পুরুষ?
সে আর বুঝি নিজের লুটেতে জানে না?...

হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল শশিনাথ,—যেন
একটা অসম্ভব অবিদ্বান আর কৌতুককর কোন
কথা এই মাত্র কানে গেছে। হাসতে হাসতে

বলল : কী যে বল তুমি! সরকার মশাই হচ্ছে
বাবার আমলের আমলা। অত্যন্ত বিশ্বাসী আর
আমাদের পরম হিতৈষী।

শশিনাথের কুটিলতাহীন সরল মুখখানির দিকে
চেয়ে প্রভার যেন বুক ঠেলে কান্না এসে গেল। তীরে
দাঁড়িয়ে যে অর্বাচীন—মার্কণ্ডেরিয়ার আবর্ত পরিমাপ
করতে চেষ্টা করে, এমন লোককে নিয়ে কী করে
পারা যায়? যে কিছুতেই বুঝতে চায়না, তাকে
কী বলে বোঝাবে সে?

আর—শুধুই কী এই? আশ্চর্য! লোকটা
যেন কিছুতেই রাগতে জানে না। সামান্যতম
একটুখানি উত্তেজনা পর্যন্ত যেন নেই। এমন কী
চোখের সামনে অজ্ঞায় অনিষ্ট দেখলেও এতটুকু
বিকার নেই, মুখ থেকে একটা ছোট ভৎসনার
কটু কথাও বেরুতে চায় না। এমন অসামান্য সহন-
শীলতা আর বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা রক্ত যে—কোন
পুরুষের অস্থি, মজ্জা, আর স্নায়ুকে স্তিমিত করে
রাখতে পারে, প্রভা তা জীবনে এই প্রথমে দেখল।

একদিন স্নানের ঘাটে চোখ বন্ধ করে মাথায়
মুখে সাবান মাখতে গিয়ে, প্রভার বাঁ কানের
মূল্যবান ছলটা কীভাবে যেন খুলে গিয়ে জলে পড়ে
গেল। খবরটা শুনে শশিনাথই যেন—প্রভার
চেয়েও বেশী লজ্জা পেল। আর তারই ফলে—
অনতি বিলম্বে সরকার মশাইকে পাঠিয়ে স্বর্ণকারকে
ডেকে এনে, সেই দিনের মধ্যেই অনুরূপ একটি ছল
গড়িয়ে দেবার বায়না দেওয়া হল।

আর একদিন—ঐতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে

নিয়—ঘরে ঢুকবার মুখে, কী ভাবে যেন দরজার পর্দায় আটকে প্রভার হাত থেকে ঝেঁপে গিয়ে পোটা সেটাই এক লহমায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। প্রভা তো অপ্রস্তুতের একশেষ! ঐ টি-সেটটি শশিনাথ কত সখ করে অনেক দামে কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল। প্রভা এই দুর্ঘটনার ফলে প্রতিমুহূর্তে আশংকা করছিল—অমন প্রিয় জিনিষটি লোকসান হওয়ার ফলে, এখনই হয়তো শশিনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে তিরস্কার করবে। আর না হয় তো—অভিভাবক সুলভ গম্ভীর কণ্ঠে ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্কতার সংগে চলাফেরা করবার জ্ঞান কোন সারগর্ভ উপদেশ দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—ওসব কোনটারই ধার দিয়েও গেল না শশিনাথ। পরন্তু কাপড়িস ভাঙার শব্দে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে, মেঝে থেকে ভাঙা টুকরোগুলো নিপুণ তৎপরতার সাথে কুড়িয়ে তুলতে লেগে গেল।

একদিন কথায় কথায় প্রভা বলল : আচ্ছা, তোমার লজ্জা করে না—দিনরাত এই ভাবে বোর আঁচল ধরে ঘুরে বেড়াতে?

: লোকে তোমাকে এই সব কথা বলে তাভায় বুঝি? একটা পরম পরিতৃপ্তির আমেজ ফুটে উঠল শশিনাথের চোখে মুখে। হেসে বলল : বলুক না, যত পারে বলতে দাও। যত পারে বলুক না, শুনে তো ভালই লাগছে!...

দেখতে দেখতে আর শুনে শুনে শেষ পর্যন্ত প্রভার সাহের সীমা ছাড়িয়ে গেল। লোকটা বাইরেই শুধু ব্যক্তিহীন নয়, অন্তরেও বিচারবুদ্ধি-

হীন অসামাজিক একটা জড়পদার্থ! আর এই তার স্বামী! জৈশ্ব স্বামীই শুধু নারীর একমাত্র কাম্য নয়, সে চায় অন্যদের বাইরেও স্বামীর একটা বলিষ্ঠ ভাবমূর্তি! আর এইখানেই প্রভা সর্বরিক্তা!

পোপনে অনেক চোখের জল আর বৃকের অতলাস্ত থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে একদিন তার দাদাকে চিঠি লিখল প্রভা,—তিনি যেন চেষ্টা চরিত্র করে শশিনাথের জ্ঞান একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেন তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানে। একভাবে দিনরাত বাড়ীতে বসে থেকে, একটা সুবশক্তির এ হেন অবক্ষয় আর চোখে দেখা যায় না। প্রভা এই সব নানা প্রসংগের অবতারণা করে নানাভাবে শশিনাথের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল দাদার কাছে আর সেই সাথে জানাল অনুরোধ। তবুও তো এর ফলে সুযোগ হবে—বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবার, পাঁচ জনের সাথে মিশবার। প্রভার দাদা জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের একজন বড় অফিসার। প্রভার চিঠি পেয়ে দাদা লিখল : তুই শশীকে শিগুগির কলকাতায় পাঠিয়ে দে। করাল এরিয়ার জ্ঞান কয়েকজন পাবলিসিটি অফিসার রিক্রুট করা হবে। শশীকে না হয়—তোদের এরিয়ার চার্জ দিয়ে পাঠিয়ে দেব। ঘরের খেয়ে চাকরি করবে, এর চাইতে আর কী সুবিধা চাস? শিগুগির যেন চলে আসে, কাজ হবেই।

সব শুনি—প্রভার জেদের ফলে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবশেষে একদিন শশিনাথ রওনা হল কলকাতায়। বাড়ী থেকে রেলস্টেশন প্রায় চার

মাইল কাঁচা রাস্তা। যেতে হয় গরুর পাড়ীতে। ট্রেন রাত সাড়ে আটটায়। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই—খাইয়ে দাইয়ে, সব শুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে—প্রভা তুর্গা নাম স্মরণ করে, রওনা করে দিল—শশিনাথকে।

শশিনাথ ব্যবস্থা করে রেখেছিল—যে কয়দিন সে বাড়ীতে থাকবে না, ঠিক কি সে কয়দিন রাতে থাকবে প্রভার কাছে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, কি রাতে এ বাড়ীতে থাকা তো দূরের কথা, কাজেই সেদিন এলনা বিকালের দিকে। শশিনাথ রওনা হয়ে যাবার অনেক পরে সে খবর পাঠাল—ছেলের হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখ হওয়ায় সে যেতে পারবে না। খবর শুনে প্রভা বিপদে পড়ে গেল। এতবড় ঘরটার মধ্যে একা থাকার কথা মনে করতেই ভয়ে তার বুক শুকিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে নির্মলের পড়ার ঘরে গিয়ে ধরা দিল প্রভা : লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আজ রাতটার মত আমার ঘরে গিয়ে পড়াশুনা করবি চল।....

এদিকে ষ্টেশনে পৌঁছে টিকিট কিনতে গিয়ে শশিনাথের খেয়াল হল,—সে তাড়াতাড়িতে ভুলে টাকা পয়সা সমেত মণিবাগটা ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে এসেছে! সাপে বাড়তি একটা পয়সাও নেই। অপত্যা কী আর করে! বাধ্য হয়েই, তাকে আবার এসে গরুর গাড়ীতে চাপতে হল।...বাড়ীর ছয়ারে যখন গাড়ী এসে দাঁড়াল—রাত তখন প্রায় দশটা। পাড়া গাঁয়ের পক্ষে অনেক রাত, সমস্ত গ্রামটা যেন এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেউড়ির সামনে

দাঁড়িয়ে সে দেখল সমস্ত বাড়ীটা একরাশ কালো অন্ধকারের মধ্যে প্রেতপুরীর মত খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে উঠোনে পা দিয়েই তার ভুল ভাঙল। তাদের শোবার ঘর থেকে—জানলার কাঁক দিয়ে, আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। আর তারই সাথে দ্বৈত-কঠোর একটা উদ্দাম হাসির ফোয়ারা বাঁধভাঙা জোয়ারের মত উচ্ছল আবর্তে ঘরের চার দেয়ালে আছড়ে পড়ছে। প্রভার সাথে অস্ত্র যে কণ্ঠটি যুক্তভাবে উচ্ছলিত হচ্ছে—তা যে কিয়ের নয়, এমন কী কোন নারীরও নয়, সে বিষয়ে শশিনাথ নিঃসন্দেহ! তবে কে হতে পারে—এতরাতে প্রভার শয়ন কক্ষে? আর কেনই বা সে এল—তার সাময়িক অস্থপস্থিতির সুযোগে! আর এলই বা কী করে বলা যায়—? সে যে আমন্ত্রিত—তাতো উভয় কঠোর উল্লাসেই প্রমাণিত সত্য! মনে মনে এই সব বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, কে যেন তার সমস্ত শরীরের রক্ত কণিকায় একটা অসহ্য দাবদাহ ছড়িয়ে দিল মুহূর্তের মধ্যে। কান মুখ দিয়ে যেন স্তম্ভিত আগুনের হলুকা বের হতে লাগল। সমস্ত শরীরের পেশীগুলো নিজের অজ্ঞাতেই এক সময়ে দৃঢ় আর সঙ্গবদ্ধ হয়ে যেন প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্তু হংকার দিয়ে উঠল।....অবশেষে প্রভা এই? এতক্ষণে যেন সব কুয়াশা কালিমা ফেটে গিয়ে, তার চোখের সামনে দিনের আলোর মতই প্রতিভাত হয়ে উঠল—প্রভার আর একটি রূপ। এইবারে সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে—কেন প্রভা দিনের পর দিন তাকে নানাভাবে প্ররোচিত করেছে—

কলকাতায় যাবার জন্ত। এত বিশ্বাস, এত সম্মান আর বুকচিড়ে ভালবাসার রক্তপদ্মটি যার পায়ে সে অকুণ্ঠ নির্ভায় অঞ্জলি দিয়েছে, যাকে সে মাথার মনি করে রেখেছে পরম বিশ্বাসে, তার এই প্রতিদান ! তার এতবড় বিশ্বাসের পানপাত্রটি এমন আকর্ষণীয় কালকূটে ডরা ! প্রভা অসতী ! সে ঐশ্বর্যিণী !

তার সমস্ত স্তিমিত অমূল্যত্বগুলো যেন এক অদ্ভুত যাত্র বলে মুহূর্তের মধ্যে একটা দুর্দম প্লাস্টিক সস্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।....

বারান্দায় উঠেই সে প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় লাথি মারল। আর সংগে সংগে ভিতরের উদ্দাম হাসির রোল যেন মস্তবলে শুরু হয়ে গেল।

একটু পরে প্রভার শংকিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল : কে ? সহজ আর স্বাভাবিক গলায় উত্তর দেবার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে, শশিনাথের অন্তরে কে যেন তার মুখ দিয়ে দানবীয় কণ্ঠে হংকার ছেড়ে উঠল : আমি দরজা খোল।....

পরক্ষণেই ভিতরে একটা ছোটোপুটি শুরু হয়ে গেল। কে যেন ঘরের পিছন দিকের দরজাটা খুলে অভিজ্ঞতায় পালিয়ে গেল, বাহিরে বন্ধদরজার সামনে দাঁড়িয়েও তা স্পষ্ট বুঝতে পারল শশিনাথ। তার একটু পরেই প্রভা এসে দরজা খুলে দিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল : সে কী ! তুমি ফিরে এলে যে ?

শশিনাথ দিক্‌বিদিক্‌ স্তান শূন্য হয়ে ছুটে এসে খপ করে প্রভার টুটি চেপে ধরল : খুবই বুঝি

অসুবিধা হল সারারাত নাগর নিয়ে ঢলাঢলি করার—তাই না ? আর এরই জন্ত আমাকে কলকাতায় পাঠাবার বুঝি এত তাড়াহুড়ো ?

এত জোরে টুটিটা চেপে ধরেছে শশিনাথ যে, প্রভা চোখে মুখে অঙ্ককার দেখতে লাগল। অতিকণ্ঠে রুদ্ধকণ্ঠে কেবলমাত্র বলতে পারল : হিঃ ! ওতো নিম্ন ঠাকুর পো !

: চোপ্‌রাও হারামজাদী বেইমান কোথাকার ! সশব্দে প্রভার পালে একটা প্রচণ্ড চড় কমে দিয়ে বজ্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠল শশিনাথ : নরকেও তোর মত ভ্রষ্টার ঠাই হবে না। চড় খেয়ে চোখের সামনে সব অঙ্ককার হয়ে গেল প্রভার। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে দরজাটা চেপে ধরে কোনমতে নিজেকে সামলে নিল। তারপর চোখ তুলে সামনে দাঁড়ানো শশিনাথের পুরুষ-কঠিন ভংগী,—আর হিংস্র মুখের দিকে এক ঝলক চেয়ে দেখেই...তার সব অপমান আর ব্যথা যেন এক নিমেষে ভুলে গেল প্রভা। এ যেন তার সব সময়ের দেখা শশিনাথ নয়, এ যেন অজ্ঞ কেউ ! দীর্ঘায়ত—বলিষ্ঠ আর প্রচণ্ড এক পৌরুষের প্রতিমূর্তি ! অভিমান আর যন্ত্রণা সব ভুলে গিয়ে হাঁটু পেড়ে মেঝেতে বসে শশিনাথের জুতার ফিতা খুলতে খুলতে স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে বলল প্রভা : আজ আর মাথা গরম করে রাত জেগে কাজ নেই। জামা খুলে শুয়ে পড়। কাল সকালে সব শুনো।

সোনালী মাছ

মানসী দাশগুপ্ত

দাদামণি আমাকে কাদাইয়ে রেখে-গিয়েছিল মণিদার ভরসায়, মণিদা নাকি এখন ওখানেই তাঁর কর্মকেন্দ্র করেছেন এই শুনেই দাদামণি কাদাইয়ে দাদামশাইকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। দাদামশাইয়ের ছিল কবিরাজী ভেষজের পুরোনো ব্যবস্থা, ছুটিতে ছাটার তাঁর শেকড় খাল দেওয়ার কাজে সহায় হতে না গেলে চলবে কেন বলে দাদামশাই আদর করে চিঠি দিলেন আমাকে। আমাদের কলকাতার ছোট বাড়িতে কেবল দাদামণি আর আমি, মা তো কোনকালে চলেই গিয়েছেন, বাবাও আর নেই, তাই দাদামণি যতো প্রাণ করে কেবল আমাকে নিয়ে—এইসব কথা অনুযোপের সুরে বলতে বলতে মামীমা আমাকে আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গেলেন, দাদা অনেক ডাকাডাকি করে আমাকে ফিরিয়ে বাইরে এনে মণিদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মণিদা সেদিন বলেছিলেন, ‘বাঃ, এ একেবারে দৈব যোগাযোগ, আমি সব ভাবছি সাংবাদিকতায় মেয়েদের এনে ফেলা দরকার! শুনে দাদা উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, ‘কেলো না তাই, শমিতা তো বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে এখন ফলের অনন্ত প্রতীকার বলে থাকবে, ওর ফেলের খবরটা

না বেরোনো পর্যন্ত ও রইলো তোমার জিম্মায়!’— ব্যাপাটা তাও শেষ পর্যন্ত অস্থিরকম হয়ে গেল।

দাদামণি চলে যাওয়া পর্যন্ত সবাই মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন—যেন কিছুটা হয়নি। শুধু মামীমা বললেন, ‘ও কিশোর, তুমি মণিবাবুকে অত চেন তো বললেন কেন একটু মাছের ব্যবস্থা যাতে হয়, খাওয়ার বড় কষ্ট এখানে।’ উত্তরে দাদামণি হাসলো যেন মামীমা বেশ একটা মজার কথা বলেছেন, ঐ পর্যন্ত। তাঁরপরে যেই না দাদামণিও গিয়েছে, আমার মামাতো ভাই তপু অমনি বলে, ‘দেখলে মা কী খড়িবাজ লোকটা, ঝট করে অমনি শমিতাকে লেখার কাজে বসিয়ে দিতে চায়। আমি আজ ছপুয়ে প্রভঞ্জনকে ডাকবো, মা, তুমি বসবে তো কুতে?’

আগে আগে কতবার এসেছি প্রভঞ্জনের নাম শুনি নি তো?

তপু বললো, ‘কী করে শুনেবে? ওতো ওই তোদের মণিদার শিক্ষিত বেকার প্রকল্পের ব্যাপারে টানে টানে এসেছে গেলবছর।’

‘মণিদার কাগজে কাজ করে বুঝি ও?’— সহকর্মী সংযোগ সম্ভাবনায় ভারি উৎসাহ হয় আমার।

তপু বলে, 'কাগজ? মণিদার কাগজ? ওঃ, ওই সপ্তাহ সমীক্ষা? ওই আবার কাগজ নাকি মণিদার? ঢাকনা, ঢাকনা বলে ওকে। থাকো কদিন টের পাবে।'—বলে তপু বিজ্ঞের মতো হাই তুললো।

দেখতে পারি না এইসব ছেলেদের যারা বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই নিজেদের সবজ্ঞান্ভা ভাবে। মামীমা বললেন, 'ওসব বলছিস কেন তপু, কিশোর ওকে যা বলে গেছে ও করুক সেইমতো বাপু। কে জানে কাগজের কাজকর্ম হয়তো মণি জানে ভালো।'

মণিদাকে নিয়ে কী একটা ব্যাপার আছে এটা এইভাবে আঁচ পেলাম বলেই বোধ হয় আমার শিকানবীশী ভেমন জমলো না। বরং দুচারদিনের মধ্যে ভাসখেলা এমন জমে উঠলো যেন জন্মকাল ধরে ভাস খেলবো বলেই আমার দেহধারণ। একদিন প্রভঞ্জন না এলে আমার রাগ হয়ে যায়, মামীমা যদি বলেন 'আয় না তিনহাতে খেলি' তাতে আরো বেড়ে যায় সে রাগ। তিনহাতে কেউ ভাস খেলে নাকি? তা ছাড়া কেন খেলবো কেন তিনহাতে, প্রভঞ্জনের কী এমন রাজকাজ? তপু বলে, 'বলবো তোমায় একদিন, দারুণ একটা লড়াই করছে প্রভূদা, দাছুর পুকুরটা জমা নিয়েছে তো, মাছ ছেড়েছে—এখন সময় হয়ে আসছে বেশ বড়ো চালান ছাড়বার। এখন খুব তকে তকে আছে, গেল বছর হয়েছিল কি?'—

গেলবছর দাদামশাইয়ের পুকুরের মাছে কী সব যেন মড়ক লেগেছিল না কি আমি শুনেছিলাম সে সব ঝাপসা ঝাপসা। প্রভঞ্জন তার মধ্যে কী করে আশ্বিন '৮২—৩

জড়িয়েছে তা অবশ্য আমি বুঝতে পারলাম না, আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওসব ইজারা টিজারার চেয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে বেড়ানো কত ভালো। আমাকে দিয়ে মণিদা একটা ফিল্ম রিভিউ লিখিয়েছিলেন—মফঃস্বলে অবশ্য সেটা বেশিদিন নিয়মিত করা শক্ত, কটা বা ফিল্ম হাউস। কিন্তু হলো কি, যেই একবার আমার রিভিউ বেরোলো, একটা নতুন জিনিস বেরিয়েছে বলে সবাই আহ্লাদ করতে লাগলো, তপু আর ওর প্রভূদা বললো, 'এর পরের বইটা চলো একসঙ্গে দেখে আসি।' মণিদা আমায় ডেকে বললেন, 'সিনেমা টিনেমা নিয়ে লেখা মফঃস্বলে কেউ বুঝতে পারে না, ওসব থাক।'—শুনলাম এবার আমায় জীবননিষ্ঠ লেখা লিখতে হবে যথার্থ জনগণ কী করে কী বলে এসব দেখে শুনে দিনকতক এইসব কথা বলে বলে আমায় শেখাতে লাগলেন মণিদা, বাড়ি এসে আমি কী লিখি কী লিখি করে কলম কামড়াতে লাগলাম। দাদামণি প্রতি চিঠিতেই অত্যাশ্চর্য খবরের সঙ্গে এটাও-খোঁজ করতে লাগলো যে আমার মণিদার সঙ্গে কাজ কী রকম এগুচ্ছে। মামীমা বললেন, 'কিশোরের একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার, তাহলে ওর কাণ্ডজ্ঞান বাড়বে।'

আমি তপুকে এককোঁকে জিগগেস করে ফেললাম 'মণিদার ব্যাপারটা কী? দাদামণিকে তোমরা বললেই পারতে থুলে।'

তপু অক্লেশে বললো, 'আমরা বলবো কেন, তুমিই বলবে দেখে শুনে, বাইরে থেকে হঠাৎ শুনে

গল্প কথা মনে করে 'কিশোরদা' কী ভাবতে কী ভাবতো—ওরকম বলা যায় না।'

আমার মনে হলো শত হলোও মণিদা আমার গুরু, তাঁর সপক্ষে কিছু বলা তো উচিত, তাই আমি বললাম, 'উনি কিন্তু বেশ প্রতিষ্ঠাবান লোক, অথচ দেখো তারই মধ্যে আমাকে সময় দিয়ে লেখা টেখা শেখাচ্ছেন।'

তপু বললো, 'সে আর বলতে, কোথায় কী রকম টোপ ফেলতে হয় মণিদার বেশ জানা আছে।' আমি বলে উঠলাম, 'ধ্যোং মণিদা সে সব দিক থেকে লোক ভীষণ ভাল, ওসব কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে টানে ওসব নেই-ই ওঁর মধ্যে, জানো?'

এতবড় কথাটাতেও কান দিল না তপু—কী একপুঁয়ে ছেলে না—বললো, 'আরে মণিদার সময় কোথা ওসব কাব্য কাব্য তুর্লভ প্রেম নিয়ে মাথা ঘামাবার, টাইপটা আলাদা, —বলছি কী!—বলেই কিছুর মধ্যে কিছু না বলে বসলো, 'প্রভুদা একটা দারুণ লোক না?'

আমি বিবেচনা করে বললাম, 'বেশ ভালো তাস খেলেন।'

তপু বললো, 'তুখু তাস খেলা নাকি, সবদিকে—ওরকম একটা মানুষ হয়না।'

কথাটায় আমার মনের মধ্যে সায় বাজতে থাকে বলে আমি নিজের ওপরে বিরক্ত হই একটু একটু, কী না আমি জানি তপু প্রভু দাদাকে, কটা কথা বা তাঁর বলবার সময় আছে আমার সঙ্গে যে আমি অতো বুঝতে পারবো। আমার কী দরকার অতো কথায়।

আমি তাই মামীমার কাজে সাহায্য করতে চাই। এমনি করে কয়েকটা দিন কাটলো। আমার লেখা আর এগোচ্ছে না। যা লিখে নিয়ে যাই মণিদা বলেন, 'সংবাদের ঠিক কেন্দ্রে যেতে হবে বুঝলে, সোজা, খাঁটি তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদভাষ্য—ওটা লোকে খুব বোঝে, বুঝলে না?'

দিনটুই আমরা বিকেলে বেড়াতে গেলাম দূরে দূরে, তপু, আমি আর প্রভঞ্জন—মামীমাই ঠেলেঠেলে পাঠালেন, রোজ ঘরে বসে তাস খেলা নাকি ভালো নয়। দাদামণির চিঠি এলো আমি নাকি খুব সাংবাদিকতা ব্যাপারটা শিখে নিচ্ছি, যদিও এখনি কিছু লিখছি না, কিন্তু কাজে লেগে আছি খুব ভালো সেইটাই। এই চিঠির বিষয় নিয়ে আমার কেন যেন প্র-ঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, একটু কী ভাবে কথাটা তোলা যায় ভেবে না পেয়ে সেদিন আমি সোজাসুজি বললাম, 'জানেন আমি তো ফিচার লিখছি এটা সেটা বিষয় নিয়ে, মানে খুব সামাজিক সংবেদন থাকা চাই আর ওই তথ্যনিষ্ঠা—এইসব। বসুন তো একটা ছোটো বাস্তব ঘটনা কী ঘটেছে এখানে যাকে কেন্দ্র করে বেশ তাজা মুড়মুড়ে ফিচার লেখা যায়?'

প্রভঞ্জন বললো, 'কেন? এই যে আপনি একটা কর্মসংস্থান পেয়েছেন—কর্ম নেই কিন্তু সংস্থান আছে এই তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে থবর।'

কথাতুলোর মানে কি, আমাকেই খোঁচা দেওয়া হচ্ছে নাকি এসব বলে ভাবতে ভাবতে আমি বললাম, 'আমি তো বলতে গেলে বাইরের লোক, এখানে যাঁরা

‘থাকেন’ সাধারণ মানুষ—যেমন ধরুন এই আপনার বা আপনাদের পাড়াপ্রতিবেশীর জীবনে যা ঘটেছে এগুলির সন্ধান পেলে হতো।’

প্রভঞ্জন একটু বঁকা চোখে তাকালো কিন্তু হাসলো মোজাসুজি। বললো, ‘সেই খবরই তো বলছি, মফঃস্বলের লোক কাজ করছিল ঠিকের কাগজে, আরও পাঁচটা ঠিকে ঠেকানো ছিল, সেই পাঁচটায় পাঁচ লাগে খোলে, কাগজে সেটার খেই ধরাতে ঘাই, অর্মান ভেঁ কাটা !

আমি কথটা বুঝবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, ‘এখন তো আর আকাশে’ উড়ছেন না, নেমেছেন জলে।’

—হ্যাঁ, আপনার দাদামশায় সহায়, আমার জলের শস্ত চাষ হচ্ছে, কিন্তু শেষরক্ষা হবে কি না বলতে পারি না। তখন বলবো যা হয়, আপনার লেখার বিষয় হবে,—কী বলেন ?’

আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না, আমার ইচ্ছে করলো তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকতে। কিন্তু সে যদি কিছু ভাবে তাই আমি চোখ নীচু করে চূপ করে হাঁটতে লাগলাম তার পাশে। নিতান্ত অকারণে আমার বিষয় লাগলো, মনে রইলো না আমি কেবল তপু আর তার প্রভুনার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি, মনে হলো খুব সুন্দর এক আকাশের তলে জীর্ণ মফঃস্বলের ধূলিজঞ্জালসার রাস্তা ধরে আমরা সবাই যেন অনন্তকাল ধরে হাঁটছি, হাঁটবো, কোথায় যে যাচ্ছি, কোথাও যাবো কি না, তা কেউ জানি না। হঠাৎ তপু কী যেন বলে উঠলো

নীরবতা ভাঙবার জন্ত, আর আমার আচমকা মনে হলো দাদামশি এলে বেশ হয়।

বাড়ীতে ফিরতে মামীমা বললেন, ‘শমি, সপ্তাহ সমীক্ষার আপিস থেকে তোমায় জ্বার ডেকে গেছে, আজ না পারো তো কাল যেও।’

তপু বললো, ‘কাল কেন? চলো আজ তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি, সন্ধ্যা হতে এখনো ঢের দেরি।’

আমি তো অবাক, তপুর এতো উৎসাহ কেন আমার? বললাম, ‘থাক না, কালই যাবো।’

সে বললো, ‘না, না, আজই দল বেঁধে চলো।’ বো মোংসাহে বেরিয়ে পড়ে সে বললো, ‘তুমি কী বলো প্রভুনা? এইটাই ঠিক না? এ যাওয়াটা শমিকে বন্ধ করতেই হবে, যতো ঘন ঘন এখন যাবে, ততো ভাড়াভাড়ি যাতায়াত বন্ধের দিন এগিয়ে আসবে, সেই তো ভালো?’

প্রভঞ্জন অশ্রুমনস্কভাবে বললো, ‘যতোটা নিশ্চিত যদি হওয়া যায় তাহলে অবশ্য’—

তপু মহা কৌতুকে হাসতে হাসতে বললো, ‘নিশ্চিত বলে নিশ্চিত।’

কী নিয়ে এদের হাসি এবং কথা কে জানে, হৈয়ালি জানে বটে এরা : আমি খানিকটা দূর দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। মণিদার অফিসের কাছে আমায় ছেড়ে দিয়ে তপু বললো, ‘আমি ফিরবো ঘণ্টাখানেক বাদে তোমায় নিতে, তার মধ্যে যদি হয়ে যায় তোমার কাজ, একটু বসো।’

প্রভঞ্জন ব্যবস্থাটা লক্ষ্য করিনি নাকি আপে?

একটু হেসে বললো, 'নজরবন্দী নাকি ইনি? পাহারা ছাড়া চলাফেরা নিষেধ?'

তপু অপ্রস্তুত হলো কি না কে জানে, আমি বললাম, 'আমি তো যেতেই পারি, ও আসছে এ পথ দিয়েই ফিরবে তাই, একা একা হাঁটতে বিস্ত্রী লাগে অন্ধকারে।'

তপু খুশি হয়ে প্রভঞ্জনকে বললো, 'তুমিও বরং থেকো আমার সঙ্গে।'

মণিদার জানার দরকার ছিল আমি খবর টবর কী নিতে শিখলাম না শিখলাম। টাউনহলের অভ্যর্থনার কথাটা আমি জানতাম নাকি, সেখানে না গিয়ে নদীর ধারে প্রকৃতির শোভা দেখে বেড়ালাম কেন তা হলে,—এ সব প্রশ্ন মণিদা ঠিক যেমন হাসি হাসি অস্বাভাবিক ভাবে নিয়ে করে যান তেমনি করেই করছিলেন, আমি চুপ করে আছি দেখে তিনি কথা থামিয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'রাগ করলে নাকি? কথা বলছো না যে?'

আমি বললাম, 'না রাগ আবার কি? আমার এদিক ওদিক বেড়াতে বেশ লাগে, না বেড়ালে খবর পাওয়া যায় না তো। আমি এখানে চাষ আবাদ, ছোট শিল্প টিল্প, মানে, ইয়ে, কে কি নিয়ে কাজ করছে তাই দেখছি টেখছি।'

মণিদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'ওভাবে ঘুরে ঘুরে সার্ভে করা ঠিক নয় তো এসব জায়গায়, টেকনিকটাও তোমার খেখা দরকার। আপাতত এই রিপোর্টটার বাংলা করো—আমি ঘড়ির দিকে তাকাত্তে তাকাত্তে কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করতে

লাগলাম। তপু এ অফিসে আগেও এসেছে আমাদের নিতে, প্রভঞ্জনকে নিয়ে তো আসেনি কখনো, আমার কেমন মনে হতে লাগলো অজ্ঞাত সে না এলেই ভালো হয়। তার চেয়ে বরং আমার আগে কাজ শেষ হয়ে যায়, আমি চলে যাই—সে টের ভালো হয়। এই প্রথম আমার মনে হলো মণিদার অফিসে বসে কাজ করার একটা অস্বস্তি আছে। মণিদা আবার টের পেলেন কি না কে জানে, দাদামণিকে কী লিখবেন হয়তো।

প্রভঞ্জন মণিদার অফিসে সেদিন এলো না অবশ্য, কিন্তু মণিদা সম্পর্কে অস্বস্তি আমার বেড়ে গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। দাদামণি আমায় চিঠিতে কতকগুলো বাজে কথা লিখলো প্রভঞ্জনকে নিয়ে। তাকে কেউ বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়েছে যে প্রভঞ্জন খুব সাংঘাতিক লোক, তার পাল্লায় পড়লে কী হতে পারে তার ফিরিস্তিও সে অবশ্য দিয়েছে, আর, তার চেয়েও যা সাংঘাতিক কথা, মণিদার কাছে বন্ধু হিসাবে দাদামণি মতামত চাওয়ায় তিনি নাকি খুবই ভয়ভয়ে যথার্থ বন্ধুর মতো দাদাকে জানিয়েছেন যে ওই ছেলেটিকে দূরে রাখাই সমীচীন। আমি রাগের চোটে চোখ মুখ ফুলিয়ে বসে রইলাম সারাদিন। দাদামণি সে সময় এসে পড়লে একটা কাগুই হতো আমাদের ভাইরোনে। তার বদলে মামোমা এসে বসলেন আমায় নিয়ে। বললেন, 'টের মান করেছিস, এখন যা, প্রভঞ্জন এসেছে, তপুও তৈরি, ঘুরে আয়। লোকের উড়ো কথায় যতো কান দিবি ততো পরহজম হবে। ওসবে কান

দিতে আছে কখনো?—কী ভালো যে লাগলো আমার মামীমাকে। আমি উঠে পড়ে বললাম, ‘তুমি কিন্তু দাদামণিকে চিঠি লিখবে একটা এ বাপারে।’

মামীমা বললেন, ‘লিখবো, বাপারটা আগে কী দাঁড়ায় দেখি।’

তপুর মতোই মামীমারও হৈয়ালি করে কথা বলার বৌক আসে মাঝে মাঝে। আমার মনে পড়লো দাদামণিকে বিয়ে দেওয়ার কথা একবার হঠাৎ বলেছিলেন মামীমা, কে জানে তার ভিতরেও কী গূঢ় অর্থ আছে! কথাটা মামীমাকে বলবো বলবো করে ঠোট ফাঁক করতেই মামীমা বললেন, ‘অমন বিড় বিড় করিস না, দেবো ব্যবস্থা করে সব, এখন যা তো।’

বাইরে এসে দেখি প্রভঞ্জনর মন খারাপ, মুখ যাকে বলে অন্ধকার। কে জানে ওকে কী বলেছে আবার কে। তপু আমায় কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বললো, ‘শমি, আজ আমরা প্রভুদার আস্তানা দেখতে যাবো।’

আমি খুব উৎসাহ করে বললাম ‘সত্যি?’—বলেই আমার মনে মনে একটু সঙ্কোচ হলো, অতো ব্যগ্রতা দেখানো ঠিক না বোধ হয়। কিন্তু কার বা তাতে কী এসে গিয়েছে। প্রভঞ্জনর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখ যেমন তার তেমনি ভার হয়েই আছে, সে যেন শুনতে পায়নি আমাদের কথা, দেখতে পায়নি আমার হঠাৎ লজ্জা।

তপু পথ চলতে চলতে বললো, ‘কিছু একটা হয়েছই ধরে নিচ্ছ কেন? প্রভুদা?’

প্রভঞ্জন বললো, ‘কারণ আছে।’

তারপর আমরা আবার হাঁটিতে লাগলাম। খুব কাছে নয়, খুব দূরে নয় প্রভঞ্জনর চালাঘর—দাদামশায়ের পুকুরপার ঘেঁষে। প্রভঞ্জন আছে ওখানে প্রায় গুরুর আশ্রমে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচারী যেমন করে থাকতো, তেমনি করে—কঠে, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনে—নিজেকে গড়ে তুলবার আশায়। কর্মপ্রকল্প প্রভঞ্জনর কাছে কীকা শব্দ নয়, মস্তো বড়ো একটা সাধনার চেষ্টা। এসব তপু বলে; আজ আমি দেখতে যাচ্ছি তার সেই সাধনাশ্রম, তার মুখে অথচ একটু আনন্দ নেই, কীচা মেঠো-পথের দুদিকেই কী যেন যত্ন করে দেখতে দেখতে চলেছে সে, হঠাৎ কিছু একটা দেখা যাবে। বিড় বিড় করে বললো, ‘সারাদিন ধরে কী হয়েছে জানি না, আমি ওদিকটায় ছিলাম।’

তপু বললো, ‘লোকটাকে ধরা গেছে?’

প্রভঞ্জন বললো, ‘হ্যাঁ, কিন্তু হাতে নাতে নয়তো, প্রমাণ নেই বলে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ, রাতবিরেতে পুকুরপাড়ে বসে যায় কতো কারণে লোকে—এইসব বলবে সেবারকার মতো।

মাছের ব্যাপার নিশ্চয়—মনে হলো আমার, কিন্তু শুখোলে কী জানি কী বোকার মতো বলা হয়। ভয়ে আমি নিঃশব্দে রাস্তার ধারে দূরে ঝাপখোলা দোবান অকারণ সরু ভাঙ্গা গলি, পৈঠে তোলা রাস্তা হোঁয়া দালান দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম ওদের সঙ্গে, কিন্তু ওদের থেকে আলাগা হয়ে। এমন সময়ে দেখা গেল উণ্টো দিক থেকে আসা দলটিকে, তপু আর

প্রভঞ্জন দাঁড়িয়ে গেল থমকে, থেমে গেলাম আমিও।
'টনাদা বলে ডেকে ওঠায় তপূর দিকে যে কালো আর
পুরু গাঁথুনির মানুষটি এগিয়ে গেল তার হাতে ধরা
ছিল কাঁধে বেয়ে নেমে আসা বিশাল জ্বালের অগ্রভাগ
এ রকম আশ্চর্য সুন্দর বিরাট জ্বাল আমি কখনো
দেখিনি আগে যা এতো যত্ন করে বয়ে নিয়ে যেতে
হয়। কিন্তু মাছ কই, মাছ? পিছনে দলের লোক-
গুলি থেমে দাঁড়িয়ে পরস্পরের প্রতি এবং প্রভঞ্জনকে
উদ্দেশ্য করেও কিসব বলাবলি করতে লাগলো।
ভাদের দিকে না তাকিয়ে প্রভঞ্জন টনাদার চোখে চোখ
রেখে তাকিয়ে রইলো ধ্বনিকক্ষণ যেন তারা কোনো
সংকেতে কথা বলছে। টনাদা তারপরে বললো
আপনারে যা বললাম ভাই।

প্রভঞ্জন আস্তে আস্তে বললো, সব গেছে?

—সব।

তপু গলা দিয়ে একটা চমকের শব্দ করে
উঠলো।

প্রভঞ্জন একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলো,
সারাদিন হেঁচলে পুকুরে, নিজে নিলে না কিছু?
টনাদা অপ্রতিভ হাসি হাসলো, হয়তো সে নিয়েছে
কতক, আপেই, কিংবা, কে জানে, হয়তো ভয় পেয়ে
জনতাকে বিলিয়ে দিয়েছে বিবাক্ত মাছগুলি।

প্রভঞ্জন হেসে নিজের কথার জের টেনে
বললো, না নিয়ে থাকলে ভালোই করেছ, এদের
ভিতরে এত বিষ, খেলে কিছু হবে না, কিন্তু তোমার
আমার সইবে না কি বলো?

টনাদা চিন্তা করে বললো, জ্বলটো নষ্ট হলছে,

তেখে মাছ মরছে, মাছে বিষ নাই। এত লোক
সব এতটুক-টুক পাবে তো।

প্রভঞ্জন একটু সময় নিলো তার কথা বুঝতে,
বললো, জ্বলটো আমার বেড়ায় মেলে দিও।

টনাদা ইতস্তত করে বললো, আজই লিবেন?

আজই দিতে হবে জেনে অনিচ্ছুক মুখে সে
যখন জ্বলকাঁধে ফের ফিরলো তখন পিছন থেকে
সেই বিশাল কালো জ্বাল দেখে আমার মনে হলো,
এমন বৃহৎ শ্রীহীনতা আমার চোখে আর পড়েনি
কখনো। দলটি অল্প অল্প কলরব তুলে সরে গেল
আমাদের কাছ থেকে পিছন ফিরে, আমরা দাঁড়িয়ে
রইলাম সেইখানে—মাঠের ভিতরে, সূর্যাস্তের
আলো গায়ে মেখে। আমার মনে হলো প্রভঞ্জনকে
আমার ডেকে নিয়ে যাওয়া উচিত কোথাও, এখান
থেকে সরিয়ে, এই জ্বাল যাতে আর তার ত্রিসমায়
না আসতে পারে এমন কোথাও।

তপু বললো, তুমি টনাদাকে বিশ্বাস করো
পুরো?

প্রভঞ্জন বললো, না করে আর কী হবে?
গেলবার টনাভাইকে তো একা এ খেসারত দিতে
হয়েছিল। সেই কিছুদিন দেদি করে তকে তকে
থেকে সেই ফলিডল কি অল্প কিছু ঢেলে দেওয়া
জলে—এইরকমই চলবে ব্যাপারটা, দাত্তকে বলো
মণিদার সঙ্গে ইজারার ব্যাপারে রফা করে ফেলতে।

—আমি ও সবে মধ্য নেই।

প্রভঞ্জন ইঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো,
ঠিক আছে, শমিতা বলবেন।

—কী বলবো কাকে ?

—কাকে ? আপনার মণিদাকে । কী বলবেন ? বলবেন, এবারে তো সমস্ত মাছেরা মৃত, অপসারিত । এবার আপনি দাদামশায়ের কাছ থেকে ওই স্বর্ণগর্ভ জ্বালাশয় নিয়ে নিন, আর মাছুষ-জনকে বিপন্ন করার দবকার নেই ।

তপু বলে উঠলো, এ একটা কী কথা হলো ? মণিদার কাছে থাকলে জলের গর্তের সোনা তো জলেই থাকে, উঠতে চায় না, মাছুষের বিপদ যতো বাড়়ে জলের তলের সোনার দাম ততো চড়ে । তুমি লড়াই ছেড়ে দিয়ে গেলে ওঁর তো পোয়াবারো !

—তা হলে আর কী করবো ? আমি হেরে গেলাম তো । যতোবার লড়াই ফাঁদবো, উনি ততোবার এখানকার কাউকে না কাউকে হাত করে কপট পাশা জিতে যাওয়ার ব্যাপার করে ফেলবেন । শমিতা এবারে খরবের বহর ধরেতে পারছেন ?

আমি উত্তর দিলাম না, কিন্তু এতদিনে মণিদার নানা কাজকর্মের একটাকে অন্ততঃ আমি দেখতে পেলাম, এটা আমার কাছে অস্পষ্ট রইলো না । তপু বললো, কী ? তুমি লিখে নিয়ে যাবে তো এটা ?

আমি বললাম, এতো আশটে খবর ?

প্রভঞ্জন বললো, আশের দাম কম নাকি ?

—জলের মাছ নিয়ে ভক্তিশ্রীতি পর্যন্ত আছে জানেন ?

আমি বললাম, আপনার সত্যি তুলনা হয় না ।

প্রভঞ্জন অপ্রস্তুত হয়ে বললো, ও কথা বলার

মতো আবার কী করলাম !—কিন্তু তার চোখ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দেখাতে লাগলো ।

ফিরবার পথে তপু বললো এবার কী করবে প্রভুদা ?

—জীবিকার সন্ধান । এখানে আর চেষ্টা করা বোধ হয় ঠিক হবে না ।

—কোথায় যাবে তাহলে ?

প্রভঞ্জন যেন অনেক চিন্তা করে বললো, শমিতা যদি নিয়ে যান তো কলকাতায় যাই ।

তপু একবারে ছেলেমাছুষি করে বললো, তাহলে আমিও যাবো । শমিকে বলে তো হবে না, কিশোরদাকে বলতে হবে, কিশোরদা—

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমায় একটু মণিদার অফিসে পৌঁছে দিয়ে মোড় নিও তোমরা, আমি আশুচর্চাখানেক পরে আসছি ।

প্রভঞ্নের কেউ তখনি কোনো জবাব দিল না । মণিদার অফিসের কাছাকাছি পৌঁছতেই প্রভঞ্জন বললো, আমরা বাইরে রইলাম, লেখা টেখার কথা কিন্তু সত্যি বলার কোন দরকার নেই ।

তপু অধৈর্য হয়ে বললো, তুমি সত্যি সব ছেড়ে দিয়ে যাবে ?

প্রভঞ্জন একগাল হেসে বললো, মাথা ধারাপ । সব যাতে ছাড়তে না হয় তাই জ্বজ্বাই এ জ্বালাশয়ের সীমানা ছেড়ে এগিয়ে যাবো । শমিতা, দেরি হলে চলবে না কিন্তু ।

আমি অফিসের ভিতরে গেলাম । মণিদা কী একটা ফোন করছিলেন টেচিয়ে টেচিয়ে, আমায়

দেখেই হঠাৎ বাক্যশ্রোত রোধ করে দিয়ে ছ' আর হাঁতে পরিবর্তিত হয়ে গেল তাঁর কথাবার্তা, তারপরে রেখে দিই, পরে কথা বলবো—বলে তিনি কোন রেখে দিয়ে বললেন, কী খবর?

আমি খুব কড়া কিছু একটা বলবো বলে তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু এখন তাঁর প্রশ্ন শুনে আমার মনে হলো বাদামুবাদে তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠা অল্প সময়ের কাজ নয়, আমাকে তার জন্তে ঢের তৈরী হয়ে নিতে হবে, এতো সময় নেই আমার। আমি তাই বললাম, মণিদা, এখানকার মাছের সাপ্লাই কোথায় যায়?

মণিদা যেন ভারি মজার কথা হচ্ছে এমন ভাবে বললেন, আরে বাবা, আমাদের শমিতা খুব হিসেবী সাংবাদিক হয়ে গেছে মনে হচ্ছে?

আমি আস্তে আস্তে বললাম, তাই মনে হচ্ছে। আপনার কাছে আর এসে এসে শিখতে হবে না। একথাটা আপনিই দাদামণিকে লিখে দেবেন।

আমি কী বলছি সেদিকে কর্ণপাত না করে মণিদা বললেন, দারুণ দেখাচ্ছে আজ তোমাকে। কী পরেছ ওটা? চকচকে, মসৃণ—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ঠিক যেন মাছের মোলায়েম আঁশে তৈরী। মণিদা, এখানকার লোকেরা যে পরের পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মেরে ফেলছে, এটা বন্ধ করা যায় না।

মণিদা খুব নিস্পৃহ ভাবে বললেন, আমি বলেছিলাম তোমার দাদামণিকে—কিন্তু তুমি এসব খবর-আনলে কোথা থেকে? কাণামুখো শুনছিলাম

আজই, এর মধ্যে তুমি জেনে গেছ কী করে? কোথায় হয়েছে ব্যাপারটা?

—যেখানে হবার। আমি একেবারে খবরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলাম কি না। লিখে দেবো যা দেখে এলাম টার্টকা?

—না না, থাক। একেবারে স্থানীয় উদ্ভজন ছড়ানো কাগজের সূনামের পক্ষে ভালো নয়, মানে, আমি ওতে বিশ্বাস করি না। তুমি আর কোনো মজার খবর জেনে এসে থাকো তো বরং বলো।

মজার খবর আর আমার জানা ছিল না। জানবারও নয়। আমি আর কোনো কথা না বলে তাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রভঞ্জন আর তপু কথা বলছিল পরস্পর, খুব নিচু গলায়, আমাকে দেখতে পেয়ে তপু-গলা বড়ো করে বললো, তোমরা এসো আস্তে আস্তে, আমি এগোই। আমি প্রভঞ্জনকে বললাম, যা যা বলবো ভেবেছিলাম, কিছু বলা হলো না কিন্তু, এতো বিস্তী লাগছিল।

সে বললো, নো হোকগে।

—আপনার নিজের গিয়ে বলে আসতে ইচ্ছে কবছে না?

—কাকে?

—বাঃ, কাকে আবার, যিনি গুগুগোলের গোড়া বলে জানেন তাকে?

—বলাবলিতে কি কোন লাভ হয়? কিছু একটা করে যেতে হবে, এখানে বসে চেষ্টা করলাম, হলো না। তাই নিয়ে চেষ্টাতে যাবো নাকি?

—আপনার নিশ্চয় ভীষণ মন খারাপ লাগছে?
আমারই এতো বিক্রী লাগছে।

—লাগছে তো? সেই জন্তাই আমার অতো বেশি
মন খারাপ আর লাগছে না।—বলে সে বোকার
মতো তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে রাস্তার মিটমিটে
আলোতেই। আমি তাই আর সব কথা ভুলে
ভাবলাম, এখন আমি দাদামনিকে চিঠি লিখবো, নাকি
মামীমা লিখবেন? না কি, লেখালেখি কিছু না
করে চলে যাবো সোজা কলকাতায় ছ'জনে মিলে?
এ সব ঠিক করে নেওয়া দরকার, আলো-আঁধারিতে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে তো এখন
হবে না। আমি আস্তে আস্তে বললাম, তপু গেল
কোথায় আগে আগে?

শুনে সে ব্যাখ্যা করার মতো করে বললো,
আমাদের একটু সময় দিয়ে গেল।

কথাটা না বলে দিলে আমি আর বুঝতে
পারছিলাম না। ওই রকম কাণ্ডজ্ঞান বলেই তো
মুঠোর মধ্যে থেকে তৈরি মাছ পিছলে পালায়।
আমি বললাম, সময় নিয়ে কী হবে?

সে বললো, বঁড়শীটা ঠিকমতো গাঁথেছে কি না
ঠাহর করে দেখা হবে।

—কার বঁড়শী, তোমার না আমার?

—অবশ্যই আমার, মেয়েদের হাতে কখনো
বঁড়শী মানায়?

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly

Founded in 1981

Advertisement Rate Schedule

[From June, 1975]

Ordinary

Full Page : Rs. 250'00

Half Page : Rs. 150'00

Quarter Page : Rs. 80'00

Special Position : 15% extra

Cover Page

Second Cover : Rs. 350'00

Third Cover : Rs. 400'00

Fourth Cover : Rs. 600'00

For Special Position contact *Advt. Manager*
Jayasree.

Advertising Space 20'5Cm x 15'24Cm.

(8" x 6")

Contact

Manager, Jayasree

Office : 20A Prince Golum Md. Road

Calcutta—26

Phone : 46-1701

[দিন আগত ঐ—২৬৮ পৃষ্ঠার পর]

কী হাসি সে হাসি, কোন্ সে ছটা, সে চোখের দৃষ্টিটা কেমন, কোন্ সে বাৎসল্য প্রেমের সমুদ্র ভেতরে উথলে ওঠে। অপূর্ব! কলির যুগ সব জায়গায় ভেজাল। কিন্তু এখনও কোনও কোনও ঘরে এই মাতৃহৃৎ রয়েছে তাই ছুনিয়াটিকে আছে।

আমার হাসি লাগে বাংলাদেশের পুরোনো সংস্কৃতির মায়েরা কেমন ইসারা করে তাদের স্বামীকে বলে দেন, আর কেউ না বুঝলেও স্বামী ঠিক বুঝে ফেলেন।

আমার সঙ্গে কিন্তু মায়ের সম্পর্ক অল্প রকম। আমি সব সময় মার সঙ্গে ঝগড়া করি। মা কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে একজন পূর্ণ Dictator। সব সময় পাশা ফেললেই মায়ের দিকে বারো আনা। আমি মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ করি। আবার কখনও কখনও যখন খুব ভাল থাকেন আর দেখেন যে ছোঁড়াটা নেহাৎ একেবারে বয়্যাব বাগ মানছে না তখন 'ও, আর পারিনা' এই ভাব দেখান। (বলতে বলতে কোথায় যেন মহাকালের মন তুমুল হয়ে যায়। কিছু ক্ষণ সব নীরব।) মায়ের এমন কতকগুলো কীর্তি আছে বা ব্যাপার আছে, বা phases আছে অর্থাৎ মা কাজ করছেন এমন সময় বাবা কোথা থেকে এসে গলাধাকারী দিতে লাগলেন যেই মার দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মাধে কি আর মায়ের নাম বাবা জপেন। অবশ্য এই দুই জ্ঞানই—না বাবা বলবো না। বলে ফেললেই আবার কী ব্যাপার করে বসেন, ওরে তুই বলেছিস? এই জ্ঞানই আমি আশ্রয় চেষ্টি করি মা এই শব্দ সম্পর্কিত কোনও প্রসঙ্গ না ওঠে।

মহাকাল মাতৃসাধক, চির উত্থানী, পৃথিবী ক্ষকীর তাঁর কর্মসাধনা অস্তুহীন নয়। ভাঙাগড়ার কারিগর এবার মায়ের পূর্ণ মর্যাদা স্ব-ভূমে প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন, তারই বার্তা বয়ে আনছে নানা লোক থেকে, 'দিন আগত ঐ'। চূড়ান্ত ধ্বংস ও পরিপূর্ণ সৃষ্টির জন্ম প্রস্তুতিই যার একমাত্র পরীক্ষা।

জা লি ফ - এর

ই ম হা মা ন ব আ সে

পড়ুন

দাম ছয় টাকা

প্রাপ্তিস্থান : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১০-এ টেমার লেন, কলি-৯

খোলা জানলা

গল্প

রচনা : সাকি * অনুবাদ : শচীন্দ্রনাথ বসু

[লেখকের পরিচয় : ইংরেজ গল্পকার এইচ এইচ মানরো (১৮৭০-১৯১৬) 'সাকি' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তাঁর জন্ম বর্মায়, বাবা ঐ দেশের পুলিশ বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। সাকি খ্যাতি অর্জন করেন লন্ডনে, প্রধানত ছোট গল্প লিখে।]

“মাসি এক্ষুনি নীচে নামবেন, মিঃ নাটেল,” বললে শান্ত শিষ্ট পঞ্চদশী এক তরুণী, “ততক্ষণ আমার সঙ্গে সইতে হবে আপনাকে।”

ফ্রাম্টন নাটেল এই কথার সঠিক জবাবটি দিতে চেষ্টা করলে যা অল্পপস্থিত মাসির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করেও কাছের বোনঝিকে চাটুগায়ে খুশী করবে। মনে মনে তার এই সন্দেহ আরও বাড়ল যে একের পর এক সম্পূর্ণ অপরিচিতদের ঘরে গিয়ে যে সে নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষাৎ করে চলেছে তাতে তার স্নায়ু-রোগের বিশেষ কিছু উপকার হবে কিনা।

এরই চিকিৎসার জন্ত এই গ্রামা-বিশ্রাম-বাসে আশ্রয় নেবে বলে যখন সে তৈরি হচ্ছে তখন তার বোন বলেছিল, “আমি জানি অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে;

ওখানে গিয়ে তুমি গা ঢাকা দেবে, কারও সঙ্গে কথা বলবে না, খালি মন খারাপ করে করে স্নায়ুর অবস্থা আরও খারাপ হবে। ওখানে যাদের আমি জানি তাদের সবার নামে আমি পরিচয়-পত্র দেব তোমাকে। যদুৎ মনে পড়ছে তারা কেউ কেউ বেশ ভাল লোক।”

ফ্রাম্টন বসে বসে ভাবছিল যে মহিলাটির কাছে সে আজ চিঠি নিয়ে এসেছে সেই মিসেস স্যাম্পটন ঐ ভালর দলে পড়েন কিনা।

তাদের মধ্যে নীরব ভাব-বিনিময় যথেষ্ট হয়েছে মনে করে বোনঝি অবশেষে বললে, “আপনি কি এই অঞ্চলে অনেককে জানেন?”

“প্রায় কাউকেই না,” ফ্রাম্টন জবাব দিলে। “বছর চারেক আগে আমার বোন এখানে রেক্টরের বাড়িতে কিছু দিন ছিল, এবং সে তাকে কতগুলি পরিচয়-পত্র দিয়েছে স্থানীয় কয়েক জনের নামে।”

ঐ শেষ উক্তিটির মধ্যে স্পষ্ট আক্ষেপের স্বর বাজল।

“তা হলে আপনি মাসির সম্বন্ধে প্রায় কিছুই

জানেন না?" শান্ত বালিকাটি আবার জিজ্ঞাসা করলে।

"তুঁর নাম আর ঠিকানা," স্বীকার করলে অতিথি। মনে মনে তার প্রশ্ন মিসেস স্যাম্পটনের স্বামী আছেন কি নেই। ঘরের আবহাওয়ায় সম্পর্ক এমন কিছু ছিল যা পুরুষের বসবাসের ইঙ্গিত দেয়।

"মাসির জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটে তিন বছর আগে," বালিকা বললে; "অর্থাৎ আপনার বোন যখন এখানে ছিলেন তার পরে।"

"দুর্ঘটনা?" প্রশ্ন করলে জ্যাম্‌টন; এই শান্ত পল্লী অঞ্চলে দুর্ঘটনা যেন ভাবাই যায় না।

অকটোবরের বিকালে ঐ জানলাটা কেন আমার সম্পূর্ণ খুলে রেখেছি তা ভেবে হয়তো আপনি অবাক হচ্ছেন?" বলে বোনকে নির্দেশ করলে একাধিক কীচের জানলার দিকে, মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে তা, ও পারেই লন।

"এই সময়ের পক্ষে গরমটা একটু বেশীই পড়েছে," বললে জ্যাম্‌টন, "কিন্তু জানলাটার সঙ্গে ঐ দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?"

"ঐ জানলা দিয়ে, আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে, মেসোমশায় ও মাসির দুই ছোট ভাই বেরিয়ে ছিলেন তাঁদের দৈনিক শিকারে। তাঁরা আর ফিরে আসেন, নি। যে জায়গাটায় কাদাখোঁচা শিকার করতে ভালবাসতেন তাঁরা, জলাভূমি পেরিয়ে সেদিকে যেতে যেতে চোরাবাদায় তলিয়ে গেলেন সকলে। জানেন, সেবারের গ্রীষ্মে ভীষণ বৃষ্টি হয়েছিল, এবং অস্বাভাবিক বছর যে সব জায়গা নিরাপদ

ছিল সেগুলিতেও হঠাৎ পা তলিয়ে গেল। দেহগুলিও উদ্ধার করা গেল না। সেটাই আরও ভয়ংকর ব্যাপার।" এখানে বালিকার কথার ধীর সুরটি মিলিয়ে গেল; থেমে থেমে দরদপূর্ণ গলায় বললে, "মাসি বেচারী এখনও ভাবে যে তাঁরা এক দিন ফিরে আসবেন, ছোট বাদামী রঙের যে স্প্যানিয়েল কুকুরটা তাঁদের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিল সেও আসবে, এসে ঐ জানলাটা দিয়ে ঘরে ঢুকবে যেমন বরাবর ঢুকেছে। এরই অল্প প্রতি সন্ধ্যায় জানলাটা খুলে রাখা হয় বেশ অদ্ভুত না হওয়া পর্যন্ত। বেচারী মাসি, কত বার সে আমাকে গল্প করেছে ঠিক কেমন ভাবে তাঁরা সে দিন বেরিয়ে গিয়েছিলেন—স্বামীর হাতের উপর ঝোলানো ছিল সাদা বর্ষাতিটা, সবচেয়ে ছোট ভাই রনি গাইছিল, 'বার্টি, তুই কেন করিস লক্ষ লক্ষ?' গানটা মাসি সহিতে পারত না বলে রনি সর্বদা ওটা গেয়ে তাকে ছালাতন করত। জানেন, এই রকম স্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যায় আমার মনে প্রায় একটা ভূহুড়ে ভাব আসে যে তাঁরা সবাই বুঝি ঐ জানলাটা দিয়ে ঢুকবেন—"

সারা অঙ্গে জঁবৎ কঁপে উঠে সে থেমে গেল। এই সময়ে মাসির প্রবেশে জ্যাম্‌টনের ঘাম দিয়ে ঘর ছাড়ল, নিজের দেহের অল্প কমা চাতে চাইতে তিনি ঘরে ঢুকলেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে।

"আশা করি ভেঁরা আপনাকে গল্পে গল্পে জমিয়ে রেখেছে?" তিনি বললেন।

“তার কথাগুলি বেশ লাগছিল,” বললে ফ্র্যাংকটন।

“আপা করি জানলাটা খোলা থাকতে আপনার অনুবিধা হচ্ছে না,” মিসেস স্যাম্পটন ভাড়াভাড়া বলে চললেন, “আমার স্বামী ও ভাইরা এখনই ফিরবে শিকার থেকে, এবং সর্বদা এই পথ দিয়েই তারা ঢোকে। পাখি মারতে জলায় বেরিয়েছে, আমার কার্পেটগুলির অবস্থাটা কি হবে বুঝতেই পারছি। আপনাদের পুরুষদের তো ঐ স্বভাব, কি বলেন?”

খোশমেজাজে তিনি বকবক করে চললেন শিকার সম্বন্ধে—পাখির অভাব, শীতকালে বুনো হাঁসের প্রাচুর্য কেমন হতে পারে সে বিষয়ে। ফ্র্যাংকটনের কানে এ সবই একান্ত বাত্‌স শোনাচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত কম রোমহর্ষক বিষয়ের দিকে কথা ঘোরাতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু খুব বেশী সফল হল না; সে টের পাচ্ছিল যে গৃহ-কর্তা তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন সামান্যই, তাঁর চোখ কেবলই ঘুরঘুর করছিল খোলা জানলা এবং বাইরে মাঠের দিকে। এমন এক শোচনীয় ঘটনার বার্ষিকীর দিনে সে যে এসে পড়েছে তা খুবই হ্রদুষ্ট।

ফ্র্যাংকটন জানালে, “ডাক্তাররা সবাই আমাকে বলেছে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে, সব রকম মানসিক উত্তেজনা ও ভারী শারীরিক কাজ এড়িয়ে চলতে।” যে সব রোগী এই ব্যাপক ভ্রান্ত ধারণার অধীন যে অপরিচিত ও আকস্মিক আলাপীরা তাদের অনুখ

ও অক্ষমতার, সেগুলির কারণ ও চিকিৎসার ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি জানতে অতীব উৎসুক, ফ্র্যাংকটনও সেই দলের। “খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কিন্তু সবাই একমত নয়,” যোগ করলে সে।

“বটে?” শেষ মুহূর্তে হাইটাকে চেপে বললেন মিসেস স্যাম্পটন। তারপর হঠাৎ তাঁর চেহারা উদ্ভাসিত, মনোযোগ খাড়া হয়ে উঠল, যদিও ফ্র্যাংকটনের কথা শুনে নয়।

“ঐ যে ওরা এসে পড়েছে!” চিৎকার করে উঠলেন তিনি। “ঠিক চায়ের সময়টিতে, দেখুন মনে হচ্ছে যেন চোখ মুখ পর্যন্ত কাদা মেখেছে।”

ফ্র্যাংকটনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বোনবির দিকে তাকাল সে সমবেদনা-জড়িত উপলব্ধির দৃষ্টিতে। কিন্তু বালিকাটি তখন খোলা জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে আছে, চোখ জমে গিয়েছে সম্ভ্রাসে নাম-না-জানা আতঙ্কের হিমশীতল স্পর্শে বিহবল ফ্র্যাংকটন ঘুরে বসে সেই দিকে তাকাল।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তিনটি মূর্তি লন পেরিয়ে এগিয়ে আসছে জানলার দিকে। প্রত্যেকের বগলে বন্দুক, এক জনের আবার কাঁধের উপরে ঝোলানো সাদা বর্ষাতি। তাদের পায়ের কাছে কাছে চলেছে ক্লান্ত, বাদামী রঙের এক স্প্যানিয়েল। নিঃশব্দে বাড়ির কাছাকাছি এসিয়ে এল তারা, তার পর কোনও এক তরুণ ব্যক্তির ভাঙা গলার সুর ভেসে এল গোম্বুলির আধার থেকে :

“বলি আমি বাটি, কেন করিস লক্ষ্যক্ষ?”

দিশাহারা ক্র্যামটন তাড়াতাড়ি তার লাঠি আর টুপি তুলে নিলে; উর্ধ্বাশ্বাস পলায়নের পথে বাড়ির দরজা, বাগানের রাস্তা ও গেট অতি অস্পষ্ট টের পেলে মাত্র। মুখোমুখি ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে এক সাইকেল-যাত্রী পাশের ঝোপে গিয়ে পড়ল।

“এই যে আমরা এসে পড়েছি গো,” বর্ধাতিবাহী ব্যক্তি বললে জানল। দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে; “কিছুটা বর্দমাক্ত বটে, তবে তার অধিকাংশই শুকনো। আচ্ছা, আমরা আসতে আসতে যে লোকটি ছুটে পাশিয়ে গেল সে কে?”

“অতি অদ্ভুত মানুষ, নাম মিঃ নাটেল,” বললেন মিসেস স্প্রিটন; “খালি নিজের অসুখের কথাই

বলছিল, তারপর যেই তোমরা এলে একেবারে বিদায় না নিয়ে বা কোনও অজুহাত না দিয়ে পিটুটান দিল। যেন ভূত দেখেছে।”

“আমার মনে হয় এর কারণ ঐ কুকুরটা,” বোনঝি বললে শাস্ত ভাবে; “উনি আমাকে বলছিলেন যে কুকুরে ওঁর ভীষণ ভয়। এক বার কতগুলি নেড়ি কুস্তা ওঁকে তাড়া করে নিয়েছিল গঙ্গা নদীর পাড়ে কোথায় এক কবরখানায়, সারা রাত কাটাতে হয়েছিল সস্ত-খোঁড়া এক কবরের গর্তে, ঠিক মাথার উপরে জন্তুগুলি রেগে দাঁত খিঁচিয়ে গর্জন করছে, মুখ দিয়ে ফেনা ঝরেছে তাদের...। এ অবস্থায় যে কোনও লোক ভেঙ্গে পড়বে।”

চট করে রোমাঞ্চকর গল্প বানিয়ে বলতে নিপুণ এই মেয়ে।

জয়ন্তী প্রকাশনের কয়েকটি বই নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ

১ম খণ্ড ৯.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০

৩ ও ৩য় খণ্ড ১৩.৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়

সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০

সুভাষচন্দ্র ও আশাশুনি প্ল্যানিং

শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬.০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

Paper back 4/- Board 5/-

ঐ মহামানব আসে : চার্লসিক

৬.০০

NETAJI THROUGH

GERMAN LENS

Nanda Mookerjee

১২.৫০

রামমোহন

সুর্ভাষ্য দাশগুপ্ত

৪.০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

অনিল রায়

৪.০০/৬.০০

বাংলাদেশের বিপ্লব

সুনীল দাস

১.২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অনিল রায়

২.০০

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

গণজীবনের আদি রূপকার শরৎচন্দ্র

প্রবন্ধ

শিবদাস চক্রবর্তী

“সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় হুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুই নেই,—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাত পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নিবিচারের হুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে”। এই বহুশ্রুত উক্তির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র নিজেই সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্যের ধ্রুব সুরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে গেছেন। সত্যিই লাঞ্চিত বঞ্চিত পুরুষ এবং বিশেষভাবে নির্যাতিতা নারীর পক্ষ নিয়ে মানুষের আদালতে নালিশ জানাবার ক্ষমতা সাহিত্যিকের কলমে এমন কড়া ভাষায় আর্জির খসড়া প্রস্তুত করতে শরৎচন্দ্রের আগে তার কোন সাহিত্যিক অমন দরদ নিয়ে এগিয়ে আসেন নি।

সেদিক থেকে বিচার করলে বাংলা কথাসাহিত্যের বিবর্তন ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি উল্লেখ্য

নাম মাত্র নয়, একটি স্বতন্ত্র যুগের স্রষ্টা। বাংলা সাহিত্যের আকাশে শরৎচন্দ্রের উদয়-বিলয়-কাল সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রযুগের অন্তর্গত। কিন্তু কথা-সাহিত্য শাখাটির ইতিহাসকে যুগ-বিভাগের দ্বারা পরিচিত করতে হলে রবীন্দ্রযুগের মধ্যেই শরৎ-যুগ নামে একটি অন্তর্বর্তী যুগ কল্পনা না করে পারা যায় না। কারণ, বঙ্কিম-রবীন্দ্র ঐতিহ্যের উত্তরসূরী-রূপে আবির্ভূত হলেও শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিসম্ভার রবীন্দ্র নাথের জীবৎকালেই ভিন্নধাতা প্রবাহিত হয়ে ভাবীকালের নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল। রোমান্সের রঙীন কল্পলোক থেকে অবতরণ করতে করতে বাংলা উপন্যাস-গল্প কাব্যামুভূতিময় ‘তত্ত্বভাবনার স্তর পার হয়ে শরৎ-যুগে এসেই ধূলিমলিন বাস্তবের ভূমি স্পর্শ করেছিল। সে দিক থেকে শরৎচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে প্রথম ‘রিয়ালিস্ট’ সাহিত্যিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্যে অবশ্য রবীন্দ্র যুগে এবে এক নতুন বাঁকের অভিযুগী হয়েছিল। ‘চোখের বাগি,’ ‘নষ্টনীড়’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং উপন্যাসোপম রচনায় মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা এবং

মানবিক সহানুভূতির অপূর্ব শিল্পায়িত প্রকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ এসেই বাংলা উপজাতি বাস্তবতার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্যে নব যুগের প্রবর্তক। তবু একথা না উল্লেখ করে পারা যায় না যে, রবীন্দ্র সাহিত্যের নর নারীরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে শেষ পর্যন্ত ‘অসাধারণ’ হয়ে উঠেছে। তাদের আচার্য্যে ও আলাপনে অস্বাভাবিক পরিমাণে এই ‘অসাধারণত্বের’ পরিচয় বাস্তব। এই অসাধারণত্ব সযত্নে পরিহার করেই শরৎ-প্রতিভা বাংলা কথাসাহিত্যে তার মৌলিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ লাভ করেছে। রবীন্দ্র মানস বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উক্তর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন, ‘উপজাতিসত্তার অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় তিনি কাব্যানুভূতির বস্তু নিরপেক্ষ সত্য-দৃষ্টির হাতে ঔপন্যাসিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণ-রশ্মি ছাড়িয়া দিয়া উপরচারী দেবতার মতো মর্ত্যলোকের বিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন’। এই ধরনের অনাসক্ত সত্যদৃষ্টি কবির পক্ষে বহুবাহিত, কিন্তু উপজাতি-গল্প রচয়িতার পক্ষে অবাঞ্ছিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তরুণ লেখক-সম্প্রদায়ের হাতে কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুর ‘গণতন্ত্রীকরণ’-এর সূচনা হয়। আভিজাত্যবর্জিত দারিদ্র্য-দলিত সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাদি-বাম্বা, আনন্দ-বেদনা তরুণ সাহিত্যিকদের কল্পনায় প্রজ্বর পেতে শুরু করে। এইভাবে সাহিত্যে

আধুনিকতার প্রবেশ ঘটে। এই প্রবেশভার প্রবর্তনায় শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের পূর্বসূরী।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপজাতিসত্তার নায়ক-নায়িকা সংগ্রহ করেছিলেন গ্রামীণ স্বচ্ছল ভূম্যধিকার সম্প্রদায় থেকে, রবীন্দ্রনাথের উপজাতিসত্তার নায়ক-নায়িকারাও ছিলেন অভিজাত নাগরিক সম্প্রদায়ের মানুষ। শরৎচন্দ্রের মুখ্য উপজাতিসত্তার নায়ক-নায়িকারা অভিজাত নাগরিক সম্প্রদায়ের মানুষ না হলেও পল্লীর সম্পন্ন গৃহস্থ এবং সেইজন্য সেখানে দারিদ্র্যভাঙিত জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র বিরল সন্দেহ নেই। তার কারণটাও স্পষ্ট। শরৎচন্দ্র সমাজের বিরুদ্ধে বিজোহ ঘোষণা করেছিলেন সমাজনৈতিক বৈষম্যের জন্ত, ঠিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ত নয়। কিন্তু তা’ সত্যও একথা অনস্বীকার্য যে শরৎসাহিত্যে নিম্নবিত্ত মানুষের ভিড় কম নয় এবং সেইদিক থেকে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পূর্বসূরীদের তুলনায় শরৎচন্দ্রই গণজীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। আর এর প্রেরণা এসেছিল যে তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে—শরৎচন্দ্রের জীবনের পাঠক পাঠিকা মাত্রেই তা’ জানেন। তাই নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনের রক্তে রক্তে যে গ্লানি, ভয়, ক্ষোভ, বেদনা দীর্ঘকাল যাবৎ সঞ্চিত হয়েছিল, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে তার বিশ্বস্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমাজের উপরতলার মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারে উৎপীড়িত মানবজাতির মুক কান্নাকে তিনি মুখর করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, নির্ধাতিত মানবতার পক্ষ নিয়ে তিনি

তার লেখনীর মাধ্যমে সমাজের অস্থায়ী-অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সোচ্চার করে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের সপ্ত পঞ্চাশতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ যথার্থই বলেছিলেন—‘....শরৎচন্দ্র যে ইঠাৎ দেশের তরুণদের কাছ থেকে এতবড় পূজা পেয়েছেন, শুধু বড়ো ঔপন্যাসিক হলে তিনি তার সিকিও পেতেন কি না সন্দেহ। মুক্তির স্বাধি বলেই তাঁর শিরে আজ এত লাজপুষ্প বর্ষণের সমারোহ। তাঁর জন্মোৎসব হচ্ছে আসলে মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির মহোৎসব, মানবতার নব দিগ্বিজয়ের পূর্ণ জয়ন্তী।’

শরৎচন্দ্রের যে কয়েকটি উপন্যাস ও উপন্যাসোপম রচনা এবং ছোট গল্পে দারিদ্র্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা হচ্ছে প্রধানতঃ ‘বিরাজ-বৌ’, ‘শ্রমক্ষণীয়া’ ‘মহেশ’ এবং ‘অভাগীর স্বর্গ’। এ ছাড়া ‘পশুিত মশাই’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘বামুনের মেয়ে’ ‘শুভদা’, ‘বিলাস’ ‘মামলার ফল’ প্রভৃতি রচনাতেও হৃদয়গত সমস্যার বিচিত্র বিকাশের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদ আন্তরিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভবঘুরে জীবনে তিনি যে সমস্ত নরনারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাদের সম্পর্কে আজও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর দরদের উৎস।

প্রথমে ‘বিরাজ-বৌ’-এর কথাই উল্লেখ করা যাক। বিরাজ-বৌ নিবিড় দাম্পত্য প্রেমের নিদারুণ বিপর্যয়ের কাহিনী। দারিদ্র্য মানুষের জীবনে এক প্রচণ্ড অভিশাপ। তার রোষ-কষায়িত নেত্রের আগুনে প্রণয়-মধুর স্বপ্নের সংসার কী ভাবে পুড়ে

ছারখার হয়ে যায়, নীলাম্বর-বিরাজের দাম্পত্য জীবনের বিপর্যস্ত পরিণাম তার সাক্ষ্য বহন করে। প্রাণ প্রিয় স্বামী নীলাম্বরে প্রতি বিরাজের কটুক্তি উচ্চারণ এবং জ্ঞো বিরাজের সত্যিষের প্রতি নীলাম্বরের সন্দেহ পোষণ—স্বামী-স্ত্রীর এই পারস্পরিক বিসদৃশ আচরণের নেপথ্য উৎস ছিল অসহনীয় দারিদ্র্যের খালা।

‘মহেশ’ শরৎচন্দ্রের একটি বহু-প্রশংসিত গল্প। উক্তির স্তবোধ সেনগুপ্তের মতে ‘পৃথিবীর সাহিত্যে খুব কম ছোট গল্পেরই নাম করা যায় যাহার মধ্যে অমূরূপ বিস্তৃতি ও নিবিড়তা আছে’। দারিদ্র্যাক্রিষ্ট কৃষক সমাজের এক মর্মস্পর্শী বাস্তব চিত্র ‘মহেশ’ গল্পে উপস্থিত। গফুর শুধু একজন ব্যক্তি নয়, সে নিপীড়িত কৃষকসমাজের প্রতিনিধিত্বান্বিত। নিত্য অভাবে জর্জরিত গফুরের শেষ পর্বস্ত বাস্তবতা ত্যাগের চেষ্টা একদা জমিদারী প্রথা-কবলিত বাংলার কৃষক সমাজের করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

‘অভাগীর স্বর্গ’ আর একটি অমুপম ছোট গল্প। জমিদার ও জমিদার কর্মচারীদের শোষণে শাসনে পীড়িত হলে সমাজের এক মর্মান্তিক কাহিনী এই গল্পে পরিবেশিত হয়েছে। অভাগী মৃত্যুর পর ছেলের হাতের একটু আগুন চেয়েছিল। কিন্তু চিন্তহীন বিস্তবান সমাজের নির্ভরতার জন্ত তা’ও তার কপালে জুটল না। অথচ অভাগী যে কোন পুণ্যবতী নারীর চেয়ে কোন অংশে কম নয় শরৎচন্দ্রের দরদী লেখনী-গুণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কারিগ্জের অভিশাপে অভিশপ্ত বাঙালী পরিবারের এক কুরুপা কুমারীর অপরিণীত দুঃখ-সহনের বাস্তব চিত্রে উজ্জ্বল শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' উপস্থাপন। যে মেয়ের রূপের জৌলুস নেই, গায়ের রঙ কালো, অথচ বাবার রূপার জোর কম, বিবাহের বাজারে স্বভাবতঃই তার দাম কম। অথচ বাঙালী সমাজে অবিবাহিতা বয়স্কা মেয়ে এক ধরনের অভিশাপ বিশেষ। সে ঘর, পর—সবার চোখে কুরুপার পাত্রী। এমনি এক লাক্ষিতা নারীর কুরুপ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে অরক্ষণীয়া উপস্থাপনে। সত্যিই "শরৎচন্দ্র অনেক দুঃখময়ী নারীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদার মত এমন একটানা, অবিচ্ছিন্ন ও অতিশয়িত দুঃখ শরৎ-সাহিত্যের অপর কোন নারী ভোগ করিয়াছে কি না জানি না।"

এক কথায় সার্বভৌম মানবিক সহানুভূতি—শরৎসাহিত্যের প্রবণত্ব। সম্ভবতঃ এইসত্যটি স্মরণে রেখেই কবি মোহিতলাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন।

* * *
রক্ষি—বসন্ত-বিধু, রবি—সে ত' সর্বস্বতুময়,
তুমি কল্পে শরতের, রশ্মি তব মর্মাস্ত হরষ।

এই পৃথ্বী মুক্তিকার। করে তব লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ তৃণ, অঙ্গে তার উজলিছে কাকন-পরশ।
চণ্ডালেরো গৃহে তব কিরণের পূর্ণ পরিচয়—
মানুষের সর্বম্মানি তব স্পর্শে স্তুতি ও সরস"।

শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্য আরও অনেক শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের প্রতিভাকে আশ্রয় করে বিচিত্রতর বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নেই। এখনও তার জয়যাত্রা অব্যাহত। তবে মৌল লক্ষণের দিক থেকে বিচার করলে এ কথা অনস্বীকার্য যে শরতোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের আদি পথিকৃৎ শরৎচন্দ্র স্বয়ং। অসামাজিক শেষজীবনের বর্ণনা, লাক্ষিত বর্ণিত মানবাত্মার আত্ম ক্রন্দনকে বাস্তব করে তোলা, নির্ধাতিতা নারীষের প্রতি মমতাবোধ, সত্যীত্বের নব মূল্যায়ন, পল্লী বাংলার মানুষও প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবণতা শরৎ সাহিত্যের মধ্যে বিকশিত বা বীজাকারে নিহিত ছিল, পরবর্ত্তীকালে সেই সমস্ত প্রবণতাই বিভিন্ন দিক থেকে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ তারাকঙ্কর, মনোজ বসু, মানিক বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ শরতোত্তর প্রথম সারির কথাসাহিত্যিকদের নেপথ্য প্রেরণা-উৎস হয়েছে বলে সম্ভবতঃ অত্যাঙ্কি হবেনা।

চিঠি

শান্তনীল দাশ

তোমাকে লিখবো চিঠি মনে মনে ভাবি প্রতিদিন,
অথচ কেমন ক'রে দিনগুলো এক একটি করে
কেটে যায়, লেখা আর হয় না তোমাকে ।
দিন আসে, রাত্রি আসে, মাস বৎসর একে একে
এমনি করেই কত আসে আর চলে যায় তারা

আজকে সারাটি দিন ছুটি পেয়ে গেছি :
(অবশ্য কাজের লোক ছিলাম না আমি কোন দিন,
সে তো জানো, আজো নই, শুধু করি কাজ-কাজ খেলা ;
সে-খেলা আমার মন টানে না, তবুও করি)
কাগজ কলম নিয়ে ভাই
বসলাম, চিঠি এক লিখবোই তোমাকে এখন ।

এ চিঠি লেখার আগে মনে মনে ভাবি :
এখন কোথায় তুমি, কতদূরে ? রয়েছ কেমন ?
দেখতে তেমনি আজ ? (তা কি হয় ।) কতগুলো দিন
কেটে গেছে, কত ঝড়, কত না হুর্যোগ,
উত্থান পতন কত, কত ভাঙাপড়া ;
কালের অমোঘ গতি অস্বীকার করে
থাকা যায় একই মতো ! সেই তুমি নেই ।
নেই আর সেদিনের সেই রূপ সুস্নিগ্ধ শ্রামল ।
বার্ষিক্যের নানা রেখা সারা অঙ্গে, মনের মাঝেও ।

তবু কী আশ্চর্য দেখ । যখনি তোমার কথা মনে
 এলো, দেখি, সেই রূপ আমার সম্মুখে ।
 সেই কমনীয় স্নিগ্ধ লাবণ্যের প্রমূর্ত্ত প্রতিমা !
 সেই মুখে মুহু হাসি, বুঝি কিছু প্রশ্ন ছুটি চোখে :
 আমাকে চিনতে পার, দেখ দেখি চেয়ে ।

দেখলাম অপলক দৃষ্টি মেলে, হারিয়ে পেলাম ।
 কত কথা লিখবো-বে, কত কথা জমা হয়ে আছে—
 সব কথা কোথা যে হারালো ।
 একটিও কথা আর এ-কলমে এলো না, এলো না ।
 কাগজের বুকে আর ফুটিলো না একটি আঁচড়
 বলে রইলাম সেই অম্লপম মুখপানে চেয়ে ।

আমাদের কথা

জয়শ্রীর আর একটি শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো ! বছরের বিশেষ সংখ্যাগুলি 'জয়শ্রীর' গতিবেগের স্মারক। নানা ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেও 'জয়শ্রী'র এগিয়ে চলবার ছোতনা জাগিয়ে দিয়ে যায় এই বিশেষ সংখ্যাগুলি, যেন একটি পর্বত চূড়া অতিক্রম করে আবার সমভলভূমি দিয়ে আমরা এগিয়ে চলতে শুরু করলাম। এইভাবে 'জয়শ্রী'র জাগ্রত জীবনের চল্লিশটি বছর পূর্ণ হতে চললো।

এবার নানা অসুবিধার মধ্যে শারদীয়া জয়শ্রীর আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার পর যে অপূর্ণতা রয়ে গেলো, সেজন্য আমরা সঙ্কোচ বোধ করছি। তেমনি গৌরববোধ করছি পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও লেখক-গ্রাহক-বিস্তারপনদাতা ও শুভানুযায়ীদের অকুণ্ণ আনুকূল্য আমাদের এগিয়ে যাবার পথ আরও সুগম আরও সমৃদ্ধ করবে এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আগমনীর সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে শারদীয় পূজার উদ্বোধনের মুখে মহাশক্তির আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি।

কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পত ১৩ই সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রে আমাদের পরম স্নহদ কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র অকস্মাৎ লোকান্তরিত হয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের জয়শ্রীর সঙ্গে সম্পর্কটি ছিল অতি মধুর। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি জয়শ্রীর নিয়মিত লেখক এবং জয়শ্রীর প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা লীলা রায়ের স্নেহধন্যও ছিলেন। শারদীয় সংখ্যা প্রকাশকালে তাঁর কথা তাই বারবার মনে পড়ছে।

নরেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর শোক বিহ্বল পরিবার বর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

২রা অক্টোবর ১৯৭৫

জয়ন্তী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র

২য় খণ্ড ১২.০০

পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১৩.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী-সমাজের অন্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বস্তু

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাঠ্যে করে ইতিহাসের পথ-পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অমুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিন্তারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

অনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অগ্রতম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান : জয়ন্তী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১১'০০
পকেট গীতা	৫'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০'০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭'৫০
Soul of India Speaks	৭'৫০
কর্মবাণী	১'৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২'০০
শ্রীমীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.	
বিজ্ঞাসাগর	৩'০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩'০০
ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের	
তরুণ তুর্কী	৩'০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড	৩'২৫
বেতুইনের দেশ	৩'০০
নিবেদিতা	১০'০০
বিজ্ঞাসাগর	১০'০০
শিবরামের কিশোর নাটক	২'০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪'০০

মূলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

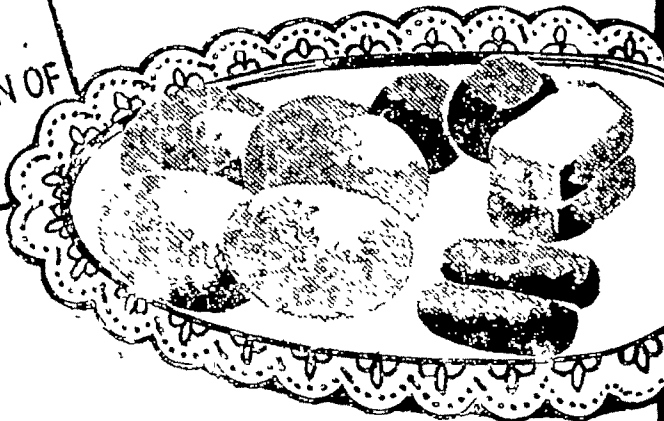
ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০
বীরসে বাঙালী	৩'৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫'৫০
বাংলার ঋষি	৫'০০
বাংলার বিদুষী	৩'৫০
বাংলার মনীষী	
রাজর্ষি রামমোহন	৩'০০
ধৃগাচার্য বিবেকানন্দ	২'৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪'০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২'৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩'০০
জীবনগড়া	৭৫
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪'০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান	
৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত	
সংস্করণ)	
শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	
সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬'০০

আয়বনম্যান নীলদ সরকারের

যোগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ		শরীর ও শক্তি	৩'০০
নিবারণ	৫'০০	সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩'০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩'০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	২'৫০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩'০০	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	১'০০

ADDS A SMILE TO YOUR DISHES

IT'S NOT ONLY
ALL GOODNESS
BUT ALSO A SIGN OF
GOOD TASTE



LAKSHMI GHEE

*makes
your dishes
delicious
taste
the best
too*



ଦୟା

ଉତ୍କଳ-ସମ୍ବାଦିକା

ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା

୮୦ ବର୍ଷ

ପ୍ରତିକ : ୧୦୮

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

ଦୟା

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পূর্তি উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ‘জয়ন্তী’ বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ছ’বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও দুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসব সংখ্যা ১৫৮৩-র বৈশাখে (মে ১৯৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভানুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক
জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০

সূচীপত্র

জয়ন্তী : কাতিক : ১৩৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জিহ্মিনী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২৯
দি (প্রবন্ধ)	অনিলচন্দ্র ঘোষ	৩৪০
কল চান মুদ্র (প্রবন্ধ)	অভয়শঙ্কর শর্মা	৩৪৪
পাশ্চাত্য নজের শিল্প-শিক্ষার		
ক্রমবিকাশ	লক্ষ্মী শ্রী সিংহ	৩৪৭
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)		
ভারতের জাতীয়তা ও শ্রুতিচন্দ্র		
	কপেন্সর ঘোষাল	৩৫১
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)		
শরৎচন্দ্র ও নারীর মূল্য	আগমণী লাভিউ	৩৫৬
সীতাতালি (কবিতা)	দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৮
আইন ও সমাজসংস্কার	কালীচরণ ঘোষ	৩৬৩
নরেন গোস্বামী বর্মান		
রাজসাক্ষী হলেন	মূলকেশ দেবদাস	৩৬৩
(বিপ্লব যুগের এককলক)		
সাগর-ভারতী	নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ	
কবিতাগুচ্ছ	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	
বর্তমান প্রসঙ্গ		

সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ১২-০০। ষাণ্মাসিক ৬-০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির লক্ষ্য দ্বারা গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

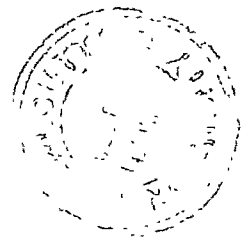
১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বপ্রথম দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলফাপের একপৃষ্ঠার লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পরিকার দাবি নেই।
৩. কবিতা লক্ষ্যেও একই নিয়ম।
৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং বঙ্গ-সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাই।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

স্বাধীনতার পাঁচিশ বৎসর

মূল্য পাঁচ টাকা

“আমরা স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীক এবং সামাজিক পুনরুদ্ধারের গভীরভাবে আগ্রহান্বিত এবং সংশ্লিষ্ট, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। আমাদের চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক এবং অসংখ্য যাদের বিশিষ্ট অবদান আছে, তাঁদের চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই রাজ্যে আমাদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের অধিকতর সচেতন করে তোলার এ প্রবন্ধগুলি সাহায্য করবে।”

সিদ্ধার্থচন্দ্র রায়, মুখ্যমন্ত্রী,

পশ্চিমবঙ্গ

“আমরা স্বাধীনতার রক্ত-জয়ন্তী বৎসরে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই স্মারক গ্রন্থটি উপস্থাপিত করতে পেরে আনন্দিত।”

অব্রহম মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী,
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ।

লেখক সূচী

অমলেন্দ্র ত্রিপাঠী ; অন্নদাশঙ্কর রায় ; দেবকুমার বসু ; পান্নালাল দাশগুপ্ত ; নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ;
নিখিলঞ্জন রায় ; শান্তকুমার মিত্র ; গৌরা আইয়ুব ; হুম্মারতন গঙ্গোপাধ্যায় ; ডঃ তুষার
চট্টোপাধ্যায় ; রাজেশ্বর মিত্র ; আসিত চেধুরী ; পশুপাত চট্টোপাধ্যায় ; গোপাল ভৌমিক ও
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রাপ্তিস্থান

- (১) বিতরণ শাখা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ২০, আর, এন, মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—৭০০০০১
- (২) বিক্রয় কেন্দ্র—নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন, ১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা—
৭০০০০১
- (৩) বিক্রয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুদ্রণালয়, ৩৮, গোপাল নগর রোড, আলিপুর
কলিকাতা—৭০০০২৭

JAYCO

ALARM TIME PIECES

&

WALL CLOCKS

AVAILABLE IN A LARGE SERIES OF MODERN STYLED MODELS

JAYNA TIME INDUSTRIES [P] LTD.

7-32 DARYA GANJ, DELHI-6.

While you celebrate DURGA PUJA, please remember your less fortunate brothers and sisters of Bihar and Orissa, victims of natural calamity.

Donate generously to the PRIME MINISTER'S NATIONAL RELIEF FUND, Prime Minister's Secretariat, New Delhi.

ESPI TRADING COMPANY

**'VANDHNA', 11-Tolstoy Marg,
NEW DELHI-110001.**

Sole sales & service agents in India for GDR Combine Harvesters E-512 and PETKUS Seed Cleaning & Processing Machines.

Exported by :

**TRANSPORTMASCHINEN EXPORT-IMPORT,
108 BERLIN**

(GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC)

With compliments :

J. MITRA & BROS

20, DOUBLE STOREY MARKET

NEW RAJINDER NAGAR,

New Delhi-110060

ঐশ্বরী

কার্তিক ১৩৮২

With best Compliments from

NSH BUSINESS MACHINES (P) LTD.

RENOWNED MANUFACTURERS OF
ELECTRONIC DESK TOP CALCULATORS.

Factory :

D-38, INDUSTRIAL AREA,
MEERUT ROAD,
GHAZIABAD. (U. P.)

Regd. Office

1008, AKASHDEEP, BARAKHAMBHA ROAD,
NEW DELHI-1
PHONE : 48584

শারদীয়া শুভেচ্ছাসহঃ—



গোবর্ধন প্রেস

২০৯ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শারদীয়া শুভেচ্ছাসহঃ—

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

জাতীয়তাবাদী গ্রন্থপ্রকাশক ও প্রচারকেন্দ্র

১৮-এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯



ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমা

যেখানেই থাকুন কাছাকাছি
ইউকোব্যাঙ্কের শাখা নিশ্চয়ই
পাবেন। এখানে, এলে বুঝতে
পারবেন, সঞ্চয় কতো সহজে হতে
পারে। সারা দেশ জুড়ে
ইউকোব্যাঙ্কের শাখা ছড়ানো,
আপনার সঞ্চয় যেখানে
বেড়ে ওঠে। ইউকোব্যাঙ্কে আপনার
সাদর নিমন্ত্রণ—

বিশদ বিবরণের জন্য যেকোন শাখায়
চলে আসুন।

ইউনাইটেড



কমার্শিয়াল ব্যাংক

ইউকোব্যাঙ্কের সঞ্চয় পরিকল্পনা :

১. সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
এই পরিকল্পনায় যত মুদ্রা টাকা রাখুন, সুদ পাবেন বছরে ৫%
২. রিকারিং ডিপোজিট
এই পরিকল্পনায় মাসে মাসে যত মুদ্রা টাকা জমা, সুদ পাবেন
বছরে ৮% থেকে ১০%
৩. ফিক্সড ডিপোজিট
এই পরিকল্পনায় আপনি বছরে ১০% পর্যন্ত সুদ পাবেন।
৪. ফিক্সড ডিপোজিটের অর্থ রিকারিং
ডিপোজিটে সঞ্চয়
এই পরিকল্পনায় ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আপনি প্রতি মাসে যে সুদ
পাবেন তা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বদলে রিকারিং ডিপোজিট
অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। ফলে আপনি কার্যকরী সুদ বেশি পাবেন,
যেমন ধরুন ৭ বছরে ১৪.৫০%।
৫. ডিপোজিট সার্টিফিকেট
এই পরিকল্পনায় মাত্র ১০০ টাকাও জমা দিতে পারেন। ১৫ বছরে
তা চারগুণ হয়ে ফিরে আসবে।

ভাষ্য

৪০ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • কাৰ্ত্তিক ১৩৮২

৩

বিচক্ষণী নাই তব ভব,
দুঃখ ও কষ্ট তব ভব।
অসমর্থ অসমর্থ
অসমর্থ কষ্টের দাব,
কষ্টের এই পথচর ॥

স্বাধীনতা

৩০ জ্যৈষ্ঠ
১৩৮২

দিদি

অনিলচন্দ্র ঘোষ

০ ০ - ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পশ্চিমবঙ্গী হতে লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও
মায়ের একান্ত সহচর বর্ষায়াস মনস্বী শ্রীনলিনীকান্ত
গুপ্ত, ১৯৬৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর।

“লীলার বাহ্য কার্যাবলীর মূল্য ও মর্যাদা আর
সকলে নির্ধারণ করবেন—আমি তাকে চিনেছি তার
অন্তরাত্মার পরিচয়ে—যে আন্তর চেতনার বল নিয়ে
সে জীবনযাপন করেছে তার তুলনা খুব বেশি
মেলে না আধুনিক জগতে ও সমাজে। লীলার
জীবন আর তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নয়—
ভবিষ্যৎ মানুষের জীবন হয়ে গিয়েছে।”

এই ছোট কথায় আত্মনিবেদিতা সর্বসমর্পিতা
লীলা রায়ের জীবন-সাধনার প্রেরণার উৎসের সন্ধান
মেলে। অন্তরের এই আত্মিক ঐশ্বর্য—গীতায়
ভগবৎ-শরণাগতি তাঁর সমগ্র জীবনকে, চালিত
করেছে। জীবন-দেবতার ওপর একান্ত নির্ভরতা
তাকে আজীবন সকল কাজের শক্তি যুগিয়েছে,
দুর্দান্ত ও দুর্লভ কর্মেও আত্ম সমাহিত চিন্তে
অগ্রগামী করে নিয়ে গেছে। অন্তরের এমন প্রাশক্তি
ও নির্ভরতা নিয়ে জীবন সংগ্রামের বিচিত্র বস্তু
পরিক্রমায় তাই তিনি ঝড়ো হাওয়ার মতো

জীবনরথ বিহাৎবেগে চালিয়ে গেছেন। কোন দিন
দিশেহারা হন নি, পথচ্যুত হন নি, ধেমে দাঁড়ান নি,
ছেদ টানেন নি, হুঃখ আঘাত বেদনা লাঞ্ছনা তাঁকে
মলিন ও অলিত করতে পারে নি।

তিনি সূদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে লিখেছেন, “আমি
(জীবনের) anchor বসতে ছোটো জিনিষকে আমি
ভগবানে বিশ্বাস, ভালবাসা, দেশকে ভালবাসা
শ্রদ্ধা করা, তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গে
নিজেকে identify করা।”

১৯৪৪ সালে দিদি লিখেছিলেন, “জীবনে সব-
কিছু আছে; একটানা নিঃশ্বাস ছুঃখশোকমুক্ত জীবন
যে আশা করে সে মূর্খ—আর আমাদের সেই
জীবনের মধ্যে গৌরবই বা কোথায়—যিনি আমাদের
তৈরি করেছেন—কি ধাতু দিয়ে তৈরি করলেন, তা
যদি তিনি পরীক্ষা করেই দেখেন নানা ভাবে, তবে
তাতে মুণ্ডে পড়বার ভীত হবার কি আছে?”

এই কথায় অরবিন্দের ১৯০৯-১০ সালে বরিশাল
জেলা সম্মেলনে ভাগবত অনুভূতির অস্বাদিত
ভাষণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীঅরবিন্দ
সেদিন বলেছিলেন, “ভগবানের হাতুড়ির নীচে

আমরা লোহার মত। তিনি আমাদেরকে যে আঘাত করেন, সে আঘাত আমাদেরকে বিনাশ করিবার জন্য নহে, আমাদেরকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য।”

নিজকে সবকিছু জীবনদেবতার পায়ে সঁপে দিয়ে পরম প্রাশান্তি ও নির্ভরতা নিয়ে, মানুষকে ভালবেসে সকল কাজই সহজ ভাবে প্রসন্ন মনে করে গেছেন, এ যেন ছিল তাঁর সহজাত সংস্কার। দিদি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “আমার মনের চিন্তা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে কাজের ধারা রয়েছে শৈশব থেকেই এক কথায় সেই ধারাটা spontaneous, effort নেই, তাতে ভাল কি মন্দ জানি না। অতি স্বাভাবিকভাবে আমার সেই ধারা দিয়ে জীবনের পথচলার বিভিন্ন মুহূর্তে আমার কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়—তাকে অমাত্য করার অর্থ জীবনকেই অস্বীকার করে একটি স্কুল দেহকে বহন করা, সে কি করা যায়? না তা কাম্য? সেই ধারাকে বিশ্লেষণ করা যায় মাত্র একটি কথায়। মানুষকে, সব মানুষকেই আমি ভালবাসি। তাদের মহত্ত্ব, দুর্বলতা, দৈহ্য, অক্ষমতা সবই আমাকে terribly irrevocably move করে।.....জীবনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। প্রচুর স্নেহ দরদ ভালবাসা প্রেম জুটেছে। দেবতার আশীর্বাদও অজস্র ধারায় পেয়েছি নিশ্চয়। এতদিন যে বেঁচে রয়েছি, কোন উদ্দেশ্য সফল করতে, জানি না, আমার জীবন-দেবতার হাতেই তার ভার।

১৪ নভেম্বর, ১৯৬৭

এই সময়ে মস্তিষ্কের রক্তস্রাব রোগের প্রচণ্ড আঘাত হতে উঠেছেন মাত্র। পূর্ব স্বাস্থ্য আর কিরে পাবার সম্ভাবনা নেই। অথচ তার মনে এসেছে এক আশ্চর্য প্রসন্নতা, তিনি যেন নিস্তরঙ্গ স্বৈর্ঘ্যের এক সংহত মূর্তি। যারা লীলা রায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে প্রাত্যহিক জীবনে আসা-যাওয়া করতেন, তাঁদের কাছে এ এক পরম বিশ্বাসের হয়ে দাঁড়িয়েছিল.....আত্মসমাহিত মানুষের চৈতন্যে যেমন আত্ম-নিবেদনের গভীর আবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে তাকে আর এক মানসিক স্তরে পৌঁছে দেয়, জীবনের কোনো স্নকঠোর তপস্চর্যার সিদ্ধির পথে যে প্রাশান্তি নেমে আসে এবং সর্বস্ব নিবেদনের বহ্ননমুক্তি-বোধ জীবনদেবতার সঙ্গে সহজ সেতুরচনার যে মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে লীলা রায়ের মধ্যেও সাম্প্রতিক কালে সেই সার্থকতার লক্ষণগুলি ক্রমশঃই পরিস্ফুট হচ্ছিল।” (জয়ন্তী ভাঙ্গ, ১৩৭৫, পৃ: ২৬১)

এ কথাগুলো লিখেছেন তাঁরই এক অন্তরঙ্গ কর্মী ভাই।

দিদি বাল্যকাল হতে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন—ধর্মপরায়ণ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম মাতামহ স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দেব ও তাঁর একমাত্র কন্যা ও দিদির নিষ্ঠাবতী মাতা স্বর্গীয় কুঞ্জলতা নাগ এবং উদার-চেতা পিতা গিরিশচন্দ্র নাগের প্রভাব উদার সুন্দর ও মহৎ জীবন গঠনে সহায়ক হয়েছিল। নিত্য উপাসনা, ভুলেও মিথ্যাকথা না বলা বিলাতীবাদ বর্জন, ক্ষুধিতেরে অন্নদান প্রভৃতি নিয়মনিষ্ঠভাবে

প্রাত্যহিক চর্চা ছিল। আদর্শের প্রতি এই নিষ্ঠা সমগ্র পরিবারটিতে পরিব্যাপ্ত ছিল।

অন্তরের ঐশ্বর্য ও কর্মের শৃঙ্খলা সুসমায় ফুটে উঠেছিল। লীলা রায়ের প্রথম জীবনের এই পরিবেশই তাঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বিকাশে অতটা সহায়ক হয়েছিল।

এর পর তাঁর অন্তর্জীবনের বিরাট পরিবর্তন আসে। সে কথা নিজেই লিখেছেন—“আমার শৈশব ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে rational upbringing ও ভাবধারার মধ্যে। দিবালোকের স্পষ্টতার মধ্যে। তার ছাপ তীব্র হয়ে আছে জীবনে। তারপর যোগাযোগ হল যথার্থ হিন্দু সভ্যতা মনন ও জীবনধারা ও mysticism এর একটি শ্রেষ্ঠ product এর সঙ্গে। কতবার ধাক্কা খেয়েছি, মন গ্রহণ করতে পারেনি, বুদ্ধি-বিচার বিচলিত হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু পেলাম তাঁর নিকট যা আমার পূর্ব-পুরুষের হাজার হাজার বৎসর ধরে রক্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আমার জীবনে অলক্ষ্যে যার স্পর্শ নিজের মধ্যে উদ্ভূত করার জন্মই যেন আমার সেই অপূর্ব জীবন সাধীটিকে পেলাম। পেলাম এমন কিছুর আশ্বাদ যার রূপ নেই স্বাদ আছে, যার প্রকৃতি ধরা ছোঁয়া যায় না কিন্তু অনুভূতিতে যাকে পাওয়া যায় এই কি আমার পূর্বপুরুষের হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত দান? হবে বা! কিন্তু এর ছোঁয়া বিচার করায় না, বিশ্বাস করায়, প্রশ্ন করে না, প্রশ্নের অতীত মীমাংসায় উপনীত হয়।”

(২৯শে-২রা জুন ১৯৬৩)

এই আন্তর সম্পদের অধিকারী বলেই তিনি বলতে পেরেছেন—“জয় পরাজয়, সাংসারিক সার্থকতা বার্থতায়, এ সব কি মানুষের পরিচয় আছে? আছে তার চিন্তায়, ব্যবহারে, সংগ্রামে। achievements কি? কোনো পাওয়া? জেবে ভেবে দেখেছি অনেক, তাতে আমার কোন আকর্ষণ নেই।

অনন্তের হাতছানিতে পথ চলা, রক্তাক্ত এ পথ কত লাঞ্ছনা, কত বঞ্চনা, কত আত্মত্যাগ আত্মনিগ্রহ কিন্তু পথ আর শেষ হয় না; হয় তো এবার হ’য়ে এসেছে। (২৩শে জুন ১৯৬৭)

এরই ঠিক একমাস আগে দিদি লিখেছেন, “আমার জীবন যে কোন সময় শেষ হয়ে যাবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মা কালী রক্ষা করেন এবং তিনিই কাজ শেষ হলে তুলে নেন।” (২২.৫.৬৭)

এই সময়ে তিনি একদিন অকস্মাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের পূণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলেন। তার নিভৃত মানসে সে সময় কোন শক্তি লীলায়িত হচ্ছিল যার আকর্ষণে তিনি অন্তস্থ দেহে ছুটে গিয়েছিলেন—নবযুগের সমন্বয়ের তীর্থে দক্ষিণেশ্বরে, জানি না। এটি তাঁর প্রথম দর্শন কি না, তাও জানি না, তবে শেষ তো বটেই এবং এটি তাঁর অন্তরাঙ্গার যাত্রাপথে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়।

মনে পড়ে, শতবর্ষ পূর্বে ব্রাহ্মপাসক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র লঞ্চে করে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, গঙ্গা-বক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে হুজনে হাত ধরাধরি করে ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করেছিলেন।

ঠাকুরের স্পর্শে ব্রহ্মানন্দের আকুল কণ্ঠে 'মা মা' ডাকে গজার জল আর আকাশের নীলিমা ধ্বনিত হয়েছিল। সে এক অপূর্ব মিলন—অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দের সহিত সাকার দ্বৈতবাদ সমন্বয়—তাই সুগন্ধর পুরুষের প্রেমলীলা দিদির জীবনও কি সেদিন ব্রহ্মানন্দের মতো এই সমন্বয়ের সাধনা—অধ্যাত্ম জীবনের এই মূর্তির অপেক্ষায় ছিল। নইলে মায়ের কাছে অস্তিম কালে মায়ের (তঁার) মেয়ে এমন করে ছুটে যাবেন কেন? আর অমনে কথাই বা তিনি নিজেকে লিখবেন কেন?

সত্যি, মা তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

হাসপাতালে প্রায় ২৯ মাস ধরে অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়িনী। নিশ্চেষ্টন কিন্তু প্রাণবন্ত চললে কুটুপটে মুখখানি—দিব্য প্রশান্ত ভাব। দেহের স্বক লাভণ্যময়, মন্থণ, রোগ বস্ত্রণার কোন ছাপ মুখাবয়বে নেই। কর্মযোগীর অস্তিম শয্যা। তাঁর কেবিনে আমার সঙ্গে এলেন বেঙ্গুড় মঠের দীর্ঘশ্রুত স্বামীজি। মাথার কাছে আশিস দিলেন, আর দিলেন মুখে একটি বিলু—শ্রীশ্রীসারদামায়ের চরণামৃত—যা পেলে জীব মুক্ত হয়ে যায়।

“নীলা মুক্ত। স্বারা দেশের জন্ত ত্যাগ করে তাঁদের বন্ধন নেই।” বললেন বুদ্ধ স্বামীজি।

দিদির দক্ষিণেশ্বরে মাতৃদর্শন সার্থক হল।

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে—তাঁর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় আজ থেকে পঞ্চাশ বর্ষেরও বেশি পূর্বে তিনি এদেশে মেয়েদের শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ও অধিকার অর্জনের আন্দোলন শুরু করেন এবং সারাজীবন সে জন্ত কাজ করে গেছেন।

তিনি শুধু মেয়েদের নেত্রী ছিলেন না, নারী পুরুষ সকলেরই দিদি নেত্রী ছিলেন।

তাঁর কাজ সাময়িক বা অল্পকালের নয়, আমৃত্যু সারা জীবনব্যাপী তার সংগ্রামময় জীবন ছিল।

জয়ন্তী—তাঁর জুহিতা। এই ছল্লালীর ভার দেশকে নিতে হবে—জয়ন্তী বাঁচলে জাতি বাঁচবে, উঠবে, দাঁড়াবে। ছেলে মেয়েরা শৌর্ষ বীর্ষে দেশের মাটি ফলিয়ে তুলবে। *

* শিবনাথ শাস্ত্রী হল-এ ২রা অক্টোবর ১৯৭৫ জয়ন্তী পরিচালক গোষ্ঠি কর্তৃক বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলরায়ের ৭৫ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতির পঠিত ভাষণ।

রুশ-চীন যুদ্ধ

অভয়শঙ্কর শর্মা

পশ্চাদপট

রুশী-চীন দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের অবরোধ ডিক্রিয়ে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সংঘাতে পরিণতি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ১৯১৭-র রুশ-বিপ্লবের চার বছর পর ১৯২১-এ চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম। স্বভাবতই মার্কসবাদ লেনিনবাদের পাঠ্যনিয়মে সোভিয়েত বিপ্লবের নিয়মামুখিতা ও কৌশলের অনুসরণে সেদিন চীনা কম্যুনিষ্টদের এগোতে হয়েছে। চীনে জাতীয় বিপ্লবের নেতা সান ইয়াত-সেন-এর নেতৃত্বে ১৯১১ সালে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো, ততোদিনে চীনা জাতীয়তাবাদী দল কুওমিংটাং ও তার তৎকালীন নেতা চ্যাং কাই-শেকের নেতৃত্বে সে-বিপ্লব পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তনের পরই পথভ্রষ্ট জঙ্গী জাতীয়তাবাদী দল কুও-মিংটাং-এর সঙ্গে তার সংঘাত বাধে। বিশ দশকের শেষের দিকে সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপানের সামরিক অভিযান চীনের বিরুদ্ধে প্রসারিত হবার আশঙ্কা বাস্তব হয়ে উঠলে লেনিনোক্ত সোভিয়েত রুশ নেতা

স্তালিনের পরামর্শ অনুযায়ী চীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সংগ্রাম মূলত্বী রেখে মাও সে তুঙ, কুও-মিংটাং-এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে জাপানের বিরুদ্ধে মোর্চা গঠন করেন। এককভাবেই হোক কিংবা ব্রিটেন বা জার্মানীর মত সোভিয়েত রুশ বিরোধী শক্তির সাহচর্যেই হোক, শক্তিশ্বর জাপান সোভিয়েত রুশের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের শক্তিমত্তা প্রতিরোধের আয়োজন সোভিয়েত রুশের নিরাপত্তার জন্ত অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। এই অবস্থায় চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি কুও মিং-টাং-এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় এলে ওই প্রতিরোধ বাহুটি যদি দুর্বল হয়, তবে স্তালিন তো সে পরামর্শ দেবেনই। কারণ চীনা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পরিধি বিস্তারের চাইতে সোভিয়েত রুশের নিরাপত্তা স্তালিনের কাছে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। তাই সোভিয়েত রুশের স্থিতির দাবীর কাছে চীনা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের প্রসারতার দাবী অতঃপর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল, চীনা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সেই শৈশবে। কুও মিং-টাং নেতা চ্যাং কাইশেক এই বোঝাপড়ায় পূর্ণ সুযোগ নিতে বিলম্ব করেন নাই।

কুও-মিং-টাং কম্যুনিষ্ট বোঝাপড়ায় শক্তিশালী হয়ে ১৯২৭-এ চ্যাং কাইশেক চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাদের পয়ুঁদস্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মাও-সে-তুঙ ছত্রভঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির অবশিষ্টদের নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে দীর্ঘ বছরব্যাপী ঐতিহাসিক লং মার্চের ('Long March') অগ্নিপরীক্ষার মধ্যদিয়ে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম পরিচালনা করে চীনের দক্ষিণ থেকে উত্তরে ইয়েনান-এ উপস্থিত হন এবং সেখানে সোভিয়েত রুশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

কিছু লং মার্চ সমাপ্তির বছরখানেকের মধ্যেই স্তালিন চ্যাং-কাই-শেক এর সঙ্গে তীব্র বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার প্রয়োজন বোধ করলেন। কারণ জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা আবার বাস্তব হয়ে উঠলো ১৯৩৬ সাল নাপাদ। তাই স্তালিনের পরামর্শক্রমে মাও-সে-তুঙ আবার চ্যাং-কাই-শেকের সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানকে রুখবার জন্ত তৈরী হলেন। এই সহযোগিতা চলে ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয় পর্যন্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের সঙ্গে সোভিয়েত রুশের অনাক্রমণ চুক্তির বলে জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রুশ যুদ্ধ-ঘোষণা থেকে বিরত ছিল এবং হিরোসিমাতে আমেরিকার আনবিক বোমাবর্ষণের পর জাপানী আত্মসমর্পণের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সোভিয়েত রুশ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে। যুদ্ধ-ঘোষণার পর সোভিয়েত রুশ দ্রুত জাপান কর্তৃক অধিকৃত চীনা-

ভূখণ্ডের মাঞ্চুরিয়ার অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয়। এবার অবশিষ্ট স্তালিনের পরামর্শের বিরুদ্ধেই মাও-সে-তুঙ কুও-মিং-টাং এর সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করে। কুও-মিং-টাং বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী ১৯৪৯ সালের ৩০শে এপ্রিল ইয়াংসি নদী অতিক্রম করলে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর চূড়ান্ত জয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। সে-বছর ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কম্যুনিষ্ট বাহিনী মূল চীন ভূখণ্ড দখল করে ১লা অক্টোবর চীনা প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। চ্যাং-কাই-শেক বিভাঙিত হয়ে তাইওয়ান চীনে আশ্রয় নেয়।

চীনে কম্যুনিষ্টদের সাফল্য আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে নিঃসন্দেহে শক্তি সঞ্চারিত করলেও চীনা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পথ সোভিয়েত রুশের পথের চাইতে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ছিল। নিপুল কৃষকবাহিনীর পেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম কয়েক বছর ব্যাপী লং মার্চ-এর আত্মাহুতি ও প্রতিকূল পরিবেশে তুর্জয় সঙ্কল্পের মূর্ত্যুপণ্ণ আবেগ, চীনে কম্যুনিষ্টদের সংগ্রামকে একদিকে যেমন স্বকীয়তা দান করেছিলো, তেমনি মাও-সে-তুঙ-এর চারপাশে প্রায় বিশ বছর একসঙ্গে সংগ্রাম করার ফলে একটি বহুদর্শী বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিলো। রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। তার ৩২ বছর পর ১৯৪৯ এর অক্টোবরে চীনা কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করলো। রুশ বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় প্রত্যক্ষ অংশীদারদের মধ্যে একমাত্র স্তালিন ১৯৪৯-এ জীবিত ছিলেন। এমন কি ১৯১৭র মার্চ বিপ্লবে

৩৪৬ জয়ন্তী, কার্তিক ১৩৮২

স্তালিনও সাইবেরিয়ায় ছিলেন। পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত ছিলেন অখ্যাত মলোটভ, আর যারা স্টালিনের চারপাশে ছিলেন রুশ বিপ্লবের দিনে, হয় হয় তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, না হয়তো বিপ্লবোত্তর বছরগুলিতে ক্রমশ তারা নেতৃত্বের সারিতে এসে পৌঁছেছেন। আর যারা স্তালিনের নামে বিপ্লবী সহকর্মী ছিলেন, ১৯৫৬-এর পূর্বেই স্তালিনের ষাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

চীনের স্বকীয় পথ, তার বহুদর্শী নেতৃত্বের বৈশ্ববিক সংগ্রামের অব্যবহিত অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের উপাত্তে চীনে সোভিয়েত-রুশের অমুপ্রবেশে জাপানী অধিকৃত চীনা অঞ্চলে সোভিয়েত রুশের দখলকারী—চীন-রুশ স্বন্দর পশ্চাদ্গট রচনা করেছিলো।

(ক্রমশঃ)

জয়ন্তী প্রকাশনের কয়েকটি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ	ঐ মহামানব আসে : চারদিক	৬০০
১ম খণ্ড ৯০০ ২য় খণ্ড ১২০০	NETAJI THROUGH	
ও ৩য় খণ্ড ১৩৫০	GERMAN LENS	
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়	Nanda Mookerjee	১২.৫০
সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০	রামমোহন	
সুভাষচন্দ্র ও জ্ঞানদাস গ্যানিং	সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত	৪০০
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬০০	সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ	
NETAJI SPEAKS	অনিল রায়	৪০০/৬০০
Volume One	বাংলাদেশের বিপ্লব	
A collection of speeches & writings	সুনীল দাস	১২৫
Paper back 4/- Board 5/-	ধর্ম ও বিজ্ঞান	
	অনিল রায়	২০০

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শিক্ষার জরুরিকার্য

শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

১২। রেকর্ড—যে কোন হাতের কাজের মত বাগানের কাজের দৈনন্দিন কার্যাবলীর নিয়মিত হিসাব রাখা প্রয়োজন। সমস্ত বছরে ছেলেমেয়েরা বা কাজ করল তার হিসাব অনায়াসেই এই রেকর্ড থেকে পাওয়া যেতে পারে। এরই সাহায্যে ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের মানও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কাঠের কাজ

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে যে সমস্ত হাতের কাজকে স্থান দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কাঠের কাজের স্থান অগ্রগণ্য। অধিকাংশ ছেলেদের স্কুলেই শিকার ব্যবস্থা ঠিক নেই, ফলে এই ক্ষেত্রে ও অন্যান্য হাতের কাজের মত আশানুরূপ সাফল্য লাভ সম্ভব হচ্ছে না। স্কুল পরিদর্শন কালে দেখা গিয়েছে যে কোন স্কুলে শিল্প শিক্ষক আছেন কিন্তু শিল্পের ক্লাসে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় না, শুধু কাঠ ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হয় মাত্র। এই রূপ অবস্থার কারণ অনেক এবং পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচনা করা যাবে।

১। প্রাকৃতিকাল—যে কোন হাতের কাজের মত কাঠের কাজের জন্তও ছেলেমেয়েদের হাতে কলমে কাজ শেখাবার সুযোগ বেশী দেওয়া প্রয়োজন। কোন কোন স্কুলে ৪টি বা ৬টি অথবা ৮টি পিরিয়ড এই কাজের জন্ত বরাদ্দ করা হয় কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই সপ্তাহে ১ ঘণ্টা বা ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় ছেলেদের হাতে কলমে কাজ শিখাবার জন্ত দেওয়া হয়। আবার কোন কোন স্কুলে এর চেয়েও কম মাত্র ৪০ মিনিট সময় সপ্তাহে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য শেখোস্ত স্কুলগুলিতে সময়ের অভাবে কোন কাজই করান সম্ভব নয়। হাতে কলমে কাজ শেখাবার জন্ত অন্ততঃপক্ষে দেড় থেকে দু'ঘণ্টা সময়ের একান্ত প্রয়োজন।

২। থিওরি—হাতে কলমে কাজ শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। অধিকাংশ স্কুলেই এর ব্যবস্থা রয়েছে। আবার কোন কোন

স্কুলে ছেলেমেয়েদের হাতে কলমে কোন কাজ না শিখিয়ে মাত্র বই পড়ান হয়। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা কোন ক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়।

প্রাকৃতিকাল কাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ছেলেদের খিওরি পড়ান উচিত। মাত্র খিওরি পড়িয়ে হাতের কাজ শেখান সম্ভব হয় না। এতে শিক্ষা শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

৩। সময়—অধিকাংশ স্কুলেই ৪০ মিনিট করে সময় এক একটি পিরিয়ডের অন্ত দেওয়া হয়। কয়েকটি স্কুলে এক ঘণ্টা করেও সময় দেওয়া হয়। কিন্তু প্রভিটি ক্লাসেই যে পরিমাণ ছাত্র সংখ্যা থাকে সেই তুলনায় এই সময় অত্যন্ত কম। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে একজন শিক্ষকের পক্ষে কখনওই সমস্ত ছেলেদের আলাদা করে কাজ দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা অবস্থায় শিক্ষকের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। অতএব পিরিয়ডের সময় আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

৪। ছাত্র সংখ্যা—কাঠের কাজ যে সমস্ত ক্লাসে শেখান হয় সেখানে ছাত্রসংখ্যা গড়ে ৫০ থেকে ৫৫ জন। কোন কোন ক্লাসে এর চেয়েও বেশী প্রায় ২৫০ জন থাকে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রদের ৪০ অথবা ৪৫ মিনিটের মধ্যে একজন শিক্ষকের পক্ষে কখনই কাজ শেখান সম্ভব নয়। এর অন্ত হুঁতবে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হয় বেশী শিল্প শিক্ষক নিয়োগ করা নতুবা ছাত্রদের কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেওয়া। অন্তর্গত ছেলেদের ভাল করে কাঠের কাজ শেখান কখনও সম্ভব নয়। এই ছোট ছোট দলগুলি যদি সপ্তাহে একদিনও ভাল করে কাজ শিখতে পারে তাতে অনেক বেশী সুফল পাওয়া সম্ভব।

৫। স্থান—কাঠের কাজ শেখানার জন্য প্রত্যেক স্কুলেই আলাদা ঘর থাকা প্রয়োজন। সাধারণ ক্লাসে কাঠের কাজ চলতে পারে না। এ কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, কাঠ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত জিনিস রাখবার জন্য এবং যন্ত্রগুলিকে ঠিকভাবে স্থাপন করবার জন্য বিশেষ স্থানের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত সাধারণ টেবিল চেয়ার বা বেঞ্চে বসে কাঠের কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ কাঠের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ স্কুলেই কাঠের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ থাকে না। যে উপকরণ থাকে তাও ছাত্রসংখ্যার তুলনায় এত নগণ্য যে তা নিয়ে কাজ শেখান বিশেষ সম্ভব হয় না।

৬। ব্যয়—কাঠের কাজ শেখাবার জন্য যন্ত্র বা কাঠের অভাবের মূল রয়েছে অর্থ অভাব। বর্ষেক পরিমাণে অর্থ এই কাজের জন্য মঞ্জুর না হওয়ার ফলেই এই বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। যদিও স্কুলের অর্থ অভাব এর মূল রয়েছে কিন্তু আংশিক ভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের শিল্প সম্পর্কিত উদ্যোগকেও দায়ী

করা যেতে পারে। হাতের কাজ বিষয়টি এমনভাবে অবহেলিত হয় যে তার জন্য যে কোন প্রকার অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন আছে সম্ভবতঃ তা তাঁরা অনুভব করতে পারেন না।

অবশ্য এই কাজের জন্য যে একেবারেই টাকা খরচ করা হয় না তা বলা চলে না। এক একটি স্কুল নিজ সামর্থ্যমুযায়ী ব্যয় করে। এই ব্যয়ের কোন নির্দিষ্ট হার নেই। কোন স্কুল যেখানে বছরে ১১০০ টাকা খরচ করছে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছেলেদের কাঠের কাজ শেখাবার জন্য সেইখানে অন্য একটি স্কুলে অনুরূপ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বছরে মাত্র ১০০ অথবা ১৫০ ব্যয় করা হচ্ছে। এই ব্যয়ের হার থেকেই অনুমান করা যায় যে কোন স্কুলে কতটুকু যন্ত্রের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে ছেলেদের কাঠের কাজ শেখান হয়।

৮। প্রস্তুত জব্বা—যে সমস্ত স্কুলেই কাঠের কাজকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শেখান হয়। কোন কোন স্কুলে কেবল মাত্র নবম ও দশম শ্রেণীতে হাতের কাজ শেখান হয়। সপ্তাহে প্রতিটি ক্লাসের জন্যই অন্তত দুটি করে পিরিয়ড হাতের কাজের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু এত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বছরে ছেলেরা কতটুকু হাতের কাজ করতে শিখল, কি কি জিনিস তৈরী করল তার হিসাব প্রায় কোন স্কুলেই দিতে পারে না। অবশ্য ছ'একটি স্কুল থেকে জানা যায় যে সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিস, যেমন—জলচকি, ব্রাকেট, বইয়ের তাক, চায়ের ট্রে, ডেস্ক ইত্যাদি তৈরী করতে শেখান হয়। এর থেকে অনুমান করা যায় যে কয়েকটা স্কুল ছাড়া প্রায় কোন স্কুলেই কাঠের কাজ বিশেষ করেন না।

৯। পরীক্ষণ ও রেকর্ড—ছেলেমেয়েদের যেমন সারা বছর ধরে কাজ শেখান হয়, তেমনি তারা কি শিখল তা যাচাই করে নেওয়াও প্রয়োজন হয়; কেন না সে অনুপাতে পরবর্তী ক্লাসে কাজ শেখান যেতে পারে। প্রায় অধিকাংশ স্কুলেই অন্ত্যস্ত পাঠ্য বিষয়ের মত কাঠের কাজের জন্যও বাৎসরিক, বাৎসরিক ও সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। হাতের কাজের ধিওরি অংশের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু হাতে কলমে কাজের জন্য তা সর্বাংশে সম্ভব নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে নিয়মিত ছেলেদের হাতের কাজের হিসাব রাখা। এই হিসাব শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং রাখতে পারেন বা ছাত্রদের দিয়ে রাখতে পারেন। তবে উভয়েরই রেকর্ড রাখা উচিত। এই হিসাব থেকে অপেক্ষাকৃত নির্ভর যোগ্য ভাবে ছেলেদের জ্ঞানের মান নির্ণয় করা যেতে পারে। সারা বছরে তারা কতটুকু দক্ষতার সঙ্গে কি কি কাজ শিখল তার ধারাবাহিক হিসাব এই রেকর্ড থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

১০। শিক্ষক—অস্বাস্থ্য শিল্পের মত কাঠের কাজের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা যায়। সমস্ত স্কুলের সমস্ত কাঠের কাজের শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এক নয়। এমন অনেক স্কুলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে এমন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন, যিনি কাঠের কাজ আদৌ শেখেন নি। সম্ভবত শিল্প শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে এই সমস্ত শিক্ষকদের দিয়ে অস্বাস্থ্য পাঠ্য বিষয় পড়ান হয়। এই অবস্থা দূর করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যতদিন পরিষদ কোন ব্যবস্থা স্থির না করে দেবেন ততদিন এই বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্ভব হবে না।

১১। বেতন—শিক্ষকের সমস্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর একটি সমস্যা, শিক্ষকদের বেতন। শিক্ষকের যে স্ত্রীয়া প্রাপ্য বেতন তা কোন স্কুলেই শিল্প শিক্ষকদের দেওয়া হয় না। কোন স্কুলেই কাঠের কাজের শিক্ষকদের সহশিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হয় না। নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকার ফলে এক একটি স্কুলে এই শিক্ষকদের এক এক ধরনের বেতন দেওয়া হয়। তবে কোন বেতনই জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

যে সমস্ত স্কুল থেকে কাঠের কাজ সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে অধিকাংশ বিভাগেই শিক্ষকদের বেতন ১১৫/-১৮৫/- টাকা; কোন কোন স্কুলে এর সঙ্গে ১০/- করে মাসিক ছুফুল্য ভাতা (D. A.) দেওয়া হয়। আবার কয়েকটি স্কুলে মাত্র ১১৫/- বেতন দেওয়া হয়। অপর একটি বিভাগে ১১৫/- বা ১১০/-১৫০/- দেওয়া হয়। একটি বিভাগে ৭০/- ১৫০/-+৪৫/- মাসিক ছুফুল্য ভাতা (D. A) এবং অপর একটিতে মাত্র ৮৫/- ও আরেকটিতে মাত্র ৪০/- বেতন দেওয়া হয়। একটি স্কুলে যদিও ৬৭/- বেতন দেওয়া হয় কিন্তু সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে তাদের নিয়োগ পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে হয়েছে।

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের বিবেচনা করবার বিশেষ অবকাশ রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

ভারতের জাতীয়তা ও সুভাসচন্দ্র

কণেশ্বর ঘোষাল

জাতীয়তা ও অস্বাভাবিকতা

জাতীয়তা সম্পর্কে কমুনিষ্ট ধ্যান ধারণার বিষয়ে F. Bloom বলছেন, “মার্কস এঙ্গেলস লিখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা পিতৃভূমি ও জাতীয়তা তুলে দিতে চান। পিতৃভূমির অর্থ হ’ল শোষণ শ্রেণীর দেশ, বর্তমানে যা বুর্জোয়াদের করায়ত্ত। সেই অর্থে এ কথা স্পষ্ট ‘শ্রমিকদের পিতৃভূমি বলে কিছু নেই। যা তাদের নেই তা আমরা হিনিয়ে নিতে পারিনা।’

“এই রূপ স্মরণ উক্তি রক্ষণশীলদের সমালোচনা এবং বিপ্লবীদের অনেক কল্পনার বিষয়বস্তু হয়েছে।” (F. B. P 24)²

কাল মার্কস কোনও ভৌগোলিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংগঠন ও অগ্রগতির ক্ষমতা জাতিগঠনের মুখ্য উপাদান বলে মনে করেছেন। অতীত উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক ও অন-অর্থ-

নৈতিক উপাদানগুলির মধ্যে কোনো সম্পর্কের কথা বলেননি (জঃ ঐ—P 32)

তাঁর মতে সব জাতির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধিকার প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে এমন নয়। ...কোথায় এবং কখন একটি জাতি রাষ্ট্র গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভবপর তা মূলতঃ নির্ভর করবে সেই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনটির শিল্পায়িত আর্থিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষমতার উপর। মার্কস সেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের অধিকার সম্পর্কে বড় ও ছোটজাতির মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য করেছেন। সেই সব জাতির বা জাতি গোষ্ঠীরই রাষ্ট্রগঠনের অধিকার আছে যারা আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে। মার্কস নিঃসন্দেহে মনে করতেন, জার্মান, ইটালীয়, পোলিশ ও হাঙ্গেরীয় (ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, আমেরিকান তা বটেই—যাদের রাষ্ট্র রয়েছে) জাতির মত বড়, একত্রিত এবং ভৌগোলিক সীমার অবসানে সমৃদ্ধ জাতিগুলির রাষ্ট্রগঠনের অধিকার রয়েছে। অপর পক্ষে ক্ষুদ্রতর জাতিগুলির যেমন, পুরাতন অস্ট্রীয় বা তুর্কীসাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্লাভ গোষ্ঠীগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার দাবী করতে পারেনা বা

(১) F. B.—The World of Nations (A Study of National Implications in the Works of Karl Marx by Solomon F. Bloom.

সাফল্য জনক ভাবে সে দাবী রক্ষা করতেও পারে না ...ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার দাবী 'ঐতিহাসিকশীলতার' বিপদ ডেকে আনতে পারে। তারা অনিবার্যভাবে উন্নতি ও প্রগতির বিরুদ্ধে যাবে। উন্নতির লক্ষণগুলি হ'ল বড় ধরণের আর্থিক রাষ্ট্রিক সংগঠন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা ও সংস্কৃতির আঙ্গবিলুপ্তি (জঃ ঐ P. 35-36)।

মার্কস এমন কি বড়জাতিগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনকেও আন্তর্জাতিক স্বার্থের নীচে স্থান দিয়েছেন। ১৮৫৯খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়া ইটালীতে হাপস-বার্গ প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মার্কস কিন্তু হাপস-বার্গ স্বার্থের স্বপক্ষে দাঁড়ান কারণ ইটালীতে ফরাসী হস্তক্ষেপ জার্মানীর একতার সহায়ক হবেনা। এবং যেহেতু জার্মানী ছিল ইটালীর থেকে বৃহত্তর ও উন্নততর দেশ। এ বিষয়ে লাসেলের সঙ্গে মার্কসের মত পার্থক্য ঘটে (জঃ ঐ P. 46)।

স্লাভ জাতিগুলির সম্পর্কে মার্কস একটি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও তিনি পোলদের স্বাধীনতা সমর্থন করতেন। মার্কস নার্ডিক বা স্ক্যান্ডিনেভীয় জাতীয়তার কথা সন্তুষ্ট করতে পারতেন না। মার্কস বিশ্বাস করতেন শ্রমিকদের দ্বারা প্রতিটি জাতি শাসিত হ'লেই আন্তর্জাতিক শান্তি বাস্তবায়িত হবে (জঃ ঐ P. 79 ও 83)।

জাতীয়তার ঐতিহ্যগত উপাদানের বিষয়ে এবং কোন জাতির বৈশ্বিক উদ্দেশ্যের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে একপ্রকার জাতীয়তাবাদ রয়েছে যা নিজের জাতিকে গৌরবময়,

বিশেষ করে বৈশ্বিক উদ্দেশ্যমণ্ডিত মনে করে। কখনো কখনো তারা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উপর জোর দেয়। এই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সেইসব জাতিগুলি তাদের অতীতকে 'প্রত্যাশিত তৈল' সিক্ত করে। (ঐ পৃ: 79)

জাতি রাষ্ট্রের গঠনে মার্কস অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষমতাকেই মুখ্য উপাদান হিসাবে দেখেছেন। সেখানে স্বাধীনতার অর্থও প্রকৃতির মনন বা অভ্যাসের নৈতিকদোষ রেখাপাত করতে পারে নি। মার্কসের জাতীয়তার চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করে Bloom লিখেছেন "সভ্যতার বাস্তব প্রয়োজন বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন এবং তা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পক্ষেই সম্ভব। সেইজন্য বৃহৎ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোর আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনই মানুষের পক্ষে প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে থেকেই আশ্রয় করে চলতে হবে। কোনো কোনো জাতি ও তাদের সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব সম্মান হারিয়ে ফেলবে-কিন্তু উপায় নেই। অর্থনৈতিক রূপান্তর না ঘটলে অসুস্থ বৃহৎ জাতির স্বাধিকারের দাবীকেও সমর্থন করা যায় না। অর্থনৈতিক সংগঠনের বিচার দিয়ে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণের সহায়তা হবে। প্রতিটি জাতির ভৌগোলিক সীমা, প্রাকৃতিক সম্পদ, জলপথ, জনসংখ্যা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে বিরাট অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে।" (ঐ—p.197-8)

কিন্তু মার্কসের সময়েই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি তাদের সজীবতা প্রমাণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে

অনেক মধ্য ইউরোপীয় জাতি তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি পড়ে তোলে। পোল বা হাঙ্গেরীয়দের থেকে ছোট জাতিগুলি হাঙ্গারীর মত বড় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করেছে। মার্কস তা বুঝতে পারেন নি (ঐ—p 200)

পরবর্তী যুগে বিশেষ জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার যখন এলো মার্কসের অনুসারীগণ ভয়পূর্ণ দিক থেকে বিপদে পড়লেন। কারণ জাতীয়তার বিষয়ে মার্কসের চিন্তা তাদের পথের নির্দেশ দিতে পারল না। উদাহরণ স্বরূপ অস্ট্রিয়াতে Otto Bauer মার্কসবাদ ও জাতীয়তার সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন করতে বাধ্য হলেন।” (ঐ P 201)

জাতিগত ভাবনা ও আন্তর্জাতিকতার বিষয়ে লেনিনের সূত্র মতগুলি কমুনিষ্ট দৃষ্টিকোণকে বুঝতে সাহায্য করবে। লেনিন বলেছেন, “আমার যুক্তি অবশ্যই ‘আমার’ দেশ এই দৃষ্টিকোণ থেকে নয় (কারণ সে যুক্তি হচ্ছে হতভাগ্য, মূর্খ, পাঁতি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর) তা হবে সর্বহারা বিপ্লবের প্রস্তুতি, প্রচার এবং তা ত্বরান্বিত করণে আমার অংশ কতটুকু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে।

“এই হচ্ছে আন্তর্জাতিকতার অর্থ এবং এই হচ্ছে একজন আন্তর্জাতিকতাবাদীর, বিপ্লবী কর্মীর আর মধ্যম সমাজবাদীর কর্তব্য।” (Selected Works Vol-3-P 127)।

অজ্ঞাত বলেছেন, “কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক

(১) Selected Works Published in three volumes,

ওপনিবেশিক অধ্যুষিত দেশগুলিতে বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটিক জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করা উচিত, একটিমাত্র সর্তে যে—এই সব দেশে ভবিষ্যতের সর্বহারা পার্টির সংগঠনকারীদের যারা শুধু নামে কমুনিষ্ট হবে না তাদের একত্রিত করে বিশেষ কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য শিক্ষা দিতে হবে। সেই বিশেষ কাজ হ’ল তাদের নিজেদের জাতির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।” (ঐ p 467)

বর্তমানের “সীমাবদ্ধ সার্বভৌমত্ব” বিষয়ক কমুনিষ্ট তত্ত্বকে উপরোক্ত আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা যেতে পারে। জাতীয়তার গঠনে বিভিন্ন বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে নূন ভাবে দেখে অর্থনৈতিক সংগঠনের উপাদানকে প্রধান বলে চিহ্নিত করায় এবং জাতীয় আন্দোলনে কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিকতার বিরূপ মনোভাবের ফলে কমুনিষ্ট পিভিসদেশের জাতীয়তার চিন্তা ও আন্দোলনের বিভ্রান্তির ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিকতা বিশ্বের জাতীয়তার চিন্তাসমূহের সমন্বয় নয়, তা এক জাতীয়তা-বিরোধী দর্শনে পরিণত হয়েছে। কার্ল মার্কস ও লেনিনের যুগ থেকেও পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে গেছে, এগিয়ে গেছে বিশ্বের মনীষা আর আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে সমন্বয়ী মননধারা এবং বিশেষ নানা ধরনের জাতিরাষ্ট্র গঠনের সাংগঠনিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। এর সূত্র ধরেই সমন্বয়ী জাতীয়তার আন্তর্জাতিকতার রূপান্তরের দিকদর্শন রচিত হবে।

ভারতবর্ষেও কমুনিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে

জাতীয়তার উৎস সম্পর্কে নানা আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে Sri A. R. Desai রচিত Social Background of Indian Nationalism নামক গবেষণামূলক পুস্তকে ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসকে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। Sri Desai স্বীকার করেছেন ভারতের বিশিষ্ট সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, তার বিশালতা এবং জনসংখ্যা সব মিলিয়ে ভারতের জাতীয়তার সমীক্ষণকে কঠিনতর করে তুলেছে কিন্তু তা থাকার্যণীয় এবং প্রয়োজনীয় (জঃ p. 5)। অতীত বলছেন, “অতীতের সামাজিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনকে ধরে রাখার ইচ্ছা ভারতে যত শক্তিশালী সম্ভবতঃ পৃথিবীর অল্প কয়েকদেশে তেমন নয়।

(জঃ ঐ)

...“ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র থেকে ভিন্ন কারণ এর (ভারতের) সামন্ত তান্ত্রিকতায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপার ছিল না।”

তারপর এর সমর্থনে Wadia Merchant পেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, “হিন্দুযুগে জমির মালিকানা ছিল গ্রামীণ সম্প্রদায়ের হাতে ; তা কখনও রাজার সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃত ছিল না।” (জঃ ঐ p 8)

প্রদেবশাই আরও মন্তব্য করেছেন যে, আশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ও আকবরের মত শক্তিশালী নৃপতির একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য নামমাত্র ছিল, কারণ অতীত ভারতের গ্রামগুলি ছিল যেন

এক একটি রিপাবলিক। ব্রিটিশ আসার পরই ভারতে সর্বপ্রথম প্রকৃত একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সাধিত হয় (জঃ p-166)। ঐ পুস্তকের লেখক আরও মত প্রকাশ করেছেন ভারতে জাতীয় শিল্প বলে কিছু ছিল না। আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক ভারতবর্ষময় সংগঠিত ছিল না, ছিল না তার যাতায়াত ব্যবস্থার সংহতি। “প্রাক ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় সংস্কৃতির বস্তুগত বা ভাবগত উপাদান সমূহের যেমন সাধারণ আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থিতি ছিলনা এবং এই অবস্থিতির সম্ভাবনাতাও নয়।.....জাতীয় সংস্কৃতিই জাতির সাংগঠনিক অস্তিত্ব সূচিত করে।” (ঐ p 26)

জাতীয়তার উপাদান বিষয়ে কম্যুনিষ্টদের এইরূপ খণ্ডিত আলোচনার ধারা নিতান্তই একপেশে এবং সেজন্যই তা Sri Desai কে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। বস্তুতঃ কম্যুনিষ্ট তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভারতের জাতীয়তার তথ্যগত উপাদান-গুণিকে অবহেলা করা হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে দেখেছি ভারতে ব্রিটিশ শক্তিই প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য এনে দেয় এইমত কত ভ্রান্ত ও উদ্বেগ প্রণোদিত। ব্রিটিশের প্রচার আর কম্যুনিষ্ট সিদ্ধান্ত এখানে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেছে। দ্বান্বিক জড়বাদী দৃষ্টিতে অতীত ভারতের গ্রামীণ কাঠামো, রাষ্ট্র ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক এবং অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিপুল এবং বিশিষ্ট প্রমাণ যথার্থ মর্যাদার স্থান পায়নি। সম্ভবতঃ ভারতের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের অতুলনীয়

বিশিষ্টতার বিষয়ে কম্যুনিষ্ট ভাবনাও দীনতা ও বিরূপতা এর অন্ততম কারণ। যাই হ'ক এ বিষয়ে তিনি আলোচনার পন্থীতে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আরও একটি বিষয় সম্পর্কে বলা প্রয়োজন এই যে অতীত ভারতের শিল্পগত কুশলতা ও সমৃদ্ধি ছিল তদানীন্তন বিধে অতুলনীয়। এবং তখন ভারতের শিল্পজাত পণ্য বিদেশের বাজারে রপ্তানী হ'ত। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তিও ছিল বিপুল। সেজন্য অতীতের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগঠন ছিল না এ কথা সত্য নয়।

কম্যুনিষ্ট মতবাদের জাতীয়তার ভঙ্গের সঙ্গে স্বভাবচরিত্রের জাতীয়তার ভাবনার মূলগত বিপুল পার্থক্য রয়েছে। তিনি ভারতের অতীত ঐতিহ্যের অবদানকে ভারতীয় জাতীয়তার অন্ততম প্রধান উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন.....একমাত্র এই জাতাই বিশ্বে দীর্ঘতম একটানা সামাজিক, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এবং এর জীবন্ত সত্য আরও অনেক সত্যের সফল পরীক্ষার সন্ধান মিলবে—সেগুলি বিশ্বের পক্ষে কল্যাণকর? অবশ্য সকল জাতির অবদানের পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই গড়ে উঠবে সত্য আন্তর্জাতিকতা। টোকিয়ো ভাষণে স্বভাবচরিত্র বলেছেন, “আমরা জেনেছি সেই আন্তর্জাতিকতাই সত্য যা জাতীয়তাকে অবহেলা করে না বরং জাতীয়তা থেকেই তা গড়ে ওঠে।” অন্তত বলেছেন, “কোনও প্রকার জাতীয়তাবাদের

প্রতি ইহার (কম্যুনিজমের) সহায়ত্ব নাই কিন্তু ভারতের আন্দোলন একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতবাসীর জাতীয় মুক্তির আন্দোলন।” (I. S. p-314) অমরাবতী ছাত্রসম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন, “সমগ্র মানব সমাজকে উদার ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে, যাহাতে পরিশেষে এই বিশ্ব-জগৎ মান জাতের পক্ষে অধিকতর সুখকর, কল্যাণকর হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।” (তৎকালীন স্বপ্ন পৃঃ ৩২)

স্বভাবচরিত্র জাতীয়তাবাদের কাগজপত্র মধ্য দিয়ে স্বাধীনতায় উত্তরণের পথনির্দেশ করেছেন, যে স্বাধীনতা হবে জাতীয় সামাজিক অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠনের পূর্বসূরী। এই সাম্যবোধকে তিনি আহরণ করেছেন ভারতীয় ঋষিদের সার্ম্যের আত্মিক মনন থেকে এবং তাকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের মানবিক প্রয়োজনে দেশের অর্থনীতিতে প্রসারিত করেছেন দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন শুভচরিত্রের এক স্থানশিঁট এবং পারকল্পিত কাঠামো রয়েছে সে কথা আজ সুবিদিত। আর জাতীয় স্বাধীনতা, আজত হলেই নূন জাতীয় আর্থিক সংগঠন গড়ে তোলা হবে। শুধুমাত্র আর্থিক সংগঠনের বেপরোয়া ভৌগোলিক চতুঃসীমা দিয়ে জাতগঠনের আগ্রহী কল্পনা নয়। স্বভাবচরিত্র জনগণের হাতে সব কমতার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত সমস্ত জাতের মুক্ত সংগ্রামে নিঃসৃত সাহায্যের প্রতীক দিতে উদ্বুদ্ধ করে ঘাষণা করেছেন, ভারতের মুক্তি বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করবে। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র ও নারীর মূল্য

অগমণী লাহিড়ী

আজ তোমার জন্মদিন। এই বৎসর তোমার জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব। দিকে দিকে উৎসবের পসরা বসে গেছে। উৎসবের ডামাডোলে কেমন বিভ্রান্ত বোধ করছি। কথা বলা, পুতুল মাস্কিক ইত্যাদির ভিড়ে অর্থাৎ মেলায় তোমায় খুঁজে পাইনা। হয়ত আমারই অক্ষমতা। কিন্তু বাড়িতে বসে তোমার রচনা যখন নুতন করে পড়ি, তখন দেখি তোমার কাছে আমরা কত দিক থেকে ঋণী। আমাদের মনের দরজায় পুরুষ একটা বিরাট তাল। ঝুলিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রেখেছিল। তুমিই প্রথম পুরুষ যে সেই চাবিটা দিয়ে আমাদের মনের দরজাগুলো হাট করে খুলে দিল। আমাদের মনের যত প্রশ্ন, যত সমস্যা সব তোমার কলমের ডগায় এক একবারে ফুটে উঠতে লাগল। আমরা নারী সমাজ বিস্মিত, বিমুগ্ধ। সমাজে সংসারে যারা অন্ধকার কোণে পড়ে থেকে শুধু চোখের জল ফেলতেই জেনেছিল, তারা শুধু প্রতিবাদ করে উঠল। পুরুষ সমাজে সেদিন ‘গেল’ ‘পেল’ রব উঠেছিল। কিন্তু তোমার লেখনি সেদিন তীক্ষ্ণ বানের মতন একের পর এককে বিদ্ধ করেই চলেছিল। তুমি আমাদের দিয়েছ সাহস, মর্যাদা, সম্মান ও মুক্তি। তোমার জন্মদিনে তোমার রচনা ‘নারীর মূল্য’ যখন পড়লাম তখন ভাবছি তোমাকে শ্রদ্ধা

জানাবার অধিকার আমাদের বা আমাদের সমাজের আছে কি না? তোমার জন্মশতবার্ষিকীতে মেলা বসিয়ে তোমার মূল্যকে অমূল্য না মূল্যহীন করতে চলেছি, ভাবতে হচ্ছে।

‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধের একটি বিশেষ অংশ আজও বেদনাবহ তাই মনে পড়ছে, রাজ্জারামমোহন রায় ও ইংরাজদের প্রচেষ্টায় যখন সহমরণ প্রথা বন্ধ করা হল তখন হিন্দু ধর্ম্মে পেল পেল রব উঠেছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজের রক্ষকদের দায়িত্ব জ্ঞান অশ্রু দিকে বেড়ে গিয়েছিল। এখন তোমারই ভাষায় জানাই—“কিন্তু সমাজ রক্ষকদের কাজ বাড়িয়া গেল। * * এই স্থানে বসিয়া আমাদের বিধবাকে দেবী বানাইয়া তুলিব। তাহার পর শাজ্জের পুরাতন শ্লোক, এতদিন যাহা অব্যবহারে কোথায় পড়িয়াছিল তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া লোকাচারের দোহাই দিয়া, যত রকমের কঠোরতা কল্পনা করা যাইতে পারে সমস্তই সজ্জ বিধবার মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া দেবী করা হইতে লাগিল। সে নিরাস্তরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, ধান ফাড়া কাপড় পরে, কেন না সে দেবী। চিংকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল, আমাদের বিধবার মতন কাহার সমাজে দেবী আছে। অথচ দেবীটিকে বিবাহের

ছাদনা-তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না—পাছে দেবীর মুখ দেখিলে কেহ দেবী হইয়া পড়ে। মঙ্গল উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে আন্ধের পিণ্ড রাঁধিতে।” বৈধবোর কঠোরতা শিখিল হয়েছে সহরে, কিন্তু গ্রামের অবস্থা কতটা উন্নত হয়েছে? আজও বৈধব্যা একটা অভিশাপ মেয়েদের জীবনে। অথচ পত্নীর বিয়োগে পুরুষের গায়ে আঁচড়টি পড়ে না।

শেষের দিকে তোমার অনুভূতি কতটা তীব্র ও বেদনার্ত ভাবতে আজও আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। বৈধবোর জন্তু যারা কোন মতেই দায়ী নয় তাদের যে কোন মাত্রলিক উৎসবে অপরাধীর সাজা নিষ্ঠে হয়। এর পরিবর্তন খুব কমক্ষেত্রেই হয়েছে। সম্ভানের মঙ্গল উৎসবে মায়ের অধিকার নেই। দেওর-ননদের বা ভাই বোনদের মঙ্গল উৎসবে বিধবা বৌদিদের বা বিধবা দিদিদের প্রবেশ রীতিমত অমঙ্গল জনক। এই অমূলক বা ভিত্তিহীন কুসংস্কার জর্জরিত অনুষ্ঠানে, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মেয়েরাই অগ্রণী। সেই মেয়েরা কি আজও তোমায় শ্রদ্ধা জানালে তুমি সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ করবে?

তোমার আর একটি প্রবন্ধ স্বরাজ সাধনায় নারী। এক জায়গায় তুমি লিখেছ—“যে বরের-বাণ কল্লা-দায়ীর কান মুচড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে, তাকে দাতাকর্ণ হতে বলায় লাভ হবে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরেও না, তাকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতীকার মেয়ের বাপের

হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। * * কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কোন দল বেঁধে হয় না। একাকীই দাঁড়াতে হয়।.....মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে অপরে পারে না।”

তোমার জন্মের শতবর্ষ পরেও সবে মাত্র পণ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। হে দরদী সাহিত্যিক তুমি তো জ্ঞান বরের বাণ ও ‘মেয়ের বাপ’ যতদিন না তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী পালটাচ্ছেন ততদিন এই আইনে পণপ্রথা বন্ধ গ্রহণন হইবে দাঁড়াবে।

তোমাকে একটা কথা জানাই, এখন নগদ টাকার বদলে জিনিষের যে ফিরিস্তি দেওয়া হয় তা দেখলে বা শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। অথচ আমরা মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা প্রতিবাদে ট্রাক ভর্তি জিনিষ নিয়ে সর্বস্বান্ত বাপ ভাইকে ঋণগ্রস্ত করে চলে আসি। আমরা সবাই আবার বিশ্বনারীবর্ষে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্তু চতুর্দিকে সভা-সমিতি সমাবেশ করে চলেছি। বলতে পার শরৎচন্দ্র—কবে আমরা এধরনের টেঁচামেঁচি বন্ধ করে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারব ও নিজেদের মর্যাদা প্রমাণ করতে পারব? যে দিন আমাদের সমাজ থেকে এই ধরনের ঘৃণ্য ব্যবস্থান্তলো দূর হয়ে যাবে সেই দিনই হবে তোমার প্রকৃত জন্মদিন।

সাঁ ও তালি কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

যাবো না নাচতে যাবো না হোথায় ওদের ইদের মেলায়
নাচবো না পরজাতির ইদতলায়
নাচবো না পরজাতির ইদতলায়,
নাচবো গো দত্ত নাচবো করম আমাদেরই এই শালের ছায়ায়
নাচবো আমরা শুধু আমাদেরই গাঁ-য়
নাচবো সবাই এই আমাদেরই গাঁ-য়...

২

উচু পাহাড়ের তলায় তলায় মরা ঝড়টাকে টেনে নিয়ে যায় মেয়েরা,
ছুরির শব্দ ঝলসে উঠছে ঠিড়িং ঠিড়িং....
পাহাড়ের ঢালে একপাল ছেলে কুপিয়ে কাটছে আপাছা,
টাঙির আওয়াজ উঠছে পড়ছে ঠাড়াং ঠাড়াং....

৩

অযোধ্যা পাহাড়ে

কৈদ পাছে সার দিয়ে চড়ছে হুম্মানের পাল।
খুব দেখি লাক দিয়ে চড়ছিল এই ডাল ওই ডাল।
জানিস, চড়ন্দারকে ও ডাল ছিলায় টেনে ছুঁড়তে পারে ?

৪

সড়ক-সড়ক-চলেছিলুম, সড়কের উপরে
জামীরলেবুর গাছ।
চিকচিকে ছই ছেলে উঠেছে পাছে, ছই সরেনদের মেয়ে
তলায়-তলায় : ক-টা লেবু দে ভাই আমাদেরও।

সাঁওতালি কবিতা

৫

আমার সঙ্গে ভাব পাঁতাতে চাপ ?
তুমি যে ভাই কেতাব-পড়া লোক—
থেকে থেকে চুল ফেরাও দেখি,
মুঠোয় চাপা রুমাল ।
বলো তোমায় ক্যামনে মানি
আমার সাঙাত ?

৬

ওহে তোমরা থাকো কেমন-খারা ?
আমরা থাকি—ভেরেগুার থাম,
বুনো ডালপালার আড়া ।
ঝোড়ো বাদল ঢোকে বলক বলক—
কী হিম ! ঝমে গেলাম ।

৭

ভোরা ছুই বোন ভারি হিংসুক
বশ করেছিল আমার মানুষটাকে ।
ওপর-টোলার কামার, যে হও, নিচের টোলার স্রাকরা, আমায়
শিকলি গড়িয়ে দাও বাপু বাঁধি উলুঝুগুক মানুষটাকে ।

৮

লক্ষ্মীমন্ত শামলা গাঁয়ের ছেলে
সবে-ফুটে-ওঠা কুড়চি কুলের স্ত্রী ।
ঘরের পুরুষ ঘর থাকো, মন আমার
গাঁয়ের ছেলেকে দিয়েছি গো দিয়েছি ।

৯

ওলো সই যাস বোরো গাঁয়ে যাস
কত পাস পাতা-পরবের ভারি মেলায় ?
কথাটুকু দিয়ে সিকিটুকু পাস ?
হাসিটুকু দিয়ে টাকা ?
নাকি নাই খুলে সিকি নিলি তুলে,
উরু তুলে পেলি টাকা !

১০

অতটুকুন মেয়েটা পো, পাঠিয়ে দিচ্ছে স্বপ্নের ঘরে
আকাশপোড়া আগুন ল-ল করে ।
চিঁড়ের ভার ভার, মুড়ি হালকা চলো চলো,
চলো জামাই কাঁধেই নিয়ে চলো ।

১১

মাপো আমার চাঁদ, বাবা আমার সুরজ,
দাদারা সব তারার পারা পুরুষ ।
জনম আমার সুরজপড় গ্রাম,
সুরজমনি আমি—আমার নাম ।

১২

মাদার পাহাড়ে বাজছে দোতারা
রাওশি বাজারে বাজছে বাঁশি
গোবর কুড়োচ্ছি, আমার কানে কানে সুর
ওগো মন মানে না যে, খালি
মনে পড়ে—সব মনে পড়ে—বুকে পাষাণের ভার

১৩

শাকপাতা বন হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়,
 আগুণটা হাতে করে উঠলুম পাহাড়ের মাথায়,
 কুরশা ফুলের মতন কালাপারা
 ছেলেটা বাসুলে একই পাড়ার—
 একটু কথা কইতে মরি,
 দাদা দাঁড়িয়ে ঠায় ।

১৪

ছিলাম ছ-জন সাঙাত একতর,
 ছিলাম সাধের সাথী চৌপহর....
 ছিঁড়লে মায়াটুকুন এখন একলা হয়ে ঘুরি,
 বরা পাতা যেমন হাওয়ায় ঘোরে....

১৫

সাত ভাইয়ে মিলে খুঁড়লো দিঘি—
 পাক—শুধু পাক—কাদায় ডহর—
 একলা বোনটি দেবতাকে দি,
 তোড়ে ওঠে জল রূপোর লহর ।

[শুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনুবাদ]

সাধনা

বিউটি

ক্রীম



তাঁর মনোহারিনী মৌন্দর্য!



প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনমূলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

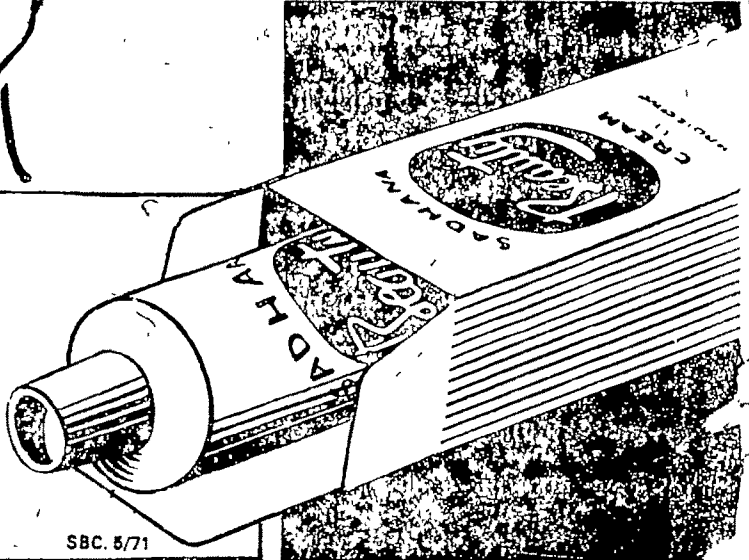
একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গুরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮



শাখা ভারতের সর্বত্র



SBC. 5/71

আইন ও সমাজ সংস্কার

কালীচরণ ঘোষ

সকল প্রাচীন সমাজে নানা প্রকার কুপ্রথার চলন ছিল, কোন সমাজে বেশী, কোথায় বা কিছু কম। জ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সেগুলি হ্রাস পায়। এসকল প্রথার যে-দিকটা খুব প্রয়োজনীয় বা প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত যুক্ত সেই দিকটাই সমাজ বংশোদ্ভূত মেনে নিয়ে চলে। ঐ সকল মতের সমর্থনে প্রভাবশালী সমাজপতি বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দল সাধারণত লোককে গুডলিকার মত চালিয়ে নিয়ে যায়। যদি কোনও (ছুঃ) সাহসী লোক প্রতিবাদ জ্ঞাপন বা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, রক্ষণশীল দল পুরাতন সংস্কারের পরিবর্তন চেষ্টা করাকে অধমাতেরণ বলে উল্লেখ করেন এবং প্রতিবাদী লোকটিকে বিহস্মী আখ্যায় সমাজচ্যুত করেন। এ কথা স্মরণে রাখা ভাল, এই সংস্কার-কামীরাই সমাজের প্রকৃত শুভামুখ্যায়ী এবং উত্তর কালের নমস্ত্র ব্যক্তি। কখনও বা “অবতার” বলে পরিচয় লাভ করে থাকেন। এ অবস্থা দূর ভবিষ্যতের কাঁহিনী; জীবিত কালে নির্ধাতনই তাঁদের কষ্টহার।

কুপ্রথার হাত হতে ভারতের হিন্দুসমাজ মুক্ত ছিল না। এমন কি বিংশশতাব্দীর সপ্তমদশকেও সম্পূর্ণ মুক্ত বলা যায় না। যেগুলি অত্যন্ত কটু, কুৎসিত, বেদনাদায়ক, সে শ্রেণীর প্রথা ছিল অনেকগুলি যে কারণে হিন্দুধর্মের নিন্দুকরা সমাজকে আক্রমণ করতে ঐ সকল প্রথাকে তুণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ সংস্কারে রাষ্ট্রগত আইনকে প্রগতিশীল জনমত বলা চলে। উৎপাত আছে অনেককাল, মাঝে মাঝে কেহবা সে সকলের সংস্কারের চেষ্টা করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নিজ মত অপরকে গ্রহণ করানো ছঃসাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ ছঃসংখ্যক সাধারণ লোক মাতব্বর, মোড়ী, দলপতি চালত হয়ে যে কোনও সংস্কারের কিকতা করে থাকে।

হিন্দু সমাজে সামাজিক কু-প্রথার তালিকা খুব বড়। নিখুঁতভাবে সকলগুলির নাম সংগ্রহ করা কঠিন। তা ছাড়া এখনও যা বর্তমান তার পিছনে সমর্থকের দল খুব বড় বলে মনে করা যায়! আরও পরিকার ভাবে বললে যে অবস্থা দাঁড়ায়, সেটা

হচ্ছে আইন পাশ হয়ে গেলেও বছর সমর্থনে সে প্রথা সমাজের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আইন পাশ হয়ে গেলেই সকলে যে পরিবর্তিত প্রথায় সমাজ-জীবন যাপন করেন, তা নয়। যারা পুরাতন প্রথার বিলোপ বা সংস্কার সাধন করতে চায়, তাদের অনুবিধা বহুলাংশে দূর হয়ে থাকে ও অন্ততঃ রাজ-শক্তি যে তাঁদের পক্ষে সেটা সকল লোকের মধ্যে প্রচারিত হলে যারা কোনও পক্ষেরই নহেন প্রয়োজন হলে সংস্কারক দলের সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে হাত মেলাতে পারেন। এ সুযোগ বা সাহস না পেলে চিরকালই অনুবিধার মধ্যে কাল যাপন করতে বাধ্য হন।

সামাজিক বা কৌলিক আচার অনুষ্ঠান অনেক আছে যেগুলি কালক্রমে অর্থহীন অত্যাচার বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বা নিজ সমাজগত লোকের সমর্থন থাকায় সেগুলির প্রচলন থেকে যায়। এ সকল প্রথা কারও ক্ষতি করে না এবং সর্বসাধারণের ওপর বাধ্যতামূলক নয়, সে কারণে ঐ সকল আচার নিয়ে কারও বিশেষ চিন্তার কারণ থাকে না।

যে সকল প্রথা মানুষের জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাসবশত শারীরিক ক্লেশ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত, সেই সকল প্রথার উচ্ছেদ বা সংস্কার সাধন করতে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য, প্রতিটি আইন পাশ করার নামে রক্ষণশীল গোঁড়ার দল দারুণ প্রতিবাদ করেছে, বিপক্ষতা করতেও

পর্যাপ্ত হয়নি। অবশ্য বর্জ্যীয় কু-প্রথার সংখ্যা অপর সকল ধর্মমত অপেক্ষা হিন্দু সমাজে অনেক বেশী। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ইংরেজ আমলে আইন দ্বারা যে সকল ঘোর আপত্তিজনক প্রথা বন্ধ করতে হয়েছে, তার প্রত্যেকটাই হিন্দু সমাজ আবহমানকাল মেনে নিয়ে এসেছে।

১. শিশু-হত্যা

হিন্দু সমাজের প্রকাণ্ড একাংশের আপত্তি থাকলেও কার্যকর বাধা না পাওয়ায় যে সকল কুপ্রথা চলে আসছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক নিষ্ঠুর আচার ছিল যেখানে মাতা স্বয়ং বা নিকট আত্মীয় বর্জ্য সাগর সঙ্গমে অথবা গঙ্গা-তীরে নিদ্রিষ্ট কোনও স্থানে জলে সন্তান উৎসর্গ করতেন। আজ যে ঘটনা চিন্তা করতে হৃদকম্প উপস্থিত হয় সে ব্যাপার কত কাল যে চলে এসেছে সেটা নির্ণয় করা বর্জ্যমানে সম্ভব নয়।

শিশু সন্তান জলে ফেলে দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা তখনই মনে আসে যখন “ভক্ত” ইহ লৌকিক বা পারলৌকিক আরও লাভজনক ফলের আশা করে; তন্মধ্যে ভবিষ্যৎ, আপদ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার সম্ভাবনা এই লাভের অন্তর্গত। যতদূর শোনা যায় বহু সাগর স্নান সমাপনান্তে দেবতার কাছে “মানত” করতেন যে, দেব বা দেবীর কৃপায় তাঁর সন্তান লাভ হলে প্রথম সন্তান সাগর জলে উৎসর্গ করবেন। অপরপক্ষে দেবতার লাভ পরবশ হয়ে বা বিপদে ফেলেও ভক্তদের অবিচলিত

নিষ্ঠা পরীক্ষা করতে ক্রটি করতেন না। তার ওপর ভক্ত বাজা পূর্ণ করবার জন্য তাঁরা হাজার কুমীররূপে আবির্ভূত হয়ে অর্ঘ্য গ্রহণ করতেন।

এ ঘটনা সদাসর্বদা দেখা যেতনা, কিন্তু এ বিধির এত প্রচলন ছিল যে নির্দিষ্ট স্থলে, সাগর সঙ্গমে, গঙ্গাতীর বাঁশবেড়িয়া, চান্দলা (?) প্রভৃতি নানা স্থানে মাস তিথি হিসাব করে, বিশেষতঃ নভেম্বর ও জানুয়ারীর পূর্ণিমায়, হাজার, কুমীরের মুখে শিশু বিসর্জন দেওয়া হ'ত এবং নরভুক্ত জলজন্তুরা চির-চরিত অভ্যাস মত সেই সকল পুণ্য তীর্থে এসে সময় মত হাজির হ'ত।

ব্যাপার এতদূর গড়িয়ে গেল যে একদল সংস্কারক এই নিদারুণ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক-দের শরণাপন্ন হলেন। ইংরেজ তখনও ভারতের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করতে বিধা বোধ করতো। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের নির্ভরতা ও সংস্কারক-দের নির্বিক্রান্তি নাথো ইংরেজ সরকার আইন বিধিবদ্ধ করা মনস্থ ক'রল। ১৮০২ সালে আগস্ট ২০শে, অর্থাৎ আজ থেকে একশ' ত্রিযান্তর বছর আগে রেগুলেশন নং ৬ (Reg. VI of 1802) বিধিবদ্ধ করে ধর্মের নামে শিশু হত্যা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। আইনের মুখবন্ধে (preamble) বলা হয়েছে। লাট দরবারে নানা আবেদন ("representations") এসেছে যে ভারতে বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে অপরাধ মূলক অমানুষিক এক কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যার দোহাই দিয়ে শিশু সন্তানকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয় অথবা হাজার কুমীরের

ভোগের জন্য উৎসর্গ করা হয়। এ কাজের জন্য পঞ্জিকাসম্মত তিথি নির্দিষ্ট আছে। কোথাও বা বৃদ্ধ লোকে এ ভাবে আত্মহত্যা দান করে।

এইখানে একটা বিষয় উল্লেখ থাকা প্রয়োজন — মুখবন্ধে সেটা বলা সম্ভব হয় নি। বৃদ্ধ লোকদের ইচ্ছায় (কখনও বা অনিচ্ছায়) দেহত্যাগ করবার জন্য গঙ্গাতীরে স্থানান্তর করা হ'ত, চলতি বথায় "গঙ্গাযাত্রা"। সাধারণতঃ অনাচ্ছাদিত স্থানে বিশেষ করে শীত ও বর্ষায় বাস করার ক্রেশ লাঘব করবার জন্য পালক বাঁশবাঁ বর্ত্তারা অজ্ঞান (হয়ত বা কিছু সম্বন্ধন অবস্থায়) মুমূর্ষুকে ঠেলে জলে ফেলে দিত। এখানে সম্ভবতঃ সেই অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পুনরায় আইনের কথায় আসা যাক। উল্লেখ করা হচ্ছে, এ সকল স্থলে বিসর্জিত শিশুকে পুনরুদ্ধারের সংবাদ পাওয়া যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দারুণ নির্ভরতার সঙ্গে প্রক্রিয়া পালিত হত ("but the sacrifices, on the contrary, been completely effected with circumstances of peculiar atrocity in some instances") এখানে আরও বলা হয়েছে এই নির্ভর প্রথা হিন্দু বা মুসলমান সরকারের অনুমোদন লাভের সংবাদ পাওয়া যায় না ("nor was at any time authorised by the Hindu or Mahomedan Governments of India") অতএব যারা এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকবে তারা সকলেই দণ্ডী।

এই আইনটি ১৮০২ সালে প্রবর্তিত হলেও শিশু বিশেষতঃ স্ত্রী-শিশু হত্যা একেবারে বন্ধ হয় নি। স্থানে স্থানে অসুষ্ঠিত হবার সংবাদ পাওয়া যেতে থাকে। আবার নতুন করে ১৮ই মার্চ ১৮৭০ সালে (Act VIII of 1870) শিশু বিশেষতঃ স্ত্রী শিশু ("Female infants") হত্যা বন্ধ করার আইন পাশ করা হয়। যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে গর্ভগমেট বিশ্বাস করে ভারতের নানা স্থানে ধর্মের নামে বালিকা শিশু হত্যার প্রথা পালিত হয় ("The murder of female infants is believed to be committed in certain parts of British India.") এতএব তদুপ স্থানে ইস্তাহার (notification) সাহায্যে এ প্রথা অবিলম্বে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ধর্মের নামে, স্থানীয় লোকাচার হিসাবে প্রকাশ্য শিশু হত্যা বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। এমন কি গর্ভস্থ জ্ঞান, (সে যে কোনও মাসের হ'ক) হত্যা করা সকল দেশেই গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হত। বর্তমান কালে জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রায় সফল-সভ্য" রাষ্ট্র অ-জ্ঞাত শিশু, (জ্ঞান) উপযুক্ত শিক্ষিত ধাত্রীবিশারদের সাহায্যে বিনাশ করা শাস্ত্র বা আইন সম্মত করা হয়েছে। আরও কি পরিবর্তন হতে পারে ভবিষ্যৎ কালের লোক জ্ঞানলাভ করে বিচার বিশ্লেষণ করবেন।

২. ক্রীতদাস

আদিম মানুষ যখন বস্ত্র জীবন যাপন করত,

প্রকৃতিজাত ফল-পাকড়, মাছ, পশু ধরে মেরে খেয়ে চালিয়ে দিতে পারত। তখন অপর লোকের বিনা সাহায্যেই সহজ জীবন পালন করা সম্ভব ছিল। কালক্রমে সমাজ বেঁধে বাঁস করবার সময় চাষ, পশু পালন, ক্রমে শিল্প ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধানুসারে পরিবারের লোক ছাড়া বাইরের লোকের সাহায্য নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ সর্বদেশে বাঁধা মাইনে, দিন মজুরি বা সর্তানুসারে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। আর বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল মাত্র আহাৰ্য্যের বিনিময়ে, একটা আশ্রয় দিয়ে সব সময়ের জন্ত লোক নিয়োগ করা হয়।

এই শ্রমিকের ওপর কর্তৃপক্ষের পরিসর নিয়ে ক্রীতদাস সংজ্ঞা নির্ণীত হয়। যেখানে পালিত লোকের কোনও স্বাধীনতা থাকে না, পালকের মতের ওপর গতি বিধি, কার্য ধারা নিরূপিত হয়, তখন সে জীব "কেনা-চাকর" ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা গৃহপালিত পশু পর্যায়ে পড়ে। বেশী কাজ আদায় করা বা অত্যন্ত ক্লেশশীল বিশদ সম্মুখ শ্রমে এই "দাস" নিযুক্ত হতে থাকে। মনের মত না হলে অতি নির্ভর অত্যাচার সংসাধিত হয়েছে। এই লোক-গুলির অল্প কোথাও যাওয়ার স্বাধীনতা রুদ্ধ; এরা বাজারে হাটে পণ্যের মত বিক্রীত হয়ে এসেছে।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির নানা দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে এবং আবাদ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠা কার্যে লোক প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর নানা স্থান থেকে লোক ধরে এনে নিজেদের ইচ্ছামত কার্য করতে বাধ্য করে। আমেরিকা স্বাধীন হবার পর নানা ক্ষেত্রে

বিশেষতঃ বড় আবাদ (plantation) এবং শিল্প বাণিজ্য ব্যাপারে কায়িক শ্রমদানপট্ট লোকের আয়োজন হয়ে পড়ে এবং দাস প্রথা দারুণভাবে বিস্তার লাভ করে।

ক্রীতদাসদের ওপর নৃশংস আচরণ হয়েছে প্রায় সর্বদেশে সর্বসময়ে। প্রতিরক্ষা শক্তিহীন অসহায় মানবনামধারী জীব পশুর মতই সব মছ করেছে। ক্রমে দেশে দেশে বিবেক বিবেচনা সম্পন্ন দয়াশীল লোকেরা এই প্রথার প্রতিবাদ করতে থাকে এবং ইংলণ্ডে উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন, ক্রহাম প্রভৃতি মনীষী প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন এবং ১৭৮৭-১৭৯০ সালে পার্লামেন্টে আইন পাশ করাতে চেষ্টা করেন। ১৮০৭ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ইংলণ্ডে দাস প্রথা লোক-মতে বন্ধ হলেও ১৮৩৩ সালে পার্লামেন্টে আইন বিধিবদ্ধ হলে উপনিবেশগুলিতে দাস প্রথা বন্ধ হয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৫) দাস প্রথা নিয়ে মতবিরোধ তীব্র হয়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, আমেরিকার অর্ধেক লোক মুক্ত আর আধখানা “দাস” থাকতে পারেনা। মোটামুটি ১৮৬১ হতেই আমেরিকা দাস প্রথা বর্জন করে।

ভারতে মানুষ কেনাবেচার কথা খুব বড় বরে আলোচনা হয় না, কিন্তু অতি প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথার চলন যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনু স্মৃতিতে পাওয়া যায় যুদ্ধে ধৃত লোকের মধ্যে ইচ্ছা বা পছন্দ মত কাকে কাকেও ক্রীতদাস করা হ’ত। কেহবা স্বেচ্ছায়, ক্রীতদাসীর গর্ভস্রাভ সন্তান, ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার এবং অপরাধের গুরুত্ব বিচারে

শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় ক্রীতদাস প্রোগ্রাম জমলাভ করেছে।

ইংলণ্ড আমেরিকা এবং অপরাপর ইউরোপীয় রাষ্ট্র, যথা ফ্রান্স, পোর্টুগাল প্রভৃতি যখন দাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে, সমকালে, হয়ত বা কিছু আগে থেকেই ভারতবর্ষে দাস প্রথা বর্জনের চেষ্টা চলছে। দাস প্রথার গুরুত্ব না-থাকায় ধীরে ধীরে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। প্রথমে শুরু হল ১৮১১ সালে ১০ সংখ্যক (Reg, X of 1811) রেগুলেশন নিয়ে। তখন বলা হল ভারতের বাইরে থেকে ক্রীতদাস আমদানী করা অপরাধ। এ আইন প্রযুক্ত হ’ল ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলে। সে সঙ্গে চলছে ইংরেজের নতুন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার। দেখা গেল সেখানে নানা রকমে ক্রীত দাস পালন প্রচলিত রয়েছে অতএব মার্চ ৩ তারিখে গৃহীত ১৮৩২ সালের ৩ সংখ্যক রেগুলেশন (Reg III of 1832) বলে নবাবদ্ধিত ভূখণ্ডে ১৮১১ সালের রেগুলেশন বলবৎ করা হল।

এতৎসঙ্গেও দেখা গেল আইন পাশের পূর্বের সর্ভানুযায়ী মালিকরা ক্রীতদাস প্রথা চালু রেখে আদালতের সামনে তাদের দাবী উত্থাপন করে মালিকানা গ্রহণ করতে চায়। কাজ সহজ করার জন্য ১৮৪৩ সালে এপ্রিল ৭ই তারিখে প্রণীত পঞ্চম আইন (Act V of 1843) মতে সমস্ত আদালতকে দাসের মালিকানা সর্বপ্রকারে উপেক্ষা করতে বলা হয়। অর্থাৎ যেন আমল দেওয়া না-হয়।

বাকী যে টুকু ছিল সেটা ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ড বিধি আইন (Indian Penal Code) এসে নিঃশেষ করে দেশকে কলঙ্ক মুক্ত করে।

নরেন গোসাঁই যেদিন রাজসাক্ষী হ'লেন

পুলকেশ দে সরকার

ক্রোড়পত্র

লক্ষ্যণীয় যে, মানিকতলা বোমা মামলার অস্ত্রাশ্র বন্দী, এমন কি নেতৃস্থানীয় বন্দীরাও এই ঘটনা-বলীর, যথাযথ পারম্পর্ষ অবগত ছিলেন না; দীর্ঘ কাবাবাসের পর তাঁরা যখন “আত্মকথা” বা “আত্ম-কাহিনী” লিখেছেন তখনও প্রকৃত তথ্য জানা বা প্রকাশের ক্ষমতা উৎকণ্ঠিত হননি; শ্রুতি ও স্মৃতিতে যেটুকু ছিল তাই নিবিচারে পরিবেশন করেছেন।

ক্ষুরধার লেখনীর “অধিকারে উপেক্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্বাসিতের “আত্মকথায়” লিখেছেন :—

“নানাক্রম গুজবের মধ্য হইতে সার-সঙ্কলন করিয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বুঝিলাম তাহা এই : হাসপাতালে থাকিবার সময় সত্যেনের মনে হয় যে, যখন কারাবাসে ভুগিতেছি তখন ত অল্পদিনের মধ্যে মরিতেই হইবে; বৃথা না মরিয়া নরেনকে মাদ্রিয়া মরিলেই ত বেশ হয়। কানাইলাল সে কথা শুনিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত পিস্তল লইয়া হাসপাতালে আসে। পেটের যন্ত্রণা শুধু ডাক্তারকে ঠকাইবার ভান মাত্র। তাহার পর সত্যেন নরেনকে

বলিয়া পাঠায় যে, জেলের কষ্ট তার তাহার সহ্য হইতেছে না; সেও নরেনের মত সরকারী সাক্ষী হইতে চায়; সুতরাং পুলিশের কাছে কি কি বলিতে হইবে তাহা যদি চুইজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক করে তাহা হইলে আদালতে জেরার সময় কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। সত্যেনের চলনায় ভুলিয়া নরেন তাহাই বিশ্বাস করিল এবং একজন ইউরোপীয় প্রহরী সঙ্গী লইয়া সত্যেনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া তাহার উরু লক্ষ্য করিয়া গুলি করে তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়। পলাইবার সময় একটা গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলির শব্দ শুনিবামাত্র কানাইলাল নীচ হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায় কিন্তু হাতে একটা গুলি থাইয়া সে সেইখানেই চাঁৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে, তখন

সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া একজন গ্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে, নরেন কোথায় পালাইয়াছে তাহা যদি সে না বলিয়া দেয় ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারী দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে, নরেন আপিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে-আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি চালাইতে থাকে।.....গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।”

প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এই কথার কোন মিল নেই।

বারীন্দ্রনাথ ছিলেন মানিকতলা বাগান বাড়ী ষড়যন্ত্র মামলার মূল গায়েন ও সর্বাধিনায়ক। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীর তিনটি অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনিও প্রকৃত তথ্য জানতেন না; তিনিও মূল ঘটনার শোনা-কথাই লিখেছেন :

“বার্লি সাহেবের কোর্টে মোকদ্দমা থাকিতে থাকিতেই আমার খেয়াল ঢোকে যে, জেল ভাঙিয়া বাহির হইতে হইবে।.....

“মাথায় আমার খেয়াল ঢুকিবামাত্র পত্রপাঠ যোগাড়বন্ধে লাগিয়া গেলাম।.....

.....আত্মীয়-স্বজনের সহিত অনেক বন্ধু-বান্ধবও দেখা করিতে আসিত, সেই দেখার অছিলায় একে একে পিস্তল জেলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ব্যারাকে শুইবার জন্ত মাটি ও ইট দিয়ে

উঁচু করিয়া গড়া খাটের মত শান বাঁধানো ছিল, তাহার ইট দুই একটা কৌশলে খসাইয়া আমরা পিস্তল রাখিবার খোপ করিয়া লইলাম। তাহার আগেই ছুটা পিস্তল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময় ছেলেরদের মধ্যে অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতেছিল যে, কি করিয়া নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইকে ইহুধাম হইতে সরানো যায়।.....আমি জানিতাম না যে, ছেলেরদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমরাই আনা পিস্তল দিয়া নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার কন্দী আঁটিয়াছে।.....এটা আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই যে, আমাকে বাদ দিয়া অন্ততঃ আমাকে না জানাইয়া, তাহারা একটা কিছু করিবে।.....

“আমি যাহা ভাবি নাই, ঘটিল তাহাই। এই অসম্ভব দলের কয়েকজন গোপনে পরামর্শ করিয়া সব স্থির করিল। আমাকে জানানো হইল না, কারণ তাহারা ঐব জানিত, আমি জানিলে বাধা দিব, জেলের ভিতর এ কাণ্ড কিছুতেই করিতে দিব না।.....

“মনে আছে, সেদিনকার প্রভাতটি ছিল শ্বেত শত-দলের মত তেমনি শুভ্র, তেমনি প্রসন্ন।..... নিশ্চিন্ত মনে আমি স্নান করিতেছিলাম।.....

“হঠাৎ একটা ছুটাছুটি হট্টগোল পড়িয়া গেল। আমি স্নানের পৈঠার উপর দাঁড়াইয়া দেখিলাম, হাসপাতালের দিকে মানুষ দৌড়াইতেছে..... আমরা সবাই তাড়াতাড়ি ব্যারাকে ঢুকিলাম, গ্রহরী দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথমটা একটা আতঙ্কের হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার,

তারপর খানিকটা সব চূপ। তাহার পর পাগলা ঘন্টি 'Alarm Bell' বাজিয়া উঠিল এবং খাকীপরা বন্দুকধারী পুলিশ কাতারে কাতারে জেল ফটক দিয়া ঢুকিতে লাগিল। এই সময় পূর্বদিকের পূর্ণিমার পাড় হইতে একজন বুড়া কয়েদী ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার স্বরে বলিল, 'বাবুজী গোঁসাঁই ঠাণ্ডা হো গিয়া।' প্রায় দশ পনের মিনিটের পর দেখা গেল সত্যেন্দ্র ও কানাইলালকে ঘিরিয়া পুলিশের দল ফটকের দিকে আসিতেছে। কানাই হাসিতে হাসিতে দৃঢ় পদে চলিতেছে।... ..

ব্যাপারটা বাহ্য হইয়াছিল তাহা শুনিলাম পরে। (বড় অন্ধর আমার)। সত্যেন ও কানাই হাসপাতালে কয়েম হওয়া অবধি নরেনকে বার বার বলিয়া পাঠাইতেছিল যে, তাহারিও রাজার সাক্ষী সাক্ষিতে রাজী আছে। নরেন যদি আসিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তিনজনেই এক বাক্যে একই প্রমাণ দিতে পারে।.....নরেন বিলক্ষণ জানিত তাহার একার কথায় জোর বাধিতেছে না।.....তাই দু'চার দিন ডাক শুনিয়া শুনিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া, একদিন সে হাসপাতালে আসিয়া হাজির হইল। সে তখন যুরোপীয়ান ওয়ার্ডে ছই একজন যুরেশিয়ান কয়েদীর হেফাজতে ছিল। সেদিন সকালে তাহাদেরই একজন নরেনের সঙ্গে হাসপাতালে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র সত্যেন তাহাকে লইয়া যত্ন করিয়া আপনার শয্যায় বসাইল। বাহরের

বারান্দায় কানাই একটি রিভলভার পকেটে পায়চারী করিতেছিল, যদি কোন গতিকে শিকার ফস্কাইয়া পালায়, তাহারই জন্ত পথে এই-খাটি আগলানো। সত্যেনের সহিত কথা হইতে হইতে হঠাৎ কম্পাউণ্ডার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা না অমন কি কাজে কানাইকে ডাকিয়া লইয়া গেল। কানাইও গেল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আসিবে আশায়। এদিকে সত্যেন পকেটে হাত রাখিয়া কথা কহিতে কহিতে, পকেটেই পিস্তল সই করিয়া লইয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। গুলি নরেনের উরুতে লাগিয়া মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। যুরেশিয়ান কয়েদী সত্যেনকে ধরিতে গিয়া পিস্তলের বাঁটের ঘায়ে আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া পিছাইয়া পড়িল। নরেন ছিল কুস্তিগীর, বেশ সাজোয়ান পুরুষ; গুলি খাইয়া সে হাসপাতাল ছাড়িয়া বাহির হইয়া দৌড় দিল।

কানাই হট্টগোল শুনিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিল শিকার পলাইয়াছে। সে হাসপাতাল গেটে আসিয়া পিস্তল উচাইয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'নরেন কোন দিকে গেল?' সে বেচারী প্রাণের দায়ে অঙ্গুলী সংক্ষেতে সে দিকটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর পশ্চাচ্ছাবন। এই সময় জেলার, নায়েব জেলার, বড় জমাদার সদস্যবৎ রোদে আসিতেছিলেন, তাহার রক্তাক্ত-পদে যুক্ত-কচ্ছ অবস্থায় নরেনকে দোড়াইতে দেখিয়া তাহাকে থামাইয়া ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। আতঙ্কে নরেন বিছু বসিতে পারিল না, শুধু পিছনে হস্ত

৩৭১ নরেন গোসাঁই বৈদ্যন রাজসকৌ হলেন

সঙ্কেতে দেখাইরা কোন গতিকে বলিল, 'ঐ আসছে আমার ছেড়ে দাও।' বলিতে বলিতে কানাই-
পিস্তল হস্তে অদূরে দেখা দিল। তখন কোথায়
জেলার, কোথায় গেল বড় জমাদার, যে যদি
পায়িল উত্তরড়ে ছুটিল; বড় জমাদার পড়িয়া পিয়া
বর্জুলের মত গড়াইতে গড়াইতে নর্দমায় পা ঢাকা
দিল। খোলসা পথ পাইয়া কানাই তাড়া করিতে
করিতে নরেনের পিঠ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল,
গুলি শির-দাঁড়া ভেদ করিয়া বুকে বসিয়া
গেল, ফলে নরেন তখনই মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া
পড়িল।.....

“নরেনকে মারিয়া কানাই পলায় নাই। খালি
পিস্তল হাতে হস্তমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। পুলিশ
আসিলে পিস্তল ফেলিয়া দিয়া খেঁচায় ধরা
দিল।”

ভাবলে বিশ্বয় জাগে, উপেক্ষনাথ ও বারীজ

কুমার হু'জনেই নিপুণ লেখক; বাংলা ইরাজী
হু'টিতেই সিক্তহস্ত। দাপাস্তরের পর দাপাস্তর জীবিত
ছিলেন। স্বাপাস্তর নেকে এসে - - - - -
তাদের প্রতিশ্রুতিতে যাচাই করবার - - - - -
তথ্যের সন্ধানী হ'লেন না। সরকার মহাশয়ের খানা
নাগালের গাইরে থাকলেও সেফালের বহু অমূল্য
বাক্যের পত্রিকা প্রভৃতি বহু পত্র পরিচয় ছিল।
স্বাধীনতার পরও তাঁরা জীবিত ছিলেন। তখন
চেষ্টি করলে তারা মহাশয়ের খানারও নাগাল পেতেন।
হু'জনেই 'বিজলী' 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি কাগজের
কর্ণধারস্বরূপ ছিলেন এবং শেষ বয়সে দৈনিক
বহুমতীরও সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু একবারও
তাদের “গল্প”কে ইতিহাসের তথ্যে পারণ্ডক
করলেন না।

সমাপ্ত

সাগর

ভারতী

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

ন্যূরেমবার্গের প্রান্ত দেশে এক মনোরম কাক্ষেতে
ছোটো স্বপ্ন দেখেছিলুম। একটা ১৯৭১ এর
জানুয়ারীতে জার্মান-বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘ যেটা আজ
মহীকুহে পরিণত; অতীত তার দশ বছর আগে
১৯৬১ তে সাগর-ভারতীর স্বপ্ন যেটার স্মৃতিকা গৃহেই
মৃত্যু হয়েছে।

'৬১র স্বপ্নটার নীল নজ্রা তৈরীর পেছনে ছিল
সর্বভারতীয় মন; শিখ, মারাঠা, রাজপুত ও তটে
বাঙালী। ন্যূরেমবার্গের অরণ্য প্রান্তের নির্জন
কাক্ষেতে আমরা মাত্র ছজন খন্দের। আমি ছাড়া
বাকী সবকজন এক একটা বিশ্বকর্মা। কেউ
হাইড্রলিক্স-এ, কেউ রসায়নে, কেউ বিজ্ঞান শিল্পে,
কেউ চিকিৎসায়। সিদ্ধান্ত হল যে এমন এক
বিজ্ঞানজন স্থাপন করা হবে যার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে
মাস্‌ল, মিউজিক, সায়েন্স ও কনসেন্স। মাঠের
মাইনে হবে ডাল আর রুটী, ধরতে পারলে মাছ।
স্থান নির্বাচিত হল ২৪ পরগণার দক্ষিণ পূর্ব কোণে
ফ্রেড্রিক্‌গঞ্জ দ্বীপ। হাওয়া কল চালিয়ে বিজ্ঞান
উৎসর্গ করা হবে; তা হেভী ডিউটী কৌশল
ব্যাটারীতে জমিয়ে সারা বছর ব্যবহৃত হবে। সমুদ্র
তীরে হাওয়ার বাটতি নেই, সারা বছর বিজ্ঞান

সরবরাহ বাঁধা। ছাত্ররা হবে সর্বশাস্ত্র পারদর্শী—
ষাট বৈঠার ছিপ থেকে গ্লাইডার অবধি।

ক্যাকড়া বাঁধল জমি কেনা নিয়ে। আমি
অজানা শক্তির ঘুঁষি খেয়ে বলে ফেলুম, “আমার
সুপার অ্যানুয়েশনের টাকারটা দিয়ে দ্বীপ কেনা
হবে।” ঠিক হল যে প্রাতি দুমাস অন্তর আমরা
ছজন ন্যূরেমবার্গে: সেই কাক্ষেতে মিলিত হব।
সবাট ডায়েরীতে পরের মিটিং এর তারিখটা লিখে
রাখলে। তারপর ট্রেন ধরে কেউ বা লিনে
মিউনিখে, কেউ হামবুর্গে, কেউ বা কোলোনে গেল;
আমি লগুনে ফিরলুম। আমার চোখে সাগর-
ভারতীর স্বপ্ন; তার খসিস লিখলুম—(যেটা পরে
চাকার বাংলার বাণীতে প্রকাশিত হয়)। ইঙ্কল ও
হোস্টেলের মডেল রচনা করলুম, ফ্রেড্রিক্‌গঞ্জ
দ্বীপের ম্যাপটার নজ্রা ফটো কপি করে পাঠালুম।
পশ্চিম বাংলার রেভিনিউ মন্ত্রীর কাছে। অমুরোধ,
সাগর ভারতীর সঙ্গে দ্বীপটা কিনতে চাই, কাঁচা
স্টালিং দোবো। চিঠির পর চিঠি, উত্তর নেই।
কাজের প্রগতির (একত্রে তার অন্তাবটায়) কথা
সহযোগীদের লিখলুম। তারা শেষ অবধি বলে,
“সাগর-ভারতী বিশ্বস্ত সাগরে ভাসিয়ে দাও।”

মডেলটা এখনও ঘরের কোণে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দেখি আর ভাবি, “আমি কী আদার ব্যাপারী!” রাইটাস বিল্ডিং এর তিন তলায় বসে আই. সি. এস. অথবা আই. এ. এস. রা আমার চিঠি পড়ে হতবলানলি করেছেন, “বিদেশে গিয়ে লোকটার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তা নয়ত সারা জীবনের সঞ্চয় খরচ করে সাগর-ভারতী গড়তে চায়।” আমার ধারণা ছিল সায়েন্স কলেজ ও যাদবপুর ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও দানে গড়ে উঠেছে। মনকে এই বলে শাস্ত্র না দিলুম যে আই.এ. এস.রাই ভারতীয় মনীষার বিকাশের শেষ কথা নয়, হলে রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, দেশবন্ধু ও সুভাষ সবাই এঁ লাইনে জীবন কাটাতেন।

সম্প্রতি বিলেতে আইনজারী হয়েছে যে ভারতীয় ডাক্তারদের ইংরাজী ভাষায় পাশ করতে হবে, না হলে বিলেতে ডাক্তারী করা নিষিদ্ধ। আগামী-কালে এ আইনটা ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকদের ওপর প্রযোজ্য হবে বলে আশঙ্কা করা যায়। নিত্য কাগজে দেখি দেশে ছাত্রদের উশৃঙ্খলতা, অভদ্রতা ও পাইপ পানের কাহিনী। ইংরেজরা ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। প্রতি মাসে তারা—ভারতীয় ছাত্র “আন্দোলনের” চলচিত্র # রূপ বাণীতে দেখে। আপে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট বলে পাশ্চাত্যেয় মানুষ সম্মান করত। এখন ওরা জনাতিকে বলে, “He has used his pipe gun well!”

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর দায়িত্ব ভারত

বোঝে না। বিবেকানন্দ শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “ধরশ্চন্দন ভারবাহী ভারস্র বেস্তা, ন তু চন্দনস্র।” (চন্দন কাষ্ঠবাহী-পাখা বোঝার ভারটাই বোঝে, চন্দন কাষ্ঠের কদর বোঝে না)। শিক্ষা যে সম্ভাভা বিস্তার,—এটা আমরা ভুলে গেছি। অনেক উগ্রপন্থী বলবেন যে “মানুষ খেতে পায়না, তার আবার সম্ভাভা।” তাদের জ্বন্তাই বলি যে খুন করলে, পাইপ পান ব্যবহার করলে যদি মানুষ খেতে পেত, তাহলে ভারতে আক্র—ভাত কাপড়ের বজ্রা বইছে। আসল কথা আমরা—আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। উদোভক্তি ও ফুৎফুৎ-বাণীই আমরা পাঠেয় করেছি। ফলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশে অবাস্তর, বিদেশে হান্তস্পদ। “স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে” এটা ভারতীয় বিদ্যার্থীদের ওপর প্রযোজ্য নয়।

এই বিশ্বজনীন কলঙ্কের পঙ্ক থেকে ভারতীয় বিদ্যার্থীদের কি ভাবে উদ্ধার করা যায়? এরাই—ভারতের ভবিষ্যৎ। আর পঁচিশ বছর পরে আসবে এক নতুন শতাব্দী : আমরা তখন “ভদ্রাস্ত্র শরীরম্”। আমরা যা ভাবীকালের জন্তে রেখে যেতে পারি—সেটা হল ভারত-চিন্তা। সংস্কৃতি দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারে না। পারে শক্তি, পারে সমর শক্তি। বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে বলেন, “Be strong, you are better off with a football under your arm than Gita।” এটা আমরা পড়িনি,

পড়লেও বুঝিনি। আজ শত্রুপরিবৃত্ত হয়ে ভাবছি,
“অতঃ কিম্।”

৭০২ খৃষ্টাব্দে ক্রাঙ্ক যদি যুট অভিযান পরাজিত না করত তাহলে ফারাসী সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা চাক্ষুশ্য বল কিছু থাকত না। রুশিয়া যদি মোঙ্গোল অভিযান না থামাত তাহলে আজ টলষ্টয় থেকে সোলঝেনিৎসেন অবধি কারও নাম পৃথিবী স্তনত না। ১৫৮০তে তুর্কী সমাপতি কারামোস্তাফা ভিয়েনার সিংহদ্বারে পরাজিত না হলে ভিয়েনা কখনও সাহিত্য ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হত না। ১৫২৮এ কাথলিক স্পেনের আর্মাডার হাতে ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী পরাজিত হলে শেক্সপীয়ার থেকে বার্নার্ড শ অবধি যতক মনোবীর জন্ম হত না। ভারতের আশপাশে চোখ দিয়ে দেখুন, চতুর্দিকে আজ কারামোস্তাফা ও মোঙ্গোল বাহিনী ঔৎপেতে বসে আছে। দু দিন পূরে এরা একত্র ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পাইপ গানের ডিগ্রী দিয়ে এদের ঠাকানো যাবে না। যদি যায় তাহলে সীজোয়া সংস্কৃতিই ঠাকাতে পারবে। An armed culture. এই ছিল আমাদের স্বপ্নের দেখা সাগর-ভারতীর মূলমন্ত্র। যে শক্তি ও প্রকৌশলের অভাবে ভারত বারবার বিদেশীর কাছে পরাজিত হয়েছে সেটা যেন আর না ঘটে এই ছিল সাগর ভারতীর রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

ভারতীয় তরুণদের—সম্রাট সুভাষ স্বপ্ন দেখতেন

এমন এক সুবক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে যারা হবে শিক্ষা দীপ্ত এবং তাদের শরীর হবে ইল্পাতে পেটা। এখন দেশে সুবক আছে, গ্র্যাজুয়েট আছে, ইল্পাতে পেটা শরীর আছে কিন্তু এই তিনের সমন্বয় নেই। এ যেন হাত, মাথা ও শরীর ভিন্ন ভিন্ন মোর্চায় যুক্ত করতে বেরিয়েছে। যে ভারত চিন্তা এই তিনের সমন্বয় ঘটাতে পারে সেটার সমূহ অভাব। এই অভাব পূরণের জন্তেই সাগর-ভারতী পস্তনের কথা তুলেছিলাম। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সফল হোক; সাগর-ভারতীতে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, দেশবন্ধু, সূর্যসেন ও সুভাষের স্বপ্ন মূর্তি হোক। এটা এমন কিছু গর্হিত বাসনা নয়। ২৮ বছর বয়সে দক্ষিণ উত্তরের বক্ষা দৌরাড্য দেখলাম। এর মোট যোগফল শূন্য। ভারত যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। দেশের জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে শত্রুর গদধ্বনি, আর আমরা মহা উল্লাসে পার্টি লাইন রক্ষা করছি। মূর্তি পূজার স্থান গ্রহণ করেছে পার্টি-শ্রেণী পূজা। এই ভূত ছাড়ামোর জন্তে দরকার নতুন সর্বমুখী, প্রকৌশল ও সমর ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। যেহেতু আই. সি. এস্ বা সরকার তৈরী নয় সেই হেতু ভারতীয় কর্মযোগ ও চিন্তার বর্ণা কলক বাঙালী হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। বাঙালী কোনওদিন কারও সার্টিফিকেট নিয়ে ডাবেনি বা রাজনীতি করেনি।

কবিতাগুচ্ছ : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটি মাছের জন্তে

মাছেরা ভেসে বেড়ায় অলে

তাদের টোপ দেওয়া হয়

তা বলে তারা কি টোপ গিলবেই

পাড়ে কি সুন্দর ফুগগুলি, সারাদিন ওড়ে প্রজাপতি

ওদিকে জলের গোলে সূর্য এসে রামধনু ছড়ায়

তার মধ্যে ফাৎনার খিরখির

মাছরাঙার লেজের মত জল কাঁপছে

নিবিড় ভালবাসার নিশ্চিন্ত শিখার মত

একটি কিংবা দুটি টোপ

সে কি ঐ একটি মাছ গিলবেই, গিলতে হবেই...

সেই মাছই টোপ গেলে যে কিছুই ভাবে না।

শুধুই ছরগ

মুহুর্তে সিদ্ধান্ত নেয়

একবার এই টোপ আর একবার ঐ টোপ

অকস্মাৎ বেঁধে যা গলায়। ২৫. ১০. ৭৫

পায়ের উপর পা

আমাকে ড্রাইভিং শেখাবেন

উরুর উপর উরু পায়ের উপর পা

আমি কমলপুস্তকের এক পোলাগী বালিকা

আমাকে ড্রাইভিং শেখাবেন

গ্রাম ছেড়ে ছোট্ট টাউন তারপর দিশাহারা এই সহরের এক প্রান্তে আমি...

প্রিন্সিপ ঘাটের ঐ খোলা রাস্তায় চাপুন অ্যাক্সিগারেটর

আমি-উড়ে যেতে চাই দূরে আরো দূরে নদনদী সমুদ্র পেরিয়ে

দেখুন আমার পা স্বল্প স্বামাবলী

আপনার পা স্থানি জানে, জানে নাকি সোনালী সীতার

ভবনে হইমং পূলে

নেমে যাব সুইমিং কন্স্টামে উঠে যেতে অনেক উচুতে
 একবুক সাঁতার দিলেই সহজে পেরিয়ে যাব আটলান্টিক,
 প্রশান্ত সাগর

আমাকে ড্রাইভিং শেখান
 কাঁধ কিংবা কোমরে আলগোছে হাতের উস্তাপ
 বস্ত্র জঙ্ঘ উরুর তলায় আমাকে ভীষণভাবে উন্মোচিত করে
 উরুর উপর উরু, পায়ের উপর পা
 আমি কমলপুরের এক গোলাপী বালিকা
 আমাকে ড্রাইভিং শেখাবেন
 আমি উঠতে চাই একধাপ দু'ধাপ তিন ধাপ

নদনদী সমুদ্র পেরিয়ে। ২২, ১০, ১৯৭৫

আমাকে ছুলিয়ে দিন

কেরির বাগান এত নির্জন কে জানতো
 ঐ দোলনায় আমাকে ছুলিয়ে দিন
 উড়ে যাক ঝাঁক ঝাঁক হলদে প্রজাপতি
 হটিকালচার বাগানের ছপুসবেলায়
 জলের ভেতর আমি পা ডুবিয়ে বসে
 অথবা বোকার উপরে
 প্রথমে মুখের ছবি সাটারেট ক্লিক করে ওঠে
 তারপর বুকে, বুকের তলের ছবি
 আরো নাচে আমার পেটের খাঁজ
 শেষকালে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র আমার ছবি

আমাদের হৃদয়ের মুখে মুখ ছবি

সারা সহরের প্রতিটি ঘরের গায়ে প্রতিটি দেয়ালে
 আমার বিবস্ত্র ছবি এ-সহরে আপ্তন ধরাবে
 ছালাবে প্রতিটি ঘর প্রতিটি সংসার
 আমাকে ছুলিয়ে দিন জোরে আরো জোরে
 পৃথিবীর আকর্ষণ গতির চেয়েও দ্রুততর তালে
 আমি হবো নতুন পৃথিবী। ২২, ১০, ১৯৭৫

বর্তমান প্রসঙ্গ

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ছিয়াত্তরতম জন্মদিবস

২রা অক্টোবর ১৯৭৫, শিবনাথ শাস্ত্রী হলে (দক্ষিণ কলিকাতা সিটি কলেজ) 'জয়ন্তী' মাসিক পত্রিকার উদ্বোধনে জয়ন্তীর প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ৭৬ তম জন্মদিবস পালিত হয়। অমুঠানে সভাপতিত্ব করেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অনিলচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীমতী পান্না বসুরায়ের উদ্বোধন সভাপতির পর ডাঃ অজিত রায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, শ্রীমতী থেকেই সেবাব্রত গ্রহণ করেছি। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখে কান্না পায়, স্বাধীনতার ২৮ বছর পরও আজ এই অবস্থা! কাদের জন্তু লড়াই করেছে— কোথায় গেল আমাদের স্বপ্ন লীলাদির স্মৃতি মনে পড়লে একটা অক্ষমতার ভাব জাগে মনে। ডাঃ রায় বিপ্লবী দেশনেত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আলাপ কিছু কিছু উল্লেখ করেন এবং তাঁর চিকিৎসা জীবনের শুরুতে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ও বিপ্লবী অনিল রায়ের পথনির্দেশের কথা উল্লেখ করেন।

— শ্রীমতী হেলেনা দত্ত বলেন : এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। দিদির আদর্শ, জাগ, আমাদের প্রভুত্ব করতে সাহায্য করবে। তাঁর

ছিল অপূর্ব সংগঠন শক্তি। দিদি মানুষকে ভাল-বাসতেন। মানুষকে ভাল না বাসলে সমাজ সেবা করা যায় না। দিদির রান্নাঘরে খেলার মাঠে, গানের আসরেও দেখেছি। আর্টের সেবায় দিদি ছিলেন নিয়োজিত, তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামে পূর্ণ। কোনওদিন বিশ্রাম নেননি। কর্মহীন ছিল তাঁর পূজা।

ডাঃ অমলেন্দু বসু বলেন : একটা সকালের মিটিংয়ে সব কথা বলা যায় না। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে তাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তখনকার দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র মহিলা ছাত্রী ছিলেন লীলা নাগ। সুদীর্ঘ করিডোরে তিনি যখন যেতেন তখন তাঁকে দেখা যেত স্ত্রী, সম্ম-পূর্ণ। গভীর ব্যক্তিত্বময়ী। এটা ছিল তাঁর স্বভাবজ। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অংশ নারীর স্বাধীনতা সংগ্রাম। লীলা নাগের একক প্রচেষ্টায় তখন এই সংগ্রাম শুরু। সমগ্র পূর্ব ভারতে নারী আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন লীলা রায়। তাঁর প্রভাব আমাদের ইতিহাসে অতি উজ্জ্বল।

জয়ন্তী পত্রিকার মধ্যদিয়ে তিনি একটা সাহিত্য স্বাধীনতা বা সাহিত্যিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতা চিন্তার ব্যাপকতা ছিল লীলা রায়ের মধ্যে। জয়ন্তী পত্রিকার মধ্য দিয়ে সুস্থ সাহিত্য চিন্তাবোধ জন্মিয়ে ছিলেন। জয়ন্তীর মধ্যে আছে শৈকিল

সৌন্দর্য তাঁর কথা চিন্তা করে আমরা আমাদের revitalize করছি। অনিল রায়ের মত মানুষ আর বাংলাদেশে নেই—জন্মাবেন কি না জানি না। বতদিন আমাদের দেশে আদর্শ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন লীলা রায়ের নাম বারে বারে স্মরণ করতে হবে। পুনর্জন্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গে না গিয়েও আমার দৃঢ় বিশ্বাস লীলা রায়ের বিপ্লবী সত্তা আমাদের মধ্যে বারে বারে ফিরে আসবে।

সভাপতি শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। ভাষণটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রী নিকুঞ্জ সেন বলেন—২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও লীলা রায়ের জন্মদিন, এই জন্মদিনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সংগ্রামের একটি ছবি ফুটে ওঠে। একদিকে অহিংসার প্রতীক গান্ধীজী ও অপর দিকে বল্লবের প্রতীক লীলা রায়। ভবিষ্যতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে লীলাদি কি করেছেন।

শ্রী নৃকুমার রায় বলেন : লীলাদি এক মহিয়সী মহিলা। সঙ্গীতের অমূল্য প্রেরণা পেয়েছিলেন অনিল রায়ের নিকট। কবিতুককে লীলাদিত্ব অভ্যর্থনা আজও ভুলতে পারি না।

শ্রীমতী আশা রায় বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের রচনা থেকে পাঠ করেন। শ্রীরমেন্দ্র লাল রায় খরচি রচনা পাঠ করেন এবং এছাড়া ভাষণ দেন শ্রী বীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য।

শ্রীমতী খন্না রায় চৌধুরী ও শ্রীমতী স্বামী মিত্র লীলা রায়ের স্মরণ করেন।

আশুতোষ গাঙ্গুলী

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের অকৃত্রিম স্তম্ভাভিধায়ী বন্ধু, জয়ন্তীর পরম হিতৈষী আশুতোষ গাঙ্গুলী গত ১০ই অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আশুতোষ গাঙ্গুলী বা এ, টি, গাঙ্গুলী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, জনদরদী শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি। ভারতের প্রথম দস্তা খনি উদয়পুরের (রাজস্থান) 'জাওয়ার মাইনস্'-এর ম্যানেজিং এজেন্টস—মেটাল করপোরেশনের তিনি ছিলেন দক্ষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অধুনা সরকার কর্তৃক পরিচালিত সেই দস্তাখানির নাম 'হিমুস্তান জিনকস্'।

আশুতোষ গাঙ্গুলী ছিলেন স্তম্ভা অমুরাগী। কথা প্রসঙ্গে তিনি জয়ন্তীর প্রতিনিধিদের বলেছিলেন, স্তম্ভাচন্দ্রের অস্ত্রধানের প্রাক্কলে কতিপয় বাঙালী শিল্পপতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্তম্ভাচন্দ্র মিলিত হয়েছিলেন, সেই বৈঠকে আশুবাবু অমিশ্রিত ছিলেন। আশুবাবু বিশ্বাস করতেন স্তম্ভাচন্দ্র জীবিত, তাঁর বিশ্বাস ছিল স্তম্ভাচন্দ্র সাধক জীবন বাপন করছেন এবং উচ্চকোটিতে বিরাজমান। জয়ন্তীর পক্ষ থেকে কিছু দিন পূর্বে তার জন্মদিনে প্রচা নিবেদন করতে গেল স্তম্ভাচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও ভাবনাগুলি ব্যক্ত করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল দেশের সংকটের ত্রাতা একমাত্র স্তম্ভাচন্দ্র।

শিক্ষাপ্রসারে তাঁর অবদান মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ (বাংলাদেশ) ও কলকাতা উইমেন্স কলেজ

স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া-রাজেন্দ্র বিজ্ঞানভবন লেকগালস-কুলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।

সমাজ-সেবা, শিক্ষা-প্রসার, আত্মপ্রোত্তি, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন প্রচার, গীতার বাণী প্রচার, সুভাষ জীবনদর্শন প্রচার প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহ ও উত্তাপ ছিল অফুরন্ত।

আমরা তাঁর প্রতি প্রজ্ঞানিবেদন করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কবিশেখর কালিদাস রায়

২৫শে অক্টোবর ১৯৭৫ শনিবার রাত ১০-৪০ মিনিটে কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁর চিরপরিচিত 'সন্ধ্যার কুলায়' বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৭৫ বছর কাব্য সাধনা সাহিত্য সাধনার পর ৮৭ বছরে কবি আমাদের ছেড়ে গেলেন, বাংলার সাহিত্য জগৎ একজন অভাবককে হারালো।

বর্তমান জেলার কুড়ুই গ্রামের এক বিদগ্ধ বৈষ্ণব পরিবারে কালিদাস রায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৮৯ সালে। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন ছিল কবি কালিদাসের। হৃদয়বাহুর আভিগম্য ছিল না তাঁর কাব্যে, সরস রচনা, নানা বিষয়ে প্রবন্ধে, তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পরিচয় মেলে। এছাড়া আদর্শ শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা কার্যক '৮২-৬

করেন। 'কুন্দ' কাব্য গ্রন্থ দিয়ে তাঁর কবি প্রতিভার প্রথম প্রকাশ।

'জয়ন্তী' পত্রিকার সঙ্গে কবি কালিদাসের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। জয়ন্তীতে প্রকাশিত একটি রচনা 'তালিকা' দিতে পারলে আগ্রহী পাঠকদের কাজে লাগতো।

ফাল্গুন ১৩৬২ জয়ন্তীতে প্রকাশিত 'সুভাষ তর্পণ' কবিতাটি স্মরণীয়—

নহে বিস্ত নহে যশ ভোগ সুখ নহে গুরুপরি

নহে মান অথবা ককিরি

কি তোমার কাম্য ছিল কিসে তব দাবি

আজি জন্মদনে শুধু সেই কথা ভাবি।....

...তোমার আদর্শ ছাড়া বাঙ্গালীর কি আছে সম্বল?

নহে তুমি ভীষ্ম ভ্রোণ কর্ত্তম, নহে যুধিষ্ঠির

গীতামন্ত্র শুনিবার একমাত্র যোগ্য তুমি বীর।

এ যুগে গান্ধীও তুমি তুমি মহারথ,

তোমা বক্ষে ধরি ধন্য এ মহাভারত।

কবির রচনা বা কবিকে নিয়ে কোনও রচনা সম্ভবতঃ ১৯৬৪ বাংলা ১৩৭৩ এর পর জয়ন্তীতে প্রকাশিত হয় নি। জয়ন্তীর পক্ষ থেকে সে সময় শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে শরৎ-সান্নিধ্যের কবি সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল। কবি কালিদাসের সঙ্গেও এ বিষয়ে একাধিক সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তারই কতক অংশ 'জয়ন্তী'র আশ্বিন ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সেদিন জয়ন্তীর প্রতিনিধি সাক্ষাৎকার অন্তে প্রণাম করে উঠলে কবি উদ্ভভাবে বলেছিলেন

‘ভোমাদের আসা উচিত, বুঝলে। আমরা ঝাঁক বেঁচে আছি এখনো তাদের কাছে এসে সব জেনে নেওয়া এবং শিখে নেওয়া উচিত।’

এই কথা ক’টি, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, নানা উপাধি ও সম্মানে ভূষিত কবি কাগিনাসের কথা ছিল না, এই কথা কয়টি ছিল বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত চর্চায় যথার্থ এক অভিব্যক্তির নির্দেশ।

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী গত ১৫ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ৮৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী বঙ্গবাসী কলেজে অর্ধশতাব্দী কাল অধ্যাপনা করেছেন এবং সেই সূত্রে বাঙ্গালী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয়রূপে তিনি কয়েক বছর কারাবদ্ধ ছিলেন, সে সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিলো, জয়ন্তীর পরিচালকবর্গের অনেকের। তাই পরে তাঁকে জয়ন্তীতে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবন্ধ লেখক হিসাবে পাওয়া গিয়েছিলো।

দেশবিভাগের পর কয়েক বছর রাজকুমারবাবু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন এবং পরে পশ্চিম বঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্যও ছিলেন। মুক্তার পূর্বেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রামকৃষ্ণ

মিশন, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট এবং তাঁর স্বগ্রামের হাতিয়া-সন্দ্বীপ জন কল্যাণ সমিতিতে তিন লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। আমরা এই অকৃতদার শিক্ষাবিদে মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হাওড়া জেলার সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য গত ১৫ই সেপ্টেম্বর শেষরাত্রে ৮১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। বিজয়বাবু ১৯২০ সালে পাক্ষীকীর আহ্বানে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং পর পর দুইবার কারাবাদও ভোগ করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাসন্তী দেবী, অমর কথামিত্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিদেব আমলে বাংলার কংগ্রেস সংগঠনে দায়িত্বভার বহন করেছেন। এ-ছাড়া তিনি পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভারও সদস্য ছিলেন।

কিন্তু শিক্ষাব্রতীরূপেই তিনি বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। হাওড়া মার্গল কলেজ, দীনবন্ধু কলেজ এবং বহু স্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেন্ট পলস ও সিটি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও সদস্য ছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং সমবায় আন্দোলনেরও তিনি হাওড়া জেলার অগ্রতম পথপ্রদর্শক।

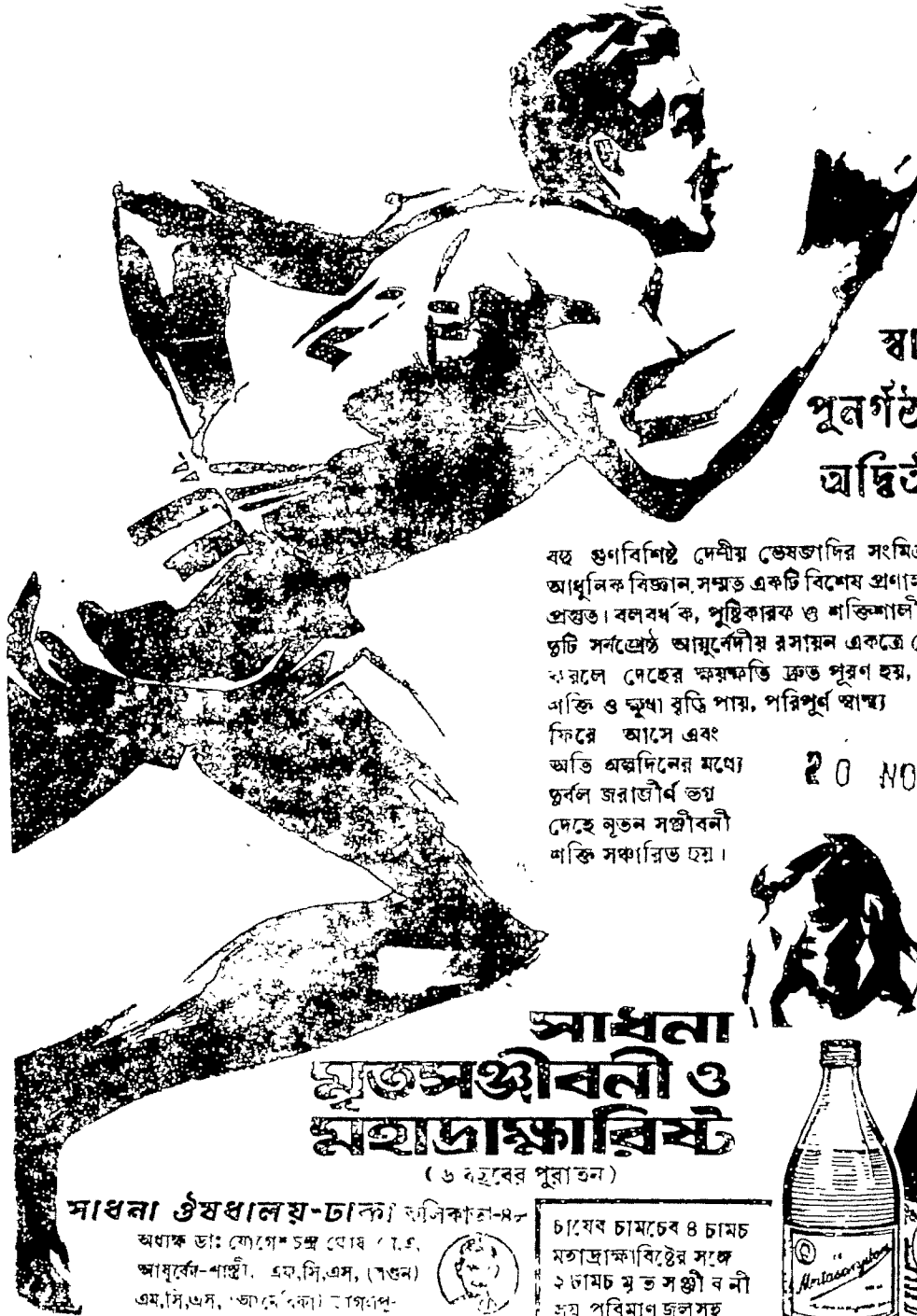
আমরা এই বর্ষীয়ান শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ৫. ১১. ৭৫

ধানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ		লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ	
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২'০০	ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০
পকেট গীতা	৫'০০	বীরসে বাঙালী	৩'৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০'০০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৫'৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭'৫০	বাংলার ঋষি	৫'০০
Soul of India Speaks	৭'৫০	বাংলার বিদ্বদ্বী	৩'৫০
কর্মবাণী	১'৫০	বাংলার মনীষী	
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০	রাজর্ষি রামমোহন	৩'০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২'০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২'৫০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.		আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪'০০
বিভাসাগর	৩'০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২'৫০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩'০০	রবীন্দ্রনাথ	৩'০০
ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের		জীবনগড়া	৭৫
তরুণ তুর্কী	৩'০০	ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪'০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড	৩'২৫	(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান	
বেঙ্গলিদের দেশে	৩'০০	৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত	
নিবেদিতা	১০'০০	সংস্করণ)	
বিভাসাগর	১০'০০	শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	
শিবরামের কিশোর নাটক	২'০০	সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬'০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪'০০		

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ		শরীর ও শক্তি	৩'০০
নিবারণ	৫'০০	সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩'০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩'০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	২'৫০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩'০০	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	১'০০



স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে,
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে
প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই
চুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য
ফিরে আসে এবং
অতি প্রস্রাবের মধ্যে
চূর্বল জরাজীর্ণ ভয়
দেহে নতুন সঞ্জীবনী
শক্তি সঞ্চারিত হয়।

20 NOV 1975

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদাম্ভারিষট্

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা বসিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ জোগেশ চন্দ্র ঘোষ (এ.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস., (সিওন)
এম.সি.এস., (জার্মানি) বাগদাদ-
কলেজের প্রথম শ্রেণী স্নাতকপত্র প্রাপক



৩৯১ হা বৈদ্য ১: প্রাঃ নরেন্দ্রজি বৈদ্য, এম.বি.সি.এস., (কলিকতা)
১৯৩৭-৩৮

চায়েব চামচেব ৪ চামচ
মহাদাম্ভারিষট্‌র সঙ্গে
২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী
সহ পরিমাণ জলসহ
প্রত্যাহ ছাবাব আহায়েব
পর্ব সেবা।



SM 4/1/69



ଉତ୍ତର-ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



੪੦ ਵਰ੍ਹੇ

ଅଗ୍ରହାୟଣ : ୧୭୪୨

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পুঁতি উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। দু'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও দুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ বৃত্তজ চিন্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপুঁতি উৎসব সংখ্যা ১৫৮৩-র বৈশাখে (মে ১২৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভানুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক
জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০

সূচীপত্র

জয়ন্তী-অগ্রহায়ণ : ১৩৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিজয়িনী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৮১
রূপ-চীন মুক্ত (প্রবন্ধ)	অভয়শঙ্কর শর্মা	৩৮২
পশ্চিম নদের শিল্প-শিক্ষার ক্রমবিকাশ (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	লক্ষ্মীধর সিংহ	৩৮৮
টমাস মান : জন্মশতবর্ষের ভাবনা	শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৩৯২
আইন ও সমাজসংস্কার	কালীচরণ ঘোষ	৩৯৭
ভারতের জাতীয়তা ও স্বভাবচরিত্র (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	কপেন্দ্র ঘোষাল	৪০৫
কর্তন শাস্ত্রীয় মঙ্গলতের	পর্যায় ভূক্ত কী	৪১৩
বর্তমান প্রসঙ্গ	হরিদাস কর	৪১৭

সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়ন্তী : পৌষ ১৩৮২। জানুয়ারী ১৯৭৬

নেতাজী সংখ্যা

অনিলকুমার চন্দ্র
কালীচরণ ঘোষ
হরিশঙ্কু কামাধ
পবিত্রকুমার ঘোষ
নন্দলাল মুখোপাধ্যায়

—আরও আছে—

অপ্রকাশিত ভাষণ, ও চাবাকের রচনায়
নতুন দিগন্ত

দাম : তিন টাকা

২০শে জানুয়ারীর পূর্বেই প্রকাশিত হবে

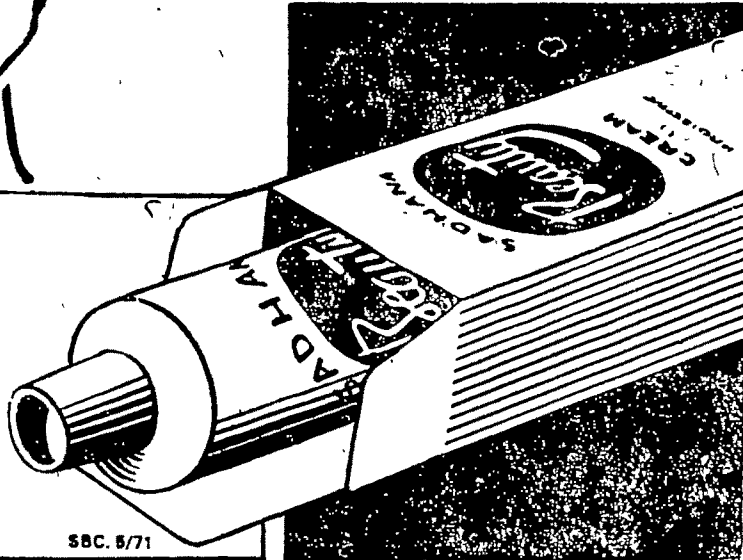


সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিনী
মৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনশ্লভ কমনীয়তা
আর অপরূপ সৌন্দর্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য



সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮



শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

ଭାସ୍କରୀ

୪୦ ବର୍ଷ • ଅଷ୍ଟମ ସଂଖ୍ୟା • ଅଗ୍ରହାସିନ ୧୩୫୨

ଓ

ବିଚାରିନୀ ନାହିଁ ତବ ଡ଼ର,
ଦୁଃଖ ଓ ଶକ୍ତି ତବ କର୍ମ।
ଅନ୍ୟାୟର ଅମରାବ
ଅନ୍ୟାୟ ଚାରିବେ ଦାବ,
କ୍ଷମା ଦିଅ ଏହି ମାଗିଛନ୍ତି ॥

ସିବିସିଆସନାୟକ

୩୦ ଜାନୁଆରୀ
୧୯୭୮

রুশ-চীন যুদ্ধ

অভয়শঙ্কর শর্মা

মাও-এর পথ

চীনা নেতারা তাদের স্বকীয়তা সম্পর্কে গোড়া থেকেই সজাগ ছিলেন। মাও-এর চিন্তার বৈশিষ্ট্য, মাও-এর অস্ব-নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক দৃষ্টি, চীনা বিপ্লবের নূতন পথ এঁকে দিয়ে গেছে—এই ধরনের প্রচারে চীনা কমুনিষ্ট নেতারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৬ এ বিখ্যাত চীন-বিশেষজ্ঞ গ্রন্থপ্রণেত্রী অ্যানা লুই স্ট্রং কে (Anna Louise Strong) এক সাক্ষাৎকারের সময় চীনের অস্বতম নেতা লিও-শাও চি চীন বিপ্লবের এবং মাও-এর তত্ত্ব-দর্শনের স্বকীয়তা ঘোষণা করে 'অস্বতম দেশের অস্ব চীন বিপ্লবের প্রদর্শিত পথকে 'মাও-এর পথ' (Mao's Road) রূপে চিহ্নিত করেন। সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির নেতারা এই ধরনের প্রচারকে আদৌ আমল দেন নি। চীনের আদর্শনৈতিক স্বাভাৱ্যতার দাবীকে উপেক্ষা করে স্টালিনের তত্ত্বদর্শনকেই চীন বিপ্লবের নিয়ামকরূপে সোভিয়েত রুশ উপস্থাপিত করতে চেয়েছে। এমন কি চীনা কমুনিষ্ট দল সেদিনকার আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট সংগঠন কমিনফর্মেরও সদস্যভুক্ত হয় নাই। আর এশীয় কমুনিষ্ট

আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্ররূপে পিকিংও সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির কাছে স্বীকৃতি পায় নাই।

চীনা কমুনিষ্টদের তাত্ত্বিক স্বাভাৱ্যবোধ সে-সময় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নাই, কারণ চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সোভিয়েত রুশের আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল। স্ট্যালিন এই আর্থিক নির্ভরতাকে কাজেও লাগিয়েছেন চীনের উপর এদিক থেকে সূক্ষ্ম চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে একটি চীন প্রতিনিধি দল নূতন বানিনজ্য এবং যোগাযোগ চুক্তি সম্পাদনের জন্ত মস্কোতে হাজির হলে সে-বছর জুন পর্যন্ত সোভিয়েত রুশ সেই আলোচনা টেনে নিয়ে যায়। তার দশদিন বাদেই কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং জেনারেল ম্যাক আর্থারে, সেনাবাহিনী এই যুদ্ধে তা ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করলে আমেরিকার চীন আক্রমণের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। এই ঘটনার পর চীন-রুশের বিরোধিতার অঙ্কুর চাপা পরে যায়। কারণ ১৯৫০-এর জুন মাসে কোরিয়া যুদ্ধের পর, কয়েক বছর কমুনিষ্ট চীনের আর্থিক পুনর্বিস্তারের

জন্তু এবং সম্ভাব্য মার্কিনী আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্তু একান্তভাবে সোভিয়েত রুশের মৈত্রীর উপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই মৈত্রী অব্যাহত থাকে এবং তারপরও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অবিভাজ্যতা সমগ্রমাণ করবার জন্তু চীন ও রুশ দুই পক্ষই তাদের ছোট-খাটো বিরোধগুলি পেছনে সরিয়ে রাখে। একথা বলাই বাহুল্য এই বছরগুলিতে চীন কিম্বা সোভিয়েত রুশ কোনো দেশের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনই তাদের নিজ নিজ স্বকীয়তা বর্জন করে একাত্ম হয়ে ওঠে নাই।

বিরোধের মূল

রুশ-চীন বিরোধের বিতর্ক ১৯৬২-এর ডিসেম্বরের পূর্বে এই দুই পক্ষ প্রকাশ্যে পরস্পরকে আক্রমণ করে নাই। ১৯৬২-৬৩র শীতকালে ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে চীনকে প্রকাশ্যভাবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট শিবিরে বিভেদ সৃষ্টিকারীরূপে আক্রমণ করা হয়। ইতালিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টি এই কাজটা প্রথম শুরু করে এবং তারপর চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির কম্যুনিষ্ট তাদের অনুসরণ করে। তারপূর্বে ১৯৫৮ সাল থেকে নিখুঁত দাঁড় করিয়ে চীন ও সোভিয়েত রুশের কম্যুনিষ্ট পার্টি পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আক্রমণ করতে হলে আলবানিয়াকে আক্রমণ করতো আর চীনা কম্যুনিষ্টরা সোভিয়েত রুশকে

আক্রমণ করতে হলে যুগোস্লাভিয়াকে আক্রমণ করতো। চীনাদের মুখে 'যুগোস্লাভ এবং শোথনবাদী' 'Yugoslavs and Revisionists'— শুনলেই বোকা যেতো আসলে ওদের লক্ষ্য সোভিয়েত রুশ, তেমনি সোভিয়েত রুশীদের মুখে 'আলবেনীয় ও গৌড়াপন্থী'....Albanians and dogmatists'— শুনলেই বুঝতে অসুবিধা হতো না ওদের লক্ষ্য চীনা কম্যুনিষ্টরা। তীব্র, তিক্ত বাদানুবাদে ষাট দশকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনগুলি বিযাক্ত হয়ে উঠে এই দ্বন্দ্বের মোমাংসা ধীরে ধীরে অসম্ভব করে তুললো। ১৯৬২-৬৩র শীতকালীন ইউরোপীয় সম্মেলনগুলিতে যেমন এই দ্বন্দ্ব অন্দর থেকে সদরে এলো তেমনি ১৯৬৩র ১৪ আগষ্ট চীনা কম্যুনিষ্টরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত রুশ চীনকে আনবিক বোমার কারিগরী কৌশল জানাতে অস্বীকার করে, ১৯৫৭ সালে রুশ বিপ্লবের চল্লিশ-তম বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্টদের শীর্ষ সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৫৭-এর অক্টোবরে সাক্ষরিত চীন-রুশ পারস্পরিক কারিগরী চুক্তি সোভিয়েত রুশ কার্যত বাতিল করে দিয়ে চীন-রুশ বিরোধ আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। চীনা কম্যুনিষ্টরা অবশিষ্ট ১৯৬৪ সালে প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণে সক্ষম হয়। তার পরের বছর ১৯৬০-এর আগস্টে সোভিয়েত রুশ চীন থেকে কারিগরী যন্ত্রকুশলীদের (technicians) সরিয়ে নিয়ে এলে চীনের আর্থিক

উন্নয়নের পতিবেগ বিপর্যয় হয়ে পড়ে। এই সোভিয়েত যন্ত্রকুশলীরা সে-সময় সোভিয়েত রুশের যন্ত্রপাতি দিয়ে চীনে কারখানা তৈরীর কাজে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং এই রুশ যন্ত্রকুশলীরা বিদায় নেবার সময় খালি হাত পায়ে চীন পরিত্যাগ করে গেলো তা নয়, তাদের তৈরী নক্সা প্রভৃতি নিয়ে চলে এলো, যার ফলে চীনাদের পক্ষে আর ঐ সব কারখানা গড়ার কাজে এপোন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

ঠিক কোন বছর থেকে চীন-রুশ দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তা নিয়েও হু'পক একমত নয়। চীনাদের মত ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের নির্মমতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে যে ভাষণ দেয়, সেখান থেকেই এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ক্রুশ্চেভের ধারণা এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ১৯৫৯ সালে। কারণ ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে রুশ বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মস্কোতে আয়োজিত বিশ্ব-কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাদের নেতা মাও-সে-তুং এর উপস্থিতিতে ও অমুমোদনে যে সর্বসম্মত সনদ গৃহীত হয়েছিলো—কম্যুনিষ্ট বিশ্বে যা 'মস্কো ঘোষণা'—('Moscow Declaration') নামে চিহ্নিত—চীনা কম্যুনিষ্টরা সেই সনদের সমালোচনা শুরু করে ১৯৫৯ সাল থেকে।

১৯৫৬ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে স্তালিন (denigration of Stalin) এবং ব্যক্তি পূজা বর্জনের (Personality Cult) পালা শেষ করার

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চেভ ও সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব থেকেও যে সরে এলো সেদিন কম্যুনিষ্টরা তা হয়তো পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারে নাই। ক্রুশ্চেভ ও সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক মাইকোয়ানের (Mikoyan) তীব্র স্তালিন-বিদ্বেষও তাদের পছন্দ হয় নাই। কিন্তু তারা সেদিন কোনো প্রতিবাদ করে নাই। পরে এই সম্মেলনের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলি তাদের মনে ছালা ধরিয়েছে, তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—যা পরবর্তী বছরগুলিতে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে স্থায়ী বিরোধের রূপ নিয়েছে।

লেনিনের তত্ত্ব চীনা কম্যুনিষ্টদের মজ্জায় মজ্জায়। সে-তত্ত্ব থেকে সরে এলে তো বিপ্লব থেকেই সরে আসা হবে ফলে কম্যুনিজম থেকেও। কারণ বিপ্লব থেকে সরে আসা মানে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজবাদে উত্তরণ। চীনাদের চোখে সে তো অবাস্তব কথা। বিপ্লব থেকে সরে এসে যারা সমাজ পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে, তারা তো শোধনবাদী—'Revisionist'—সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদীদের সংস্কার করে কম্যুনিজম আনবার কল্পনা তো স্বপ্নালু বাতুলতা। পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজবাদের শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান? নৈব নৈব চ। এই হোলো চীনা কম্যুনিষ্টদের তত্ত্ব—আর এটাই বিরোধের মূল। লেনিনের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী সমাজে যুদ্ধ অনিবার্য। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট থেকে যুদ্ধের উদ্ভব। আর যুদ্ধই বিপ্লবের জন্ম দেবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যত বিধ্বস্ত হবে যুদ্ধ ততো অনিবার্য হয়ে উঠবে।

ফলে অবশ্যস্বার্থী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তন হবে। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বিধ্বস্ত হবে, নিহত হবে। কিন্তু উপায় নেই, রক্তাক্ত যুদ্ধই বিপ্লবের উৎস, বা কম্যুনিজমকে প্রতিষ্ঠা দেবে। আর সমাজ সংস্কার সে তো পুঁজিবাদী শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথ, শোষণবাদীদের পথ। লেনিনের তত্ত্বে যুদ্ধ ও রক্তাক্ত বিপ্লব অনিবার্য ও অবিভাজ্য। কিন্তু লেনিনের আমলের পর সমুদ্র দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। আনবিক বোমা শুধু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শজ্ঞাগারে নয়, সোভিয়েত রুশের শজ্ঞাগারেও সঞ্চিত হচ্ছে। গুলি বোমা, ট্যাঙ্ক, প্যাস বোমারু বিমানের মামুলী যুদ্ধে না হয় লোককন্ডের পর যারা রইলে, তারা বিপ্লবের অগ্রদূত হবে, না হয় তো “যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই”—এই ধ্বনি করবে। কিন্তু বিপদ দেখা দেবে, যদি আনবিক বোমার আঘাত পৃথিবীকে আণবিক মরুভূমিতে পরিণত করে? সেই ধ্বংসের স্তূপে দাঁড়িয়ে কারা কম্যুনিষ্ট বিপ্লব করবে? কার বিরুদ্ধেই বা? সোভিয়েত রুশের কম্যুনিষ্ট নেতাদের সামনে আণবিক মরুভূমির বাস্তব সম্ভাবনা এক কঠিন প্রশ্ন নিয়ে এলো। তবে কি লেনিনের যুদ্ধ ও বিপ্লবের অনিবার্যতার তত্ত্ব সংস্কার করে নিতে হবে? সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করলে কম্যুনিজম-এ পৌঁছানো যাবে তার নিশ্চয়তা কী? কারণ সশস্ত্র বিপ্লব থেকে স্থানীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে কতক্ষণ? আর স্থানীয় যুদ্ধ যে পৃথিবীর একটি অঞ্চলের সীমানা আবদ্ধ

থাকবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? স্থানীয় যুদ্ধ কিছু কাল চললেই পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিগুলি এপেক্ষে—ওপেক্ষে জড়িয়ে পড়ে তাকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত করবে। আর বিশ্বযুদ্ধ একবার শুরু হলে, সে-যুদ্ধ আণবিক যুদ্ধের রূপ নিতে কতক্ষণ?

সুতরাং আনবিক অস্ত্রের যুগে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বর্জন করতে হবে। আর সশস্ত্র বিপ্লবই যদি বর্জন করতে হয়, তবে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের হৃদপিণ্ডই উপড়ে ফেলা হবে? এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কম্যুনিষ্টদেরও তো বিপ্লবের পথ বর্জন করে শান্তিপূর্ণ সমাজপরিবর্তনের পথে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য এগোতে হবে। তাই যদি হবে পুঁজিবাদের সহচর সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের প্রভেদ রইলো কোথায়?

চীনা কম্যুনিষ্টদের চোখে এরাই ‘শোষণবাদী’ (Revisionist)। রুশ কম্যুনিষ্টরা ১৯৫৬-র সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই শোষণবাদের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ‘শোষণবাদের’ অভিযোগ, এতো এক মহাসঙ্কট। ‘শোষণবাদের’ অপবাদ লেনিনের আমলে প্রথম শোনা গেছে। মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকরা তাদের প্রতিপক্ষের ওপর তাত্ত্বিক স্বলনের অপবাদ আরোপ করে, তাদের স্তব্ধ করতে সিজ্জহস্ত। এবং সেই অপবাদ তীব্র ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ-বিদ্বেষে অনিবার্যভাবে জর্জরিত রয়েছে। মার্ক্স এ বিষয়ে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকদের পুরোগামী ছিলেন। লেনিনও ছিলেন তাঁর উপযুক্ত মন্তাশিষ্য।

লেনিন নিজে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্ক্সবাদকে টেলে সেক্সে নিয়ে সেই সংশোধনকে মার্ক্সবাদরূপেই উপস্থাপিত করেছেন এবং লেনিনের পরবর্তীরা সেই সংশোধিত তত্ত্বকে 'লেনিনবাদ' নাম দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং যারাই লেনিনের ব্যাখ্যা থেকে সরে এসেছেন তাদেরই উপর শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে। তাদের নামকরণ হয়েছে বাম-অলিত (Left-deviationist) ডান-অলিত (Right deviationist) অথবা 'শোধনবাদী' (Revisionist) এছাড়া, তাদের বাম সুবিধাবাদী (Left opportunist)। দক্ষিণ সুবিধাবাদী (Right opportunist) কিম্বা দল ভাঙানিয়া (Fractionalist) অপবাদগুলিও বহন করতে হয়। লেনিন যেমন নিজের বিচার অনুযায়ী মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তেমনি পতনশঙ্কিত শেষের দিকে বার্নষ্টাইন (Bernstein), কাউটস্কি (Kautsky) মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন হিংস্র বিপ্লবের পথে নয়, বিবর্তনের পথে, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ পথে,—হতেও পারে পরিস্ফুট পথে,—সমাজ বিপ্লবকে সার্থক করে তোলা যেতে পারে। বিপ্লব-বর্জিত পথে সমাজ পরিবর্তনের তাত্ত্বিকরা লেনিনের নির্মম শ্লেষের মুখে 'শোধনবাদের' (Revisionist) অপবাদ বহন করে গেছেন।

১৯৫৬-এর সোভিয়েত রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের পর থেকে যখন সোভিয়েত রুশের তাত্ত্বিক নেতারা বলতে শুরু করেন যে যুদ্ধ আর অনিবার্য নয়, এবং বিপ্লব বর্জিত পথে

কম্যুনিজমে উত্তরণ সম্ভব, তখন চীনা কম্যুনিষ্ট নেতারা রুশ কম্যুনিষ্টদের লেনিনবাদ থেকে এই তাত্ত্বিক স্বগনকে, লেনিনের পথ অনুসরণ করে, 'শোধনবাদী' বলে চিহ্নিত করবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এই অপবাদের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্ত ১৯৫৬-এর আগের রুশ কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিকরা পথ খুঁজে বেড়িয়েছেন। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ১৯-তম কংগ্রেসে স্টালিন স্বয়ং লেনিনের যুদ্ধ ও বিপ্লবের অপরিহার্যতার তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্ত উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে স্টালিন 'প্রবলেমস অফ ইকনমিকস' (Problems of Economics) নামক তাত্ত্বিক প্রবন্ধে বলতে চাইলেন যে যদিও যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন যুদ্ধও অনিবার্য হয়ে থাকবে, তবুও সমাজবাদী শিবির এতো শক্তিশালী হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ এড়িয়ে থাকতে পারবে এবং পুঁজিবাদীরা পণ্যের বাজারের কাড়াগাড়িতে পারস্পরিক যুদ্ধ বিধ্বস্ত হবে। স্টালিন এইভাবে লেনিনবাদকেও বজায় রাখতে চেয়েছেন আবার আণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্য ব্যবহারের ভয়ঙ্কর পরণতিকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু স্টালিনের যুক্তি বড় দুর্বল, যা ভাবতে মন চায়, সে ধরণের কল্পনাকে প্রাশ্রয় দিয়ে দায় সেরেছেন। স্টালিনোত্তর সোভিয়েত নেতাদের মধ্যে এ সম্পর্কে চিন্তার দৈশ কত পড়ীর ছিল তা বোঝা যায় স্টালিনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকভ ও সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন মুখ্য সচিব ক্রুশ্চেভের আণবিক

বোমার বিধ্বংসী পরিধি কতটা প্রসারিত হতে পারে সেই বিতর্কে। ম্যালেনকভ স্পষ্টই বলেছেন আণবিক বোমা কম্যুনিজম ও পুঁজিবাদ উভয়কেই ধ্বংস করতে পারে, আর ক্রুশ্চেভ বললেন আণবিক বোমা কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সাংঘাতিক ক্ষতিসাধন করলেও তাদের ধ্বংস করতে পারবে না, পুঁজিবাদই কেবলমাত্র ধ্বংস হবে, কম্যুনিজম বেঁচে থাকবে। ক্রুশ্চেভের যুক্তিতে মনে হবে আণবিক বোমার কম্যুনিজম সম্পর্কে একটা মমতা রয়েছে। আসলে স্টালিন তার “এবলেমস্ অফ ইকনমিকস্” তথ্যে যা বলেছেন ১৯ তম দলীয় কংগ্রেসে, ক্রুশ্চেভ যেন তারই রকমফের পুনরাবৃত্তি করে গা বাঁচালেন।

১৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারীতে সোভিয়েৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করে বললেন। ক্রুশ্চেভ ততোদিনে ম্যালেনকভকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং দলে তার অপূর্ণ ছুই গোঁড়া স্টালিনবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী মলোটোভও কাগাগোভিচকেও খর্ব করে সোভিয়েত রুশে প্রধান মন্ত্রীদের এবং দলের মুখ্য সচিবের দায়িত্বে আসীন হয়ে অধিকতর ক্ষমতার

অধিকারী হয়েছেন। ক্রুশ্চেভ বিংশতি কংগ্রেসে স্পষ্টতর তাত্ত্বিক ঘোষণায় বলেন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, সমাজবাদী শিবির এতোটা শক্তিশালী হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী শিবির তাকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না, তাছাড়া এই শিবিরের শান্তিপূর্ণ জনসাধারণও তাদের সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের সমাজবাদী শিবির আক্রমণের উদ্ভাগকে প্রবলভাবে বাধা দেবে। সুতরাং যুদ্ধ আর ভবিষ্যতের মত অবশ্যস্বাবী —fatally inevitable—নয়। তাছাড়া শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে, এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে বিশ্বের শান্তিকামী জনতা সমগ্র বিপ্লবের পথ বর্জন করে, কোনো কোনো দেশে, শান্তিপূর্ণ পথে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করবে এমনও হতে পারে, এই শান্তিপূর্ণ পথ পরিষদীয় পথ পরিক্রমের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ আর একটি তাত্ত্বিক সূত্র বিবৃত করেন, সমাজবাদে উত্তরণে বিভিন্ন পথ স্বীকার করে নিতে হবে—“different road to Socialism”—বিভিন্ন দেশ সমাজবিপ্লব সাধনে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শিক্ষার ক্রমবিকাশ

শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিল্প শিক্ষার সময়

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে সমস্ত অনুসন্ধান পত্র পাঠান হয়েছিল তার উত্তরে জানা যায় যে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই সপ্তাহে মাত্র ৫০ মিনিটের একটা পিরিয়ড হাতে কলমে শিল্পের কাজ শেখাবার জন্য বরাদ্দ থাকে। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য ৪০ মিনিটের একটা পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয়। আবার এমন স্কুলের সংখ্যাও কম নয় যেখানে সূতা কাটা ও বয়ন বিচার ব্যবস্থা আছে কিন্তু তা কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের মাধ্যমে, কারণ সেখানে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্যই নির্ধারিত থাকে। হাতে কলমে মোটেই কাজ শেখান হয় না। ছ'একটি স্কুল থেকে জানা যায় যে দৈনিক এক ঘণ্টা করে সপ্তাহে ৬ দিন কাঠের কাজ হাতে কলমেই শেখান হয় কিন্তু প্রতি সপ্তাহে (৪০ মিনিটের) ৯ পিরিয়ড তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (B. Ed বা B. T) তথ্য একমাত্র বিশ্বভারতীর বিনয় ভবন থেকে পাওয়া গেছে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিনয়ভবনের ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা হাতে কলমে কাজ শিখেছেন এবং হাতে কলমে কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক জ্ঞানও লাভ করেছেন। বিনয়ভবনের শিক্ষক শিক্ষণের শিল্প-শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছিল। বিনয়ভবন শিক্ষক-শিক্ষণে বয়ন, দারু-শিল্প, কারু শিল্প (Artistic Handicraft) যন্ত্রের সঙ্গে ভাল ভাবেই শেখান হয়। প্রতিটি শিল্প ক্লাসে পরিমিত ছাত্র গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পকে যথাযথ স্থান দিতে হলে সময় সম্পর্কে এইভাবে এক সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি পাণন করা উচিত।

পাশ করা বা শিক্ষণ গ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিল্প জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিফল হবে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিনয়ভবনে শিল্পকে একটা মেথড সাবজেক্ট (Method subject) রূপে গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সালে বিশ্বভারতীর কলকাতা এই

৬৮৯ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছেন এবং বিনয়ভবন শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে শিল্পকে একটা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কোন না কোন শিল্প শিখতেই হয়। এই পরিবর্তনের ফল কি দাঁড়ায় তা জানা সময় সাপেক্ষ।

তথ্যামুসন্ধান পত্রের মারফৎ জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মাধ্যমিক বিভাগেই শিল্প শেখাবার জন্য প্রতি সপ্তাহে ৭ ঘণ্টা ২০ মিনিট করে সময় দেওয়া হয় এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য ও সমপরিমাণ সময় বরাদ্দ রয়েছে। সেইজন্য বছরে গড়ে ২১৮ করে হাতে কলমে এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য ভিন্নভাবে সময় ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই জাতীয় বিভাগেয় সংখ্যা খুবই কম।

বিশ্বভারতী পরিচালিত শিক্ষাসত্ত্ব উচ্চমাধ্যমিক বিভাগেয় নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের ত্রীনিকेतনের কাঠের কাজের শাখায় যে ভাবে কাজ শেখান হয় তার একটি তালিকা দেওয়া হল :—

শিল্প	প্রতি সপ্তাহে হাতে কলমে কাজের সময়	প্রতি সপ্তাহে তাত্ত্বিক জ্ঞানের নির্ধারিত সময়	পিরিয়ডের সময়	সারা হাতে কলমে	বছরে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সময়
কাঠের কাজ	X	X	X	X	X
নবম	১৮ ঘণ্টা	X	৩ ঘণ্টা	৩১০ ঘণ্টা	X
দশম	২ "	২ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	১৫৫ "	১৫৫ ঘণ্টা
একাদশ	২ "	২ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	১৫৫ "	১৫৫ "

শিল্পের সঙ্গে শিল্পও একটা পরীক্ষার অঙ্গ এবং তাছাড়াও প্রতিটি ছাত্রের দৈনিক কাজের হিসাব (cumulative record) রাখা হয়। সরকারী বিবৃতি অনুসারে মাত্র এই বিভাগেই এই জাতীয় হিসাব রাখার ব্যবস্থা দেখা যায়।

সরকারী পরিকল্পনামুযায়ী একটি মাত্র বিভাগেই একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিল্পকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিখান হয়। সাধারণতঃ অন্যান্য বিভাগে এই ব্যবস্থা দেখা যায় না। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে ঐ সমস্ত বিভাগে শিল্পকে দায় সারা পোছের করে শেখান হচ্ছে তাতে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। স্বজন মূলক শিক্ষা নৈতিক শিল্প ছাত্রছাত্রীর চরিত্র গঠনে কতটা সহায়তা করে সে সম্পর্কে শিক্ষক সাধারণ ও অভিভাবক মনে হয় এখনও সম্পূর্ণ সচেতন নন। রবীন্দ্রনাথ বহুবছর আগে একবার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে কোন না কোন শিল্পে সুদক্ষ করে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্ন, সেই আদর্শ আজও পশ্চিমবঙ্গে সার্থক রূপ নিতে পারেনি।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যগার্ঘ্যভাবে শিল্প শিক্ষা দিতে হলে নীচের শ্রেণীগুলিতে অন্ততঃ পক্ষে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট করে সপ্তাহে তিন দিন শিল্প শেখার দরকার আর উপরের শ্রেণীগুলিতে ১½ ঘণ্টা করে সপ্তাহে ২ দিন শিল্পের ক্ষুদ্র সময় দেওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষার যত্নপাতি

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয় যত্নপাতি বা আসরাবের অভাব আছে। শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে এ একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। অল্পসম্মানে জানা যায় যে, যে সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিল্প শিক্ষক শিল্পামুরাগী অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিল্প শিখেছেন ও চর্চা করেছেন শুধু সেই সকল বিদ্যালয়ের যত্নপাতির কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যত্নপাতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যত্নপাতি যা ধোয়া যায় বা ভাঙ্গা যায় তারও হিসাব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু একাজের ক্ষুদ্র কেবল মাত্র শিল্প শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভর করা উচিত বলে মনে হয় না। একমাত্র উপযুক্ত শিল্প পরিদর্শক দ্বারাই একাজ হতে পারে।

শিল্পের ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা

শিল্প ক্লাসে ৪০ থেকে ৪০০ পর্যন্ত সর্বাধিক ছাত্র সংখ্যা দেখা যায় সর্বনিম্ন সংখ্যাও সাধারণতঃ ২০ এর কম নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ শিল্প বিশারদরাই জানেন যে কোন একটি শিল্প ক্লাসে ২০ জনের অধিক ছাত্রসংখ্যা থাকলে শিল্প শিক্ষার কাজ সঠিক চলে না। এ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে শিল্প ক্লাসে সর্বাধিক ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। অনেকগুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত কোন না কোন শিল্প শেখান হয়। কোন একটি স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এবিষয়ে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণ গ্রহণ করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কারণ মুদালিয়র কমিশন একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিল্প শিক্ষাদেবার সুপারিশ করেছিলেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিল্প শিক্ষার অভিজ্ঞতা

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিল্প শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তাদের শিল্প পাঠ্যক্রম একরূপ নয়। শিক্ষার মেয়াদ সম্বন্ধেও একই কথা। কেউ এক বছর শিখেই শিক্ষক হচ্ছেন, কেউবা

ই বছর শিল্প শিক্ষক হচ্ছেন আবার কোন কোন শিক্ষক তিন বছর ধরে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্প শিক্ষার কোন মান স্থিরীকৃত হতে পারে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষকের দক্ষিণা

কোন কোন বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষককে মাত্র ৬০/- দক্ষিণা দেওয়া হয়। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষকের বেতনের হার ১১৫/- ৩/- ১৩০/- ৪/- ১৮৫/-। মাত্র একটি মাধ্যমিক স্কুলে শিল্প শিক্ষকের মাহিনার হার অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের। বিশ্বভারতীর পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষাসত্রের শিল্প শিক্ষার একজন গ্র্যাজুয়েট, উপরন্তু শিল্পে তিন বছর শিক্ষা লাভ করে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। আর মাহিনার হার ১৭৫/- + ১০/- = ৪২৫/-। বিনয়ভবন শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতম শিক্ষকের মাহিনার হার ৪০০/- ৮০০/- এবং তিনি অতিরিক্ত ভাতাও পেয়ে থাকেন। অগ্ন্যস্ত শিক্কদের মাহিনার হার ২৭৫/- ৬৫০ টাকা এবং তাঁরাও অতিরিক্ত ছুমূল্য ভাতা (D. A) পেয়ে থাকেন।

শিল্প শিক্ষকের দক্ষিণার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। এই অবস্থার উন্নতি না হলে এবং শিল্প শিক্ষক অগ্ন্যস্ত শিক্ষকের সমান দক্ষিণা পেলে শিল্পশিক্ষার অগ্রগতি পশ্চিম-বঙ্গে ব্যাহত হতে বাধ্য। শিক্ষা শিল্প ও অগ্ন্যস্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমতুল্য বিবেচিত হওয়া উচিত।

মাধ্যমিক স্কুলে শিল্প শিক্ষার উপাদান

তথ্যসঙ্গ্রহ পত্র থেকে বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষার উপাদানের ব্যয় সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। কোন একটি বিদ্যালয়ের ৪৮০ জন ছাত্র কাজ শেখে পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত। সেই গ্রন্থ প্রতি বছর ২৫০০ টাকা উপাদান বাবদ ব্যয় হয়। এই বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ শেখান হয়। আরেকটি মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে নুঁচের কাজ শেখান হয়। ছাত্রী সংখ্যা ২৪, প্রতি বছর উপাদান বাবদ খরচ হয় ১৫০০ টাকা আরেকটি বিদ্যালয়ে সেলাই ও বাগানের কাজের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রতিবছর উপাদান বাবদ খরচ মাত্র ২৫ টাকা। একটি স্কুল থেকে জানা যায় যে সেখানে কাঠের কাজ শেখান হয় এবং ছেলেরা নিজেরাই উপাদান সংগ্রহ করে আনে ও উৎপন্ন জিনিস নিজেরাই ব্যবহার করে। এমন কয়েকটি বিদ্যালয় আছে যেখানে শুধু শিল্পের তাত্ত্বিক জ্ঞানই দেওয়া হয় ; হাতে কলমে কাজ হয়ই না। সেইজন্য উপাদানের ব্যয়ও নেই কিছু।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিল্প পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্পের কোন পরীক্ষা নেওয়া হয় কি না এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হয় বলে জানা যায়। একটি মাত্র স্কুলে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও ছাতে কলমে শিল্প কাজের পরীক্ষা পৃথকভাবে হয়ে থাকে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার রেকর্ড

বিদ্যালয়ে কোন রেকর্ড রাখা হয় কি না এই প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে অধিকাংশ স্কুলেই এর কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু একটি মাত্র স্কুল থেকে জানা যায় যে প্রত্যেকটি বিদ্যার্থীই হাতে কলমে কাজের রেকর্ড রাখেন।

তথ্যসমৃদ্ধান পত্রে সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে অল্প যে কোন জ্ঞাতব্য তথ্য। চূড়ান্তের বিষয় কোন মাধ্যমিক স্কুল থেকেই এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।

শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত আবাস ও যন্ত্রপাতি

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে শিল্প শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বা আবাস এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ও সঠিক কিছু নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হলে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। প্রতিটি শিল্পের শিক্ষাগৃহ কি রকম হওয়া উচিত তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে স্থির করে, এঁকে ও ছাপিয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। যন্ত্র ও আসবাব সম্পর্কেও একই নীতি প্রযোজ্য।

বিদ্যালয়কে সুন্দর রাখা (Beautification of Schools)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিণত করতে হলে, সাজিয়ে গুটিয়ে রাখাও একান্ত কাম্য। বিদ্যালয়ের অঙ্গন ও গৃহের অভ্যন্তর গুছিয়ে রাখার অভ্যাসটি যাতে ছাত্রছাত্রীরা করে সেই দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সৌন্দর্যের চর্চা শিক্ষানৈতিক জীবনেই আহরণ করতে হয়। শিল্পচর্চার মাধ্যমে এ কাজ হতে পারে ও হওয়া উচিত।

শিক্ষা শিল্প (Educational Crafts)

শিল্পকে শিক্ষার যথার্থ অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সকল শিক্ষকের শিল্প বোধ। আর এই বোধ একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই আহরণ করা সম্ভব। সেইজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে সাধারণ শিল্পের শিক্ষা নৈতিক সার্থকতা জানতে হবে, বুঝতে হবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় রূপে শিল্প প্রবর্তন করতে হবে। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের শিক্ষক শিক্ষণে কেন্দ্রের-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা অমুখাবন যোগ্য।

বিভিন্ন ধরণে শিল্প ক্লাসে কতজন ছাত্রকে এক সঙ্গে শিল্প শেখান যায় তার মানও স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। উপযোগী যন্ত্রপাতির কি ধরণের চাহিদা তা দৃষ্টি পথে রেখে স্থির করে দিতে হবে।

বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষা দেবার উপযোগী স্থান বা গৃহের কোন নির্দিষ্ট মান নেই। অনেক শিক্ষকের ধারণা (অমুমান করা হয়) যেন শিল্প একটি অনাবশ্যক, অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয়। স্বজনধর্ম মূলক শিক্ষা শিল্পের প্রভাব ছাত্রছাত্রীর জীবনে কত সুদূর প্রসারী হয়ে তা অবশ্য পরিদৃশ্য। পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বিষয়ে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ সামান্যই হয়েছে। শিক্ষা শিল্পের উপকারিতা সম্পর্কে গবেষণার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সাধারণতঃ পরীক্ষা পাশের জন্যই প্রস্তুত হয়ে শিক্ষা শিল্পের স্বজন শক্তি সম্পর্কে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ই উদাসীন। এই উদাসীনতার কারণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। শিল্পকে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষণীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করা হয় নি, ফলে এর উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা দেবার জন্য যে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় তাঁদের শিল্প শিক্ষার মান একরূপ নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার জন্য যে ব্যয় করা হয় সেই অনুপাতে শিল্প সৃষ্টি প্রায় কিছুই হয় না বলে বর্তমান গবেষকের ধারণা হয়েছে।

অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের বেতন অতি নগণ্য। শিল্পকে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের মত গুরুত্ব দিতে হলে শিল্প শিক্ষকের ও অপ্রয়োজনীয় সহকারী শিক্ষকের মত মর্যাদা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিল্প শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চা মত সময় ব্যয় করা হয়। কোন বিদ্যালয়ে অতি সামান্য আবার কোন বিদ্যালয়ে বেশ ভাল। এই বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের ন্যূনতম মান স্থির করে দেওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শেখবার উপযুক্ত গ্রন্থ রচিত হয়নি। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিল্পগ্রন্থ রচনায় শিক্ষাবিদদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড কিরূপ হওয়া উচিত এই সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক অভিভাবক এই প্রথম তাঁদের সন্তানদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছেন। বহুনিরঙ্কর অভিভাবক যারা হাতে কলমে পরিশ্রম করে উপার্জন করছেন তাঁরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের আর হাতে কলমে কাজ শেখাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। এই জন্ত দায়ী আমাদের প্রগতি হীন সমাজ ব্যবস্থা। অথচ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অস্বাভাবিক রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও বৃহৎ শিল্প (Industry) এবং কুটির শিল্প দুই ই বৃদ্ধি পাচ্ছে; কৃষির উন্নতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষি ও শিল্পের উপযোগী নাগরিক শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ই হবে তার প্রথম সোপান।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার উপযোগী ঘরের নক্সা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে করিয়ে ছাপিয়ে ফেলা প্রয়োজন যাতে স্থানীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিল্প গৃহের মান সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারেন।

অভিজ্ঞ শিল্প শিক্ষা-বিশারদ (যিনি শিক্ষকও বটেন শিল্প বিশারদ ও বটেন)

অভিজ্ঞ শিল্প শিক্ষককে পরিদর্শক রূপে মোতায়েন করা প্রয়োজন।

স্বাধীনভারতে বৃহৎ শিল্প বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে যে সমস্ত শিল্প বস্তু ঘরে হাতে তৈরী হ'ত এখন তা ক্রমে ক্রমে কারখানায় তৈরী হচ্ছে। রাস্তা ঘাট ও যান বাহনের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের তৈরী শিল্প বস্তু (যে সকল শিল্প জব্বা পূর্বে হাতে তৈরী হ'ত) দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই বিবর্তনের মুখে কারু শিল্পের ব্যাপকতা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা। পূর্বে যে সময় গ্রামীণ পরিবেশে সূর্য্যচি পূর্ণ শিল্প কলায় নিয়োজিত হ'ত সে সময়টুকু এখন হয়ত স্বজন মূলক কর্মে দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষের স্বজন ধর্মকে সীমিত করলে তার কুফল দেখা দেবেই। কাজেই এই বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। মানুষ যন্ত্রের দাস হবে না, যন্ত্রই মানুষের দাস হবে এই কথাটাই খাঁটি। কিন্তু কীভাবে এই নূতন সমাজ গড়ে তোলা যায় তা শিক্ষাত্রতীদের ভাববার সময় এসেছে। স্কুল কলেজে শিক্ষক শিল্পের ব্যাপক চর্চা আবলম্বনের প্রধান ও প্রাথমিক ধাপ।

(সমাপ্ত)

টমাস মান : জন্মশতবর্ষের ভাবনা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) এ-যুগের ভেতমনিই এক চিন্তানায়ক যিনি জার্মান হলেও বিশ্বজনীন, যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় হয়েও বিশ্বের গৌরব। এই বিশ্বজনীনতা মানবিকতাবোধের ওপর, মানুষকে ভালবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জ্যেস প্রমুখ প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের সমপোত্রীয় হলেও, মানের বৈশিষ্ট্য প্রকরণ নির্ভর নয়। তিনি উপন্যাসে মানুষের সভ্যতা ও ইতিহাস তথা মানুষকেই চিত্রিত করেছেন তার বৃহৎ পটভূমিকায়। তিনি প্রথমযুগের রচনায় মানুষের পটভূমি খুঁজেছেন জার্মানিতে, তার পরের যুগে ইউরোপের বৃহত্তর পরিধিক্ষেত্রে, তার পরের যুগে বাইবেলের জোসেফ সিরিজে। রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি মানুষের অন্তর্জগতের বিশ্লেষণের চেয়ে, মানুষের সামগ্রিক সত্তার ওপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন মিরীক্ষণ করেছেন, মানুষ যে মৃত্যু ও সময়হীনতার ওপারে নিজের কীর্তির মহিমায় কত মহীয়ান তাই দেখাতে চেয়েছেন।

তার প্রথম উপন্যাস ('ডি বুডেনব্রকস'-১৯০০) —যার বিষয়বস্তু অনেকটাই আত্মজীবনীমূলক— তাঁকে ইউরোপীয় প্রধান ঔপন্যাসিকদের সমপার্থ্য-

ভুক্ত করে তোলে উক্ত উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটি প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে (প্রায় ২৪ বছর) তিনি একাধিক ছোট ছোট রচনায় মন দেন যাদের বক্তব্য বীজাকারে প্রথম উপন্যাসটিতেই স্পষ্ট ছিল—যেমন; 'টোনিও ক্রোয়েগার' (১৯০৩)-এ তিনি শিল্প ও সাধারণ নাগরিকজীবনের দ্বন্দ্ব পরিষ্কৃত করেন; 'ডেথ ইন ভেনিস' (১৯১০)—এ প্রতিভা এবং শারীর ও মানস বৈকল্যের পরস্পরনির্ভরতার কথা আলোচনা করেন, ইত্যাদি। তাঁর 'ম্যাজিক মাউন্টেনই' (১৯২৪) পরবর্তী বিখ্যাত উপন্যাস যা তাঁকে খ্যাতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করে। এই উপন্যাসেই একটি স্তানাটোরিয়ামকে উপলব্ধ করে তাঁর সময়চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। স্তানাটোরিয়ামে সময় বন্ধনহীন, দিনের পর দিন গড়িয়ে চলেছে, অথচ বাইরের পৃথিবীতে জীবন গতিনির্দিষ্ট, সময়ের গণ্ডীঘেরা।

জার্মান সংস্কৃতির রক্ষণশীল, দার্শনিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষক এই ঔপন্যাসিক ফ্যালিসজমের নিন্দার মুখর হয়ে ওঠেন তাঁর রচনায়।

ফলস্বরূপ, তাঁর উপস্থাপন পুড়িয়ে ফেলেন হিটলার, তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ভ্যাগের মধ্যে যে-প্রতিবাদের ধ্বনি সোচ্চার মানের ক্যাসিঞ্জমবিরোধিতার মধ্যেও মানবিকতা-বোধের তেমনি এক সুস্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

মানের রচনায় বিষম জীবনচিন্তা, বিষম মূল্য-বোধের উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'বুডেনব্রুকসের' শিল্প-কর্মে ভাগনারের সঙ্গীতের প্রভাব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অবশ্যের সহাবস্থানও দেখানো হয়েছে। 'টোনিও ক্রোয়েগার' বা 'ডেথ ইন ভেনিসেও' তেমনি অসুস্থ শিল্পীর বক্তব্যের মাধ্যমে জীবন এবং আত্মার মৌল বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন মান। ম্যাজিক মাউন্টেন-এও সমসাময়িক সভ্যতার অসুস্থ মানসের রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই অসুস্থতার বোধ থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তিনি জীবনের সুস্থতার দিকে এগিয়ে চলেছেন, ঠিক তখনই প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে পেল। হিটলারের আমলে যখন তিনি স্বদেশত্যাগী তখনই তিনি বাইবেলের সূত্র ধরে জোসেফ সিরিজের উপস্থাপনগুলি লেখেন। ঐতিহাসিক অতীত-বর্তমানের এক সাম্প্রতিক ব্যাখ্যাই যেন প্রকাশ পেয়েছে এই উপস্থাপনগুলিতে। জোসেফ সিরিজের পর মানের কয়েকটি ছোট

উপস্থাপন প্রকাশিত হয়। কিছু পরে, ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত আর একটি উপস্থাপন—ডক্টর কন্সটাস। এতে এক জার্মান সঙ্গীতরচনাকারের একটি কাল্পনিক জীবনী সংগ্রহিত হয়েছে—ফাউস্ট কাহিনীরই এক ভিন্নরূপ পুনরাবৃত্তি—এবং এতে শিল্পী ও পৃথিবীতে তার ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে, যেমন দেখানো হয়েছে জার্মানির আত্মিক শক্তি ও তার আত্মিক বিপর্যয়ের ঘটনাও। ফেলিক্স ক্রুসের স্বীকারোক্তিই (১৯৫৪) তাঁর শেষ বই যাতে তিনি এক আত্মসচেতন ব্যক্তির কাহিনী বিবৃত করেছেন।

টমাস মানের মানস পরিমণ্ডল ও তার ব্যাপ্তিই আমাদের আকর্ষণীয় মনে হয়—যে-ব্যাপ্তি আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা দেখি। তাঁর ব্যাপ্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে মানুষের সভ্যতা ও শিল্পকর্মের প্রতি প্রজ্ঞা। মানুষের প্রতি প্রজ্ঞা থেকেই ক্যাসিঞ্জমের প্রতি তীব্র নিন্দার মনোভাব গড়ে উঠেছে তাঁর।

তাঁর উপস্থাপনের বিশাল কল্পনা দেখে রবীন্দ্রনাথের সাধনার কথাই মনে পড়ে; আর তার পরেই আমাদের সাম্প্রতিক রিক্ততার কথা ভেবে, সাহিত্যে নৈরাজ্যের কথা ভেবে হৃৎ হৃৎ ভেঙে পড়ি।

আইন ও সমাজ সংস্কার

কলীচরণ ঘোষ

৩. সতীদাহ

ধর্মের দোহাই পেড়ে মানুষ যে কত নৃশংস হতে পারে সম্ভবতঃ তার সীমা নেই। জিঘাংসা মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে। প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেবার জন্য মানুষের হৃদয় কিস্তদন্তীর পিচাচকেও দেবতুল্য করে তুলতে পারে, কিন্তু সজ্ঞানে, সদিচ্ছায়, ব্যক্তি বা সমষ্টির মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে সমাজের নমস্ত ব্যক্তিরও কত নিয়ন্তরে নামতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা।

আজ পূর্ণ দেড়শ বছরও হয়নি, ধর্মের নামে যে অমানুষিক অপকর্ম সংসাধিত হয়েছে, সে কথা আজ কল্পনায় আনতেও কষ্ট বোধ হয়। আজ জোর করে বলতে হয় “সত্যিই হয়েছে”, “এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপ্ন”।

বিবাহিতা কচি মেয়ে থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধা পর্যন্ত কারও বাদ থাকার কথা নয়। সমাজপতি, শাস্ত্রজ্ঞ দিগ্গজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সংসারের স্থির ধীর মস্তিষ্ক সম্পন্ন গৃহকর্তা ও পাড়ার মাওব্বর ইত্যাদি, ইত্যাদি মানব কুলের মাথা বন্দী হইয়া উঠিত। এই সমাজ স্বামীহানির পরকালের সদগত করার চিন্তায় “পতি পরম গুরু”র দেশে বিধবার সদগতি হয় স্বামীকে অমৃতরূপে কলনে; সহস্রতা হ’লে।

স্বামীর জীবনধারণ কালে স্বর্গে যাবার এ সুযোগ হয়নি; আজ ভগবৎ কৃপায় সে পথ বন্ধন উন্মুক্ত হয়েছে, তখন সেটা হেলায় হারাণ নিবৃদ্ধিতার কাজ হবে।

স্বামীর চিতায় জীবন উৎসর্গ করলে সে “সতী”র অনন্ত পুণ্য হবে, সমাজে গ্রামে গ্রামান্তরে “ধন্য ধন্য” পড়ে যাবে। বেচারী স্বামী পথে নিতান্ত একা বোধ করবেন না; স্বস্থানে পৌছে “সংসার” পাতবার অশ্রুবিধা তাঁর হবে না। তাছাড়া সন্ত বিধবা যে নিজের এই পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য নিতান্ত আগ্রহশীল তার জ্বর জ্বর প্রমাণ উৎপাদিত হওয়ার অশ্রুবিধা ছিল না।

প্রমাণ হয়ে গেল, বিধবা জীবিতকালে বরাবরই সতীর আত্মোৎসর্গ জ্বরসী প্রাণশ্রী করতেন। অতএব বর্তমানকালে নিজের বেলায়, মুখে না বললেও, তাঁর এ ব্যাপারে যে পূর্ণ সমর্থন আছে, সেটা স্বয়ংসিদ্ধ; প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

উপস্থিত সকলেই শুনেছেন বিধবা নিজ মুখে বলছেন, “আমায় কোথায় রেখে গেলে গো, আমায় তোমায় সজ্ঞে করে নিয়ে যাও। আমি তোমায় ছেড়ে কি করে থাকু গো” ইত্যাদি সবই স্বামীর সহগমনের পক্ষে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাঁর

সদিচ্ছাকে কোনও রকমে অগ্নি থাকতে দেওয়া চলে না। সমাজের অকল্যাণ হবে।

শোড়জোর আরম্ভ হয়ে গেল একেবারে শাস্ত্রীয় মতে সস্ত্র প্রক্রিয়া পরিণালিত হবার জন্ত। সিঁথর সিঁহর পায়ের আলতা, লাল পাড় পরদের শাড়ী প্রভৃতি অঙ্গে চড়িয়ে দেওয়া হল। শরীরের সব বাধা বন্ধন দূর করবার জন্ত যদি কোনও অলঙ্কার পায়ের থাকে সেগুলি খুলে দেওয়া হ'ল। হাতের শাঁখা অগ্নির তাতে ভেঙ্গে যাবে, অতএব সে ছুগাছা রইল। আর রইল বাঁম হাতের “নোয়া” (লৌহ বলয়) কারণ সেটা অপ-দেবতা থেকে রক্ষা করে চলবে।

পুরোহিত এসে মন্ত্র পড়লেন, যার এক বর্ণ বুঝলেন না। বীর স্বর্গ কামনায় এত বড় কাণ্ড ঘটছে। তার মধ্যে যোগ করা ছিল যে তিনি স্বেচ্ছায় সহমৃত্যু হচ্ছেন।

এত বড় ত্যাগের আত্মসমর্পণের উদাহরণ ঘটায় করে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন; যাতে অমুগামী বীর তাঁরা যেন সাহস পান, উৎসাহিত হন। শাঁখ, ঢাক ঢোল, কঁসর ঘণ্টা সবই বন্দোবস্ত হ'ল, কীর্তীগীয়ারা তারস্বরে ভগবানের নাম বিগোতে লাগলেন। কিন্তু আসল কথা যে ঐ উৎসর্গীকৃত নারীর কায় যেন কেউ শুনে বিচলিত না হন।

চিতা প্রস্তুত। কোথাও বা পতীর পরিধা কেটে তার মধ্যে চিতা সজ্জিত হ'ত। “পতী” দেবীকে চিতার পাশে এনে সাধারণতঃ দড়িদড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে দেওয়া হ'ত, যাতে পালাতে না পারেন। তার

পরও দ্বিতীয় স্তরের রক্ষণ-বাহ তৈরী করা থাকত যাতে সহমৃত্যুভিলাষিনী যন্ত্রণায় চিতা থেকে উঠে যেতে না পারেন। শক্তিমান পুরুষ পুঞ্জবরা কঁচা বাঁশ নিয়ে দুর্গ রক্ষা করতেন। চিতা থেকে এ-টু সরে এলে বাঁশ দিয়ে আগুনের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিত। এ সম্বন্ধে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও নারী বেঁচে পড়তে পারতেন তাঁকে স্ব-স্ব চিতার ভস্ম করা হত। যেখানে গভীর গর্তের মধ্যে চিতা সজ্জা হ'ত, সেখান থেকে উঠে পালাবার উপায় ছিল না। স্বামীর চিতা নিভে যাবার পর নারী যদি জীবিতা থাকতেন ওপর থেকে কাঠ ফেলে নতুন করে আগুন জ্বল দিচ্ছিলেন। আর না হয় মাটি চাপা দিয়ে জীবন নাশ করা হ'ত।

একটা কথা বলা অসঙ্গত হবে না। সহ-মরণ যাত্রার আজক হিসাবে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন হ'ত, সে তালিকার মধ্যে কঁচা বাঁশের উল্লেখ আছে। তার প্রধান কারণ—জলজ্যান্ত একটি মহিলাকে ভস্মীকৃত করতে শুক বাঁশ দিয়ে ঠেলেতে গেলে সে বাঁশে আগুন লেগে পুড়ে যাবে। আবার নতুন করে বাঁশ নেওয়া, হয়তো নারীকে অর্ধমৃত অবস্থায় রাখার মত দুর্লক্ষণ। আসল কথা কঁচা বাঁশ শুকিয়ে গিয়ে আগুন ধরতে যত সময় লাগতে পারে তার মধ্যে একটা জ্বালোক অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সম্ভব।

অর্ধমৃত মৃত প্রায় “পতী” কে যে মাটি চাপা দেওয়া হ'ত, সে-খবর পাড়য়া যায়, আইনের মুখবন্ধ বা ভবিজা থেকে। পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

এ অপকর্মের উৎসাহদাতা হলেন সমাজের গোঁড়া, অন্ধাশ্বাসী ব্রাহ্মণ পুরুষ ঠাকুরের দল; একপাশে ধর্মিক ও সমাপনাস্থে তাঁদের যথোন্মুক্ত “দাক্ষিণ্য” গ্রাপ্তি ঘটবে। বিধবার সম্পত্তির ধারা উত্তরাধিকারী তাঁদেরই এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা যত। আইন প্রণয়নের পূর্বে তথ্য সংগ্রহের প্রারম্ভে দেখা যায়, মৃতের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা ভাগিনেয় (হয়ত সন্তানও) ইত্যাদি অর্থাৎ হিন্দুগাজ্জ-মতে সম্পত্তিতে প্রধান দাবীদার, তাঁদের সম্পর্কিত মহিলারা “খেচ্ছায়” স্বামীর অনুগমন করেছেন।

প্রাচীনকালে এই জঘন্য প্রথার উল্লেখ আছে মাত্র, ব্যাপকভাবে পালিত হবার প্রমাণ নেই। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বাঙ্গলা, অযোধ্যা ও রাজস্থানে ও কাশ্মীরে এ প্রথার চলন বেশী, পাঞ্জাবে কম এবং দাক্ষিণাত্যে প্রায় অপ্রচলিত।

চলে আসছিল এক রকম মন্দ নয়। স্বর্গে সিঁড়ি বেড়ে যচ্ছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ত অকস্মৎ স্বর্গ লাভ করলেন। ধারা এই পুণ্যকর্মে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও মহাপুণ্যের অংশভাগী হয়ে হুশ বা দীর্ঘকাল স্বর্গস্থান পেয়েছেন।

বাদ সাধলেন মহাশয়—কয়েকটি বাঙ্গালী তার মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম বলস্বরূপ প্রধান। তাঁদের আন্দোলন লোকের চতন্য সঞ্চার করেছিল এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে। তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুললেন, কিন্তু কেবল জনমত এই বাধা দানে সার্থক নয়। সে সময়ের বড় লাট লর্ড বেটিন্জ। তিনি নিজেই এই বেদনাদায়ক ঘটনার সব বিবরণ জেনে মর্মাহত

হয়েছিলেন। এখন নেতৃবর্গের সমর্থন পেয়ে তিনি ব্যাঙ্গ্য গ্রহণে বন্ধাবদ্ধ হইলেন। তাঁর মনের কথা নভেম্বর ৮, ১৮২২ সালে লিপিবদ্ধ করেন:

“To consent to the consignment, year after year of hundreds of innocent victims to a cruel and untimely death, when the power exists for preventing it, is a predicament which no conscience can contemplate without horror....With the firm undoubting conviction entertained upon this question I would be guilty of little short of the crime of multiplied murder if I could hesitate in the performance of this solemn obligation. I have already been stung with this feeling. Every day's delay adds a victim to the dreadful list which might have been prevented by a more early admission of the present question.” P. Thomas: Indian Women Through the Ages.”

সংক্ষেপতঃ বলা যায়, বেটিন্জের মতে সত্যদাহ বন্ধ করার ক্ষমতা থাকতে নিরীহ এক মহিলাকে অকালে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে দেওয়ার কথা চিন্তা করতে গেলে বিবেক আলোড়িত হয়ে ওঠে। তিনি মনে করেন, এ নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ না করলে তিনি

জায়তঃ এই বহু যুদ্ধের জন্ম দায়ী। প্রতিদিন একটি হিসাবে নরহত্যা চলছে; কিছু আগে থেকে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বন্ধ করা যেত।

ভারতীয় নেতাদের আবেদনে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। তাঁদের আবেদনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয়, আইনের মুখবন্ধে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিল। আইন বিধিবদ্ধ হবার পর কাটের অনুমোদন লাভ করে ডিসেম্বর ৪, ১৮২৯ (Reg. XVII of 1829)

প্রথমেই বলা হ'ল চলিত প্রথায় নারীকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা বা কবর দেওয়া হয়ে থাকে ("The practice of suttee or burning or burying alive the widow of Hindoos.") এ ভারি হ'তে এই কাজ সম্পূর্ণ— আইন বিরুদ্ধ বা দণ্ডনীয় হ'ল।

বহুকালাবধি যে প্রথা চলে আসছিল সেটা বন্ধ করবার কারণ হিসাবে বলা হ'ল যে এ ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতির কাছে নিতান্ত আপত্তিকর ও ঘৃণ্য ("revolting to the feelings of human nature") এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে এর কোনও বিধি ব্যবস্থা নেই। বরঞ্চ বিধবার পক্ষে সংসারে থেকে মিরাস্তুর ভাবে পবিত্র জীবন যাপন করার নির্দেশ আছে। ব্যাপক অঞ্চলে এ প্রথার কোনও চলন নেই। যেখানে আছে সেখানে এও দারুণ ঘোরতর ক্লেশসহ্য অকল্যাণ করা হয়ে থাকে যে বহু হিন্দু সে ব্যবস্থাকে বে-আইনী ও খলতায় পরিচয় বলে মত দিয়েছেন।

আইন পাশ হ'ল ১৮২৯ সালে, কিন্তু সতীদাহ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়নি। পরে ১৮৬২ সালে দণ্ডবিধি আইন (Indian Penal Code) পাশ হলে আত্ম-হত্যা, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা, এবং এই কাজে সহায়তা করার দণ্ড ভোগের বিধি হলে ক্রমে সতীদাহ বন্ধ হয়ে যায়। কুচৎ কদাচিত্ত স্বামীর সহিত সহমৃত্যু হওয়ার সংবাব পাওয়া যায়। আত্মহত্যা অপরাধ, কিন্তু সে কারণে আত্মহত্যা বন্ধ হয়নি; হওয়া সম্ভবও নয়। আজ কাল যদি কোথাও সতীদাহের সংবাদ পাওয়া যায়, সেখানে বুঝতে হবে বিধব বহু বাধা উত্তীর্ণ হয়ে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দান করছেন।

৪. বিধবা বিবাহ

হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় বিধবার বিবাহ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল। সাধারণ সংসারে, নিতান্ত বাতিক্রম না হ'লে, বিধবা নারীর স্থান অতি বেদনাদায়ক। মাজলিক কোনও কাজে তার স্থান নেই; আচার অনুষ্ঠানের তৈজস পূত্র স্পর্শ করা পর্যন্ত তার পক্ষে নিষিদ্ধ। পূজা উপচারে তার একটা স্থান আছে, কারণ তার ইহকাল পরকালের কল্যাণের জন্য এটা দরকার।

বিধবাকে পুড়িয়ে মারবার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই বৈধবা থেকেই সমাজের লোকে প্রমাণ পেয়ে যেত যে এই "আনাগী" (অভাগী) যখন স্বামীকে "খেয়েছে" তখন সে অতি "অপূয়া" অর্থাৎ সর্ব অমঙ্গলের হেতু। বৈধবায় সঙ্গে সঙ্গে

সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিয়ে মাথা প্রায় কেশহীন করে ছেটে দেওয়া হয়। পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে ধান (পাউ-হীন কাপড়) প্রদান বিবজ্জিত করে তাকে কুরূপা করে ফেলা হয়, যেন তার প্রতি কোনও পুরুষ আকৃষ্ট না হয়। নিরাময় ভোগন, দিবা রাত্রে মাত্র একবার, দেহের পুষ্টির ভোজ্য আশিষ পর্যায়ে তুলে দিয়ে একাদশীতেও বটেই বার তিথি পূজা, প্রভূত ব্যাপারে উপবাস ব্যবস্থা তার কপালের তিখন।

খাণ্ডাঠাকুরানীর ত বটেই সংসারের অপর নারীর নিকট তার পরিবারের একজন বলে তার কোনও স্থান থাকত না। সে সকলেরই যেন একটা কৃপার পাত্রী। জ্বালামের ধন সম্পত্তিতে অধিকার কম, নিত্যন্ত “জ্বা-ধন” আর না হয় অপূত্রক স্বামীর সম্পত্তিতে জীবিতকালীন অধিকার নিয়ে সংসারে জীবন ধারণ করতে হয়। কচিং নিজ ভরণ পোষণের মত সম্পত্তি থাকে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারের অপরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাক্ষিলা অপমান, নির্যাতনের বিনিময়ে এগুলি গ্রহণ করতে হয়।

অতি অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে বিধবা নারী সংসারে সম্মানের সহিত পালিতা হন। বিশেষত বুদ্ধিমতী সেবাপরায়ণা ও দেবসেবাদি কাজে অমুরক্তা এবং স্বাস্থ্যবতী জ্বালোক সম্মান সমাদর পেয়ে থাকে।

মাতৃভক্ত সন্তান থাকলে বিধবার জীবনে সুখ শান্তি লাভের সম্ভাবনা। কখনও বা ভাইদের বা

দেবর ভাস্করের সন্তানদের যুগ্মেব স্নেহ পালন করে মাতৃস্নেহ স্বাদ ও সুখ কপালে জুটে থাকে।

বালিকা থেকে বয়স্ক বিধবার হাল প্রায় একই। পোষাক পরিচ্ছদ, আহার, অনাহার প্রভৃতি সকল বিষয়ের “শঙ্কায়” ব্যস্থা প্রায় একই রকম। যে বালিকা বিবাহের কিছুই জানে না, বয়স প্রাপ্ত হলে আশে-পাশে যখন বিবাহ সম্পন্ন হয়, তখন তার অংশা অত্যন্ত করুণ সে কথা লিখে বোঝাবার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

তার ওপর আছে ভোগের ক্রম। বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গেই নারীর সমস্ত কামনা বাসনা নিষ্পিত হয়ে যায় না। মানুষের আদিম ক্ষুধা সকল সংযমের বঁধ ভেঙ্গে বাইরে ঠলে আসে। অধিকাংশ বিধবা পাবিত্র জীবন যাপন করে বলে ধরে নেওয়া যাক, কিন্তু ভ্রষ্টাচারের সংবাদ ও মাথাচাড়া দিয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জাতিনাশ ও সমাজ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা। এই ভাবে কত নারীর জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে, তার প্রকাশ্য হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়।

পরনির্ভর জীবন, সাধারণ আহার বিহার, বাসনা কামনা রুদ্ধ অবস্থায় মানুষ শক্তির অধিকারী হয়েও জীবনের স্বপ্নে পরাভূত হতে হচ্ছে, অপবাদ হিম্মতের মত বোঝা হয়ে চেপে বসছে; সমস্ত সদ্‌বৃত্তি সমস্ত স্বাভাবিক শক্তিকে নিষ্পেষ্ট করে দিচ্ছে।

এ বিবরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। লোকাচার মতে নারীর চিরেই ধর্ম্যতার ধর্ম্যচরণের ক্ষেত্র এবং অক্ষয় স্বর্গ লাভের সোপান বলে প্রচার করতে করতে

বিধবার বিবাহ একেবারে পাপের পাহাড় করে তুলে ধরেছে। শাস্ত্রে শুধু বিধবা বিবাহের গিঁথি আছে। যখন শাস্ত্রের দোহাটি পেড়ে বিধবা বিবাহ সমাজ সিক্ত করার চেষ্টা হয় তখন “শাস্ত্রের মহাপণ্ডিতের দল” সর্ববিশুদ্ধ দিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন।

বিষের প্রতিষেধক আর একটা বিষ। এই শাস্ত্রের আপত্তি খণ্ডন করার জন্য বিজ্ঞানসাগর মহাশয়কে দরকার হয়েছিল। তিনি দেখিয়ে দিলেন অজ্ঞানতার ফলস্বরূপ বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলে চলে এসেছে। আর বাধা সৃষ্টি করেছেন সব পুরুষ যার মধ্যে নিজেরা হয়ত ৬০।৭০ বা তার চেয়ে বেশী বয়সে পঞ্চম বর্ষ বা আরও অধিক সংখ্যক অশ্রাব্য বয়স্ক কুমারীর পাণি গ্রহণে “পুন্য়াম মরক” হতে ত্রাণ পেতে আগ্রহীল।

তুপকের, বাকু ও মসী যুদ্ধ চলতে লাগল। সংস্কারকের দল গভর্নমেন্টকে অমুরোধ জ্ঞাপন করলেন বিধবা বিবাহ আইন সিক্ত করা হুকু।

প্রতিপক্ষ যুক্তি দেখিয়ে আপত্তি জানাল। সমসাময়িক কালের পত্র পত্রিকা নানা মত প্রকাশ করেছে, কতগুলি অতি কুরুচিভরা।

সকল দিক বিচার বিবেচনা করে গভর্নমেন্ট বিধবা বিবাহ আইন সম্মত বলে ১৮৫৬ সালের জুলাই ২৫-এ পনেরো সংখ্যক আইন (Act XV of 1856) পাশ করল। এর যুক্তিতে বলা হ'ল হিন্দু বিধবাদের পক্ষে দ্বিতীয় পুত্রগ্রহণে বাধা থাকায় তাদের সন্তানাদি অবৈধ বলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বঞ্চিত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, সামাজিক রীতি এই বিবাহের বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র মতে এই রূপ বিবাহে পোনও বাধা নিষেধ নেই। একেজেরে যারা নিজ নিজ বিবেক মতে একরূপ বিবাহ করতে চায় তার প্রতি আইন বাধা বলে পরিগণিত হ'য়ে না। অর্থাৎ তাদের সন্তান সন্ততি পিতামাতার সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হ'বে না। এ ব্যবস্থার সমর্থনে বলা যায় যে এ বিধবার বিবাহে সমাজে (বিধবাঘটিত) দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সমাজের কল্যাণ সাধিত হ'বে।

এখানে আব একটি বিষয়ের সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণতঃ অষ্টম নবম বর্ষে কন্যাকে পাত্রস্থ করা হ'ত। এ বয়সের পূর্বেও যে বিবাহ হ'ত না, তা নয়। আরও বেদনার কথা যেখানে বালিকা কন্যা বাগদত্তা হবার পর পাত্রের মৃত্যু ঘটেছে। গোঁড়ো হিন্দুরা রূপ কন্যাকে “বিধবা” পর্যায়ে ফেলে “কু-কণা” বলে আর বিবাহ দিত না। এই আইনে সে বিষয় (“By the reason of the woman having been previously betrothed to another person who was dead at the time of her marriage”) বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়েছিল। আইন প্রণয়নকালে এ কথা মনে হওয়া অযৌক্তিক নয় যে “ধর্ম্মধারীরা” যে কটা বাগদত্তা কুমারীর বিবাহে বাধা দিতে পারবে তারা স্বর্গের সে কটা খাপ এগিয়ে যাবে।

বিধবা বিবাহ আইন মতে সামাজিক রীতি বলে

পরিগণিত হলেও সাধারণের মধ্যে খুব ব্যাপক ভাবে গৃহীত হয়নি। বাৎসরিক মোট বিবাহ সংখ্যার মধ্যে, হাজারটিকে একটি স্থান যে বছর ছিল না, সে কথা মেনে নিতে হয়। রক্ত পথ উন্মুক্ত হল। যোগাযোগ করতে পারলে বিবাহ ব্যাপারে যে সকল বাধা দেখা দিত, পাত্র পাত্রীর অভিভাবকরা যে ভাবে নির্যাতিত হতেন, জাতিচ্যুত বা পাড়ায় “একঘরে” হয়ে বাস করা, কুৎসা বিক্ষিপের হাত হতে রক্ষা পেলেন; সম্মান সম্মতি পিতা মাতার সম্পত্তিতে অধিকারী হওয়ায় সাধারণ সম্মানিত নাগরিক বলে স্বাধীন জীবন যাপন করার সুযোগ হল। তথাপি আইন পাশ হওয়ার পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ব্যবস্থাটাই ঠিক “সাধারণ” হয়ে উঠতে পারে নি। পরবর্তীকালে সকল জাতির মধ্যে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন পাশ হওয়ায় বিধবা বিবাহ প্রায় সাধারণ সামাজিক বিবাহ সংস্কারের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

৫. বয়োপ্রাপ্তি নির্ণায়ক আইন

হিন্দু শাস্ত্র মতে বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী স্বামীর নিত্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়েছে এবং সহবাস সম্পর্কে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলেও আইন একেবারে অসহায় বলে মত গৃহীত হয়েছে। এই সামাজিক প্রথা বলে কত বালিকা বধূর প্রাণ নাশ পর্যন্ত ঘটেছে। এ প্রথাটির ঘটনা সংকোচের অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে। কখনও

জানাজানি হলে স্বামীর আত্মীয়রা সব ব্যাপার ঢাকা দিয়েছে। কচিং কখনও বস্ত্রের আত্মীয়রা ঘটনাটাকে “হত্যা” পর্যায়ে ফেলে পুলিশ সাহায্যে গণ্ডাগাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে। “দাম্পত্য” ব্যাপারে স্বামীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করার বাধা বর্তমান।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে এক দশম বর্ষীয়া বালিকার সহবাস জনিত রক্তস্রাবে মৃত্যু ঘটে। প্রচণ্ড হৈ চৈ পড়ে গেল, কিন্তু “স্বামী” কে দণ্ডনীয় বলা গেল না। তখন সারা ভারতের চিন্তাশীল শিক্ত সম্প্রদায় আইনের সাহায্য গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন।

দশ বছরের অধিক বয়স্ক সত্ত্বেও যে আইন প্রচলিত ছিল, সেটা ১৮৯১ সালের ২৯ মার্চ গৃহীত (Act X of 1891) আইনে বারো করে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (Indian Penal Code-র ৩৭৫ (বলাৎকার) ধারা সংস্কার সাধন করা হয়। দশ বৎসর বয়সটা বাড়িয়ে বারো করা হ'ল। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়: “The limit at which the age of consent is now fixed (i. e. ten years) favours the premature consummation by adult husbands of marriage with children who have not reached the age of puberty, and is thus, in the unanimous opinion of medical authorities, productive of grievous

suffering and permanent injury to child wives and of physical deterioration in the community in which they belong."

পূর্ণতা লাভ করার পূর্বে বালিকা বধূর উপর প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী কর্তৃক সহবাস, চিকিৎসকদিগের সর্বসম্মতিক্রমে মতে অত্যন্ত হানিকর এবং বেদনাদায়ক। অতএব বয়সটা দশ থেকে ছাদশ করা সমীচীন মনে হয়েছিল।

[১৯২৫ সালের ২৯ সংখ্যক আইনে

বালিকা বধূর বয়স বারো থেকে চৌদ্দ করা হয়েছিল]।

এ সকল ব্যাপারে আইন যে খুব বেশী সহায়তা করতে পারে তা মনে হয় না। তবে একটা আভ্যুত্থানে দুর্ঘটনার সংখ্যা যে হ্রাস পায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ আইনকে শক্তি দান করার পক্ষে কত্বে বিবাহ বয়স বৃদ্ধি করার ফলে যে ১৮৯১ সালের দশ সংখ্যক আইনের অপরাধ পুঞ্জীভূত মানবজাতির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জয়ন্তী প্রকাশনের কল্লেক্টিভ বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ

১ম খণ্ড ৯.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০

ও ৩য় খণ্ড ১৩.৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়

সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০

সুভাষচন্দ্র ও জ্ঞানদাস প্লানিং

শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬.০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

Paper back 4/- Board 5/-

ঐ মহামানব আসে : চারদিক

৬.০০

NETAJI THROUGH
GERMAN LENS

Nanda Mookerjee

১২.৫০

রামমোহন

সুজাতি দাশগুপ্ত

৪.০০

সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ

অনিল রায়

৪.০০/৬.০০

বাংলাদেশের বিপ্লব

সুনীল দাস

১.২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অনিল রায়

২.০০

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, লিকাতা-২৬

ভারতের জাতীয়তা ও সুভাষচন্দ্র

ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

সুভাষচন্দ্র জাতীয়তার বিষয়ে যেমন কমুনিষ্ট ধ্যানধারণা গ্রহণ করেননি, তেমনি ফ্যাসীবাদের উগ্র জাতীয়তাকে পর্জন করেছেন। বলেছেন, “আমি যখন মুক্তি সংগ্রাম লিখছিলাম তখন ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে লিপ্ত হয়নি এবং মনে হ’য়েছিল তা একপ্রকার প্রবল জাতীয়তাবাদ।” (I. S. P 393) আবার টোকিও ভাষণে বলেছেন, “.....তা (অর্থাৎ ফ্যাসীবাদ) ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে সক্ষম হয়নি।” ঐ ভাষণের অন্তত বলেন, কমুনিজম যেখানে দুর্বল তা হচ্ছে—কমুনিজম জাতীয় প্রবণতার কোন মূল্য দেয় না। আমরা ভাবতবর্ষে চাই একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি যা সমগ্র জনতার সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে এবং যার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়; জার্মানিতে জাশফাল সোস্যালিস্টরা যে জিনিষটি অর্জন করতে পারেনি। ...ভারতবর্ষ.....রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক

বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবে।^১ সুভাষচন্দ্র ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছেন, “প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেইদেশের ইতিহাসের দ্বারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে।....আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমি অশ্রু দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।”...আমরা পূর্বেই দেখেছি সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকও যুক্ত হয়ে তা ভারতবর্ষের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অঞ্চল প্রতীক হ’য়ে দাঁড়িয়েছে। Hans Kohn বলেছেন, বর্তমান যুগে জাতি-রাষ্ট্রই আদর্শ সংগঠন বলে বিবেচিত হ’চ্ছে। ব্যক্তির ও জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, তার আর্থিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে জাতি-

(১) দ্রঃ ‘The next remarkable contribution of the culture and civilization of the world, India will be called upon to make, P 372 I. S.

রাষ্ট্রের গঠনে।...জাতিরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে...অর্থনৈতিক দিকটি আধুনিক সংযোজন।

(H. K. P 16-18)

যাই হ'ক জার্মানীর গ্রাশফাল সোস্যালিজমের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তার ধ্যানধারণার বিপুল পার্থক্য সুস্পষ্ট। জার্মানীর আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—জাতীয়তা সম্পর্কে পশ্চিমী পণ্ডিতদের মনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তাঁদের অনেকে সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে ফ্যাসীবাদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। Sources of Indian Tradition নামক একটি সংকলন গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, “তাঁর মৃত্যুতে এবং বিশ্বে ফ্যাসীবাদের পরাজয়ে ভারতবর্ষে গ্রাশফাল সোস্যালিজম সম্পর্কে এই স্বল্পকালীন আগ্রহের হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটে।” (T. D. B—p 889) ঐতিহাসিক তথ্যে এরূপ অসাধু মন্তব্যের সমাপ্তি ঘটুক। আশা ক’রব পশ্চিমী পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সত্য ইতিহাস যাচাই ক’রে যুদ্ধকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব বর্জন করবেন এবং তাঁদের তথাগত অতীত ভুল সংশোধন ক’রে ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন।

সুভাষচন্দ্র পুণায় অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সভায় (3-5-28) জাতীয়তাবাদের উপর আক্রমণের জবাব দিয়ে বলেছেন, “একাধিক দিক থেকে জাতীয়তাবাদের উপর যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে

আমি সে সম্পর্কে আমার দেশবাসীদের এবং যুবক বন্ধুদের সতর্ক ক’রে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়তা বাদকে কখনো কখনো সন্দেহ, স্বার্থসন্ধ এবং আক্রমণাত্মক ব’লে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিকতার ক্রমোন্নতির পথে বাধা-স্বরূপ বলেও মনে করা হচ্ছে। এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলতে চাই যে ভারতের জাতীয়তাবাদ সন্দেহ, স্বার্থপর বা আগ্রাসী নয়। তাঁ মানবজাতির সর্বোচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এই আদর্শ হ’ল— সত্য, শিব, সুন্দর। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ আমাদের জীবনে সত্যবাদিতা, সাধুতা, পৌরুষ এবং ত্যাগ ও সেবার আদর্শ জাগ্রত করে। ততোধিক জাতীয়তাবাদ আমাদের জনজীবনে স্বপ্ননশীল প্রতিভা জাগ্রত করেছে; যা বহুশতাব্দী ধরে স্তব্ধ ছিল; এর ফলে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করছি।

“জাতীয়তাবাদের উ’র আর এক আক্রমণ আসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই আক্রমণ শুধু অবিবেচনা প্রসূত নয় তা অজ্ঞাতসারে আমাদের বিদেশী শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষা করে। সাধারণ মানুষের কাছে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে আমরা সমাজবাদী বা অথবা যে কোন নূতন ভিত্তিতে ভারতের সমাজ সংগঠন করতে সচেষ্ট হইনা কেন, আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজে গড়ার অধিকার অর্জন করতে হবে। যতদিন ভারতবর্ষ বুটেনের

(১) প্রচারিত সংবাদ লেখ্যে ভারতবর্ষের জনতা সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন না।

পদতলে থাকবে ততদিন আমরা সে অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবো।” (Selected Speeches : Publication Divn p32-33)

স্মৃতিচিহ্ন মতের অনুসরণে বলা চলে বিশ্বে সমন্বয়ী আন্তর্জাতিকতায় উদ্ভবণে ভারতীয় জাতীয়তা পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করবে। স্মৃতিচিহ্ন এ প্রত্যাশার রূপায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ভারতবাসীর উপর-যারা বিশ্বাস করেন বিশ্বে ভারতকে তার বিশিষ্ট সভ্যতার অবদান রাখতে হবে।

কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে সূর্য জাতীয়তার সংগঠনে আমরা বর্তমানের ভারতবাসী—যদি যুগের দাবীর ও অতীত আদর্শের সমন্বয় হ’তে অক্ষম হই, তা হ’লে ভবিষ্যত বংশধরেরা আমাদের ক্ষমা করবেন না। ভারতে জাতীয়তার যে শক্তিশালী সাংগঠনিক উপাদানগুলি রয়েছে—তা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাকামী নানা শক্তির বিযুক্ত অভ্যুদয়কে রোধ করতে সক্ষম না হ’লে ভারতবর্ষে মহান জাতীয়তার সংগঠন ব্যাহত হবে। ভারতবর্ষে নানা সামাজিক ঐশ্বর্য ও বিশেষ করে ভাষা সংক্রান্ত বিভেদের সুযোগ নিয়ে নানা শক্তি আমাদের সংহত জাতীয়তার ভাবনায় আঘাত করেছে। এদের স্বরূপ উপলব্ধি করে রে গ নিরাময়ের জন্ত তৎপর হওয়া আমাদের আশু জাতীয় কর্তব্য।

ভাষা, আঞ্চলিকতা ও সামাজিকতা বৈষম্য

ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা একদিন শিক্ষা, ভাব ও সাংস্কৃতিক সংহতির বাহন ছিল। এই

ভাষাতেই শাস্ত্র, গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। আজও ভারতবর্ষে অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্ত আন্দোলন তুলেছেন। আসমুদ্র হিমালয় এ ভাষার প্রতি ভারতবাসীর এক বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে এবং ভারতের সমস্ত ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্যীয়। উত্তর ভারতের ভাষাগুলি সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশ থেকে ক্রমশঃ নিজেদের উন্নতি ঘটিয়েছে। জাতীয় সংহতিতে সে ভাষার অবদানকে কি ভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে গভীর মনন ও পর্যালোচনার অভাব রয়েছে এবং সরকারী পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ অনীহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধার প্রাচীর তুলেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে রূপাভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী ভাষার কথা বলা হয়েছে যা হিন্দী-উর্দু মিশ্রিত এক ভাষা। অমিশ্র হিন্দী ভাষাভাষীর জনসমষ্টি ভারতের বিপুল জনসমষ্টির একটি অংশমাত্র (অর্ধেকের কম)। দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলাভাষী জনসংখ্যা এর থেকে নূন ছিল না। উপরন্তু প্রাদেশিক ভাষা সমূহ অনেক উন্নত এবং জনশিক্ষার বাহন হিসাবে এদের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। স্বাধীনতার পর যথেষ্ট বিবেচনার অবকাশ না দিয়ে অজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়কে পাশে সরিয়ে রেখে অর্থপূর্ণ দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় ভাষার নির্দেশ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রাদেশিক অঞ্চলের জনপণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোষ্ঠীগত বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। ভবিষ্যতে হিন্দীভাষাকে আন্তঃরাজ্য

সম্পর্কের বিষয়ে একটি সুস্থ, সহজগ্রাহ্য ভাষা হিসাবে গড়ে তোলা যাবে কিনা সে সম্পর্ক সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় নীতি একটি গোষ্ঠীগত মর্যাদার বিশেষ মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করার ফলে একপ্রকার সংহতি রোধক মনোভাবের লক্ষণও উকি দিয়েছে। কেন্দ্র যদি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মানসিকতার বাহন হয়ে দাঁড়ায়, আত্ম নয় কাল তা জাতির সংহতির পক্ষে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। ভাষা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার নিদর্শন দেওয়া হয় কিন্তু বুঝতে হ'বে রুশভাষা সেখানে অধিকাংশ জনসমষ্টির ভাষা। প্রান্তিকভাষাগুলিকে জারের আমলে উচ্ছেদের সর্বনাশা প্রচেষ্টা চলছিল—তা বন্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের সমস্তা জটিলতর, এখানে কোন ভাষাই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা নয় এবং রাজ্যের ভাষাগুলিও বিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী ও শক্তিশালী।

বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে পৃথিবীতে অনেক জাতি তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে আবার একই ভাষাভাষী জনগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি। বর্তমান বিশ্বে ভাষার ভিন্নতাকে কোনো দেশের জাতীয় সত্তার অন্তরায় হিসাবে দেখলে চলবে না যেখানে জাতিসত্তার অস্বাভাবিক উপাদানগুলি প্রবল এবং জাতি গঠনের স্বপক্ষে।

ভাষার বিষয়ে সুইজারল্যান্ডের উদাহরণ সকলে যথার্থ কারণেই দিয়ে থাকেন। সুইসজাতির চারটি ভাষার মধ্যে প্রধান তিনটি হ'ল ফরাসী, জার্মান

ও ইটালীয়। এ সব ভাষা ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালীতে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে এবং ভাষাগুলির আন্তর্জাতিক মর্যাদা রয়েছে। তবুও এই সব শক্তিশালী ভাষা-ভাষীর জনগণ একটি জাতিতে পরিণত হ'বার দৃঢ় মানসিকতা গড়ে তুলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্বীর টানাপোড়েনের মধ্যেও নিজেদের সুইসজাতি-স্বাক্ষকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এর কারণ হিসাবে Hans Kohn বলেছেন, “সুইজারল্যান্ডের যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোই যে এর একমাত্র কারণ তা নয়, সর্বোপরি রয়েছে সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতা, সংযত আচরণ আর সদিচ্ছা।” (p-115—Nationalism & Liberty) সুইস মানসিকতার আর একটি নিদর্শন রয়েছে Romansch ভাষার প্রতিষ্ঠায়। এই ভাষা জাতির শতকরা একভাগ লোকের ভাষা। অল্পসংখ্যক পার্বত্য উপত্যকায় এই Romansch ভাষী সম্প্রদায়ের কোন সংগঠিত ভাষা ছিল না। “উনবিংশ শতাব্দীতে মনে হয়েছিল এ ভাষা বুঝিবা লুপ্ত হ'য়ে গেল কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এ ভাষা তার সজীবতা ফিরে পেল...। ভাষাগত জাতিসত্তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ এক আকর্ষণীয় উদাহরণ এবং তা সুইসজাতির দূর-দৃষ্টির পরিচয় বহন করে।” (এ p-117) জাতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করে ১৯৩৮ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী জার্মান, ফরাসী, ইটালীয় ভাষার সঙ্গে Romanch ভাষাকেও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দান করা হয়।

ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির জন্য আঞ্চলিক

ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিতে হবে। ভারতের প্রতিটি প্রাদেশিক জনসমষ্টি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আবার প্রতিটি প্রদেশ তাদের ভাষা ও বিশিষ্ট সংস্কৃতির অবদানে মহাভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পূর্ণতায় সাহায্য করেছে এবং সমস্ত প্রাদেশিক সন্থা ভারতসন্থায় উদ্ভীর্ণ হয়েছে। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে স্বভাষচন্দ্র প্রতিটি প্রদেশকে তাদের সাংস্কৃতিক সন্থা পূর্ণতর করে তোলার জন্য ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দানের কথা বলেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এই স্বাধীনতা ভারতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলে মনে হ'তে পারে কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেছেন, “জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ভাষা ও একটি সাধারণ লিপির প্রবর্তন করতে হবে।”

“ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে আরও নৈকট্যের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং একটি সাধারণ শিক্ষানীতির মাধ্যমে সমগ্র জনতার মধ্যে এক ঐক্যচেতনা জাগ্রত করতে হবে।

“রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আমি ভাবতে ইচ্ছা করি, হিন্দী ও উর্দু মध्ये পার্থক্য কৃত্রিম। এই দুটি ভাষার মিশ্রণে একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্রভাষা গড়ে উঠবে...এই সাধারণ ভাষা নাগরী বা উর্দু যেকোনো লিপিতেই লেখা যেতে পারে।”

লিপির বিষয়ে এই ভাষণের মধ্যেই তাঁর মত ব্যক্ত ক'রে বলেছেন, “সম্ভবতঃ আমাদের দেশের অনেকে রোমান লিপি গ্রহণের বিষয় শুনে ভীতি-

বিহ্বল হবেন কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদেরকে এই সমস্যাটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো।...আমি স্বীকার করি এক সময়ে আমি একটি বিদেশী লিপি গ্রহণকে জাতীয়তা-বিরোধী ব'লে ভাবতাম কিন্তু ১৯৩৪ সালে তুরস্ক ভ্রমণের পর আমার মত পরিবর্তিত হয়। আমি বুঝলাম পৃথিবীর অসংখ্য অংশের সমতুল একটি সাধারণ লিপি প্রবর্তনে কত সুবিধা রয়েছে।..... ভারত শতকরা নব্বই জনেরই অক্ষরজ্ঞান নাই, তারা কোনো লিপির সঙ্গেই পরিচিত নয়।...সেজন্য কোন লিপি আমরা প্রবর্তন করি সে বিষয়ে তাদের উদ্বেগ নাই।—উপরন্তু রোমানলিপি একটি ইউরোপীয় ভাষা শিখতেও সাহায্য করবে।”

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রশাসনে জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছিল যার মধ্যে ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও অসংখ্য শিক্ষা দেওয়া হ'তো। প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত রোমানলিপিতে হিন্দুস্তানী ভাষায় সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়েছে (জঃ P-309, A. C. C.)। ১] ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভাষাশৃঙ্খলার উৎস একটি প্রাচীন ভাষা হওয়ায় অস্বাভাবিক সেগুলি বোধগম্য হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু লিপির স্বাভাবিক আঞ্চলিক ভাষা সমূহে প্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কোনও একটি সাধারণ লিপির মাধ্যমে সে কাজ সহজতর হ'য়ে জাতীয়

(১) A.C.C.—India's Struggle for Freedom by Major Genl. A. C. Chatterji

সংহতিতে সাহায্য করতে পারে। সুভাষচন্দ্র ভাষার গঠনে একটি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মননের ভিত্তি রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের ভিতরে তা গড়ে তোলার সুযোগ ঘটেনি।

ভাষার ব্যাপারে গোঁড়া মনোভাব ভারতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। তাছাড়া এর সুযোগে ভাষাভিত্তিক জাতিতত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করে সুযোগসন্ধানীরা জাতীয় সংহতিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে। জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে বিবেচনামূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যে এর সমাধান খুঁজতে হবে এবং সে পথে সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাবোধ বর্জন করতে হবে। একদিন ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিপুল অবয়বের একটি ভাষাই ছিল এবং লিপির স্বাভাব্য সহযোগে বর্তমানে ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে গভীর পারস্পরিকতা রয়েছে সে কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও দূরে থাকতে পারে না। আর বিশাল ভারতের ঐক্যের প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভাষাসমস্যা সমাধান খুঁজতে হবে। জোর দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে। জাতি গঠনের আলোচিত উপাদানগুলির গুরুত্ব, ভারতীয় ভাষা ও ইতিহাসের বিষয় এবং বর্তমান বিশ্বে ভাষাবিশয়ে জাতীয়তার পরীক্ষানিরীক্ষার কথা বিবেচনা করলে ভারতের জাতীয়তায় ভাষাসমস্যা দুর্বলত্ব হবে না। জাতীয় ইচ্ছা, সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা এবং ইতিহাস চতনার জাগৃতির মধ্যে সে সমাধানের চাবিকাঠি

নিহিত রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের মত সর্বভারতীয় আশা ও চেতনার ত্রুটিভর ভারত পুরুষের স্বর্ণপরশ পেলে জাতির সর্বজনীন জাগৃতির মহাযজ্ঞের আগোড়নের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সমস্যার সমাধান ঘটাতো। চাকুরীনীতির বৈষম্য ও হিন্দীভাষার চাপের ভীতি থাকলে ভাষাসমস্যা জটিলতর হয়ে যাবে। আর একদল নির্বোধ আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীস্বার্থের বিষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ফিণ্ড করে ভাষাদাঙ্গার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপার নিয়ে জাতীয় সংহতিতে অঘাতের কারণ নাই। জাতীয় ইতিহাস ও ইতিহাসের শিক্ষা ও সামাজিক রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নীতির প্রবর্তন, রাষ্ট্রীয় শুভ-শক্তির সবল প্রতিষ্ঠা জাতীয় সমতার পূর্ণরূপায়ণের অন্ততম সর্ত। রাষ্ট্রীয় শক্তির সমাগ দৃষ্টি, সঙ্গতা, জায়বিচারে কঠোরতা থাকলে ভাষাদাঙ্গার মত জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক ঘটনার অবতারণা সম্ভব হবে না।

কিছুদিন আগে ভাষাসম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে একজন বিশিষ্ট সুভাষাবাদী-চিন্তাবিদ এক শিথিল ভাষণের মধ্যে বলেন, “...পরিস্থিতির গুরুত্ব এই অবিসংবাদী সিদ্ধান্তে পৌছে দেয় যে ভাষাগত প্রদেশবিভাগ শুধু যে জাতীয় নেতৃত্বের অগ্রাধিকারের প্রশ্নে বিচারশক্তির শোচনীয় অভাব সূচিত করে তাই নয়, তা দেশের ঐক্য ও কতি-সাধন করেছে...।...ভাষাগত বিভাগের পরিবর্তে প্রশাসনগত বিভাগের উপর জোর দেওয়া উচিত ;

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত জীবনধারায় ভাষাকে নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত স্থান দিতে হবে।”^১

ভাষা জাতি সত্তার সংগঠনে সাহায্য করলেও তা জাতি গঠনের মুখ্য উপাদান নয়। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, “.....আমি বিশ্বাস করি বিদেশী শক্তির অপসারণের পর সর্বোপরি একটি জাতিতে সম্ভব হবার ও সম্ভব হওয়ার ইচ্ছা চাই।.....একোয় সমস্তা একটি মানসিক বিষয়। সাধারণ মানুষের ভিতর শিক্ষা ও আচরণের মাধ্যমে এক জাতিত্বের বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ খাদ্য প্রভৃতি একো সহায়তা করে কিন্তু তা একা সৃষ্টি করতে পারে না।” (P-54—Crossroads)

সমাজের মধ্যে সামাজিক বিভেদ, বর্ণভেদ প্রথ, সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং আর্থিক বৈষম্যও ভারতের জাতীয়তার পক্ষে বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে কাজ করবে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আর্থিকভাবে অনুন্নত শ্রেণীকে অধিকতর আর্থিক সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু সামাজিক বিভেদগুলির সমাধান শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে করা যাবে না। এর জন্য ব্যাপক শিক্ষার সুযোগদান ও ম্যায়নীতির উদার মানসিকতা সৃষ্টির জাতীয় আলোড়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জনতার স্বার্থ থাকবে দেশগঠকদের অন্তরে এবং এর প্রকাশই হবে আর্থিক সামাজিক ব্যবধান দূর করা, দেশের মানুষকে সংস্কৃতি, ইতিহাস

ও ঐতিহ্য সচেতন করা যার মধ্য দিয়ে জাতীয়তার মূল হবে সুদৃঢ়, জাতীয়তা হবে গণ-ইচ্ছার সংহত রূপ এবং তখনই তা স্বীয় উদ্দেশ্যে উত্তীর্ণ হ’তে পারবে।

উপসংহার

ভারত পৃথিবীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি জীবন্ত সত্তা। ভারতীয় সত্তায় অনুসিক্ত ব’লেই তার ‘ব্যক্তিস্বরূপ’কে আশ্রয় ক’রে দেশের ‘আত্মস্বরূপ’ গড়ে ওঠার বনিয়াদ রচিত হয়েছে এবং বিশ্ব কবি তাই চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের অনন্ত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত সমন্বয়ী সত্তাকে সুভাষচন্দ্র কিভাবে দেখেছেন এবং গ্রহণ করেছেন তা আমরা আলোচনা করেছি। তিনি সেই ভারত আত্মার প্রতীক যে ভারতের অবস্থিতি বিশ্বমানবতার পূর্ণতায় বিশেষ অবদানের প্রতিশ্রুতি বহন করে। তাই তিনি বলেছেন, “...ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগতকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়৷ বাঁচিয়া আছে।” অতীত বলেছেন, “অবর্ণনীয় দুঃখবেদনা ও অগণিত বিরোধ সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার কারণ তাহার একটি বিশিষ্ট সাধনা আছে। জগৎকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেই বাঁচাইতে হইবে।” একে রূপায়িত করার জন্য প্রথমে চাই স্বাধীনতা ও পরে জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ গঠন। সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রনৈতিক যুক্তি আন্দোলনে

(১) From a paper read by Sri Sunil Das in a Linguistic Seminar held in Calcutta. (unpublished)

অবতীর্ণ হ'য়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আঃ হিন্দ সরকারের অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত ক'রে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর ভিতরে বিপুল ফাটল ধরিয়ে দেন—যাঁর ফলে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন স্রাবিত হ'য়ে ওঠে। জাতীয়তার ভিত্তিতে সমাজবাদী রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর কাছে উপস্থাপিত করেছেন। সাম্য-ভিত্তিক অথগু জাতীয়তায় উত্তরণে সুভাষ-নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান আদর্শ রেখেছে। অতীত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি ক'রে দেশে অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা সুভাষচন্দ্রের আশু লক্ষ্য। ভারতের জাতীয়তাকে তিনি অথগু সাম্য ও ভারতীয় ঐতিহ্যে মণ্ডিত এক আদর্শনৈতিক সম্বোধনাবে গড়ে তুলেছেন—যা পৃথিবীর কাছে নূতন সাম্য ও সংস্কৃতির অবদান রাখবে। ভারতবাসীকে সেই আদর্শ রূপায়ণের দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। ভারতবর্ষ হ'বে নূতন জাতীয়তাবাদের গীঠভূমি—যে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হ'য়ে নূতন মূল্যবোধে অমুসক্ত অথগু স্বাধীন বিশ্বরচনায় পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

[সমাপ্ত]

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্ম

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সন্ডাক ১২'০০। বাৎসরিক ৬'০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্ম স্বামী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্ম

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের স্বযোগ সর্বাপেক্ষে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠার লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পরিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।
৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-বোগিতার জন্ম আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স পোলাক মহাস্থান রোড
কলিকাতা-২৬

কীর্তন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত কী !

হরিদাস কর

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রেণী বলিতে ঋপদ, ধামার টপ্পা ও ঠুংরী প্রভৃতি প্রচলিত গীত সমূহকে বুঝায়। এই সব সঙ্গীতের সহিত রূপগত ও রীতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও কীর্তন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সহিত সম্পর্ক রহিত নহে। কারণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে কীর্তনগীত অস্বাভাবিক সঙ্গীত রূপগুলির সহিত আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অনন্যতা অর্জন করিয়াছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ও কীর্তন সঙ্গীতের মূল উপাদানগুলির মধ্যে বৈষম্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

যাবতীয় সঙ্গীতের শ্রেণীগত বিচারে মূল উপাদান সুর ও তাল। এই দুই উপাদানের আশ্রয়ে বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতি ও বিচিত্র সমন্বয় দ্বারা গঠিত বহুবিধ সঙ্গীতের প্রকাশভঙ্গিকে গায়করীতি বলা হয়। কীর্তনের প্রবর্তনকালে মূলতঃ ইহা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গায়নরীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল বলা হয়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত না হইয়াও বলা যায় যে এতদ্ উভয়ের মধ্যে বর্তমানেও সামঞ্জস্য অনেকাংশেই অক্ষুর আছে। এবং তাহা অনস্বীকার্য।

উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঋপদ যেই সময় বিশেষভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে

থাকে, প্রায় সেই সময়েই বাংলাদেশে কীর্তন-সঙ্গীতের প্রবর্তন হয় এবং ইহার প্রবর্তক শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় তৎকালের অভিজ্ঞ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান কীর্তনসঙ্গীতের গায়নরীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ ঋপদের দ্বারা অবলম্বনে কীর্তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।

ঋপদ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও যে সকল প্রাচীন প্রবন্ধ সঙ্গীত হইতে ঋপদ গানের উৎপত্তি কীর্তনের সঙ্গীতিক ভিত্তিও তাহার উপরেই রচিত হইয়াছিল, এই কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

প্রাক চৈতন্য যুগে শ্রীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত ‘শ্রীগীতগোবিন্দ’ গ্রন্থখানিতে তৎকালীন দেশী রাগ ও তালে গীত কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ সঙ্গীত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। রাগ—মালব, বসন্ত, গুজ্জরী, রাসকিরী, কণ্ঠাটি প্রভৃতি, তাল—রূপক, জ্যোতি, একতালী, অষ্টতাল ইত্যাদি।

চণ্ডীদাস রচিত বলিয়া খ্যাত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে একত্রিক, দণ্ডক ও লগ্নক প্রভৃতি দেশী প্রবন্ধ সঙ্গীতে তৎসম্পর্কিত বড়ারী, গুজ্জরী, কেদার, মল্লার, ললিত, বসন্ত, কণ্ঠাটি, বেলাবলী, সিদ্ধুরী, পঠমঞ্জরী

রাগ। যতি, রূপ একতালী ইত্যাদি তালসমূহের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। অতএব এই কথা বলা অযৌক্তিক হইবে না যে প্রাক্ চৈতন্য কীৰ্ত্তনের পঞ্চদশর্কগণ প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে অম্লসরণ করিয়াই তাহাদের অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা পরবর্ত্তিকালে ত্রীল ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রবর্ত্তিত কীৰ্ত্তনে পরিণতি লাভ করে।

সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে এমন অনেক রাগ ও তালের নাম পাওয়া যায়, যাহা বর্ত্তমান প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ ও তালের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যতা দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে কীৰ্ত্তনগীতের প্রয়োগ ব্যাপারেও অনেক রূপান্তর, নামান্তর, অপ্রচলন, বিলুপ্তি ও বিচ্যুতি যে ঘাটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচলিত রাগের মধ্যে ভৈরব, ভৈরবী, দেশ, ধাম্বাজ, পিলু, জয়জয়ন্তী, গৌরী, বেহাগ, রাগ পঞ্চম, বসন্ত, বিভাষ, ভোমপলজী, সিন্ধু, কাফী, কেদার, মল্লার ইত্যাদি বহু রাগসমূহের একক বা মিশ্র ব্যবহার কীৰ্ত্তনে দেখিতে পাই।

কীৰ্ত্তন গানের তাল সমূহের অনেক তালেরই মাত্রা ও বিভাগগত সামঞ্জস্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে রহিয়াছে। যথা—লোকা, ও দাদরা তালের মাত্রা ও বিভাগ একই প্রকার। দোঠকী ও দীপচন্দী তালের গঠন অম্লরূপ। দাঁশপারী, কাহারবা বঙ্কিত একই বলা যায়। আড় তাল, সুরফাক, আড়া চৌতাল, জ্যোতি তালের স্রায়, ঝাঁপ ও তেওড়া নাম ও বিভাগ এক। এমনি আরও বহু তালের

নাম করা যায়। যাহাই হউক কীৰ্ত্তন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মূল উপাদান সমূহের সমন্বয়ে সৃষ্টি বিকাশ হইয়াছিল; শ্রুতরাং উভয় সঙ্গীতে গায়নরীতির মধ্যেও সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক, অন্ততঃ পূর্বে যে তাহা ছিল প্রাচীন গ্রন্থের উক্তি হইতেই তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। যথা—ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে খেতুরী উৎসব বর্ণনায় গ্রন্থকার লিখিলেন।

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদভয়।
অনিবদ্ধ গীত পোকুলাদি আলাপয় ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণগাস সবাপ।
আলাপে পোকুল কঠ নাশে তাপ ॥
আলাপে পমকমস্ত্র মধ্য তার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কে বা ধৈর্য ধরে ॥
বার বার প্রশমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ একট করণে ॥
রাগিনী সহিত রাগমুর্ত্তিমস্তকৈলা।
শ্রুতি স্বরগ্রাম মুচ্ছনাди প্রকাশিলা ॥

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্রায় কীৰ্ত্তনে ও আরম্ভে আলাপ অর্থাৎ অনিবদ্ধ গীত দ্বারা একটি রাগরূপের উদ্ঘাটন করা হইত, পরে নিবদ্ধ সঙ্গীত তালমাত্রা বাণী সংযুক্ত সঙ্গীতাংশ গাওয়া হইত। অংশগ্রহণ্য প্রভৃতি স্বরের প্রয়োগ এবং সমন্বয়, মস্ত্র, মধ্য ও তারস্বরের গমকাদি অলংকার, শ্রুতিস্বর। গ্রাম ও মুচ্ছনাদির সাহায্যে আলাপ করিয়া রাগ রাগিনী মুর্ত্তিমস্ত করাই ছিল রীতি। পরবর্ত্তিকালে কীৰ্ত্তন অম্লশীলনকারীদের মধ্যে রাগরাগিনী চর্চার

৪১৫ কীর্তন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত কা ?

বিমুখতা হেতু অথবা যে কারণেই হউক শাস্ত্রীয় রীতিগুলি অমুমত হয় নাই। বাহার ফলে কীর্তন গানের শাস্ত্রীয় রীতিসমূহের প্রয়োগ বিলুপ্ত না হইলেও বর্তমানে অনেকটাই বিরল হইয়াছে বলা যাইতে পারে এখনও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচলিত রীতির আয় কীর্তনে প্রথমতঃ বিলম্বিত, পরে মধ্য ও দ্রুত তাল লয়ে গীত হইয়া থাকে। স্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি বলিতে কীর্তন-সঙ্গীতে কিছু নাই। কবিতার স্তবকশেষে স্থায়ীতে ফিরে যাওয়ার রীতি নাই। প্রথম হইতে কবিতার শেষ স্তবক পর্যন্ত একাদিক্রমে পাওয়া হয়। একই পদে একাধিক তাল ও সুর প্রয়োগ ইহার প্রাচীন রীতি। ইহাতে স্বরবিস্তার বা তালের ব্যবহার নাই। পক্ষান্তরে যথার্থ বাণী বিস্তার দ্বারা মূলগদের ভাব ও রসপূর্ণা আখর অলংকার যোজন্য করা এই সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রচলিত গায়নরীতিতে দেখা যায়। প্রচলিত কীর্তন ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাদৃশ্য সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা যায় যে, কীর্তন ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীত রূপগুলির অনুরূপ নহে কিন্তু ইহা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরই পর্যায়ভুক্ত একটি স্বতন্ত্র গীত পদ্ধতি বাহার মূলে শাস্ত্রীয় প্রবন্ধগীতের প্রভাব লক্ষ্যপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে—
জাতীয় মহিলা সংহতির উদ্যোগে

এবং

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের
সহযোগে

আয়োজনোচ্চক্র

বিষয়

সমাজ বিপ্লবে নারীর ভূমিকা

সভানেত্রী

শ্রীমতী নলিনী দাস

বক্তা

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

শ্রীমতী বাণী রায়

শ্রীমতী বীণা ভৌমিক

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

(সারদামঠ)

ও

আরও অনেকে

স্থান : শিবানন্দ হল

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (পোলপার্ক)

সময় : ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৫,

সোমবার, বিকাল ৫টা

জয়শ্রী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র

২য় খণ্ড ১০.০০

পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১০.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী-সমাজের আদর্শভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বস্তু

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাথের করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অন্যতম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

বর্তমান প্রসঙ্গ

প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচন বহাল : সুপ্রীম কোর্টের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

গত ৭ই নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের পাঁচ-সদস্যযুক্ত বিশেষ আদালত সর্বসম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রীর রায়ে বেরলি কেন্দ্র থেকে ১৯৭১-এ লোকসভায় নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে গত ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন, সে রায় বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বৈধ ঘোষণা করেছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়দানের মত দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিলো, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সর্বসম্মত স্বার্থহীন সিদ্ধান্তে সে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার অবসান হয়ে অবিলম্বে দেশের রাজনীতি স্বাভাবিক খাতে ফিরে আসবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

সুপ্রীম কোর্টে প্রধান মন্ত্রীর আপীল প্রধান বিচারপতি শ্রী এ. এন. রায়, বিচারপতি চতুষ্টিয় শ্রী এইচ. আর. খান্না, শ্রী কে. কে. মাথু, এম. এচ. বেগ এবং ওয়াই. ভি. চন্দ্রচূড় দ্বারা গঠিত বিচারালয়ে বিভিন্নপক্ষের আইনজীবীদের সাত-সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর গত ৯ই অক্টোবর রায় দান মুলতুবা থাকে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানীর সঙ্গে সংবিধানের ৩৯ তম

সংশোধনের বৈধতা এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ এবং নির্বাচনী আইন-সমূহ (সংশোধন) আইনের [Election Laws (Amendment) Act, 1975] বৈধতাও বিতর্কিত হয়। ৩৯ তম সংবিধান সংশোধনী আইনটি গত ১১ই আগস্ট প্রেসিডেন্টের অমুমোদন পায়। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী মামলার আপীল দায়ের হবার পর এবং শুনানী আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্বে।

সংবিধানের ৩৯ তম সংশোধনটিতে সংবিধানে ৩২৯-এ (Article 329-A) ধারা পেশ করে দেওয়া হয়, যে ধারার বলে পার্লামেন্টে যে কোনো সভায় প্রধানমন্ত্রীর এবং লোকসভায় স্পীকারের নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ বিচারালয়ের আওতার বাইরে পার্লামেন্ট কর্তৃক সৃষ্ট একটি পৃথক সংস্থায় বা মঞ্চে (Forum) মীমাংসিত হবে, যে 'ফোরাম'-এর বিধি-বিধান সমূহ পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং যে 'ফোরামের' সিদ্ধান্ত যে কোনো বিচারালয়ের এজিক্যুরের বহির্ভূত থাকবে। এই সংশোধনীর ৪নং উপধারার (Clause 4) বলে এই সংশোধনী কার্যকর হবার পূর্বে অমুমোদিত অথবা কোনো আইন প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্পীকারের নির্বাচন সংক্রান্ত

দয়াক্ষেপের প্রযুক্ত হতে পারবে না অথবা প্রযুক্ত হতে পারে বলে গ্রাহ্য করা হবে না এবং উক্ত পদাধিকারীদের নির্বাচন পূর্ব অমুসৃত কোনো আইনের বলে কোনো ক্রমেই অবৈধ ঘোষিত হতে পারে না এবং সংবিধানের পূর্বে কোনো আদালত পূর্ব অমুসৃত আইনের বলে উপরোক্ত পদাধিকারীদের নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষিত হলেও তাদের নির্বাচন বৈধ বলে গণ্য হতে থাকবে। ৩২তম সংশোধনীর ৫নং উপধারায় বলা হয় যে এই সংশোধনীর পূর্বে স্মৃতিম কোর্টে ৪নং উপধারায় বর্ণিত কোনো আপীল কিম্বা পালটা-আপীল (crosses appeal) দায়ের করা হলে, তা ৪নং উপধারায় ব্যবস্থা অনুযায়ী মীমাংসিত হবে।

পাঁচজন বিচারকই ৩০ তম সংবিধান সংশোধনীর ৩২৯ (ক) ধারার ৪নং এবং ৫নং উপধারা স্মৃতিম কোর্টের কাছে পেশ করা আপীল স্তন্যনীর অধিকার কেড়ে নিয়েছে বলে মনে করেন নাই। তবে এটাও ঠিক যে সংবিধান সংশোধনীর ৪ এবং ৫ উপধারার অবৈধতা সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি বেগ সরাসরি কোনো মত প্রকাশ করেন নাই। প্রধান-বিচারপতি বলেছেন ৪নং উপধারা আইনের শাসনের পক্ষে হেয়স্কর—“offends [the rule of law] এবং এই উপধারাটি ‘ছিদ্রসঙ্কুল’—Suffered from infirmities’। বিচারপতি বেগই একমাত্র বিচারপতি যিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের তথ্যনির্বাচনগুলি যদি সঠিক ধরেও নেওয়া যায় তবুও

বলতে হবে বিচারপতি তার ভিত্তিতেও কতকগুলি স্পষ্ট ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বিচারপতি বেগ সংবিধান সংশোধনীর ৪নং উপধারা সম্বন্ধে বলেছেন। Undoubtedly clause (4) of Article 329-A could be said to have a political objectives in the context in which it was introduced.”

অপর তিন বিচারপতি ৪নং উপধারা সম্বন্ধে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। বিচারপতি খান্না ৪নং উপধারাকে অবৈধ ঘোষণা করে গিয়েছেন যে এই ধারা স্বাধীন এবং জায্য নির্বাচনের পরিপন্থী। এই সূত্রে বিচারপতি খান্না বলেছেন : “Clause (4) should be struck down in its entirety as it violates the principle of free and fair elections which in an essential postulate of democracy and which in turn, is a part of the basic structure of the Constitution...”

বিচারপতি চন্দ্রচূড় সংবিধান সংশোধনীর ৩২৯ (ক) ধারার ৪ এবং ৫ উপধারায় উভয়কেই মত অবৈধ এবং বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন কেননা সংবিধানের ১৪ ধারায় সামোর যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তার ঘোরতর পরিপন্থী অথচ সাম্য সংবিধানের এই মৌলিক প্রত্যয়। বিচারপতি আরও বলেছেন ভারতীয় প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রীর অনস্বীকার্য অনন্ত মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা রয়েছে কিন্তু এই অনন্ততার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনকে সকল প্রকার আইনের উর্ধ্বে

স্থান দেবার পারস্পর্যটুকি কি? “But what was the nexus of that uniqueness with the law providing that the election of the Prime Minister and the Speaker to Parliament would be above all laws and that their elections would be governed by no norms or standard applicable to all others contesting that election and that an election declared to be void by a High Court Judgment shall be deemed to be valid.”—বিচারপতি চন্দ্রচূড় এই প্রশ্ন তুলেছেন।

বিচারপতিরা সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৪-এর জন-প্রতিনিধিমূলক (সংশোধন) আইন এবং ১৯৭৫-এর নির্বাচন আইন সমূহ (সংশোধন) আইনকে বৈধ বলে গ্রহণ করে এই দুই সংশোধিত আইনের ভিত্তিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করেন। কারণ যে অসংশোধিত আইনের বলে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন যে কাক্সগুলিকে বে-আইনী বলা হয়েছিলো, আইনের সংশোধনের ফলে সেই কাক্সগুলি আর বে-আইনী রইলো না। সুপ্রিম কোর্টে পার্লামেন্টে সংশোধিত নির্বাচন আইনসমূহ (সংশোধন) আইনের অতীত-প্রয়োগের (retrospective effect) অধিকার স্বীকার করে নেবার ফলে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের বৈধতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব সর্ব-

সম্মতিক্রমে পালন করে জাতীয়জীবনের একটি জটিল গ্রন্থি মোচনে এগিয়ে এসেছেন। প্রশাসন, পরিষদ এবং জনসাধারণ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সঠিক মূল্যায়ন করে অতঃপর নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবেন জাতীয় জীবন এই আশার বাণী বহন করে চলবে।

বাংলাদেশে আবার অভ্যুত্থান : আরও নৃশংস হত্যা

গত ৩ নভেম্বর রাত্রিবেলা গত ১৫ই আগষ্টের অভ্যুত্থানের এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও অনেকের হত্যার পুনরাবর্তন শুরু হয়েছে। সেই রাত্রিতে বাংলাদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত চারজন বিপ্লবী জননেতা—তাজুদ্দিন আহম্মদ, নজরুল ইসলাম, মনসুর আলি এবং কামারুজ্জামান সহ আরও অনেক রাজনৈতিক বন্দী নৃশংসভাবে ঢাকা জেলে নিহত হয়েছেন, সেদিনই ১৫ই আগষ্টের অভ্যুত্থানের কয়েকজন নায়ক বাংলাদেশ ছেড়ে ব্যাঙ্কে পলায়ন করেন। বিগ্রেডিয়ার খালেদ মুসারফ মেজর জেনারেল পদে উন্নত হয়ে বাংলাদেশের সৈন্যপ্রাধান্য নিযুক্ত হন এবং প্রাক্তন সেনানায়ক জিয়াউর রহমান পদত্যাগে বাধ্য হন এবং বন্দী হন। এ-ছাড়া তারপরই সংবিধান সংশোধন করে ৬ই নভেম্বর প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং খোন্দকার মুস্তাক আহমদ পদত্যাগ করেন। ৭ই খুব ভোরে সেনাবাহিনীর সহিত জনসাধারণের সংঘাতে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রতম নায়ক

জেনারেল খালেদ মোশারফ নিহত হন, এবং মুক্তি-
যুদ্ধের অপর এক নায়ক, মাত্র কয়েক দিন আগে
ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী মেজর জেনারেল জিয়ায়ুর রহমান
সেদিন অল্পসময় পরেই বেতারে নিজেকে চৌক
মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এবং সেনাধিনায়করূপে
ঘোষণা করেন। কিন্তু ৭ই রাতে বাংলাদেশের সর্বত্র
সশস্ত্র সংগ্রামের মাঝখানে নূতন রাষ্ট্রপতি আবু
সাদাত সায়েম ঘোষণা করেন সামরিক আইন
অনুযায়ী বাংলাদেশ শাসিত হবে, তিনি নিজে হবেন
মুখ্য সামরিক প্রশাসক—মেজর জেনারেল জিয়ায়ুর
রহমানের মুখ্য সামরিক প্রশাসনের দাবী বাতিল
করে—তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে
ডেপুটি মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটরের একটি কাউন্সিল
গঠিত হবে। জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে একটি
পরামর্শ পরিষদ গঠিত হবে এবং চারজন আঞ্চলিক
প্রশাসক নিযুক্ত হবে।

মুক্তাক আহমদের মজ্লিসভা বাতিল হয়েছে,
সংসদ বাতিল হয়েছে এবং ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারীর
মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে পণতাত্ত্বিক কাঠামোতে
প্রত্যাবর্তন করা হবে—নূতন রাষ্ট্রপতি এই প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন।.....১৫ আগস্টের
অভ্যুত্থানের ও হত্যার পর গত আড়াইমাস খন্দকার
মোস্তাক আহমদের আড়ালে যে অপাত-স্বৈর্য ছিল,

সেই স্বৈর্য ভেঙেচুরে গেছে। একদিকে সেনাবাহিনীর
বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অন্তর ছেড়ে
বাইরে উপচে পড়েছে, অপরদিকে মুক্তিবর রহমানের
হত্যায় বিশ্বস্ত শক্তি ৪ঠা নভেম্বর ঢাকা জেলে
নেতাদের নৃশংস হত্যার মৌনপ্রতিবাদ মিছিলের
মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারপর সশস্ত্র ছাত্র
এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাতের সংবাদও ছাড়িয়ে
গেছে। ঢাকা এলাকায় ১৩টি থানায় কারফু এই
সংঘাতের ইসারা দিচ্ছে। যদি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন
স্তরের মধ্যে সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতা অবিলম্বে প্রতিহত
না হয়, যদি ঢাকা জেলে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্ত
যারা দায়ী তাদের অবিলম্বে খুঁজে বার করা না হয়,
বাংলাদেশে আত্মঘাতী হত্যালীলা দ্রুত যুদ্ধের
আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে। বাংলাদেশের বিশ-
পঁচিশ হাজার সামরিক বাহিনী সেই অগ্ন্যেপাতে
ছড়িয়ে জড়িয়ে। বাংলাদেশের আন্তঃস্তরীয় পরিস্থিতি
যেমন তাদের নিজস্ব ব্যাপার তেমনি সেই পরিস্থিতির
ঘাত-প্রত্যাবর্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতও নীরব
দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। ভারতের
প্রধানমন্ত্রী খুব সঙ্গতভাবে সময়োচিত এই সতর্কবাণী
সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন; বাংলাদেশে দ্রুত
স্বৈর্য ফিরে আসুক প্রতিটি ভারতবাসী এই আশা
করছে।

২০২৬, বিধান সরণিহৃত কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে ত্রিকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২'০০	ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০
পকেট গীতা	৫'০০	বীরসে বাঙালী	৩'৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০'০০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৫'৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭'৫০	বাংলার ঋষি	৫'০০
Soul of India Speaks	৭'৫০	বাংলার বিদ্বদ্বী	৩'৫০
কর্মবাণী	১'৫০	বাংলার মনীষী	
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০	রাজর্ষি রামমোহন	৩'০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২'০০	ধ্রুগাচার্য বিবেকানন্দ	২'৫০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.		আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪'০০
বিভাসাগর	৩'০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২'৫০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩'০০	রবীন্দ্রনাথ	৩'০০
ভূপর্ষটিক রমানাথ বিশ্বাসের		জীবনগড়া	৭৫
তরুণ তুর্কী	৩'০০	ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪'০০
ভয়ংকর আত্মিকা ১ম, ২য় খণ্ড	৩'২৫	(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান	
বেতুইনের দেশে	৩'০০	৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত	
নিবেদিতা	১০'০০	সংস্করণ)	
বিভাসাগর	১০'০০	শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	
শিবরামের কিশোর নাটক	২'০০	সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬'০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪'০০		

আয়ত্তনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ		শরীর ও শক্তি	৩'০০
নিবারণ	৫'০০	সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩'০০
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩'০০	নীলোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	২'৫০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	৩'০০	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	১'০০

প্রসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২



স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ঔষধাদির সংমিশ্রণে,
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে
প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই
দ্রুতি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, ইজম
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য
কিরে আসে এবং
অতি গুরুত্বপূর্ণ মতো
দুর্বল জরাজীর্ণ ভাঙ্গ
দেহে নতুন সজীবনী
শক্তি সঞ্চারিত হয়।

15 DEC 1975

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের প্রদায়ক শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদোচাৰ্ঘ

চারের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিষটের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যহ দুবার আহারের
পর সেব্য।



SMM-2/89



৪০ বছর
শেখ ১৩৮২

জি সংখ্যা
NUMBER

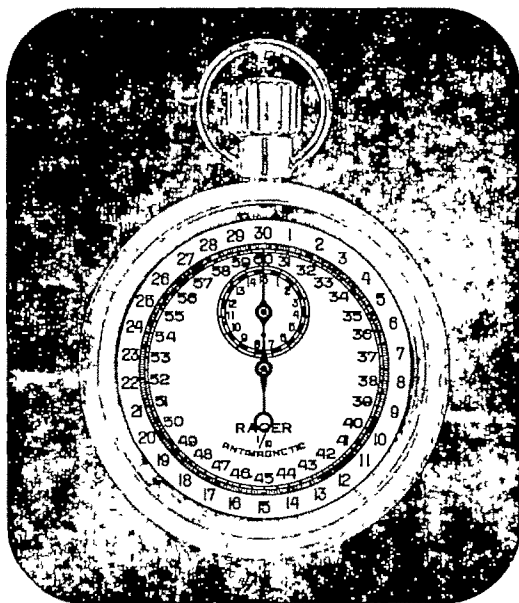
শ্রী-সম্পাদিকা

শিলা কান্ত

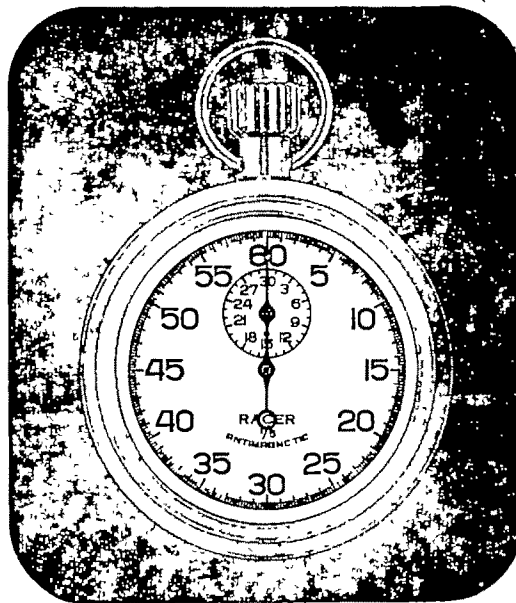


RACER

PRECISION
STOP WATCHES
ACCURACY WITH TIME MEASURING



Ref. 41171 19" BFG
1/10 SECONDS TIMER (Stop Watch)
1 Jewel, 30 Seconds Dial.
Small hand registers upto 15 minutes.
Start, Stop and flyback to zero by Crown
Chromium plated case.



Ref. 41171 19" BFG
1/5 SECONDS TIMER (Stop Watch)
1 Jewel, 60 Seconds Dial.
Small hand registers upto 30 minutes
Start, Stop and flyback to zero by Crown
Chromium plated case.

USEFUL FOR :

- ⊕ SPORTS
- ⊕ ACCURACY CONTROL
- ⊕ EXPORT ENQUIRIES SOLICITED

- ⊕ YACHTING
- ⊕ INDUSTRIES
- ⊕ LABORATORIES

MANUFACTURED BY :

ELLORA INDUSTRIES

3792, CHURIWALAN, DELHI-6.

PHONE : 267048/261002

GRAMS : 'CREAMLAI'D' DELHI.

TELEX : Regent.

ND 2113.

দিকে দিকে দৃঢ় সংকল্প ••••

জাতির কর্মযজ্ঞে নূতন প্রভাত

দেশের সর্বোচ্চ উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির
যথার্থ রূপায়ণের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত ২০ দফা অর্থনীতি
কর্মসূচীর রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই
এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেছেন :

- পশ্চিমবঙ্গ ঋণভার লাঘব ব্যবস্থা
- ৬ কোটি টাকার এক সুসম, গ্রাম উন্নয়নের উৎপাদন কর্মসূচী
- ৩ কোটি টাকার এক বিশেষ কর্ম সংস্থানের উদ্যোগ
- ভূমিহীন কৃষকদের চাষের ভূমি এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য
বাস্তি-জমি দ্রুত বিতরণ
- নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র-বিক্রয়ের ব্যবস্থা
- বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ।

আরও অনেক কর্মসূচী রূপায়িত হতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

জনগণের প্রতি কর্মবর্ধমান সেবা

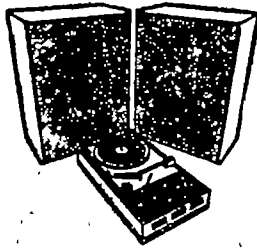
অগ্রাধিকার ক্ষেত্র আর্থিক সহায়তা
কৃষি শ্রমিক



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-8-74

PHILIPS



জয়ন্তী প্রকাশনের নতুন বই

লক্ষ্মীশ্বর সিংহের
বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

৬১টি বৃক্ষের চিত্র সম্বলিত বাংলাভাষায়
একটি অনবদ্য সংযোজন।

দাম দশটাকা

জয়ন্তী প্রকাশন

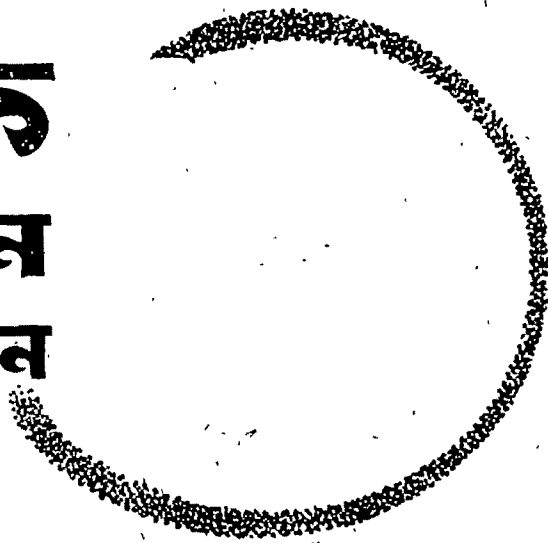
২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬

* নিখুঁত

* পারিষ্কার

* আভিনব

ব্লক
মুদ্রন
ডিজাইন



দাশ গুপ্ত ঙ্গ কোং

১৫, মাহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন :

২৪-৪৫১৫

রণজিত সেনের শ্রেষ্ঠ বই

স্বর্গ মর্ত গাতাল

প্রকাশক

আঙ্গিক

১৫নং মাহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ২৪-৪৫১৫

প্রাপ্তিস্থান :

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

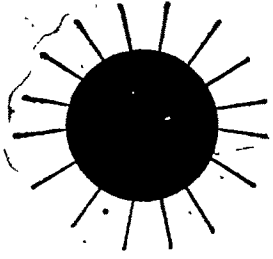
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯



বাড়ী বদল করাছেন ?

যদি তা না হয় তাহলে এত মাল সঙ্গে নিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করাছেন কেন ? আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনার জন্ত কি অপেক্ষা করছে—সহযাত্রীদের রোষ-দৃষ্টি, ড্রাইভার ও কুলিদের প্রতিবাদ আর সারাক্ষণ ধরে মানসিক উত্তেজনা। তাছাড়া আছে মোটা অঙ্কের খরচের বোঝা। সবচেয়ে বড় কথা, রেল ভ্রমণের জন্তে এতসব ঝামেলায় আপনার প্রয়োজন কি ? কম মাল নিয়ে চলে এই পার্থক্য অনুভব করুন না কেন ?

কম মাল নিয়ে চলা মানেই অধিক আরাম



দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে



সূচীপত্র

নেতাজী সংখ্যা ॥ জয়শ্রী ॥ পৌষ ॥ ১৩৮২

লেখক	বিষয়	পৃঃ	লেখক	বিষয়	পৃঃ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিজয়িনী নাই তব চর	৪১১		ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৪৮৬
	সুভাষচন্দ্রের অজ্ঞাত ভাষণ ও রচনা (সংকলন)	৪২২	ভূদেব চৌধুরী	পুস্তক পরিচর	৪৮৯
সম্পাদকীয়	সমসাময়িক দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র	৪৫৩	সমদর্শী		
			Editorial	Struggle still say I	৪৯৩
			H. V. Kamath	Netaji : Philosopher Soldier and Statesman	৪৯৩
চারণিক	'দিবস রজনী আমি যেন' কার আশায় আশায় থাকি'	৪৫৬	Kalicharan Ghosh	Subhas Bose's English Composition and humour	৪৯৯
অনিলকুমার চন্দ	সামান্য তিনটি ঘটনা ও অসামান্য একটি লোক (স্মৃতিচারণ)	৪৬৩	Nanda Mukherjee	Subhas Chandra Bose and the Arab Freedom Movement	৫০১
কল্যাণকর ঘোষাল	স্বাধীনতার স্বরূপ ও সুভাষচন্দ্র	৪৬৯	শান্তদীপ দাশ	জয়ন্ত সুভাষ জয় (কবিতা)	৫০৬
			রমেন্দ্রলাল রায়	ভারতপথিক (কবিতা)	৫০৬
				বর্তমান প্রসঙ্গ	৫০৭
পবিত্রকুমার ঘোষ শেখ ও অশেষ (অলোচনা)		৪৭৭	সম্পাদক	সুনীল দাস	

With the best Compliments :

**NIREKA ENGINEERING & CO.
(Private Limited)**

Gram : NIREKA, CAL.-2
Phone : 57-2389

29 THE MALL
Calcutta-28

With best compliments of :

Telegrams : C I M A R E K

Telephones ; 22-3103/4543/6301

SAMPAT CERAMICS (P) LTD.

11, POLLOCK STREET, (First Floor)

POST BOX NO. 319 CALCUTTA-1

Distributors for :

Sur Enamel & Stmpg. Works Pvt Ltd, Sur Industries Private Limited.

Scientific Indian Glass Co. Limited, Perfect Industries Gujarat

Metal Box Co. Bengal Procelain Co. Private Limited.

দেশ এগিয়ে চলেছে

আমাদের ক্ষিত-খানারের জল আরও বিশি জল

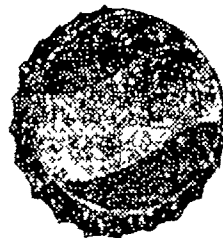
আমরা মোট জলসেচনের কর্মতা বাড়াতে
সক্ষম হয়েছি। এখন 2.18 কোটি হেক্টর
জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। এই
কর্মতা পঁচিশ বছর আগে যা ছিল, এটি
তার দ্বিগুণেরও বেশি।

নিম্নসিঁড়ি আরও 50 লক্ষ হেক্টর
জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা কার্যকর
করা হবে।

দূর সংকল্প ও কঠোর
পরিশ্রম—আমাদের
এগিয়ে নিয়ে যাবে

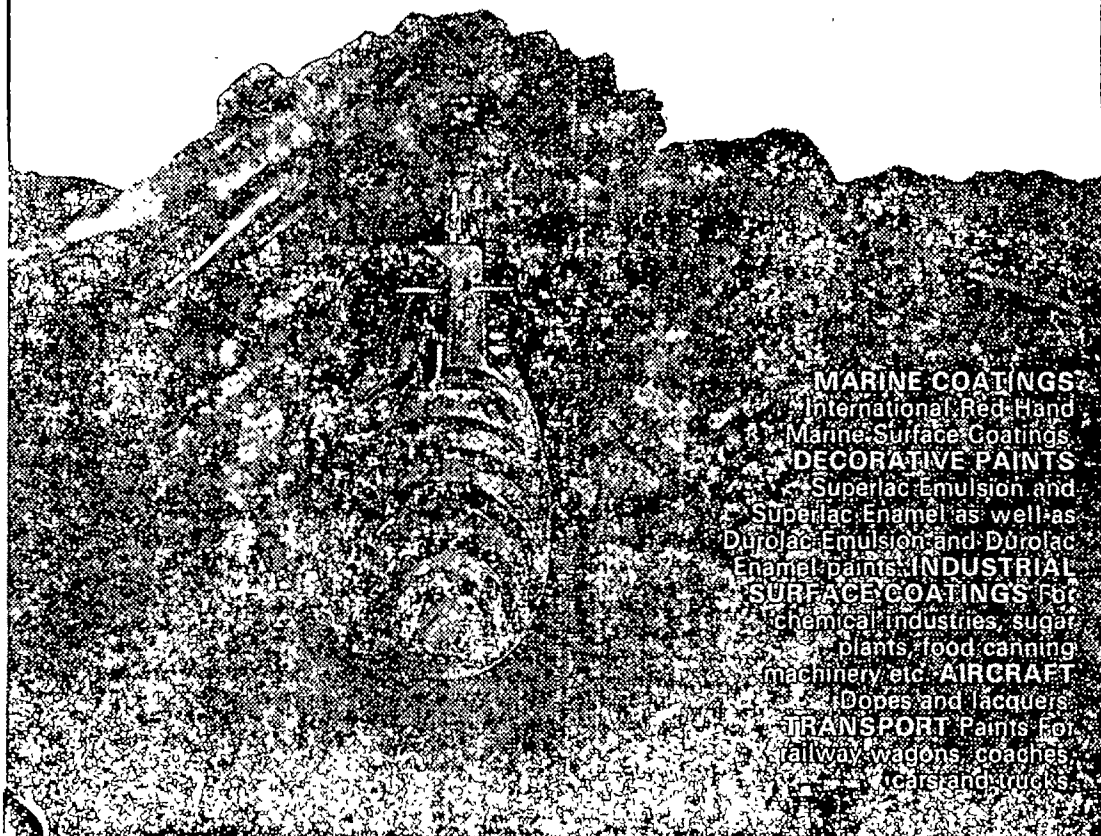


What brings
a submarine &
a crown top together?



SHALIMAR PAINTS

A Member of The International Paint Co. of Courtaulds Group-U.K.



MARINE COATINGS
International Red Hand
Marine Surface Coatings
DECORATIVE PAINTS
Superlac Emulsion and
Superlac Enamel as well as
Durolac Emulsion and Durolac
Enamel paints **INDUSTRIAL**
SURFACE COATINGS For
chemical industries, sugar
plants, food canning
machinery etc. **AIRCRAFT**
Dopes and lacquers
TRANSPORT Paints for
railway wagons, coaches,
cars and trucks

HEROS-SP-45A

ডায়ালী

৪০ বর্ষ • নবম সংখ্যা • পৌষ ১৩৮২

৩

বিজয়িনী নাইতর ভয়,
দুঃখ ও লক্ষ্য তর কয়।
অসম্মান অসম্মান
অসম্মান লক্ষ্যে দায়,
কল্পিত এই পক্ষিচয় ॥

স্বর্গীয় শ্রীমদ্রাজ

৩০ জানুয়ারি
১৩৮২

সুভাষচন্দ্রের তত্ত্বাত ভাষণ ও রচনা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুব ও ছাত্ররাই প্রাণ স্ফোর করেছিল। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রথম দিকটা নিগোজিত ছিল কেবল মাত্র বাংলা তথা ভারতের যুব ও ছাত্র সমাজকে একটি নিয়মশৃঙ্খলা, একটি দূরপ্রদারী লক্ষ্য ও আদর্শে প্রতিষ্ঠা করা। একশ্রু কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলির প্রাত্যহিক কর্মশূচী সম্বন্ধে তাঁর ভাষণে, তাঁর নানাবিধ পত্রে নির্দেশ আমরা দেখতে পাই।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ ৭ মাস্কালয় জেল থেকে মুক্তির পর কয়েকটি বছর ঝটিকার জ্বায় বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এবং ভারতের বড় বড় নগরীতে যুব ও ছাত্র সমাজের কাছে সুভাষচন্দ্র তাদের কর্তব্য তাদের শক্তি, ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাণী তুলে ধরেছেন। তাঁর সেসব ভাষণের অধিকাংশই আজও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সুখের বিষয় জয়ন্তী প্রকাশন বিলম্বে হলেও সুভাষচন্দ্রের রচনা ও বক্তৃতামালা সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন, এবং তাদের সহযোগিতায় বর্তমান সংখ্যায় আমরা সুভাষচন্দ্রের কতিপয় তত্ত্বাত ভাষণ ও একটি রচনা প্রকাশ করলাম।

সম্পাদক, জয়ন্তী

১. যৌবনের প্রেরণা

বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া তরুণের আন্দোলন আয়ত্ত হইয়াছে। শুধু বর্তমান যুগে কেন—যুগের পর যুগ যখনই কোন জাতির জীবন-মরণ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তখনই এই আন্দোলন দেখা দিয়াছে।

তরুণ আন্দোলনের স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে তরুণ আন্দোলন বলিতে যে কোন তরুণের আন্দোলনকেই বুঝায় না। তরুণের আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, লক্ষ্য আছে। যেখানে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে,

সেখানেই তরুণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তরুণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই নিত্য নূতন সৃষ্টি করা তরুণ আন্দোলনের লক্ষ্য। যেখানেই সৃষ্টি, সেখানেই প্রকৃত জাগরণ।

জাতির পুনর্জন্ম

মানুষের জীবনে যেমন—জাতির জীবনেও তেমনই শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আছে। অনেক সময় জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; আবার অনেক সময় জাতি বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাঁহার আত্মা মরিয়া গিয়াছে। একরূপ দেখা যায়। জাতির জীবনে এই উত্থান ও পতন, জন্ম ও মৃত্যু চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। “Evolution of Civilization” নামক পুস্তকে গ্রন্থকার জাতির জীবনের এই মৌলিক নিয়মটি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সভ্যতা মরিয়া যায়, কিন্তু আবার তাহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করিলেও এই প্রশ্ন আসে, আমরা কি প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া আছি? ইহার উত্তরে আমি বলিব, আমরা অনেকবার মরিয়াছি, এবং অনেকবার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছি। পৃথিবীতে যত সভ্যতা আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার অনেক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাবিলন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা আজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। মিশর প্রভৃতি দুই

একটি জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, আজ মিশরের সভ্যতা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে; রোম ও গ্রীসে আবার নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে।

জাতির স্বজনী শক্তি

চীন ভারতের সভ্যতা এখনও বাঁচিয়া আছে। আমাদের প্রাচীন চিত্তার ধারা, সভ্যতার ধারা এখনও জীবিত আছে। জাতি বাঁচিয়া আছে কিনা, তাহার মাপকাঠি হইতেছে—সে জাতি নূতন সৃষ্টি করিতে পারে কিনা। কিন্তু যদি সে সৃষ্টির মধ্যে নূতনত্ব না থাকে, যদি তাহা শুধু গতানুগতিকতার পণেই খাবিত হয় তবে তাহা প্রকৃত সৃষ্টি নহে। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সমাজরাষ্ট্র, প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যদি নূতন সৃষ্টি দেখা দেয় তবেই জাতির জীবনে যথার্থ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মদেশে শিল্প-সাহিত্য ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু সেই গতানুগতিকতার ভাব বর্তমান। অথচ শিল্পী হিসাবে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ—বাস্তব জীবনেও ব্রহ্মদেশবাসীরা একরূপ মরিয়া রহিয়াছে। তবে তাহাদের বাস্তব ও রাজনৈতিক জীবনে কিছু কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আজ আমাদের শিল্প সাহিত্য ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিতে নূন নূতন সৃষ্টি হইতেছে। যে জাতির মধ্যে রামমোহন, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতির যে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা

সহজেই বোঝা যায়। সৃজনী শক্তি না থাকিলে কোনও জাতিই এইরূপ মণীষীর জন্মদিতে পারে না। জাতি যখন মরণের দশায় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন এই সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করে।

চিন্তা-রক্তের সংমিশ্রণ

তুই রকম অসহায় বা তুই কারণে মরণোন্মুখ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইয়া থাকে। একটা জীব বৈজ্ঞানিক বা রক্তসংমিশ্রণের দিক হইতে আর একটা মানবিক বা চিন্তার দিক হইতে। যখনই তুইটি সম্প্রদায় বা তুইটি জাতি পরস্পর মিলিত হয়, তখনই উভয়ের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ এবং চিন্তার আদান প্রদান হইয়া থাকে। মহাভারতের আমল হইতে ভারতবর্ষে এই রক্ত সংমিশ্রণ চলিয়া আসিতেছে। এই জাতিভেদের অচলায়তন তখন ছিল না। তারপর ঐতিহাসিক সময়ে ছন্দ-শক পাঠানের রক্ত মিশিয়া গিয়াছে। যখনই বাহিরের প্রবল আঘাতে একটি জাতি আর টিকিতে পারে নাই তখনই বিভিন্ন চিন্তার সংমিশ্রণে সে জাতি আবার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। রোমক সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা যখন ধ্বংসোন্মুখ হয়, তখন বাহির হইতে পথিক ও অন্ত্যজ জাতি আসিয়া রোমে আধিপত্য করে। ফলে তাহাদের সংমিশ্রণ রোমে সভ্যতা আবার বাঁচিয়া ওঠে। এই যে ইউরোপে ধর্মরগতে পুনঃসংস্কার (Reformation) এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে

পুনর্জাগরণের (Renaissance) আন্দোলন— ইহাও মূল-এ বাহিরের সংমিশ্রণ।

ভারতের জাতিগঠন ও তরুণের দায়িত্ব

আজ আমাদেরও এই সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যদি জাতিকে গড়িয়া উঠাইতে হয়, তবে সে গুরুদায়িত্বের ভার তরুণের উপর। এখন আমাদের চিন্তার বিষয়, কি করিলে আমরা এই গুরু দায়িত্বের উপযুক্ত হইতে পারি। বর্তমান জগতে সকলেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ভার তরুণ দল না লইলে আর রক্ষা নাই।

জার্মানী ও চীনে যুবক আন্দোলন

যুদ্ধের পর ইউরোপে যে সমস্ত জাতির মধ্যে এই তরুণের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তন্মধ্যে জার্মানী ও জার্মানী উল্লেখযোগ্য। জার্মানীতে যুবক আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। এখন সেখানে এই আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। চীন দেশেও এই আন্দোলন কতকটা আরম্ভ হইয়াছে। তবে তাহা বেশীর ভাগ ছাত্রসমাজে। আমাদের দেশে যুবক আন্দোলনের সহিত রাজনীতির যেমন সম্পর্ক, তাহাদের দেশেও সেইরূপ। চিন্তার জগতে এবং রাজনৈতিক জগতে চীন এতদিন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার সংশ্রবে আসিয়া চীন দীর্ঘকাল পরে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিজের ঘোষণা করে। ক্রমে তুই দলের সৃষ্টি হয়। একদল কনফিউসিয়ান দর্শনের

মতবাদ প্রচার করিতে থাকে। অপর দল ইহার বিপরীত পথে চীনকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে। তারপর ক্রমে সামঞ্জস্য হয়। আমাদের দেশে যখন ইংরেজের আগমন হয় তখন আমাদের প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। দেশের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবহারে একটা ওশট পালট আরম্ভ হয়। তারপর পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের নুতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। ফলে সমষ্টি সাধিত হয়। চীনেও ধর্ম, সমাজ সাহিত্য ও শিক্ষা—সব দিক দিয়াই সংস্কারের একটা প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। শতদিনের ঘুমন্ত চীন আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। ছাত্রগণই এই আন্দোলন চালাইতেছে। এক্ষণে ৫০ খানি কাগজ বাহির হইয়াছে। ডঃ সান ইয়েং সেন এই নুতন আন্দোলনের জন্মদাতা। অনেকে ইহার মধ্যে বলশেভিকবাদ আরোপ করিতেছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। হয়তো এই আন্দোলনের কোন কোন দিক বলশেভিকদের অনুরূপ হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বর্তমান। ভারতের যাক আন্দোলনেও আগাগোড়া এইরূপ একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই দিক দিয়া উভয় দেশের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যুবক আন্দোলন সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত

আমাদের দেশে কেহ কেহ মনে করেন, এই বর্তমান আন্দোলন একটা ছত্রুক মাত্র। ইহার

পিছনে কোন সত্য নাই। ইহা বাহিরের আঘাতের একটা চক্ষু মাত্র। ইহার মধ্যে অন্তরের চৈতন্য নাই, ইত্যাদি। অনেকে একথাও বলেন, পাশ্চাত্য প্রভাব চলিয়া গেলে আমরা আবার আমাদের অন্ধকার যুগে চলিয়া যাইব। আমাদের কোনও কর্মপ্রচেষ্টা থাকিবে না। সুতরাং ইংরাজ থাকিতে থাকিতেই আমাদের উন্নতি করিতে হইবে।

ইংরাজ ও মুসলমানের প্রভাব

কিন্তু ইহা ঠিক নহে। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাাইতেছি, এই আন্দোলনের ফলে জাতির জীবনে নিত্য নুতন সৃষ্টি হইতেছে। বৌদ্ধ যুগের আমল হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্ত কত চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চিরদিন নব নব সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। কাজেই ইংরাজ না আসিলেও ইহা হইত। আমরা ইংরাজদের অনেক প্রভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি একথা সত্য। মুসলমানও এদেশে আসিতে আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নুতন রূপ পাইয়াছে। বাহিরের হিন্দু ও মুসলমানে যতই বিরোধ থাকুক না, সমগ্র জাতির শিল্প কলা সাহিত্যের মধ্যে, জাতির অনুরাঙ্গার মধ্যে একটা মৌখিক একতা আছে। সেখানে কোন বিরোধ নাই। আজ ভারতের শিল্প, ভারতের সঙ্গীতের কোন জাতি ভেদ নাই। যুগের পর যুগ

এইরূপ নূতন নূতন সৃষ্টি হইতেছে, তাই জাতি বাঁচিয়া আছে।

তরুণের অমরত্ব ও সার্বজনীনতা

এই নূতন সৃষ্টির ভার তরুণের উপর। তরুণের কাজ নূতন সমাজ সৃষ্টি। সমাজ সৃষ্টি মানেই মানুষ সৃষ্টি—মানুষ লইয়া সমাজ। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে চিন্তা ও কল্পনা রাজ্যে সৃষ্টির প্রয়োজন। চিন্তা এবং কল্পনা জগতে এই সৃষ্টির চেষ্টা সবকালে, সব দেশে তরুণের মধ্যে চলিয়াছে। তরুণ অমর। তরুণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। তরুণের দেশ নাই, কাল নাই জাতি নাই। তরুণ—তরুণ। তরুণকে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। সে সার্বজনীন—আজ পৃথিবীর সমস্ত তরুণ সমাজ একটী-রূপ চিন্তা করে, প্রাণে প্রাণে একই রূপ অনুভব করে। সকল তরুণের হৃদয়ভিত্তে একই সুর ধ্বনিত হয়। এই তরুণের আজ জাতি গঠনের মহাসাধনায় মগ্ন হইতে হইবে।

তরুণের সাধনা

সাধনা মানে বনে জঙ্গলে গিয়া যোগ অভ্যাস করা নহে। আজ সাধনার ভিন্ন অর্থ। খাঁটি মানুষ তৈরী করাই এখন সাধনা তবেই জাতি গড়িয়া উঠিবে। সমগ্র জাতির মধ্যে যৌবনের প্রেরণা জাগাইতে হইবে।

যৌবনের প্রেরণা

আজ যখন চারিদিকে তাকাই, সর্বত্র অন্ধাব-

অভিযোগ, দৈন্ত হৃদয় দেখিয়া শোকে, ঘৃণে প্রিয়মান হই। শুধু ভাবি, কিরূপে এই জাতিকে আমরা গড়িয়া উঠাইব? তরুণের উপর এই মহান কাজের ভার স্তম্ভ হইয়াছে। যার মধ্যে যৌবন নাই, সে নিরাশ হইবে, ভয় পাইবে। তরুণের কাজ বাস্তবকে অস্বীকার করা। তরুণকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। নিজেরও দেশের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, ইতাই সর্বাপেক্ষ প্রয়োজন। ইহা আদিবে যদি আমরা সকলেই অন্তরের মধ্যে যৌবনের প্রেরণা অনুভব কবি। আজ ক্রমেই এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছে। যুবক না বৃদ্ধ, তা নির্বিশেষ হয় অন্তরের মমতা দ্বারা। বয়সে কিছু বোঝা যায় না। যৌবনের এই অমর প্রেরণা ফিরিয়া পাইতে হইবে সাধনার দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, কল্পনা দ্বারা। সাহিত্য, নর্ষ, সমাজ, রাষ্ট্র—সব দিক দিয়া জাতিকে গড়িয়া উঠাইতে হইবে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যদি একবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে তবে তাহা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা দিবে। স্বাধীনতার এই আদর্শ চিন্তা দ্বারা, ধ্যান দ্বারা, সাধনার দ্বারা মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার জন্য যৌবনেই প্রয়োজন। যৌবন বাতীত এই চিন্তা, এই কামনা এই স্বপ্ন অসম্ভব। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ইংরেজের অধীনে স্বাধীন হইব, এই চিন্তা পুণ্ডিতাগ করিতে হইবে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যদি একবার প্রাণ স্পর্শ করে, একবার যদি আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় তবে কোথা হইতে অসীম শক্তি অনুভূত হইবে তাহা ভাবিয়া আমরা অথাক হইব। এই জন্য বাঙালীর

৪২৭ যৌবনের প্রেরণা

ভাব প্রাণভার এটা সার্বকতা আছে। এই পৃথিবীতে সকল শক্তির বড় শক্তি বয়না ও চিন্তা শক্তি।

শক্তির উদ্বোধন

এদেশে কি না আছে? প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্য, প্রতিভাবান কবি, দার্শনিক, নৈজ্ঞানিক, ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড়—কিসের অভাব আমাদের? শুধু প্রয়োজন শক্তির উদ্বোধনের। এই জন্ত সাময়িক স্বৈরাচারের (autocracy) প্রয়োজন। নতুবা নিয়মানুষ্ঠিত না থাকিলে শক্তির ও সংহতির উদ্বোধন সম্ভবপর হয় না। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, তরুণেরা উচ্ছ্বল হইয়াছে। আমি তাঁহাদের প্রতিবাদ করি। তবে একটা আন্দোলন আরম্ভ হইলে এণ্টু উচ্ছ্বলতা না হইয়া যায় না। কিন্তু পরে ইহা থাকে না।

অমৃতের সন্তান

আমরা বিশ্বাস করি, আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের মধ্যে দেবতা আছে। কাজেই আমরা

স্বাধীন হইলে উচ্ছ্বল হইব ইহা। কিছুতেই বিধাণ করিব না। নেতৃবৃন্দের পতন যখন-তখন হয়! তাহা না হইলে তরুণের আন্দোলন জাগিত না। এক জনের পতন আর একজনের সেখানে আগমন—আর পশ্চাতে সমাজ! তখনই বিশ্ব জাতি জাগিতেছে।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

আমার শেষ কথা, আপনাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি রহিয়াছে, তাহা অমুভব করণ। আমাদের মৃতসঞ্জীবনী পুষ্টি পান করিতে হইবে। দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। যেদিন জাতির মধ্যে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প জাগরিত হইবে সেইদিনই আমাদের কাজ আসিবে। এই সংকল্প জাগিলে ২৪ ঘণ্টাতে ইংরেজ এ দেশে থাকিতে পারিবে না।

আমাদের জাতি বড়ছিল। আবার বড় হইবে। আমরা সকল রকমে বড় হইব, আমরা স্বাধীন হইব। তবেই আমরা বিশ্ব সভ্যতায় স্থান পাইব।

২. যৌবনের উচ্ছ্বাসই সৃষ্টির তরঙ্গ

পুণ্ডরীক শরৎদাস,

আজ আপনাকে আমাদের মাঝে আমাদেরই একজন আপনার হিসাবে পেয়ে, আমরা যে কতবড়,

একটা শক্তি অমুভব করছি, তা মুখের কথায় বলতে যাওয়া ব্যর্থতার রূপান্তর মাত্র। হে মনস্তত্ত্বের অধি, সারা বাঙ্গলা আজ আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিমুদ্রন

জানিচ্ছে। কিন্তু দুই থেকে শুধু আপনার পায়ে অর্থাৎ ট্রেনে বিদায় নিলে, আমাদের প্রাণে তৃষ্ণা মিটেবে না। আপনার সু-উচ্চ বেদীর নীচে বসে, আপনার বৃকের সত্যের আগুন আমাদের বৃকে জ্বালিয়ে তুলতে চাই। তরুণের বৃকে ভালকে ভাল বলবার শক্তি ও অস্থায়কে অস্থায় বলবার ক্ষমতা আপনারই দিয়েছেন, আপনার সত্যের নির্মম ছুরিকাঘাতে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রের মিথ্যা ও ছলনার আবরণ শতধা হ'য়ে সত্য উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট হ'য়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

রয়স ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা আপনার অনেক নীচে। তবুও আপনার ভিতরকার নবীনতা আপনাকে আমাদেরই একজন বলবার অধিকার দিয়েছে। আর এই অধিকারের জোড়েই আমরা বলতে সাহস পাচ্ছি যে, আমরা হাওড়ার তথা সারী বাঙ্গলার তরুণের দল, এতদিনের পুঞ্জীভূত অত্যাচার, উৎপীড়নকে পদদলিত ক'রে, এগিয়ে যেতে পারবো।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়,

আপনার নীরব আশ্রয়ভাগের অতীত কাহিনী বাঙ্গলা আজও ভাল করে জানে না। আজ ক্রোড়ের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েও আপনার নির্মম নিষ্ঠা ও অদম্য সাহসের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বর্তমান সমস্যাগুলি, অতীতের তুলনায় অত্যন্ত জটিল ও হুঙ্কার মন্দেই নাই।

বর্তমান যুগ-সংগঠন কার্যের দিক থেকে আপনার

এবং আপনাদের, যুগ-সমাজে বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও আপনার চরিত্রগত গুণাবলী প্রত্যেক স্বদেশসেবী বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে গৌরবে নেওয়া আশ্রয়ের এই হৃদিনে বড়ই প্রয়োজনীয়। আপনার অতীত কাহিনী হাওড়ার যুবক-দলের স্ফূর্তি বিষয়। প্রাণহীন সভা-সমিতি ও অর্থহীন শোভাযাত্রা কোরে আপনাকে ও আপনাদের অভিনন্দিত করা যায় না। আমাদের সমাহিত কর্মই আপনাদের স্মৃতির একমাত্র প্রতিদান, স্মৃতির একমাত্র তুর্পণ।

সমবেত ভাই বোন,

হাওড়া আজ আপনাদের, তার সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমাদের এ কাজে দোষ-ত্রুটি অনেক আছে, কিন্তু এটা আমাদেরই কাজ এই ভেবে, এর সব দোষ ত্রুটি আপনারা ক্ষমা করবেন। গোড়ায় একটা কথা আপনাদের ব'লে রাখছি— একটা মন্ত কিছুই ব্যবস্থা এখানে আমরা করতে চাই নাই। বড় বড় কথা ব'লে, বড় বড় প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে, লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

জাতির জীবনে যখন ভাঁটার টান ধরে, তখনই তাদের জীবনে জোয়ারের দরকার পড়ে। তাই, দেখতে পাই, অবসাদ হ'তে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য, যে কোন একটা কিছুকে আশ্রয় ক'রে, সব সভা-সমিতিতেই খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলে আসছে। এইভাবে একটার পর একটা ক'রে কত উত্তেজনারই সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু এ চেষ্টা

অবসাদের লাঘব কতটুকু করতে পেরেছে? আন্দোলন শোভাযাত্রারও দরকার আছে, কিন্তু তা ঐ স্বাধীন দেশে। যেখানে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি একই স্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি মাত্র,— প্রভু ভূত্য সম্বন্ধ নয়। 'যে'নে আন্দোলন করলে রাজশক্তি ভয় পায়, সাবধান হয় ও আপনকার্-প্রণালীর পরিবর্তন করে। কিন্তু এ দেশ তো তা নয়! সেই স্বদেশী আমলের কথাই ধরুন বা যুদ্ধের আমলের হোমরুলওয়ালাদেরই দেখুন, এমন কি কি মহাত্মাজীবীর অসহযোগ দর্শন একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আন্দোলন এদেশে কম হয় নাই। কিন্তু ফল তার কি হ'য়েছে? তথাকথিত রাজনীতিকের দল চেষ্টা করে বল'ব (এবং এটা তাঁদের সত্যিকারের ধারণা) যে চোখ রাজ্যে ইংরেজ ভয় পায়। কিন্তু মণীষী বিপিনচন্দ্রের কথায়—"toothless opposition" কে ইংরাজ গ্রাহ্যও করে না," বাঙ্গলার জেলায়, জেলায়, রাষ্ট্রীয় সন্মিলন, যুব সন্মিলন (ছাত্র ও তরুণী সন্মিলনও এখনও বাকী আছে), ছাত্র সন্মিলন প্রভৃতি কত সন্মিলনই ত হ'চ্ছে। অনেক জায়গায় বাচ্চাই সাঁকোকে ফাঁসী এবং আমানুজাকে রাজা করবার ব্যবস্থাও হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবের ফলে আমানুজা বেচারার কিছুমাত্র সুবিধা হয়েছে বলে বোধ হয় না। বাচ্চার সঙ্গীন এখনও তাঁকে দেশছাড়া করে রেখেছে। স্বাধীনতার প্রস্তাব তো কম হয় নাই? কিন্তু শুধু প্রস্তাব পাশ করে দেশ স্বাধীনতার পথে কতটুকু এগিয়েছে?—এটাই আজ

বিশেষ করে ভাবতে হবে। মাত্রাজ কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবের কলিকাতায় যা তুর্গতি হ'লো! —এমন লজ্জাকর ব্যাপার কি, জগতের ইতিহাসের বুকে আর কোথাও দেখেছেন? তাই বলছি, যারা বড় বড় প্রস্তাব পাশ করতেই মজবুত, তাঁরা তাঁদের রাজনীতি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু যুবক-সমাজ যেন এই ভুল না করে। তারা যা ক'বে তা শুধু কথায় নয়। তাদের কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য থাকবে। দেশের এই অল্পম প্রতিরোধ আর অর্থহীন আন্দোলন থেকে আমরা এই যৌবনশক্তিকে পৃথক করে নিতে চাই। কোন একটা ব্যাপারকে আশ্রয় করে ছজুকের সৃষ্টি করা আমাদের দেশে শক্ত নয়, এবং যুব সমাজকে যন্ত্রের মত এই ছজুকে মাতিয়ে তোলাও বঠিন কথা নয়। কিন্তু উত্তেজনা যদি ভিত্তিহীন হয়, তবে সেই কাজ আরম্ভ না করাই শ্রেয়। শক্তিকে সংহত না করে নিছক উত্তেজনায় উদ্বিগ্ন হওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই, সে শুধু যুতার পূর্ব লক্ষণ—বিকার মাত্র। অবশ্য আন্দোলনের ভাব-প্রচার ও ইংরাজকে ধাপ্পা দেওয়ার হিসাবে খানিকটা দরকার আছে; (যদিও ইংরাজ এখনও খুব ভাল করেই রাখে), তবুও যুব-সমাজ যেন একথা কখনও না ভোলেন যে, এ কাজের জন্ত প্রকৃতিগত ছজুকশ্রিয় লোকের অভাব কোনদিন হয় নাই, হবেও না। এর জন্ত, স্বরাজ্যদল, হিন্দুসভা, মোসলেম লীগ, কোউন্সিলের দাদারা, কংগ্রেস আরও কত সন্মিলন, সভাসমিতি পাল্লা দিয়ে রেস দিচ্ছে। ও আমাদের জন্ত নয়। আমাদের কর্ম-

কেন্দ্র একেবারে স্বতন্ত্র। তাই তাঁদের আন্দোলনের আড়ালে, আমাদের নীরব তপস্তার স্থান খুঁজে নিতে হবে। আমরা জন্মেছি আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিতে—যে কোন উপায়ে সমস্ত অজ্ঞায় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে—শুধু চেষ্টায়ে কঁাদতে নয়; আবেদন, নিবেদন জানাতে নয়। তা সে অজ্ঞায় বিদেশী আমলাতন্ত্রেরই হ'ক, বা রাজা মহারাজ, জমিদার, ধনিক, বণিক প্রেমহীন সমাজ বা প্রাণহীন ধর্মেরই হ'ক।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, হাওড়ায় যুব-সম্মিলনী করবার প্রয়োজন কি? কংগ্রেস রয়েছে, আরও কত সভা-সমিতি রয়েছে, তবে এর কি নতুন কিছু দেবার আছে? উত্তরে আমরা বলবো—আছে। যৌবনের উচ্ছ্বাসই—সৃষ্টির তরঙ্গ। আজ পর্যন্ত জগতে যা কিছু সৃষ্টি হ'য়েছে তার পশ্চাতে রয়েছে ঐ শক্তিমত্ত যৌবন। সব সময়ে এর রূপ বাইরে ফুটে না ব'লেই একে অস্বীকার করা যায় না। এই সৃষ্টি শক্তি বিভক্ত হ'লেই, পরস্পর আত্মবাতী শক্তির উদ্ভব ক'রে জাতিকে বিনষ্ট করে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, যুবশক্তিকে মূঠার ভিতর পুরে আপন কাজ হাসিল করতে সকলেই উন্মূখ। লক্ষ্যহীন এই শক্তি, পরস্পরার্থে এ ভাবেই আপন অস্তিত্ব নিঃশেষ করে আসছে। জগতের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী (imperialist) এবং রাজতন্ত্র শক্তি (aristocratic) এভাবেই যৌবনকে আপন স্বার্থে নিয়োজিত ক'রে আসছে এবং যেদিন দেশের যুব মণ্ডলী স্ফূর্তিশীল ও সজাগ হ'য়ে উঠে, সেদিন

অত্যাচারী শাসকের সিংহাসন ধূলিসাৎ হ'তে আর বড় বিলম্ব হয় না। অধিক কি, বর্তমান চীন, রুশিয়া ও জার্মানীরূপে কখনো একটু আলোচনা করে দেখলেই এ সত্য উপলব্ধি করা শক্ত হবে না। এদের ছাড়া সাম্রাজ্য অচল। সৈন্য, রাজপুরুষ, সাম্রাজ্য পরিচালনের সমস্ত বিভাগই দাঁড়িয়ে আছে এদেরই উপর। এদের ভিতর বিদ্রোহের বীজ উগ্ধ না হ'লে এ প্রাণহীন শোষণের শেষ কোথায়? মুক্তি যজ্ঞের পুরোহিত শ্রী লেনিন, ডাক্তার সান ইয়াং সেন প্রভৃতি এ কথার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আমাদের তথা কথিত নেতার দল এসত্য মোটেই বুঝিতে চান না। নিজেরা যেমন হুকুম ভাল বাসেন, ছেলেদেরও তেমনি তাতেই মাতিয়ে রাখতে চান—নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করতে। সে স্বার্থ দেশের স্বার্থের সঙ্গে কতটুকু জড়িত? বড় বড় কথার ফাঁকে ছেলেরা শুধু exploited হ'য়ে আসছে। নেতার আদেশ—তাই পালন করতে হ'বে, কেন না বলবার অধিকার নেই; তা হ'লেই তুমি দেশজোহী, এ কথাই বরাবর শুনে আসছি। বাংলার অস্ত্র জায়গার কথা জানি না, শুধু হাওড়ার কথাই বলি। এখানে যে একটা ভীষণ অভাব, আজ যুবসমাজকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তার কারণ কি? এতদিন তারা শুধু মস্তুর মত খেটেই এসেছে। বোঝে নাই কেন। এখন তারা দেখছে যে তাদের অতীতের আশা আজ ব্যর্থতার কালিমায় ভরে গেছে। তাই আজ তারা পুরাতনের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ঘোষণা

করেছে; আজ তারা আপন অধিকার, কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে নিতে চায়—ধাপ্পায় আর তারা ভুলবে না। এই সম্মিলনী তারই একটু বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হাওড়া জেলার বিচ্ছিন্ন যুবশক্তিকে সম্ববদ্ধ করে একটা কর্মপন্থার সৃষ্টি করা ও তাকে কাজে ফুটিয়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই সম্মিলিত যুব শক্তি কোন্ পথে চলবে, এই নিয়ে অনেকের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হ'য়েছে। এই কথাটা সকলকেই আমরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি যে, যে কোন একটা ছজুককে দেশের কাজ বলে মানতে আমরা আর রাজী নই। আমাদের একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও লক্ষ্য রয়েছে। আমরা চাই, ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্রের নামে যে ভণ্ডামী চলছে, তাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়তে। এই ভাঙনকে সফল করে তুলতে যতটুকু আয়োজন করা দরকার, তার রীতিমত ব্যবস্থা না করে আমরা বাতুলের আয় কোন কাজে ব্যাপ দিতে প্রস্তুত নই। তাই কংগ্রেস সভূতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক। প্রয়োজনে, আমরা একে ভাঙবো, গড়বো ও এর কর্মপন্থা নির্দেশ করবো।

এই হাওড়া জেলার মধ্যেই, আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ করবার অনেক কিছুই বাকী আছে। ৫৩০ বর্গমাইল নিয়ে, এ জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাস। বাঙ্গালার আর সমস্ত জেলা থেকে এই জেলাই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু প্রত্যেক বর্গমাইল হিসাবে লোক সংখ্যা প্রায় ১৯০০, অস্বাভাবিক

সব জেলার চেয়ে অধিক। এখানকার লোকের জীবনী শক্তিও সবচেয়ে বেশী, গড়ে প্রায় ২৫ বৎসর। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে চাষবাসের দিক দিয়ে কলকারখানার দিক দিয়ে, এই জেলা বাঙ্গালার অস্বাভাবিক জেলার চেয়ে অনেক বিষয়ে অগ্রণী, তবুও এই ক্ষুদ্র স্থানেও দুর্গতি, দুর্দশার অস্ত্র নাই। দেশের ছেলেরা যে দেশের উপর দরদী নয়, এই কথা বললে, তাদের উপর অস্বাভাবিক করা হ'বে। সেই স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে, আজ পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করতে ও নির্যাতন সহ্য করতে হাওড়ার ছেলেরা কোনদিন পশ্চাৎপদ হয় নাই, এর খবর দেশবাসী না জানলেও আমলাতন্ত্র খুব ভাল করেই জানে। তারা জেলও খোটছে, তিলে তিলে আপন জীবন নিঃশেষও করেছে। দেশের ডাকে, এ সমস্ত বিপদকে ত তারা কোনদিন গ্রাহ্য করেনি। তবে আজ তাদের এ দুর্দশা কেন?—আজ এ প্রশ্নটাই সকলের মনে বার বার ঘা দিচ্ছে।

এ কথাটা সবাই বাধ্য হ'য়ে স্বীকার করেছে যে, তীব্র আত্ম-কলহ এখানেও যুব সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিদেশী রাজশক্তি এর জন্ত কতটা দায়ী? আর নেতৃবৃন্দ, ও দাদা-বাবাই কি এই বিচ্ছেদের মূলে কতখানি আছেন, তা আজ বিশেষ করে ভাবা দরকার। স্বদেশ-সেবার এই মহাত্মত্বের ভিতর যৌবনের আত্মকলহের মূল কোথায়—কে বলবে? যুব-সমাজ তো নেতৃত্ব বা পদমর্যাদার কান্ডাল নয়। তারা শুধু কাঁধেই আত্ম সমাহিত, ত্যাগেই গৌরবান্বিত। যেখানে একই মত, একই

পথ, একই লক্ষ্য,—সেখানে একশক্তি শতধা বিভক্ত হয় কেন—এ সমস্তার সমাধান ও বিশ্লেষণ আজ আগাদেরই করতে হ'বে। বিভিন্নদেশে দেখতে পাই, বিভিন্নদল গড়ে ওঠে বিভিন্ন মত ও পথকে আশ্রয় করে। সেখানে Liberal, Conservative, Labour,—Communist, Social Democrat, Fascist প্রভৃতি—বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়—বিভিন্ন মতকে আশ্রয় করে। এর তবুও কতকটা অর্থ আছে। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে প্রায় সমস্ত ব্যাপারই একটা অদ্ভুত ধরণের। এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। নূতন ও পুরাতন দাদার গণ্ডি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে; এবং একই শক্তি পরস্পর বিরোধী আবর্তে সৃষ্টি করেছে। মুখে এদের দেশোদ্ধারের বড় বড় বুলি। কিন্তু কাজে দেখতে পাই, এদের দেশের কাজ মানে—পরস্পরের কুংসা রটানো ও পরস্পরের ক্ষত্রতা সাধন। এর সর্বশেষে প্রভাব থেকে হাওড়া যে একেবারেই মুক্ত, আমি তা বলি না। বরং এখানেও আত্মপ্রত্যাহার যথেষ্ট রয়েছে। বিভিন্ন বর্গের যে কোন পরিষ্কার মতবাদ রয়েছে, তার আবিষ্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। “আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা, কাজেই আমাকে অনুমরণ কর—” কাকে রাখি, কাকে দেখি।

হাওড়ার কোন C. I. D. officer কে বলতে শুনেছি, “যদি আরও ছ'চারটে Conference হাওড়ায় হয়, তবে আর আমাদের কাজ থাকেনা।” যখন পুলিশের মুখে এত বড় বিজ্ঞপের কথা বার

হ'তে পারে, তখন দেশের আজ কতবড় দুর্দিন। এ কথা কি হাওড়ার ছেলেরা ভাবেন না? নেতৃত্বের চাপে আজ আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। এসমস্ত দাদাদের প্রভাব থেকে যুগশক্তির আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। যে মত সভা, যে পথ সভা, সে মত এবং পথকে সমস্ত জাতি গ্রহণ করবেই। কিন্তু যদি ব্যক্তি বিশেষ আপনার অভিজ্ঞতার বা অতীত গৌরবের দোহাই দিয়ে আপন মত জোর করে চালাতে চান, তবে তাঁর লাঞ্ছনার আর পরিসীমা থাকবে না।

সুব-সমাজ দিনের পর দিন সজীব হ'য়ে উঠছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সত্যতা আজ মর্মে মর্মে অনুভব কোরছে। আমরা অনেক প্রবর্তিত হয়েছি। আর সময় নষ্ট করতে চাই না। স্বামীজির বাণী আজ ধ্বনিত হচ্ছে “Begin with disbelief; realise, prove, test and then take it, কল্লীর কল হ'তে মুক্ত হ'বার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু এ'ত আমাদের মুক্তি দিচ্ছে না। লাহোর কারাকক্ষে যে মহাপ্রাণ মুকুলেই ঝবে গেল, সে যতীন্দ্রনাথ কি শুধু ৬৩ দিন অনাগারে প্রাণ দেবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। না, বৈঁচে থাকলে বোধহয় তাঁকে দিয়ে জাতীয় জী-নের কোন এক বড় অধ্যায়ের উদ্ঘাটন সম্ভব হত। এ অকাল মৃত্যুর জন্য শুধু কি বিদেশী আমলাতন্ত্রই দায়ী না অন্য কারুর দায়িত্ব এতে রয়েছে। তাঁর সমাধির উপর বসে এখনও কি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলতে পারব না? অনেকে হয়তো একে আশ্রয় করে

নিজের মহিমা বৃদ্ধির পথ খুঁজবে। সে পথের আগল আটকে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে। এ দণ্ডিচীর আশ্রয়ান যেন বুধাই না যায়।

এইবার আমরা কি করতে চাই তার একটু আলোচনা ক'রে অভিভাষণ শেষ করব। প্রথমেই বলেছি “আমরা চাই সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের নামে যে ভণ্ডামী দেশে চলছে, তা'কে নির্মম আঘাতে গুঁড়ো করতে।” প্রথম আমাদের অনুসন্ধান কোরতে হবে এই সমস্ত অজ্ঞায়ের প্রতীকগুলি দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর, তার মানে দেশের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান আমাদের কোর্টে হবে। জ্ঞান ও কর্মের প্রসার ঐ লক্ষ্যেরই বিষয়ভূত কোরে আমাদের চালাতে হবে। আমাদের দেশের সমস্ত ধর্মের আমলাতন্ত্রের নখাগ্রে, কিন্তু তা'র কণ্টক আমাদের নেতৃবৃন্দ জ্ঞানের বা জ্ঞানবীর চেষ্টা কেনে। যৌবনের গতি ভিন্ন পথ খুঁজছে বলেই এ সমস্ত ধর্ম-ধর্মের প্রয়োজন তা'দের সবার চাইতে বেশী। আর এরই সাথে সাথে চল ব আয়োজনের পালা। ইংরাজ আমলাতন্ত্রের শক্তি যাই, সামাজ্য বলে নেতৃবৃন্দ প্রচার করুন না কেন, আমাদের তুলনায় তা'দের সুবিধা অনেক বেশী। অর্থাল লোকবল, রেল, টেলিগ্রাফ, এমন আরও কত কি দিয়ে তারা আমাদের এমনি অষ্টে পিষ্টে বেঁধ রেখেছে যে, এই বাঁধনের বাইরে চলবার পথ বড়ই সঙ্কীর্ণ। প্রত্যেক বিভাগেই তা'দের বড় বড় মাইনে করা, উচ্চশিক্ষিত লোক (Highly paid whole time worker and specialists) দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম

ক'রছে। আমাদের অবস্থা একবার ওদের সাথে তুলনা করে দেখুন। ওদের এক একজন কর্মী রাত্রি দিন অবিশ্রাম কাজ ক'রে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে। আর আমরা চাই কীকে কাজ হাসিল কোর্টে। ওরা দিনের পর দিন এই নিয়ে ভারছে ও এ কাজেই মেতে আছে। কিন্তু আমরা শুধু দুটো বক্তৃতা ও একটু হজুক হৈ চৈ করেই কর্তব্য শেষ করতে চাই। ইংরাজ কিন্তু রক্তচক্ষু ও বক্তৃতাকে ভয় করে না। আমাদের শৈথী জিনিষটাকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সমস্ত শক্তিও প্রায় লোপ পেয়েছে। আমরা শুধু মাতামাতিই করি, আর ছেড়াছেড়ি নিয়েই বাস্তব। কিন্তু আজ বিধাহীন হয়ে জিজ্ঞাসা করছি “কাদের প্ররোচনায় আমরা এমনিভর করি?” আমাদের দেশসেবার এই মামুলী, ধরা-বাধা পথ বদলে নুন পথ গড়তে হবে। এর জন্ত চাই, একদল (তা' সে সংখ্যায় যত কমই হোক না) সর্বভাগী কর্মী। পরিবর্তন আনতে হলে পেশাদার স্বদেশ কর্মীর একান্ত প্রয়োজন। এরা শুধু বিকেন্দ্রিক দেশের কাজে কাটাবে না, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবে। এই প্রসঙ্গেই রুশ বিপ্লবজ্ঞের গুরু লেনিন বলে গিয়েছেন “It is better to get hold of ten able men than hundred dullards. By able men I mean, men, who will devote to the revolution not only their free evenings but their whole life. I mean professional Revolutionaries. There must be

division of work and each man must be trained to the task.

আমী বিবেকানন্দও বলেছেন “দশটা মানুষ পেলে আমি ভারতবর্ষ উল্টে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ চাই পশু নয়।” Give me ten men, I will revolutionise India, I want men not brutes.”

আমাদের এই ভাবে সর্বভাগী কর্মী সংগ্রহ করতে হবে। তাদের জীবনের ঐক্যতারা হবে স্বদেশ-সেবা। এঁরা দৈন্য ধরে নীরবে আপন কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে যেদিন উঠতে পারবে, সেদিনই প্রকৃত কাজ আরম্ভ হবে। এদের অনন্ত কর্মশক্তি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে একটা প্রবল কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করবে। আর সেই শ্রোত দেশ থেকে সমস্ত অস্ত্রাদ্রব্য দূর করে এই হুজুহ কাজ স্থগাধ্য করে তুলবে। যারা উদ্ধুদ্ধ গণশক্তি বা Mass consciousness এর স্বপ্ন দেখেন, তাঁদেরও আমরা বলি গণশক্তি আপন হাতে আজ পর্যন্ত কখনও উদ্ধুদ্ধ হয়ে ওঠেনি, উঠবেও না। জনগণের মনস্তত্ত্ব (Mass Psychology) এ নয়। এ সম্পর্কে লেনিনের কথা প্রণিধান যোগ্য “All mass consciousness dries up on holidays and Sundays wage payment,” হাতে কিছু পরসী আর এওটু

আমোদ করবার সুযোগ পেলেই জনসাধারণ সব-ভুলে যায়। সাধারণ শুধু হুজুহ করতে পারে, স্থায়ীভাবে একটা কর্মপন্থা অবলম্বন করা এঁদের ধাত নয়। তাই হুজুহ-মাতা নেতাদের হাতে প’ড়লেই এঁদের চূর্ণভিত্তির সীমা থাকে না। বিগত ধর্মঘটগুলো এ সত্য কতকটা প্রমাণ করছে।

গণশক্তিই জাতির মূলশক্তি, দেশকে বড় করতে হ’লে এদের প্রকৃত পথে চালাতে হবেই। এদের নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করবে, তা দের শোভাঘাত্রী, সখের স্বদেশী হলে চলবে না। যাঁরা চালাবেন তাঁরা হবেন সর্বভাগী, বিশেষজ্ঞ (Specialist) কর্মীর দল। তাঁরা নিভুতে তপস্বী করবেন। এই দলের চিন্তাশক্তি হবে গভীর আর কর্মশক্তি হবে অশীম। একদিকে যেমন জগতের সমস্ত চিন্তাধারার সঙ্গে এঁদের যোগ থাকবে, অন্যদিকে তেমনি দেশের সমস্ত তথ্যই এদের মখদর্পণ বিরাজ কোরবে। আজ এমন একটা সংগঠনের অভাব দেশে বিশেষ-ভাবে অনুভূত হচ্ছে; এখনও কি তা গড়বার সময় হয় নাই? আর কতকাল লক্ষ্যহারা হ’য়ে আলেয়ার পেছনে ছুটবো? আমাদের মস্তিষ্ক কি এতই বিকৃত? যে, কোন একটা কাজকে স্বদেশ সেবার কথা বললেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব? আর নয় অনেক হয়েছে, নূতন পথের আবিষ্কার আমাদের কর্তেই হবে। “বন্দেমাতারম্”

৩. মুক্তি! সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি !!

মাননীয় অধ্যক্ষনা সমিতির সভাপতি মহাশয়,
সমবেত ভক্তমহিলা ও ভক্তমহোদয়গণ,
আজ আপনারা শুভমুহূর্তে ও উপযুক্ত সময়ে
হাওড়া জেলা রাষ্ট্র সম্মেলনের আয়োজন
করিয়াছেন। জটিল হইতে জটিলতর সমস্ত দেশের
সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।
চণ্ডনোত্তির প্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক গগন
ঘনাকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। আসন্ন তুফানের
আগমনী গাতিবার জন্ত যেন মধ্যে মধ্যে দমকা
হাওয়া উঠিতেছে এবং বিজলী অট্টহাস্তে হাসিতেছে।
এই অবস্থার মধ্যে যাত্রী আমরা অনাগতের পানে
দৃষ্টি রাখিয়া আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভয়, ভাবনা বৃকে
লইয়া মুক্তির পথে চলিয়াছে।

আপনারা আজ আমার আহ্বান করিয়াছেন—
মাতৃপূজার যে আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে
আমাকেও যোগদান করিতে হইবে। যোগ্যতার
বিচার আপনারা করেন নাই কারণ ভাবপ্রবণ
হাওড়াবাসী আপনারা, বিচার না করিয়াই আজ
পর্যন্ত আমার উপর অপরিমিত স্নেহ বর্ষণ করিয়া
আসিতেছেন, তাই আমিও নিজের যোগ্যতা নির্ণয়
না করিয়া সাধ্যমত আপনাদের সকল আহ্বানে সাড়া
দিয়া আসিতেছি।

মাত্র কয়েকদিন হইল এই নয়দানের নিকটেই

আপনারা একজন মহাবীর, মহাত্মাগী, অমিত তেজ
শহীদ বাঙ্গালী যুবকের প্রতি আপনাদের প্রীতি
জ্ঞাপনের জন্ত বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন—
সারা রাত্রি জাগ্রতি বর্ণ ধর্ম নিবিশেষে আবাল বৃদ্ধ
বণিতা শত সহস্র ভারতবাসী দলে দলে আনিয়া
আপন আপন প্রীতি ভক্তি গুণ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া
গিয়াছিলেন।

তরুণ কর্মী যতীন্দ্রনাথ দশীচির তপস্তায় সিদ্ধ
হইয়া এই পরাধীন ভারতবর্ষে আবার স্বাধীনতার
আশ্রয় ছালাইবার জন্ত নিজের অস্থিপুঞ্জ রাখিয়া
গেলেন; সেই অস্থিগুলি স্মৃদুর লাহোর হইতে বৃকে
করিয়া আনিয়া ভারতবাসী কেওড়াতলা শ্মশানে
গঙ্গার তীরে বজ্রানল ছালিয়াছিল, এবং এই যজ্ঞ
সমাপন করিয়া পবিত্র চিতাভস্ম মস্তকে ধারণ
করিয়াছিল। হে যতীন্দ্রনাথ! ঐ পূণ্য দিবসে
যে মন্ত্রে তুমি আমাদের দীক্ষিত করিলে তাহা হইতে
কোনও দিনই আমরা যেন ভ্রষ্ট না হই; তোমার
সঙ্কল্প, তোমার তেজ, তোমার ত্যাগ তোমার স্বদেশ-
প্রেম, তোমার কর্মক্ষমতা ও ভাবপ্রবণতা যেন
আমাদের প্রত্যেক ভক্ত বন্ধুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া
অগ্নিরে আমাদের জীবনের একটা রূপান্তর ঘটাইতে
পারে।

যতীন্দ্রনাথের অতুলনীয় আত্মবলিদানের ভিতর

দিয়া বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী, আবার প্রমাণ দিয়াছে যে মানুষ হিসাবে আমরা অল্প কোনও স্বাধীন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। গত দেড় শত বর্ষের মধ্যে আমরা পরাধীনতা ও বাবতীয় চুরাবস্থা সত্ত্বেও এবং মনুষ্য অর্জনের সুযোগ সুবিধা না পাইয়াও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব মহাপুরুষের পরিচয় দিতে পারিয়াছি—তাহাতে সমগ্র জগৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে এই জাতি মৃতপ্রায় নয়, মরণোচ্ছুক নয়, এ জাতি মরিতে পারে না—কারণ তার জীবনীশক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। এ জাতি বাঁচিতে চায় কারণ তার বাঁচিবার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। ভারতের যে একটা বাণী আছে; ভারতের যে একটা বিশিষ্ট সাধনা ও শিক্ষা আছে। ভারতের যে বিশ্বদরবারে দিবার মত কিছু সম্পদ আছে—ইহা কথার কথা নয়; ইহা সত্য। ভগবান যেমন সত্য; এ জগৎ যেমন সত্য, ইহাও তেমনি সত্য।

কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে দেশে এত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন সে দেশে জন-সামান্যের মধ্যে এত দুর্গতি, এত অবনতি, এত হতাশা। একদিকে মানবতার অতুলনীয় সম্পদ—অপর দিকে মানবরূপে পশুদেরই রাজত্ব; যেন একদিকে অপূর্ণ কারুকার্যখচিত, নানারক মণ্ডিত মর্মর প্রাসাদ এবং তৎপার্শ্বের ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীর ও পুতিগন্ধময় আবর্জনা ভূপ। এ অবস্থার প্রতিকার কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে কিরূপে সম্ভব? আজি বলি প্রতিকার নিশ্চয়ই সম্ভব। যদি আমরা

একবার আমাদের সাধনার ধারা বিপুলতার দিকে, সমাজের দিকে পরিচালিত করিতে পারি। আমাদের জাতীয় সাধনাকে—ব্যক্তিগতদের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভারতের ঘরে ঘরে এবং ভারতের পর্ণকুটীরেও লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে এবং শ্রেণীবর্ণনিরপেক্ষে ভারতবাসী সম্পদে ও গৌরবে মহীয়ান হইয়া উঠিবে।

আমি যাহা বলিলাম তার অর্থ এই যে, আমরা যদি অন্তরের সঙ্গে সমগ্র জাতির নবজাগরণ দেখিতে চাই তাহা হইলে সমাজ হইতে সকল প্রকারের কৃত্রিম বৈষ্য (man made inequalities) তুলিয়া দিতে হইবে এবং মনুষ্যের বোধনের ক্ষমতা সকলকে সমান সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিতে হইবে সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক, কোনও প্রকার কৃত্রিম গৈষম্য আর রাখিলে চলিবে না এবং পুরুষের দাসত্ব হইতে নারীকে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের সমাজের অবস্থা দেখিয়া কোনও কবি যেন আর না গাহিতে পারেন—

“পুরুষ অবকল্প আপন দেশে

নারী অবকল্প নিজ নিবাসে।”

বিশ্বমানবতার যে আদর্শ আমাদের বৈষ্ণব কবি গাহিয়া গিয়াছেন (সুদনহ মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে মাই) তাহা যেন আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে সার্থক ও মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারি।

রাষ্ট্রের সহিত সমাজের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ,

৪৬৭ মুক্তি ! সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি !!

তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমাদের সমাজের একটা আলোড়ন, একটা আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই রাষ্ট্রশক্তি কিরিয়া পাইব না বা রাষ্ট্র স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না। সমগ্র জাতি যে পর্যন্ত মুক্তিকামী না হইবে সে পর্যন্ত মুক্তিতে অসম্ভব। কিন্তু আপনারা বুকে হাত দিয়া বলুন তো—আমাদের অপরূপ নারী সমাজ, আমাদের উপেক্ষিত অল্পমত সমাজ, আমাদের নিপেষিত শ্রমিক ও কৃষক সমাজ কি ব্যাপকভাবে মুক্তিকামী হইয়াছে? আর তাহারা মুক্তিকামী হইবেই বা কেন, যদি তাহারা সমাজের ও অর্থের দাস হইতে মুক্তি না পায়? অর্থের বন্ধন যাহাকে অহোরাত্র নিপেষিত করিতেছে—সমাজের শৃঙ্খল যাহাকে নিরন্তর ক্লিষ্ট করিতেছে—সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন কি করিয়া দেখিবে যদি রাষ্ট্রীয় বন্ধন চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে অস্বাস্থ্য বন্ধন হইতে মুক্তি না পায়? বন্ধন মানুষ কখনও চায় না—মানুষ চায় মুক্তি, সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি, জাতির অন্ধকারময় জীবন-প্রেক্ষাগেষ্ঠে মুক্তির প্রদীপ জ্বলিয়াও যদি আশা করেন যে সমগ্র জীবন নূতন প্রেরণায় উজ্জ্বল হইবে না—তাহা হইলে সে আশা ছরাশা মাত্র। একদিকে স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিতে চান, কিন্তু অপর দিকে যদি “সাদা বিলের” প্রতিবাদ করিতে চান—তাহা হইলে দুঃখের সহিত আমি বলিব, “হে বন্ধু, আপনার মনোভাব আমি বুঝিতে অক্ষম।” বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের ভাবের ঘরে যে লুকোচুরি চলিতেছে তাহা চিরকালের তরে

পৌষ ৮২—৩

দূর করিবার জন্ত স্বাধীনতার সর্বজনীন বিকাশের কথা, মুক্তির প্রকৃত স্বরূপের কথা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার অর্থও ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়াছে। স্বরাজ বলিতে আমরা এক সময়ে মনে করিতাম “উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন;” কিন্তু আমরা এখন বুঝি “পূর্ণ স্বাধীনতা”। আমরা এক সময়ে মনে করিতাম যে রাষ্ট্রকে (State) দখল করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিব; কিন্তু সমাজের জীর্ণ কাঠামোতে হাত দিব না। কিন্তু এখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, পক্ষাঘাত ক্লিষ্ট অচলায়তন সদৃশ বার্কাকাগ্রস্ত সমাজের দ্বারা রাষ্ট্র বিপ্লব করা বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবপর নয়। সমাজের দেহে নবজীবন সঞ্চার করিতে হইলে সকলকে ডাকিয়া চিরকালের জন্ত বলিয়া দিতে হইবে যে, যে নূতন সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে চাই সে সমাজে প্রত্যেক মানুষ—কি পুরুষ, কি নারী—মनुস্মৃতির পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবে। জাতিভেদের বৈষম্য সেখানে থাকিবে না; নারী সেখানে পুরুষের সহধর্মিণী ও সমানাধিকারিণী হইবে; অর্থের দিক দিয়াও মানুষের সহিত মানুষের বৈষম্য থাকিবে না। এবং যাহারা ধান উৎপাদন করে সেই চাষা ও মজুর সম্প্রদায় তাহাদের নায্য দাবী লাভ করিবে। স্বাধীন দেশে স্বাধীনসমাজের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ স্বাধীনতার রক্তজিলক ললাটে লইয়া জন্মিবে এবং বর্দ্ধিত হইবে। মনুষ্যজাতির এবং

আন্দোলনের জন্ত সকলে সমান অযোগ ও সুবিধা ভোগ করিবে। এই সাম্যবাদই ভারতের মূল্য। এই মূল্য দিতে কি প্রস্তুত আছেন? যদি প্রস্তুত থাকেন, তবে বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবেন।

স্বাধীনতা লাভের জন্ত আমাদের পথ ও পাত্থ্য কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু পথ নির্ণয়ের একটা প্রধান উপায়—ইতিহাসের স্মরণ হওয়া। বাঙালীর ও ভারতের গত তিন বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে আমরা তিনটি যুগ দেখিতে পাই—(১) স্বদেশী যুগ (২) বিপ্লবের যুগ এবং (৩) অসহযোগের যুগ।

প্রথম যুগে আমাদের প্রধান অঙ্গ ছিল বিলাতী জব্বা বয়কট—বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র ও লবণ বয়কট। স্বদেশী যুগের উদ্দাম আন্দোলনের ফলে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইয়াছিল এবং মিন্টো-মর্লে সংস্কারের (Minto Morley Reforms) প্রবর্তন হইয়াছিল। উদ্ভূত আমলাতন্ত্রের শির অধীনত হইয়াছিল এবং তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও নাকচ হইয়াছিল। নূতন শাসন পদ্ধতি লাভ করিয়া অনেকে সন্তুষ্ট চিত্তে আন্দোলন ছাড়িয়া দিলেন—আমলাতন্ত্রও আসন্ন যুদ্ধ দেখিয়া চরমপন্থীদের নির্ধাতন আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে উৎসাহী কর্মী ও স্বদেশ-প্রেমিকেরা প্রকাশ্য আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া বিপ্লবের পথ গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে বিপ্লবের যুগ আরম্ভ হইল। ১৯১৮ বা ১৯১৯ পর্যন্ত

বিপ্লবীদের চেষ্টা চলিল। এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া কতকর্মী হাসিতে হাসিতে জীবনের জয়গান গাহিয়া ফাঁসিকাঠে উঠিলেন। আরও কতকর্মী দেশে ও বিদেশে কারাগারে ও বাহিরে কত নির্ধাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সাধনা ব্যর্থ হইল না। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই প্রচেষ্টার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু নূতন শাসন পদ্ধতি পাইয়া মডারেট সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইলেন ও দেশের অধিকাংশ লোক সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা চাহিয়াছিল স্বরাজ—Self-determination বা আত্মনিয়ন্ত্রণে অধিকার—কিন্তু তাহারা পাইল মর্টেগার মাকাল ফল। যখন অসন্তোষের বহিঃ চারিদিকে ছলিতেছে, তখন জালিয়ানওয়ালাবাদের হত্যাকাণ্ড তাহাতে ঘৃতাঙ্কিত প্রদান করিল এবং তাহা হইতে নির্গত হইল অসহযোগের ধুমরাশি। এই ধুমরাশির প্রভাবে আমলাতন্ত্রের চোখে একরূপ ধাঁধা লাগিয়াছে যে, সে আজও পর্যন্ত স্থির করিতে পারে নাই—যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় তার কি করা উচিত।

অসহযোগের মূলনীতি—আমলাতন্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া জনতাকে সজ্জবদ্ধ করা এবং জনতাকে সজ্জবদ্ধ করিয়া যে সহায়তা ও সহযোগিতার উপর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত তাহার ভিত্তি একেবারে ধ্বংস করা। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী নিজেদের জীবনদান করিয়া যখন দেশকে মুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন বৃথিতে হইবে যে

৪৩৯ মুক্তি ! সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি ॥

ভারতের জনসাধারণ যে পর্যন্ত না মুক্তিকামী হইবে এবং মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে সজ্জবদ্ধ হইবে—সে পর্যন্ত শুধু উপায়ে বা বিপ্লবের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর নয়।

জানি না দেশে এখনও এমন লোক আছে কিনা যাহারা মনে করেন যে আড়াইধানা বোমা ও দেড়ধানা পিস্তলের দ্বারা তাঁহারা ভারত উদ্ধার করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতের উদ্ধার সাধন অত সহজ নয়। আড়াইধানা বোমা ও দেড়ধানা পিস্তলের দ্বারা Terrorism করা যায়, কিন্তু করা যায় না Revolution, Terrorism ও Revolution এক কথা নয়। Terrorism মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা সজ্জবদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু Revolution সম্ভব হইবে শুধু সেই দিন, যেদিন সমগ্র জাতি জাগিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানে যেখানে Terrorism বা Revolution হইয়াছে ইতিহাসের সে সব অধ্যায় পর্যালোচনা করিলে এই কথাই প্রতিপন্ন হইবে। Revolution এর সৃষ্টি মানুষের চিন্তা জগতে এবং জাতির সাহিত্য ক্ষেত্রে। একথা জানে ইংরাজ—তাই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের উপর তাহাদের এত নির্মম দৃষ্টি এবং তাই ভারতবর্ষে Sedition এর একরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং Sedition দমনের জন্য একরূপ বিচিত্র আইন। Revolution অস্ত্রের দ্বারা সজ্জবদ্ধ হইতে পারে অথবা বিনা অস্ত্রেও হইতে পারে এবং Revolution এর সময়ে রক্তপাত হইতে পারে বা না হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কি একাধিকবার আমরা

রক্তপাতবিহীন বিপ্লব বা Bloodless Revolution এর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই না ?

Revolution কথাটি দেখিলে বা শুনিলে আমাদের প্রভুরা আজকে শিহরিয়া উঠেন। তাহারা সঙ্গে সঙ্গে রক্ত গঙ্গা ও হিমমুগের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন এবং ভয়-বাকুল চিত্তে সকল প্রকার অস্ত্র ও উপায় অবলম্বন করিয়া স্বকপোল-কল্পিত বিপ্লব নিবারণের জন্য বন্ধপরিকর হন। কিন্তু Revolution বস্তুটা কি এতই খারাপ ? Revolution এর অর্থ—অল্প সময়ের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন, যেমন Evolution এর অর্থ বহুদিনব্যাপী ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ। প্রকৃতি-দেবীর কোলে আমরা বড়, তুষান, বস্তারূপ Revolution মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি। কিন্তু কৈ তাহাতে তো কোনও আপত্তি করি না। ব্যক্তির এবং জাতির জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা Revolution এর কথা শুনিতে পাই; কিন্তু তাহাতে তো আমাদের নিজাভঙ্গ হয় না। Sir Hinders Petric মহাশয় Revolution of Civilization সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু সে বইতো Proscribed হয় নাই বা বে-আইনী সাব্যস্ত হয় নাই।

বস্তুতঃ Revolution এর সহিত রক্তপাতের বা অস্ত্রের অচ্ছেদ্য কোনও সম্বন্ধ নাই; বিনা রক্তপাতে (অর্থাৎ Bloodless) Revolution যে রূপে সম্ভব Non-Violent Revolution বা বিনা অস্ত্রে Revolution ঠিক সেই রূপ সম্ভব।

এ কথা আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভুলিয়া যান। এবং আমরাও মথো, মথো ভুলিয়া যাই; কিন্তু একথা যদি আমরা সর্বদা স্মরণ পথে রাখি তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ এবং পক্ষা সম্বন্ধে কোনও দিন ভ্রান্ত হইব না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে terrorism এর যুগ চিরকালের জন্য কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের প্রধান অস্ত্র mass organisation। নিজেদের স্বার্থের জন্য, নিজেদের দাবীর জন্য দেশবাসীকে একজোট করিতে হইবে, সম্মেলন করিতে হইবে। এই সম্মেলন আন্দোলন, বিশিষ্ট দাবী বা বিশিষ্ট অভিযোগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে যেখানে অভ্যুত্থান, যেখানে vested interests এর প্রতিকূলতা—সেখানে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিতে হইবে। হয়তো কখনও সমাজের উচ্চ বর্ণদের বিরুদ্ধে সত্যগ্রহ আরম্ভ করিতে হইবে; হয়তো কখনও ধনিক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গরীব-চাষী ও মজুরদের সম্মেলন করিয়া আন্দোলন চালাইতে হইবে; হয়তো কখনও রাষ্ট্রীয় দাবী আদায় করিবার জন্য আইন অমান্য বা খাজনা বন্ধ করিতে হইবে। এই উপায়ে দেশবাসী স্বার্থপরতা ভুলিয়া দেশের সঙ্গে মিশিবে এবং সম্মেলন হইয়া উঠিবে। ইংরাজজাতি এবং তাহাদের গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে তাহাদের অস্তিত্বের জন্য আমাদের উপর এতবেশী নির্ভর করে-যে, আমরা যেদিন জাতি হিসাবে সম্মেলন হইতে পারিব সেই দিনই আমরা আমাদের সহযোগিতা ও সহায়তা প্রত্যাহার করিয়া বন্ধুক

কাহান বিশিষ্ট আমলাতন্ত্রকে বিনা অস্ত্রেই আমাদের পদানত করিতে পারিব।

আমি স্বাধীনতালাভের উপায় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জাতির অবস্থা দেখিলে আমার কথার আরও সমর্থন হইবে। আজকাল general strike এর উপকারিতা ও অমোঘত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশেও অনেকে বিশ্বাসবান হইয়া উঠিতেছে, এতদ্ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই যে, রুশ জাতি বন্দুক কামানের শক্তির অপেক্ষায় propaganda র শক্তির উপর অধিক নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছে। আমি তো মনে করি যে, ইংরাজ জাতি যে পৃথিবীতে এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে—ইহার প্রধান কারণ তাহারা propaganda চালাইতে জানে। তাহারা জানে যে propaganda দ্বারা সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়—দুর্বল শক্তিমান হইয়া উঠে এবং যে শক্তিশালী সে দুর্বল হইয়া পড়ে। ইংরাজ জাতি বহুবার propagandার দ্বারা যাহা করিয়াছে অসংখ্য জাতি বন্দুক কামান প্রভৃতির দ্বারাও তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। এবং আজ যে বলশেভিকদের উপর ইংরাজেরা এত ক্রুদ্ধ ও সন্দেহান তাহার একটা একটা কারণ এই যে বলশেভিকরা এতদিন পরে propaganda র রীতি এবং propaganda র কৌশল জানিয়া ফেলিয়াছে।

কিছুকাল যাবৎ বাঙলার কংগ্রেস কমিটি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে propaganda চালাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে তাহারা

আমলাভ্যন্তর বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বক্তা ও প্রচারকদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কতকগুলি মামলা রুজু হইয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। যেদিন আমরা ইংরাজের নিকট propaganda র রীতি ও কৌশল ভালরকম শিক্ষা করিতে পারিব সেইদিন জানিবেন যে আমরা গুপ্ত মন্ত্রের অধিকারী হইয়াছি এবং আমাদের সিংহলাভের বিলম্ব নাই।

অসহযোগ নীতির উদ্দেশ্য সকল করিবার জন্য যে non-violent mass organisation আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহার প্রধান উপায় ব্যাপকভাবে propaganda—এই propaganda র দ্বারা দেশবাসীর মনোজগতে বিপ্লব আনিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহারা স্বীয় স্বার্থরক্ষার ও দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সজ্জবদ্ধ হইয়া উঠিবে। Seely Meredith Townsend প্রমুখ চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক এই অবস্থার করুণা করিয়াছেন যে, যেদিন ইংরাজের রাজত্ব আর মুহূর্তের জন্য টিকিতে পারিবে না।

স্বাধীনতার পরিপূর্ণ রূপের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে গণ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে একরূপ কর্মী সৃষ্টি করা চাই। ভবিষ্যতের কাজের জন্য যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা-যোগ্যতা বিশিষ্ট কর্মী আমরা চাই সেরূপ অধিকসংখ্যক কর্মী আজ পাওয়া যায় না। একরূপ আদর্শকর্মী সৃষ্টি করিবার জন্য যুব আন্দোলনের ও ছাত্র আন্দোলনের আবশ্যকতা হইয়াছে; যুব আন্দোলনের দ্বারা

উদ্দেশ্য যুব সমাজকে সকল রকমে আত্মপ্রত্যায়ী, স্বাবলম্বী ও যোগ্য করিয়া তোলা। পরের উপর বা বৃদ্ধের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, যাহারা ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী সেই তরুণ সমাজকেই নতুন জাতি সৃষ্টির গুরুভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে।

ছাত্রজীবনেই মানুষের চরিত্র গঠন হইয়া থাকে—তাই ছাত্রসমাজকে সকল রকমে যোগ্য করিয়া তোলার জন্য ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের ছাত্রেরা যদি শিক্ষা দীক্ষায় কৃতী হইয়া উঠে এবং চরিত্রবলে বলিয়ান হইতে পারে তাহা হইলে তাহারা অধ্যয়ন সমাপন করিয়া আদর্শকর্মী রূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ ছাত্র আন্দোলনের সহিত যুব আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ছাত্র-আন্দোলন ও যুব-আন্দোলন—এই উভয়ের প্রত্যাব ও চেষ্টার দ্বারা দেশে আবার মনুষ্যত্বের বোধন হইবে, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া ভারত কোনও দিন দরিদ্র হয় নাই—আজও দরিদ্র নয়। কিন্তু আমাদের সাধারণের অবস্থা অতীব শোচনীয়। আমাদের সাধনা বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্যক্তিহুমুখী হইয়া পড়িয়াছে—আমরা ব্যক্তির ফুটাইবার দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়াছি—সমগ্র সমাজকে উন্নত করিবার জন্য সে রূপ চেষ্টা করি নাই; তাই আমরা সচরাচর মিশিয়া মিশিয়া কাল করিতে পারি না—একজনের নিকট মাথানত

করিতে হইলে আমরা অপমান বোধ করি এবং আমরা স্ব স্ব প্রধান ও পরশ্রীকাতর হইয়া পড়িয়াছি। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা করিতে করিতে আমরা অহঙ্কারে মরি এবং আমাদের এরূপ বিচিত্র মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে যে, তার বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়—“দেশ উদ্ধার যদি হয় তবে আমার দ্বারাই হউক, নতুবা হইয়া কাজ নাই।”

জাতীয় চরিত্রে এই গলদ দূর করিবার জন্য চাই discipline এবং discipline শিখাইবার জন্য চাই—Volunteer movement এর প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছি। বাধা পাইয়াছি অসংখ্য দেশী, বিদেশী কত লোকই ঠাট্টা করিয়াছে, বাধাও দিয়াছে। কেহ কেহ আবার বহু পরিশ্রম করিয়া দোষ ধরিয়া ছিন্ন অঙ্গেষণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি যে Volunteer movement যদি বাঙলাদেশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে তাহা হইলে বাঙালীর চরিত্র হইতে একটি দূরপন্থের কলঙ্ক চিরকালের জন্য বিদূরিত হইবে। বাঙালী তখন ধর্মে কঠোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শৌর্বে বীর্যে, সর্ববিষয়ে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে।

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে গত কলিকাতা কংগ্রেসে জাতির পক্ষ হইতে একটি দাবী ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং ঐ দাবী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিবেন কি না তাহা স্থির করিবার জন্য এক বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল। দাবী যদি গ্রাহ্য না হয় তাহা হইলে ১লা জানুয়ারী ১৯০৭ হইতে আমরা কি করিব

তাহাও একরকম বলা হইয়াছে। আমি মনে করি—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কংগ্রেসের দাবী স্বীকৃত না হইলে সাহেব কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর প্রস্তাবটা কার্যকরী করিবার আমরা কি করিব তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। কলিকাতা কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে এই বৎসর পূর্ণ অসহযোগের জন্য (অর্থাৎ আইন অমান্ত, খাজনা বন্ধ প্রভৃতির জন্য) দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে। দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য কংগ্রেস কমিটিগুলির পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতীজগৎ বর্জন এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। এখনও আমরা প্রতিবৎসর প্রায় ১১০ কোটি টাকার বিলাতী মাল খরিদ করিতেছি এবং তার মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি টাকার বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতেছি। সুতরাং আমাদেরই অর্থের দ্বারা প্রায় এক কোটি ইংরাজ নিজের ঘরে বসিবার প্রতিপালিত হইতেছে। আমরা যদি নিরস্ত্র উপায়ে এবং কোনও প্রকার শাস্তিভঙ্গ না করিয়া এই বিলাতীমাল ক্রয় বন্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে বিলাতে এক কোটি ইংরাজের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন। অসহযোগ অস্ত্র ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারিলে যে তাহা অব্যর্থ এবং অমোঘ তার আর একটা কারণ এই যে ইংরেজ এ দেশে এবং নিজের দেশে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমাদের উপর নানানভাবে নির্ভরশীল এবং আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা

৪৪৩ মুক্তি। সকল প্রকার বর্জন হইতে মুক্তি ॥

বাতিরেকে কোটা কোটা ইংরেজ একদিনের জন্তও
জীবন ধারণ করিতে পারে না।

সম্মুখে যে সব সমস্যা পড়িয়া আছে তাহার
সমাধান করিতে হইলে এবং সমস্ত দেশকে পূর্ণ
স্বাধীনতার দিকে লইয়া যাইতে হইলে, অবিলম্বে
ছুইটা কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে।
প্রথম কাজ সামরিক প্রণালীতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী
গঠন এবং দ্বিতীয় কাজ শ্রমিক আন্দোলনে অন্তরের
সঙ্গে যোগদান। আমি একথা বলিতে বাধ্য যে,
এখনও পর্যন্ত এই দুইটি কাজের দিকে নেতৃবৃন্দের
দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। দেশের বর্তমান
অবস্থায় কোনও নেতা যদি নূতন programme
বা কর্মপ্রণালী দিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে
এই দুইটি কার্য কর্মজালিকার পুরোভাগে রাখিতে
হইবে।

আর একটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ
করিব। দেশের অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ দাঁড়াইতেছে
তাহাতে আমার মনে হয় যে, আগামী বৎসর আমরা
আবার একটা বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে
পারিব; গবর্ণমেন্টের বর্তমান দমননীতির দ্বারা ইহার
প্রতিরোধ হইবে না। এই উদ্ভাদপূর্ণ আন্দোলনের
সময়ে সহস্র সহস্র কর্মীর প্রয়োজন হইতে পারে।
তাহা যদি হয়, তবে বাঙলার ছাত্রসমাজকে আর
একবার স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হইতে হইবে। তবে এবার অধ্যায়ন ত্যাগ করিতে
হইবে চিরকালের জন্ত নয়—শুধু একবৎসরের জন্ত
জ্ঞাত স্বাধীন দেশে যুদ্ধের সময়ে ছাত্র সমাজ যেরূপ

স্কুল কলেজ খালি করিয়া রণভূমির দিকে ধাবমান
হন, প্রয়োজন হইলে আপামী বৎসর বাঙলার ছাত্র-
সমাজকেও তদ্রূপ স্কুল কলেজ খালি করিয়া কর্ম-
ক্ষেত্রের পানে ছুটিতে হইবে। তারপর যদি এক
বৎসরের শেষেও সংগ্রাম চলে, তখন ১৯৩১ সালে
আবার আর এক নূতন দল আসিয়া, কর্মক্ষেত্রে
নামিবে এবং পুরাতন দল তখন ইচ্ছা করিলে
কর্মক্ষেত্রে হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অধ্যায়ন
কার্যে পুনরায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে।
অভিভাবকবৃন্দ হয়তো আমার এ কথায় রুষ্ট হইবেন
কিন্তু উত্তরে আমি বলিব—“যদি স্বাধীনতা চান—
তবে নাশ্র: পক্ষা বিজ্ঞতে অয়নায়।”

সমবেত ভক্তমণ্ডলী। আমার অভিভাবণ শেষ
হইয়াছে। নূতন কথা হয়তো কিছু বলি নাই—
কিন্তু কাজের কথা বলিয়াছি—অভিজ্ঞতার কথা,
অন্তরের কথা শুনাইয়াছি। দেশের কোনও কোনও
স্থানে এখন দলাদলি দেখা যাইতেছে—ইহাতে যে
আমরা সকলেই দুঃখিত ও মর্মান্বিত হইয়াছি সে-
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দলাদলি করে
তাহারা—যাহারা কাজ করে না, করিতে চায় না—
অথবা যাহারা discipline মানিতে চায় না।
কাজ করিলে বহু শৃঙ্খলা মানিয়া চলিলে মাহুষ
দলাদলি করিতে পারে না—করিবার অবসরও
পায় না। এই দলাদলিতে ভীত হইবার কোনও
হেতু নাই। কারণ অদূর ভবিষ্যতে যদি সকলে
আবার রাজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় তখন
আপনা-আপনি দলাদলি খামিয়া যাইবে। এবং

আমরা যদি তরুণ সমাজকে discipline শিখাইয়া কর্মক্ষেত্রে নামাইতে পারি তাহা হইলে দলানলির বীজ চিরকালের স্বরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আমলাতন্ত্রের দমন নীতি দিন দিন ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছে। একে একে আমাদের কর্মীরা লৌহকপাটের দিকে চলিতেছে। আমরা কি বসিয়া থাকিব? এই তো আমাদের মাহেশ্রবণ! বুধা তর্ক ও সমালোচনা ছাড়িয়া আশ্রয় আমরা সকলে একসঙ্গে কর্মসমূহে ঝাঁপ দিই। ভীরে আমরা একদিন পৌছিবই পৌছিব—কারণ পার্থসারথি নিজেই যে আমাদের পথ প্রদর্শক। ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; ভারতের সম্ভাবনা আবার শির উন্নত করিয়া দেশ-

বিদেশে পরিভ্রমণ করিবে এবং ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আবার বিশ্বদরবারে সমাদৃত হইবে। আজ বাঙালী, তথা ভারতবাসী, অস্ত্রের সহিত বিশ্ব করে যে, সে মুক্ত হইবে, কারণ মুক্ত হইবার শক্তি সে নিজের অস্ত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাই আজ আর আমরা দুর্বল নই, কালাল নই—ভিখারী নই। আমরা আবার মানুষ হইয়াছি। পূর্ণ মানবতার পৌরবে আমরা আজ বলীয়ান। অতএব আশ্রয়—সকলে ভেদ বিসম্বাদ ভুলিয়া মাতৃপুত্রার জন্ত সমবেত হই; জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অর্ঘ্যরূপে লইয়া মাতৃচরণে উপস্থিত হই এবং গলগল্যাকৃতবাসে সকলে সম্মুখে প্রার্থনা করি—“জননী। জাগৃহি।”

“বন্দেমাতরম্”

৪. দেশবদ্ধ ও জাতিগঠন

দেশবদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে—অনেক কিছু বলা হয়েছে; কিন্তু লেখবার ও বলবার কথা অনেক বাকী আছে। বোধ হয় আসল কথাগুলিই বলা হয়নি। আমি আজ তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের একটা দিকের উল্লেখ করব—যেটার অভাব আমরা সকলেই আজ কাল খুব বেশী অনুভব করছি।

দেশবদ্ধুর অপরিমেয় মানসিক তেজ ও শক্তি ছিল। তাঁহার কর্ম জীবনে যত প্রতিকূল শক্তি

সামনে এসেছিল—সবই তাঁহার অপ্রতিহত বীর্ঘ্যের নিকট পরাভব স্বীকার কবেছিল। তিনি তাঁহার বিজয়-বাহিনী দুর্বীর বিক্রমে যথেষ্ট পরিচালিত করতে পারতেন। এ সব কথা আমরা জানি—কিন্তু আজ জামবার প্রয়োজন হয়েছে—কি করে তিনি ঐ অলৌকিক শক্তি লাভ করলেন। যে শক্তি দেখে—কি দেশবাসী, কি ইংরাজ—সকলেই চমকিত হতেন, সে শক্তি কি আশ্রয়—লুক্ক না সাধনা ক্রান্ত?

সব শক্তিই সাধনা-প্রসূত—অন্ততঃ আমার বিশ্বাস তাই—এবং যাহা আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণ-লব্ধ বলে মনে হয়, তাহাও পূর্বজন্মের সাধনার ফল। দেশবন্ধু যখন বিলাত থেকে ফিরে কলকাতায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন তখন তিনি একরকম নিঃসম্বল ছিলেন এবং পিতৃ-ঋণের বোঝার চাপে তিনি অবসন্ন প্রায়। তাঁহার সম্বল ছিল একটি মাত্র—সেটি অন্তরের সম্বল। প্রাণমন ঢেলে কাজ করবার শক্তি তাঁহার ছিল। সেই পাথের নিয়ে তিনি ছত্তর সাগরে জীবন-তরী ভাসিয়ে ছিলেন। তাঁর প্রথম সুযোগ এল—আলিপুর বোমা মোকদ্দমার সময়ে। মোকদ্দমা হাতে নিয়ে তাঁর আর দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। দিনরাত ভেে খাটতেনই—সংসার খরচ চালাবার জন্ত নিশ্চিন্ত মনে ধার করতেন এবং যতদিন মোকদ্দমা চলছিল ততদিন নিজের সংসারের খোঁজখবর আর রাখতেন না। তিনি আগে থেকে বলে রেখেছিলেন যেন সংসারের কোনও কথা নিয়ে কেহ তাঁকে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না করেন এবং সে সময়ে পুত্রকন্টার কঠিন গীড়া হলে একটীবারও দেখতে যাননি। একরূপ আত্মস্তিক অনশ্রুমনা নিষ্ঠার ফল তিনি হাতে হাতে পেলেন। মোকদ্দমায় তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হলেও সাফল্যের গৌরবে তিনি মগ্নিত হলেন এবং সাফল্যের ফলস্বরূপ তাঁর যথেষ্ট পসার আরম্ভ হ'ল। তারপর থেকে প্রায়াকটমের জন্ত আর তাঁকে চিন্তা করতে হয়নি।

সারাজীবন দেশবন্ধু যখন যে কাজের ভার পোষ ৮২—৪

নিতেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন। সে তত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আর অন্যকোনও চিন্তা থাকত না। যাঁরা তাঁর সমগ্র কর্মজীবন দেখেছেন—তাঁরা এই কথার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন। এই আত্মনিমজ্জনের দ্বারাই তিনি অপরিমিত শক্তি লাভ করতেন। জীবন না দিলে কখনও জীবন পাওয়া যায় না। সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে ষোল আনা আত্মদান ক'রে, যে ব্যক্তি কাজ করে—তার চিন্তের মধ্যে এক অজ্ঞানিত দ্বার উন্মুক্ত হয়—এক অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলে যায়। সে তখন নিজেই বুঝতে পারে না এত শক্তি তার কোথা হতে এল। ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম বা নামকীর্তনের দ্বারা যে অল্পভূতি মানুষ সব সময়ে পায় না ও যে সম্পদ সব সময়ে তার ভাগ্যে জোটে না—সে তাহা সহজে লাভ করিতে পারে যদি নিজাম কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ষোল আনা বিলিয়ে দিতে পারে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত যখন আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হ'ল, তিনি তখন ভোগ ও ঐশ্বর্যের রাস্তা ছেড়ে সপরিবারে ত্যাগ ও নিবৃত্তির মার্গ অবলম্বন করেছেন। বাহিরের লোকেরা এখনও সন্দেহ করতেন তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ পথে চলতে পারবেন কিনা এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্পন করতে শুরু করলেন তখন তাঁহার শত্রুপক্ষরা এই কথা প্রচার করতে লাগলেন যে দেশবন্ধু এখন “পুনর্মুখিকো ভব” নীতি আশ্রয় করেছেন। কিন্তু আমরা—যাঁরা তার অন্তরের

পরিচয় কতকটা রাখতুম—জানতুম যে তাঁহার কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনের নামাস্তর নয় এবং তিনি অসহযোগের যে ভাগের যে পথ একবার গ্রহণ করেছেন তা থেকে আর কোন দিন ভ্রষ্ট হবেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সাময়িক প্রভাবের দরুণ অসহযোগী সাজেন নি। ১৯২১ এর পূর্বেই তিনি মনে মনে এতটা বিরাগী হয়েছিলেন যে তাঁর নিকট প্র্যাক্টিস ভ্যাগ করা মোটেই কষ্টকর বোধ হয় নি; তিনি অন্তরের “স্বধর্মের” প্রেরণায়ই ঐশ্বর্যের পথ ছেড়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্ম নিবেদন করেছিলেন। সেই জন্মই প্র্যাক্টিস ছাড়ার পর স্বপ্নের চাপে ক্লিষ্ট হলেও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার পারিশ্রমিকের (fees-এর) প্রলোভন সহজে পায়ের তেলতে পেরেছিলেন। গয়া কংগ্রেসের পর সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্ম দ্বারে দ্বারে ঘুরেও যখন তাঁর শূণ্য থলি ভরল না তখন তাঁর অমুচরদের মধ্যে কেহ কেহ বলতেন যে লোকের দ্বারে ভিক্ষা করে লাঞ্ছিত না হয়ে তিনি যদি এক আধটা মোকদ্দমা করেন তবে আমাদের সব অভাব মিটে যায়। কিন্তু সে কথায় তিনি কণপাত করেন নি; কারণ টাকা অপেক্ষা আদর্শ ছিল তাঁর কাছে বড় এবং অসহযোগ নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা তখন ছিল আমাদের সব চেয়ে বড় কর্তব্য। বস্তুত টাকার অভাব মানুষে মিটাতে পারে কিন্তু মানুষের অভাব টাকায় কখনও মিটে না। টাকার অভাব সঙ্গেও অক্ষুণ্ণ আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা যে কাজ হয়, বহু অর্থের দ্বারা তাহা হয় না। সবদেশে ও সবকালে আদর্শের স্থান টাকা অপেক্ষা

অনেক উচুতে। আদর্শের দ্বারাই মানুষ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের দ্বারাই অর্থ সংগৃহীত হয়—কিন্তু শুধু অর্থের দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয় না বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় না। এতটা আদর্শবাদী না হলে দেশবন্ধু তাঁহার প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অগ্রাহ্য করেও পূর্বকার সকল সহকর্মী ও বন্ধুদের ভ্যাগ করে অপরিচিত কর্মীদের নিয়ে অসহযোগের অজানা পথে চলতে সাহসী হতেন না এবং অবলীলাক্রমে রাজ সন্তোষ ছেড়ে সপরিবারে তাপসের বেশ ধারণ করতে পারতেন না।

কর্ম জীবনের এই আত্মস্তিক আত্মদান ও আদর্শ শ্রীতি ধর্মজীবনে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীরাধার (আরাধনা করে এই অর্থে রাধা) আপন-ভোলা আত্মহারী কৃষ্ণ প্রেমে পরিণত হয়। তাই মহা-শক্তিশালী কর্মবীর দেশবন্ধু ছিলেন ধর্মজগতে বৈষ্ণব। আপাত দৃষ্টিতে বৃষ্ণতে পারা যায় না যে যে ব্যক্তি এত বড় ব্যারিষ্টার, এত বড় তাকিক, এত বড় বাগ্মী, এত বড় কর্মী,—সে কি ক’রে প্রেমিক বৈষ্ণব হয়। কিন্তু আর কেহ জামুক বা না জামুক—বাল্যলীলা মাত্রেই জানে যে পণ্ডিত কুলাগ্রগণ্য, তর্কচূড়ামণি, অখিল-শাস্ত্র পারঙ্গম জগন্নাথ-নন্দনই প্রেমাবতার গৌরাজে পরিণত হয়েছিলেন এবং বিষ্ণুপদ দর্শনে তাঁহার প্রেমাত্মক বস্ত্রায় সাংখ্য ও জ্ঞানশাস্ত্র ভেসে গিয়েছিল। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি কি কারণে, কি উপায়ে, কি কৌশলে দেশবন্ধু এত বড় তাকিক বাগ্মী ও ব্যবহারাজীবী হতে পেরেছিলেন

তাহলেই বুঝতে পারব তাঁর পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করা কি ক'রে সম্ভব পর হ'ল।

তাঁর জীবনের শ্রোত একবার কোনও দিকে ফিরলে আর উজ্জান বইত না। জীবনে যখন যে আদর্শ গ্রহণ করতেন প্রাণের সহিত তাহা গ্রহণ করতেন এবং সমস্ত জীবনটাকে সে আদর্শের দ্বারা ভরে নেবার চেষ্টা করতেন। কোনও জায়গায় তাঁর মধ্যে কঁাকি বা মেকি কিছু ছিল না। এই অকৃত্রিম সারল্য, সত্যপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধিসার দরুণই তিনি নাস্তিকতা ও agnosticism-এর মোহ কাটিয়ে মায়াবাদের কুঙ্কটকা ভেদ করে প্রেমের রাজ্যে পৌছতে পেরেছিলেন। বিশ্ব প্রেমের আদর্শ সামনে রেখে তিনি দেশ-সেবার মধ্য দিয়ে প্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়ে গেছেন যে “কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড পরম বিষের ভাণ্ড” এই উক্তি বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্ব নয়; কর্মের মধ্য দিয়েও প্রেমের সাধনা সম্ভবপর এবং যে ব্যক্তি সদাসর্বদা কর্মের মধ্যে ডুবে থাকে সেও ভগবানের লীলা উপভোগ করতে পারে যদি “আগুণের পরশমণি” তার হৃদয়কে উজ্জ্বল করে থাকে।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে দৈনন্দিন জীবনে তিনি যখন যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতেন তখন তার মধ্যে আত্মহারা হতেন! ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দেখেছি যে তিনি সপরিবারে ইংরাজের কোপানলে আত্মত্যাগে বাঁপিয়ে পড়বার জন্ত পাগল হয়েছিলেন। যতদিন আইন অমান্যের আন্দোলন

(civil disobedience) চলেছিল ততদিন তাঁর আর অস্ত্র কোনও চিন্তা ছিল না। তারপর ঐ আন্দোলনের অবসানে কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি প্রচার করতে যখন আরম্ভ করলেন তখনও তাঁর সেই চিরাত্যস্ত যুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল। পয়া কংগ্রেসের সময়ে ভারতবর্ষের জনমত বিশেষভাবে তাঁর নীতির বিরোধী ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার, তথা ভারতের, অধিকাংশ পত্রিকা তাঁর প্রতিকূল হলেও তিনি অমানুষিক পরিশ্রমের দ্বারা ধীরে ধীরে জনমতকে তাঁর অমুকূল করে নিলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে তাঁহাকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বহুস্থানে ভ্রমণ করে, তাঁহার নীতি প্রচার করতে হয়েছিল। আমরা জানি যে তাঁহার কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিলের কাজ অচল করা এবং মন্ত্রী নিয়োগে বাধা দেওয়া। বাঙ্গলা কাউন্সিলের অবস্থা দ্বারা জানেন তাঁরা বিস্মিত হন কি করে তিনি উপর্যুপরি মন্ত্রীদের বেতনের প্রভাব নাকচ করলেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্ত তিনি কয়েকমাস অহোরাত্র ক্লিষ্ট কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন তা বোধহয় স্বরাজ্য দলের সভ্যরা ভিন্ন আর কেহ জানেন না। দেশের সেবায় তিনি নিজের মানও জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। যারা তাঁর পাদস্পর্শ করবারও যোগ্য নন তেমন লোকের পায়ে হাত দিয়ে দেশের নামে কোন কিছু ভিক্ষা করতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন না। (চলিত কথায় বলে— লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।) জুজুখর বিষয়

এই যে অভাগা দেশে এমন কুলাঙ্গারও আছে যাদের মন তাতেও টলেনি) শেষবার মন্ত্রীদেব বেন্তন নিয়ে যে ভোটযুদ্ধ হয় তার অব্যবহিত পূর্বে তিনি যখন পার্টিনায় বিশ্বাস করছেন তখন কলকাতা থেকে স্বরাজ্য দলের কয়েকজন গিয়ে তাঁর সহিত দেখা করেন—আসন্ন ভোটযুদ্ধের জয় কি করা দরকার তার পরামর্শ করতে। সে সময়ে এক দেশবন্ধু ভিন্ন প্রায় সকলেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন—সবলেই ভাবছেন আর বুঝি মন্ত্রী ঠেকান গেল না। তখন প্রাণের পূর্ণ আবেগ ও আগ্রহের সহিত তিনি তাঁহাদের সম্বোধন করে বললেন—এবার যদি তোমরা সরকারকে হারাতে না পার তবে আর আমি বাঙ্গলা দেশে ফিরব না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করে যাও যে প্রাণপণ করে আবার লাগবে এবং সরকারকে পরাজিত করবেই করবে।” তাঁর সেই আন্তরিকতা পূর্ণ ওজস্বী কথায় নিরাশ হৃদয়ে আশা ও শক্তি ফিরে এল। তাঁরা সকলে কলকাতায় ফিরে কোমর বেঁধে দিবারাত্র খাটতে লেগে গেলেন। কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু নিজেও নামলেন এবং অবশেষে কেজা ফতে হল।

দৃষ্টান্তের শেষ নেই—আর দৃষ্টান্তের অধিক প্রয়োজনই বা কি? তাই আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে কান্ত হব। আমি দেশবন্ধুর নিকট-আত্মীয় ও সহকর্মীদের নিকট শুনেছি যে আমাদের গ্রেন্ডারের পর রাজবন্দীদের যুক্তির কথা তাঁর সারা মনকে গ্রাস করেছিল। তাঁর একজন নিকট আত্মীয় সেদিন আমায় লিখেছেন—“তোমাদের নিয়ে যাবার

পর যে কয়টা মাস বেঁচেছিলেন কি তাঁর অন্তরের ছালা। যে কাছে এসেছে সেই তার তাপ অনুভব করেছে। ব্যর্থ রোষে, কোভে হুঃখে যেম ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। তাই অনেক সময় ভাবি—তাই বুঝি চলে গেলেন সহিতে পারলেন না! * * * আজ কয়দিন থেকে ভাবছি তিনি যদি না অসময়ে চলে যেতেন তবে তোমাদের এতদিন বন্দী-জীবন কাটাতে হোত না। * * * বাঙ্গলা দেশের এতগুলি ছেলে এতগুলি ঘর অন্ধকার করে এতগুলি গৃহের সুখ শান্তি ভগ্ন করে আজ এত কষ্ট পেত না। তিনি কখনই স্থির থাকতে পারতেন না—একটা কিছু উপায় হোতই।” এ কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অডিঞ্জাল আইন যখন বাঙ্গলা কাউন্সিলে পেশ করা হয় তখন দেশবন্ধু রোগগ্রাস্ত ও অতি-দুর্বল থাকায় স্ট্রেচার (stretcher) এ করে কাউন্সিলে উপস্থিত হন। তাঁহার চিকিৎসক ও আত্মীয় স্বজনরা তাঁহার শরীরের প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে (১) তাঁকে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে যদি তাঁর যাওয়া বন্ধ করবার জন্ত গাড়ীর বন্দোবস্ত না করা হয় তবে তিনি পদব্রজেই রওনা হবেন—পথে যা ঘটে ঘটুক। শেষে যখন সবাই বুঝলেন যে তাঁকে ঠেকান যাবে না এবং তিনি সেদিনকার সভায় উপস্থিত হবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প—তখন যাবার বন্দোবস্ত করা হয়! হয় তো সেদিন এতটা অত্যাচার না করলে তাঁর স্বাস্থ্যের দিক দিয়া

(১) তখন জনসাধারণ জানতেন না তাঁর শরীরের বিরূপ সামাজিক অবস্থা।

ভালই হ'ত। কিন্তু তিনি রাজবন্দীদের হুঃখ এমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পদে না যাওয়াটাই অসম্ভব ছিল। মানুষের হৃদয়টা যত বড় হয়, তার হুঃখ কষ্টও তত বেশী হয়। তাঁর অনুচর ও সহকর্মীদের প্রতি এত গভীর স্নেহ ও সমবেদনা ছিল বলেই তিনি এত বড় শাস্তি-সেনা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং নিজে বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা হতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের বর্তমান ছুঁদশার কথায় মনে এই প্রশ্নই উদয় হয়—দেশবন্ধু সেই অসীম ভালবাসা ও সমবেদনার কতটা তাঁহার আসনের উত্তরাধিকারীরা পেয়েছেন? নেতা যিনি হবেন—তিনি যদি নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিতে না পারেন তবে তিনি অনুচরদের হৃদয়ে অচলা ভক্তি ও নিষ্ঠা কি করে জাগাবেন?

এক একটা cause নিয়ে এমনভাবে পাগল হতে পারতেন বলেই তিনি অফুরন্ত শক্তি পেতেন। অস্তরের প্রেরণায় জীবনটাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে না পারলে মানুষ কখনও অমৃতের সন্ধান পেতে পারে না। আমি শুনেছি যে তিনি অনেক সময়ে হাসতে হাসতে বলতেন—আমার জন্ম কোনও স্মৃতি-মন্দির (memorial) রচনা না করে একটা শিলার উপর এই কথাটি কথা লিখে দিও “বাঙ্গলার একজন পাগল এখানে বিশ্রাম করছে।” (২) এই কথাগুলি তাঁর অস্তরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। জীবদ্দশায় তাঁকে অনেকে পাগল বলতেন। আমরাও ইচ্ছা হয়

(২) এই কথাগুলি ঠিক না রাখতে পরলেও আমি আশা করি ভাবটা বজায় রেখেছি।

তাঁকে পাগল বলতে—কারণ অনেক সময়ে পাগলের লক্ষণ না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না। পুরাত্নাত্মীয় sanity (স্থির মস্তিষ্কতা) পাওয়া যায় সেখানে—যেখানে আছে শুধু dull mediocrity।

আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার হয়েছে আপন ভোলা পাগলা করা নিষ্ঠা। জাতিগঠনের মূলে আগে চাই খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ হ'তে হ'লে আদর্শ গভীর নিষ্ঠা চাই। স্বদেশ সেবাকে সাময়িক বৃত্ত বা কালযাপনের উপায় স্বরূপ বিবেচনা করলে চলবে না। স্বদেশ সেবায় বক্তৃতার বা লেখনী চালনার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু সবার অধিক প্রয়োজন আছে—জীবনের শিক্ষার। যে ব্যক্তি নিজে খাঁটি নয়, তার বক্তৃতার মূল্য কি—রচনার দাম কি? প্রাণই প্রাণকে জাগাতে পারে এবং সে বিশ্ব বিজয়ী প্রাণ মানুষ লাভ করতে পারবে না যতদিন না সে সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত হয়েছে। যে ব্যক্তি ষোল আনা দিতে পারে শুধু সেই ব্যক্তিই ষোল আনা শক্তি ও প্রেমলাভ করতে পারে। মানুষ যে হতে চায় তাকে অস্তরের সহিত বলতে হবে—

“এনেছি মোদের দেহের শক্তি

এনেছি মোদের ধর্মের মতি

এনেছি মোদের প্রাণ।

এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ

তোমারে করিতে দান।”

জাতির প্রাণের সহিত নিজের প্রাণের একত্ব

অমুভব না করতে পারলে দেশাত্মবোধ কি তা মানুষ স্বপ্নয়জন্ম করতে পারে না। জাতির জীবনের সহিত নিজের জীবন মিশিয়ে দেওয়ার ফলে যার মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জেগেছে শুধু সেই ব্যক্তিই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ও নূতন জাতি সৃষ্টি করতে পারে। সকল সাধনার গূঢ়ত্ব একই—ভাবে বিভোর হবে যাওয়া; জীবনে-মরণে শয়নে স্বপনে একই ভাবের দ্বার ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া। ভাবের সাধনা করতে করতে মানুষ যখন তত্ত্বাব-ভাবিত হয়ে পড়ে; যত্নের জন্ম যখন তার ভাবের অভাব হয় না—তখন সে সিদ্ধ বলে জগতে পরিচিত হয়। জাতি প্রাণী যারা হতে চান, তাঁদের এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। দেশমাতৃকার স্বরূপ উপলব্ধি করে আত্যন্তিক নির্ভার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু জাতির চরণে পিসর্জন দিতে হবে। এই আত্মদান সম্পূর্ণ হলে জাতির ভরা যৌবন ও সারা প্রাণ ব্যক্তির জীবনে ফুটে উঠে—হৃদয়ের মধ্যে অফুরন্ত ও অদম্য শক্তির উৎস খুলে যায়—আদর্শের পূণ্য-পরশে ব্যক্তির জীবন হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হয়। মানুষ নিজের পরিবর্তন দেখে নিজেই অবাক হয়—ভাবে কি ছিলুম, কি হয়েছি।

দেশবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসর ভাবের সাধনা করেছিলেন—নিজের যোল আনা এমনই ভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের বলতে তাঁর কিছু ছিল না—নিজের জন্ম তাঁর ভাবনা চিন্তাও ছিল না। জাতির দাবী, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনের

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ও প্রত্যেক স্থানটী দখল করেছিল। এক কথায় তিনি দেশাত্মবোধ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তো জাতির উদ্দাম ও অপার শক্তি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রকট হয়েছিল এবং তিনি জনসমাজে দুর্জয় পুরুষ সিংহ রূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন।

আজ দেশবন্ধুর শরীর ইতলোকে নেই—কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধনা তো অমর হয়ে আছে। সেই প্রাণ ইচ্ছা শক্তি, সেই পূর্ণ আত্মদান, সেই গভীর সাধনা আবার অসংখ্য নরনারীর জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে কুশুম কোরকের মধ্যে গন্ধ যেমন আত্ম প্রকাশ লাভের জন্ম বাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে, আজ ভারতের প্রাণ তেমন প্রমুগ্ধ ভারতবাসীর হৃদয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে নিজে প্রকাশ করবার জন্ম।

জাতি একটা মনগড়া কাল্পনিক বস্তু নয়; একটা বাস্তব সত্য। ব্যক্তি যেমন সত্য জাতিও সেরূপ সত্য, ব্যক্তি ছাড়া জাতি হয় না—জাতি ছাড়া ব্যক্তিও হয় না। জাতির একটা আত্মা (collective soul) আছে—একটা শিক্ষা (culture) আছে—একটা অতীত আছে—একটা ভবিষ্যৎ আছে। জাতির সুখ-দুঃখ বোধ আছে—জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। একথা যে উপলব্ধি করে নি, সে জাতির স্বরূপ কিছুই বোঝে নি। দেশাত্ম-বোধ তার কাছে কথার কথা মাত্র।

প্রকৃত দেশাত্মবোধ যার মধ্যে জেগেছে সে ব্যক্তির সংকীর্ণতা অতিক্রম করে নব জাগ্রত

৪৫১ দেশবন্ধু ও জাতিগঠন

জাতির জীবন্ত বিগ্রহরূপে জনসমাজে অবিস্মৃত হয়।
দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সে নিজের জীবন দেশ-
মাতৃকার চরণে বলি দিয়ে পূর্ণতর জীবন লাভ
করে। নব জীবনের গৌরবে ভূষিত হয়ে সে তখন
শির উন্নত করে ও বন্ধ বিস্তার করে বিশ্ব সভায়
দাঁড়িয়ে বলতে পারে—

“আমার জীবনে জড়িয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।”

তরুণ বাঙলাকে আমি বলি—মানুষ যদি হতে
চাও—নূতন জাতি যদি সৃষ্টি করতে চাও—স্বাধীন
ভারতের স্বপ্ন যদি ফলাতে চাও—তবে এস আমরা
এই সাধনায় ডুব যাই।

১. ১৬ই জুলাই ১৯২৮ কলকাতা এলবার্ট হলে প্রদত্ত ভাষণ।
২. হাওড়া জেলা যুব সম্মিলনে পঠিত অভিভাষণ, পুস্তিকাটিতে কোনও সন তারিখের উল্লেখ
নেই, পুস্তিকাটি শ্রীশিবপ্রসাদ ঘোষ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত, আনুমানিক আগষ্ট-সেপ্টেম্বর
১৯২৯।
৩. হাওড়া রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ, আগষ্ট ১৯২৯,
৪. প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংযোজিত হয় নি, আনুমানিক ১১ই আষাঢ় ১৩৩৪ সংখ্যা
থেকে সংগৃহীত ও পুনর্যুক্ত।

জয়ন্তী প্রকাশনের কয়েকটি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অগ্ণাত বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ	ঐ মহামানব আসে : চারপিক	৬০০
১ম খণ্ড ৯০০ ২য় খণ্ড ১২০০	NETAJI THROUGH	
ও ৩য় খণ্ড ১৩৫০	GERMAN LENS	
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়	Nanda Mookerjee	১২.৫০
সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০	রামমোহন	
সুভাষচন্দ্র ও গ্র্যান্ডাল প্ল্যানিং	সুরাজেন্দ্র দাশগুপ্ত	৪০০
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬০০	সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ	
NETAJI SPEAKS	অনিল রায়	৪০০/৬০০
Volume One	বাংলাদেশের বিপ্লব	
A collection of speeches & writings	সুনীল দাস	১২৫
Paper back 4/- Board 5/-	ধর্ম ও বিজ্ঞান	
	অনিল রায়	২০০

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জয়শ্রী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র

২য় খণ্ড ১১.০০

পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১৩.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের অজ্ঞাতাঙ্গন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বস্তু

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাঠ্যে করে ইতিহাসেব পথ-পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অমুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাণীর পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অস্বতম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ.টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধান। সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার রহস্যজনক ভাবে অস্তিত্ব হইয়েছেন। এই ত্রিশ বছরে ভারতবর্ষ কতটা পুরণো হয়েছে, কিম্বা ঘুরিয়ে বলতে হয় কতটা নূতন হয়েছে? ১৯৪১ সালের জামুয়ারী থেকে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের বাইরে তার পর থেকে ভারতবর্ষ তাঁর শারীরিক উপস্থিতির সুযোগ পায় নাই। ১৯৪৫-এর আগষ্ট পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ আত্মগত্যের মূলে চূড়ান্ত আঘাতের কারণ হয়েছিলেন, ভারতীয় নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীতে ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের অলঙ্কার কেন্দ্র-বিন্দু ছিলেন, সর্বোপরি বেয়াল্লিশের স্তিমিত বিপ্লবের পর যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসন উৎসাদনে সর্বাঙ্গিক বৈপ্লবিক জনচেতনা বিপুলভাবে বেগবান করে তুলেছিলেন। শুধু যে তাঁর পরোক্ষ উপস্থিতি ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তিমূল চূড়ান্তভাবে টলিয়ে দিয়েছিল তাই নয়, তাঁর প্রাক্তন কোনো কোনো সহ-যোদ্ধাদেরও তিনি উদ্বোধনের কারণ হয়েছিলেন। মণিপুর বা আরাকান দিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্র যদি একবার ভারতে প্রবেশ

করতে সক্ষম হতেন, তবে? তবে তো ভারতের জাতীয় বিপ্লব সম্পূর্ণ হতো। কিম্বা যদি যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক গণচেতনা জাতীয় বিপ্লবের সমাপ্তিতে পরিণতি পেতো তবে? ক্রান্ত, শ্রান্ত সহযোদ্ধাদের সেদিনকার উদ্বেগ, ঘটনার এই সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত ছিল। যারা রয়ে-সয়ে পরিবর্তনকেই কল্যাণকর মনে করতেন, আমূল পরিবর্তন তাদের সহিবে কেন,—এই পরিবর্তনের জ্ঞতা তাদের আদৌ কোনো প্রস্তুতিই যে ছিল না।

তারপর গত ত্রিশ বছরে অনেক জল বয়ে গেছে। সমসাময়িক ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অস্তরালে অস্তিত্ব হলেও সমকালীন ভারতবর্ষে তিনি এক যুগ-নায়কের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন—রূপকথার মত যার জীবনের ও ভারতের মুক্তির জ্ঞতা তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের কাহিনী দেশের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের মুক্তি কেবল-মাত্র ভারতের জনসাধারণের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনেই সীমিত নয়। সুভাষচন্দ্রের জীবন বোধের গভীরে তাঁর দৃঢ়মূল প্রত্যয় জন্মেছিলো যে, ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব করে তুলতে পারলে, বিশ্ব-মানবতার নিরাপত্তা অনিবার্য হয়ে উঠবে:

“India Freed, means humanity saved।”

বিশ্বমানবতাবোধের এই উদ্দীপ্ত প্রত্যয় সুভাষচন্দ্রের জীবনে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই। জীবন ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতার উন্মেষ সেই শৈশবেই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে দেখা গেছে। সুভাষ তখনও কটকে প্রোটেষ্ট্যান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র। সেই ইউরোপীয় স্কুলের বিজ্ঞাতীয় পরিবেশে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষতা সাধনের নানা সুযোগ থাকলেও, স্কুল কর্তৃপক্ষের ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বালক সুভাষের মনে একথা গেঁথে দিয়েছিলো যে ভারতীয় হিসাবে তারা আর এক জাতের লোক—“as Indians we are a class apart”। ভারতীয়রা ইংরেজদের চাইতে আলাদা জাতের লোক, ভারতীয়ত্ববোধের এই অস্পষ্ট ছোপ বালক সুভাষচন্দ্রের মনে সে-সময়ই একটা দাগ কেটে গিয়েছিলো। বার বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন তিনি দুটো পৃথিবীতে বাস করছেন। একটা ইউরোপীয় স্কুলের ইউরোপীয় ভাবধারার পৃথিবী দেশের মাটির সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই, সম্পর্ক নেই, আর একটি পৃথিবী ভারতীয় জীবনবোধের—যেখানে রয়েছে ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় জীবনধারা এবং পারিবারিক জীবনের পরিবেশ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ধ্যানের ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায়, মননায় ও জীবনের স্তরে স্তরে পল্লবিত হয়ে উঠে তাঁর ভারতীয়ত্ববোধকে,

তাঁর মানবতাবোধের সাপেক্ষসঙ্গে মিলিত করেছে। এই ভারতীয়ত্ববোধের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবেদ থেকে। শুধু নিজের জ্ঞান মুক্তির সাধনাই ভারতীয়ত্ববোধের অস্তিম বার্তা নয়। তার মধ্যে নিহিত রয়েছে স্বার্থ সঙ্কমণ। তাই “নিজের মুক্তি ও জগতের হিত সাধন”—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবেদ থেকে সুভাষচন্দ্র এই শিক্ষা নিলেন এবং অতঃপর যোগ, ধ্যান, সাধন-তপস্কার গোপনচারিতার সঙ্গে দুর্গতদের সেবাব্রত—যুবক সুভাষচন্দ্রের জীবনযাত্রায় অনিবার্যভাবে স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। আর যে টুকু কাঁক ছিল সেটুকু পূরণ করে দিলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ভ্যাগব্রতের তপশ্চর্যার পথে শক্তির আরাধনা। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে পরাধীনতার গ্রানিমুক্তির জ্ঞান যেমন শক্তির স্পন্দন চাই আত্মার গভীরে, যে শক্তির উদ্বোধন ব্যক্তিরকে ভ্যাগব্রতের তপশ্চর্যা অসম্পূর্ণ থাকবে, সেবাব্রতের শক্তি থাকবে অশুভ—সেই শাপিত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হবে জাতীয় জীবনে শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের বিচ্ছুরিত শক্তিই নয়, হুঃখ, দৈন্য অর্জের সাধারণ মানুষের জীবনে পীড়ন-শোষণ-সাজুনার বন্ধন-মুক্তির দুর্বীর শক্তি। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ভারতীয়ত্ববোধের যে শক্তি সর্বাঙ্গক বন্ধনমুক্তির পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, সেই শক্তিই বিশ্বমানবতার বন্ধনমুক্তিতে দিগুদিগন্তে সঞ্চারিত হয়ে ভারতীয়ত্ববোধের সঙ্গে মানবতাবোধের সমন্বয় সাধন করবে।

সমসাময়িক ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্র ত্রিশ বছরের

অন্তরাল থেকে এই জীবনবোধের আদর্শই তুলে ধরেছেন। সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবী মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, দেশের বাইরে অস্থায়ী-স্বাধীন ভারত সরকার গড়ে তুলেছিলেন এই অস্তিম উদ্দেশ্য নিয়ে যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পুরোভাগে নেতাজীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পন্ন করবেন এবং তার অস্তিম পরিণতিতে ভারতীয়স্ববোধের এবং মানবতাবাদের সমন্বয় সাধন করে গোটা পৃথিবীতে তাঁর সমন্বয়ের আদর্শ ছড়িয়ে দেবেন। যুদ্ধোত্তর নূতন পৃথিবীতে নূতন ভারতবর্ষ জন্ম নেবে, নবতর জীবন বোধে উদ্বোধিত হয়ে নবনব পৃথিবীর পত্তন করবে। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেলে, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ফলে এই অপূর্ণ সমন্বয়ও দূরের বস্তু হয়ে গেলে। গত ত্রিশ বছরে এই আদর্শ অগ্নান থাকলেও এই আদর্শের পরিপূরণের পথে অনেক প্রতিবন্ধক; অনেক বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু সেই আদর্শ তো অগ্নানই রয়ে গেছে, এবং সেই আদর্শের আহ্বান আসছে বারে বারে ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে, বিশেষভাবে যুবশক্তির কাছে। দেশে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার ফলে জীবনে অনেক সুখভোগের রুদ্ধদ্বার দেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে খুলে গেছে। জীবনে ত্যাগের আদর্শ তাই তাদের অনেকেরই মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে গ্রহণ করে কুছাঁ তার পরিবর্তে উন্নত জীবনমানকে বরণ করে

অপেক্ষাকৃত মন্থণ জীবন যাপনের সুযোগ যেকালে তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, সে-সময় ত্যাগের আবেদন তারা গ্রহণ করবেন কেন? কিন্তু ত্যাগ তো জীবনকে বর্জন করা নয়। জীবনকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেই তো সেখানে ত্যাগের গৈরিকের স্থান হবে। জীবনের বলিষ্ঠ গ্রহণ মানে আত্মসুখমগ্নতা নয়। জীবনটা মায়া নয়, মোহ নয়, স্বপ্ন নয়। জীবনের ওপর সূনিদিষ্ট কর্তব্যপালনের দাবী রয়েছে। 'Life is a mission, a duty'—এই বোধে সজীবিত হয়ে জীবনে আসক্তি বর্জন করে ত্যাগের পথ গ্রহণ করতে হবে, সেবার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে—শোষিত ও বঞ্চিতের সেবা, দেশের সেবা, মানবতার সেবা।

সমকালীন ভারতবর্ষে বার্ষসঙ্গ আত্মসর্বস্বতার স্থূল অবলোপ থেকে কেউই রেহাই পান নাই, যুবশক্তি তো অবশ্যই নয়। ক্ষমতার লোলুপতা, অর্থের গৃধ্রুতা সমাজকে কলুষ-কালিমায় আবৃত করে রেখেছে। তারই মাঝখানে ভারতীয় জীবনবোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কখনও বা এক-আধটিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু সেটা নিতান্তই ব্যতিক্রম। যৌবনশক্তি বা তারুণ্যশক্তি প্রতিকূল পরিবেশে কিছুকালের জন্য অপরিচিত হয়ে দিগন্তকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে পারে। কিন্তু আদর্শের যাত্নমন্ত্রে এরাই অসাধ্যসাধন করেন। মরণপণ সঙ্কল্প করে সমাজে দলিত-শোষিতদের জীবন আলোকিত করবার কিছা দেশের চরমতম ছদ্দিনে

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দুরূহত পালন করে থাকেন। “ভারতীয় জীবনবোধের চিরায়ত আবেদন, সুভাষচন্দ্রের অনন্ত জমকালো জীবনে যা মূর্ত হয়ে উঠেছিলো, সমকালীন ভারতবর্ষে যেন একটি আশু প্রজ্জ্বলিত দীপ বর্তিকা। তাঁর জীবনে আদর্শবোধ এতো পভারে উৎসারিত হয়েছিলো। যে তাঁর পক্ষেই ১৯৪০ সালের নভেম্বরে বন্দীশালায় জীবনপণ অনশনের মুখে বলা সম্ভব হয়েছিলো : ‘এই মরণগতে সবই ধ্বংস হয়ে যায় এবং যাবও কিন্তু মানুষের ভাবনা, আদর্শবোধ কিম্বা স্বপ্ন স্থায়িত্ব লাভ করে। আদর্শের জন্ত ব্যক্তি আত্মবিলোপ করতে পারে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই আদর্শ সহস্র জীবনে পল্লবিত হয়ে উঠবে’—“In this mortal world, every thing perishes and will perish—but ideas, ideals and dreams do not, One individual may die for an idea but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives.”

কথা উঠতে পারে, বর্তমান ভারতবর্ষে পরিকল্পিত সমৃদ্ধির মুখে আদর্শ উদয়াপনের জন্ত মরণপণ সঙ্কল্পের অবকাশ কোথায়? কিন্তু মুহূর্তেই এই সংশয়ের মীমাংসা হয়ে যায় যখন দেখা যাবে রাষ্ট্রের যারা নেতা তাঁরাই দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের সীমান্তে নানা বিপদের সঙ্কেত দেখে উচ্চকিত হয়ে উঠছেন এবং দেশবাসীর দেশপ্রেমের আদর্শের কাছে আবেদন জানিয়ে এই সম্ভাব্য বিপদ উত্তরণের জন্ত দৃঢ়বদ্ধ

সঙ্কল্প গ্রহণে উদ্বোধিত করছেন। ভারতবর্ষে পরিকল্পনার জনক সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। পরিকল্পনা হবে ভারতীয় জীবনবোধের কাঠামোতে— পরিকল্পনার দর্শন বলতে এই তত্ত্বটিকে তিনি দেশের বাইরে থেকে তুলে ধরেছিলেন দেশবাসীর সামনে। এই তত্ত্বকে সামনে রেখে দেশ স্বয়ম্ভর হবে, পরিকল্পিত অর্থনীতি পরনির্ভর করে তুলবে না ভারতবর্ষকে। পরিকল্পিত অর্থনীতি এতোদিন স্বয়ম্ভরতা ও পরনির্ভরতার মধ্যে বিক্লিপ্ত হয়ে এগিয়েছে, কিন্তু আত্মস্থ হবার দিকে কতটা এগিয়েছে সেটাই ভাবনার বিষয়। সুভাষচন্দ্র সমকালীন ভারতবর্ষকে এই আত্মস্থ হবার পথ দেখাচ্ছেন।

দেশের প্রতিরক্ষার জন্ত সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠনের পথ দেখিয়েছেন সুভাষচন্দ্র এবং প্রতিরক্ষার জন্ত শত্ৰুসরঞ্জামে স্বয়ম্ভর হবার অনিবার্যতাও সুভাষচন্দ্রের ভাবনাই প্রথম স্থান পেয়েছিলো। বহুতপস্বে স্বাধীনতা অর্জন এবং অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সেনাবাহিনী গঠনের ভাবনা সেই ছাত্রজীবনের রোগশয্যায় ১৯১৪ সালেই সুভাষচন্দ্রের মনে দানা বেঁধেছিলো। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন এবং ১৯৪০-এ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবী মুক্তিবাহিনী গঠন তারই সার্থক পরিণতি। সমকালীন ভারতবর্ষের সম্মুখে আজাদ হিন্দ বাহিনীর শৌর্যবীর্যের অপূর্ব ইতিহাস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারতীয়জীবনবোধের সাধনার আর একটি পদচিহ্ন—একতা, বিশ্বাস ও

বলিদানের আদর্শ ঘেরা যে বাহিনীতে জাতীয় সংহতির সর্বোত্তম স্বাক্ষর সর্বকালের ভারতবর্ষের জন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র অতুলনীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। দেশের বাইরে থেকে জাতীয় স্বত্বকে ধ্বংস করবার শক্তির কিস্বা দেশের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্ত ত্যাগের হৃদয় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যাবার চিরায়ত প্রেরণা দেবেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ-হিন্দ-বাহিনী।

স্বামী বিবেকানন্দের পথ অনুসরণ করে সুভাষচন্দ্র মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের মহত্তম আবেদন তার জীবনে সর্বোত্তম স্থান করে নিয়েছিলো। সমাজজীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, রাষ্ট্রজীবনে শাসন ও শাসিতের সম্পর্ক, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু সুভাষ-ভাবনায় ব্যক্তি-মানুষ। ব্যক্তি-মানুষের বন্ধনমুক্তি সমাজে শোষিতদের বন্ধনমুক্তি এনে দেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির উৎসমুখও এইখানে। সুভাষচন্দ্রের ভারতীয়জীবনবোধের মূলেও সেই মনুষ্যত্বের মহত্তম প্রতিষ্ঠার আয়োজন। সমাজ

জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে অথবা আন্তঃরাষ্ট্রীয়জীবনে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও লাঞ্ছনার ঘনঘটা অবিরাম গতিতে তৈরী হচ্ছে। সমাজবাদের নামে, গণতন্ত্রের নামে সমাজে অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের মুক্তির নামে ক্ষমতাবানদের, সবলদের নানা অপকৌশলে মনুষ্যত্ব পদদলিত হচ্ছে। মনুষ্যত্বের সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে লাঞ্ছিত মানুষের অপ্রতিরোধ্য দাবী। এই দাবী পূরণের ডাক এসেছে যুবশক্তির কাছে, তারুণ্যশক্তির হৃদয়ে, দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে। সুভাষচন্দ্রের জীবনবোধেরও অপ্রতিরোধ্য দাবী মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। এই দাবীর প্রতিষ্ঠার জন্ত সুভাষচন্দ্রের সমগ্র সত্তা বিজোহী হয়ে উঠেছে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও একদিন যুবশক্তিকে মানুষ-তৈরীর জন্ত উদ্বোধিত করে বলেছিলেন; ‘সংগ্রাম করো, সংগ্রাম করো, নিরন্তর সংগ্রাম করো।’ ত্রিশ বছরের ব্যবধান অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্রও আহ্বান জানাচ্ছেন ‘সংগ্রাম করো, সংগ্রাম করো, মনুষ্যত্বের মহত্তম প্রতিষ্ঠার জন্ত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করো।’

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WORLD NEWS....Jerusalem Dec. 21, 1975.

Amrita Bazar Patrika

22-12-75.

চারণের ১১ ঘণ্টার ঝড় কাগজে কলমে হয়েছিল, আর এই ১১ ঘণ্টার ঝড় বিশ্বমানচিত্রে

ছিল ডাগনের দেশ, সমাজতন্ত্রের জন্মদার ভাঙ্কের দেশ, তৈল রাজ্য, স্বদেশ ও ‘সোনার বাংলা’ পানের দেশ।

ডাগনের দেশের সঙ্গে মহাকাল আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ তাই উভয়ের আলাপ আলোচনা এত নিবিড়—‘একজন বলছেন দণ্ড আমি পেয়েছি তথাপি ভগবান আমার ছেলেকে নিয়ে নিলেন, It was his words ‘God has punished me’ এবং তারপরে দীর্ঘ ৫ বছর আমাকে আত্ম-নির্বাসিত জীবন বাপন করতে হয়েছে আর ভুল হবে না।’

অপর জন উত্তর দিলেন, ‘যদি পুনরায় ভুল করে স্বন্দ্র যুদ্ধে প্রাচীন ভীম ঘর্ষণের নাট্য শুরু করতেই হয় তাহলে আগামী সময়ে যে ব্যাপক গুতোগুতি লাগবে সেই গুতোগুতির পাল্লা যে কোনও একটি পাল্লা বেশী ভারী করে একজন কি করতে পারে এটা তুমি ভালই বোঝ।

একজন বলছেন—‘নতি আপনার জন্ত ভয় হয়—একটা হাতীকেও পিণ্ডে ভেঙ্গে ফেলতে পারে কিন্তু যখন ভাবি উনি ‘মৃত’ মৃত হওয়াতেও এর প্রাপ্তি করবার কিছু নেই খোওয়াবারও কিছু নেই, জীবিত হলেও যার প্রাপ্তিও কিছু নেই খুইয়ে ফেলবারও কিছু নেই। যেখানে প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির বন্ধনই যার নেই তাকে নাড়াচাড়া করতে একটা অজানা ভয়ের প্রশ্ন ওঠে বৈকী’

অপরজন সহদোর বন্ধুর বৃকে হাত রেখে বলেন ভয় আপনার ?

তিনি জবাব দিলেন ‘আমি তো ভয়শূন্য নই তাই যদি হতে পারতুম তবে পুত্র হারাণোর মত দুঃখে ভগবানের প্রতি আমার অভিযোগ আসতো না, আমার ভেতরে কাব্য ছিল এবং আছে বলেই একজন অভিনেত্রী আমার জীবনে দ্বিতীয়বার স্থান পেল। প্রাপ্তির যেখানে আশা আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্তির ভয় তো সেখানে। আপনার শক্তির উৎস হল আপনার সীমাহীন একলা পথ এবং শব অবস্থা আর আপনার এই অবস্থায় লোকে স্বীকার করুক আর না-ই করুক অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শঙ্কা জাগায়।’

চারণের দৃষ্টিপটে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের নানা ঘটনাবলী অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত উন্মোচিত হয়ে পড়ে, কিন্তু যার প্রতিক্রিয়ার নির্দেশ চারণ পায়নি। তাছাড়া কতটুকুই বা চারণের বোঝা সম্ভব, একই বৈঠক, মাতৃসাধনা, সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র দেব গান কত কি প্রসঙ্গে এবং অবলীলা আলোচনা চলছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ মনে পড়ে এমনি কোন এক বৈঠকে তারাশঙ্করের সমগ্র রচনার আত্মোপাস্ত আলোচনা করে, প্রতি গ্রন্থের চরিত্র চিত্রণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, উদ্ধৃতিসহ যোগে করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। এবং তারই মধ্যে অকপটে বলেছিলেন ‘জান এ মানুষটির সঙ্গে

আমার কী সম্বন্ধ ছিল ?' চারণ কেবলি ভাবে কবে কে কিভাবে এই মানুষটির বিরাটদের সামান্যতম বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'মডেল' তৈরী করবে।

১৯৪৫ ও ১৯৭২ এই ত্রিশ দশকের ব্যবধানে, একটি মানুষ তার জাগতিক সকলপ্রকার শক্তির উৎসে যা বুদ্ধি ও অনুভবেরও অগম্য এক দৈবিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন তা চারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোন একটা প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠলে তার আদি ও অন্তসম্বন্ধে কোনও কঁাক থাকে না। রক্ষনই হোক আর সঙ্গীতই হোক।

চারণ অনুভব করে যদি তার অগণিত পাঠক কায়মনোবাক্যে একাগ্রচিত্তে এই বিশ্বয়কর ব্যক্তির পূর্ণরূপটি অনুভব করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করেন তাহলে আগামী দিনের ঘটন অবটন অনেক কিছুই তাদের কাছে সহজবোধ্য হবে। শুধু তাই নয় যে মানুষের মধ্যে দেশের সংস্কৃতি দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য সংহত রূপ নিয়েছে, যিনি এ সমস্তকে আত্মস্থ করেছেন, করে, অচলকে চলমান করেছেন, এই সামগ্রিক জীবনে চলমানতা এনেছেন, যার মন আজও কৈশোরের লীলা খেলায় বিন্দুমাত্র দ্বিধাস্থিত নয় তাঁকে—মহাকালকে—জানা সহজ হবে—বোঝা সহজ হবে—এবং তাঁকে প্রণাম করে তাঁরই পথে অনুগমন করার সংকল্প নেবে।

পৃথক পৃথক সময়ে চারণ যা শুনেছে, তার একটি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে বিবৃত করছে :

বৈঠক ১

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা পুতুলেরও মন আছে কি? মা জিজ্ঞাসা করলেন তুই কি বলিস? বললাম হ্যাঁ আছে। মা বলেন তুই বড় এচড়ে পেকেছিস। আগে জানতুম না পরে জেনেছি chaitanya in comatoze। মারণাজ্ঞ মরণমজ্ঞের হোতা, হোতা ভক্তকণ যতকণ impersonal।

মা ঋণিককণ চুপ থেকে ডান হাতটা উচু করে ইসারা করলেন, মার ধপ্পর!

—মহাকালের মায়ের সঙ্গে এভাবেই সংলাপ চলে। আর সেই কথা বলতে বলতে কখনও কোন সুদূর গহনে সমাহিত, কখনও অব্যোরে বর্ষণ।

“আমি অপেক্ষা করছি, মা আমাকে এই farsical stage act থেকে কবে সরিয়ে নিয়ে কোলে তুলে নেবেন? যদি বল farsical কেন? ভীষ্ম আমি শশধরা বশুধরার ধর্মত আইনত অধিকারী আমি—I declared I am stepping aside from the path of ruling and reigning

৪৬১ 'দিবস রঞ্জনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি'

the world। পিতৃদেব দেখলেন, তাই ত এতবড়-renouncing। এত বড় সম্মান। তিনি বরদান করলেন ইচ্ছামৃত্যু।

আমার ইচ্ছামৃত্যুতো বরদানের অপেক্ষা রাখে না, এটা তো inherent, এর চাইতেও বড় নাটকীয় জীবন দেখাতে পার কী কারণ? মা সবই জানেন তাই বলেন, আচ্ছা।

বিজ্ঞোহ আমি করিনে, তবে বিজ্ঞোহের সুর শোনাবার অধিকার আছে তো?

বলেছিলুম, না হয় আমাকে কোলেই তুলে নিন। বলেন সে কেমন করে হবে? প্রসব করেছি আমি কোলেও তুলে নেব আমি। আরেকটু সময় যাক এমন সুন্দর জায়গায় রাখবো, তখন তুমিও সব ভুলে যাবে।

কর্মজীবন—Discipline—ব্যাপকার্থে সাধনা—আজ নয় কাল এখন নয় পরে—দেখছি চেষ্টা করছি এই ধরনের কোনও উত্তর চরণের তরফ থেকে হওয়ায় মহাকাল বলেন—

আমার জীবনে এবার এসে করবো তার স্থান নেই। যা করতে হবে তা করতেই হবে, তার মধ্যে এবার বা অমুকের প্রশ্ন নেই। এ জীবনে সব সময় মনে রাখতে হবে এবার নেই, সব সময় এই মুহূর্তে। আমার রাস্তায় every one of us live by the surviving seconds। We know it। এখন আছি এই বাঁচারও শেষ এই মুহূর্তেই হতে পারে। This is the reality। প্রত্যেকের জীবনেরও এটাই reality।

বৈঠক ২

পামীর থেকে Alps পর্যন্ত নিয়ে যেখানে সমুদ্র মিশেছে এই Himalayan Region কে I know like my palm। Badrinath-এর নিকট মানাগাঁও, বসুধারা অলকা শতপঞ্চ, ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, শিবকুণ্ড, থুরীর মঠ—এটা হল লামাদের India র দিকে last very renowned monastery—এই থুরীর মঠ আমার খুব প্রিয়ছিল। সপ্তঋষি বলে একটা জায়গা আছে তা এমন সুন্দর তার চার দিকে ৭টি পাহাড় মধ্যে একটি সুন্দর হ্রদ। যেখানে পাহাড় হ্রদের সঙ্গে মিশেছে সেখানে শত সহস্র গুহ। আমি প্রায়ই ওখান দিয়ে pass করতুম। ঐ জায়গা দিয়ে যেতাম কারণ আমাদের তিন চারটে থাকার জায়গা আছে। আমি একটা standing order দিলাম, এখানে যারা হাগবে মৃতবে, তাদের shoot them। একবার ঐদিকে আমি আসছি, সঙ্গে আমার মোটে দুজন, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলুম যে একজন পাহাড়ী ভুজ গাছের ডাল ভেঙ্গে একটি লাঠি করেছে আর গুণ গুণ করতে করতে আসছে। আমাদের ভাব হল এমন একটি সুরক্ষিত জায়গায় যা কেউ জানে না আছে

জেনে ফেলো। উটে ঐ পাহাড়ী জিজ্ঞাসা করলো আপনারা রাস্তা ভুল করে এসেছেন কি? ওর ধারণা আমরা যাত্রী পথ ভুল করে এসেছি। লোকটি বলে, 'ত্রিশূল'-এ যাব তাই এই পথে short cut যাচ্ছি। ঐ সমস্ত এলাকায় হাজার রকমের রঙ বেরঙের ফুলের মেলা। হৃদ থেকে পাহাড়ের একটু উচু পর্যন্ত। পাহাড়ীটি বলে, ভুলেও যেন এই ফুলের গন্ধ শুকবেন না বা খাবেন না, কারণ এসব দেবতাদের স্থান। মনে পড়ে গেল কালিদাসের দেবভাস্মা হিমালয়ের কথা। "বনুধারা"তে এক সাধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় যে জড়িবুটি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই। সময় থাকলে হয় তো এর সেবা করে জেনে নিতুম, তবে আমার দরকারও নেই সময়ও নেই।

একটি লতা আছে—তার একটি মাত্র গুণ আছে, একটি বিশেষ দিনে, বিশেষ নক্ষত্রের স্থানে স্নান করে লতাটি যে সমূলে উপড়ে শিকড়ের নীচের অংশটি ছিড়ে ডান হাতের মধ্যে শক্ত মুঠিতে ধরে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে একটি বিশেষ আসরে এসে পৌছে গেছে। সেখানে স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী নারী পুরুষ নাচ গান করছেন। গন্ধর্ব ও অঙ্গরারা দেবযোনির, এঁদের বিভিন্ন জায়গায় এমন আসর আছে। যদি সেটি ধরে রাখতে পার দেখবে ঐ নাচ গানের পর ভূমি পুনরায় নিজ স্থানে পৌছে গেছে।

বৈঠক ৩

"Democracy can function only in a disciplined population, Indisciplined Democracy is nothing but mobocracy or factionalism. It is synonymous with Demonscracy."

International dealings এ there is no eternal friend or foe,

বৈঠক ৪

'পথের দাবী' proscribed হয়েছিল জানি? তখন সর্বক্ষণ ওটা আমার সঙ্গেই থাকতো। হাসভূম, শরৎবাবু ওর মধ্যে একটা impossible action ভরে দিয়েছেন। সব্যসাচীকে প্রথমে যে ভাবে দাঁড় করিয়েছেন, ঐ cadre এর লোক, উনি ওকে দিয়ে যা যা করিয়েছেন, করবে না। করতে পারে না। ওত যেন Typical নাটক। ঐ cadre এর একজন Revolutionary ঐ কাজ করতেই পারে না। প্রথম কথাই হোল বিপ্লবী কখনও মেয়ে মানুষের মুখ শুঁকতে দেবে না, সে

১৬৩ 'দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি'

স্বর্গের দেবীই হোন বা অস্ত্র কেউ। দ্বিতীয়তঃ ঐরকম পরিবেশে ঐ রকম কাজ করতে পারে না। তৃতীয়-হল, একজনকে গুলি করতে পিস্তল ঠাট্টালেন, একজন মেয়ে মানুষ হাত ধরলেন আর গুলি miss হোল। যে ভাবে চরিত্র delineation হয়েছে তা আমার রুচিতে বাধে। dilineation অস্ত্রভাবে হলেও চলত।

একবার কোনো একটা Railway junction এ wait করতে হল। সে Junction একলকাতা থেকে লম্বা পাড়ি দেওয়া ট্রেন থামলো। ৮।১০ জন দৌড়ে আমার কাছে এসে, কেউনা (কৃষ্ণচন্দ্র দে) পাঠিয়েছেন—বল্লে কেউ আপনাকে দেখে তাঁকে বলেছেন তাই তিনি পাঠিয়েছেন। কাছে গেলাম, হাত দুটি ধরে বল্লেন একটি গান শোনাই—এটাই তাঁর আমার সঙ্গে সাক্ষাতের রাস্তা ছিল—তিনি গান শোনাচ্চেন, এদিকে যাকে গান শোনাচ্ছেন তার দিকে তাকিয়ে ভীড় জমে গেল। গার্ড এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—signal এর নিশানা বগলে চেপে ধরে। ২০ মিনিট পর গান শেষ হলে, ট্রেন ছাড়লো। দুটি আপেল তাঁর হাতে তুলে দিলুম। সারজীবন চলতে চলতে এই ছোট ছোট হীরে, এই মণি মাণিক্যের কুচো জমা রয়েছে কখনও হাসি, কখনও কাঁদি কখন বিষণ্ণ হয়ে উদার হয়ে যাই।

যখনই এই দেশে কোনও কর্মবীর এসেছেন আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে দেবতা বানিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকি। রামচন্দ্র দেবতা ছিলেন না, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ছিলেন না, তাঁরা আমাদের মতনই মানুষ। নিজেদের দুর্বলতা, নিজেদের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা নীচতা স্বীকার করবার ক্ষমতা নিজেদের নেই তাই তাঁদের দেবতা বানিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকি। এটা আর কিছুই নয় তাঁদের ক্রিয়াস্বক দিকটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা।

মহাকালের এক অন্তরঙ্গ অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর কথা দিয়ে চারণ এবারকার কাহিনী শুরু করেছিল, সেই কাহিনী লিখতে লিখতে ছাপার অক্ষরে একটি ইতিহাসের যবনিকা হল। ১৩৮১ পৌষ সংখ্যায় প্যারী বৈঠকে জটনৈকের উক্তির উল্লেখ ছিল, ১১ ঘণ্টার প্রতিলিখনে সে প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছিল, একজনকে বিশ্বের সেরা Diplomat এর শিরোপা দিতে দ্বিধা হয়নি মহাকালের এবং এক সময় বলেছিলেন, বড়ভাইকে নির্দেশ দেওয়া আছে রাজ প্রাসাদোপম চিকিৎসাকেন্দ্রেই যেন সে থাকে আরামে, তার বিশ্রাম দরকার।

মহাকাল-এর এত অন্তরঙ্গ বন্ধু, থাকা সত্ত্বেও—‘আমি অস্ত্রতঃ নিরঙ্কুশভাবে নিঃসঙ্গ। আমার কোনও সঙ্গী নেই। কিন্তু পৃথিবীতে কেউ সঙ্গী ছাড়া থাকতে পারে না। আমারও একটা twinself আছে। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ যখন জন্ম নেয় তার সঙ্গে সঙ্গে তারই সঙ্গে জন্ম নেয় একটি twinself এটা হোল একটা unalterable law। twinself কান্নর ভেতরই থাকে কান্নর

বাইরে। ভেতরের twinsell অদৃশ্য অশরীরী হয়ে সব সময় সঙ্গে থাকে এর কাজ হোল নিজেরই যমজ আত্মাকে পরামর্শ দেওয়া ভালমন্দ বলে দেওয়া। আমার twinsell আমারই ভেতরে।

এ পৃথিবী কিসে চলে? এ পৃথিবী চলছে ভাবনার উপর। এই ভাবনাই মানুষকে দেবতা বা পিশাচ করে। তাকে উচুতে নিয়ে যায় অথবা গভীরতম গহ্বরে ফেলে দেয়। কোনও জীলোককে মা' ডাকছ এই ভাবনা তোমায় পিশাচ হতে দিচ্ছে না। একটি মাত্র ঘরে পিতা যখন তার কন্ঠ্যর দিকে তাকাচ্ছেন তখন কি স্নেহের ভাবনা ঝরে পড়ছে। ভাই যখন তাকাচ্ছে তখন তার বোনকে রক্ষাকরার সঙ্কল্প জেগে উঠছে। তার ছেলে যখন তাকাচ্ছে তখন প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠছে। আর স্বামী যখন তাকাচ্ছেন তখন বাসনা জাগছে।

কত বিষাক্ত জীব আমায় ভালবাসে। বোলতা ভেঁ করে আমার কাছে এসে থমকে থাকে। এই সমস্ত জায়গায়ই কাজ করছে ভাবনা।

চিন্ময়ী ও মুন্ময়ী মায়ে তফাৎ নেই। মুন্ময়ী মা ঐ চিন্ময়ী মায়েরই অংশজাত।

তোমরা কামনাকে বল প্রেম। যতক্ষণ পর্যন্ত, শারীরিক সম্বন্ধ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমের গন্ধপর্যন্ত নেই, ছোঁয়াচ পর্যন্ত নেই। প্রেমের সিংহদ্বার খুলবে তখন যখন দৈহিক, শারীরিক ঐহিক সম্বন্ধের ইচ্ছা শেষ হবে। প্রেমের ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন অধীর হয়ে ঐ দরজার ওপারে। সিংহদ্বার খুলে যাবে সেই মুহূর্তে যে মুহূর্তে তুমি ঐ সম্বন্ধগুলি ত্যাগ করবে। উপনিষদে তার একটি বখা পাবে 'প্রেম স্বরূপ ভগবান।' কোথায় খুঁজচ তাঁকে? তিনি রয়েছেন তোমারই ভেতরে। কামনার দীপশিখা বুজিয়ে দাও প্রেমের দীপ শিখা জ্বলে দাও। পলতে দুটো তেল একটিই। প্রেমের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান শুধু তুমিই হোলে না, জ্যোতির্ময় করে দিলে তোমার ভগবানকে। তোমার মায়ের মুখ আলোকিত হল। রাস্তা তোমার শেষ হল।

মনে রেখ সৌন্দর্য বিকশিত হয়, এই সৌন্দর্য সর্বব্যাপী দৈহিক, চারিত্রিক, প্রাণের অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি চিন্তা, অহংকার একটু ব্যাপক অর্থে এই চারটি নিয়ে) হৃদয়ের, প্রজ্ঞার, বুদ্ধির কাজের সৌন্দর্য পাখিব জীবনের প্রতিটি segment এর সৌন্দর্য আকর্ষিকভাবে বিকশিত হয়, তার উপযুক্ত আবরণ যদি থাকে তবে।

মূল কথা হল যতক্ষণ তুমি সত্যি সত্যি পরিত্যক্ত হওনি in the same token তুমি সব কিছু পরিত্যাগ করনি, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা তোমার বোঝা অসম্ভব সত্যিকারের ভালবাসা কি। যতক্ষণ আমি আমার soil স্পর্শ করে ছিলাম ততক্ষণ আমি জানতাম না কতটা ভালবাসি, আজ আমি নির্বাসিত, পরিত্যক্ত। যার কোনও Nationality নেই, দিগন্তে দাঁড়িয়ে তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেনিকের মাটি তার দেবতা, বুঝতে পারি কত ভালবাসি, হতভাগ্য আমি যখন সে মাটি ছুঁয়ে ছিলাম তখনও বুঝনি সে মাটির দাম। (মহাকাল অঝোরে কাঁদছেন, আর আমরা কজন উদ্বেলতা নিয়ে, হৃদয় নিঙরানো বেদনা নিয়ে হতবাক হয়ে বসে আছি।)

৯ই জামুয়ারী ১৯৭৬

সামান্য তিনটি ঘটনা

ও

অসামান্য একটি লোক

অনিলকুমার চন্দ

সামান্য তিনটি ঘটনা—আপাত দৃষ্টিতে অতি সামান্যই মনে হয়—কিন্তু এই সামান্য ঘটনা তিনটির ভেতর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম কি অসামান্য আমাদের নেতা—সুভাষচন্দ্র।

তার কলকাতা জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তার সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল, যার স্মৃতি আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়েছিল চিঠির মাধ্যমে এবং তার স্মৃতিপাত করেছিলেন তিনিই। ১৯৩৬ সালে ইউরোপ থেকে চিঠি লিখে আমার পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লিখেছিলেন ভারী স্মরণ একখানা চিঠি। সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল তার অনেক পরে—যখন তিনি শ্রীনিকেতনে শিল্পভবনের একটি বিক্রয় কেন্দ্র কলকাতায় আমাদের আমন্ত্রণে শুভ উদ্বোধন করতে এসেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি (তখনকার দিনে কংগ্রেস সভাপতিকেই রাষ্ট্রপতি অভিহিত করা হ'ত) নির্বাচিত হবার পর তিনি ছ'তিন দিন বিশ্রাম

নেবার ক্ষুদ্র শান্তিনিকেতনে এলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রানে। সংগে ছিলেন অদ্বৈত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়—যিনি পরে কলকাতার পৌর প্রধান (Mayor) নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেবার সুভাষচন্দ্র বাইরের কোনো সভাসমিতিতে যাননি, নিছক ছুটি কাটাতেই তার এই অবস্থান। শুধুমাত্র একদিন শ্রীনিকেতনের অদূরবর্তী—“আমার কুঠি”তে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

এই অসামান্য কর্মবীর আবার সময় সময়ে বাঙালী জীবনের এক বৈশিষ্ট্য, আড্ডাও বেশ জমাতে পারতেন।

মুঠো মুঠো স্মৃতি খেতেন। পকেটে সর্বদাই থাকতো রূপোর ছোটো একটা বাস্ক। হু'একবার উল্লেখ করেছিলেন, “আমি মশাই উড়িষ্যার লোক—স্মৃতি ছাড়া আমার চলবে কি করে?”

বাইরের গণ্যমান্য অতিথি কেউ এলে স্বাক্ষর সংগ্রহকারীদের (autograph hunters) হাত থেকে তাঁদের বাঁচাবার জন্য তখনকার দিনে আমাদের

রীতি ছিল ওদের খাতাগুলি আমার দপ্তরে রেখে যেতো—সুবিধে মতো সেই অতিথি তাঁর স্বাক্ষর লিখে দিতেন—কেউ কেউ হয়তো ছোটোখাটো কবিতা বা বাণীও রেখে যেতেন। সেবার ছেলে-মেয়েদের তিন চারশ' বই জমা পড়লো আমার দপ্তরে। আমি কয়েকবারই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর এই দায়িত্বের কথা। গল্প শুদ্ধবের আসর তিনি ছাড়তে প্রস্তুত ন'ন, বলেন সে'ত নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু তার জন্ম এত তাড়া কিসের? সময়'ত ঢের আছে। এমনি করে তাঁর শাস্তিনিকেতনের ছুটি ফুরিয়ে এলো—শেষ সন্ধ্যা। পরের দিনই সকাল বেলার ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাবেন। আমার শিরে বজ্রাঘাত—তাঁর স্বাক্ষর জোগাড় না করতে পারলে ছেলেমেয়েরা আমার চুপ ছিড়ে নেবে, একথা তাঁকে সসম্মুখে মনে করিয়ে দিলাম। দশটা রাত হোলো—আমার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। শাস্তিনিকেতনে আমাদের অতি ভোরে ওঠার প্রয়োজন—রীতিও তাই। সুভাষচন্দ্র তখন বলেন—দিন'ত বইগুলো—মুক্তি আমার আসন্ন ভেবে মনের আনন্দে এগিয়ে এলাম। সুভাষচন্দ্র তখন বলেন—বাঙালী ছেলেদের বই-এ ত বাংলা স্বাক্ষর দিতে হ'বে—অবাঙালীদের ইংরেজীতে। কোনটা কার তা' বলতে হ'বে। আমি বললাম তার কি প্রয়োজন। অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হবে—আপনার স্বাক্ষর হ'লেই হবে।

অত্যন্ত কষ্ট হয়ে তিনি বাজেন—আপনি আমাকে বইগুলো দিয়ে বাড়ী চলে যান। এই বলে প্রত্যেকটি

বই ধরে ধরে বইটির মালিক বাঙালী কি অবাঙালী বের করে বাংলা বা ইংরেজীতে প্রয়োজন মত স্বাক্ষর দিতে লাগলেন। লজ্জায় ক্রোধে আমি চুপ করে বসে রইলাম—তিনি দীর্ঘকাল ধরে এক একটি বই'এ স্বাক্ষর করে গভীর রাত্রে বিশ্রাম করতে গেলেন। সে রাত্রেই কথা মনে হ'লে, এখনো আমার মন লজ্জায় ক্ষোভে ভরে ওঠে। কিন্তু সেদিন বুঝেছিলাম সাধারণ মানুষের আর মহামানবে কি তফাৎ।—

পরের দিন সকালবেলা তিনি কলকাতা ফিরে গেলেন। আমরাও জনকয়েক সেই ট্রেনে কলকাতা চলাম—কলকাতায় আমাদের গ্রন্থন-বিভাগের একটি অধিবেশন ছিল। তখনকার বিশ্বভারতী আমরা ঠাট্টা করে বলতাম নিঃস্বভারতী—আজকালের মত টাকার ছড়াছড়ি ছিল না। সেদিনে কলকাতায় কার্যোপলক্ষে যেতে হ'লে আমরা ভাতা পেতাম সাতটাকা করে। আমরা সবাই তখনকার ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের যাত্রী। সুভাষচন্দ্র ওদের দ্বিতীয় ক্লাশের রিটার্ন টিকিট ছিল—কিন্তু তাঁরা আমাদের সঙ্গেই একগাড়ীতে চলেছেন। সে ট্রেনটি ছিল অত্যন্ত লক্ষণাময় প্যাসেঞ্জার ট্রেন—যাত্রী বিরল। সুভাষচন্দ্র সে ট্রেনেই কলকাতা যাচ্ছেন খবর রটেছিল। প্রত্যেক স্টেশনে অগুণ্ঠিত লোক—মালাচন্দন, সুভাষচন্দ্র কি জয়—বন্দেমাতারম্ ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কিছুই বাদ গেলো না। গুসকরা স্টেশনে ভাড়ের মধ্যে একটি ছোট্ট ছেলে তাঁকে ভারী সুন্দর একটি গোলাপ উপহার দিল। সত্যি অতি সুন্দর, বেশ বড়ো—কোনো সৌখীন

লোকের সখের বাগানের সেরা ফুলটি তুলে এনেছে নেতাকে অর্থ দেবার জন্যে। ফুলটি হাতে নিয়ে সুভাষচন্দ্র খুব তারিফ করলেন, বলেন কলকাতা নিয়ে যাবো এবং সমস্ত ওপরের বাড়ি তুলে রাখলেন। আমাদের সঙ্গে মস্ত এক বুড়ি খাবার আমাদের বোঁঠান, প্রজেক্টা প্রতিমা দেবী দিয়ে দিয়েছিলেন, রাত্তায় খাবার আছে। খুব জ্বলার করে ট্রেনেই পিকনিক করা গেল।

কোনো একটা ছোটো ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছে— সুভাষচন্দ্র জনতার মধ্যে নেবে গেছেন—মালচন্দন নিচ্ছেন। আমি আমার দ্বিপ্রাহরিক বিজ্ঞান আয়োজনে ব্যস্ত। তখনকার দিনে আমাকে মাঝে মাঝেই বিশ্বভারতীর কাজে কলকাতা যেতে হ'তো। আমার সঙ্গে Duck back এর ছোট্ট একটি রাবারের বালিশ থাকতো—ফুঁ দিয়ে হাওয়া পুরে দিলেই চমৎকার বালিশ তৈরী হয়ে যেতো। ফুলটি দূরে সরিয়ে, বালিশটি উপরে রেখে একলাফে বাড়ি ওঠে গুয়ে পড়লাম। সুভাষচন্দ্র গাড়ীতে উঠেই একেবারে আতঙ্কিত চিৎকার করে বলেন— আমার ফুলটি চেপে দিলেন? আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম—ফুলটি ঠিকই আছে। আমি দূরে সরিয়ে রেখেছি। তিনি যেন হারাপো রত্ন কিরে পেলেন, এমনভাবে ফুলটি তুলে নিলেন। মনে পড়লো গারিবাল্ডির কথা—বই-এ পড়েছিলাম যে তিনি তাঁর হাজার মুক্তি সেনানীদের নিয়ে নাপেলসের (Naples) রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। একটা পাহাড়ের ঘাটি দখল করবার জন্যে

জোর লড়াই চলেছে—তাঁর সৈন্যেরা প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষণ করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন—সংগীত অবস্থা। এমন সময় হঠাৎ গারিবাল্ডি জুকুম দিলেন, বর্ষণ থামাও কিছুক্ষণ—পাশের একটা ঝোপে বসন্তের অগ্রদূত একটি নাইটিংগেল পাখী আপন মনে মধুর গান কচ্ছে—তিনি সবাইকে সে গান শোণিত করার জন্যে আহ্বান করলেন।

অন্তরে এই কবিপ্রাণ না থাকলে কি আর লাল কেজাতে কোমীনিশান তুলবার জন্যে “ভনমনধন” দিয়ে সবাইকে ডাক দিতে পারতেন তিনি?

এবার তৃতীয় ঘটনার উল্লেখ কবি। যখন জহরলালজী চুঙ্কিঙে চৈনিক নেতাদের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আমাদের চীনভবনের অধ্যক্ষও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক তানয়ুনশেন ও আমি কলকাতায় আসি কিছু জরুরী পরামর্শের জন্যে। আমরা দিন কয়েক কলকাতায় ছিলাম ও তানসাহেব একদিন রাষ্ট্রপতিকে লাঞ্চ খাবার আমন্ত্রণ করলেন তখনকার চীনেপাড়ার বিখ্যাত রেইরেট নানকিনে। তখনকার চৈনিক কনসালজেনেরাল ও ১০১২ জন নেতৃস্থানীয় চিনেভ্রাতৃলোক সেই ভোজে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ছাড়া আমিই মাত্র অল্প আরেকজন ভারতীয় ছিলাম। সেখানে। Birds' nest soup, sharks fin, lotus seed প্রভৃতি নানাবিধ চৈনিক চর্বাচোস্ত ইত্যাদি টেবিলে ছিল, এবং তখনকার চৈনিক রীতি অনুযায়ী কয়েকঘণ্টা সেই ভোজনো চলেও বেশ মনে পড়ে বিকেলে চায়ের সময় পর্যন্ত সেই বৈঠক চলেছিল। সুভাষচন্দ্র পরের দিন তাঁর এলগিন

রোডের বাড়ীতে প্রফেসার তান ও আমাকে খেতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যা আটটার পর আমরা দুজনে তাঁর ওখানে উপস্থিত হলাম। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা খুবই সমাদরের সংগে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কারণ স্ত্রীভাষচন্দ্র তখনো তাঁর নানাবিধ সভাসমিতি শেষ করে বাড়ী ফিরতে পারেন নি—একটু দেরী হ'তে পারে বাড়ীতে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। ৯টার কিছু পরে তিনি ফিরলেন ও দেরী হয়ে যাওয়ার জন্তে খুব ক্ষমা চেয়ে ডিনার টেবিলে আনতে আদেশ দিলেন। তারপর তান সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে বসলেন, আমাকে মার্জনা করবেন আমি আপনার সংগে খেতে বসতে পারছি না। আমাকে এক্ষুণি চুঁচুড়া যেতে হবে—এইমাত্র খবর এসেছে যে সেখানকার এক কংগ্রেস কর্মী টি. বি রোপে মরম্মোমুখো—বড় আগ্রহ প্রকাশ

করেছে মরবার আগে দেখতে চায়। আমাকে এক্ষুণি সেখানে যেতে হ'বে। আমি তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে বললাম যে তাঁর অতিথি বিশিষ্ট এক বিদেশী অধ্যাপক, একটু একসঙ্গে বসে না গেলে কি অপরাধ হবে না? তিনি বলেন নিশ্চয়ই অপরাধ হ'বে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো অপরাধ হবে যদি আমি যুক্তাপথ বাতী সেই কর্মীর পাশে গিয়ে না দাঁড়াই—এই বলে প্রফেসারের কাছে আরেকবার ক্ষমা চেয়ে ঝড়ের মত সিঁড়ি দিয়ে নেবে তাঁর অপেক্ষামান গাড়ীতে চেপে ঝটিতি চলে গেলেন।

দেশে নেতার অভাব নেই—কিন্তু নেতাজী শুধু এক—আমাদের স্ত্রীভাষচন্দ্র।

স্বাধীনতার স্বরূপ ও সূভাষচন্দ্র

ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

অখণ্ড স্বাধীনতা

স্বাধীনতা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, তা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তিই সূচিত করে না।

স্বাধীনতা সর্বব্যাপী, মানুষের সমাজনৈতিক ও ব্যক্তিক ভূমিতে ও তা পরিব্যাপ্ত। সূভাষ মননে রাষ্ট্র হ'বে 'স্বাধীন মুক্তি সম্পন্ন সমাজের' ^১ ধারক, যে সমাজে 'ব্যক্তি সর্বতোভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না।' ^২ ব্যক্তিক

স্বাধীনতা মানুষের জীবনবিকাশের চাবিকাঠি।

জগন্নাথ জেলা ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে

(২১-৭-২৯) সূভাষচন্দ্র বলেন, 'সমাজ ও জাতি-গঠনের মূল—ব্যক্তি-বিকাশ। তাই স্বামী

বিবেকানন্দ বলিতেন—man making is my mission—খাঁটি মানুষ তৈরী করাই আমার

জীবনের উদ্দেশ্য।...স্বাধীনতার অখণ্ডরূপের আভাস

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়।

Freedom freedom is the song of the

soul—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ-হৃদয়ার

ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশ-

বাণীকে মুক্ত ও উন্মত্ত প্রায় করিয়া তোলে।... স্বামী

বিবেকানন্দ মানুষকে ষাণ্ডীয়া বন্ধন হইতে মুক্ত

গৌর '৮২-৭

হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন।' অশ্রুজ বলাছেন, 'আমি জানি জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি।' ^২

মুক্তির ভগীরথ সূভাষচন্দ্র এমনিভাবে ব্যক্তি-সত্তা বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যেমন ক'রে স্বামীজী উদ্ভাস্ত কণ্ঠে মানুষগড়াকে জীবনের 'mission' বলে ঘোষণা করেছেন। এই নূতন মানুষই আদর্শময় কর্মক্ষেত্রের স্বত্বিক। মেদিনীপুর ভাষণে (২৯-১২-২৯)

প্রোগ্রাম দেবার বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সূভাষচন্দ্র বলেন, নূতন মানুষ তৈয়ারী করিবার

চেষ্টায় আমি এখন নিরত।" এই মানুষের মধ্যে

বইবে স্বাধীনতার ক্ষমতারা, তারাই স্বাধীন চিন্তার

উৎস এবং মুক্ত ব্যক্তির জায় চিন্তা করতে পারলেই

তবে স্বাধীনতা করায়ত্ত হয়।

(জঃ পৃঃ ১২৬ তরুণের স্বপ্ন)

স্বাধীনতা অবশ্য শুধু ব্যক্তির জন্ত নয়, তা

সমাজেও পরিব্যাপ্ত হবে। যে সমাজে মানুষ বাস

করে তারও চাই স্বাধীনতা। '...সত্যকার

স্বাধীনতার অর্থ কেবলমাত্র ব্যক্তির জন্ত নয়, সমগ্র

সমাজের জন্তও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি।' ^২

সমাজে জাতি-ভেদের অচলায়তন লুপ্ত হবে। অতীতের বর্ণাশ্রম ছিল সাম্যসমাজের নিয়ামক। কিন্তু আজ আর তা নয়। বর্ণ-বিভাগ জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়ে সমাজে এখন নানা বৈষম্যের প্রাচীর খাড়া ক'রে সমাজের সহজগতি রুদ্ধ করেছে। তাই সুভাষচন্দ্রের মুক্ত সমাজে 'জাতিভেদ আর থাকিবে না।' ১

সে সমাজে নারী পুরুষের অধিকার বৈষম্যের নিরসন ঘটবে। 'নারী মুক্ত হইয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে।' ২ পুরুষের মত নারীর মুক্তিও স্বাধীন সমাজের অপরিহার্য উপাদান। বর্তমান সভ্যতার নারী মুক্তির উচ্চ কণ্ঠ প্রচার বাজল্য অস্তুঃসার শূন্য হ'য়ে পড়বে, যদি সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন না থাকে। নারীর প্রতি সামাজিক সম্মান, সমান সামাজিক অধিকার সেখানে প্রতিনিয়তই অবহেলিত হচ্ছে, সেখানে নারী অধিকার বর্ষে সাময়িক সভাসমিতির বক্তৃতার আড়ালে বর্তমান সভ্যতার বঞ্চনার আধিক্যকে যান্ত্রে আরও প্রকট ক'রে না তোলে উত্থোগীদের সে বিষয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের মুক্ত সমাজে প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'বে।

সে 'সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে না,... প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে।' ৩ লাহোর ভাষণেও বলেছেন, 'স্বাধীনতা শুধু রাজ্যীয় বন্ধন মুক্তি নহে, ইহা অর্থের সমান

বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি বর্জনও সূচিত করে।' ৪

সুভাষচন্দ্রের এই স্বাধীনতার চিন্তাধারা তাঁর জীবন দর্শন থেকেই উৎসারিত। ভারতবর্ষে মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সমাজদর্শন প্রতিফলিত হ'লে তা বিশ্ব মানবের পক্ষেও কল্যাণকর হবে।

সুভাষমনের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, ব্যক্তি, সমাজ, আর্থিকক্ষেত্র ও রাষ্ট্রে এক সমন্বয়সূত্র বন্ধনে অখণ্ড মুক্তির দর্শন রচনা করেছে, যার উৎস নিহিত রয়েছে ভারতীয় মনন ধারার গভীরে।

মুক্তির দর্শন

সাম্য দৃষ্টিই অখণ্ডবোধের উৎস। সুভাষচন্দ্রে এই সাম্য এসেছে ভারতের অতীত ঐতিহ্যের ধারা থেকে। ইতিহাস থেকে আমরা জানি ভারতের এই ঐতিহ্যধারা ভারতের স্বাধিদের সাধনা সমৃদ্ধ। সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবন সাধনা দিয়ে মননের গভীরে তা উপলব্ধি করেছেন। দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের লীলা। বলেছেন, 'আমার নিকট প্রেমই সত্যের স্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেছে প্রেম এবং মানব জীবনের মূলনীতি'। (ভারত পঞ্চিক-পুঃ ১৩৩)। এই প্রেমই সুভাষদর্শনের উৎস ভূমি। প্রেমের এই অমুখ্যান তাঁকে সাম্য-সাধক করে তুলেছে এবং জীবনময় কর্মযোগে তা প্রসারিত হ'য়ে সুভাষীয় সাম্যদর্শনে রূপলাভ করেছে। সাধনা

সমুদ্র এ সাম্যই সমস্যের সূত্র রচনা ক'রে অখণ্ডতায় উত্তীর্ণ হয়ে পূর্ণ সমাজ-দর্শনের জন্ম দেয়। স্মৃতিচিহ্নের জীবন সাধনায় এক সাধ্য বস্তু এই অখণ্ড সমাজদর্শন।

স্মৃতিচিহ্ন যখন প্রসারিত হল স্বাধীনতার মর্গক্ষেত্রে তখন তার পরিধি বিস্তৃত হ'য়ে অখণ্ড স্বাধীনতার দর্শনে রূপলাভ করল। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি এই স্বাধীনতা শুধু বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তি বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বোঝায় না—যদিও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্ধন মুক্তির প্রথম সোপান রচনা করে; সামাজিক ও আর্থিক সাম্যে সে স্বাধীনতা প্রস্ফুটিত হয়ে ব্যক্তিক স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলবে। স্বাধীনতা হবে মুক্তির সমার্থক। স্মৃতিচিহ্ন এরূপ এক আদর্শ মুক্ত সমাজ রূপায়নের নির্দেশ রেখেছেন। অতীত ভারতের রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে তদানীন্তন ঐতিহাসিক পটভূমিতে অমূরূপ সমাজ দর্শনের রূপায়ন তিনি লক্ষ্য করেছেন। আমরা এর অনুশীলন করি না এবং আমাদের শিক্ষার ধারা এমনিই যে আমরা দেশের ঐতিহ্যের প্রবাহ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হ'তে চলেছি। এ বিষয়ে সতর্ক না হ'লে দেশ তার অতীত প্রমূল্য হারিয়ে সমাজ সংগঠনে চরম বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হবে।

স্মৃতিচিহ্ন ভারতের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রবাহের পুরুষ, ভারতের আত্মপুরুষ। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় ক'রে দেশের আত্মস্বরূপের আবির্ভাব ঘটুক—এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেশের মুক্তির অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে দেশনায়ক ব'লে বরণ করেছেন। 'স্মৃতিচিহ্নের রক্ষা ও চক্ষুতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবিস্কৃত হন'—এই কথাই উল্লেখ ক'রে স্বাধী কবি স্মৃতিচিহ্নকে হৃদয়াক্রান্ত দেশের 'সার্থক মুক্তি'র হোতা হিসেবে দেখেছেন। বাংলাদেশেও রাষ্ট্রনেতার পদে আহ্বান করতে গিয়ে তাঁকে 'ঘণ্টার স্মৃতিচিহ্ন' ব'লে চিহ্নিত করেছেন আর চেয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রে স্মৃতিচিহ্নের সাধনায় বাংলার 'আত্মজাতি বোড়শোপচারে সত্য হোক।' ('দেশনায়ক' প্রবন্ধ কালান্তর গ্রন্থে প্রস্তাব্য)।

জনতার সেই স্বাভাবিক প্রতিনিধি নেতাজী স্মৃতিচিহ্ন টোকিয়ো ভাষণে (১৯৪৪ নভেম্বর) বলেন, 'অতীত ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।' আর রংপুর ভাষণে (১৯২৯ মার্চ) ঘোষণা করেন, 'সমাজতন্ত্র বোধের জন্ম হয়েছে ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতির মধ্য থেকে।' ভারতের সমাজ ও আদর্শ চিন্তার সর্বক্ষেত্রে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত হ'য়ে তাঁকে জ্ঞান ও কর্মযোগীতে...উত্তীর্ণ করেছে। অতীত ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ সাধনার ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে স্মৃতিচিহ্ন অতীত ভারতের প্রজাতন্ত্রগুলির রাষ্ট্রিক কাঠামো ও পরিচালন কুশলতা, সে সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতার প্রতিফলন অগভীর মনন সহকারে অনুধাবন করেছেন। পরবর্তীকালের রাজতন্ত্রের যুগে ও গ্রামভারতে স্বাধীন গ্রাম

পঞ্চায়েতী প্রশাসন ও স্বয়ম্ভরতার আদর্শের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (vide p 6 to 11 Indian Struggle & p. 32 of Selected Speeches, Govt of India publication)। ১৯২৭ সালে স্বচক্ষে আসামের খাসি উপজাতিদের সমাজ কাঠামোর মধ্যে ভারতের অতীত প্রজাতান্ত্রিক যুগের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অমুরূপ ধারার প্রচলন দেখে তৃপ্ত হয়েছেন। (vide Foot Note to p 9- Indian Struggle.)।

সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে, কর্তৃত্বের ভূমিকায় স্থাপন করেননি। তাঁর স্বাধীন রাষ্ট্র স্বাধীন সমাজসত্তা ও স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাব স্বর্ভূ সমস্যের চালক হয়ে, চলবে, অবদমনের যন্ত্র হিসেবে নয়। সুভাষ নির্দেশিত সমাজে উত্তীর্ণ হ'তে প্রথম দুর্লভতা বাধা হিসেবে দেখা দেয় ব্রিটিশ রাজশক্তি, তার সামরিক ও সাংগঠনিক পরাক্রম। নূতন সমাজ সংগঠনের পূর্ণ সফল হ'য়ে দাঁড়ায় বৈদেশিক শক্তির বিতাড়ন; সে শক্তি আর্থিক শোষণের সঙ্গে জাতির প্রাণশক্তিকেও নিঃশেষিত করে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে চিরস্থায়ী শোষণ ও শাসন কায়েমে উদ্বৃত্ত ছিল। ব্রিটিশ শক্তি অতীত ভারতের প্রাচীন কাঠামো, তার দার্শনিক চরিত্র বিধ্বস্ত করে, সমাজে জাতিবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে দেয়— পরবর্তীকালে যা ভারতবিভাগে পরিণতি লাভ করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নূতন প্রশাসনের আগ্রাসী আচরণে আহতজাতির জীবনী-শক্তি জাগ্রত হ'য়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত

হয়। আমরা দেখি সুভাষচন্দ্রকে সংগ্রামী রাষ্ট্র-নায়করূপে। বস্তুতঃ সুভাষ জীবনের এই প্রকাশ তাঁর বহুমাত্রিক নেতৃত্বের ও জীবনধারার অনন্ত বিশিষ্টতার স্বাক্ষর বহন করে।

রূপান্তরের বিপ্লবী দিশারী

অখণ্ড সাম্য-স্বাধীনতার দিশারী সুভাষচন্দ্র ভারতের বৈদেশিক শাসনমুক্তির অগ্রদূত হিসাবে দেখা দিলেন। মিললেন এক লীলাবাদী মানব প্রেমিক দেশনেতা-দেশবন্ধুর নেতৃত্বে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই মিলন এক অতি বিরল ঘটনা। বাংলার তথা ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসে তার প্রভাব চিরস্থায়ী হয়ে আছে। মানব প্রেমিক সুভাষচন্দ্র অখণ্ড মুক্তির দর্শনকে রূপায়িত করতে চাইলে বঙ্গন মুক্তির সংগ্রামে তাঁকে অবতীর্ণ হ'তে হয়। তদানীন্তন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির শৃঙ্খলিত অবস্থা তাঁকে বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরিত করে তোলে। সামাজিক ও দার্শনিক রূপান্তরের যে বিপ্লব বহুটা তাঁর মধ্যে বইছিল তা প্রকাশিত হ'ল। তাঁর দীর্ঘ ওজুতি, আপোষহীন সংগ্রাম, কারা ছর্ভোগ, বৈপ্লবিক আর অহিংস আন্দোলন ধারার মতবিরোধে ভারতবর্ষ থেকে নিষ্কমন, আজ আর কারো অজানা নয়। তারপর সশস্ত্র সংগ্রামে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অধিনায়করূপে, আজাদহিন্দ সরকারের প্রধান হিসাবে দেখেছি সেই অনন্ত বিপ্লবী নায়ককে। প্রেমের দর্শন ধার জীবনাদর্শের উৎস আমরা দেখলাম তাঁকে অভুলগ্নীয় বিপ্লবী রাষ্ট্র-

নায়করূপে। তাঁর জীবনের দর্শন ও কর্মের এই অভিশ্রবণ গভীর অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষ অমুরূপ প্রকাশ দেখেছে লীগাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক জীবনে। ভাগবতের উদগাতা পুরুষ প্রেমের ঠাকুরকে আমরা দেখেছি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধের নিয়ামকরূপে, অর্জুনের সারথি হ'য়ে যিনি পৃথিবীকে গীতামৃত্ত দান করেছেন।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় সুভাষচন্দ্রের অবদান যে অতুলনীয় ইতিহাস সে কথা স্বীকার করে।

শুধু রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নয় সমাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রেও তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নির্দেশ রেখেছেন।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে সমাজে তিনি বর্তমানের জাতিবৈষম্যের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দিতে বলেন কারণ তা সমাজ প্রগতির অধিকার হ'বে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'বর্তমান বর্ণ বিভাগ (caste) প্রকৃত জাতি নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক। উহা যথার্থই জাতির অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার স্বাধীন গতি রোধ করিয়াছে। কোন বন্ধমূল প্রথা যা জাতি বিশেষের জন্ত বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রকৃত 'জাতি'কে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে দেয় না ; ... (বিবেকানন্দ রচনাবলী ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১)

অতীত বলেছেন যে আত্মিক ধর্মের জাতিভেদের স্থান নেই এবং বদান্ত ধর্মের বিরুদ্ধে। এই বিভাগ সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে এক প্রতিষ্ঠান।

পৃথক পৃথক বর্ণের মানুষ সম্যাসী হ'লে বর্ণাভীত হয়ে যান। জাতিভেদের ধারণা বৈষম্যের বৃহত্তম উপাদান এবং মায়ার মূল, জন্মগত বা গুণগত জাতি প্রথা এক বন্ধন বলে মনে হয়।—ভারতীয় ধারাত্রেই এর সংস্কার করা যায়। (vide p33-35 of Caste Culture and Socialism—published by Advaita Ashrama)। সুভাষচন্দ্র এই বন্ধনকেও অতিক্রম করতে চেয়েছেন।

সমাজে নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা হিসাবে দেখেছি সুভাষচন্দ্রকে। এ সম্পর্কেও পূর্বের আলোচনার জের টেনে বলতে হয় যেখানেই বন্ধন সেখানেই তাঁর মুক্তির দৃষ্টি প্রসারিত। নারীর প্রতি অত্যাচারের সংবাদে তাঁর মন বিজ্রোহ করেছে, তিনি বিজ্রোহ করেছেন, জগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে (২১. ৭. ২২) সভাপতির ভাষণে সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রচার ধারা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,—আর যাও—মাতৃজাতির সমীপে। যাঁরা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ যাঁরা হয়ে আছেন—'অবলা'—তাঁদেরও জাগাও—বল—আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধরা।' পুরুষের দৈহিক শক্তি ও সমাজে তাঁর তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থিতি নারীর সম্মানকে বাড়িয়ে তুলুক—তা যেন অবদমনের হাতিয়ার হ'য়ে না দাঁড়ায়। নারীপুরুষের স্বর্গ সমন্বয় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সমাজের সাম্যের পথ রচিত হয়, অবদমন ও অপমানের মধ্য দিয়ে নয়।

রাষ্ট্রিক সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে প্রকৃত

স্বচ্ছন্দ গতি করে তুলতে হ'লে বর্তমানের হাজারো বন্ধনের দুর্লভ্য বাধা অতিক্রম করতে হবে, সেজ্ঞা স্বাধীনতার পর কয়েক বৎসর কতৃৎমূলক প্রশাসন প্রয়োজন। (vide p. 312 Indian Struggle)। সে প্রাথমিক পর্যায়ে অতিক্রান্ত হ'লে স্বভাবতঃই মুক্ত সমাজ, অথগু স্বাধীন সমাজ রূপায়নের কালে পৌছতে হবে।

সুভাষচন্দ্র ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রে কৃষক মজুর জনতার স্বার্থে এক আমূল পরিবর্তনের রূপরেখা দিয়েছেন। বড় শিল্প জাতীয়করণ জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি বড় মাঝারি ও কুটীর শিল্পের সূচু সমন্বয়ে নতুন আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ রেখেছেন। (vide p. 80-81 Cross Roads) শক্তিশালী উৎপাদন ও সামাজিক বটন ব্যবস্থা ও তাঁর আর্থিক কর্মসূচীর অন্তর্গত (vide p. 414—Indian Struggle)। কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপায়নের জন্য প্রথম প্ল্যানিং কমিটি সংগঠন করেন।

আর্থিক সংগঠনে প্ল্যানিং এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টাকে তাঁর অবদানের অনন্ত স্বাক্ষর বলে আমরা মনে করতে পারি, কিন্তু হয়ত ভবিষ্যতে ভারতের আর্থিক ইতিহাসের রচনাকারীরা একথা তুলে ধরবেন যে নতুনতর এক মুদ্রানীতির মাধ্যমে তিনি ভারতীয় আর্থিক কাঠামোতে এক বৈষম্যবিনাশী ধারার

প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। কমুনিষ্ট অর্থনীতিতে সেরূপ কোন নীতির সন্ধান তিনি পাননি কারণ তারাও পশ্চিমী সমাজে প্রবহমান মুদ্রানীতিরই অনুসরণ করেছে, তার থেকে ভিন্নতর নীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু ভাবী সাম্য সমাজে অথগু স্বাধীনতার রূপায়নে নতুন মুদ্রানীতি প্রয়োগের প্রমুখ্য একদিন ধরা পড়বে। মুদ্রা আর্থিক সংগঠনের (রাষ্ট্র শক্তিরও) চাবিকাঠি, কিন্তু তা আজ রক্ষণ হয়ে সমাজে যে তাগু সৃষ্টি করছে, তা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই গেসেলের মুদ্রাতত্ত্বের প্রতি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। নতুন মুদ্রানীতি রূপায়িত হ'লে ভারতের মত বিশাল দেশের আর্থিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের সূচীমুখ রচিত হবে। কোন বৃহৎ দেশে এরূপ পরিবর্তন তার ভৌগোলিক চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিশ্বের অর্থনীতিকেও তা প্রভাবিত করে এবং আন্তর্জাতিক বিনিময়তত্ত্বের মাধ্যমে তা বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

সুভাষচন্দ্রের অথগু আদর্শের দৃষ্টি ভারতের রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও ব্যক্তিক ভূমি ছাড়িয়ে বৈশ্বিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। অতীত প্রমূল্যে মহান, নতুন বৈজ্ঞানিক কুশলতা, আর্থিক তত্ত্বের প্রয়োণে শক্তিশালী, শিক্ষায় সাধনায় গরীয়ান এক আদর্শ সমাজ ভারতবর্ষে গড়ে তোলার স্বপ্ন রয়েছে সুভাষচন্দ্রের। সে ভারত বিশ্বমানবতার ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে তার আপন অনন্ত অবদান তুলে দিয়ে বিশ্বকে মহত্তর করে তুলবে।

ভারতের অবদান

বিশ্ব মানবাত্মার প্রতি আহ্বান করেছে ভারতের শাস্ত্রবাণী 'শৃঙ্খল বিশেষ...'। দীর্ঘ একটানা ঐতিহ্যের অনন্ত অধিকারী ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা, জীবনের সর্বদিকের সাধনায় সমৃদ্ধ ভারতের বস্তুবা পৃথিবীরও সম্পদ। ভারত মণীষা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সুভাষচন্দ্র তাই বারবার বলেন, পৃথিবীকে ভারতবর্ষের দেবার আছে। ভারতবর্ষের একটি বাণী আছে যা জগৎ সভায় শোনাতে হবে। (জ্যৈষ্ঠ্য পৃ: ১২৭ তরুণের স্বপ্ন)। এ বাণী অখণ্ড সাম্য সম্বন্ধের বাণী, মানুষকে পূর্ণ করে তোলার বাণী, ভারতবর্ষ একদিন তার জীবন ধারার মধ্যে সাধমা দিয়ে যা মূর্ত করে তুলেছিল। সে ভারত আজও প্রবাহমান। অতীত প্রমূল্যে মহীয়ান হয়ে নূতন অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ আবার তার সাধিত বস্তুর আর আদর্শের ডালি বিশ্বকে উল্হা দেবে। পৃথিবী তা থেকে যদি বঞ্চিত হয় তা হ'লে তা দীনতর হ'বে। সুভাষচন্দ্র তাই বলেন ভারতবর্ষ যে যুগ-যুগান্ত ধরে বেঁচে রয়েছে তার অমূল্য প্রাণ সম্পদ নিয়ে তার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। সারা জগতকে পূর্ণতর করে তোলার উদ্দেশ্যে। 'জগৎকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আপন অতুলনীয় অবদানটি দিবে, তাই তাহার মুক্তি লাভেও প্রয়োজন

আছে।' (জ্যৈষ্ঠ্য—মধ্য প্রদেশ যুবসম্মেলনে সভাপতির ভাষণ—১৯. ১১. ২৯)। বৈদেশিক শাসন থেকে আন্ত মুক্তির ঐকান্তিকতা তাই সুভাষ-মননে গভীরতম হ'য়ে দানা বেঁধেছিল। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চূর্ব্বার হ'য়ে উঠেছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশন মঞ্চ থেকে সভাপতির ভাষণে তিনি উদ্ধাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ভারতের মুক্তি বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করবে।'

সুভাষ জীবন দর্শনের অন্ততম প্রধান এই লক্ষ্য ভারতীয় জীবনধারারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি।

সুভাষচন্দ্র চেয়েছেন ভারতবর্ষ নূতন সাম্য সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হোক। দেশ বিদেশের, যা কিছু মহান গ্রহীক্ষুভারত তা গ্রহণ করে তাকে নিজস্ব সমাজ ও মনন ধারার অঙ্গ করে নেবে। দর্শনে, বিজ্ঞানে আর্থিক ও সামাজিক সংগঠনে ভারতে এক অখণ্ড স্বাধীন সম্বন্ধ ধারার জীবন্ত প্রকাশ ঘটুক— সেখানে সর্বপ্রকার বন্ধন ও বৈষম্যবোধ লুপ্ত হ'য়ে সমাজে ব্যক্তিও মহান হয়ে উঠবে। মানবাত্মার মুক্তির দিশারী হিসাবে ভারতবর্ষ তখন স্বভাবতঃই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষন করবে। ভারতাত্মা সুভাষচন্দ্রের অখণ্ড জীবনাদর্শ রূপায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

(১) মেদিনীপুর যুব সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ (২৯-১২-২৯) জ্যৈষ্ঠ্য

(২) ১৯. ১০. ২৯ নাহোরে শাঙ্কর হাজি সম্মিলনীতে ভাষণ।

সাধনা

বিউটি

ক্রীম



তাঁর মনোহারিনী মৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমলীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরঙ্গ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য



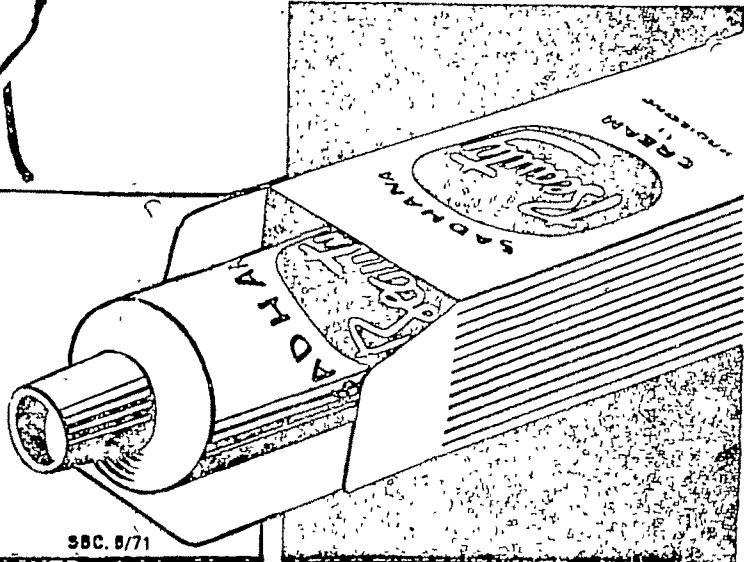
সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮



J. C. Ghose

শাখা ভারতের সর্বত্র



SBG. 9/71

শেষ ও অশেষ

পবিত্রকুমার ঘোষ

কোন সরকারী ভদ্র কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি না। মিঃ জি ডি খোসলা লেখক রূপে ব্যক্তিগত দায়িত্বে যে নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি লিখেছেন—Last days of Netaji নামক সেই গ্রন্থখানির সৌন্দর্য ও মাধুর্য আমি যেভাবে উপভোগ করেছি পাঠককে সেই রসাস্বাদনের অংশীদার করতে পারলে আমি তৃপ্ত হব। খোসলা সাহেব বিচারপতি, বিদগ্ধ ব্যক্তি। তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্লেষণশক্তি অপরিমিত। তিনি কোনো সাক্ষীর মুখ দেখে কিংবা তার একটি ছুটি কথা শুনেই তার চরিত্র, প্রকৃতি ও মতলব বুঝে ফেলতে পারেন। সেটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ বিচারপতি রূপে নীচুতলা থেকে উচ্চতম পদ পর্যন্ত অধিকার করেছেন তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এবং মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন কম নয়। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তিনি একজন পাকা লেখক। যদিও কেমব্রিজ থেকে গণিতশাস্ত্রে তিনি বি এ পাশ করেছিলেন, কিন্তু পরিণত জীবনে তিনি তিনখানি ছোট গল্পের বই ও একখানি উপন্যাস লিখেছেন; যে সব ভারতীয়রা ইংরেজি ভাষায় লেখক রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন

পৃষ্ঠা ১২-৮

মিঃ খোসলা অবশ্যই তাঁদের মধ্যে একজন রূপে গণ্য হবেন।

কিন্তু আলোচ্য বইখানি পড়তে শুরু করলেই বাতে মুগ্ধ হতে হয় তা হোলো মিঃ খোসলার কবিত্ব-শক্তি। প্রকৃতই তিনি একজন কবি। নবম অধ্যায়ে তিনি তাঁর জাপান যাত্রার কথা লিখেছেন। টোকিও শহরের নিসর্গ বর্ণনায় তাঁর কবি স্বভাব মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু তিনি যে একজন উচুদরের শিল্পী তার প্রমাণ পেয়েছি বইয়ের প্রথম পাতাটিতেই। বড় উপন্যাসিক বইয়ের প্রথম লাইনটিতেই গোটা বইয়ের সারাংশের প্রভি ইঙ্গিত করে থাকেন, অনেক ক্ষেত্রে মিঃ খোসলা তাই করেছেন। ১৯৭০ সালের ২রা জুলাই কুলু ভ্যালিতে অবকাশ যাপনের পর তিনি কিরে এসেছেন দিল্লীতে, পেলেন হাতে একটি বই। পোলাণ্ডের নেতা জেনারেল সিকোরস্কি ১৯৪৩ সালে বিমান-দুর্ঘটনার মারা গিয়েছিলেন। উইনস্টন চার্চিল মিত্রশক্তি রাশিয়ার স্বার্থে তাঁকে যড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিলেন এই ছিল অপবাদ। পঁচিশ বছর পর কার্লোস টমসন স্বীয় উত্তোগে বহু অহুস্কারের পর আবিষ্কার

করলেন যে অপবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উইনস্টন চার্চিলের চরিত্র হ্রস্বতঃ উদ্দেশ্যেই এই অপবাদটি রটানো হয়েছিল। চার্চিলের মৃত্যুর পর টমসন সে মিথ্যার জাল টেনে ছিঁড়ে ফেলেছেন।

সুভাষ বসুও মারা যান ১৯৪৫ সালে বিমান-
 দুর্ঘটনায়। তার ঠিক পঁচিশ বছর পর ভারত সরকার
 মিঃ খোসলাকে আমন্ত্রণ জানালেন এ সম্পর্কে
 সত্য উদ্ঘাটনের জন্য অমূল্যমানের ভার নিতে।

.....

...। ... এখন মিথ্যার জাল ছিঁড়ে
 ফেলতে কি মিঃ খোসলা এগিয়ে আসবেন না?
 তিনি কি একজন ভারতীয় কার্লোস টমসন হতে
 অস্বীকার করবেন?

টেলিফোন বেঞ্জে ওঠে। ভারত সরকারের
 স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি ত্রিনিবাসবর্ধন
 ওশাস্ত্র থেকে মিঃ খোসলাকে বলেন: আপনি
 আরও একটি সরকারী তদন্ত কমিটির কাজ
 চালাচ্ছেন জানি। সেটাও করুন। আবার এ ভারটিও
 নিন। বুঝলেন না, বিদেশে যেতে পারবেন।

বিদেশ! জাপান। মিঃ খোসলা জাপান
 যাওয়ার স্বপ্ন লালন করেছেন চিন্তে দীর্ঘ কাল ধরে
 হয়ে ওঠেনি। এবার অস্বাভাবিকভাবে এলো সে
 সুযোগ। তাও সরকারী খরচে। নেতাজীর জীবন-
 মৃত্যু রহস্যের কিম্বদন্তি করার দায় তাই তিনি তদন্তেই
 মাথা পেতে মিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর ছবি ভেসে ওঠে তাঁর
 মানস পটে। একবার মাত্র স্বচক্ষে দেখেছিলেন
 তাঁকে। তখন মিঃ খোসলার বয়স আঠারো-উনিশ,
 আগার-গ্রাজুয়েট, লণ্ডনবাসী। সুভাষ বসু সেদিন
 আই. সি. এস পদ ত্যাগ করার সঙ্কল্প করেছেন;
 পথের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন ছাত্রকে তাঁর
 সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উচ্চকণ্ঠে তিনি বোঝাছিলেন।
 এক পলক দেখেই, চার বছরের কনিষ্ঠ মিঃ খোসলা
 সুভাষ বাবুকে দাবড়ে দিলেন। বললেন, “মশাই,
 আমি আই. সি. এস হব, একজন ইংরেজকে অন্তত
 ঐ পদে বসা থেকে ঠেকাবো, এবং সেটাই হবে যথার্থ
 স্বদেশ সেবা।” সুভাষবাবু একধার জবাব দিতে
 না পেরে শুধু তাজিলোর দৃষ্টিতে একটু চাইলেন
 মাত্র। মিঃ খোসলা মনে করলেন, সুভাষবাবু
 বুধাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাগাড়ম্বর করছেন।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এ ঘটনা কি সত্য
 না কল্পিত? সুভাষচন্দ্র আই সি এস ত্যাগের
 সিদ্ধান্ত সেদিন নেননি, নিয়েছিলেন ইংলণ্ড যাবার
 আগেই। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বীয় কীর্তিমহিমা
 জ্ঞাপন করার মতো দুর্বল মানসিকতা তাঁর ছিলনা।
 তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁর সামনে যে ভঙ্গীতে কথা
 বলতে পারতেন না, সেই ভাষায় ও সেই ভঙ্গীতে
 চার বছরের অমুজ্জ খোসলা কয়েকটি স্পষ্ট ও হক
 কথা শুনিয়ে দিলেন ও যথার্থ দেশপ্রেম কী তা
 শিখিয়ে দিলেন এবং সুভাষচন্দ্র জবাবটি পর্যন্ত খুঁজে
 পেলেন না—হ্যাঁ, এসবই হয়তো বা সত্য। কেমনা
 ব্যক্তিকে মিঃ খোসলা তো কম যাম না। তিনি

চিরকালই স্পষ্ট বস্তু, নির্ভীক, সত্যবাদী ও দেশ-
প্রেমিক ছেনে আমরা আশ্বস্ত হলাম বই কি।

না, লেখক সুভাষচন্দ্রকে কোথাও হেয়
করেননি। বরং বারবার তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা
নিবেদন করেছেন। ভূমিকাতেই তিনি নেতাজীর
সাহস ও চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন
যে নিজের জীবন তিনি ভারতবর্ষের জন্ত সমর্পণ
করেছিলেন। পরিশেষে লিখেছেন, এত বড়ো
মানুষটি, যিনি ছিলেন অশাস্ত্র ও ছুর্নিবার তিনি কি
বঁচে থাকলে লুকিয়ে থাকতেন? তিনি সুনিশ্চিত
মারাই গিয়েছেন। আর সে কি মহনীয় মৃত্যু!
একবার কাঁদলেন না, কাতরোক্তি করলেন না,
অভিযোগ করলেন না কারও বিরুদ্ধে, শুধু হবিবর
রহমানকে বললেন : যাও, ফিরে গিয়ে দেশবাসীকে
বোলো, আমি দেশের মুক্তির জন্ত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত
লড়েছি; ভারত অচিরেই স্বাধীন হবে। আহ,
দেশের জন্ত মৃত্যু কি মধুর!

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কি সত্যই মারা গিয়েছেন?
মিঃ খোসলা বলেছেন, ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট
হুপুর বেলা তাইহোকু বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনা
হয়েছিল একথা সত্য; ঐ বিমানে নেতাজী ছিলেন
ও তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান একথাও সত্য; এবং ঐ
তারিখেই রাত্রে তিনি মারা যান একথাও সত্য।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি কী কী?

যুক্তি এই যে, লেফেট্যান্ট-জেনারাল ফুজিয়ারা
তাঁকে বলেন যে মেজর তাকাহাসি ও লেঃ কঃ
শিরো নোনোগাকির (Nonogaki) কাছ থেকে

তিনি শুনেছেন যে চন্দ্র বোস বিমান দুর্ঘটনায়
মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয় জাপানী সাক্ষী তাদাসি
আন্দো (Ando) বলেন যে তিনি শুনেছেন যে
চন্দ্র বোস বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তৃতীয়
জাপানী সাক্ষী তাদাও সাকাই (Tadao Sakai)
বলেন যে তিনি উক্ত বিধ্বস্ত বিমানখানির যাত্রী
ছিলেন, তবে চন্দ্র বোস দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন
কি না তা তিনি জানেন না। চতুর্থ জাপানী সাক্ষী
শিরো নোনোগাকীও নেতাজীর অন্তিম যাত্রায়
বিমান সহচর ছিলেন। বিমানটি দুর্ঘটনায় পরার
পর তিনি দেখেছিলেন চন্দ্র বোস অগ্নিবেষ্টিত
হয়েছেন ও তাঁর অনুচরটি সে আগুন নেভাবার চেষ্টা
করছেন। হাসপাতালে নীত হলে চন্দ্র বোস ও
নোনোগাকি একই ঘরে স্থান পান ও সে রাত্রেই
বোস মারা যান। ইনি বিমানবন্দরে চন্দ্র বোসকে
পুরো নগ্ন অবস্থায় দেখেছিলেন। পঞ্চম জাপানী
সাক্ষী মেজর তারো কোনো (Major Taro
Kono) বলেন যে তিনি উক্ত বিমানটিতে ছিলেন
ও অগ্নিদগ্ধ চন্দ্র বোসকে তিনিও দেখেছিলেন;
না, বোস আদৌ নগ্ন ছিলেন না, বৌদ্ধ মন্দিরে
যেন প্রশান্ত ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন এমন-
ভাবে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারো কোনো
হাসপাতালে চন্দ্র বোসকে দেখেননি, তাঁর মৃত দেহ
দেখেননি। তিনি যে মারা গিয়েছেন এ তাঁর শোনা
কথা। এমন কি তারো কোনো বলেন, তাইপে
পৌঁছানোর পর চন্দ্র বোস যে কোথায় গিয়েছেন তা
আমি জানি না।

ষষ্ঠ জাপানী সাকী মিঃ তাকাহাসি বলেন যে
 তিনি ঐ হুর্ভাগ্য বিমানটির যাত্রী ছিলেন। চল্ল
 বোসের পোষাকে আশুন লেগেছে দেখে তাকাহাসি
 ও হবিবর রহমান দুজনে আশুন নেভাবার চেষ্টা
 করেন। তাকাহাসির আঘাত সীমাস্থ ছিল, তবু
 তিনি অচৈতন্য হয়ে যান ; চল্ল বোসকে নগ্নাবস্থায়
 তিনি দেখেননি। হাসপাতালে বোসকে দেখলেও
 তিনি মারা গিয়েছেন এটা তাঁর শোনা কথা।
 বোসকে মৃত অবস্থায় তিনি দেখেননি !

উক্ত হাসপাতালে চন্দ্র বোসকে চিকিৎসা করেছিলেন যে ছদ্মন ডাক্তার, ডাঃ জোসিমি ও ডাঃ জোসিও ইসি,—তারা বলেন, তাঁদের চোখের সামনেই চন্দ্র বোস মারা গিয়েছেন। তবে যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি সম্ভবত চন্দ্র বোস, কেননা এর আগে তাঁরা তাঁকে চোখে দেখেননি। পরিচয় সন্ধান করার যোগ্যতা তাঁদের ছিল না।

মিঃ খোসলা বলেছেন জাপানী এই কয়েকজন
সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। কারণ মিথ্যা
কথা বলার কোনো কারণ তাঁদের নেই। দ্বিতীয়ত,
জাপানীরা কঠোর পরিশ্রমী, মিথ্যাবাদী নয়। তারা
শ্রান্তরক নয়।.....

কথা বলেছেন সমর গুহ এম. পি. ডঃ সত্যনারায়ণ
সিংহ, এস, এম, গোস্বামী, উত্তম চাঁদ মালহোত্রা,
সজ্জন জাল, নামওয়ার উপাধ্যায়, রাজা রাম দীক্ষিত,
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, মুকুন্দ পারেখ, দেবেন সেন,

ব্রজেন্দ্র স্বরূপ, মহেশ চন্দ্র, গোরীচাঁদ সান্যাল,
মুগারক মজুমদার, উসমান প্যাটেল, নিঞ্জন সিং
তালিব, বি, ক্রুবর্তী, সুরেশচন্দ্র বসু, এম, এল,
সোফি, প্রভৃতি। এঁদের কেউ কেউ ভারতীয়
লোকসভার সদস্য, সংবাদপত্রের সম্পাদক, শ্রমিক
নেতা, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, গোয়েন্দা
অফিসার। এঁরা বলেন
নেতাজী তথাকথিত বিমান-চূর্বটনার পরও বেঁচে
ছিলেন বা আছেন। কারও কারও দাবী যে তাঁরা
তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন।

মিঃ খোসলা ২১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনেছেন, এই সাক্ষ্যের বিবরণ লিখতে লেগেছে ৪৬৭৪টি টাইপ-করা পৃষ্ঠা। এতগুলি পৃষ্ঠা বাঁধাতে হয়েছে ১৭টি ভলিউমে। এই সমুদ্র মন্থন করে তিনি দেখেছেন যে নেতাজীর অন্তিম বিমান যাত্রার চারজন সহযাত্রীর সাক্ষ্যই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। নেতাজীর আয়োজন অন্তরঙ্গ মুহম্মদ শ্রীমতীরঞ্জন বক্সসহ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—তার কোনো উল্লেখ মিঃ খোসলা করেননি। কিন্তু প্রচার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন শ্রীমুনীল দাস ও এইচ. ভি. কামাথের কথা। কিন্তু এঁদের মত ও বিশ্বাস যে কী তা মিঃ খোসলা বলেননি।

মিঃ খোসলা যথার্থ সাহিত্য স্রষ্টার মতো রস
সৃষ্টিতে যে উপাদানগুলি কাজে লাগবে সেগুলি
নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন, বাকি অংশগুলি
স্পর্শই করেননি। ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ, গোস্বামী
ও উত্তমচাঁদের সাক্ষ্য নিয়ে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করে

আমাদের প্রচুর তুলি দিয়েছেন। বেড়ে বেছে নিছক লুডিক্রাস অংশগুলি পরিবেশন করে তিনি গোটা সাক্ষ্যমালার প্রতি সুবিচার করেছেন কি না সাহিত্য রস সন্তোষের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন হয়তো বা অবাস্তব।

লেখকের দু' একটি মন্তব্য রুঢ়, যেমন জাপানীরা নাকি নেতাজীকে ক্রৌড়নক রূপে গণ্য করত (পৃ: ১৫৯)। জাপানীরা চায়নি যে আই, এন এ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করুক; তারা চেয়েছিল আই, এন, এ জাপানের তল্লাবাহক হয়ে থাকুক (পৃ: ১৬০—৬১) জাপানীরা নেতাজীকে কাজে লাগানোর যত্ন ছাড়া আর কোনো চোখে দেখেনি। জাপানের আত্ম সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা উবে গিয়েছিল (পৃ: ১৬২)। হবিবর রহমান নেতাজীর একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন বলে তিনি একটা বানিয়ে মিথ্যা গল্প বলেছেন এটা অধৌক্তিক ও অসম্ভব (পৃ: ১৬৪) যুদ্ধের শেষ দিকে জাপানীরা সুভাষ বসুকে অবজ্ঞা দেখিয়েছে (পৃ: ১৬৮)

ডঃ রাধাবিনোদ পাল যুদ্ধের পর জাপানে গিয়ে দেখেছেন নেতাজীকে জাপানীরা অশেষ শ্রদ্ধা করে। প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁকে দেবতার মতো সম্মান করতেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল নেতারাও নেতাজীকে অপারিসীম শ্রদ্ধা করতেন। জাপানী সেনাধ্যক্ষরা ঋণশ্রু ভাষায় নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাঁদের সে লেখাগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ খোসলা তাৎস্রয়ো হায়াসিদা লিখিত বইখানির কথা উল্লেখ করেছেন

সমর শুরুতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। তাৎস্রয়ো হায়াসিদার “নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু” নামক বইখানির পাতায় পাতায় নেতাজীকে মহামানব ও নরোত্তম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে ও জাপানী সামরিক অফিসারদের শ্রদ্ধাঞ্জলিও ঐ বইয়ে সংকলিত হয়েছে। জাপানীরা নেতাজীকে হতমান করতে চেয়েছিল বলে মিঃ খোসলার এই যে মন্তব্য—From the beginniug they had wanted him as their tool, a pawn in their hands who could be made to move in compliance with their schemes and wishes. (পৃ: ১৬৯)—একথা কি কোনো জাপানী স্বীকার করবে? মিঃ খোসলা মনে করেন জাপানীরা সদা সত্যবাদী; তবে আজ পর্যন্ত তারা ঠিক এর বিপরীত কথাই বলে আসছে।

কেউ কেউ বলেন যে যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটলে নেতাজী রাশিয়ায় যাবার সিদ্ধান্ত নেন ও তিনি মাঞ্চুরিয়ায় গিয়ে রাশিয়ার আশ্রয় নিতে সমর্থ হন। তাঁকে এইভাবে মাঞ্চুরিয়ায় যেতে জাপান সাহায্য করেছিল ও তাঁর এই যাত্রা ইঙ্গ-মাকিন গোষ্ঠীর কাছে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে জাপান সরকার ও তার অফিসাররা বিমান-ছব্বটিনায় নেতাজীর যত্নর কথা রটিয়েছিলেন। হবিবর রহমানও নেতাজীর নির্দেশে এই তথ্যকথিত যত্নর কথা প্রচার করেছেন। মিঃ খোসলা যুদ্ধের পর যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে এই মত সত্য নয়।

জাপানীরা যুদ্ধে পরাজিত হবার পর নেতাজীর কোনো মূল্য তাদের কাছে ছিল না। তারা তখন আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচে। নেতাজীকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষুদ্র যে বিমানখানি প্রধানমন্ত্রী তোজো দিয়েছিলেন তা তখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নেতাজী তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মাধুরিয়া যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জাপানীরা সাফ বলে দিল যে যে অতগুলি লোক পাঠাবার ব্যবস্থা তারা করতে পারবে না। একমাত্র চন্দ্র বোসকেই তারা নিয়ে যেতে পারে। নেতাজীর পীড়াপীড়িতে তারা হবিবর রহমানের ক্ষুদ্র আরও একটি আসন বিমানে দিতে রাজি হয়েছিল। এতে তো বোঝাই যাচ্ছে যে নেতাজীকে জাপানীরা সে সময় আর আদৌ কোনো খাতির করত না। আর তাঁর পালিয়ে যাবার সুবিধার্থে জাপানীরা মিথ্যা করে বিমান দুর্ঘটনার কথা রটাবে? মিঃ খোসলা বলেন : Such a hypothesis just does not make sense When questioned during the proceedings of this commission, they (the Japanese) repelled the suggestion that they had told lies to help Bose escape to safety. এমনকি হবিবর রহমানও মিথ্যা বলার পাত্র নন। যদিও মিঃ খোসলা হবিবর রহমানকে দেখেননি বা তাঁর সাক্ষ্য নেননি তবু তিনি এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে হবিবর রহমান নেতাজীর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য পোষণ করলেও মিথ্যা কথা বলতে পারেন না।

মিঃ খোসলা এই মর্মভেদী দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করেছে। মিথ্যা প্রচারকারী ও মতলববান্ধরা তাঁর এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার কাছে সঙ্কোচ বোধ করবেন। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

মিঃ খোসলা প্রশ্ন করেছেন, নেতাজী বেঁচে থাকলে এতদিন পালিয়ে থাকবেনই বা কেন? আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় তাঁর নাম নেই, কোনোদিনই ছিল না। ইঙ্গ-মার্কিং গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে নেতাজী মারা গিয়েছেন—কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নেবার কথা মিত্র শক্তি ভাবেনি। এছাড়া, ১৯৪৬ সালেই সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন দেশে ফিরে আসতে সুভাষাবুর কোনো বাধাই নেই।

বইখানির বিবয়বস্তু নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য। লেখক পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট রাতে নেতাজী মারা গিয়েছেন। কিন্তু এ বইয়ের নায়ক কে? পাঠকের যদি মনে হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাতা জুড়ে আছেন সমস্ত গুহ, এবং লেখক যেন তাঁর সঙ্গেই লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন, তাহলে কি ভুল হবে?

পরিশেষে আমি বিস্মিত হয়েছি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো এই তদন্ত কালে কোনোরকম গবেষণা পত্র দিয়ে সাহায্য করেননি দেখে। ব্যুরোর পরিচালকরা নেতাজী সম্পর্কে অবশ্যই অথরিটি। তাঁদের সহযোগিতার অভাব আমাকে ব্যথিত করেছে। তবে কিছুটা ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছেন শ্রী অমিয়নাথ

বহু। তিনি তদন্ত কমিশনের সঙ্গে বহুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। একটি বিষয়ে তিনি মুস্তফা আসানও বরে দিয়েছেন। নেতাজীর হাতে একটি গোল ঘড়ি থাকত। কিন্তু শরৎ বসুকে একটি চৌকোণা ঘড়ি দিয়ে বলেছিলেন, যত্নাকালে নেতাজীর হাতে এই ঘড়িটি ছিল। এতে অনেকে আপত্তি জানিয়ে বলতেন, চৌকোণা ঘড়ি নেতাজীর ব্যবহৃত ঘড়ি হতে পারে না। অমিয়নাথ বসু তাঁর সাক্ষ্য বলেছেন, শরৎ বসু হাতে পাওয়া মাত্র বলেছিলেন, ঐটিই স্মৃতিস্মারক ঘড়ি। শরৎ বাবু বহু যত্নে অম্মজের এই স্মারক চিহ্নটি রক্ষা করে গিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র বসুর উক্তির গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমি কিন্তু জনসভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে শুনেছি যে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি, বেঁচে আছেন, ভারতে ফিরবেন। তাঁর এই উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আত্মজেরা যখন মনে করেন যে তাঁদের পিতৃদেবের এই বিশ্বাস ভ্রান্ত ছিল, অত বড় ব্যারিষ্টার হওয়া সত্ত্বেও তিনি তথ্য ও যুক্তি ছাড়াই এসব কথা বলতেন;—তখন, আমরা বাইরের লোক, আমাদের চুপ করে যাওয়াই উচিত। ভ্রাতৃত্বস্নেহে অন্ধ শরৎচন্দ্র বুদ্ধ বয়সে ভুল করতেও পারেন বই কি।

॥ ২ ॥

আমি বিচারক নই; সাহিত্যের ছাত্র মাত্র।
যুক্তির ঠাসবুনান ও তথ্যের জড়ত্বের পারে আর

একটি জিনিস আছে, তা রস। রসতত্ত্বের দাবী এই যে সহৃদয়হৃদয়সংবাদীই তার সন্ধান পাবেন। মিঃ খোসলা সুলেখক, কবি ও চিন্তাশীল কিন্তু নেতাজীরহস্তের রসিক তিনি নন। তিনি একবারও ভেবে দেখেননি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র সাক্ষী ছাড়া আর সবাই কেন তাঁর কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন নেতাজী জীবিত বলে? এতে তাদের কী স্বার্থ সুসিদ্ধ হবে? সবাই তো নেতাজীর নামে চাঁদা তুলছেন না। সংবাদপত্রে নাম ছাপার ইচ্ছাও সবার নেই। চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম আনন্দবাজারে রোজ ছাপা হোত; এখনও কি তিনি স্বীয় নাম মুদ্রণে মোহমুগ্ধ? নেতাজী জীবিত এরকম বিশ্বাস পোষণে তাঁর কোনো স্বার্থ নেই তো।

উষাকালে সূর্যোদয়ের ইশারা পাই খোলা জানালার পথে। অমলিন হৃদয়খানি মেলে রাখলেই মেলে সত্যের ইশারা। মিঃ খোসলা যুক্তি ও তথ্যের অ্যানাইট দিয়ে একখানি নিশ্চিহ্ন ঘর নির্মাণ করেছেন। তাঁর নির্মিত কৌশলের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু আলোর কণিকাটুকু প্রবেশেরও কোনো ছিদ্র তিনি রাখেননি। মস্তিষ্কের ভায়ে আচ্ছাদিত তাঁর হৃদয়। যদি কখনো হৃদয়ের ধ্বনি ক্ষণতরেও শ্রুত হয় সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের অক্ষুশাসনে তিনি স্তব্ধ করে দেন সে ধ্বনি।

ফুল কেন মরে তা বিশ্লেষণ করা যায় বৈজ্ঞানিক প্রাথমিক ও যুক্তির সাহায্যে। ফুল কেন বাঁচে আর লাণ্যময় হয়ে ওঠে সে রহস্য জানে শুধু রসিক-হৃদয়। না শিশুকে চিরে ফেলে তার জীবনরহস্য

জানতে বসে না; মায়ের অমৃতকরা হৃদয়ই তার শিশুর সব গোপন বার্তা জানিয়ে দেয়।

ঈশ্বরকে জানা যায় না দার্শনিক যুক্তির সাহায্যে—‘ষড়্দর্শনে না পায় দর্শন।’ প্রেমে কিন্তু মেলে শুধু দর্শনই নয়, স্পর্শন ও আশ্বাদনও। বিচারক আইন মেপে সাজা দিয়ে চলেন জ্ঞানপন্থীর চিন্তে,—তাই দণ্ডিতের হৃদয়স্পন্দনের সংবাদ তিনি পাননা কোনদিনই। কত নিরপরাধী তাই পেয়েছে হত্যাকারীর প্রাপ্য দণ্ড, কত হত্যাকারী বেরিয়ে গিয়েছে আইনের ফাঁক পলে কে রেখেছে তার হিসাব? বিচারপতি, তাই একবার বিচার-অভিমানের মায়াদৃষ্টি রেখে, প্রেম-দৃষ্টিতে জগৎটাকে জাখো।

সত্যের ইশারা তো ছড়িয়ে ছিল দিগন্তের রক্ত-রশ্মি রেখায়। ইতিহাসের রথচক্রভঙ্গে যখন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের উদ্ভূত গল্পগুণি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন কালপুরুষের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে যাওয়া তো অসম্ভব নয়। নেতাজী হবির রহমানকে তাঁর শেষ নির্দেশে বলেছিলেন : ভারত অচিরেই স্বাধীন হবে। হয়নি কি? কিন্তু ইংরেজ যাবার বেলা স্বাধীন ভারতকে পঙ্গু ও অসাড় করে রাখার উদ্দেশ্যে দেশ ভাগ করে গিয়েছিলেন। দেশভাগের চক্রান্ত যে টিকছে না তা অয়ং লর্ড মাউন্টব্যাটেন এখন স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘পাকিস্তান ভেঙে পড়বে একথা আমরা আগেই জানতুম।’ পাকিস্তানে, যুক্তরাজ্যের কী হবে? উত্তর আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও ব্রুটেন এখন প্রত্যেকে পৃথক ও স্বাধীন

রাষ্ট্র হবার জন্য আন্দোলন করছে ও প্রধানমন্ত্রী হারল্ড উইলসন সম্প্রতি একটি বিল এনেছেন যা কার্যকর হলে যুক্তরাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পথে ঘটনাস্রোত এগিয়ে যাবে। যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতনা, বিশ্বের সেই বৃহত্তম সাম্রাজ্য চূর্ণ তো হয়েছেই, এখন খোদ যুক্তরাজ্যই চৌচির হতে বসেছে।

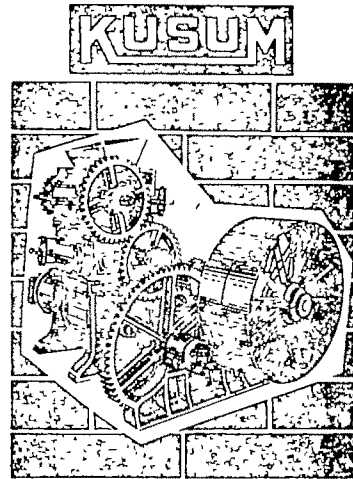
এরই সঙ্গে পাশাপাশি যদি দেখি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ও এশিয়া-আফ্রিকার জাগরণ ও বন্ধনমুক্তি তাহলে কি অস্বীকার করা চলে যে নেতাজীর আরক্ত সংগ্রাম দিকে দিকে জয়যুক্ত হচ্ছে? নেতাজী বেঁচে আছেন কি না, সে প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান কালে তিনি বলেছিলেন : “আমার সংগ্রাম সফল হবেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। ইতিহাসের গতি বহুশতময়—ভারতীয় সৈন্যদল বার্মায় আই. এন. এর সাফল্য পেয়েছে; এই সংস্পর্শের ফলে একদিন ভারতে বিস্ফোরণ ঘটবেই।”

ঘটেছিল, নৌবিজ্রোহ এসেছিল সেই বিস্ফোরণের আভাস মাত্র নিয়ে। আরও বৃহত্তর ঘটনা ঘটায় ভয়ে ভীত ইংরেজ ক্ষমতা তাড়াতাড়ি হস্তান্তর করে দিয়েছিল। নেতাজী জীবিত কি না এ প্রশ্নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আজ তাই, বিশ্বের নৈশবিক রূপান্তর ঘটছে কি না, এশিয়ার নব অত্মাখান ঘটছে কি না, ভারত ঐশ্বর্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে কিনা। নেতাজীর বিশ্ববীক্ষা বাস্তব ঘটনার বস্তিনাথেরে যাচাই করে

সত্য ও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কমিউনিজমের বিশ্বশিবির ভেদ করে আজ উঠেছে জাতীয়তাবাদের জয়গান; পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাম্রাজ্য শৃঙ্খলের বন্ধন কেটে বেরিয়ে এসেছে প্রাচ্যের মানুষ; লীগ অব নেশনস-এর স্বার্থহীনে আচরণের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসভ্য ও আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের রবার স্ট্যাম্প হয়ে থাকতে চাইছে না; জাতীয়তাবাদের দৃঢ় ভিত্তর ওপর দাঁড়িয়েও আজ বিশ্বমানব এক বিশ্ববোধে উজ্জীর্ণ হতে উৎসুক। পৃথিবীতে এই চেতনাও এখন সম্প্রসারিত হয়েছে যে বিশ্বের সকল নবজাতকের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষার সংস্থান করার দায়িত্ব এখন সকলকেই বহন করতে হবে। এই সকল বোধ ও প্রত্যয়গুলি কবে বাস্তবে কার্যকর হয়ে উঠবে সেটাই এখন আমাদের তীক্ষ্ণতম জিজ্ঞাসা। এই শেষ প্রশ্নের অশেষ উত্তর দেবার দায় বহন করবেন যিনি মর্ত্যলোকের কোনো গভীর গহনে আপন অবিচল তপশ্চর্যায় অমৃত সঞ্চয় করে চলেছেন তিনি, এই বিশ্বাস পোষণ করাই ইতিহাস ও যুক্তিসম্মত। সৃষ্টির বিকাশের একটা পারম্পর্য আছে, ইতিহাসের গতিরও আছে ক্রমপর্যায়। আকস্মিক ঘটনা বলে যা মনে হয় তারও অন্তরালে থাকে দীর্ঘকালের নীরব প্রস্তুতি। মিঃ খোসলা আইনজ্ঞ, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ নন। তাঁর যুক্তিবোধ বৃহত্তর বিশ্বের গতিধারার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করায়নি। যেখানে চিন্তা স্তব্ধ করে ভাবুক হওয়া

দরকার সেখানে তিনি মুখর ও চপল। তিনি শেষ দেখেছেন, পাননি অশেষের পরিচয়।

আলোচিত গ্রন্থ: Last Days of Netaji :
G. D. Khosla : Thomson Press
(India) Ltd, 1974.



**double roller
PUG MILL**

A HEAVY DUTY
MACHINE
FOR MANUFACTURING
BRICKS, ROOF TILES,
RIDGE TILES
ETC.

**KUSUM ENGINEERING
COMPANY LTD.**
25, SWALLOW LANE,
CALCUTTA-1, INDIA.

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

রোপ্য জরুরী উৎসব

চৌদ্দটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের অগ্রতম ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া পঁচিশ বছরের জনসেবার ইতিহাস সম্পূর্ণ করেছে ১৯৭৫-এর ১৮ই ডিসেম্বর। ১৯৫০-এর ১৮ই ডিসেম্বর বাংলা দেশের চারটি সুপরিচিত ব্যাঙ্কের একত্রীকরণের ফলেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার যাত্রা শুরু। এই চারটি ব্যাঙ্কের নাম কুমিল্লা ব্যাঙ্ক করপোরেশন, নিঃ বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ এবং হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ। ইতি পূর্বে ১৯৪৬ নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ নামে অপর একটি ব্যাঙ্ক কুমিল্লা ব্যাঙ্ক করপোরেশনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়। স্মরণ থাকতে পারে শ্রী এন সি দত্ত ১৯১৪ সালে কুমিল্লা শহরে কুমিল্লা ব্যাঙ্ক করপোরেশন লিঃ, ১৯১৮ সালে শ্রী জে সি, দাস কলকাতায় বেঙ্গল লোন কোম্পানী—পরবর্তীকালে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, ১৯২২ শ্রী আই, বি, দত্ত কুমিল্লায় কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ এবং ১৯৩২ শ্রী ডি, এন, মুখার্জী কলকাতায় হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী এন, সি, দত্তের পুত্র এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রথম জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বি কে দত্ত ১৯৩০ কুমিল্লায় নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ স্থাপন করেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েক বছর আর্থিক পরিস্থিতি যেমন দেশের ব্যাঙ্কশিল্পের পক্ষে ভয়ঙ্কর ছিল, তেমনি দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা পর আর একবার ব্যাঙ্ক শিল্প গুরুতর সঙ্কটে দেয়। এই সঙ্কটে ১৯৪৮ এর মধ্যে অনেক বন্দরজা বন্ধ করে দেয়। ১৯৫০-এর মে মাসে নাথ বন্দরজা বন্ধ করার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উত্তোকে এই চারটি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতায় ১৯৫০-এর ১৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ-এর চারটি ব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে বহু আমানতকারী মনে ব্যাঙ্ক শিল্পের সঙ্কট সম্বন্ধে পুঞ্জীভূত হতাশা করে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক গোড়া থেকেই স্বল্পসঙ্গ সম্পদদের ব্যাঙ্করূপেই কাজ করে এসেছে। প্রতি পরিবেশে প্রায় সাত বছর একত্রিত বকরটির সংহতি সাধনে কেটে গেছে। একাকরণের সময় চারটি ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ১৪৪। কিন্তু ১৯৫৬-এর শেষে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সংহতি সম্পূর্ণ হবার পর তা কমে দাঁড়ায় ৯৫-১৯৫০-৫৭তে এই ব্যাঙ্ক আমানত ২৬.৯ কোটি টাকা থেকে ৩৮.৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায় (অর্থাৎ ৪২.৭% বৃদ্ধি), দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় শতকরা

ভাগ—১৩৯ কোটি টাকা থেকে ২৩৬ কোটি টাকায়। ১৯৬০-এর পর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের দ্রুত প্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ এ আমানত বেড়েছিলো ৩৮.৪ কোটি টাকা থেকে ৫১.৭ কোটি টাকা। ১৯৬৫র মধ্যে এই আমানত ১০০ কোটি টাকার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ১৯৬৯-এর শেষে আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৮.৩ কোটি টাকা। দাদন-এর পরিমাণ ও ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫র মধ্যে বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়; আর ১৯৬৯র শেষে এর পরিমাণ হ'ল ১১৮.০১ কোটি টাকা।

১৯৬৯-এর ১৯শে জুলাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দেশের আর্থিক জীবনে একটি দিক-চিহ্ন বিশেষ। এই ঘটনা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের সম্মুখের জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারগুলির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক হবার নূতন দিগন্ত খুলে দিলো। কৃষির দ্রুত সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, নূতন উৎপাদনোদ্যোগীদের বর্ধিত উৎসাহ দান, অনগ্রসর অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়ন—এই কর্মসূচীগুলিতে স্বর্ণি রূপায়ণের দায়িত্ব এসে গেলো ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ওপর।

জাতীয়করণের পর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের দ্রুত-বিস্তার এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিবিহীন লোকদের অর্থনৈতিক জীবনের গোড়া পত্তনে তার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয়, জাতীয়করণের সময়কার ১৭৪টি শাখা বর্তমানে ৪৮৩তে পৌঁছেছে, যার মধ্যে পূর্বভারতের ৮টি রাজ্যে শাখার সংখ্যা

শতকরা ৮৭ ভাগ এই ৪৮৩টি শাখার শতকরা ৬১টি গ্রামীণ এবং আধা শহর অঞ্চলে স্বল্পসঙ্গতি-সম্পন্নদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ব্যাঙ্কের একলক্ষ তিরানব্বই হাজার ঋণ-প্রাপকদের মধ্যে একলক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ঋণ-প্রাপক অর্থাৎ শতকরা ৯১% ভাগ এযাবৎ যারা অবহেলিত ছিলেন তারাও কৃষিক্ষেত্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ঋণ-প্রাপকদের শতকরা ৮৫ ভাগের জমির জোতের পরিমাণ ৫ একর অথবা তার কম। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে গত ৬ বছরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক গড়ে প্রতিদিন ৬টি শিল্পকে সাহায্য করে এসেছে। আর যদি কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, খুচরা ব্যবসা, পরিবহন এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রের হিসাব ধরা যায়, তবে দেখা যাবে, ১৯৬৯ জুলাই মাসে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক তাদের সংখ্যা যেখানে ছিল ২৩০৫ সেখানে ১৯৭৫-এর জুনে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১, ৭৬, ৩৪৩টি। এই সব ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে দাদনের পরিমার্ণ ১০.০৬ কোটি টাকা থেকে ২৩.৫৮ কোটি টাকায় বেড়েছে। অগ্রাধিকার-প্রাপ্তদের ক্ষেত্রের দাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মোট দাদন বৃদ্ধির শতকরা ৩৬.২ ভাগ; আর মোট দাদনের শতকরা ৯.৩ ভাগ থেকে শতকরা ২৭.৭ ভাগে অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত দাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭৫-এর ২রা অক্টোবর গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য যে পাঁচটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে, তার মধ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে পৌর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে মালদা, মুন্সিরাবাদ এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় এই ব্যাঙ্কের শাখাও খোলা হয়েছে। ১৯৭৬র ৩১শে মার্চের মধ্যে আর ১০টি শাখা খোলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী এম এল সেনগুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজার পি, কে, সেন এবং অস্থায়ী পরিচালক বৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দ এই ভারতীয় ব্যাঙ্কটির দ্রুত সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তাদের রোপ্য জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অভিনন্দনযোগ্য।

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১২'০০। বাৎসরিক ৬'০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের অযোগ্য সর্বাপেক্ষে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলফ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
- কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।
৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-বোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স গোলান মহাস্থান রোড

কলিকাতা-২৬

পুস্তক পরিচয়

‘সুভাষচন্দ্র’ তৃতীয় খণ্ড পাড় শেষ করেছি—
প্রায় একটানা এক ঝোঁকে। গ্রন্থকার শ্রীপতি
কুমার ঘোষ নিছক “জীবনী” লিখতে বসেন নি,
সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাঠ্যে করে
ইতিহাসের পথপরিক্রমা করতে বেরিয়ে ছিলেন।
এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও
তেমনি উল্লেখনীয়।

ইতিহাস কেবল অতীতের নির্ভুল তথ্যপঞ্জী নয়,
অনাগতজীবনের সখাযথ দিশারির ভূমিকাতেই
তার সার্থকতা। নিজেদের মধ্যে ইতিহাস পুনরাবর্তিত
হয়ত হয় না, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রের নির্দিষ্ট আধারে
তার আত্মবিস্তারের এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিও রয়েছে।
অতীত তথ্যের আলোকে সেই অনাগতের তাঁর
সন্ধানও বুঝা অন্ধকারের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

তাই কেবল সুভাষচন্দ্রের জীবন-কথা কিংবা
জীবন-গ্রন্থ নিয়েই নিজেদের তিনি ব্যাপ্ত রাখেন
নি; ইতিহাসের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর অমুপেক্ষ
বিবরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই মহাজীবনের স্থায়ী
মূল্যাবধারণ করতে চেয়েছেন। এই সূত্রে প্রথম
দুই খণ্ডে মহাকাব্য ধর্মী বিস্তার ও প্রাচুর্যের মধ্যদিয়ে
সুভাষ-জীবন গ্রন্থের রথ মসুর গতিতে এগিয়ে
চলেছে। তৃতীয় খণ্ডে এসে লেখকের আদর্শ
পার্টায়নি, কিন্তু প্রযুক্তির প্রকরণ বদলেছে।

এখানেও ইতিহাস-তথ্যের আত্মপূর্বিক প্রেক্ষাপটে
অনাগত দৃষ্টিতে সুভাষ-জীবন প্রত্যক্ষ করা স্বাভাবিক
অপেক্ষাপাত প্রচেষ্টাটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থ
বর্ণনায় ব্যাপ্তি হ্রস্বতর হয়েছে। পূর্ব পূর্ব খণ্ডে
সুভাষ জীবন কথা চলেছে সমসাময়িক তথ্যপ্রবাহের
অমুখ্য হয়ে; এবারে সুভাষ-জীবন-গ্রন্থের
কেন্দ্রাভিমুখে তথ্যসামগ্রীকে সংহত করা হয়েছে।
আগের উপস্থাপনা কেন্দ্রাতিগ হলে, এবারে তা
কেন্দ্রভিগ। লেখক তাঁর পূর্ব প্রকরণ পরিবর্তনের
কারণ বিবৃত করেছেন ‘নিবেদন’ অংশে; গ্রন্থমধ্যে
তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

বক্তব্য সংহত এবং অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রিগত হতে
পেরেছে বলেই তথ্যভ্রমের ভায়মুক্ত এক স্বচ্ছ
ক্রান্তগতি তার আয়ত্ত হয়েছে; তাছাড়া এবারকার
পরিণততর বিবৃতি ভঙ্গীতে যুক্ত হয়েছে অনেকটা
যেন কথন-শৈলীর গুণ; আর সেই সঙ্গে উপস্থাপিত
ঘটনাবলীর তীব্র সমুচ্ছল প্রাণহমানতা রচনার মধ্যে
কাহিনী-রসের লোভনীয় স্বাদ মুক্ত করে দিয়েছে।
ফলে এক ঝোঁকে একটানা পাড় শেষ না করে
মনের কাছেই যুক্তি মেলে না যেন।

তাহলেও ইতিহাস আসলে তথ্যজীর্ষ। তথ্য
সংগ্রহে ও বিস্তারিত গ্রন্থের পূর্বাপর দেশকাল ভিত্তিক
ব্যাপক পটভূমিকে লেখক অক্ষুণ্ণ রাখতেই চেষ্টা

করেছেন। এই নূতন খণ্ডের মুখ্য আলোচ্য বিষয় সুভাষ-জীবনে দেশবন্ধু-নেতৃত্বের যুগ এবং দেশবন্ধুর তিরোভাব-উত্তর কালে সুভাষ নেতৃত্বের উদীয়মানতার প্রসঙ্গ। ব্যাপক অংশ জুড়ে দেশবন্ধু ঐতিহাসিক ভূমিকার ঝটিকাগতি চরিত্রটিকে উজ্জ্বল রেখায় ভাস্বর করে তুলেছেন পবিত্রকুমার। প্রধানত সমসাময়িক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যরাঞ্জিত সঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থাদির সার সংকলন করে সেকালের ইতিহাসকে একালের চোখে যেন জ্বলজ্বাল করে তোলা হয়েছে। কংগ্রেসের কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসেই এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যপঞ্জী এমন জীবন-আবেদন মণ্ডিতরূপে সুলভ নয়। অথচ এই জীবন্ত বিবৃতির কেন্দ্র-বিন্দুতে সুভাষ-ব্যক্তিত্বের কোরক-রূপটি সযত্নে সংবদ্ধিত হয়েছে। পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে।

চতুর্থ খণ্ডের জ্ঞাত উৎকৃষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে গ্রন্থকার পবিত্র ঘোষকে অভিনন্দিত করি—জাতির জ্বলন্ত ইতিহাসকে বলিষ্ঠ, হৃদয়গ্রাহী, সর্বজনীন আবেদন সহযোগে এই দুর্যোগাঙ্ককার যুগে তিনি আত্মবিস্মৃত বাঙালি পাঠকের অন্তরের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টা কেবল ইতিহাস-লেখকের নয়, এক বিশেষার্থে ইতিহাস-নির্মাতারও।*

জুদেব চৌধুরী

৫.১২.৭৪

* সুভাষচন্দ্র : তৃতীয় খণ্ড, পবিত্রকুমার ঘোষ। জয়ন্তী প্রকাশন ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা—২৬, দাম ১৩.৫০

Oaten Incident 1916 : A Chapter in the life of Netaji Subhas Bose : Bholanath Roy, Secretary Students' Consultative Committee, Presidency 1915-16 : S. C. Sarkar & Sons (Private) Ltd : 1-G College Square, Calcutta—12 : Rs 3

আলোচ্য পুস্তকটি আয়তনে স্বল্পপরিমিত হলেও এর বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। আর তাঁর চাইতেও বড়ো কথা পৃথিবীর অমূল্যমূল্য বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের এক অমোঘ দিক-নির্দেশিকারূপে পুস্তকের আলোচ্য ঘটনাটি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

১৯১৬ র ১৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা আড়াইটা নাগাদ প্রেসিডেন্সী কলেজের এক তলার সিঁড়ির কাছে তৎকালীন ইতিহাসের অধ্যাপক ই, এফ, ওটেনকে ছাত্ররা প্রহার করে। ওটেন-প্রহারে ছাত্রদের মধ্যে যাদের মুখ্যভূমিকার প্রবল জনশ্রুতি ছিল তারা হলেন কলাবিভাগের ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর অনঙ্গমোহন দাম বিপিন দে এবং কলাবিভাগের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সুভাষচন্দ্র বসু। অধ্যক্ষ এইচ, আর, জেমস বিভাগীয় তদন্তে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কলেজের বেয়ারা বাংশীগালের গোপন সনাক্তকরণের ভিত্তিতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী গভর্ণিং বোর্ড সভায় অনঙ্গমোহন দাম এবং সুভাষচন্দ্র

বস্তুকে ওটেন-প্রহারে মুখ্যভূমিকা গ্রহণের দায়ে কলঙ্ক থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন।

ওটেন-প্রহার যে কোনো আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সে-কথা সুবিদিত। ওটেনের বর্ণবিদ্বেষ, ভারতবিদ্বেষ, ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যের অভিব্যক্তি এবং তাদের দৈনিক লাঞ্ছনার ঘটনা ইতিপূর্বেই ওটেন-প্রহারের পটভূমি তৈরী করে রেখেছিল। আর ১৬ই ফেব্রুয়ারী আর একটি ছাত্রের প্রতি দুর্ব্যবহার, লাঞ্ছনা ও ঔদ্ধত্যের পরিণামে ওটেন-প্রহার অনিবার্য হয়ে উঠছিল।

বস্তুতপক্ষে, এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ব্রিটিশ ঔদ্ধত্য ভারতীয়দের ওপর অবজ্ঞা ও অসম্মানের বোঝা চাপিয়ে তাদের দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিকের অমর্যাদায় লাঞ্ছিত করে এসেছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর কলঙ্ক আরোপ করে তাকে লঘু ও খর্ব করবার জ্ঞাত উত্তোাগী হয়েছে। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল বঙ্গভঙ্গকারী লর্ড কার্জন ছিল ওদের পথ প্রদর্শক। লেখক যথার্থই বলেছেন: 'It was an era of partial apartheid'—কৃষ্ণ আফ্রিকার মত না হলেও সেদিন আমাদের দেশেও বর্ণবিভিদের প্রাণ্য সাদা-কালোর মাঝখানে আঁচরি তুলে দিয়েছিলো। এরই ফলে ট্রেনে, ট্রামে, ডাক বাংলায় সাদা চামড়ার একাধিপত্যের প্রতিবাদে ভারতীয়দেরও বাধ্য হয়ে মারমুখ হবার পাঠ নিতে হোলো। এই পাঠ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম অশনি-সঙ্কেতরূপে দেখা দিয়েছিলো।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ওটেন-প্রহারের ঘটনা তারই একটি স্মৃতিস্তম্ভ। লেখক নিপুণ তথ্যসমাবেশ ও বিশ্লেষণে এই পটভূমিকে যেমন দীর্ঘদিনের ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেমনি তথ্য-যুক্তি দিয়ে ওটেন-প্রহারে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সপ্রমাণ করেছেন। ওটেনকে ছাত্ররা পেছন থেকে আক্রমণ করে মিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছে, এই অভিযোগের খণ্ডন করে সুভাষচন্দ্র ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যরূপে বলেছেন: "Mr Oaten did receive the solitary stroke from behind. Those who felled him were all in front of him and on the same level with him. Being an eyewitness myself, I can assert this without fear of contradiction." আর আশুতোষ মুখার্জির নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের নিয়মানুযায়িতা, জাহ্নুয়ারীর ছাত্র ধর্মঘট এবং ওটেন-প্রহার তদন্তের জ্ঞাত বাংলা সরকার যে কমিটি গঠন করেছিলো, সেই কমিটি সুভাষচন্দ্রকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওটেন-প্রহার সমর্থনযোগ্য কি না। উত্তরে তাঁর বলতে দ্বিধা হয় নাই, প্রহার যুক্তিযুক্ত না হলেও দারুণ প্ররোচনার মুখে ছাত্রদের এ কাজ করতে হয়েছে। অবশ্যি নিজে ওটেনের ওপর হাত তুলেছিলেন কিনা সে-প্রশ্ন তদন্ত কমিটি তাকে না জিজ্ঞাসা করলেও কমিটির সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তরে দ্বিধাহীন চিন্তে সুভাষচন্দ্র ওটেন-প্রহারের অনিবার্যতা বিবৃত করে গেছেন। শিক্ষক-পেটানো কিংবা কাউকে আঘাত করা সুভাষচন্দ্রের বাঙে

নেই, এই যুক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ওটেন-প্রহার থেকে দূরে সরিয়ে রেখে কেউ কেউ তাকে অত্যন্ত ভাব্যমব্য রাখবার চেষ্টা করেছেন। তাদের মাথায় এ-কথাটা এলোনা, যে ঘটনায় ভাষাতার কোনো প্রশ্নই জড়িত ছিলো না, এই ঘটনার একমাত্র দাবী ছিল জাতীয় সম্মানকে উর্ধ্বে তুলে ধরবার জন্য ইংরেজের অহুহীন ঔদ্ধত্যকে সাজা দেওয়া হবে না, কাপুরুষের মত সেই ঔদ্ধত্যকে মেনে নিয়ে ছাত্ররা তথাকথিত 'ভাষাতা' বজায় রাখবে? লেখক দিলীপ রায়ের কাছে সুভাষের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন '...I plunged into action, come what may'—তারপরও শ্রীদিলীপ রায়ের 'ভাষাতা' বোধ বলছে 'নেতাজী ওটেনকে নিজে আঘাত করেন নাই।' এই ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে বলছেন...তাঁর অধ্যাক তাকে বঞ্চিত করে দিয়ে ভবিষ্যতের যাত্রাপথ সুনির্দিষ্ট করে দিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি ঐতিহ্য তৈরী করে গেলেন, যা থেকে ভবিষ্যতে আর পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। একটি সফটমুহুর্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কর্তব্য সাধন করেছেন। আত্মপ্রত্যয় ও অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণের অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। নেতৃত্বের স্বাদ ও... শহীদের হোঁচকা পেলে। এক কথায়, চারিত্র্য-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে স্থিরভাবে ভবিষ্যতের সঙ্গে পাঞ্জা কষবার অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। ওটেন-

ঘটনা ভবিষ্যতের সুভাষচন্দ্রকে তাঁর স্বীয় কক্ষ পথ হাত ধরে দেখিয়ে দিল, যার পরিণতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই কারণেই ষাট বছর পরও ওটেন-প্রহার জাতীয় জীবনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে এবং ওটেনও বৃদ্ধ বয়সে এই ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে ৩২ বছরের হুজুত অধ্যাপক ৮৪ বছর বয়সে সুভাষ-প্রশস্তির বাস্তবরূপ দিয়েছেন একটি সনেট রচনা করে :

"Did I once suffer Subhas
at your hands?"

'সুভাষ! তোমার হাতে কি আমি একবার লাঞ্চিত হয়েছিলাম।' লেখকের অকৃত্রিম সুভাষ-অনুরাগ ওটেন-প্রহারের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশণে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে—এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদই হয়ে থাকবেন। তবে একটি সামান্য ক্রটির দিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না। ভূমিকায় ১৯১৬-এর ১০ই জানুয়ারীর ঘটনা উল্লেখ করে লেখক যা বিবৃত করেছেন, তাতে মনে হয় ঐদিনই ছাত্রধর্মঘট হয়ে যায়। তাই 'went on strike'-এর পর 'the next day' সংযোজন করলে ঘটনার পরম্পরা সম্পর্ক ভুল বুঝবার কারণ থাকবে না, যদিও ২৬ পৃষ্ঠায় Sec 2 তে তিনি লিখেছেন 'The next day the strike' began

পুস্তকটির বহু প্রচার কামনা করি।

সমদর্শী

“Struggle still say I” !

It was an invocation to the youth of the country. It was an invocation for ceaseless struggle and endless sacrifice. What was at stake was the Nation. The Nation has sunk in an abysmal torpor from which it has to be rescued. Dedicated and selfless service of the youth of the country for the resurgence of the nation was the need of the hour. The strident voice of Swami Vivekananda on his return from the spiritual conquest of the West, demanded of the youth of the country that they should brace themselves for service to their poor and downtrodden countrymen and launch mighty struggle to reach out social justice to them. In the words of Swamiji :

“Feel my children, feel for the poor, the ignorant the downtrodden, feel till the heart stops and the brain reels and you think you will go mad—then pour the soul out at the Lord and then will come power, help and indomitable energy. Struggle, struggle was my motto for the last ten years. Struggle still say I.”

It was no froth and fury to be consigned to oblivion, once the romantic mystique wore out. It was of a sterner stuff. It was a soul-stirring invocation, overpowering and vibrant. Subhas Chandra Bose, who in his early teens, was trying to reach out to the depth of his soul, while remorselessly pushed forward in an uncharted course of experience, seething with pain and anguish, chanced upon the invocations of Swami Vivekananda. It was a soothing balm to his restless soul. Nay, it was something more. It was to him a beacon light to endure

throughout life which gave unto his life a meaning and purpose.

“Struggle Say I”, in the contemporary context is as much an invocation to the youth of today, as it was an invocation during the days of Subhas's youth. ‘Struggle’, is the keynote of Subhas's life. This solitary word ‘Struggle’ epitomises the multi-dimensional facets of the life of the foremost Revolutionary who strode on the world stage and vanished under mysterious circumstances.

Even as a child, Subhas was imperceptibly seeking to weave a distinct web of life. ‘Struggle’ was immanent in this web of life. Shades of this ‘struggle’ could be seen in his early school life in Protestant European School at Cuttack when boy Subhas realised that Indians in the school “were a class apart” or when the consciousness grew in him that he was living in a dual world—the one was the world of his own Society and Country and the other was the world of School hours, “which was not England, but an approach near to it,”

As the scheme of his way of life became more and more pronounced the accumulated spirit of protest of Subhas on several counts crystallised into the spirit of revolt. In a different context Swami Vivekananda exhorted people to stand up to the persecutors with the words “yours is always the right to rebel.” And here was Subhas ready to act upon his exhortations even from his boyhood. His revolt against the constraints of the family, standing in his way of service to the poor or his

pursuit of Yoga and Sadhana are all links in the chain culminated in the revolt against foreign rule and finally in his building up a revolutionary army of liberation under the Provisional Govt of Free India.

But all this was in fulfilment of a "mission" in his life which he could sort out when he was only eighteen years in age. He was to build himself up brick by brick in pursuit of this "mission", an ideal to live for and die for. India's Freedom was not an end in itself. Freedom was to be followed by reconstruction of the country on Socialist lines, which postulated a framework of Socialism, not borrowed from abroad, but derived from the historical conditions of India. The Yogi and Sadhaka in Subhas, have combined with the Revolutionary and votary of equality and Social Justice in him, to give a new dimension in the quality of Indian life. The material achievements of science have blended with the higher quest of man after Truth. This spiritual quest of man in the midst of plenty, which bounties of Science would more and more generate, would make for humility, dedication and a sense of surrender for a cause. "Man making is my mission"—exhorted Swami Vivekananda—His spiritual heir Subhas Chandra truly experimented with this "man-making"—in

his ceaseless struggle and revolt. His unfinished Revolution gave promise of a new India which would have been rooted in the highest synthesis of the achievements of science and achievements of spiritual quests of man.

Subhas Chandra Bose dominates the contemporary horizon—although he is not to be seen on the horizon for three score years—as no other Indian does, as the brightest synthesis of Spirituality and Materiality. It is useless to make invidious comparisons with other contemporary Indians who also illumine the horizon in their own distinctive way but do not answer to the synthesis which Subhas Chandra has pursued all along his life and has attained eminent success. It is towards this unique synthesis which is the much sought after "man-making" by Swami Vivekananda that Subhas Bose beckons the youth of the day. Pelf and Power do not make a 'man'. Pelf, Power allurements and inducements galore are there, but speaking of 'man' there are none or few. It is time that the youth of the country acted up to the exhortations of Rebel Subhas who's life's mission rings out across the horizon resonating the voice of Swami Vivekananda: "Struggle say I", "man-making" is your mission.

Netaji : Philosopher, Soldier and Statesman

H. V. Kamath

If Mahatma Gandhi's clarion call to the British Government to "Quit India" had not been sharpened by Netaji Subhas Chandra Bose's war-cry of "Chalo Delhi"—which reverberated from Singapore to Manipur—if Mahatma's satyagrahis had not been powerfully reinforced by the armed soldiers of Netaji's Azad Hind Fauj, I firmly believe that there would have been no Indian Independence on August 15, 1947; and no Indian Republic on January 26, 1950.

As a matter of fact, Gandhiji's timing and tactics of non-violent battle against the British power in India during world war II were not a little influenced and conditioned by Netaji's speeches and actions, reflecting his own policy and programme, before the latter left India, as well as after his dramatic dash across two continents in pursuit of his high mission. "Go and ask Subhas", said the Mahatma to Louis Fisher, the American publicist, when the latter asked in July, 1942, why he was so impatient to launch a struggle against the British.

What significant role did Netaji play in the fight for India's freedom? His was a chequered, meteoric and colourful career which lit up the Indian political stage. His star at times faded, but soon shone again with unusual luminosity in the Indian, and finally in the Asian, firmament. He infused a revolutionary elan into the non-violent mass movement launched by Gandhiji, quickening the pace and raising the tempo of the struggle, and in the end hastened the day of India's deliverance.

His flaming idealism was well brought out in the letter he addressed to the Governor of Bengal and his Council of Ministers from the Presidency Jail, Calcutta, on November 26, 1940, conveying his decision to fast unto death if he was not released from detention. It is a long letter, but I shall reproduce only a few striking sentences here :

"In this mortal world, everything perishes and will perish, but ideas, ideals and dreams do not.....No idea has ever fulfilled itself in this world except through an ordeal of suffering and sacrifice. What greater solace can there be than the feeling that one has lived and died for a principle?...What higher consummation can life attain than peaceful self-immolation at the altar of one's cause? To my countrymen I say: Forget not that the greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law: you must give life, if you want to get it. And remember that highest virtue is to battle against iniquity, no matter what the cost may be...To the Government of the day I say: Cry halt to your mad drive along the path of communalism and injustice. There is yet time to retrace your steps, Do not use a boomerang which will soon recoil on you....."

It was the strange turn of events at the Tripuri Congress Session, in March 1939, that prepared him for his destined role in world

history. He had been elected President in the first-ever election, I believe, in the Congress Party's history since the advent of Mahatma Gandhi. He had defeated Dr. Pattabi Sitaramayya, who had been backed by the Congress High Command, including Gandhiji. When after the election the Mahatma wrote that "Subhas's victory is my defeat", Netaji was deeply hurt, but did not retaliate in any manner whatever; and in his heart there was no rancour.

At Tripuri, where he conducted the proceedings of the Congress session from his sick-bed, he proved a political prophet. He declared in his Presidential address that war would break out in Europe within six months, and that India should, therefore, deliver an ultimatum to the British Government and prepare for the final battle. His colleagues, however, paid no heed; on the contrary, by deftly manoeuvring the passage of the Pant resolution which was intended to hamstring the elected President, Netaji was practically forced out of the Congress gadi. Eighteen years earlier, he had resigned from the Indian Civil Service in order to join India's freedom struggle; now he resigned the Congress Presidentship in order to strike the last, the decisive, blow for India's freedom.

In May 1939, he launched the Forward Bloc, which became the spearhead of the anti-Imperialist and the anti-war struggle. September saw the outbreak of war in Europe, exactly as he had predicted at Tripuri. He was arrested—the last of a series since 1923—in July 1940, under the Defence of India Rules, but was released in December, shortly after he began his fast unto death as a protest against his continued detention. He was virtually interned in his house, and the Government kept a round-the-clock vigil; nevertheless, he

escaped in January 1941, and made his way, after what must have been a hazardous journey, to Berlin, via Peshawar, Kabul and Moscow.

In Berlin, Netaji met Hitler and discussed the problem with him. It would appear that Hitler showed himself more receptive to Netaji's ideas than Mussolini's. I learnt in Munich in October 1960 from Dr. Paul Schmidt, who had been the Fuehrer's personal interpreter. In January 1942, Netaji raised the first battalion of the Free India Legion in Germany, drawn mostly from Indian prisoners of war. He also began his regular broadcasts from Radio Berlin, which aroused tremendous enthusiasms in India. Speaking with passionate sincerity on April 20, 1942, he said :

"I am not an apologist of the Tripartite powers; that is not my job. My concern is with India—... Britain's paid propagandists have been calling me an enemy agent. I need no credentials when I speak to my own people. My whole life has been one long, persistent, uncompromising struggle against British Imperialism, and is the best guarantee of my bona fides. All my life I have been a servant of India. Until the last hour of my life, I shall remain one. My allegiance, and loyalty have ever been, and will ever be, to India alone, no matter in which part of the world I may India live."

In 1942, when British, French and Dutch imperialisms in East Asia crumbled before the Japanese blitzkrieg, Netaji realised that his hour of destiny had struck. With the utmost cooperation from the German and Japanese Governments, he left Germany early in 1943, and, after a perilous three-month voyage in a submarine from Hamburg to Penang, reached Tokyo, and subsequently arrived in Singapore on July 2, 1943.

The dramatic appearance of the strong, dynamic leader was a signal for wild jubilation among the Indian prisoners of war no less than among the civilian community in Singapore and elsewhere in East Asia. Two days later, on July 4, he took over from Rash Behari Bose the leadership of the Indian Independent Movement in East Asia, organised the Azad Hind Fauj—becoming its Supreme Commander on August 25—proclaimed the Provisional Government of Azad Hind on October 21, and formed the Rani of Jhansi Regiment on October 22. The Andaman and Nicobar Islands were liberated in November and renamed Shaheed and Swaraj Islands; respectively. The INA headquarters was shifted to Rangoon in January 1944, and, marching thence towards their motherland, the Azad Hind Fauj crossed the Burma border and stood on Indian soil on March 18, 1944.

Their joy knew no bounds and in a moving gesture of dedicated love, they fell on their knees and kissed the dust of Bharat Mata. How the brave army subsequently advanced up to the gates of Kohima and Imphal, how free India's banner was hoisted there to deafening cries of "Jai Hind" ! and "Netaji Zindabad !" how the atom bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki compelled Japan to surrender, and the INA consequently to retreat, is well known, and I do not wish to dilate upon these events here.

Netaji was reportedly killed in an air crash over Formosa on August 18, 1945 : this most intrepid warrior and astute statesman was then only 48 years young.

The trial by court martial, in early 1946, of three INA officers in the Red Fort, Delhi was the British Government's crowning act of stupidity. It sparked off the Naval Mutiny

and convulsed the ranks of the Indian Army, thus driving the last nail into the coffin of British rule in India.

During the terrible famine in Bengal in 1943, Netaji made an offer to send 100,000 tonnes of rice obtained from the Burmese and Siamese governments, to Calcutta, and asked the British to give a guarantee of safe conduct and return to the ships that would bring the rice to India. The British Government, heartless and callous it was, made no reply to the offer, lest Netaji should appear as the saviour of the starving millions of India.

He also successfully dissuaded the Japanese from bombing Calcutta. He told them: "Encouragement and hope is what I wish to give to my people, not devastation and suffering. After Imphal is captured, we will send over Calcutta large formations of bombers, which will drop not bombs but thousands of tricolours to the people of Bengal. That would destroy British imperialism more effectively than bombs".

On every occasion, he asserted his independence as well as that of the INA : and such was the force of his personality that the Japanese leaders gave in each time.

Despite the fact that Gandhi was instrumental in expelling him from the Congress, Subhas bore no grudge or ill will on this account. He was free from malice, and he was the first to acknowledge and address the Mahatma, over Rangoon Radio, on July 6, 1944, as "Father of the Nation", and ask for his "blessings in this holy war for India's liberation".

On the solemn occasion of the Proclamation of the Provisional Government of Azad Hind

on October 21, 1943, Netaji took the following oath :

"In the name of God, I take this sacred oath that, to liberate India and the thirty-eight crores of my countrymen, I, Subhas Chandra Bose, will continue the sacred war of freedom till the last breath of my life. I shall remain always a servant of India, and to look after the welfare of thirtyeight

crores of Indian brothers and sisters shall be for me my highest duty.

"Even after winning freedom, I will always be prepared to shed the last drop of my blood for the preservation of India's freedom".

No wonder that, as Dr. Pattabhi Sitaramayya said, "Subhas may be alive or dead in body, but his spirit and his name will endure long, yea, for ever in history".

with
compliments
from



Indian Oxygen Limited

Subhas Bose's English composition and humour

Kali Charan Ghosh

Subhas stood first in the I. C.S. Examination in English composition amongst a lot of Britishers, but the world has been denied the privilege of knowing the details of what secured Subhas the exalted position in the examination. We know from his writings, written speeches and letters to his relatives and friends that he was a master of the English language and could write with an ease and in a style that might well stimulate envy in the hearts of writers of English in India and the United Kingdom. His letters to his brother, Sarat Chandra Bose, from the Burma Jail are classic in the line. These are marked by lucid style, happy selection of words, perspicacity in conveying his thoughts and ideas, easy flow, and sometimes humour. If chance had not drawn him away from his early choice of vocation, viz, profession of a teacher and latterly of a journalist, he would have been remembered throughout India for his mode of teaching, veresatile knowledge and for his writings.

It would seem strange that Subhas thought that, like Sir Surendra Nath Banerjea, he had a meagre knowledge of the English grammar, and both of them thought that this knowledge of the intricacies of grammar was not quite necessary for the mastery of a language. Surendra Nath was admitted into the Parental Academic Institution ; a primary school to learn English. He had no previous knowledge of a foreign language he did not even know a letter, so to say, of the English alphabet. He was beset with

difficulties and his position became extremely uncomfortable among boys who spoke nothing but English. Writes Surendra Nath in his reminiscences A NATION IN MAKING : "But I muddled through somehow ; and in a short time managed to speak the language, I presume not very correctly, and without knowing a word of the grammar". The conclusion that Surendra Nath reached was :

"The fact illustrates the truth, which is now recognised, that a language is best learnt through the ear and not with the aid of the grammar and the dictionary (Italics ours). As a matter of fact I never studied English grammar as thoroughly as is now done by our boys ; and when I went up for the Matriculation Examination my grammatical knowledge was confined to Lenni's little book."

As soon as Surendra Nath's book was published Subhas got a copy of it and it was discovered that amongst the very few passages that were underlined by him in the whole book were the passage printed in italics above from Surendra Nath's book. He fully agreed with Surendra Nath and he said that he held the same view about his knowledge of grammar. He would jocularly say that he had become a 'pundit' in English without seriously reading the English grammar. It may be true, but what does that matter ? The following letter written to Sarat Chandra Bose on March 17, 1926, from the Mandalay Jail will vouchsafe for his style, the philosophic

bent of mind worthy of a devotee and above all his humour in which ignorant people would say he was badly lacking in :

"We had an interesting, though by no means a novel experience, a couple of days ago. The sun fell and the shades of evening descended upon us. But darker even than the evening tints, there rose skyward in the dim distance a dust storm so frequent in Mandalay in summer. Before the screens could be lowered, the dust like a canopy completely shrouded us. Not without difficulty, the screens were lowered but so high was the wind that they began to float in the air and served only to add to the music of the scene. The dust lay thick all over the room and not even the remotest corner was free from its touch. The wind persisted and tiles began to blow off the roof. The wooden structure began to croak much like a ship tossed about on a stormy sea. Papers began to fly, lanterns were smitten down and sundry articles began to take wings. But the wrath of Heaven did not last long and the "twice blest" drops of merey soon began to fall from above. Philosophers say that God's mercy shines even in darkness. It was, therefore, meet that the merciful drops should fall in the dark. So, to complete the harmony of the situation, the electric current conveniently failed and we were enveloped in what Milton would describe as "Cimmerian darkness." The lurid flashes of lightning served only to make the "darkness visible" (I am again using a Miltonic expression) for is not saintly Milton as effective in his descriptions of darkness as Shakespeare is sweet in his description of 'fairy moonlight' (?) and to reveal to the more devoted the terrible beauty of the smile of Kali—the Queen of the Dark (*Chinmoy mukha-mandalay sove atta atta hashi*. 'চিন্নয় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি')

"Dust was soon overpowered but we and our slender belongings were rendered the sport of the wind and the rain. I remember to have read a description of rain at school as follows :

"Pitter, patter, pit pat

Down the window pane, etc."

But there was no window-panes, and altogether ignoring the existence of pallisades, the rain began to fall pit-pat on and down our clothes. The wind suddenly turned and began to blow from the north—the side on which no screens at all had been provided. Bathed

by rain and chilled by the wind to our very bones, we nevertheless dared not to move from our places lest we should stumble against tables and cots or strike other heads, and we could only keep up our spirits and add to the humour of the fray by exercising our throats and lungs. Darkness and confusion reigned supreme till light returned and the wind abated. And then what did we behold ! Books drenched, clothes dripping and bedding moistened, and on the top of it all, a miniature rivulet flowing down the room. Heaven, to relieve our monotony, had planned to us some novel work to do and full two hours we were kept busy scrubbing the floor, drying up the water and wiping the books and furniture. The books and the clothing had no doubt a good night's rest after a refreshing bath but what about ourselves ? There was the Chief Jailor whom we could hold responsible for the vagaries of the weather...and in fact for everything happening under the sun. And out went a peremptory order at ten o'clock at night for a supply of dry blankets and bed sheets. That august person already unnerved by the inclement weather was well-nigh staggered...but he did consider it wise to send a supply of "brand new" Jail-made blankets and from his own surplus store there came a number of decent sheets and blankets. Sympathy and warmth could not be too welcome at that hour of night and praying for the blessings of Lord we surrendered to the lock-up man as the clock struck eleven.

"I am afraid I must stop here as I may be getting a poetic affectation."

It is a thousand pity that Subhas became suddenly conscious of 'poetic affectation' so early. If he had gone on writing in this vein for hours, inspired as he seems to be at the time, there would have been millions to read whatever he had written, to enjoy it and to peep through the writing at the greatness of its author.

But for the letters written in the manner in which they were done the public would not have had any chance of knowing the stylist in English language that Subhas was.

Subhas Chandra Bose and the Arab Freedom Movement

Nanda Mookherjee

Netaji Subhas Chandra Bose was a great friend of the Arabs. His sympathy for the Arabs, fighting for their national cause, was profound and deep. Like Jawaharlal Nehru, his love for the people of the Arab World developed out of our past history and common sufferings under the alien rule. The mass struggle in the Arab World against imperialist rule kindled his nationalist feeling and he wanted to forge a common link between India and the subjugated Arab nations. He was eager to extend all possible support to the Arabs waging an uncompromising war against imperialism. During his sojourn in Europe he came in contact with Arab nationalists and exchanged views on future course of action.

To assure the Arabs of India's support, Bose and Nehru took active part in getting a resolution passed in 1928 by the All India Congress Committee, expressing India's full sympathy towards the Arabs in their struggle for national liberation.

A staunch nationalist as he was, Subhas could never reconcile himself to the partition of any country on the basis of religion. He believed that this sort of partition would subserve the interests of imperialists and colonialists alone. It was this conviction that led him to condemn the partition of Palestine. A humanist as he was, the tragedy of Palestine was a nightmare to him. He never forgot the

lessons he derived from that unhappy episode. A few years later, warning his countrymen against imperialist design to divide India, he said, "Friends, we have resolved to create a united and free India. Therefore, we shall oppose all attempts to divide her and cut her up into bits. Ireland and Palestine have taught us a lesson. We have realized that to divide a country will ruin it economically, culturally and politically." (Broadcast from somewhere in Burma, September 12, 1944—Speeches and Writings of S.C. Bose, Publications Division, Govt. of India).

Though he had an indomitable faith in the final victory of subjugated nations of Africa and Asia over colonialism, yet he never underestimated the strength of imperialists and colonialists. He strongly believed that India's independence would not be complete and threat to her freedom would always remain, unless there was a concerted action on the part of the enslaved nations of the Afro-Asian continent to banish imperialism and colonialism from their sacred soils. To achieve this end and with a view to infusing a spirit of comradeship, he favoured the idea of sending Indian delegations to various countries under foreign domination and inviting delegations from other oppressed nations. When the Wafdist delegation from Egypt came to India on an invitation from the Indian National Congress

In 1939, Bose, in his Presidential address at Tripuri, said, "You are aware that the Wafdist delegation from Egypt have arrived in our midst as the guests of the Indian National Congress. You will join me in according the most hearty welcome to all of them. We are extremely happy that they found it possible to accept our invitation and make the voyage to India. We are only sorry that political exigencies in Egypt did not permit the President of the Wafd, Mustapha Nahas Pasha, personally to lead this delegation. Having had the privilege of knowing the President and leading members of the Wafdist party, my joy to-day is all the greater. Once again I offer them, on behalf of our countrymen, a most hearty and cordial welcome". (Presidential address at Tripuri Session of the Congress, March 10, 1939—Speeches and Writings of S.C. Bose). While welcoming the Egyptian delegation, he further said, "India feels proud in welcoming our brothers from Egypt. It symbolises the solidarity of the movements for freedom in Egypt and India". He admired the Arabs for their "courage, determination and sacrifice", in the cause of their national struggle.

It is said that wise statesmen hardly go by their own experiences alone. They learn from other's experiences too. This was the case with Bose. He studied the nationalist movements of all countries, and the Arab nationalist movement in particular, with keen interest and wanted to develop international contacts for he believed "that in the years to come, international developments will favour our struggle in India. But we must have a correct appreciation of the World situation at every stage and should know how to take advantage of it. Egypt stands before us as an example. Egypt won

her Treaty of Alliance with Great Britain without firing a shot, simply because, she knew how to take advantage of the Anglo-Italian tension in the Mediterranean" (Presidential address at Haripura, February 19, 1938—Speeches and Writings of S.C. Bose).

He highly appreciated some of the diplomatic moves of the Arab countries for serving their own national cause and it is a fact of history that he applied the same technique in India's case with remarkable courage. His clear-cut vision of international affairs convinced him in early thirties that war was sure to break out in Europe very soon and this would offer India a golden opportunity to win freedom. He wanted to play Germany and Italy against Britain, the greatest enemy of India and other subjugated nations. Having failed to do much from within, he left India, defying all obstacles, for Germany and from there he went to Japan where he took charge of the Indian National Army to deliver a strong blow to British imperialism.

In support of his unusual action and to inspire his countrymen for taking advantage of the international situation to reach their desired goal, he referred to the contemporary Arab politics in the following words: "By using England and the United States of America against French imperialism, Syria and the Lebanon are setting an example to India as to how India can utilize the present international situation for winning her freedom. There is no doubt that the day is not far off when other Arab states will use other friendly powers against Britain". (Broadcast from Singapore, June 19, 1945).

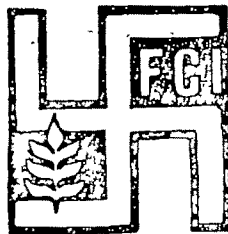
Bose's sudden departure from India in 1941 and his mysterious disappearance from th

SUBHAS CHANDRA BOSE AND THE ARAB FREEDOM MOVEMENT

৫০৬

South East Asia, after cessation of hostilities, endeavoured hard to concretise further the bond of friendship with those Arab States, which stand for secularism, socialism, progress and peace. But the Destiny willed otherwise !

Best Compliments of :

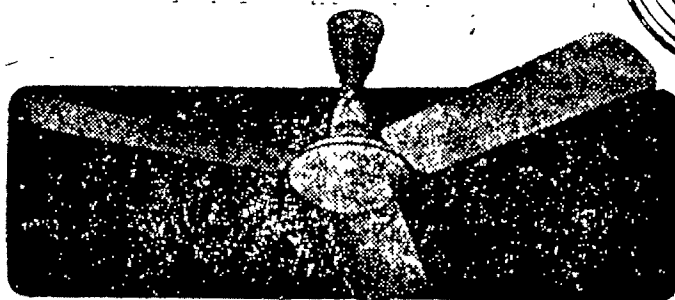


The Fertilizer Corporation of India Ltd.

EASTERN MARKETING ZONE

41, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700071

ক্যালকাটা ফ্যান



আপনার
জীবনের
অংশীদার



ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

CPW/PA/4-72-8

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পুঁতি উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। হুঁবার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও দুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপুঁতি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩-র বৈশাখে (মে ১৯৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভাহুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাতাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক
জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০



ভারত-পথিক

রমেন্দ্রলাল রায়

তুমি চলেছ অনিবার
শুধু সম্মুখের নব নব তীর্থ-আবিষ্কারে ;
শৃঙ্খল যত পরাধীনতার
চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ;
সাম্য-প্রভাতের মিলন-তোরণে,
জয়তু হে ঋষিক !
আপোষহীন-পরমাণুর যুগোচিত ধর্মযুদ্ধে ।

বেদান্ত-ভেরীয়ে স্বামীজী-ওংকারে
মহাভারতের শৌর্যময়
যে মানবিকতা বোধ
গ্রহ-পরিক্রমার বিবর্তনবাদেও
নিরন্তর উদাস্ত,
আজ্ঞা তারি দিব্য প্রেরণায়
তোমার রূপ-সত্য-উদ্ঘাটন যে
জীবন-তারুণ্যের
প্রব মুক্তি-পাথেয় ।

জয়-হিন্দ ! এই একই মন্ত্রে
তুমি একমেবাবিতীয়ম্ !
হিন্দুস্থানের পূর্ণ স্বাধীনতা-স্বপ্নে,
এশিয়া-আফ্রিকা ও বিশ্বের
কোটি কোটি কৃষ্ণ আত্মাকে, জাগ্রত করেছে,—
সাম্রাজ্য-শোষণের রক্তাক্ত কারা
ধূল্য মিশিয়ে দিতে
গীতা-বিপ্লবের আগ্নেয় দীক্ষায় ;
তাই স্থান ও কাল অতিক্রম করে
মহাভাতি-সদনের শৃঙ্খল সিংহাসনে,
চৈতন্যময় তোমার “সমস্বাদর্শ”
নিত্য অধিষ্ঠিত, হে ভারত-পথিক !



জয়তু সুভাষ জয়

শান্তশীল দাশ

দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক তুমি,
বিশ্বের বিশ্বয়,
চির হৃদয়, চির অশাস্ত তুমি,
তুমি চির নির্ভয় ।

শৃঙ্খল ধ্বনি বন্দিনী জননীর
শুনেছিলে, প্রাণ হয়েছিল অস্থির,
সে-পাশ মোচনে চির সংগ্রামী তুমি,
হে বীর জ্যোতির্ময় ।

বারে বারে এসে স্বহৃদ্য দিয়েছে হানা,
ফিরে গেছে হতমান,
মায়ের আশিস-বর্মে অন্ধ ঢাকা,
তুমি যে অমর প্রাণ ।

কোথায় রয়েছে স্বচ্ছা নির্বাসনে,
কোন সাধনায় কী ধন অন্বেষণে ;
সারা দেশ জুড়ে তোমার আসনধানি,
জয়তু সুভাষ জয় ।

বর্তমান প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের পঁচাত্তরতম অধিবেশন

চণ্ডীগড়ের সমীপবর্তী কোমাগাটা মারু নগরে কংগ্রেসের পঁচাত্তরতম অধিবেশন হয়ে গেলো। ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের একটি স্মারকরূপে কংগ্রেস নগরের নামকরণ করা হয়েছিলো 'কোমাগাটা মারু'। ১৯১৩ সালে আমেরিকার সান ফ্রানসিসকোতে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীরা মিলিত হয়ে গদর পার্টি গঠন করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব। সে-সময় অগ্রাঙ্ক ভারতীয়দের সঙ্গে বহুসংখ্যক শিখ গদর পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এস, এস, কোমাগাটা মারু নামক জাহাজে বহু শিখ কানাডা থেকে বজবজ এসে পৌছালে তাদের কর্তৃপক্ষ জাহাজ থেকে নামতে বাধা দেয় কারণ ইংরেজ সরকারের ধারণা ছিল এর অনেকেই গদর পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ভারতবর্ষে বিপ্লবের ইচ্ছন যোগাবে। তারা যখন দল বেঁধে জোর করে তীরে নেমে কলিকাতা অভিমুখে পায় হাঁটা পথে রওয়ানা হয়, তাদের অনেকেই সেদিন তাদের বাধাদানকারী সশস্ত্রবাহিনীর গুলিতে নিহত হন—। কংগ্রেস নগরের নাম পাঞ্জাবের প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাসে এই বৈপ্লবিক ঘটনার স্মারকরূপে 'কোমাগাটা মারু' রেখেছেন। পাঞ্জাবের কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আদিলগ্নে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। সে-সময় তিনি কলকাতায় 'দেশ-দর্পণ' নাম জাতীয়তাবাদী গুরুমুখী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পর 'কোমাগাটা মারু'র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। আর জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিরও এই প্রথম অধিবেশন। ১৯৭৫-এর জুলাই-এর পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোনো অধিবেশন হয় নাই। জরুরী অবস্থা ঘোষণার দিন ২৬শে জুনকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—'the big divide'—। অর্থাৎ ঐদিনটি একটি জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনীয়, জরুরী অবস্থা-পূর্ব এবং জরুরী-অবস্থা-উত্তর ভারতবর্ষের নিঃসংশয় ভেদরেখা। এই অধিবেশনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে জরুরী অবস্থা এখন চলতে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা চলবার কারণ হিসেবে বলেছেন : ধ্বংসাত্মক কার্জ এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই, আমাদের স্বাধীনতা

এতোটা ইতিপূর্বে বিপন্ন হয় নাই—'Never before our freedom was in such peril as it is now'—বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিপদ সম্বন্ধে তাই সতর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা তার সাক্ষ্য বহন করছে। জরুরী অবস্থাজ্ঞারী থাকার জন্য লোকসভার নির্বাচন—যা আগামী মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করবার সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে—এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেবার জন্য কংগ্রেস পরিষদীয় দলকে সংবিধানের ৮৩ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কংগ্রেস অধিবেশনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে সংবিধানের সংশোধন। প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতি সংবিধান সংশোধনের মাপকাঠিরূপে পার্লামেন্টের সর্বময়-কমতার—Supremacy of the Parliament—উপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের প্রাধাত্যের সঙ্গে চরিত্রের অধিকার সংরক্ষণের সত্যটি জুড়ে দিয়ে বলেছেন সংবিধান পরিবর্তন হবে গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির জন্য গণতন্ত্রকে খর্ব করার জন্য নয়। আবার তাকে বলতে শোনা গেছে কিছু আইনজ্ঞ বৈঠক করে সংবিধান সংশোধনের বিধান দিলে হবে না, দেশের বক্ষিতদের মত নিতে হবে, কারণ তাদের বক্ষনা হ্রাসের জন্যই সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন।

একই মঞ্চে, একই সময়ে একই প্রস্তাবের উপর বলতে গিয়ে প্রস্তাবের উত্থাপক সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে বলতে শোনা গেছে সংবিধানের ব্যাপক এবং সুদূর

প্রসারী পরিবর্তন চাই—vast and far reaching changes। আবার বলেছেন দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য কিছু দুঃলোক প্রচারপত্র বিলি করে : "creating false impressions like the move for a one party Government or a Presidential form of Government"

মোটকথা, সংবিধান সংশোধন করতে এ-বিষয়ে কারুর দ্বিমত না থাকলেও, কতটা সংশোধন হবে—সে সম্বন্ধে সংগ্রেস অধিবেশনের বক্তৃতায় অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কংগ্রেস সভাপতি তার সভপতির অভি-ভাষণে একদিকে যেমন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর জোর দিয়েছেন তেমনি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান সংশোধনের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। কিন্তু কোথায়, কতটা পরিবর্তন সে-সম্পর্কে তার ভাষণেও কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। একদিকে যেমন পার্লামেন্টের প্রাধাত্যের কথা বলেছেন, তেমনি আবার তারই পাশাপাশি বলেছেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিচারালয়ের উপর সংবিধানের অস্তিত্ব দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন।.....

বহিঃশক্তির আক্রমণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বার বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অজানা কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাকে অনুশরণ করেছেন। প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সরাসরি পাকিস্তানকে এ-বিষয়ে জঁসিয়ার করে দিয়েছেন। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে মন্ত্রীসভার কিছু রদবদল হয়েছে। হরিয়ানার

৫০৯ বর্তমান প্রসঙ্গ

মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার নিয়েছেন, শরণ সিং সেখান থেকে পদত্যাগ করেছেন। উমাশঙ্কর দীক্ষিত জাহাজ ও পরিবহণ মন্ত্রক থেকে পদত্যাগ করে কর্ণাটকের রাজ্যপাল হয়েছেন। মন্ত্রীসভায় তার স্থানান্ত্রিবিহীন হয়েছেন লোকসভার সদস্য জি, এস, ধীলন। খাদিজকার। গণেশ পদত্যাগ করেছেন। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রসায়ন ও সার-এর একটি পৃথক মন্ত্রকের পুরো মন্ত্রী হয়ে বসেছেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ কিস্তি আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নিরিখে এই রূপবদল হয়েছে। না অথচ কোনো নিরিখে তা ভবিষ্যৎ বলবে। কোমাগাতা মার্ক সম্মেলনের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর আনুষ্ঠানিকভাবে যুবকংগ্রেসের সর্বভারতীয় সমাবেশে যোগদান।

চাসনালা কয়লাখনি দুর্ঘটনা

ধানবাদের অদূরে চাসনালা কয়লা খনিতে গত শনিবার দুপুরবেলা ১টা ৩৫ মিঃ। আগে ১. ২৫ মিঃ খনির ম্যানেজার খাদ পরিদর্শন করে ওপরে উঠে এলেন, তার দশ মিনিট এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় খনির গহ্বরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজারসহ ৩৭২ জন কয়লা খনির শ্রমিক অকস্মাৎ জলমগ্ন হয়েছে। ঘটনার বিবরণে যতটুকু জানা গেছে, তাতে অনুমান হয় চাসনালা থেকে ৮০ ফুট দূরে অবস্থিত ১৯৪৫-এ পরিভাস্ত্র একটি খনি থেকে সেই খনিতে পানীয়রূপে

সঞ্চিত জল ৮০ ফুটের প্রতিরোধ ভেঙ্গে চাসনালায় দুইটি খাদে ছড়িয়ে পড়ে ১১ কোটি গ্যালন ঢুকে তিনটি মিনিটে সেই খাদ দুইটিকে ৩১২ জন কর্মরত খনির শ্রমিকদের মৃত্যুর কঁাদ তৈরী করে। দ্রুত জল নিকাশের জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে এবং আমেরিকা, পোল্যান্ড ও সোভিয়েত রুশ থেকে পাম্প ও বিশেষজ্ঞরা এসে পৌছাচ্ছেন। কিন্তু সব সরঞ্জাম তৈরী করে জল নিকাশের ব্যবস্থা শুরু করতে করতে এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আরও কয়েক দিন অবশ্যই যাবে। তাই চাসনালায় অন্ধকারাচ্ছন্ন খাদে জলমগ্ন হতভাগ্যদের বেঁচে থাকার আশাও ক্রমশঃই কণ থেকে কণতর হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী সরকারের সংশ্লিষ্ট নানা বিভাগ, বিহারের কয়লা খনির শ্রমিকরা, বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদল হতভাগ্যদের আধিক সাহায্যের তাদের পরিবারে কর্মকর্মীদের কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছেন। এই রকম একটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা সমবেদনা প্রতাপন করেছেন।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এই শতাব্দীতে ১৯৭৫ সালে সব চাইতে বেশী সংখ্যক দুর্ঘটনায় সর্বাধিক শ্রমিকের জীবননাশ হোলো কেন? এ বছর ২২২ টি খনি দুর্ঘটনায় ৬৬০ জন চাসনালা সমেত খনি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, গত বছর ২২১টি দুর্ঘটনায় ২২৮ জন খনি শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তার আগে ২০০টি দুর্ঘটনায় ১২৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সে বছর ক্রিৎপুর খনিতে দুর্ঘটনায় ৩৪

জন শ্রমিকের মৃত্যু। ১৯৬৫ র ২৮শে মে ধোঁরী খনি দুর্ঘটনায় মারা যায় ২৬৮ জন, আর ১৯৫৬ র বড়খেমো খনিতে মারা যায় ৩১ জন শ্রমিক। উনিশ দিন পর জলমগ্ন অবস্থা থেকে ১১ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিলো। খাদেদর একটা অংশে সামান্য বাতাস এদের প্রাণরক্ষা করেছিলো। চাসনালায় বিশেষজ্ঞরা এই ভরসা রাখতে পারছেন না।

কয়লা খনি রাষ্ট্রীয়ত্ব হবার পর খনির তদারকী কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও উন্নততর ও প্রশস্ততর হয়ে গত কয়েক বছরে খনি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমিয়ে আনবে এটাই আশা করা যায়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ত্ব হবার পর খনি দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। ইম্পাত খনি মন্ত্রকের এর খনি নিরাপত্তা ডাইরেকটরেটের দায়িত্ব এ-বিষয়ে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

চীন সোভিয়েত সম্পর্ক

ডিসেম্বরের গোড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এর চীন সফরের সময় চীনের সহ-প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান চীনে মাও-সে-তুং এবং অশুস্থ চৌ-এন-লাই-এর পরই প্রধানতম শক্তিমান ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট ফোর্ড-এর প্রারম্ভিক অভ্যর্থনা সভায় সোভিয়েত রুশের সঙ্গে আমেরিকার দাঁতাত বা সমঝোতার প্রচেষ্টাকে ন্যাং করে দিয়ে বলেন আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত রুশের বোঝাপড়া

চীনের কাছে অবাস্তব, চীনের কাছে বাস্তব সত্য হল সোভিয়েত রুশের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তারা কতটা আত্মরক্ষার জন্ত তৈরী হতে পারে।

এদিকে গত ২২শে ডিসেম্বর লণ্ডন থেকে প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায় পৃথিবীর পরিক্রমারও সর্বশেষ চীনা উপগ্রহ চীনা সীমান্তে রুশ সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে। মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত রুশের সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, ভ্লাডিভস্টক থেকে রুশ টহলদারী নৌবাহিনী দ্বিগুণ করা হয়েছে। ক্ষেপণাস্র ট্যাঙ্ক, কামান ও অস্ত্র সরঞ্জাম পশ্চিম রুশ থেকে চীনা সীমান্তে আনা হয়েছে। চীনা আবার পিকিং লাঞ্ছা, সিনকিয়াং এবং অস্ত্রাস্ত্র যায়গার সৈন্যদের সতর্ক করে দিয়েছে।

এই সংবাদের চীনা নেতৃবৃন্দের অকস্মাৎ সোভিয়েত রুশের প্রতি নমনীয়তা সংশ্লিষ্ট সকলকে তাজ্জব করে দিয়েছে। ২১ মাসের বেশী আটক রাখার পর চীনে অল্পপ্রবেশকারী সোভিয়েত হেলিকপটারের তিনটি বিমান চালককে ডিসেম্বরের শেষে অকস্মাৎ মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের সঙ্গে গণ্যমান্ত অতিথির মত আদর-আপ্যায়ন করা হচ্ছে। তাদের সম্মানে চীনারা একটি ভোজসভার আয়োজন করে এবং তাদের দৃষ্টব্য স্থানগুলি দেখারও রাজকীয় ব্যবস্থা করে। চীনাদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে চীনে খোদ রুশ রাষ্ট্রপতির মাথা গুলিয়ে গেছে, পশ্চিমারাও তাজ্জব হয়েছে। আবার পূর্ব ইউরোপীয় কূটনীতিবিদরা কেউ-কেউ বলছেন

আগামী ফেব্রুয়ারীতে আসন্ন সোভিয়েত পার্টির বৈঠকের দিকে লক্ষ্য রেখেই চীনারা এই নাটকীয় কূটনৈতিক চাল দিয়েছে।

কিন্তু চীনারা আসল কথা যা বলবার তা ঠিকই বলছে। রয়টারের সংবাদ চীনারা ৪ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার বলেছে সোভিয়েত-মার্কিন সংঘাত বিশ্ব-যুদ্ধের বিপদ বৃদ্ধি করছে। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী খোলাখুলি গত ২৮শ ডিসেম্বর একটি সংবাদভাষ্যে বলেছেন 'The Soviet Union and the U. S. A. were the only Countries in a position to start a new world war. But it added that Moscow was the main source of danger of war as Washington was on the "defensive because of its weaker position."'

জয়প্রকাশ নারায়ণের মুক্তিসাধ

সর্বোদয় নেতা লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ অসুস্থ অবস্থায় গত ১২ নভেম্বর বন্দীশালা থেকে সাময়িক মুক্তি লাভ করেন। দিল্লীতে কয়েকদিন অবস্থানের পর বোম্বাই এর যশলোক হাসপাতালে কিডনীর চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। তাঁর দুইটি কিডনীরই স্বাভাবিক ক্রিয়া অচল হয়ে যাওয়ার কারণে কৃত্রিম-কিডনী বা dialysis-এর সাহায্যে তাঁর রক্ত পরিশুদ্ধ করা হচ্ছে। এই ভাবে ১৬ বার ডায়ালাসিসের সাহায্যে তাঁর রক্ত পরিশুদ্ধ হয়েছে। চিকিৎসাধীন থাকাকালীন গত ৪ঠা ডিসেম্বর তাকে

বিনামূলীতে মুক্তি দেওয়া হয়। বর্তমানে জয়প্রকাশ নারায়ণ বোম্বাইয়ে তাঁর ভ্রাতার বাসায় রয়েছেন এবং সপ্তাহে কয়েক দিন যশলোক হাসপাতালে ডায়ালাসিসের জন্য যান। আমরা তাঁর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য দেশবাসীর সঙ্গে সমবেতভাবে বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি।

মিসার চতুর্থ সংশোধন

গত ১৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আভাশ্বরীণ নিরাপত্তা আইন (১৯৭১) সংশোধন করে একটি অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করেছেন। মিসার এই চতুর্থ সংশোধন অনুসারে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আটক আদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বা ঐ আদেশ কোনো কারণে বাতিল হলে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে নতুন আটক আদেশ জারী করা যাবে।

নতুন সংশোধনীতে বলা হয়েছে নতুন কোনো কারণ না ঘটলে বা নতুন তথ্য পাওয়া না গেলে আটক ব্যক্তিকে মূল আটক দেওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাসের বেশি আটক রাখা যাবে না।

গত ১৭ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি মিসা আইনের তৃতীয় সংশোধনী জারী করেছেন। এই সংশোধনীর ফলে মিসার আটকের কারণ এবং তথ্যগুলি গোপন এবং রাষ্ট্রীয় বিষয় রূপে বিবেচিত হবে। ফলে মিসার আটক ব্যক্তিও জানতে পারবে না কি কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, এবং আদালতকেও আটকের কারণ দেখাবার দায় থাকবে না।

১১২ জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮২

সংবাদপত্র সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স

গত ৮ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি সংবাদপত্র সংক্রান্ত তিনটি অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন। (১) আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশ বন্ধের জন্য (২) প্রেস কাউন্সিল ভেঙে দেবার জন্য, (৩) সংসদের কার্যকরী প্রকাশ আইন বাতিলের জন্য।

আপত্তিকর বিষয় বলতে কী বোঝায়, তা সংবিধানের ১৯ (২) অনুসারে বুঝতে হবে। যাতে সংবিধানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, অত্যাশঙ্ক জনিষপত্র ও কাজ সংক্রান্ত উৎপাদন, সরবরাহ, ও বণ্টন ব্যবস্থার হানি হয়; সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বৈষম্য বা বিরোধের হয়, এছাড়া অমালীন ও অস্বীকৃত রচনাবলীর বিরুদ্ধেও এই আইন প্রয়োগ করা হবে। প্রেস কাউন্সিল ১৯৬৬ র ১লা জাম্মারী থেকে লোপ পেলো। আর ১৯৫৬ সালে সংসদীয় কার্য-বিবরণী, প্রকাশনা সম্পর্কে নিরাপত্তা আইনে

সংবাদপত্রগুলিকে সংসদে প্রদত্ত বক্তৃতা ছাপবার যে অধিকার দেওয়া হয়েছিলো, সেই অধিকার বাতিল হয়ে গেলো। সংশ্লিষ্ট আইনটি বাতিল হবার সঙ্গে সঙ্গে।

আপত্তিকর বিষয় প্রকাশনা বন্ধ করবার জন্য মুদ্রাক্ষর, প্রকাশক ও সম্পাদকের কাছ থেকে জামানত দাবী করা হতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে সেই জামানত জব্দ হতে পারে ও দ্বিতীয়বার জামানত দাবী করা যেতে পারে।

উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গত নভেম্বরে শেষে পদত্যাগ করায়, বিধান সভা বজায় রেখে গত ৩০শে নভেম্বর সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এইচ, এন বহুগুণা তার আকস্মিক পদত্যাগ সম্বন্ধে কোনো কারণ দেখান নাই।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২'০০
পকেট গীতা	৫'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১০'০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭'৫০
Soul of India Speaks	৭'৫০
কর্মবাণী	১'৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২'০০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.	
বিভাসাগর	৩'০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩'০০
ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের	
তরুণ তুর্কী	৩'০০
ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড	৩'২৫
বেতুইনের দেশে	৩'০০
নিবেদিতা	১০'০০
বিভাসাগর	১০'০০
শিবরামের কিশোর নাটক	২'০০
ছোটদের সেরাগল্প	৪'০০

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০
বীরসে বাঙালী	৩'৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫'৫০
বাংলার ঋষি	৫'০০
বাংলার বিদুষী	৩'৫০
বাংলার মনীষী	
রাজর্ষি রামমোহন	৩'০০
ষুগাচার্য বিবেকানন্দ	২'৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪'০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২'৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩'০০
জীবনগড়া	৭৫
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৪'০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত সংস্করণ)	
শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	
সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৬'০০

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ	শরীর ও শক্তি	৩'০০
নিবাবণ	সরল যোগ ও ব্যায়াম	৩'০০
যোগ বায়ামে (মোহদের স্বাস্থ্য) ও স্টেন্ডার্ড	নীত্যাগ দেহে দীর্ঘ জীবন	২'৫০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট	১'০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ বালুজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২



স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে,
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে
প্রস্তুত। রসায়নিক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই
ছটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম
শক্তি ও শ্রুতি বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য
কিরে আসে এক
অতি অল্পদিনের মধ্যে
দুর্বল জরাজীর্ণ ভয়
দেখে নতুন সজীবনী
শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা-কলিকাতা-৪৮

অধ্যাপক ডাঃ বোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

চারের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিষটের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যাহ দু'বার আহারের
পর সেব্য।



SMM-2/89

Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 3.00 with Regtd Postage
Rs 4.70 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

ପଞ୍ଚିତ୍ରାସି-ସମ୍ଭାଷିକା
ନୀଳା ଦାସ

माघ : १७८२

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পুঁতি

উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ছ'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও দুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। তার এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপুঁতি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩ সালের বৈশাখে (মে ১৯৭৬) প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভাঙ্ঘ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক

জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০



সূচীপত্র

জয়ন্তী মাস : : ১৩৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিজয়িনী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১৩
রুশ-চীন দ্বন্দ্ব	অভয়শঙ্কর শর্মা	৫১৪
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)		
দাদার জীবন পূর্ণতার		
সাধনার জীবন	কণেশ্বর ঘোষাল	৫২৫
সমাজ বিপ্লবে নারীর ভূমিকা		
	সাগরিকা ঘোষ	৫৩২
রিলকে জন্ম শতবর্ষ : ১৯৭৫		
	আর্ষদেব	৫৩৭
রিলকের কবিতা	অমৃতাদ :	৫৩৯
	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	
জীবনের আয়নার (গল্প)		৫৪১
	ডঃ অন্নদামোহন বাগচী	
বর্তমান প্রসঙ্গ		৫৪৭

ভুল সংশোধন

জয়ন্তী পৌষ ১৩৮২ সংখ্যায় ৪৫১ পৃষ্ঠায়, ২ নম্বর নোট-এ শ্রীশিবপ্রসাদ ঘোষ এর স্থলে শ্রীশিবব্রত ঘোষ হবে।

৪৫১ পৃষ্ঠায় ২ ও ৩ নম্বর নোটে হাওড়া জেলা নুব সন্মিলন ও হাওড়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলন-এর সময় সঠিক পাওয়া না গেলেও ভাষণে উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে ঐ ভাষণ দুটি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ এর পর কোনও এক সময় প্রদত্ত। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই উল্লিখিত সময় আগষ্ট ১৯২৯ হবে না।

এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা কৃতঃখিত।

সম্পাদক জয়ন্তী

সম্পাদক : সুনীল দাস

দেশ প্রিয় চবেছে

সকলের জন্য আরও বেশি খাদ্য

এ বছর খাদ্যের পরিমাণ হবে
রেকর্ডসৃষ্টিকারী—এই পরিমাণ
114 মিঃ টন হবে বলে জানা
করা হচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী খাদ্য বণ্টন
ব্যবস্থাটি সুসংগঠিত করা হয়েছে।
এটি এখন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা
হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

দূর সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম
আমাদের প্রিয় নিয়ে যাবে



ଆସଞ୍ଜୀ

୪୦ ବର୍ଷ • ନବମ ସଂଖ୍ୟା • ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୧

୩୩

ବିଚାରିବି ନାହିଁ ତବ ଡ଼ର,
ହୃଦୟ ଓ ମନ ତବ କଥା ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପରାଧ
ମନେଇ ଚାଲିଯାଉ,
କହିଦାମି ଏହି କାହାଣୀ ॥

ସିଦ୍ଧିବିଜୟାଚାର୍ଯ୍ୟ

୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ
୧୯୮୧

ধারাবাহিক প্রবন্ধ :

অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব*

অভয়শঙ্কর শর্মা

স্ট্যালিন বিসর্জনের পর

বিংশতিতম সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে স্ট্যালিন-বিসর্জন নীতি ঘোষিত হবার পর সোভিয়েত রুশ নেতারা স্ট্যালিনের নিন্দায়, সমালোচনায় মুগ্ধ হলেও চীনারা অতো বাড়াবাড়ি পছন্দ করে নাই। চীনা কমুনিষ্ট নেতাদের প্রচারের খারাটা ছিল স্ট্যালিন ভুল-ভ্রান্তির উদ্দেশ্ব না হলেও, স্ট্যালিন প্রকৃতই মহান ছিলেন। স্ট্যালিন বিসর্জনের প্রচারে স্ট্যালিনের আমলের লৌহকঠিন বাঁধন কমুনিষ্ট ছনিয়ায় শিথিল হয়ে পড়ে এবং মস্কোর তাঁবেদার পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলি এই বন্ধন মুক্তির জন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাছাড়া ২০তম কংগ্রেসে সমাজবাদে উত্তরণের বিভিন্ন পথ-এর ঘোষিত নীতি এই বন্ধন-মুক্তির বিজ্রোহে ইন্ধন যোগায়। ১৯৫৬র শরৎকালেই পোলাণ্ড এবং হাঙ্গেরী রীতিমত বিজ্রোহ করে বসে। পোলাণ্ড-এ বিজ্রোহের আগুন ছলে উঠলে পোলাণ্ডের উদারনৈতিক কমুনিষ্ট নেতা

গোমূলকা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে নূতন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্রুশ্চেন্ড প্রথমটা চেয়েছিলো সোভিয়েত সেনাবাহিনী দিয়ে পোলাণ্ডকে সায়েস্তা করবে। ওয়ারশ সহর সোভিয়েত ট্যাঙ্কবাহিনী এসে ঘিরে ফেললো। পোলরা সোভিয়েত ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধের জন্ত তৈরী থাকে। চীনা কমুনিষ্ট নেতারা পোলাণ্ডকে সমর্থন করে এবং ক্রুশ্চেন্ডকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে নিবৃত্ত করে। চৌ-এন-লাই প্রথমে মস্কো এবং পরে ওয়ারশ গিয়ে আপসের পরিবেশ তৈরী করে। কিন্তু হাঙ্গেরীর বেলায় বিপরীত ঘটনা ঘটলো। ক্রুশ্চেন্ড হাঙ্গেরীতে সৈন্য পাঠিয়েও তাদের সরিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং হাঙ্গেরীর কমুনিষ্ট নেতা ইমরে নাজ্ (Imre Nage) এবং জেনারেল ম্যালেটারকে (Pal Maleter) নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করে নির্মমভাবে হাঙ্গেরীর বিজ্রোহকে দমন করেন, ১৯৬০ সালের মস্কোতে ৮১ দলের কমুনিষ্ট

* [ভুলক্রমে লেখক প্রদত্ত 'রুশ-চীন দ্বন্দ্ব' শিরোনামার পরিবর্তে পূর্ববর্তী সংখ্যা দ্বয়ে 'রুশ চীন যুদ্ধ' মুদ্রিত হয়েছে, এজন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদক, জয়ন্তী]

সম্মেলনে চীন ঘোষণা করে যে তাদের চাপেই সেদিন হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ সোভিয়েতরুশ নির্মমভাবে দমন করতে বাধ্য হয়।

পূর্ব ইউরোপের দুইটি রাষ্ট্র বিদ্রোহ দমনে দুই রকম পদ্ধতি অনুসরণের কারণ হিসেবে দেখা যায় দুইটি ক্ষেত্রেই সোভিয়েত রুশের পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে চীনের পরামর্শ অমুযায়ী ক্রুশ্চভ কাজ করতে বাধ্য হয়। পোল্যান্ডের সত্তা কারামুক্ত পোমুলকার কম্যুনিষ্ট সরকার শক্ত হাতে শাসন ক্ষমতায় আসীন রয়েছে এবং পোল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর ওপর গোমূলকা সরকারের কর্তৃত্বও সংশয়াতীত। তাই পোল্যান্ডের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের পরিবর্তে আপস শ্রেয়। আর হাঙ্গেরীতে সেনাবাহিনী কম্যুনি পার্টির বিরুদ্ধে গেছে এবং হাঙ্গেরীর বিদ্রোহীরা কম্যুনিষ্ট শিবির ভেঙ্গে পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসীর পথ ধরতে চায় যার পররাষ্ট্র নীতি হবে কম্যুনিষ্ট ও পশ্চিমীরাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিরপেক্ষ অবস্থান। চীনা নেতৃত্ব প্রবলভাবে কম্যুনিষ্ট সংহতি ভাঙতে দেবার বিরুদ্ধে। তাই চীনারা চেয়েছে যতই নির্মম হোক না হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমন করতেই হবে। ক্রুশ্চভও উভয়সঙ্কে ছিলো। ২০-তম কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই যদি কম্যুনিষ্ট জোটে ভাঙন ধরে তবে তার ঘরের শত্রুরা কোণঠাসা হলেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তার পতন ঘটাবে। তাই ঘরের শত্রুদের কোণঠাসা করে ক্রুশ্চভ হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে স্ট্যালিনী সঙ্কাস

প্রয়োগ করে। “সমাজবাদের বিভিন্ন পথের” নীতি হাঙ্গেরীর পরীক্ষাগারে যেমন ঘা খেলো, তেমনি পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরীর বিদ্রোহে চীনা কম্যুনিষ্টরা সোভিয়েত রুশ নেতৃত্বের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বও স্থান করে নিলো।

এর আগের বছর চীনের দরজায় দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রুশ্চভ সোভিয়েত নেতৃত্বের অনুকূলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এসেছে। ১৯৫৫-এর শেষের দিকে নামেমাত্র প্রধানমন্ত্রী বুলগানিনকে গাথা-বোটের মত সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ সফরের সময় সাহায্যের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বন্ধুত্বের উদ্বেলতা দিয়ে ক্রুশ্চভ এশিয়ার এই অঞ্চলে চমক সৃষ্টি করেছে। এই অঞ্চলের সত্তা স্বাধীন দেশগুলির মৈত্রী ছিল ক্রুশ্চভের লক্ষ্য। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে এদের সরিয়ে নিরপেক্ষ রাখতে পারলেই ক্রুশ্চভের চোখে যথেষ্ট কাজ হোলো। এরা কম্যুনিষ্ট-বিরোধী হলেও এসে যায় না, যদি এরা উপনিবেশবাদ বিরোধী হয় এবং সোভিয়েত রুশের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়।

কম্যুনিষ্টদের পরিভাষায় ভারতবর্ষে সেদিন নেহেরু সরকার ছিল জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সরকার। যাদের অস্তিম লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা বা জাতীয় বিপ্লব। স্বাধীনতা অর্জন করলেই এদের বৈপ্লবিক লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যায় এবং তারপর এই সব দেশের স্বাধীন সরকার পুঁজিবাদী কাঠামোকে স্বীকার করে নিয়ে পরিষদীয় পন্থতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে।

লেনিনের তত্ত্ব অনুযায়ী জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনই যাদের অস্তিম বৈপ্লবিক লক্ষ্য সেই সব স্বাধীন সরকারকে 'সমাজবাদী বিপ্লবীদের প্রথম সূযোগেই উৎসাদিত করতে হবে। কারণ এরা হোলো "সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী" (lackeys of imperialism)' ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখলের পর ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বি. টি. রণদিভের অভিনন্দন বার্তার উত্তরে মাও-সে-তুং খাঁটি লেনিন তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নেহেরুর নেতৃত্বে পরিচালিত সেদিনকার স্বাধীনতা-উত্তর ভারত সরকারকে সাম্রাজ্যবাদী সরকাররূপে চিহ্নিত করে ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের এই সরকারকে উচ্ছেদের দায়িত্ব স্বরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। মিশরে নাসেরকে এবং ইন্দোনেশিয়ায় সোয়েকার্নেকে এবং ভারতে নেহেরুকে সমর্থন ও এদের সরকারকে সাহায্য দান নিয়ে পরবর্তীকালে চীন-রুশ জ্বলন্ত এক পর্যায়ে ক্রুশ্চেভকে এবল চীনা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।

১৯৬০ সালের ১১ই নভেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮১টি কম্যুনিষ্ট পার্টির শীর্ষ সম্মেলনে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তেং সাইও-পিং (Teng Hsiao-ping) ক্রুশ্চেভনীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে লেনিন-তত্ত্বের অনুসরণে অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে চীনা নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের

উল্লেখ করেন। তাঁর মতে কোনো বিশেষ সংগ্রাম-সূচীতে শ্রমিকরা জাতীয় বুর্জোয়া সরকারের শরিক হলেও, সেই সরকারকে নিবিচারে সমর্থন করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে বুর্জোয়া ও শোষিতদের সংহতিকে সমর্থন কম্যুনিষ্টদের দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত সংগ্রাম বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শুরু হলে তখন আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের কোনো ক্রমেই বরদাস্ত করা যাবে না। ভারতবর্ষ তো বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের পরিচয়ে অপাক্ষেপ ছিলই। ১৯৫৯-এ তিব্বত-এর 'প্রতি-বিপ্লবের' পর চীনা কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অপাক্ষেপ হয়ে গেছে। তেং আরও বলেন যে বর্তমানে (১৯৬০ সাল) নেহেরু দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকি চীনের সঙ্গে খুঁচিয়ে সীমান্ত-বিরোধ সৃষ্টি করে নিজের দেশের জন-সাধারণের বিরূপতা থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতিতে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি যে সময় 'নেহেরু চক্র'-এর (Nehru Clique) বিরুদ্ধে সমর্থনের ক্ষমতা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে, বিশেষভাবে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ডাক দিচ্ছে, ঠিক সে সময় সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে নেহেরু-সরকারকে সমর্থন জানিয়ে ভ্রাতৃ-প্রতিম পার্টির সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে চীন-ভারত বিরোধকে তীব্র করে তুলছেন।

এই পরিস্থিতিতে কম্যুনিষ্টদের কী করণীয় তার বিধান দিয়ে তেং যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ

করেন, ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি বর্তমান ভারত সরকার সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন বলে দাবী করেন। প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়েছে “unity-struggle ; “struggle-unity”; অর্থাৎ ‘ঐক্য সংগ্রাম’ সংগ্রাম-ঐক্য’। “unity-struggle” বা ‘ঐক্য-সংগ্রাম’ বলতে বোঝায় যাদের দক্ষিণমুখী প্রবণতা রয়েছে তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে এবং একই সময়ে যাদের বাম-মুখী প্রবণতা রয়েছে তাদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। আর ‘struggle-unity’ বা ‘সংগ্রাম-ঐক্য’ বলতে বোঝাবে যারা সংগ্রামে পৰ্য্যুদন্ত হয়ে বাম-মুখী মোড় নেবে তাদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। কার্যত এই নীতির উদ্দেশ্য হলো নেহেরুর সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রেখে তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে—যার ফলে তার আভ্যন্তরীণ সঙ্কট ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং তার শাসন ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমীপবর্তী হয়ে উঠবে। “ঐক্য-সংগ্রামের” এই পরিণতিতে ভারত সরকারের উৎসাদন সহজতর হবে। নেহেরুকে সমর্থনের অভিযোগের উত্তরে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন ফাঁসীর আসামীকে যেমন ফাঁসীর রজ্জুটি সমর্থন করে তেমনি নেহেরুকে ক্রুশ্চেভ সমর্থন করছেন : We support them as the rope supports the hanged man”। বর্তমান ভারত সরকারের প্রতি ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির সমর্থনের স্বরূপও কী এই ধরনের ? লেনিন-তত্ত্ব বা ক্রুশ্চেভ-তত্ত্ব, যে মাপকাঠিই প্রয়োগ করা যাক না কেন ভারত সরকারের, অর্থাৎ ভারতের

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের, বিলোপই তার শেষ কথা। চীনের এই তাত্ত্বিক মতের পরীক্ষার জন্তই বোধ হয়, চীন ১৯৬২র অক্টোবরে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করেছিলো।

যুগোস্লাভিয়াকে কেন্দ্র করেও রুশ এবং চীনের দ্বন্দ্ব ধূমায়িত হচ্ছিল। ১৯৪৮ সালে যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত রুশের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কারণ সে-সময় স্ট্যালিন যুগোস্লাভিয়ার স্বাধীনতা বিলোপ করতে চেয়েছিলেন, যুগোস্লাভিয়ার কমুনিষ্ট পার্টি ‘লীগ অফ কমুনিষ্টস’কে (League of Communists) সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির তাঁবেদার বানাতে চেয়েছিলেন। ক্রুশ্চেভ এই অবস্থার পরিবর্তন করে, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে, যুগোস্লাভ কমুনিষ্ট পার্টি'কেও আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট আন্দোলনের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৫-র গ্রীষ্মকালে ক্রুশ্চেভ ও বুলগারিন বেলগ্রেডে উপস্থিত হন। কিন্তু টিটো রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সম্পর্কের পুনঃ স্থাপনে সম্মত হলেও যুগোস্লাভ কমুনিষ্ট পার্টি'কে মস্কোর আওতায় আনতে অসম্মত হন। ক্রুশ্চেভ হাল ছাড়লেন না। ১৯৫৬ র জুনে টিটোকে মস্কোতে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করে দুই দেশের কমুনিষ্ট পার্টির মধ্যে একটা সমঝোতায় এসে ক্রুশ্চেভ ও টিটো যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমাজবাদী উন্নয়নের পথ বিভিন্ন—‘the roads to socialist development, in different

countries in different conditions are different.” ‘বিভিন্ন দেশে সমাজবাদের পথ বিভিন্ন’ ১৯৫৬র বিশ্বেশিতম কংগ্রেসে গৃহীত নীতির কার্যকরী প্রয়োগের দৃষ্টান্তরূপেই যেন যুক্ত-বিবৃতিতে একথা ঘোষিত হল। এই যুক্তি প্রসারিত করে যুক্ত-বিবৃতিতে আরও ব্যাখ্যা করা হোলো যে ‘সমাজ-বাদের বিকাশে বৈচিত্র্য, সমাজবাদে শক্তি সঞ্চা-রিত করে’—diversity in the development of socialism helps to strengthen it’ এবং মস্কো ও বেলগ্রেডের দিক থেকে বলা হয় এক পক্ষ আর এক পক্ষের ওপর সমাজবাদের বিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কিত মত চাপিয়ে দেবে না—‘neither one side nor the other has any inclination to impose on others its own conceptions in determining ways and means of Socialist development.

সে-সময় চীন এই ঘোষণার কোনো প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু ১৯৫৭-এর নভেম্বরে রুশ বিপ্লবের ৪০ তম বার্ষিকীতে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমুনিষ্ট সম্মেলনের পর অবস্থার পরিবর্তন হোলো। ১৯৫৬-এর ২০তম কংগ্রেসে স্টালিন-বিসর্জন নীতির ফলে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে মস্কোর নেতৃত্বে ফাটল দেখা দিয়েছে, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরীতে বিজোহ দেখা দিয়েছে, অস্ট্রা কমুনিষ্ট পার্টির মধ্যে আন্ত-কেন্দ্রীকতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এমন কি খাস সোভিয়েত ভূমির চিন্তাবিদদের একাংশ স্বাধীন চিন্তার দাবীতে বিজোহের পতাকা তুলেছে। এই

সঙ্কটে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরীর বিজোহের মীমাংসায় মাও-সে-তুং-এর পরামর্শ ও সহায়তা ক্রুশ্চেভকে সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে শক্তিদান করেছে। ১৯৫৭-এর মস্কোর সম্মেলনে, ক্রুশ্চেভ ও মাও-সে-তুং-এর পারস্পরিক সাম্প্রতিক বোঝাপড়ায়, বিশ্ব কমুনিষ্ট আন্দোলনে মস্কোর আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় মাও-সে-তুং অক্লপণভাবে ক্রুশ্চেভকে সাহায্য করেন। এই কারণে একমাত্র যুগোস্লাভিয়া ১৯৫৭ মস্কোর ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে অসম্মত হয়। ক্রুশ্চেভ যুগোস্লাভিয়াকে খুশী করে সমাজবাদী শিবিরে ফিরিয়ে আনবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন আর ঠিক সেই মুখে যুগোস্লাভিয়ার এই আচরণ চীনা নেতাদের কাছে ক্রুশ্চেভের মর্যাদা বিপন্ন করে তুললো। চীনা-দের চোখে যুগোস্লাভিয়া সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দোসর সমাজবাদী শিবিরের বিচ্ছিন্নতাকামী। যুগোস্লাভিয়া সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে আর্থিক ও সামাজিক সাহায্য নিয়েছে, বিশ্ব শক্তি বিভাগকে দুইটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে দেখবার বিরোধী এবং আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে দেবার ঘোরতর বিরুদ্ধে। সুতরাং, চীনা কমুনিষ্টরা ‘শোধনবাদী’ যুগোস্লাভিয়াকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে ক্রুশ্চেভ-এর উপর চাপ সৃষ্টি করলে ক্রুশ্চেভ নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং চীনা কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে ১৯৫৮-এর ২৫শে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির দায়িত্ব চাপিয়ে

প্রস্তাব গ্রহীত হয়, ক্রুশ্চেভ কার্খভ যুগোস্লাভিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের পঞ্চমবাহিনী—‘a Trojan horse for the Imperialists’ রূপে চিহ্নিত করে তাতে সায় দেন এবং ক্রুশ্চেভ যুগোস্লাভিয়াকে প্রতিশ্রুত আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে চীনা কম্যুনিষ্টদের খুশী করবার চেষ্টা করেন। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবটির বয়ান নিম্নরূপ:

“In a wild attempt to undermine and disintegrate the Communist Parties of various countries they (the Yugoslavs) have propagated a series of fallacious theories. They deny the leading role of the Communist Party in Socialist revolution and Socialist construction; they attack the Communist and Workers’ Parties in the Socialist Countries, and slander the Communist Parties in the Socialist Countries This thoroughly revisionist programme is put forward for the purpose of splitting the international Communist movement.”

অতঃপর যতদিন পর্যন্ত চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি সরাসরি নাম নিয়ে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি'কে আক্রমণ করতে বিরত থেকেছে, ততদিন পর্যন্ত ক্রুশ্চেভ এবং সোভিয়েত রুশকে আক্রমণ করবার প্রয়োজন হলে যুগোস্লাভিয়াকে শিথিল দাঁড় করিয়ে

চীনা কম্যুনিষ্টরা অপরোক্ষে সোভিয়েত রুশকে আক্রমণ করেছে। যা কিছু বিপ্লববিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরবিরোধী, তারই নাম ‘শোথনবাদ’ এবং যার প্রতীক চীনাদের চোখে যুগোস্লাভিয়া, অর্থাৎ তার আড়ালে সোভিয়েত রাশিয়া। আর ক্রুশ্চেভ যদিও সে-সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে বসবার আগ্রহাতিশয্যে চীনা কম্যুনিষ্টদের সমর্থনের জন্য সাময়িকভাবে যুগোস্লাভিয়াকে ‘Trojan horse of the Imperialists’ আখ্যায়িত করে চীনা কম্যুনিষ্টদের খুশী করতে চেয়েছেন, সে-কারণে যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ক্রুশ্চেভের চেষ্টা ধেমে যায়নি। ১৯৬২ সালেও সোভিয়েত রুশের সেদিনকার নাম-মাত্র প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে ক্রুশ্চেভ বেলগ্রেড-এ পাঠিয়েছিলো একই উদ্দেশ্যে। ইতিহাসের এমনই পরিহাস, যে সময় চীন-রুশ দ্বন্দ্ব স্থায়ীরূপ নিয়েছে এবং মাঝে মাঝে এই দুই রাষ্ট্রে সীমান্ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে ওঠে, তারই মধ্যে চীনের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের জন্য ১৯৭৫-এর অক্টোবরে যুগোস্লাভ প্রধানমন্ত্রীর সোভিয়েত রুশে যাবার সংবাদ পাওয়া গেলো।

স্বল্পস্থায়ী মিতালী

রুশ বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মস্কোতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের বৈঠক ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে আহত হয়েছে। উপলক্ষ্য যদিও লেনিনের বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্য,

লক্ষ্য আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে মস্কোর প্রাধান্তের স্বীকৃতি পরোক্ষ আদায় করা, তার ওপরও আবার ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। ক্রুশ্চেভ কেন নিরাসক্ত থাকবে ১৯৫৬-এর হ্যাঙ্গাও ও হাঙ্গেরীয় সঙ্কট-এর পর? সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত সে বছরের গোড়ায় মলোটোভ-ম্যালেনকভ কাগানোভিচের চূড়ান্ত পরাজয়ের এবং দলের সকল প্রকার পদ থেকে তাদের নির্বাসনের পর? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকভ বিভাঙিত হয়েছে সোভিয়েত রুশের এক প্রান্তে এক অখ্যাত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তদারকরূপে, আর স্ট্যালিনের আমলের দুর্ধর্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ নির্বাসিত হয়েছে বহির্মঙ্গোলীয়ার রাজধানী উলান বাটোরে এক অকিঞ্চিৎকর রাজকর্মচারীর দায়িত্বে।

মস্কোতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতারা সমবেত হয়েছেন। তাদের কি ভূমিকা? অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের নেতাদের কোনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেই। তাদের শুধু লেনিন-বিল্গের ৪০তম বার্ষিকী উৎসবেই মত্ত রাখা হয়েছে। এই মহোৎসবের পেছনে যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে, সেখানে যে একটি সর্বসম্মত ঘোষণাপত্র উপস্থাপিত হবে, সে-ধরনের কোনোও আঁচই তাদের গোড়ায় পেতে দেওয়া হয় নাই। তাদের পাঠানো হয়েছে সোভিয়েত রুশ পরিভ্রমণে—যৌথ খামার, বড় বড় কল কারখানা তারা ঝেরিয়ে দেখুক। আর এই ধরনের আয়োজন তাদের জন্য। আর সেই আলয়ে পূর্ব

ইউরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের নেতাদের নিঃসোভিয়েত কম্যুনিষ্ট নেতারা বৈঠক করে মস্কো সম্মেলনের ঘোষণা পত্রের খসড়ায় তাদের সম্মতি আদায় করছেন। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট নেতাদের রচিত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি ইতিপূর্বে সম্মেলনে উপস্থিত চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা অমুমোদন করেছেন—তাদের মধ্যে স্বয়ং মাও-সে-তুং উপস্থিত রয়েছেন। সেদিন সোভিয়েত রুশের নেতাদের সঙ্গে চীনের নেতাদের পরম সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। ১৯৫৬-এ পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীয় সঙ্কট থেকে মাও-সে-তুং ক্রুশ্চেভকে পরিত্রাণ করেছেন। মাও-সে-তুং-এর পরামর্শমত সেদিন ক্রুশ্চেভ না কাজ করলে, হয়তো সে ক্ষমতাচ্যুত হতো, হয়তো পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত তাঁবেদার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত রুশের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাধিকার অর্জন করতো। তাই ১৯৫৭ মস্কো সম্মেলনে সোভিয়েত রুশের নেতাদের কাছে চীনা কম্যুনিষ্টদের খাতিরই আলাদা। চীনা কম্যুনিষ্ট নেতারাও উৎফুল্ল। ১৯৫৬-এ পূর্ব ইউরোপের ঘটনা আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের কেন্দ্র বিন্দুতে তাদের স্থান করে দিয়েছেন। আন্দোলনের বড়ো শরিক, সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির পাশেই তাদের স্থান। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট নেতারাও তাই চীনা কম্যুনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে সর্বাত্মক খসড়া ঘোষণাপত্রটি নিয়ে আলোচনা করে তাদের সম্মতি নিয়ে নিয়েছেন। আত্মহুলত অগ্রাগ্র রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসের পর বৈঠক

সোভিয়েত তাঁবেদারীমুক্ত হয়েছিলো, এই খসড়া তার অনেকটা খর্ব করা হয়েছে। খসড়ার বয়ান তাদের জন্ম অপেক্ষাকৃত কঠোর, গোঁড়া এবং তীক্ষ্ণ। তাদের স্বাধীনতা সীমিত। অর্থাৎ মস্কোর বন্ধু আটুনি তাদের উপর আবার রক্ষতর হবার দিকে। আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট আন্দোলনে মস্কোর প্রভু ফিরিয়ে আনবার প্রধান সহায়ক চীনা কমুনিষ্টরা।

সম্মেলনে ১৪ নভেম্বর খসড়া ঘোষণাটি উপস্থাপিত হোলো। পূর্ব-ইউরোপের কমুনিষ্ট ব্লক-বহির্ভূত বৈচারা অ-কমুনিষ্ট রাষ্ট্রের কমুনিষ্ট প্রতিনিধিদের খসড়া সম্বন্ধে বলবার কিছু ছিল না। সম্মেলনের প্রথম দুই দিন আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি শাস্তির ঘোষণা রচনা নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল। মূল সম্মেলনে তাদের একটিই কাজ— অর্থাৎ, সোভিয়েত রুশ নেতাদের তৈরী এবং চীনা কমুনিষ্ট নেতাদের সমর্থিত খসড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর দান। তারা বিনা বাধ্যব্যয়ে তাদের সে-ভূমিকা পালন করে, বাদে যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধিরা। টিটো এই সম্মেলনে উপস্থিত হননি, তার পক্ষ থেকে ছিল যুগোস্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী—কার্ভেলজ। টিটো হয়তো উপস্থিত হোতেন, হয়তো যুগোস্লাভিয়া ১৯৫৭-এর মস্কো ঘোষণার খসড়ায় স্বাক্ষরও দিতো। মস্কোর নভেম্বরের সম্মেলনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মস্কোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরূপে ক্রুশ্চেন্ড মার্শাল জুকভকে যুগোস্লাভিয়ায় পাঠিয়েছিল। তারও কয়েকমাস পূর্বে মস্কোট-ম্যালেনকভ—

কাগামোভকে সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটি থেকে বিতাড়ন, জুকভের স্বার্থহীন সহযোগিতা পাওয়াতেই ক্রুশ্চেন্ডের পক্ষে সমর্থন হয়েছে। এবার ক্রুশ্চেন্ডের হাতে মার্শাল জুকভ বিতাড়নের পালা। সেই প্রস্তুতির জন্ম ক্রুশ্চেন্ড পাঠিয়ে দিলো জুকভকে যুগোস্লাভিয়ায়, টিটোর অভিনন্দনের আপ্যায়নে গদগদ হতে। টিটোর জন্মকালো অভিনন্দনের অনাবিল আনন্দ নিয়ে মস্কো পৌছাতেই জুকভ পদচ্যুত হয়ে ইতিহাসের অন্ধকারে বিদায় নিলেন। আপ্যায়িত অতিথির অব্যবহিত পদচ্যুতিতে টিটো অপদস্থ বোধ করলেন। যার ফলে ১৯৫৭-এর মস্কো সম্মেলনে তার অমুপস্থিতি এবং খসড়া ঘোষণায়ও যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধির স্বাক্ষর বর্জন।

১৯৫৭-এর মস্কো ঘোষণা, সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের বকমফের হলেও এই ঘোষণাটি আরও সংহত। ঘোষণাটিতে আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সংগ্রাম-মূলক করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট আন্দোলনের ওপর মস্কোর বাঁধনকে আরও কঠোর করা হয়েছে এবং অ-কমুনিষ্ট বিশ্বের প্রতি কমুনিষ্টদের তাত্ত্বিক আক্রমণ তীব্রতর করা হয়েছে। ঘোষণা সনদে বলা হয়েছে (১) 'বিশ্বে আর একটি যুদ্ধের "অমোঘ অনিবার্যতা নেই"—War was not 'fatally inevitable', (২) যে সব দেশে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ক্ষরণ হয়েছে, সেই সব দেশে হয়তো তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে কমুনিজমের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু যে সব দেশে পুঁজিবাদের

অগ্রগতি নেই, সেই সব দেশে? হ্যাঁ, ১৯৫৭ এর নভেম্বর ঘোষণায় তাদের জ্ঞাত পৃথক পথ খোলা রাখা হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার মত অনগ্রসর দেশের কমুনিষ্টদের কাছে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ খোলা রইলো। তাদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম যে দেশেই দেখা দেবে সে-সব দেশের প্রতি সহায়ক হস্ত প্রসারিত হবে, ঘোষণার এটিও একটি মূল কথা। (৩) আর 'সমাজবাদে উত্তরণের পৃথক পথ' ত্যাগ রইলো। কিন্তু এই তৃতীয় ঘোষণাটি আর উচ্চবর্ত্ত রইলো না।

১৯৫৭-এর খসড়া ঘোষণায় অনেক রাষ্ট্রের কমুনিষ্ট পার্টি'রই মোহভঙ্গ হোলো। ১৯৫৬-এর পোলিশ অভ্যুত্থানের পর পোলাণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা গৌমলকা সে-সময় ক্রুশ্চেভকে অগ্রাহ্য করেও কমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। গৌমলকার ধারণা ছিল, ১৯৫৭-এর আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট সম্মেলন সোভিয়েত রুশের বহুকঠিন বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্তি পাবার সুযোগ। অস্বাস্থ্যবান রাষ্ট্রের কমুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে পোলিশ কমুনিষ্ট পার্টি'কেও এনে দেবে। এবং এই বিষয়ে তার প্রধান সহায়ক হবে স্বয়ং মাও-সে-তুং এবং চীনা কমুনিষ্ট পার্টি। কারণ, ১৯৫৬তে পোলাণ্ডের অভ্যুত্থানের সময় সোভিয়েত রুশের সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে মাও-সে-তুং-ই ক্রুশ্চেভকে বিরত করেছিলেন, মলোটভ প্রমুখ স্ট্যালিনবাদীদের প্ররোচনা সত্ত্বেও। মস্কো ঘোষণার খসড়ায় অপর কমুনিষ্ট পার্টি'র উপর সোভিয়েত

কমুনিষ্ট পার্টি'র আধিপত্যের কড়াকড়ির প্রত্যাবর্তন দেখে আশাহত গৌমলকা চীনা নেতাদের কাছে খসড়াটির প্রয়োজনীয় সংশোধনের জ্ঞাত আবেদন জানালো। অস্বাস্থ্য সমমতাবলম্বী কমুনিষ্ট পার্টি'র নেতাদের কাছেও তারা এ-আবেদন নিয়ে হাজির হোলো। কিন্তু এই খসড়ার পেছনে মাও-সে-তুং-এর পুরোপুরি সমর্থন দেখে গৌমলকার মোহভঙ্গ হোলো।

খসড়া ঘোষণায় আর একটি উপসর্গ যুক্ত হয়ে কয়েকটি দেশের কমুনিষ্ট পার্টি'র আর এক ধরণের উদ্বেগের কারণ হল। কমুনিষ্ট আন্দোলনে 'গৌড়াপন্থী' বা 'dogmatism'-এর এবং 'সংশোধনবাদ' বা 'revisionism'-এর বিরুদ্ধে নতুনভাবে সতর্কতার ডাক দেওয়া হল। এই দুইটি মনোভাবাপন্নদেরই জবজ্বলন্ত অন্তর্ভুক্তিরূপে চিত্রিত করা হলেও, তৎকালীন পরিস্থিতিতে 'সংশোধনবাদ' বা revisionism-কে আশু এবং অধিকতর বিপজ্জনকরূপে চিহ্নিত করা হোলো।

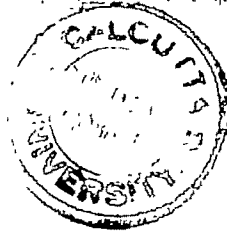
পূর্বে 'সংশোধনবাদ'-এর উদ্ভব আলোচিত হয়েছে। ১৯৫৭-এর ঘোষণায় 'সংশোধনবাদ'-এর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে প্রোলিটারিয়ান-বিপ্লবের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা যে সব সংস্কার-মূলক আন্দোলন অস্বীকার করে তারা লেনিন-ভাষের বিরোধী সংশোধনপন্থী।

'গৌড়াপন্থী' বা 'dogmatism' শব্দটি আরও গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবিত হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির প্রাণে বলশেভিক নেতাদের মার্ক্সীয় ভঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে

সমসাময়িক সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হয়। এই অ-মার্ক্সীয় পন্থা অমুসরণকে যারাই সমালোচনা করেছেন, তাদের ওপর ‘গোড়াপন্থা’ বা ‘dogmatism’-এর কালিমা আরোপ করে ঘায়েল করবার চেষ্টা হয়েছে। বিপ্লবের পর ‘War Communism’-এর নামে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছিল লেনিন বুঝতে পারলেন তাতে বিপ্লব বিপর্যস্ত হবে। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে কম্যুনিজম-এর তাত্ত্বিক পথ ছেড়ে পরিস্থিতির সঙ্গে আপস করতে হয়েছিলো। ফলে ব্যক্তিগত মালিকানাতে পুনরায় প্রাধান্য দিয়ে তাকে ভেঙে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সামলাতে হয়েছিলো। লেনিনের এই নূতন ব্যবস্থা নামাঙ্কিত হয়েছিলো ‘নূতন অর্থনৈতিক নীতি’ বা ‘নিউ ইকনমিক পলিসি’ রূপে সংক্ষেপে ‘নেপ’ বা ‘NEP’। এই ‘নেপ’ মার্ক্সীয়ত্বের স্বপ্ন বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু লেনিন একেই পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্ক্সীয় তত্ত্বের নবায়ন বলতে চেয়েছেন। আর যারা লেনিনের এই ব্যাখ্যা স্বীকারে অপারগ ছিলেন তাদেরই ওপর ‘dogmatism’-এর কালিমা লেপন করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা মার্ক্সবাদের বিস্তৃত ধ্বজাধারারূপে নিজদের অভ্যন্তর ব্যাখ্যাতার স্থান গ্রহণ করেছেন, তাদের সঙ্গে সহমত না হলেই সেই সব বিরোধীদের ‘dogmatism’-এর তীব্র কটুক্তি ও প্রেষণের সম্মুখীন হতে হবে। আর তারই আড়ালে চলেছে নেতার খোঁচাচার। স্ট্যালিনের আমলে স্ট্যালিনমোস্তর কালে এই শব্দটির বহুল ব্যবহার হয়েছে, নেতাদের অভ্যন্তর মার্ক্সবাদী, লেনিনবাদী

সমপ্রমাণ করবার জন্য। স্ট্যালিন ত্রিশ দশকে জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টির দফারফা করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী চুক্তি করেছিলেন—সোভিয়েত রুশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য। এই ঘটনাগুলি সম্পাদিত হয়েছিল মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক দোহাই দিয়ে। অথচ মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল এই ঘটনাগুলি। আর যারা এই কাজের সমালোচনা করেছেন তাদের ‘dogmatism’-এর অপবাদ কুড়িয়ে স্ট্যালিনের বিরোধ-ভাজন হতে হয়েছে। চীন রুশ স্বপ্নে dogmatism শব্দটি একটি নূতন ব্যাঞ্জনা নিয়ে এলো। সোভিয়েত রুশ নেতৃত্বের বিপ্লব থেকে বিচ্যুতি, ‘পু’জিবাদের সঙ্গে সহঅবস্থান নীতি এবং ‘মুজু’ আর অনিবার্য নয়’—এই নীতিগুলির বিরোধিতার অপর নাম হলো ‘dogmatism’। রুশ-চীন স্বপ্নে এই বিরোধ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ‘dogmatism’ শব্দটিও চীনের প্রতি তীব্রতরভাবে আরোপিত হতে শুরু করলো। তবে গোড়ায় সরাসরি নয়, প্রচ্ছন্নভাবে। চীনের ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গেছে, সোভিয়েত রুশকে সংশোধনবাদের অভিযোগে আক্রমণ করতে হলে যেমন চীন সোভিয়েত রুশের বেনামদার হিসেবে যুগোস্লাভিয়াকে আক্রমণ করতো, তেমনি সোভিয়েত রুশও চীনের উপর ‘dogmatism’-এর অভিযোগ আরোপের জন্য চীনের বেনামদাররূপে আলবেনিয়া ও তার নেতা হোজাকে বেছে নিলো।

‘সংশোধনবাদ’ বা ‘revisionism’-কে আত্ম



এবং অব্যবহিত অন্তঃশক্তিরূপে ১৯৫৭-এর মস্কো সনদে চিহ্নিত করায় কোনো কোনো দেশের কম্যুনিষ্ট নেতাদের আঁতে ঘা লাগে। পোলাণ্ড, ইতালী এবং যুগোস্লাভিয়া তো বটেই—তাদের অন্তঃশক্তি। পোলাণ্ডের গোমুলকা, ইতালীর তোগলিয়াত্তি (Togliatti) কিম্বা যুগোস্লাভিয়ার টিটো—এরা সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির বাঁধানো তাত্ত্বিক সড়ক দিয়ে চলতে রাজী নয়। যুগোস্লাভিয়ার টিটো তো বহু পূর্বেই নিজের দেশের জন্য পৃথক তাত্ত্বিক পথ কেটে নিয়েছেন, স্ট্যালিনকেই অগ্রাহ্য করে, ক্রুশ্চেভ তাকে আবার তোয়াজ করে দলে ভিড়তে চাইছেন। কিন্তু মস্কো নিরপেক্ষ যে স্বাধীনতা রয়েছে টিটোর, তা বর্জন করে কখনই নয়। চীনা কম্যুনিষ্টরা অবশ্য টিটোর যুগোস্লাভিয়াকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে সোভিয়েত রুশকে ‘রিভিসনিজমের কটুবাদে জর্জরিত করেছে। পোমুলকাও পোলাণ্ডকে যতটা সম্ভব সোভিয়েত রুশের খবদারী থেকে মুক্ত রাখবার সঙ্কল্প নিয়ে মস্কো সম্মেলনে হাজির হয়েছে। ইতালীয় কম্যুনিষ্ট নেতা তোগলিয়াত্তী বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু-কেন্দ্রিক ভঙ্গুর (‘Polycentrism’) জনক। বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি ‘সমাজবাদে উত্তরণের বিভিন্ন পথ নেবে—এই তত্ত্ব তোগলিয়াত্তীর মত তাত্ত্বিকদের কাছে অনেকটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। তাই ১৯৫৭র মস্কো সনদে ‘ডগম্যাটিজমের চাইতে ‘রিভিসনিজম’ আশু ও অব্যবহিত অন্তঃশক্তিরূপে চিহ্নিত করায় গোমুলকার মত তোগলিয়াত্তীও বিপন্ন বোধ করলো। তারাতো মস্কোর তাত্ত্বিক খবদারী থেকে যথাসম্ভব মুক্তি চায়, সুতরাং মস্কো-ঘোষণার তাত্ত্বিক বন্ধন যদি আরও মস্কো-কেন্দ্রিক হয় তবে গোমুলকা—

তোগলিয়াত্তীর নিজ নিজ পথে চলার উত্তোগ তো ‘রিভিসনিজম-এর দায়ে পড়বে। তাই মস্কো সম্মেলনের সনদের শাসনের বাক্যকে ‘রিভিসনিজম’ এর পরিবর্তে ‘ডগম্যাটিজম’-এর ওপর বর্তানোর জন্য গোমুলকা—তোগলিয়াত্তীর উৎকণ্ঠিত তত্ত্বের চপে, যুগোস্লাভিয়াও তাদের সময় দেয়। মস্কো সম্মেলনে তোগলিয়াত্তীর ‘Poly-Centrism’ বা বহুকেন্দ্রিক তত্ত্বের বিড়ম্বনায় করাণী কম্যুনিষ্টরা কিন্তু খুশী হয়েছিলো। ঘোষণা সনদে ‘রিভিসনিজম-এর উপর বাক চীনাঁদের তাত্ত্বিক মতের পছন্দসই কথা। যুদ্ধের অনিবার্যতা, যুদ্ধ থেকে বিপ্লবের জন্ম এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কমতাদখল—খাঁটি মার্ক্সবাদী তত্ত্বের পর পর এই ধাপগুলি চীনা কম্যুনিষ্টদের চোখে স্বস্তি:সিদ্ধ ঘটনা। এই পারস্পর্য থেকে িচুটিই ‘রিভিসনিজম’। মস্কো ঘোষণা সনদে ‘রিভিসনিজম-এর উপর বাক্যে চীনা কম্যুনিষ্টরাও নিশ্চিন্ত। তোগলিয়াত্তী—গোমুলকাদের খাতিরে তো মাও-সে-তুংকে অখুশী করা যায় না। ক্রুশ্চেভ ও তার সহকর্মীরা কেমন করে ভুলবে ১৯৫৬-র পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীর সঙ্কট থেকে মাও-সে-তুং ও চীনা কম্যুনিষ্টরা তাকে পরিত্রান করেছে আর ১৯৫৭-এর মস্কো আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সমাবেশে ঘোষণা সনদের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রুশের নেতৃত্বের নিঃশব্দ পুনঃ প্রতিষ্ঠা মাও-সে-তুং-এর—নিঃশব্দ সমর্থন ছাড়া সম্ভব হতো না। কিন্তু ১৯৫৭র মস্কো সমাবেশে রুশ-সোভিয়েত মিতালী নিতান্তই তাৎক্ষণিক। এই দুই শক্তির কম্যুনিষ্ট পার্টির পারস্পরিক বিরোধের বীজ ঘোষণা সনদে যেমন নিহিত ছিল, তেমনি দুই পক্ষের ভাষণেও তার সুস্পষ্ট ইসারা ছিল। দুই পক্ষই হয় তা বুঝতে পারেন নাই, কিম্বা বুঝেও চোখ ঠেঁরে সাময়িক মিতালীকে বেশী মূল্য দিয়েছেন। (ক্রমশঃ)।

দাদার জীবন পূর্ণতার সাধনার জীবন

কণেশ্বর ঘোষাল

জীবন বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের কাছে অর্থাৎ দাদার কাছে যখন আমাদের আসার সৌভাগ্য হ'ল তখন অগ্নিযুগ পার হ'য়ে গেছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনও শেষ পর্বে উপনীত। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে দাদা ১৯৪৬-এ ব্রিটিশ জেল থেকে মুক্তি পেলেন। I. N. A. এর বিচার পর্বেরও শেষ হয়ে আসছে। আসন্ন হিমালয় নেতাজী আর তাঁর INA এর প্রভাবে ভারত ইতিহাস আচ্ছন্ন... দেশ দাঁড়িয়েছে আর এক বিপ্লবের মুখোমুখি কিন্তু হয় ভারতবর্ষ। সেদিন ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে আপোষে কমতা হস্তাক্ষরের প্রত্যাশায় ভারতের নেতৃবৃন্দ উৎকণ্ঠ। সুভাষচন্দ্র দেশভাগ রোধের ডাক দিলেন—তাতে দেশ কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। I. N. A. এর প্রভাব ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, যে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল—তা প্রচারিত হ'ল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। অতীতের সমস্ত প্রতিশ্রুতি, জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা ও মূল্য বোধ যেন বিসর্জিত হ'ল। ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে গেল।

এমন একটা বিপর্যয়ের সময়ে আমরা—তখন কলকাতা ছাত্র—দাদার কাছে—আনাগোনা করছি।

কিসের আকর্ষণে জানিনা—উজ্জ্বলিত মনে দাদার কথা, আলোচনা নির্দেশ শুনি। আলোচনার অধিকাংশই বুঝি না তবুও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি।

ইতিপূর্বে আমরা কিছু সেবার কাজ, মঠ-মিশনের কাজে জড়িত ছিলাম, রাজনীতি এড়িয়ে চলতাম। একদিন সন্ধ্যায় ছাদে গিয়ে দাদা বললেন... সেবার কাজ, ধর্মের অনুশীলন এসব আছে। তবু শুধু তাই দিয়ে ভারতবর্ষে যে জড়বাদের চেউ আসছে তাকে ঠেকানো সম্ভব হবে না—জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর মুখোমুখি হতে হবে। জীবনে idealism এর সঙ্গে realism কে যুক্ত করতে হবে... যাকে বলে idealistic realism বা realistic idealism ... শুনিলাম। আলো আঁধারের দৃশ্য জাগে মনে কিছু বুঝি অধিকাংশই ধরতে পারি না।

ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার দিন ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট। সেটি স্বাধীনতার দিনও—খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। কলকাতার বুকোও আনন্দের জোয়ারে চতুর্দিকে উল্লাসের ধ্বনি ভেসে আসে—বেলেঘাটায় তখনও দাদার আশ্রিত ছিলে দলে দলে সজ্জিত লরীতে লরীতে মানুষের জোয়ার—উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস ও জ্ঞানগানের ধ্বনি—শুভগর্ভ জ্ঞানগান উঠছে 'হিন্দু-

মুসলিম ভাই ভাই' বেন এক বেদনাময় হাহাকারের মত, শোনাচ্ছে।

দাদার মন বেদনাগ্রস্ত নির্দেশ দিলেন—এই কলকাতার বুকের উপর প্রতিবাদ মিছিল করতে হবে। আমাদের নির্বাক প্রতিবাদ মিছিল হাঞ্জরা-পার্ক থেকে বের হয়ে উদ্ভাস্ততা, শ্লেষ উপেক্ষা করে—নেতাজী ভবনে গেল। আমরা নূতন চিন্তার প্রাস্তরে উপনীত হলাম। চিন্তার রাজ্যে এক গভীর স্বাতন্ত্র্য ও প্রত্যয় জাগ্রত হ'ল। মনে হ'ল আমাদের লক্ষ্য ও পথ সাধারণ নয়—সহজও নয়।

দেশভাগ সমস্কার সমাধান করেনি বরং তা বাড়িয়ে তুলেছে। পাঠচক্রের মাধ্যমে তিনি আমাদের অনেক না বোঝা বিষয় পরিষ্কার ক'রে দিতে সচেষ্ট হ'লেন।

দেশভাগের পরিণতিতে আমাদের নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে তা বলতে বলতে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে যেত।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুণ্ঠনে দেশ হ'ল কতবিকৃত। তখন নরনারী বারা ভারতবাসীই ছিলেন তাঁরা আশ্রয় প্রার্থী হয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হ'লেন। দেশভাগের পর বারা এদিকে চলে আসবেন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য ইতিপূর্বে বিভিন্ন সভায় নানা প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছিল কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রাখতে কেউ এগিয়ে এলেন না। আমাদের সংগঠনের পক্ষে এই বিশাল সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। তবুও দাদা স্থির থাকতে পারলেন না। হৃদয় সাহসে East Bengal

Minority Relief, Welfare [Central Committee সংগঠনের মাধ্যমে সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্যাম্পে ক্যাম্পে আমাদেরও কাজ পড়ল। সে সময় দাদা ও দিদির যে ব্যাকুলতা, উদ্বেগ ও সমস্কার সম্মুখীন হওয়ার বিপুল সাহস লক্ষ্য করেছি তা আমাদের জীবনে গভীর চিহ্ন একে দিয়ে গেছে এরা তাঁদের জীবনের এক নূতন দিক আমাদের মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে হিন্দু-মুসলিম নিবিশেষে বিপন্ন মানুষ ও সাধীদের উদ্ধারে দাদা-দিদির মত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কার্যে এগিয়ে যেতে দেখিনি অন্য কোনও নেতাকে।

দেশের এই দুর্ভোগের ঘনঘটার মাঝে দাদার কাছে তার নির্দেশিত কিছু কিছু কাজের জ্ঞান প্রায়শই যোগাযোগ ঘটত। তখনও আমাদের পাঠ্যদশা ও রাতের ক্লাস সেরে ৪৭ এ রাসবিহারী অভিজ্ঞ হ'য়ে বাসায় ফিরতে দেয়া হ'ত। দাদার মন কেমন ক'রে জানতো, বেশী রাতে বাসায় ফিরে, বিশেষতঃ শীতের দিনে, ছেলেটিকে ঠাণ্ডা খাবার খেতে হয়। জিজ্ঞাসা করেছেন; উত্তর দিতে লজ্জা বোধ করেছি। এমন এক রাতে একটু বেশী দেয়া হ'য়ে গেছে...নৌচে সিঁড়ি বেয়ে বাবার উঠোনের সময়...পাশের ঘরে ডাক পড়ল। সভয়ে ভিতরে গিয়ে দেখি দিদি স্বয়ং গরম খাবার দিয়ে শীত খেয়ে নিতে বললেন। যার কাছে যেতে ভয় করত তাঁকে দেখলাম অল্পপূর্ণার মত। মন বিপুল বিশ্বাসে সভয় প্রজ্ঞায় আবৃত হয়ে গেল। দিদি আমার

হৃদয়ে মা হয়ে উঠলেন। দাদা ছিলেন আমাদের নতুন জীবনের জনক আর দিদি ছিলেন জননী। এমনি করে আমরা কয়েকজন অর্বাচীন ছাত্র জনক-জননীর প্রীতিতে, শিক্ষায়, প্রয়োজন হ'লে তড়িনায় ... বেড়ে উঠতে লাগলাম। জনক জননী সম্পর্কে নতুন নতুন পরিচয়ের বিষয়ও বাড়তে লাগল।

অনেক জিনিষ জনকজননী আমাদের দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন...কিন্তু সে সব গ্রহণ করার মত কমতা আমাদের ছিল না। উপরন্তু তার জন্তু একটা সময় ও বয়সও আছে। বিরাটকে কিছুটা বুঝতে হলেও একটা মানসিক প্রস্তুতি ও বোধের প্রয়োজন এবং তার জন্তু দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলনও অপরিহার্য।

দাদা জানতেন...ছেলেদের মনে আদর্শের সঞ্চার না হলে তাদের বাস্তব কাজের ভিত্তি হয় নড়বড়ে। কাজের জন্তু আন্তরিক উত্তম ও নিষ্ঠা, আদর্শ থেকেই উৎসারিত হয়।

তাই দেশের স্বার্থোগণ্য পরিবেশে তিনি যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সেবার কাজে জড়িয়ে ছিলেন তেমনি ideological অর্থাৎ আদর্শগত কাজ ও সমানতালে চলতে লাগল। দেশে দারিদ্র, কৃষিশিল্পের সমস্যা, বেকারত্ব, তার উপর বাস্তবহারী সমস্যা—যা দেশভাগের পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়, প্রতিদিন প্রাকট হতে লাগল। দেশের চিরায়ত প্রমুখা, আর আদর্শবাদ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ'ল। ...এ সময় দেশের মেতৃষে এমন বৃগুকৃষদের প্রয়োজন যারা সকলভাবে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন।

এই সময়ে দাদা, জনতার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে ছড়িয়ে দেবার বিপুল প্রচেষ্টা চালালেন। তাঁর বিদগ্ধ লেখায়, গানে, কবিতায়, বক্তৃতায় রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তার প্রকাশ হতে লাগল। নানরূপ প্রতিকূল অবস্থাকে তিনি যেন তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে লাগলেন।... এখানে বলে রাখা দরকার দাদা তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্বাভাব্য পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এবং সেজন্যই তিনি সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হয়ে Forward bloc এর মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হন। বিশ্ব যুদ্ধ শেষে জেল থেকে বের হবার পর এ কাজকে এগিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর হন।

আমরা ইতিমধ্যে তাঁর Party & Leadership পেয়ে গেছি, Social Dynamics সম্পর্কে তাঁর চিন্তার রূপরেখা দিয়েছেন। জয়প্রীতেও মানা বিদগ্ধ লেখার মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে রূপ দিতে সচেষ্ট হ'লেন।

নেতাজীর ডাক বৃত্তানাট্য রচিত হ'তে লাগল। নেতাজীর আদর্শকে জনতার ছায়ায় পৌঁছে দিতে হবে। অনেক গান রচিত হ'ল তাতে সুর যোজনা করলেন সুরকার কবি অনিলচন্দ্র। সুভাষ দর্শনের রূপকার গানের মধ্যেও সে দর্শনের বিকাশ ঘটালেন। ভারতের অতীত প্রমুখের সঙ্গে বর্তমানের সমন্বয়, একদিকে চিং ও অন্যদিকে কজের সমন্বয় ঘনিষ্ঠ হ'ল।

সঙ্গীত হ'ল—

ওরে আধুনিক, ওরে ও প্রাচীন
কেহই চরম কেহ চূড়ান্ত নয়,
কালের বীণায় বাজে বিচিত্র

জীবনের বাণী নূতন সম্বয়।'

আবার বললেন,—

জয় হোক চির উর্ধ্বলোকের অদম্য পৃথিবীর।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে রচিত গানের মধ্যে—
বললেন—

কভু রুদ্র পঙ্কীর ছন্দ ভয়ঙ্কর

কভু যুগ যুদ্ধ প্রেমের বাণী

কভু হৃৎকের মিলনমন্ত্র মনোহর—

দূর অতীত হতে দাও আনি।'

অতীত থেকে বর্তমানে ভারতের বিপ্লবী সত্তার অভিযাত্রা... দাদার জীবনে সে অভিযাত্রা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে জনতার রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। কিশাণ মজদুর প্রজারাজ সংগঠিত হবে ভারতের বুকে—অতীত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। গানে-গানে তার রূপরেখা রচিত হলো। এমনি করে নূতন আদর্শ ও সুভাষ দর্শন প্রচারের গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করে চললেন।

শুধু গান ও সুর রচনার মধ্যেই নয়, নিজের প্রায়ই রিহাসেলে উপস্থিত থেকে খুঁটিনাটি দেখিয়ে দিতেন। তাঁর উপস্থিতির গাভীর্ষ প্রতিটি রিহাসাল আসরে এক বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে আসত।... দাদার নির্দেশে শিল্পীরা হ'লেও শিল্পীদের সাথে গলা

মেলাবার জন্তে আমাদেরও রিহাসেলে যোগদান করতে হ'ত। গানের চাইতে দাদার সান্নিধ্যই আমাদের কাছে সম্ভবতই আকর্ষণীয় ছিল। এমনি একদিন বালীগঞ্জের এক বাড়ীতে নেতাজীর ডাক রিহাসালের আয়োজন হয়েছে। দাদা একটু আগেই এসে গেছেন। আমি কিন্তু পরেই উপস্থিত হয়ে দাদাকে তন্ময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে পিছন ফিরে আমায় দেখে বললেন—'দেখছ কৃষ্ণের ছবিখানা কি সুন্দর! সম্মতি সূচক মাথা নাড়লাম বস্তুত দেখছিলাম দাদাকে। ভারতের এই বিপ্লবী নেতার তন্ময়তা গীতার কৃষ্ণের ছবির মধ্যে যেন ভারতের শাস্ত সত্তার ভিতরে, তার ঐতিহ্যধারার মধ্যে আত্মপ্রবেশ করেছিল। দাদাকে আবার নূতন ভাবে দেখলাম।

যাই হ'ক নেতাজীর ডাক মঞ্চ হ'লে রাজনৈতিক মহলে সাড়াপড়ে পেল এবং বিভিন্ন স্থান থেকে সেই নৃত্যনাট্য পরিবেশনের জ্ঞান জিজ্ঞাসাবাদ আসতে লাগলো। পরবর্তীকালে দাদার তৈরী স্বরলিপিসহ নেতাজীর ডাক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে সুভাষ দর্শনকে, এমন ক'রে যে প্রকাশ করা যায়, নেতাজীর ডাক না দেখে, না পড়ে, তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ছিল।

সুভাষদর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাঠচক্র হ'য়েছে। শিল্পীদের তাগিদে ক্ষত নেতাজীর জীবন-বাদ, প্রকাশিত হ'ল। এতদিন দেশে সুভাষদর্শনের সংগঠিত রূপ ছিল না। করোয়ার্ড রকের ভিতরে ও

নেতাজীর জীবনদর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হ'চ্ছিল। এই পুস্তক প্রকাশের পর স্মৃতিচারণের প্রামাণ্য পুস্তক মানুষের হাতে এল। দাদা দেশের ও আমাদের অর্থাৎ যারা স্মৃতিচারণ অমুরাগী মনে করি তাদের...এক বিরাট অভাব পূরণ করলেন। বস্তুতঃ অনিলচন্দ্র স্মৃতিচারণের রূপকার। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখলেন :

“বর্জন বা বিরোধ নয়, গ্রহণ এবং সংহতি সাধনই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মন্ত্র। তাই বৈদিক উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধ, মুসলিম এবং খৃষ্টানী চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি মিলে মিশে গেছে এ দেশে। জাতিভেদ, আদিবাসী, অষ্ট্রিক, মোঙ্গলীয় যুরোপীয়, সারসেনী পারসিক সকল শ্রোতের সংগম ঘটেছে ভারতবর্ষে। কিন্তু সকল ধারারই মূল সূত্রেই মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক ও মানবিক প্রমূল্যের (values) জয়গাথা ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। কি ইসলামী, কি বৈদিক সকল সংস্কৃতির মূল কথাই এই অধ্যাত্মবোধ। শুধু জড়জীবনই নয়, শুধু ঐহিক ভোগই নয়, জীবনে ঐহিকের মধ্যে আত্মিককে ও জড়শক্তির মধ্যে চিত্ত-শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই দুয়ের সামঞ্জস্যই হ'ল ভারতের নিজস্ব বৈচিত্র্য। এই সামঞ্জস্য জড়-জীবনকে, ঐহিক ভোগ সম্বন্ধকে বাদ দেয় নাই।”

আবার ঘোষণা করলেন—“গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ ও ক্যাসীবাদ—এই তিনটি মতবাদ থেকেই নেতাজীর সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ পৃথক ও স্বতন্ত্র।...সমাজ-গঠন করবার দায়িত্ব যারা নেবেন, তাঁদের আজ নেতাজীর সমাজদর্শন বা Social Philosophy

বুঝতে হবে...।” আর নেতাজীর জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন—

‘স্মৃতিচারণের জীবন আদর্শে জাতীয়তাবাদ জীবন্ত সত্য এবং দেশপ্রেম অকাট্য বাস্তব।...এবং দেশপ্রেম ও জাতীয়তাকে স্বীকার করার অর্থই হ'লো মার্কসীয় আর্থিক ব্যাখ্যাকে বর্জন করা।...All power to the Indian people—এ শ্লোগান সমাজতন্ত্রেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। ভারতবর্ষ সমাজতন্ত্র চায়, মার্ক্সবাদ চায়না। এই নেতাজীর অভিমত।’

এখন মার্ক্সবাদ নয় কেন এর...দর্শনগত জবাবই চাই। এ-জবাবের বনিয়াদ তিনি ইতিপূর্বেই রচনা করেছেন ‘সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ গ্রহে।’ বাংলায় কেন সারা ভারতের কোন ভাষাতেই এমন পুস্তক আমাদের চোখে পড়েনি।

বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নাই... একে ব্যাখ্যা করে তুলে ধরেছেন ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’ গ্রন্থে (১৯৩৯ এ প্রথম প্রকাশিত হয়) হেগেলের দর্শন ও বিবর্তন ধারার সমালোচনা করে লিখলেন হেগেলীয় দর্শন এবং মার্ক্স মর্গানী মতবাদের তীব্র সমালোচনা করলেন—বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ শীর্ষক রচনায়। ‘হেগেলীয় দর্শন ও বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ’ রচনা দুটি জয়শ্রীভে-ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়—আমরা যারা তাঁর নির্দেশিত পথ গ্রহণ করতে সচেষ্ট বলে মনে করি—তাদের পক্ষে পুস্তক দুটি প্রকাশিত না হ'লে বিপুল ব্যর্থতা প্রকটিত হবে। দাদার লেখা What Netaji Stands for নামে একটি ইংরাজী

১৬০ জয়ন্তী, মার্চ ১৯৮২

পাশাপাশি নবজি হানসার চাতক '...নবজি হানসার
পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। এই ভাবে দাদা একটি
—নবজি হানসার চাতক
পূর্ণাঙ্গ Social Philosophy গড়ে তুলেছেন।
বহুত বালার বিপ্লবী ইতিহাসে তিনি একটি
অনুষ্ঠান চিন্তাধারা 'a school of thought' এর
উদগাতা পুরুষ।
শুধু দর্শনের দিক দিয়েই নয়। তিনি স্বাধীনতা
উত্তর রাজনৈতিক পন্থার দিকদর্শন রচনায় নেতৃত্ব
দিয়েছেন কারোয়ার্ড ব্রকের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে
এই সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করতে ইচ্ছা
করি। মুদ্রাদানে এক ১৫ই আগস্টের মিটিং-এ
তখনকার কারোয়ার্ড ব্রকের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব
এসেছেন—সাংগঠনিক দায়িত্ব রয়েছে দাদা-দাদির
উপর। কিন্তু সভারস্তে উপস্থিত গান চাই।
শিল্পীরা গানের জন্ত ৪৭ এ বাসবিহারী এভিনিউর
বাগান উপস্থিত তা শিল্পীদের মধ্যে আমারও
স্বাধীনতা ডাক পুঙ্খ। দাদা সঙ্গীত রচনা করেছেন
সুকে মাত্র সুর তখনও সব হয়নি। সেদিন এক
ছাত্র আশ্চর্যজনক ঘটনা লক্ষ্য করেছি—গান রচনা
করেছেন উত্তে বড় গান—সঙ্গে সঙ্গে সুর আরোপ
ও নকলছেন—আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন—আবার
পারেন শাইনের সুর যোজনা করছেন—অপূর্ব
melody এত ক্ষুদ্র সুর রাজ্যে নিমগ্ন হয়ে গেছেন
—কিন্তু গানের মধ্যে আমাদের গান তুলে দিয়ে
মুদ্রাদানে চলে গেছেন সভায় যোগ দান করতে।
ইংরেজী ও সংস্কৃত সহ দাদা অনেকগুলি ভাষা
জানতেন শুধু জানার জন্ত জানা নয়—সব ভাষাতেই
তার বিশেষ অধিকার ছিল—হিন্দিতে উত্তে বড়তা

করতে, এবং রচনা ও গান লিখতে পারতেন সহজ-
সহজভাবে। বাংলা ভাষার তার যে পাণ্ডিত্য, দাদার বিদগ্ধ
বাংলা রচনাগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। অনিল
চন্দ্রের সাবিক বিপুলতাকে অনুভব করিও আমাদের
সাধ্য ছিল না।
আদর্শ রূপায়নের কাজে চাই মানুষ—সে মানুষ
তৈরীর কাজ বিপ্লবী যুগের প্রারম্ভ থেকেই দাদা
গ্রহণ করেছিলেন। এই মানুষ গড়ার কাজে স্বামীজীর
জীবনে এক লক্ষ্য হিসাবে দেখা দেয়—বলেন
'man making is my mission.' সুভাষচন্দ্র
তার মেদিনীপুর ভাষণে (২৯.১২.২৯) বলেন—
'নতুন মানুষ তৈয়ারী করার চেষ্টায় আমি এখন
নিরত।'
দাদা চাইতেন বিপ্লবের কাজে ভাল ছাত্রদের
সংগ্রহ করতে—কারণ একাজে একাধি অমুশীলন
প্রয়োজন—বিপ্লবের দর্শনও বুঝতে হয়। কিন্তু
মুখল এই ভালছাত্ররাই বেশীর ভাগ carcerist
বা উচ্চপদাকাজী হয়ে পড়ে এবং পর বোপ্যতার
পরীক্ষায় তাদের সকলতা এর সপক্ষে যায়। ভাল
ছাত্রদের তিনি আহরণ করেছেন এবং বিপ্লব মঞ্চে
দীক্ষিত করে তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন
এক কঠিন পরীক্ষা। আমরা জানি এ বিষয়ে তার
কৃতিত্ব কতখানি পরবর্তীকালে সেই কৃতি পুরুষদের
দান আমাদের জাতীয় জীবনে কত মূল্যবান হয়েছে।
শুধু মাত্র ভালছাত্রদেরই নয়—আমাদের মজ
কুড়দেরও তিনি উপেক্ষা করেননি কলিক পেরিয়ে
অর্থনৈতিক চাপে নানা জায়গায় চাকুরী খুঁজি

মর্দেব পাশে মরিয়ে রাখার সাধা ছিল না কারো।

লেখাগুলি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সুভিপ্রদর্শ।
 প্রতিটি লেখার সঙ্গে তাঁর একান্ত আত্মার আমাদের
 জীবনকে আকর্ষণ করে। তবুও শুধু লেখার মধ্যে
 রঙভিত্তিক চাকচাক্য রাত (৩) বর্ণমালা । ফাট

। एक राजकपडि, खिछीइयइ

ନାକନୀଳେ ପ୍ୟାମି ଶ୍ରୀମ ନକ)

ମାତା ନାମ" ଡିପ୍ଟହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ୍ବରାଜ ହସାସ

সবশেষে বলতে চাই—দাদার জীবন পূর্ণতার

କଥା) **ଉଷା** ଶିଳ୍ପ ର' ଶିଳ୍ପୀ । ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ । ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ । ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ।
 ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପୀ

କିଂବା ଜାଲଗାନ୍ଧୀର ଘରୋଇ କାମକୁ ଚାହିଦା ନଈକରି
। ଚଢ଼କ

-ଚନ୍ଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଚନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନନ୍ଦନ ଚାକ୍ର ଚକ୍ର

न्यायसिद्धि कलौपाभास कोट इति—आकाश महत्त्व न्यायसिद्धि

। । न ह्यापे श्यते चान्ति नाह काश्चित् लक्ष्यं हिहिम

[illegible]

କୃଷ୍ଣ । ମହାମାତୃତ୍ବ 'ପ୍ର' ଭ୍ୟାଞ୍ଜିତ୍ବେନ ମଂଶୀନର୍ତ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି

৫৩০ সমাজ বিপ্লবে নারীর ভূমিকা

জয় করিবার অধিকার নিয়ে” নারীকে অগ্রসর হতে দেখেছি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী এক অভিনব জাতীয়তাবোধে বাংলা দেশকে প্রাণিত করেছিল; যার চেউ এসে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে। ঠাকুরবাড়ীর জ্যোতির্গুণে যে মহীয়সী নারীগোষ্ঠী লালিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী বেরিয়ে এলেন নারী জাগরণের প্রতিভুরূপে। তারপর এলেন নারীর বন্ধনযুক্তির সংগ্রামে তারই কন্যা সরলা দেবী ১৮৯৭ সালে কিন্তু তাঁর সে উদ্যোগ স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। তারপর দেখা পাই ভগিনী নিবেদিতার। ১৯০২ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নারীর বন্ধন মুক্তিসহ পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশকে মুক্ত করতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়েছিলেন।

১৯০৫ সাল ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সংগ্রামে, বয়কট ও অশেষীর জন্ম দিয়েছিল, যার প্রবল স্পন্দন প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে নারী সমাজকে “আপন ভাগ্য জয় করিবার” শক্তি এবং তাদের মধ্যে ইংরেজ শাসন বিরোধী মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের কালিমাহিন্ত্র দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের অমুপ্রেরণায় ঘরে ঘরে অরক্ষণ ও জাতিধর্ম নরনারী বয়স নির্বিশেষে রাধী-বন্ধন আদেশিকতার নূতন এক দিগন্তে নারী সমাজকেও প্রবলভাবে দেশপ্রেমের চেতনার উদ্বুদ্ধ করেছিল।

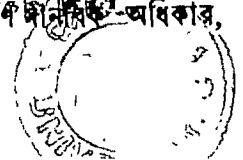
এই শতাব্দীর প্রথম দশকের বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আনি বৈসাস্ত ও লোকমাত

ভিলকের হোমরুল আন্দোলনের পর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে জনজীবনের স্তরে পৌঁছে দিলেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের অদ্বুতপূর্ব গণজাগরণ সহস্র সহস্র নিরক্ষর নারীকে—শিক্ষিত শ্রেণীর তো কথাই নেই—পার্বশ্র জীবনের নিরুপদ্রব সীমানা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্টকময় আজিনায় বার করে নিয়ে এল। তারা এক নূতন জগতকে দেখতে পেল। নারীর বন্ধন-মুক্তি জাতীয় মুক্তির সঙ্গে কতো ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ অসহযোগ আন্দোলন নারীর মনে সেই চেতনার স্পর্শ দিয়ে গেলো। এই সংগ্রামে নারীর বন্ধন মুক্তির সর্বোত্তম প্রতিভুরূপে দেশ পেলো গান্ধীজীর অন্ততম সহযোগী সরোজিনী নাইডুকে। অসহযোগ আন্দোলন অল্পকালেই স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্ত আন্দোলন জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে নারীর মুক্তির সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হবার পূর্বে বাংলাদেশ এক অগ্নিগর্ভে পরিষ্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। বাংলায় বিলাতী বস্ত্র বয়কট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। দেশবন্ধু সেই আন্দোলনের নেতা। স্বেচ্ছাসেবকরা পর পর কয়েকদিন গ্রেপ্তার হলে ১৯২১ এর ৭ই ডিসেম্বর দেশমাতা বাসন্তী দেবী, উমিলা দেবী, সুনীতি দেবীসহ বড় বাজারে নগ্নপদে খন্দর বিক্রয়ের সময় গ্রেপ্তার হন। সেদিন বাংলাদেশে এই একটি মাত্র ঘটনা দেশের বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে নারীনেতৃবৃন্দের পটভূমি তৈরি করেছিল।

১৭৬৩ নারীর বন্ধন মুক্তির বিপ্লব, জাতীয় মুক্তির
-বিপ্লব এবং সামাজিক বিপ্লব এই ত্রয়ী সংগ্রামের
ফলেই নারী নেতৃত্বের আত্মত্যাগে মুক্তির দ্বার
১৭৬৩ নারীর আত্মত্যাগে সামাজিক বিপ্লব এবং জাতীয় মুক্তির
ফলেই নারী নেতৃত্বের আত্মত্যাগে মুক্তির দ্বার

১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পক্ষ থেকে পশাণাশি গঠনমূলক
সংগ্রামের প্রস্তাব প্রদানের পরে সংগ্রামের কাজ করে গেছেন।
ভারতবর্ষের নারী সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে
তিনি এক জন সুনামের গঠন ও সংগ্রামের
এই দৈতরূপকে তৈরিকারী যেন রূপ দিয়ে গেছেন
আজও সমাজ বিপ্লবের অঙ্গীকার নিয়ে অনেক
অবরোধ, অনেক অসুবিধা, নারীর আত্মত্যাগ ও
সুদূর আত্মমর্ষাদাখ্যেই এই সংগ্রামের অঙ্গীকার
দেশ স্বাধীন হবার পর নারীর দৈনন্দিক জীবন
চলেছে কিন্তু সে জীবনাত্মক বস্তুর সামাজিক নয়
মাত্র, অর্থনৈতিক, মানবিক, নারীর অসুবিধা
তার দৈনন্দিক জীবনেই রয়েছে গেছেন নারীর প্রতি
বৈষম্যমূলক আটপাড়া নারীর অধিকার, পরিবার ও



১৬৬ জয়ন্তী, মার্চ ১৩৮২

সমাজের সর্বোপরি জগতের কল্যাণের পরিপ্রস্তু—
একথা নারী পুরুষকে সমানভাবে উপলব্ধি করতে
হবে, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও
সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের সংগে সমানভাবে নারী
অংশ গ্রহণ করতে পারলে—দেশ ও মানবতার
সেবায় নারীর কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ
পেলে দেশ ও জগতেরই কল্যাণ হবে—এই চেতনা
নারী পুরুষকে সমানভাবে অনুভব করতে হবে।

ভারতবর্ষের সমাজ বিপ্লবে নারী নানা বন্ধন-
শীড়নের অবরোধ ডিঙ্গিয়ে পুরুষের পাশে এসে
দাঁড়িয়েছে—তৎসঙ্গেই সেই নারী পুরুষকে সমবেত-
ভাবে অসমাপ্ত সমাজ বিপ্লবকে সার্বক করে তুলতে
হবে তবুও শেষ প্রশ্ন থেকে যায়। নারী কি চায় ?
পুরুষের সমকক্ষ না নারীর ব্যক্তি জীবনের ও ব্যক্তি

জীবনের সামগ্রিক পরিপূর্ণতা। পুরুষের সমকক্ষ
হয়েও নারী জীবনের পরিপূর্ণতা খোঁজেন এমন
দৃষ্টান্ত আমরা দেখছি। আজ আন্তর্জাতিক নারী-
বর্ষে সামাজিক জয়যাত্রার মধ্যে নারীকে আত্ম-
আবিস্কার করতে হবে—নারীর সবচাইতে বেশী করে
প্রয়োজ্য নিম্নে—জানা—উপনিষদের সেই বাণী
“আত্মানং বিজি” নিম্নে—জেনে সমাজ বিপ্লব তাই
আমি বলি আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের জয় ধ্বনি হোক
“আত্মানং বিজি”।

* ১৯৭৫ এর ১৫ই ডিসেম্বর রামকৃষ্ণমিশন
ইনস্টিটিউট অফ কালচারেল সহযোগে জাতীয় মহিলা
সংহতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত “সমাজ-বিপ্লবে নারীর
ভূমিকা” শীর্ষক আলোচনা-চক্র, জাতীয় মহিলা
সংহতির পক্ষ হতে উপস্থাপিত আলোচনা-পত্র।

জয়ন্তী প্রকাশনের ককেন্দ্রকতি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ

১ম খণ্ড ৯০০০ ২য় খণ্ড ১২০০০

ও ৩য় খণ্ড ১৩০০০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়

সাধারণ ২৫০০, বাঁধাই ৩৫০০

সুভাষচন্দ্র ও জাশনাল ম্যানিং

শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬০০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

Paper back 4/- Board 5/-

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

ঐ মহামানব আসে : চারণিক

৬০০০

NETAJI THROUGH

GERMAN LENS

Nanda Mookerjee

১২.৫০

রামমোহন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

৪০০০

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

অনিল রায়

৪০০০/৬০০০

বাংলাদেশের বিপ্লব

সুনীল দাস

১২৫০

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অনিল রায়

২০০০

রিলকে জন্মশতবর্ষ : ১৯৭৫

আর্য দেব

রিলকের জন্ম ৪ ডিসেম্বর ১৮৭৫। এই স্মৃতি
মন্ডয় গভীর কবির কবিতায় আজো শ্রান্ত ক্রান্ত
পৃথিবীর জন্মে ছায়া আছে, ভালবাসা আছে।
প্রথম জীবনের নিঃসঙ্গ এই মানুষটি সারা জীবনই
নিঃসঙ্গ ছিলেন মনে মনে। তাঁর মা তাঁকে ছেলে-
বেলায় মেয়ে সারিয়ে রাখতেন, সেই মেয়েলি
শুষ্কতার হাতই ত আমরা দেখি তাঁর পরবর্তী-
কালের কবিতাবলীতে। আমাদের বাংলা কবিতায়
সেই শুষ্কতার হাত ছিল 'ধূসর পাতুলিপি'র কবি
জীবনানন্দ—সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে নিবিড়।
রিলকের কবিতায় উপমার ব্যবহার জীবনানন্দকে
অরণ্য করায়, রিলকে প্রচুর উপমা ব্যবহার করতেন।
তা ছাড়া তাঁর রচনায় নিজের বিশেষ বিশেষ
অনুভূতি বোঝাবার জন্মে নানাভাবে—থেকে, ব্যাখ্যা
করে, বহুদ্রব্য ব্যবহার করে, প্রশ্ন তুলে—তাঁর
কবিতার এক একটি লাইনকে টেনে নিয়ে যান।
ছন্দ, রূপকল্প ও বাক্যের যুগপৎ অস্তিত্বে এক নাটকীয়
প্রগাঢ়তার সৃষ্টি করেন তিনি। কবিতায় কথোপ-
কথনের ভঙ্গি মাঝে মাঝে ব্যবহার করে তিনি যে
সহজতা এনেছিলেন তার চরম বিকাশ আমরা
এলিয়টে দেখেছি।

মাঘ '৮২—৪

জার্মান সাহিত্যের এই লিরিক কবি কবিতাকে
নিজের ধর্মবিশ্বাসের মত আঁকড়ে ধরেছিলেন। সারা
ইউরোপ ঘুরে বেরিয়েছিলেন তিনি। টলস্টয়ের
সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল রাশিয়ায়, আর রবীন্দ্র
সেক্রেটারি হিসেবে পারি-তে কাজ করেছিলেন এক
বছর (১৯০৫-৬)। ডুইনো দুর্গে অভিজাত সংসর্গে
তাঁর কিছুকাল কেটেছিল; যোগাযোগ ছিল
ভালেরির সঙ্গে। জীবনের প্রতি তাঁর একটা
মিষ্টিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাঁর চিঠিপত্রেও ব্যক্তিক
আনন্দের চেয়ে সেই রহস্যবাদ স্পষ্ট।

তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতাবলীতে (১৮৯৯-
১৯০৪) অভিজ্ঞতার গভীরে প্রস্তার অনুপ্রবেশ দেখা
যায়, দেখা যায় অগ্নিল নিবিড় মনোভঙ্গি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় (১৯০৬-২৬) বর্তমান
সভ্যতার সহরে সংস্কৃতির কুৎসিত দিকটার কথা
বলেছেন তিনি। সব কিছু থেকে যোগসূত্র হারিয়ে
কবি যেন শিল্পের জগতেই ডুবে থাকতে চাইছেন,
শান্তি চাইছেন।

অফিসুপের প্রতি চতুর্দশপদীগুলিতে (১৯২৩)
জীবনের নশ্বরতা, জীবন ও মৃত্যুর সহাবস্থান তিনি
স্বীকার করে নিয়েছেন—শিল্পই সেখানে একমাত্র

সাহস্রা। ‘ডুইনো এলিজি’ নামক দশটি শোকগাথায় সৌন্দর্যমূলক রহস্যবাদকে তিনি ব্যক্তিক উচ্চারণে সজ্জ করেছেন।

এই মহান কবির উদ্দেশ্য গল্পাঙ্গলে গল্পপুঞ্জের মতই এই সংখ্যায় তাঁর কয়েকটি কবিতার অন্তর্ভুক্ত দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এই জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রিলকে যে একজন সিরিয়স কবিই ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন সিরিয়স পরলেখকও ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটী জৈনিক তরুণ কবির প্রতি লিখিত দশটি চিঠির মধ্যে নটি চিঠির অন্তর্ভুক্ত। এই চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন কাপপুস নামক এক তরুণ কবিকে বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে। চিঠিগুলি সবই শিল্পী, শিল্পকর্ম, শিল্পের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কিত। স্বভাবতই একজন নিষ্ঠাবান কবির সুবিবেচিত বক্তব্য চিরকালের শিল্পকর্ম সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং এগুলি তাঁর কবিতা অনুশীলনেরও সহায়ক। তিনি লিখেছেন : “নিজের ভিতরে প্রবেশ করুন। আবিষ্কার করুন কোন্ সে প্রেরণা যা আপনাকে লিখতে প্রণোদিত করে।... স্বীকার করুন নিজের কাছে যদি লেখা বন্ধ হয়ে যায় আপনার মৃত্যু ঘটবে কি না।...সেই সব আজিক, যা অতিপরিচিত ও সাধারণ, প্রথমে পরিহার করুন। ...যেখানে সম্পন্ন ঐতিহ্য রয়েছে, যা অংশত উজ্জ্বল, সেখানে আর একটি মৌলিক সৃষ্টি বিশেষ কঠিন।...

অতরাং সাধারণ বিষয়গুলো থেকে তাদের দিকে ফিরুন, আপনার দৈনন্দিন জীবন যাদের যোগান দেয়। আপনারই সেদনা ও বাসনাকে রূপ দিন” (১৭. ২. ১৯০৩)।

কিংবা এই উক্তিগুলি : “শিল্পসৃষ্টি নিঃসীম নিভৃততার ফসল; সমালোচনা তার সন্নিকটে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না।” (২৩. ৪. ১৯০৩) “মৌমাছি যেমন মধু সংগ্রহ করে, আমরাও অনুরূপভাবে সব কিছু থেকেই মধুরতমকে আহরণ করি এবং তাঁকে সৃষ্টি করি” (২৩. ১২. ১৯০৩); “শিল্পও একটি জীবনযাপন প্রক্রিয়াই” (১৯০৮), ইত্যাদি—এই রকম অনুরূপ ও অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে।

সং কাব্য তথা সং শিল্প কী—যা ফ্যাশন-বহির্ভূত ও তাৎক্ষণিক বিস্তারপূর্ণের চক্কানিহীন নয়—সে সম্পর্কে এই সিরিয়স কবির মতামত প্রত্যেক পাঠকেরই ভাল লাগবে মনে হয়। এই চিঠিগুলির বর্তমান অন্তর্ভুক্ত নিঃসন্দেহে বাংলা অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যের সম্পদ বাড়ালো। এক্ষেত্রে আমরা অন্তর্ভুক্তককে অভিনন্দন জানাই।*

* রিলকের চিঠি জৈনিক তরুণ কবিকে, অন্তর্ভুক্ত রঞ্জু নাগ, ব্লক এ, প্ল্যাট ২ ; ১১ সেন্টার সিঁথি রোড, কলকাতা-৫০, তিন টাকা।

রিলকের কবিতা

অনুবাদ : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

যতবারই

যতবারই, যত ভাল করেই আমরা প্রেমের পটভূমি জানি না বেন
এবং শোকাকুল নামাঙ্কিত ঐ ছোট গির্জার প্রাঙ্গণ
এবং সেই ভয়ঙ্কর স্তম্ভ বাদ্যেখানে সকলেই শেষ হয়ে যায়
ততবারই, আমরা দুজনে এক সঙ্গে যাই

বুড়ো গাছগুলোর নীচে

গুয়ে পড়ি বারবার ফুলগুলির মাঝখানে

আকাশের মুখোমুখি হয়ে। ১৯১৪

নিষ্পাপ গাছগুলির পিছনে

নিষ্পাপ গাছগুলির পিছনে প্রাচীন ভাগ্য তার শব্দ মুখশানির

রূপ দিচ্ছে

বলিরেখা সেদিকেই যায়...

এখানে পাখির ডাক, ওখানে বেদনার রেখা।

কঠিন ভবিষ্যৎচক মুখ থেকে বারে।

ওঃ, প্রায়-প্রেমিকেরা

যেমন বিদায়স্বাপন ছাড়াও হাসে !

তাদের ভাগ্য তাদের ছাড়িয়ে ওঠে, অস্ত যায়

নক্ষত্রপুঞ্জিত, রাত্রিমখিত।

তাদের অভিজ্ঞতার কাছে যা এখনো নিম্নেকে সঁপে নি,

অর্গের পথে পথে বিচরণশীল

একটি বায়বীয় রূপ। ১৯১০

অফিউসের প্রতি চতুর্দশপদী : প্রথম খণ্ড : সাত

প্রশংসা, হ্যাঁ তা-ই, তাই। স্মৃতিকার ও আশীর্বাদকারী

সে এক খনিজ এসেছিল শাস্ত্র খনি থেকে
হৃদয় সে এনেছিল, ও হো, কণস্থায়ী নিষ্পেষক
মামুষের জন্তে ছিল সেই তার অনিশ্চেষ্ট মদ।
ছাতিহীন জিনিসের জন্তে তার কণ্ঠ থামে নাকো
পযিত্র দৃষ্টান্ত তার মুখখানি খুলে মেলে ধরে
সবই জ্ঞানক্ষেত্র হয়ে ওঠে সবই গুচ্ছ বেঁধে তোলে
তার সহানুভূতির দক্ষিণের পাকানো উত্তাপে।

সমাধি এবং নষ্ট রাজা যারা সেখানে শায়িত
তার প্রশংসাবচন মিথ্যা প্রমাণিত করে নাকো
সন্দেহ করে না ছায়া এসে যদি ঢেকে দেয় দিন।

সে ত এক দূত সে যে সর্বদাই আত্মবাহু তাই
তাদের ছয়ার থেকে পাঠায় উজ্জল ডিন-ভরা
কলগুলি যাতে তার স্মৃতি করে সেই মৃতজন। ১৯২২

প্রথম বসন্ত

কর্কশ বিগত। আর হঠাৎ শুষ্কতা
মাঠের উন্মুক্ত ধূসরিমায় বিস্তৃত।
ছোট নদীগুলি সব সুর বদলায়
অল্পখন্ড আদর এখন ঘুরে ফেরে
বিশালত্ব ছেড়ে শুষ্ক পৃথিবীর পাশে
ভবিষ্যৎ বলতে বলতে রাস্তা দূরে যায়
আচমকা সেটিকে পাবে দেখো ফাঁকা গাছে
ওপরের দিকে সেই হয়েছে উচ্ছিন্নত! ১৯২৪

জীবনের

আয়নার

ডাঃ অমদামোহন বাগচী

হীরালাল বন্ধু আমার প্রতিবেশী। একেবারে পাশাপাশি বাড়ী। অনেকদিন থেকেই তাঁকে দেখে আসছি। বয়সে আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। কিন্তু তার জ্ঞান অবাধ বন্ধুদের কোনই বাধা হয়নি। প্রাণ-খোলা মানুষ,—মনের সব কথা—সচরাচর বা একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাড়া কাউকে বলা যায় না, হেসে হেসে তা সব অকপটে খুলে বলেন—এতটুকুও আড়াল না করে। ইদানিং কিছুদিন যাবত ব্লাড প্রেসারে ভুগছেন। কিন্তু তাঁর দেহ আর মনের উপরে তা এতটুকুও প্রভাব পিস্তার করতে পারেনি। খাওয়া-দাওয়ার এতটু বাছবিচার ছাড়া আর সবই যথা-পূর্ব। একটা বড় ফার্মে চাকরি করেন। মোটা মাইনে। কিন্তু খরচ কম। সংসার ছোট। বিয়ে থা করেন নি। আত্মীয় স্বজনও কাউকে দেখি না। গাছপালা, পুকুর, বাগান সমেত একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মাত্র একখানা ঘর নিয়ে বাস করেন। তবে একেবারে একা নয়। সংগী আছে একজন। কোন মানুষ নয়—একটা কুকুর। বিশাল চেহারা। মিশ্র জাতের বলে মনে হয়। কান দুটো বড় বড়—আর খোলা। গায়ের রঙটা অস্বস্ত। অবিকল বাঘের

মত। সারা গায়ে ডোরা-ডোরা ছাপ। আর ছাপটও বাঘের মতই। হীরালাল তাই আদর করে ডাকেন—বাঘা।

হেসে বলেন : জ্ঞান ডাক্তার, আমার বাঘা ভোমাদের ঐ রয়েল বেঙ্গলের চাইতে—ইন নো ওয়ে ইন্ফিরিয়ার। একবার একটুখানি লেলিয়ে দিলেই হয়—বাস্—তার দেখতে হবে না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ও একলাফে শিকারের টুটু কামড়ে ধরে তাকে সাবরে দেবে। দেখবে একদিন ?

ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলি : দোহাই দাদা, ফাষ্ট এডের সব ঝগড়া ঝামেলা তো শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়েই এসে পড়বে। আর শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কী মরবে ঠিক নেই। মিছে ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন।

এক ফুঁয়ে সব সংশয়ের মেঘ উড়িয়ে দিয়ে হীরালাল বলেন : তাই বলে চোর চোট্টা ডাকু বদমাইসকে ভয় করতে হবে নাকি ? গভর্ণমেন্ট যখন বন্দুক বা পিস্তলের লাইসেন্স দেন, তাতে একটা বড় সতের উল্লেখ থাকে—সেলফ্, এ্যান্ড

এপাটি এটেকশান। চোর চুরি করে পালাচ্ছে বা গুণ্ডা আমাকে চাকু মারতে ভেড়ে আসছে,—তাহলে কা বলতে চাও তখনও আর্মস্ ব্যবহার করব না ?

: বাঃরে ! তখন নিশ্চয়ই করবেন !...

ছাদ ফাটানো হাসি হেসে হীরালাল বলেন : হিয়ার ইউ আর ! আমার বন্দুক নেই—বাধা আছে। হি ইজ মোর ছান এ গান্ অর রাইফেল। কথা খামিয়ে হঠাৎ চড়া গলায় হাঁক ছাড়েন : বাধা !

কোথায় ছিল বাধা কে জানে, বিহ্যৎবেগে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল হীরালালের কোলের উপরে। পা গেলের মত চাটতে লাগল সারা গা। হীরালাল আদর করে ওর মুখটা টেনে এনে নিজের মুখের কাছে ধরে বললেন : ওরে থাম...থাম...হয়েছে। বাজারে যেতে হবে না ?

মস্তমুগ্ধের মত : একলাফে কোল থেকে নেমে বাধা অপলক নেত্রে চেয়ে রইল হীরালালের মুখের দিকে। হীরালাল খাটো গলায় বললেন : টেবিলের উপর থেকে মানিবাগ—আর বাজারের বোলাটা নিয়ে আয়। চলু যাই, এই, বেলা বাজারটা সেরে আসি।

আমার বিশ্বয় বিহ্বল দৃষ্টির সামনে—পরমুহূর্তে ছুটে ঘরে ঢুকে বাধা আগতো ভাবে দাঁতে ধরে মানিবাগটা এনে হীরালালের সামনে রেখে দিয়েই—আবার ছুটল থলে আনতে।

জিজ্ঞেস করি : আচ্ছা বোস দা, বাজার হাট সেরে সব কেটে কুটে, নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে

দেয়ে অকসি যেতে অনুবিধা হয় না ? এতো আর এক আধ দিনের ব্যাপার নয়, তাই বলছি।

হাসি মুখে হীরালাল বলেন : এতটুকুও না। বরঞ্চ ভালই লাগে। রান্না বরি—লিমিটেড আইটেম। ইকমিক কুকারের তিনটি বাটিতে তিনটে পদ চাপিয়ে দিয়ে—শেভ...স্নান, সারতে না সারতেই রান্না কম্প্লিট। একটাতে চাপাই ভাত—তাতে একটা কিছু সেজ্জ, একটাতে মাছের ঝোল, আর একটাতে বাধার মাংস। ওর জন্ম রোজ আড়াইশো গ্রাম মাংস কিনতে হয়। নইলে ও নবাব পুস্তুরের মুখে ভাত ঘোচে না। আর ওরই বা কী দোষ ? তোমার ডিরেকশান অনুযায়ী আমার মাংস ডিম, ঘি, মাখন হুন সব বন্ধ। সবাই তো আর হীরালাল বহুর মত বাপের সুপুত্র নয়—যে, মুখবুজ্জে ঐ ঝাল হুন মসলা নজ্জিত শ্রোতের আহাৰ দুই বেলা অমৃত জ্ঞানে গিলে যাবে ?

ওঁর এই অকৃতদার থাকার পিছনে একটা বেদনার কাহিনী লুকিয়ে আছে। হীরালাল ছোট বেলায় বাবা মাকে হারিয়ে মামার বাড়ীতে মানুষ হন। সেখানেই পড়াশুনা করেন। যেবার বি. এ. পাশ করলেন—বয়স তখন কুড়ি—মামা বিয়ে ঠিক করলেন। গরীবের মেয়ে—বহুর চৌদ্দ বয়স। দেখতে ভাল। বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। উত্তোগ আয়োজন চলতে লাগল। দুই পক্ষের আশীর্বাদও শেষ। আর দিন পনেরো বাকি। হঠাৎ খবর এল—মেয়ের অন্তঃস্ব। ডাক্তার সন্দেহ করছে টাইফয়েড বলে। যদি দিন দশেকের মধ্যে

সেই উঠতে না পারে—তা হলে বিয়ের দিন পিছিয়ে দিতে হবে। এর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ মেয়ের এক কাকা এসে হাজির। কাকী ভেজা গলায় বলল : দয়া করে হীরাকে একটা দিনের জন্ত ছেড়ে দিন। শেষ দেখাটা দেখে আশ্রুক। অনির অবস্থা খুব খারাপ।....

শুধু হীরালালই নয়, মামা মামীও সংগে গেলেন। তখন প্রায় শেষ অবস্থা। সবার অনুরোধে হীরালাল অনিমার কপালে সিন্দুর পরিয়ে দিলেন। শেষ মুহূর্তে গঙ্গাজলের পরিবর্তে রোগিণীব মুখে দেওয়া হল হীরালালের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ডোবানো জল। অর্থাৎ পাদোদক!

হীরালালের মুখে গল্প শুনে শুনে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। হীরালাল তা দেখতে পেয়ে একটু হেসে বলেছিলেন : জ্ঞান ভাই ডাক্তার, সেদিন আমিও কঁদেছিলাম। সবাই যখন অনিমাকে ঘিরে কাঁদাকাটি করছে, আমি এক ফাঁকে ওখান থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব এক চোট কঁদেছিলাম। কিন্তু সে কাকী হবু বৌমার যাবার শোকে বা বিয়ে ভেঙে যাবার দুঃখে নয়।

হঠাৎ আমার দিকে আরও খানিকটা সরে এসে আমার পিঠে একখানা হাত রেখে কতকটা যেন চাপা গলায় বলেছিলেন : আসলে ব্যাপারটা কী জ্ঞান, যখন অনিমার কপালে সিন্দুর পরাবার জন্ত সবাই আমাকে নিয়ে গেল ওর কাছে, তখন ওর প্রায় শেষ অবস্থা। চোখ বন্ধ। রীতিমত শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। কপালে আঙ্গুল ছোঁয়াবার সাথে সাথে

হঠাৎ ও চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। দেখলাম ও একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার চোখে চোখ রেখে। ওর মুহূর্ত ছোঁয়া লাগা ফাকাশে গাল দুটো হঠাৎ যেন পলকের জন্ত ঐ কপালের সিন্দুরের মতই লাল হয়ে উঠল, আর একটা ছোট্ট নিশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুকের ভিতর থেকে। সেটা কেমন জ্ঞান? ঐ যে অনেক দুঃস্বপ্ন আর উৎকর্ষার পরে ভাল খবর কানে এলে যেমন বুক থেকে একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে—এও ঠিক তেমনি। আর তার ঠিক পরমুহূর্তেই ও চোখ বুঁজল। সে চোখ আর মেলেনি। কী আশ্চর্য দেখ ও যেন কপালে ঐ সিন্দুরের ছোঁয়াটুকু শাবার জন্তই অতক্ষণ মুহূর্ত সাথে লড়াই করে বেঁচেছিল।

বলা শেষ করে কেমন যেন অদ্ভুত মুখ করে হীরালাল হাসতে লাগলেন। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল—হাসির আড়ালে উনি জোর করে কাকী চাপতে চেষ্টা করছেন।

বাজার সেরে এসে কাকী চাপিয়ে হীরালাল বাবাকে সাথে নিয়ে পুকুরে যান। সেখানে ডগসোপ দিয়ে বাবার গা ঘষে তাকে স্নান করিয়ে, নিজে স্নান সেরে ঘরে এসে বাবাকে সাথে নিয়ে খেতে বসেন। খাওয়া-দাওয়া হলে কাকী প্যান্ট পরে দরজায় ভাল লাগিয়ে বাবাকে বাড়ীর পাহারায় রেখে অফিসে বেরিয়ে পড়েন। মিনিট দশেক হেঁটে গিয়ে বাসষ্টপ। সেখান থেকে অফিস আরও আধঘণ্টার পথ।

সারাটা দুপুর বাবা অতঃপ্রহরীর মত বাড়ীর

পাহারা দেয়। চোর, বদমায়েস, ভিক্ষুক দূরের কথা একটা কাক শালিখ পর্যন্ত বাড়ীর উঠানের ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। সারাটা ছপুর ঐ ভাবে কাটিয়ে নিয়ে—কেউ ওকে বল দেয় না—তবুও কী আশ্চর্য, ঠিক কঁটার কঁটার সাড়ে চারটেয় ও ঠিক পিয়ে হাজির হয় বাসষ্ঠ্যাণ্ডে। একটু পরেই হীরালাল এসে নামেন বাস থেকে। বাঘা তাঁকে সাথে নিয়ে বাড়ী ফেরে। এমটু বিশ্রাম করে কিছু মুড়ি বিস্কুট খেয়ে ছুজনে উঠোনে নেমে পড়ে বল খেলতে। একদিকে হীরালাল অস্ত্র দিকে বাঘা। হীরালাল পা দিয়ে বল মারছেন, বাঘা ছুটাছুটি করে কখনও বা পা দিয়ে, কখনও বা দাঁতে ধরে সে বল এনে ছুঁড়ে দিচ্ছে হীরালালের দিকে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে ছুজনে কিছুক্ষণ বায়ান্দায় বসে রেডিও শোনে। বাঘা হীরালালের কোলের কাছে বসে যে ভাবে তন্ময় হয়ে গান শোনে তা সত্যি দেখবার মত। তারপর একটু বেশি রাত হলে ছুজনে ঘরের ভিতরে শুতে যায়। খাটে হীরালাল। আর মেঝেতে মাহুরের উপরে পুরু সতরঞ্চি বিছিয়ে বাঘার শয্যা।

এই ভাবেই চলছিল ওদের জীবনযাত্রা—বেশ কয়েক বছর ধরে।

হঠাৎ একদিন অফিসে কাজ করতে করতে শ্রৌক হয়ে টেবিলেই অস্ত্রান হয়ে পড়ে গেলেন হীরালাল। সবাই মিলে ধরাধরি করে যখন হাসপাতালে নিয়ে গেল—দেখা গেল পথের মধ্যে রুগী মারা গিয়েছে।

আমি তখনও সে খবর জানি না। সন্ধ্যা-

বেলায় একটা রুগী দেখে ফিরছি, বাসষ্ঠ্যাণ্ডের কাছে দেখলাম কেমন যেন একটা উদ্বেগ আকুল দৃষ্টি মেলে—পায়ের দিকে চেয়ে বাঘা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আমার কাছে এসে, মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন কুঁচ কুঁচ শব্দ করে, এতক্ষণও হীরালাল ফিরে না আসায় তার অন্তরের অশান্ত উদ্বেগ জানাতে লাগল। আমি ওর গায়ে হাত রেখে হেসে বললাম : কীরে—বাবু বুঝি ফেরেনি এখনও ? হয় ওভারটাইম করছে, আর নয় তো দিনেমায় গেছে। এসে যাবে এখনই। চল যাই।...

ও অনিচ্ছাসম্বন্ধেও এল আমার সাথে। এর কিছু পরেই খবর পেলাম—হীরালালের অফিসের সহকর্মীরা হাসপাতাল থেকেই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সারাটা রাত প্রায় জেগে কাটিয়ে দিলাম। পুরানো অনেক কথা—অনেক স্মৃতি বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। আর ঐ বিনিম্র গ্রহরগুলিতে কান পেতে শুনলাম থেকে থেকে বাঘার মর্মভেদী আকুল আর্তনাদ। উঃ! সে কী কান্না! কানে গেলেই বুক ফেটে যায়। ওর অরচেতন মনেও নিশ্চয়ই অমংগলের আভাস পেয়েছে।

পরদিন হীরালালের মামার বাড়ীতে টেলিগ্রাম করলাম। মামা মামী কেউ বেঁচে নেই। এক দারোগা মামাতো ভাই—খবর পেয়ে আট দিনের মাথায় সজীক এসে হাজির হল। এ কথা সে কথার পরে আমাকে বলল : শ্রদ্ধা শাস্তি একটা কিছুতো

করতেই হবে। টাকা পয়সা কেমন কী রেখে গেছেন—আপনি জানেন কিছু ?

আমি বললাম : আমি ও সম্বন্ধে কিছুই জানিনে ভাই। তুমি ঘরে গিয়ে খুঁজে পেতে দেখ, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের কাগজ পত্র নিশ্চয়ই আছে। তারপর কাল একবার আফিসে গিয়ে খোঁজ নিও।

বাড়ীর দরজার তালার চাবি মৃতের পকেট থেকে বের করে একজন সহকর্মী রেখে দিয়েছিলেন।

হীরালালের আত্মীয় এসেছে খবর পেয়ে সে ভজলোক নিজে এসে চাবি দিয়ে গেলেন। দারোগা চাবি হাতে দরজা খুলতে যাবার সময় কয়েকজন প্রতিবেশী সমেত আমাদেরও সাথে ডেকে নিল। ভিতরে ঢুকে দেখি যে ঘরের দরজার সামনে টান হয়ে গুড়ে আছে বাঘা। খাওয়া নেই দাওয়া নেই—এই কয়দিনেই অমন হঠপুট চেহারা শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে। হীরালালের নিত্য সংগী তার অন্ত আদরের বাঘা বলে আর যেন ওকে চেনাই যায় না। এতগুলি লোককে হঠাৎ এ ভাবে ঢুকে দেখে ও কান খাড়া করে অতিকষ্টে উঠে বসল। একবার চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল—দলের মধ্যে হীরালাল আছে কি না। নাই দেখে—ভীষণ শঙ্ক করে ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর অবস্থা দেখে আমার চোখে জল এসে গেল। ও আমার

কাছে এসে—আমার মুখের দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুঁই কুঁই শব্দ করে কাদতে লাগল।

এদিকে তাল খুলে দারোগা বৌ সাথে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে,—সহসা বাঘা আমার পাশ থেকে উদ্ভাসের মত ছুটে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল। ওদের ঢুকে দেবে না।

দারোগা পা দিয়ে ঠেলে ওকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু বাঘা একচুলও নড়ল না। যেন শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—দরজা আগলে। কয়েক বার চেষ্টা করে সরাতে না পেরে, ভীষণ রেগে গিয়ে দারোগা ঝেড়ে লাথি মারল বাঘার পেটে। আর যাবে কোথায়? কিন্তু বাঘের মত লাফিয়ে উঠেই বাঘা সজোরে কানড় বসিয়ে দিল—দারোগার হাঁটুর উপরে। থাকির প্যাণ্ট ছিঁড়ে দরদর ধারে রক্তের ফোয়ারা ছুটল ক্ষতস্থান থেকে। একেতো কানড়ের যন্ত্রণা—তার উপরে এতগুলি লোকের সামনে বিশেষ করে জ্বর সামনে—একটা ইতর জীবের এই হুঃসাহসিক স্পর্ধা দেখে—অপমানিত দারোগা ঝট করে পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুলি করল বাঘাকে লক্ষ্য করে। একটা মর্মভেদী আত্ননাদ করে রক্তাশ্লুত দেহে বাঘা ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকে একলাফে খাটে উঠে হীরালালের শয্যার উপরে লুটিয়ে পড়ল।...

সাধনা

বিউটি

ক্রীম

তাঁর মনোহারিনী মৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনমূলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য



সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

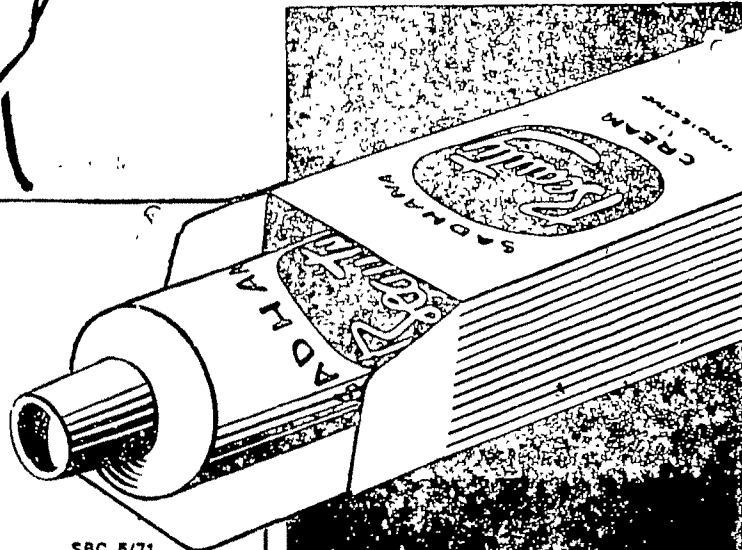
কলিকাতা-৪৮



J. C. Ghose

শাখা ভারতের সর্বত্র

৯



SAC 5/71

বর্তমান প্রসঙ্গ

অনিল রায় স্মৃতিবার্ষিকী

৬ঠ জামুয়ারী ১৯৭৬ মুদলীধর গালস' কলেজ
হলে অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্বোধনে বিপ্লবী
ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায়ের চতুর্বিংশতিতম
স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন
ডাঃ সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত।

‘প্রতিদিন তব গাথা’—গান দিয়ে সভার কাজ
শুরু হয়। গাইলেন শ্রীমতী নন্দিতা মজুমদার।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অধ্যাপক অমূল্যভূষণ
সেন বিপ্লবী অনিলচন্দ্রের নানা দিক নিয়ে আলোচনা
করেন। তিনি বলেন অনিলদাকে জানা যেত যদি
শ্রীসংঘ ও বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের একটি পূর্ণ
ইতিহাস রচনা হোত। তিনি আরও বলেন, এই
ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নিতে তিনি রাজী আছেন
যদি তথ্য দিয়ে সবাই তাকে সহযোগিতা করেন।

প্রবীণ বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন বলেন, অনিলদার
বিপ্লব চিন্তা শুধু মারামারি কাটাকাটি নয়, স্বাধীনতা-
উত্তর সমাজ বিপ্লবের কথাও তিনি ভেবেছিলেন।

দাদা যেটা চেয়েছেন পরে দিদিও সেটা চেয়েছেন
দেখেছি। রক্তের বিনিময়ে বিপ্লব আসবে, স্বাধীনতা
আসবে, কিন্তু তারপর ভারতের কী রূপ হবে। এটা
দাদা ও দিদি ভেবেছিলেন। শুধু negative side
এ গলে চলবে না, positive side-এ দেখতে

হবে, ভারতের অতীত কী ভারত কী দিতে চায়,
ভারত কী দেবে, এসব জানতে পারলেই positive
side প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আমি তাই দাদাকে
বিপ্লবী হিসেবে শ্রদ্ধা জানাই। পরিপূর্ণতা বিপ্লবীর
মধ্যেই সম্ভব। দাদা রক্তাক্ত বিপ্লবকে বেছে
নিয়েছিলেন প্রথম দিন থেকেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও
তারপরে কি সে সম্বন্ধেও তিনি ভেবেছিলেন। তাই
বিপ্লবী হিসেবেই আমরা তাঁকে প্রশংসা করি, প্রশংসা
করবো। এমন বিপ্লবী ভারতে সচরাচর দেখা যায় না।
বঙ্কিমচন্দ্র চুখে করে বলেছিলেন ভারতবর্ষে ইতিহাস
নেই তাই রাজসিংকে কেউ চেনে না। আমিও সেই
কথা repeat করতে চাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার
ইতিহাস, বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করা চাই, কোনও
দলের ইতিহাস নয়, তবেই দাদাকে চেনা যাবে।

তাছাড়া আলোচনা করেন কণেশ্বর ঘোষাল, তাঁর
আলোচনাটি বর্তমান সংখ্যায় পত্রস্থ করা হোল।
সভাপতিও অনিলচন্দ্রের নানা দিকের প্রতি
আলোকপাত করেন। সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ
করেন রমেন্দ্রলাল রায়, গান করেন দীপিতা রায়
ও রবীন মুখোপাধ্যায়।

তামিল নাড়ু ও গুজরাট সরকার

তামিল নাড়ুর ডি. এম. কে এবং গুজরাটের

জনতা ফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে কেন্দ্র ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটিতে বহু সদস্যের গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ আনলে বলেন যে কেন্দ্র পরিস্থিতির ওপর মজবুত রাখছে। একজনমাত্র সদস্য একটি বিরোধী দলের সরকারের বিরুদ্ধে এই চোখা সমালোচনা করেন। রেড্ডীর সংবাদ পরিবেশনে জানা যায় গুজরাটে নিষিদ্ধ দলের সদস্যরা তৎপর, তাদের দমনে গুজরাট সরকারের কোনো সাড়া নাই। ঐ রাজ্যে গোপন প্রচারপত্রের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। গোটা দেশে এই কারণে প্রায় ৪০০০ লোককে আটক করা হয়েছে, কিন্তু গুজরাটে হয়েছে মাত্র ৪ জন। অর্থাৎ, এ-বিষয়ে যা করেছেন তা বলতে গেলে একবারেই অকার্যকর হয়েছে।

এদিকে ২৮শে জামুয়ারী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চিমেনডাই প্যাটেল-এর নেতৃত্বাধীন কিষাণ-মজদুর লোকপক্ষ সাত মাসের জনতা ফ্রন্ট সরকারের তার দলের সমর্থন পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদের দলে আছে ১২ জন বিধান সভার সদস্য এবং তিনজন নির্দলীয় সমর্থিত সদস্য রয়েছে। কিষাণ মজদুর লোকপক্ষের অন্ততম সদস্য ধরমসিং প্যাটেল অবশিষ্ট তার নেতাদের সঙ্গে একমত মন। তার মতে জনতা ফ্রন্ট সরকার ভালই কাজ করছে, কোনো আতঙ্কের কারণ নাই এবং কিষাণ মজদুর-লোকপক্ষের সদস্যদের জনতাফ্রন্ট সরকারের প্রতি

পূর্ণ আস্থা আছে। জনতা ফ্রন্ট সরকার টিকবে না ভাববে সেই প্রশ্ন।

মাজাজে ডি, এম, কে সরকারের এবং মাজাজে বিধান সভার মেয়াদ আগামী ২১শে মার্চ শেষ হবে। লোকসভার মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হবে সেই প্রসঙ্গে ডি এম কে সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠতে পারে। তাই আগেই মাজাজের কংগ্রেস ২১শে মার্চেই ডি, এম, কে সরকারের মেয়াদ শেষের কেন্দ্রের কাছে দাবী জানিয়েছে। ডি এম কে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি পদত্যাগ করে বিধান সভা ভেঙে দিতে রাজ্যপালকে অনুরোধ করার কথা ভাবছেন না। অথচ, ২১ মার্চ-এর পর কি করবেন সে-সম্বন্ধেও মুখ খোলেন নাই। শুধু এইটুকু বলেছেন তার দল সব পরিস্থিতির ক্ষুদ্রই প্রস্তুত এবং কংগ্রেস দল তাদের 'দাবীকে ডি, এম, কে সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সীমিত না রেখে, নির্বাচনের দাবী করলে সে-প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ই জামুয়ারী মাজাজে কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় ডি, এম, কে সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের কাজের ফলশ্রুতির দায়িত্ব এড়িয়ে কেন্দ্রকে অভিযুক্ত করায় প্রচণ্ড কোভ প্রকাশ করেন। জামুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী লোক-সভায় এক বিবৃতিতে বলেছিলেন মাথাপিছু গ্যানের ব্যয় তামিল নাড়ুতে সব চাইতে কম, তার জবাবে করুণানিধি বলেন উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয়ের সঙ্গে মোট ব্যয়ের অনুপাত মাজাজে সব চাইতে বেশী।

প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাজের ১৪ই জানুয়ারীর সভায় করুণানিধির এই তথ্য পরিবেষণ ভুল চিহ্নিত করে বলেন, সারা ভারতে যেখানে উপরোক্ত অনুপাত শতকরা ৭০.৬ মাদ্রাজে সেখানে শতকরা ৬৭.১ ভাগ। এ-ছাড়া প্রধানমন্ত্রী করুণানিধির তথ্যে আরও ভুলের উল্লেখ করেন।

করুণানিধি তারও জবাব দিয়েছেন। তার বক্তব্য কেন্দ্র কখনও সাহায্য দেয় নাট, আদৌ এটা তার কথা নয়। মাদক-বর্জন পুনরায় আরোপ করার এবং খরাত্রাণের আকস্মিক ব্যয়ে রাজ্যের রাজস্ব ৮০ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। এই ঘাটতিটা রাজ্যের অনুরোধে কিছুটা মেটালে তামিল নাড়ুর মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় এ-বিষয়ে জাতীয় গড়ের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতো। পুরো উন্নয়নমূলক ব্যয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী তামিল নাড়ুর মাথাপিছু উন্নয়নমূলক ব্যয় হয়ে উঠতো ১৯৭৫-৭৬ এ ৯৮.২৫ টাকা যা উত্তর প্রদেশ অথবা পশ্চিমবঙ্গের চাইতে বেশী।

ইতিমধ্যে ৩১শে জানুয়ারী ডি, এম, কে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে নূতন মন্ত্রীসভা

শ্রী এইচ, এন, বহুগুণা মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী শ্রীমারায়ণ দত্ত তেওয়ারী ২১শে জানুয়ারী তারিখে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৫-এর ২৯শে নভেম্বর বহুগুণা পদত্যাগ করলে

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন সাময়িকভাবে জারী হয়। ১৯৭৩-এর জুনে কমলাপতি ত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় ত্যাগ করলে সে-বছর নভেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বহুগুণাকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্ত পাঠান। ঘটনার আবর্তনে ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতিক্রমেই দুই বছরবাদে পদত্যাগ করেন। উপদলীয় বিরোধে কোণঠাসা হয়ে কমুনিষ্ট পার্টির বিধান সভার সদস্যদের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধিই বহুগুণার বিদায় অনিবার্য করে তোলে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কর্মদক্ষতা হ্রাস

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কর্মদক্ষতা হ্রাসের অভিযোগ জনসাধারণের পক্ষ থেকে বহুদিন থেকে উত্থাপিত হয়ে আসছে। সে দিকে না ব্যাঙ্ক কর্মচারীবৃন্দ, না ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কান দিচ্ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে, এবার কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও ব্যাঙ্ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখার্জি ২৭শে জানুয়ারী রাজ্যসভায় এই স্বীকৃতি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ব্যাঙ্কগুলির উন্নতির জন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আশা করি এবার সমবেতভাবে সকলের সহযোগিতায় এ-কাজটি হবে।

সংবিধানের ১৯ ধারার অধিকার স্বগিত

গত ৮ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি এক আদেশজারী করে জরুরী অবস্থার সময় ১৯শ ধারায় প্রদত্ত মৌলিক

অধিকার প্রয়োগের জন্য যে কোনো আন্দোলনে যাওয়ার সুযোগ—৭টি স্বাধীনতা—স্বগিত রেখেছেন। সংবিধানের ৫৫৯ (১) ধারা অনুযায়ী এই আদেশ জারী হয়েছে। আদালতে এই অধিকার প্রয়োগের জন্য যে সব মামলা চলছে, জরুরী অবস্থা চলাকালীন সেগুলি বন্ধ থাকবে।

১৯৭৫-এর ২৭ শে জুন রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ জারী করে জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের ১৪, ২১ ২২ ধারায় প্রদত্ত অধিকারগুলি অবৈধভাবে স্বগিত রেখেছেন।

এঙ্গোলা

পর্তুগীজ উপনিবেশ এঙ্গোলার স্বাধীনতা গত ১১ই নভেম্বর ঘোষণার পর পর্তুগাল তার ৫০০ বছরের সার্বভৌমিক ত্যাগ করে সশস্ত্র সংঘর্ষে নিয়োজিত তিনটি সংগঠনের হাতে এঙ্গোলার ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেয়। কিন্তু পর্তুগাল এঙ্গোলা ছেড়ে যাবার সমসময়ে এঙ্গোলায় পরস্পর বুদ্ধমান দলের মধ্যে সোভিয়েত রুশ ও কিউবার সমর্থন নিয়ে ডাঃ অগাস্টিনো নেটোর (Dr Augustino Neto) নেতৃত্বে পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট ও সংক্ষেপে এম, পি, এল, এ (M.P. L. A) সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রূপে নিজেদের ঘোষণা করে। এই দলটি এঙ্গোলার ১৯৬১ সালে গঠিত, ১৯৬৮ থেকে সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট। ১৯৭৪-এর এপ্রিলে খাস পর্তুগালে বিপ্লব ঘটে যাবার পর এরা এঙ্গোলায় প্রবেশ করে এবং অপর

দুইটি দলের সঙ্গে চুক্তি ও কোয়ালিশন ভেঙে এঙ্গোলার রাজধানী লুয়ান্ডা ১৯৭৫-এর অগাষ্টি দখল করে অন্য দু'টি দলকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। এঙ্গোলার স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্য দুইটি দলের মধ্যে হোল্ডেন রবার্টোর (Holden Roberto) নেতৃত্বে গ্রাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট—সংক্ষেপে এফ, এন, এল, এ (F N L A) সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এই দলটি সমর্থনের কেন্দ্র জাহেরের (Zaire) প্রেসিডেন্ট মোবুটু (Mobutu)। ১৯৭৪ সালে দলটি তৎক্ষণাত হয়ে ১৯৬১ সাল থেকেই এঙ্গোলার স্বাধীনতার লড়াই শুরু করে। তৃতীয় দলটি গ্রাশনাল ইউনিয়ন ফর টোটাল এঙ্গোলান ইউনিপেপেশ-এর সংক্ষেপে ইউনিটার (UNITA)—নেতা জোনাস সাভিমবি (Jonas Savimbi)। সাভিমবি এক সময় রবার্টোর সহকারী ছিল, ১৯৬৬ সালে এফ, এন, এল, এ থেকে সরে এসে এই দল গড়ে।

এঙ্গোলায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপে। সোভিয়েত রাশিয়া এঙ্গোলার সরাসরি হস্তক্ষেপ করে প্রচুর আধুনিক, ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান ইত্যাদি অগাস্টিনো নেটোর এম, পি, এল, একে সমর্থন দিয়ে তাতে সরকারকেই এঙ্গোলার একমাত্র সরকারের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টায় অস্বাভাবিক দুইটি সংগঠনের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে। এঙ্গোলায় প্রায় হাজার নরেক কিউবার সেনা লড়াই, কিউবার জনা সাতেক নামী জেনারেল তাদের সঙ্গে রয়েছেন। এ-ছাড়া রুশ বৈমানিক, রুশ সামরিক উপদেষ্টাও

৫৫১ - বর্তমান প্রসঙ্গ

রয়েছে প্রচুর। এম, পি, এল, এ সরকার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও পেয়েছে।

আমেরিকাও জায়েরের (Zaire) হাত দিয়ে এক, এন, এল, এ কে প্রচুর সাহায্য দিয়ে এসেছে। বর্তমানে কংগ্রেস আর সাহায্য নামাঞ্জুর করেছে। এম, পি, এল, এ একক সরকার ঘোষণার পর এক, এন, এল, এ ও ইউনিটার কোয়ালিশন গঠিত হয়েছে এবং এই যৌথ শক্তি এম, পি, এল, এ'র রুশ আধুনিক অস্ত্রের কাছে পিছু হ'টে যাচ্ছে। এক, এন, এল, এ চীনের সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছে। গোল বেথেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিটার পক্ষ নিয়ে তাদের সেনাবাহিনী এঙ্গোলায় পাঠানোর পর। ফলে বর্ণৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার সকল অপরাধ এক, এন, এল, এ ইউনিটার এবং তাদের সমর্থকদের উপর আরোপিত হয়ে এঙ্গোলার চারপাশে একটি দারুণ বিষচক্র তৈরী করেছে। এই সমর্থনের ফলশ্রুতি আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির দুইটি শিবিরে বিভক্ত, যা পরিষ্কার হয়ে গেছে ১০ই জানুয়ারী থেকে ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত আদিস আব্বায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকা প্রক্য সংস্থার (Organisation of African Unity of OAU) শীর্ষ সম্মেলনে। ৪৬টি রাষ্ট্রের এই সংগঠনটিতে ২২টি রাষ্ট্র নাইজেরিয়ার (Nigeria) প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েত রুশ ও কিউবা সমর্থিত এম, পি, এল, এ (M P L A) সমর্থন জানায়। অপর ২২টি রাষ্ট্র সেনেগাল (Senegal) উপস্থাপিত প্রস্তাবের অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি, সকল প্রকার বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপের

অবসান এবং তিনদলের জাতীয় প্রক্য সরকার গঠনের দাবী সমর্থন করে। জাম্বিয়া, জায়ার এই প্রস্তাবের সমর্থকদের অন্যতম। উগান্ডা বা ইথিওপিয়া কোনো পক্ষে মত দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

এঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে গোটা আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি রুশ শিবির ও মার্কিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রথম চীন ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পর বিরোধী এঙ্গোলীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যদিও এক, এন, এল, এ ইউনিটা কোয়ালিশনের পেছনে জায়েরে, চীন, ফ্রান্স রয়েছে, আমেরিকা তার প্রধান সহায়। দক্ষিণ আফ্রিকা এই দিকে সমর্থন প্রসারিত করে যে ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার অবসানের জন্য আমেরিকা চাপ দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এঙ্গোলা থেকে সৈন্য ও সাহায্য প্রত্যাহার করে নিতে। কারণ বর্ণৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার উপস্থিতি বহু আফ্রিকার রাষ্ট্রকে যেমন এম, পি, এল, এ'র দিকে টেনে এনেছে, তেমনি সোভিয়েত রুশও এঙ্গোলায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সুযোগ এই ঘটনার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে, যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা না সোভিয়েত রুশ কে আগে এঙ্গোলায় গৃহযুদ্ধ জড়িয়ে পড়েছে, তা নিয়ে ছুপকের দুই রকম অভিমত রয়েছে। পঞ্চাশ দশকে কঙ্গোতে যে ঘটনা ঘটেছিলো, তীব্রতরভাবে এঙ্গোলায় তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

শ্রেসিডেন্ট ফোর্ড এবং হেমরী কিসিংগার হুমকি দিয়েছিলেন যে সোভিয়েত রুশ এঙ্গোলায় এম, পি, এল, এ'কে সমরাজ্ঞ সরবরাহ বন্ধ না করলে

রুশ-মার্কিন পারমাণবিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র সীমিত-করণের চুক্তির, দ্বিতীয় সলট চুক্তি (SALTII) যার নামকরণ হয়েছে, আলোচনা হবে না এবং রুশ-মার্কিন দাঁতাত বিপর্য হবে। ভ্লাডিভস্টক-এ ১৪ মাস আগে ফোর্ড-ব্রেননেভ-এর এ-বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর সোভিয়েত রুশের গরজ সত্ত্বেও আর আলোচনা এগোয় নাই। তারপর এঙ্গোলা নিয়ে সোভিয়েত রুশের প্রতি মার্কিন হুমকি। তারপর গত ২০শে জানুয়ারী ব্রেননেভ-এর সঙ্গে তিনদিন আলোচনার পর মস্কো ত্যাগের পূর্বে কিসিংগার বলেন আর একটি পারমাণবিক চুক্তি রুশের সঙ্গে সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। সময় সীমা পূরে বেধে দেওয়া হয়েছে এ-বছরের মে-মাসে। এঙ্গোলা নিয়ে এই দুই রাষ্ট্রের কি আলোচনা হয়েছে জানা যায় নি। কিন্তু সোভিয়েত রুশ এঙ্গোলায় যে গভীরে জড়িয়ে গেছে, সেখান থেকে সরে আসা ব্রেননেভ-এর পক্ষে সম্ভব মনে হয় না।

কেন? জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েত রুশের নীতি অনুযায়ী সাহায্যের অনিবার্যতা রয়েছে। কয়েকটি রাষ্ট্রে সাহায্য প্রদানিত করে সোভিয়েত নেতৃত্বকে পিছুও হঠতে হয়েছে, তাদের সাহায্য পুষ্ট জাতীয় নেতৃত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে। উদাহরণ স্বরূপ ঘানায় নজ্জুমার (N Krumah) পতন, আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনীর হাতে বেন বেলার (Ben Bella) অপসারণ ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণ বিভাঙ্কম এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা, যেখানে প্রচুর

অর্থব্যয়ের পর সোভিয়েত রুশ হটে বিদায় নিয়েছে। মিশরেও সোভিয়েত রুশ প্রচুর অর্থব্যয় করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। সাদাত ক্ষমতায় এলে তো সোভিয়েত রুশের প্রচ্ছন্ন সেনাবাহিনীকে মিশর থেকে বিতাড়নই করে।

কোরিয়ার যুদ্ধে সোভিয়েত রুশ উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণে প্ররোচিত করলেও তাদের কোনো বাস্তব সাহায্য করে নাই। একমাত্র ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ক্রুশ্চভোভের বছরগুলিতে ধীরে ধীরে সোভিয়েত রুশের সাহায্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এঙ্গোলায় সরাসরি সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সোভিয়েত রুশের খোলাখুলি সাহায্যদানে প্রশ্ন উঠেছে, তৃতীয় বিশ্বে দুই বৃহৎ শক্তির ঠাণ্ডা লড়াই-এর অংশগ্রহণী কী নিয়েই কি সোভিয়েত-এর এই আয়োজন? না, ২৪তম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসে ব্রেননেভ নেতৃত্ব অবসানের জন্মই সোভিয়েত রুশের পার্টির শক্তি কেন্দ্রে ব্রেননেভ-বিরোধীদের চাপেই এই আয়োজন? একদিকে আমেরিকার সঙ্গে দাঁতাত আর তারই পাশাপাশি আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের—এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে সোভিয়েত রুশ সামরিক সাহায্য দিয়ে স্বপক্ষভুক্ত করবে—এই পরস্পরবিরোধী ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হলে ‘তৃতীয় বিশ্ব’ তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হবে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরের মঞ্চট এই বিন্দুতে অনিবার্য গতিতে পৌঁছাবে।

ফ্রান্সে-এর পর ব্রেনেল মেত্‌স এই পরিশ্রমিক এড়িয়ে যাবার জন্য আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি বোঝাপড়ায় নেমেছেন, ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের হেলসিংকি-সনদ রচনায় মুখ্যভূমিকা নিয়েছেন এবং মধ্য ইউরোপে, ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ছোটোচুক্তিভুক্ত দেশগুলির সমঝোতার মধ্য দিয়ে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও সমরাজ্য হ্রাসের উদ্যোগ করেছেন। এ-ছাড়া ইউরোপের কমুনিষ্ট পার্টিগুলিও সোভিয়েত রুশের নীতিকে এড়িয়ে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে পৃথকভাবে চলবার প্রকাশ ঘোষণা করেছে—ফ্রান্স ও ইতালীর কমুনিষ্ট পার্টি এদের অগ্রণী। সুতরাং এঙ্গোলার যুদ্ধ সোভিয়েত রুশের আভ্যন্তরীণ অন্তর্ভ্রমের এবং বহির্বিশ্বে সোভিয়েত-বিরোধী শক্তি সমাবেশের এই সুদূরপ্রসারী ইসারা দিচ্ছে।

চীনে চু এন-লাই-এর পর

চীনা কমুনিষ্ট বিপ্লবে মাও সে-তুং-এর আজীবন অগ্রতম সহযোদ্ধা, চীনে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে কমুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটানা ২৭ বছরের প্রধানমন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী, চীনা কমুনিষ্ট পার্টির নানা সঙ্কটের উত্থান পতনের মধ্যেও দলের শীর্ষস্থানীয় অগ্রতম অব্যয় অক্ষয় দলীয় ও রাষ্ট্রনেতা, সারা বিশ্বে চীনা কমুনিষ্ট শাসনের সব চাইতে প্রথম ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও শক্তিশালী প্রতিনিধিরূপে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত, চু এন-লাই, ৭৮ বছর বয়সে তিন

বছর ক্যানসারে রোগ-ভোগের পর গত ৮ই জানুয়ারী সকালবেলা পিকিং-এর একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চু গত তিন বছরই হাসপাতালের রোগশয্যা থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রয়োজন হলে সেখানেই বিদেশী কূটনীতিবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, গত তিন মাস যা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। ১৯৬৬-র ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লবের’ ঝড়ে চীনা কমুনিষ্ট পার্টির অনেক নামী নেতার মাথা ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে, বহু নেতাকে উচ্চতম পদ থেকে অসম্মানের গহ্বরে টেনে নামানো হয়। লি-সাও-চি, চীনা কমুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তেং শিয়াও পিং, পিকিং-এর মেয়র কমুনিষ্ট পার্টির উচ্চ পর্যায়ের জাদরেল নেতা পেং চেন এবং আরও বহু বহু নামের কয়েক বছর নিশানা পাওয়া গেলো না। সে জায়গায় চীনে মাও-এর আশীর্বাদপুষ্ট নতুন র্যাডিকাল বা জঙ্গী-নেতাদের আবির্ভাব ঘটে: চেয়ারম্যান মাও-এর জ্যী চিয়াং চিং (Chiang Ching) ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক ওয়াং হুং-ওয়েন (Wang Hung-Wen), চাং চুন-চিয়াও (Chang-Chun Chiao), ইয়াও ওয়েন-উয়ান (Yao Wen-Yuan) প্রভৃতি আরও অনেকে। এদের মধ্যে সে-সময় চিয়াং চিং-এর পরই সাংহাই গোষ্ঠী নামে পরিচিত কমুনিষ্ট পার্টির জঙ্গী গোষ্ঠীর নেতা ওয়াং হু-ওয়েন-এর শক্তিকে চীনে কাকুর অধীকার করবার জো

ছিল না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ওয়াং এবং চাং চুন-চিয়াও দু'জনেই তেং সিয়াও-পিংকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন, যদিও তেং দলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তেং সিয়াও-পিং রক্ষা পেল না।

‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’ ঝড়ের মধ্যেও এই জঙ্গীরা চু এন-লাইকে স্পর্শ করতে সরাসরি সাহস পান নাই, যদিও ঠারে ঠারে তাকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছেন এবং তার সমর্থকদের দল থেকে উৎসাদিত করেছেন। দলে তেং সিয়াও-পিং এমনি একজন উৎসাদিত শক্তির চু সমর্থক। সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কম মারাত্মক ছিল না। চীন গোটা পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন বছর অতিবাহিত করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে চীনা রাষ্ট্রদূতদের পিংকিং-এ ফিরিয়ে আনা হয়, এক মিশর বাদে। ‘তৃতীয় বিশ্ব’ও চীনের প্রভাব স্তিমিত হয়ে যায়। যদিও মাও সে-তুং-ই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর জনক। বিপ্লবের লাল সেনারা (Red Guards) —বলতে গেলে চীনের সংহত যুবশক্তি—সকল রকম বাঁধনের মাত্রা ডিঙ্গিয়ে গেলে চীনে বিভিন্ন অঞ্চলের কমুনিষ্ট পার্টিগুলিকে ও তাদের পরিচিত নেতাদের পবুদস্ত করলে, সেনাবাহিনীকে ডেকে তাদের কঠোরভাবে সংহত করতে চু-এর ডাক পড়ে। ১৯৬৯-এ নবম আংশনাল পার্টি কংগ্রেস-এর পর সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর ক্ষয়ক্ষতি পূরণে চু এগিয়ে এসে প্রথমেই বহিঃবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের জন্য

বিভিন্ন রাষ্ট্রে চীনা রাষ্ট্রদূতদের পাঠাতে আরম্ভ করলেন। পার্টির স্ব.স পড়া কাঠামোগুলির পুনর্গঠনের কাজ আর একটি দায়িত্ব নিয়ে এলো। তা না হলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর বাড়াবাড়ি দমনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীই চীনা-জীবনে সর্বসর্বা হয়ে উঠবে। পার্টি, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন-এর মধ্যে সুসম ভারসাম্য চাই। এর কোনো শাখা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হয়ে উঠলে এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। মাও-এর চিন্তায় “Political power comes out of the barrel of the gun”—রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল, অর্থাৎ সেনাবাহিনী। কিন্তু বন্দুক চালাবে কে? —দল কমুনিষ্ট পার্টি।

তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে দলের বিভাঙিতদের পুনর্বাসনের ডাক পড়লো। মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর জনক। গোড়া তাত্ত্বিক। আর চু এন-লাই বাস্তববাদী মধ্যপন্থী। ২০০০ সালের মধ্যে চীনে একটি শক্তিশালী আধুনিক সমাজবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। দলের অবমানিত, পলাতক পোড়োখাওয়ারা অভিজ্ঞ যোদ্ধারা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করলেন চুর আশ্রয়ে ইতিমধ্যে মাও-এর আশীর্বাদ-পুষ্ট, নবম জাতীয় গণ কংগ্রেসে মাও-এর উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষিত, চীনের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাও-এর নিত্য-সহচর, সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর অন্যতম উত্থোক্তা লিন পিয়াও (Lin Piao) মাও-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে প্রেপ্তারের ভয়ে সোভিয়েত রুশে পলায়নের পথে মঙ্গোলিয়ায় বিমান

হুয়টিনায় প্রাণ হারিয়েছে। সেটা ১৯৭১ র সেপ্টেম্বর মাস। তারপর থেকে লিনপিয়াওর বিরুদ্ধে চীনের প্রচার সম্বন্ধে তীব্র আক্রমণ চলে 'সো ভয়েত শোধন-বাদীদের' সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীরূপে। লিন পিয়াও বিদায় নেবার পর সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অপদস্থ সহযোগীদের পুনর্বাসনের কাজও দ্রুততর গতিতে চু সম্পন্ন করতে লাগল। চীনা কমুনিষ্ট পার্টির বিতাড়িত প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তেং শিয়াও-পিং (Teng Hshiao-Ping) তাদের অন্ততম। পিকিং-এর 'গ্রেট ওয়াল'-এর (Great Wall) গায়ে প্রাচীরপত্র এঁটে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের র্যাডিকলরা প্রচ্ছন্নভাবে চু'র সমালোচনা করে। সে-সময় লিন পিয়াও এবং কনফুসিয়াসের বিরুদ্ধে প্রাচীর পত্রে বাঙ্গচিত্র এবং আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে—কনফুসিয়াস-এর নামটা প্রতীকী মাত্র, আসলে চু-ই ছিল তাদের লক্ষ্য। এই প্রচারের পেছনে মাও-এর সায় হয়তো ছিল। কিন্তু চু-এর বাস্তব বুদ্ধিকেও মাও স্বীকার না করে পারে নাই।

গত চারবছরের চেষ্ঠায় চু এই পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং ধীরে ধীরে তেং শিয়াও-পিংকে তার নিজস্ব সহকারীরূপে এক নম্বর ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চু'র এই দূরদর্শিতার ফলে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রশাসকদের অন্ততম তেং শিয়াও-পিং, চু'র রাষ্ট্রীয় দায়িত্বগুলি অনায়াসে পালন করে গেছে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের মিলনের সময়ও তেং-এর উপস্থিতি প্রশাসনে এবং দলে তেং-এর

সগৌরব পুনর্বাসনের স্বাক্ষর দিচ্ছে। এ ছাড়া কমুনিষ্ট পার্টির অন্ততম ভাইস-চেয়ারম্যান, সেনাবাহিনীর প্রধান, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো এবং পলিটব্যুরোর নয়-সদস্য বিশিষ্ট ইয়াও-উয়ান কমিটির সদস্য এবং সামরিক কার্যসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সুতরাং তেং চু-এর পরই বর্তমান চীনে সর্বশক্তিমান ব্যক্তি এবং একাধারে দল, সামরিক-বাহিনী এবং সরকারের ওপর শব্দদারীর অধিকারী। তেং-ই তাই চু-এর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, নানা বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে চু তার অবর্তমানে এই শক্তিশ্বর মানুষটিকে তার স্থলবর্তী সকল ক্ষমতার অধিকারী করে দিয়ে গেছেন।

তেং সম্বন্ধে র্যাডিকালদের এখনও প্রশ্ন রয়ে গেছে। তারা তেংকে এখনও গ্রহণ করতে পারে নাই। সেদিক থেকে চীনে অসুট ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। অসুস্থ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কখনই নিঃশেষিত হয় না। সমস্তা তখনই দেখা দেয় যখন ক্ষমতার ভারসাম্য এই দ্বন্দ্ব ভেঙে পড়ে, তখনই ঘটে জাতির আভ্যন্তরীণ জীবনে বিপর্যয়। চীনের সরকারী পত্রিকা 'পিপলস ডেইলী'তে এখন 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'র পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হয়, তেং-এর নীতিরও তার নাম উল্লিখ না কবে সমালোচনা হয়। তেং সেগুলোকে অগ্রাহ্য না করে, মেনে নিতে চেষ্ঠা করে। পার্টির সাময়িক পত্র 'রেড ফ্লাগ'-এ পলিটব্যুরোর দুই সদস্য—ইয়াও ওয়েন-উয়ান (Yao Wen-Yuan)) এবং চীনের তনয় উপপ্রধানমন্ত্রী, তেং-এর অধস্তন সহকারী, সেনাবাহিনীর চীফ 'পলিটিক্যাল'

কমিশনার এবং পলিট ব্যারোর, নয়-সদস্য বিশিষ্ট স্ট্যাণ্ডিং কমিটির জীবিত ছয়জনের একজন চাং চুন-চিয়াও (Chang Chun-Chiao)। তেং-এর নাম না নিয়ে তার কয়েকটি আধিক নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করে। তাদের বক্তব্য এই নীতি কার্যকর হলে চীনে পুঁজিবাদ ফিরে আসবে, সোভিয়েতের মত সংশোধনবাদ আত্মপ্রকাশ করবে। ওয়েন ও চাং-এর পেছনে হয়তো মাও ছিলেন। কিন্তু তেং বেশীদূর সমালোচনা গড়াতে না দিয়ে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে সমালোচকরাও চুপসে যায়।

চু'এর জীবদ্দশায়ই তেং তার ক্ষমতা সংহত করে নিয়েছে, র্যাডিকালদের সঙ্গে যুববার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। বর্তমানে মাও-এর পরই দলে ক্ষমতার মাত্রায় তেং-এর স্থান। কিন্তু চু যেমন তেং-কে ক্ষমতায় পুনর্বাসিত করে দিয়ে গেছেন, তেমনি র্যাডিকালদের ডানা-কিছুটা ছেঁটে জাতীয় ঐক্যের বনিয়াদ তৈরী করে দিয়ে গেছেন। রোগশয্যা থেকে উঠে এসে ১৯৭৫-এর গোড়ায় চীনা কমুনিষ্ট পার্টির জাতীয় জনকংগ্রেসের দশম অধিবেশনে পার্টির ও প্রশাসনের ক্ষমতার চক্রে প্রবীণ ও নবীনদের সংহত করে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করে মাও-উত্তর এবং চু-উত্তর চীনে অসুদৃশ্যের সম্ভাবনামূলক করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সাংহাই-এর বর্তমানে ৪৭ বছর বয়স্ক র্যাডিক্যাল ওয়াং হুং-ওয়েন (Wang Hung-Wen) মাও সে-তুং-এর চোখের মণি, মাও সে তুং-এর জ্যেষ্ঠতম র্যাডিক্যাল চিয়াং চিং-এর (Chiang Ching) বনিষ্ঠ সহযোগী।

চু-এর অসুস্থতার ক্ষণে মাও-এর নেতৃত্বে ১০৭-সদস্যবিশিষ্ট যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটিতে মাও-এর পরই ওয়াং-এর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। দশম কংগ্রেসে চু'র প্রস্তাবে যে ছয়জন দলের ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিল মাও-এর চোখের মণি ওয়াং তাদের একজন। এই ছয়জনের মধ্যে মাত্র তিন জন জীবিত এবং স্বপদে বহাল রয়েছেন। এরা হলেন : ওয়াং, তেং, এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যার ভাপ্যবিপর্যয় ঘটেছিল এবং চু যার পুনর্বাসন দিয়ে গেছেন—ইয়ে চিয়ে-ইং (Yeh Chie-Ying)। ওয়াং পলিট ব্যারোর নয় সদস্য বিশিষ্ট স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যদেরও একজন। এই স্ট্যাণ্ডিং কমিটি চীনে সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতার অধিকারী। পলিট বুরোতে চু'র পর ওয়াং-এর স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এদের মধ্যে জীবিতরা হলেন : মাও, ওয়াং, তেং, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়ে চিয়ে-ইং, চু তে (Chu Teh) এবং চাং চুং-চিয়াও—(Chang Chung Chiao)। দশম কংগ্রেসে চু'র প্রস্তাবে ১২ জন ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার নিযুক্ত হয়েছে। তাদের তিন নম্বর স্থান নির্দিষ্ট হয় র্যাডিকালদের অগ্রতম চাং চুন-চিয়াও।

দশম কংগ্রেসে নবীন ও প্রবীণের যৌথ নেতৃত্বে বারজন ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টারের মধ্যে আরও র্যাডিকালরা স্থান পেয়েছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বও পেয়েছে। বারজন ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টারের মধ্যে চারজনের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। লি সিয়েন-নিয়েন (Li Hsien-Nien) প্রধান

অর্থনৈতিক প্রশাসক, চেন সি লিয়েন (Chen Hsi-Lien) পিকিং সামরিক ঘাটির কমান্ডার, হুয়া কুয়ো—কিং—(Hua Kuo feg) নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ইউ চিউ-লি (Yu Chiu-li) পরিকল্পনা মন্ত্রী। এদের বয়স ষাটের উর্ধ্ব, এবং এবং চু ও তেং-এর মধ্যপন্থায় আস্থা রাখে।

র্যাডিকালদের মধ্যে আর একটি প্রখ্যাত ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি প্রশাসনে কোনো স্থান না পেলেও চীনা প্রচারযন্ত্রে এই নাম,—ইয়াও ওয়েন-উয়ান—(Yao Wen-Yuan) বহুল প্রচারিত। সংবাদ-পত্রে, রেডিও, টেলিভিশনে তার নাম উল্লিখ করা হয় দেশের একজন প্রমুখ নায়করূপে—‘One of the leading personalities’। ১৯৭৫ ব সেক্টেশ্বরে চীনে একটি জাতীয় শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তাচাই-তে। জাঙ্গুয়ারীতে দশম জাতীয় কংগ্রেসের পর সেক্টেশ্বরে তাচাই (Tachai) জ্ঞাননাল স্টাডি কনফারেন্স গত বছরের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সমাবেশ। চু তখনও ক্যালারে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েন নি। তাচাই-এ পলিট ব্যুরোর ২১ জন সদস্যদের মধ্যে ১৩ জনই হাজির ছিল এবং দলীয় কর্মকর্তারা সারা চীন থেকে হাজির ছিল। তাচাই সমাবেশ-এর আলোচ্য ছিল দশম কংগ্রেসে চু’র ঘোষিত লক্ষ্য ২০০০ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে চীনে একটি শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণতিতে কৃষির ভূমিকা। বর্তমান কৃষিব্যবস্থায় কমানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কৃষি নিয়ে নবীনে প্রবীণে জোরালো বিতর্ক হয় এবং নবীনরা আশঙ্কা করে

এই অর্থনীতি বজায় থাকলে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদ ফিরে আসবে। ইও ওয়েন-উয়ান (Yao Wen-Yuan) নবীনদের পক্ষ থেকে তাচাই বিতর্কে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। তাচাই-এর পরই তেং-এর বিরুদ্ধে গত অক্টোবরে চীনা সংবাদপত্রে প্রচ্ছন্ন সমালোচনা আরম্ভ হয়। কল্পিত কাহিনীর নায়কের গায়ে ‘শোষণবাদী’ ‘আত্মসমর্পণকারী’—“(Capitulationist)”—সোভিয়েত রুশের কাছে আত্ম-সমর্পণকারী—অপবাদ এঁটে দেয়। চু তখনও এই ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল। ওয়াংকে সাংহাইতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই গত ১লা অক্টোবর চীনের জাতীয় দিবসে তাকে পিকিং দেখা গেলো না। অথচ, চীনের জাতীয় জীবনে যারা গণমাগ্ন এই দিকটিতে তাদের সকলকেই পিকিং-এ হাজির থাকতে দেখা যায়। ওয়াং ডিসেম্বরে পিকিং-এ সম্মানের আসনে ফিরে আসে। মাও সে-তুং-কে দিয়ে তেং-এর ক্ষমতা খর্ব করার যদি এরা চেষ্টাও করে, সম্ভবত র্যাডিকালরা ব্যর্থ হবে। কারণ তেং ইতিমধ্যে তাদের সকল প্রকার প্রতিরোধ প্রতিহত করে চু-এর উত্তরাধিকার রক্ষার জন্ত তৈরী হয়েছে। মাও-ও অতঃপর তাতে সায় দেবেন, সেই সম্ভাবনাই সমধিক, চু কমুনিষ্ট পার্টির কাছে নিষিদ্ধভাবে কয়েকটি অনুরোধ জানিয়ে গেছে, যাকে তার ‘টেস্টামেন্ট’ (‘Testament’) বলা চলে। এই ‘টেস্টামেন্ট’ও বোধ নেতৃত্বকে শক্তি দেবে আশা করা যায় এবং র্যাডিকালরা কিছুদিনের জন্ত প্রবীণদের সঙ্গে আপোষ করে এই নেতৃত্বের অংশীদার

হবে। র‍্যাডিক্যালদের অস্বাভাবিক তনয় ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী চাং গত বছর হাংচাওতে শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙতে তেং-এর সেনাবাহিনী প্রয়োগ প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে তেমনি সমর্থন করেছে ১১টি সামরিক অঞ্চলের বাহিনীদের ব্যাপক বদলির ব্যবস্থা। এই ঘটনাগুলি দশম কংগ্রেসে গৃহীত চু'র শিষ্টাচারগুলির দূর্বলতার পরিচায়ক এবং চু-উত্তর চীনে স্থিতির সঙ্কেত। মাও-সে তুং-ও অকারণে এই স্থিতি বিস্তৃত করবেন তার সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে তেং-এর ক্ষমতায় আসা এবং ক্ষমতায় সংহতিসাধন অসম্ভব ছিল। আসলে চীনের পররাষ্ট্রনীতিরও কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। 'চু-এর মত তেং আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের সমর্থক। রুশ-মার্কিন দ্বিত্বের প্রবল বিরোধী। ১৯৭৫-এর শেষে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড চীন সফরে গেলে তেং ফোর্ডের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যেই এই মত ভীষণভাবে প্রকাশ করেছে। এশিয়ায় এবং তৃতীয় বিশ্বে গোটা সোভিয়েত রুশের খবরদারীরও (hegemony) তেং প্রবল বিরোধী, সুতরাং সোভিয়েত থেকেও চীনের নীতি অপরিবর্তিত থেকে যাবে।

সফল জয়না-কল্পনার অবসান করে গত ৭ই জানুয়ারী চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রী হুয়া-কুও-ফং (Hua Kuo Feng) অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। শোনা যায় মাও-সে-তুং-এর ব্যক্তিগত নির্দেশে এই মনোনয়ন হয়েছে। এই মনোনয়ন স্থায়ী কিনা তা আরও কিছু সময় না গেলে পরিষ্কার হবে না।

চীনে আর একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ গত ২৩শে জানুয়ারী চীনের ১৮ তম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর আগে ১৭টি বিস্ফোরণের মধ্যে ১৫টি বায়ুমণ্ডলে, ২টি ভূগর্ভে। গত ৭ই অক্টোবর ভূগর্ভে ১৭তম বিস্ফোরণ ঘটে। ১৯৬৪তে চীনের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। ১৯৫৯-এ চীন পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যার ও সাজ সরঞ্জাম সোভিয়েত রুশের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়! চীনের বক্তব্য তারা কোনো অবস্থাতেই প্রথম পারমাণবিক যন্ত্র ব্যবহার করবে না। নিজেদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন এবং ছুই বৃহৎ শক্তির পারমাণবিক একচেটিয়া ভাঙবার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বিলোপের জন্য এই বিস্ফোরণ।

'কল্লোল' যুগের ছুই দিকপাল

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

'কল্লোল' যুগের অস্বাভাবিক জ্যোতিষ্ক প্রথিতযশা কথা-সাহিত্যিক শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ২রা জানুয়ারী ১৯৭৬ তারিখ টাঙ্গা পার্কের বাসভবনে লোকান্তরিত হয়েছেন। শৈলজ্ঞানন্দ বালাকালে স্কুল জীবনে কাজী নজরুল ইসলামের সহপাঠী ছিলেন সে সময় কয়লাখনি অঞ্চলে সমৃদ্ধ মাতামহের আশ্রয়ে বসিত ও প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। সেখানেই কাজী নজরুলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। ছু'জনে একই সঙ্গে পড়ে গল্প ও পদ্য লেখেন। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধলে ছু'জনেই বাঙালী পণ্টনে যোগদানের জন্য সচেষ্ট হলেন। ডাক্তারী

পরীক্ষায় শৈলজ্ঞানন্দ বাস্তব হয়ে গেলেন, নজরুল উত্তীর্ণ হয়ে পন্টনে যোগ দিলেন।

ফিরে এসে অর্থাভাবে শৈলজ্ঞানন্দের পড়াশোনা বেশীদিন চললো না। তার সাহিত্যচর্চা শুরু হল। ধীরে ধীরে কলকাতায় কল্লোল-চক্র গড়ে উঠলো। শৈলজ্ঞানন্দ প্রায় দেড়শ উপস্থাপনা লেখেছেন। তার কয়েকটি চিত্রায়তও হয়েছে। কয়লা-খনির শ্রমিকদের জীবন নিয়ে শৈলজ্ঞানন্দই প্রথম লেখেন, কয়লাকুঠির দেশে উপস্থাপন।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

‘কল্লোল যুগ’-এর আর এক দিকপাল অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ‘২৯শে জামুয়ারী ১৯৭৬ খ্রিঃ দশটায় লোকান্তরিত হলেন। অচিন্ত্যবাবু সরকারী চাকুরী জীবনের কঠোর দাবী মিটিয়েও সাহিত্যিক জীবনের সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত রেখেছিলেন, এটা তাঁর সাহিত্য-

প্রতিভার পরম বৈশিষ্ট্য। বলতে গেলে তাঁর মহৎ সৃষ্টিকর্ম চাকুরী জীবনেই রচিত হয়েছে। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর লেখনী বিশ্রাম নেয় নাই। ফলে কিছু অসমাপ্ত রচনা রয়ে গেলো।

অচিন্ত্যকুমার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কবিত্ত্বপে। কবিত্বাতিই তাঁর প্রথম জীবনের পরিচয়। কাব্য থেকে কথা-সাহিত্যে তারপর তার উদ্ভরণ এবং সবশেষে কাব্যময় জীবনী—যার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে—ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী ‘পরমপুরুষ’-এর খণ্ডখণ্ডিতে। শতাধিক গ্রন্থের লেখক অচিন্ত্য কুমার তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘প্রিয়া ও পৃথিবীর’ এবং তার উপস্থাপনগুলির জন্য পাঠীদের মন হরণ করে নিয়েছিলেন। সে-সময় তার স্মৃতির প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি।

জয়ন্তী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র

২য় খণ্ড ১২.০০

পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১০.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী-সমাজের আত্মভাণ্ডার হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বসু

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাঠ্যে করে ইতিহাসের পথ-পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অমুঘ্যায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিন্তারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অন্ততম।

দেশ

প্রাপ্তিস্থান : জয়ন্তী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

থানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ) ১২'০০

পকেট গীতা ৫'০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১০'০০

ভারত-আত্মার বাণী ৭'৫০

Soul of India Speaks ৭'৫০

কর্মবাণী ১'৫০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১'৫০

শ্রীশ্রীচণ্ডী ২'০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিভাসাগর ৩'০০

ছোটদের গল্পগুচ্ছ ৩'০০

ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী ৩'০০

ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড ৩'২৫

বেহুইনের দেশে ৩'০০

নিবেদিতা ১০'০০

বিভাসাগর ১০'০০

শিবরামের কিশোর নাটক ২'০০

ছোটদের সেরাগল্প ৪'০০

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যাঘ্রমে বাঙালী ৪'০০

বীরসে বাঙালী ৩'৫০

বিজ্ঞানে বাঙালী ৫'৫০

বাংলার স্বাধি ৫'০০

বাংলার বিদুষী ৩'৫০

বাংলার মনীষী ৩'০০

রাজর্ষি রামমোহন ৩'০০

যুগার্চ্য বিবেকানন্দ ২'৫০

আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪'০০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ২'৫০

রবীন্দ্রনাথ ৩'০০

জীবনগড়া ৭৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪'০০

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান

৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত রুহুল পরিবর্তিত

সংস্করণ)

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী ৬'০০

আয়ত্তনমান নীরদ সরকারের

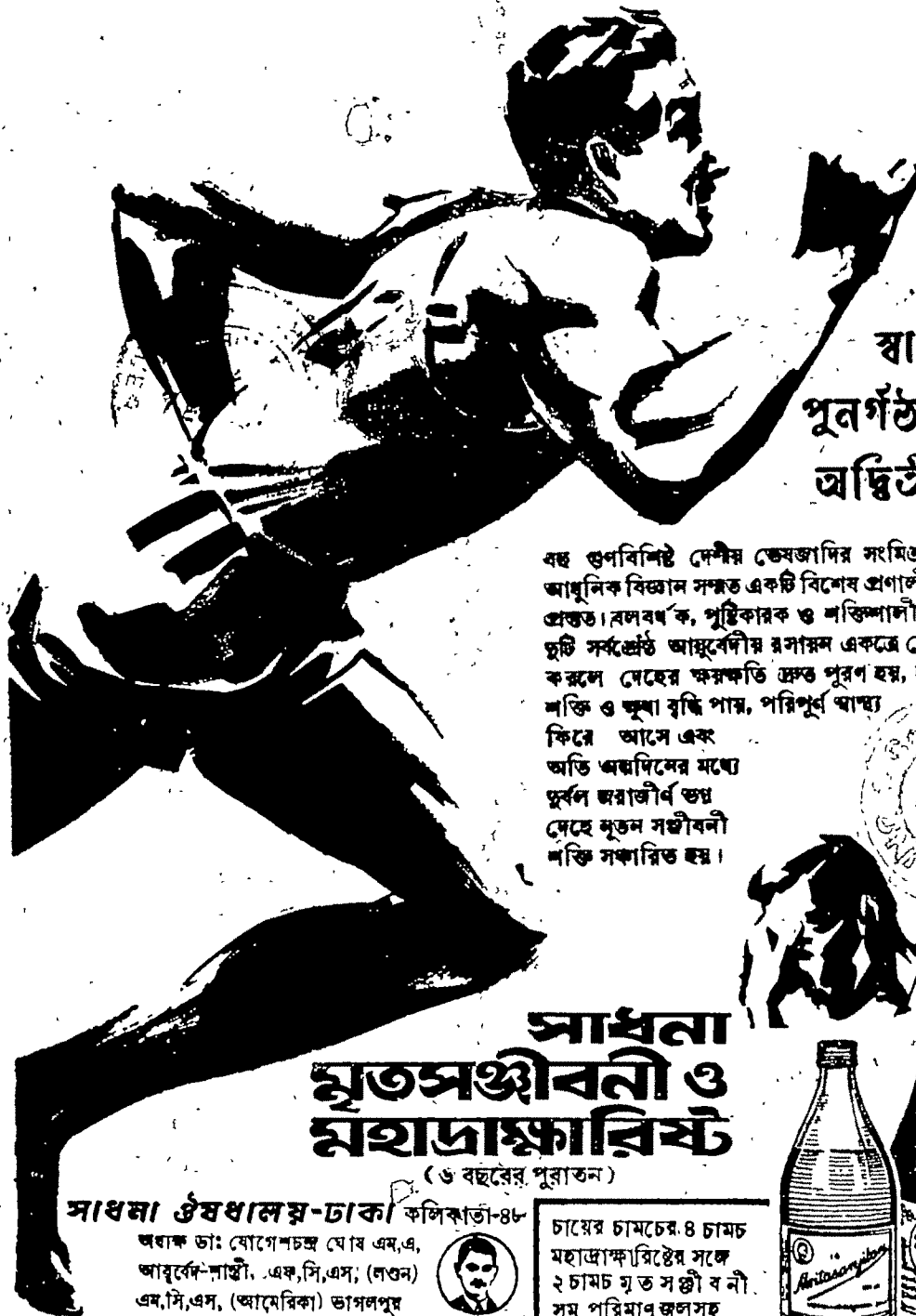
যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ শরীর ও শক্তি ৩'০০

নিবারণ ৫'০০ সরল যোগ ও ব্যায়াম ৩'০০

যোগব্যায়ামে চেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৩'০০ নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন ২'৫০

ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন ৩'০০ আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট ১'০০

প্রোসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২



স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে,
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে
প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই
চুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন
করলে বেহের ক্ষমকতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম
শক্তি ও জুখা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য
কিরে আসে এক
অতি অল্পদিনের মধ্যে
দুর্বল জরাজীর্ণ শরীর
মেহে মূর্তন সজীবনী
শক্তি সকারিত হয়।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদাম্কারিষট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অবাক ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,
আয়ুর্বেদ-সাস্ত্রী, এফ,সি,এস; (লণ্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদচর্চা

চায়ের চামচের ৪ চামচ
মহাদাম্কারিষটের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যহ দু'বার আহারের
পরে সেব্য।



SMM-2/69

Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1.00 with Regtd Postage
Rs 1.70 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পূর্তি উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ছ'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনায় ও ছুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথা-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩ সালের প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভানুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক
জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ১৬

ফোন : ৪৬-১৭১০

সূচীপত্র

জয়ন্তী কাল্পন : : ১৩৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিজয়িনী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬১	কর্মযোগী অধ্যাপক	বীরেন্দ্রনাথ গুহ	৫৭৭
রুশ-চীন দ্বন্দ্ব	অভয়শঙ্কর শর্মা	৫৬২	নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব	আরতি গঙ্গোপাধ্যায়	
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)			(আলোচনা)		৫৮৯
রোপ শস্যায় (কবিতা)	শ্রীফুলকুমার দত্ত	৫৭৫	বর্তমান প্রসঙ্গ		৫৯৩

সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়ন্তী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অগ্ৰাণ্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন রুলের ৪নং করম অনুযায়ী]

(৮নং রুল জুড়িয়া)

১. প্রকাশের স্থান	২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
২. প্রকাশের কাল	মাসিক
৩ ও ৪. মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় ১০।৬৯এ, দেশপ্রাণ শাসনালয় রোড, কলিকাতা-৩৩
৫. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	সুনীল দাস, ভারতীয় ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬
৬. স্বত্বাধিকারীর নাম, ঠিকানা	১. সুনীল দাস, ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ ২. বিজয় নাগ, ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

আমি, কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ কিরণচন্দ্র মিত্র

প্রকাশক

১১।৩।৭৬

সাধনা

বিউটি

ক্রীম



তাঁর মনোহারিনী মৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনমূলভ কমনীয়তা
আর অপক্লপ লাভণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য



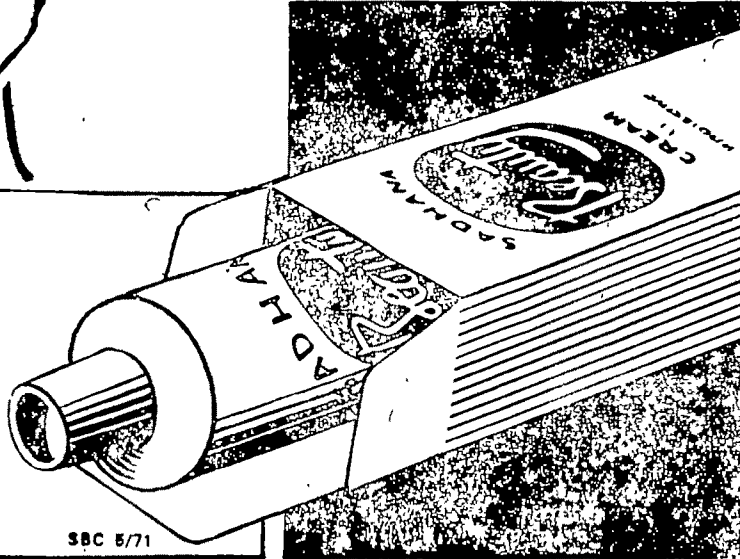
সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮



Dr. Ghose

শাখা ভারতের সর্বত্র



SBC 5/71

ଦାସତ୍ବୀ

୪୦ ବର୍ଷ • ଏକାଦଶ ମାସ • ଫାଲ୍‌ଗୁନ ୧୩୫୮

୩୩

ବିଚାରିଣୀ ନାହିଁ ତବ ଡ଼ର,
ଦୁଃଖ ଓ ଶକ୍ତି ତବ କର୍ମ।
ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ
ଅନ୍ୟାୟ ଶକ୍ତିର ଦାସ,
କହିଲୁ ଏହି ମାରିଚିକା ॥

ସୁବିଶାଳାକାଶିକା

୩୩
୧୩୫୮

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব

অভ্যুদয় শর্মা

বিরোধের বীজ

মস্কো ঘোষণার ত্র্যম্বর্ষ চীন এবং সোভিয়েত রুশ একই দৃষ্টিকোণ থেকে দূরের কথা, বলতে গেলে বিপরীত দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেছে। এই বিপরীত দৃষ্টি কোণের উৎস সন্ধান করলে কয়েকটি ঘটনার দিকে নজর দিতে হয়। ১৯৫৭-এর আগষ্ট মাসে সোভিয়েত রুশ আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের (Inter-continental multi-stage ballistic missile) সার্বিক পরীক্ষার সংবাদ ঘোষণা করে বিশ্বে বিশ্মিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে নতুন হাইড্রোজেন অস্ত্রের পরীক্ষাও সোভিয়েত রুশ এ-বছর সম্পন্ন করে। আর সব চাইতে বিশ্বয়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিজ্ঞাচমক খেলে যায় সে-বছর ৪ঠা অক্টোবর মহাকাশে সোভিয়েত রুশের প্রথম স্পুটনিক (Sputnik) প্রেরণে। লেনিন-বিপ্লবের ৪০ তম বার্ষিকীর মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ওরা নভেম্বর আর একটি স্পুটনিকের আবির্ভাব আমেরিকাকে এবং গোটা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াকে যেমন মৈরাস্ত্রের অঙ্ককারে ঢেকে দিল, তেমনি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট শিবিরে উল্লাসের ঢেউ বইয়ে দিল। চীনা

কম্যুনিষ্টদের চোখে সোভিয়েত রুশের এই অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাফল্য সামরিক যন্ত্রের প্রয়োগে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে বহু পেছনে ফেলে ভীত-চকিত করে তুলেছে। সুতরাং এই নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কম্যুনিষ্ট শিবির সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে পারতে। ফলে বিশ্ব বিপ্লব স্বরাধিত হবে। সমাজবাদে উত্তরণও আস্ত হয়ে উঠবে।

আর সোভিয়েত রুশ নেতৃবৃন্দ? চীনা কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যেমন সোভিয়েত রুশের এই নতুন হাতিয়ার-গুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উপর আক্রমণে স্তম্ভাক্রমে দেখেছি। তেমনি সোভিয়েতের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই হাতিয়ারগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতিকে রুখবার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে! সাম্রাজ্যবাদীদের সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা তো প্রতিহত হবেই, উপরন্তু পুঁজিবাদীশক্তির সঙ্গে সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজবাদের উত্তরণের পথও বুঝিবা খুলে গেলো। অস্তুতঃ সোভিয়েত রুশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো সম্ভাব্য আক্রমণ

থেকে নিশ্চিততর হোলো, সেই সঙ্গে গোটা শিবিরেরও।

১৯৫৭-র মস্কো সম্মেলনে ১৮ই নভেম্বর মাও-সে-তুং-এর বক্তৃতায় মস্কো ঘোষণা-সনদের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বৈপরীত্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। সে-সময় মাও-সে-তুং কিম্বা ক্রুশ্চেভ এই বক্তৃতা যে বিপরীত চিন্তার ছোতক, ততটা তলিয়ে-দেখেন নাই। মাও-সে-তুং কবি মানুষ, কল্পনার পাখায় ভর করে মনের চিন্তাকে কাব্যময় ভাষায় মুক্তি দিয়ে বলেন: 'The east wind is prevailing over the west wind. That is to say, the forces of Socialism are overwhelmingly superior to the forces of imperialism. মাও তার এই চিন্তাকে আরও স্পষ্টতর করে বললেন: 'I am of the opinion that the international situation has reached a new turning point..... That is to say the Socialist forces are overwhelmingly superior to the imperialist forces'। এই সঙ্গে মাও সাম্রাজ্যবাদীদের তাচ্ছিল্য-ভরে 'কাগুজে বাঘ' রূপে উল্লেখ করেন, এই 'নকল বাঘদের' পরাজয় অবশ্যস্বাবী। মাও-এর এই বিশেষণটি বহুবারস্তের মত সোভিয়েত রুশ নেতাদের কানে লেগে থাকবে। ক্রুশ্চেভ তো বহুবারস্তে ইতিমধ্যে সিদ্ধহস্ত হয়ে গেছে, তার বহুবারস্তগুলি অনেক সময় বিদুষকদের অর্বাচীনতার মত শুনিয়েছে। মাও-এর 'কাগুজে বাঘ'র সঙ্গে তাল

রেখে সে-সময় ক্রুশ্চেভও সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য করে বলতো—আমরা ওদের জ্যাস্ত পুতবো—'We shall bury them'।

কিন্তু মাও-সে-তুং সেদিন আরও মারাত্মক কথা বলে তার মনোভাবকে অনাবৃত ও দ্ব্যর্থহীন করেছেন। আণবিক অস্ত্রের যুগে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি বৃহৎ শাস্ত্রশুলিকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবে, কারণ আণবিক যুদ্ধের পরিণতি বিশ্বের সর্বাঙ্গক ধ্বংস। সোভিয়েত রুশের পুঞ্জিবাদ ও সমাজবাদের সহঅবস্থানের তত্ত্বের মূলে আণবিক যুদ্ধে সর্বাঙ্গক ধ্বংসের অবশ্যস্বাবিতা। মাও এ-সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, ১৯৫৭-এর ১৮ ডিসেম্বর মস্কো সম্মেলনে নিবিধায় সে তত্ত্ব ঘোষণা করে বলেন: পৃথিবীর ২৭০ কোটি মানুষের মধ্যে হয় তো আণবিক যুদ্ধের প্রতিঘাতে 'এক-তৃতীয়াংশ কিম্বা অর্ধেক বিশ্ববাসী ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐকৈক বৈদেশিক কুটনীতিকের সঙ্গে আলোচনাচ্ছলে তার বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: 'I said that if the worst came to the worst and half of the mankind died, the other half would remain while imperialism was razed to the ground and the whole world would become Socialist,' মাও-সে-তুং-এর এই বক্তৃতার একটি পৃথক ভাষ্য সোভিয়েত রুশীদের মুখে শোনা গেছে, তারা বলতে চেয়েছেন, মাও-ও-সে-তুং বলেছেন আণবিক যুদ্ধে হয়তো চীনের ৩০ কোটি

লোক নিহত হবে, তারপরেও তো ত্রিশ কোটি থেকে যাবে। তাই আণবিক যুদ্ধে চীনও রক্ষা পাবে কমুনিজমও রক্ষা পাবে। আমেরিকার সঙ্গে আণবিক যুদ্ধে মাও পিছু-পা নন, এই ধারণা সোভিয়েত নেতাদের মনে ধীরে ধীরে দৃঢ়মূল হয়ে যায়। কারণ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্ব আণবিক যুদ্ধে কারও নিষ্ফলি নেই। সমগ্র বিশ্বই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সোভিয়েত রুশের নেতারা তাদের নূতন বৈজ্ঞানিক শাকল্যের ফলশ্রুতিরূপে দেখেছে শক্তির ভারসাম্য অনিশ্চিতভাবে সমাজবাদী শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং এই নব অর্জিত শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে তাদের সম্মুখে দেবে, যুদ্ধ থেকে বিরত করবে। অতঃপর বিনা যুদ্ধেই সমাজবাদী শিবির সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে কাবু করে ফেলবে। মাও-সে-তুং যে শক্তির আক্রমণাত্মক প্রয়োগ, সমাজবাদী শিবিরের জয়ের জন্ত অব্যর্থ ভেবেছেন, ত্রু-শুচু সেই শক্তিকে প্রতিরক্ষার ভূমিকায় অব্যর্থরূপে দেখেছে। ১৯৫৭-এর মস্কো সম্মেলনের ঘোষণা-সমদ সম্পর্কে চীন ও সোভিয়েত রুশের এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি অনতিকালেই রুশ-চীনের তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক দ্বন্দ্বের সূচনা করলো।

প্রতিরোধের বোজ-এর উৎস সঙ্কানে এই সঙ্গে আর একটি ঘটনা স্মরণ করা কর্তব্য। ১৯৫৭-এর ১৫ই অক্টোবর অর্থাৎ মহাকাশে সোভিয়েত রুশের প্রথম স্পুটনিক পাঠানোর মাত্র ১১ দিন পর সোভিয়েত রুশ ও চীন একটি দলিল স্বাক্ষর করে। এই দলিলটিকে পরবর্তীকালে চীনারা 'জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্ত নূতন

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সংক্রান্ত চুক্তি'—'an important agreement with respect to new technology for national defence'—এবং এই দলিলের শর্ত অনুযায়ী সোভিয়েত রুশ পিকিংকে আণবিক বোমার নমুনা দেবে এবং এই বোমা তৈরীর কারিগরী বিস্তার বিস্তৃত বিবরণ জানাবে—'a sample atomic bomb and technical details for its manufacture'। মাও-সে-তুং নভেম্বর সমাবেশে চীনের উচ্চপর্ষায়ের সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত রুশের প্রতিনিধিস্থানীয়দের সঙ্গে তাদের দীর্ঘ বৈঠকও হয়। শোনা যায়, এই বৈঠকে চীনারা ক্ষেপণাস্রু চেয়েছিলো ও তা তৈরীর কারিগরী শিক্ষণের সুযোগও চেয়েছিল এবং চীনাদের ধারণা হয়েছিলো সোভিয়েত রুশ তাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবে। সন্তুষ্ট এই আশ্বাসের বশবর্তী হয়েই চীনা-উপকূলের অদূরবর্তী কুয়েময় ও মাংসু দ্বীপ দুইটি আক্রমণের জন্ত চীনারা ১৯৫৮-এর গোড়ায় তৈরী হয়েছিলো। কিন্তু সোভিয়েত রুশ সরাসরি চীনাদের এই উদ্যোগে সাহায্যের আশা অগ্রাহ্য করে দেয়।

তা সত্ত্বেও ১৯৫৮-এর আগস্টের শেষে চীনারা কুয়েমায় দ্বীপে বোমার আঘাত শুরু করে। তার আগে ত্রু-শুচু সোভিয়েত প্রতিরক্ষার মন্ত্রী ম্যালিনভাঙ্সকে নিয়ে ১৯৫৮-এর ৩১শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত পিকিং-এ থেকে মাও-সে-তুং ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে। এই আলোচনার রুশ নেতারা স্পষ্টভাবেই চীনাদের

বুঝিয়ে দেয় ক্ষেপণাস্ত্র কিনা আণবিক অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলে, সেই অস্ত্র থাকবে সোভিয়েত সামরিক নেতৃস্থানীয়েরা। চীন ভূখণ্ডে সোভিয়েতের সামরিক ভাবেদারীতে, চ্যাং কাইশেকের ফরমোসা সরকারের বিরুদ্ধে কুয়েময় অভিযানের প্রস্তাব যদি সত্যিই হয়ে থাকে সেটা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, চীনের দিক থেকে সে প্রস্তাবের উদ্বেজিত প্রত্যাখ্যান অবধারিত ছিল। কারণ, সোভিয়েতের আণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণাত্মক শক্তি সম্বন্ধে চীনের উচ্চ দায়িত্ব সোভিয়েতের প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব চাইতে যে কত ভিন্নতর ১৯৫৭-এর ডিসেম্বরে 'ওয়ার্ল্ড কালচার'—'World culture'—নামক পত্রিকার একটি নিবন্ধে তা প্রস্ফুট হয়ে ওঠে: 'The absolute superiority of the Soviet Union in inter-continental ballistic missiles has placed the striking capabilities of the United States in an inferior position The Soviet inter-continental ballistic missiles cannot only reach military base in Central Europe, Asia or Africa, but they can also force the United States for the first-time in history, into a position from which neither escape nor the power to strike back is possible.'

সোভিয়েত কশের নিকট চীনের এই প্রত্যাশা যে কত অপ্রাসঙ্গিক ছিল তা প্রমাণিত হতে বিগত

হোলো না। ১৯৫৭-র ডিসেম্বরে মস্কো সম্মেলনের পরই মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটে তার পরীক্ষা হয়ে গেলো। ১৯৫৮-এর ১৩ই জুলাই ইরাক বিদ্রোহের পর আমেরিকা ও ব্রিটিশ যথাক্রমে লেবাননে ও জর্ডানে সংখ্যাভীত সেনাবাহিনী নামিয়ে দিলো। চীন ও সোভিয়েত রুশের নিশ্চিত ধারণা হল, পশ্চিমী সেনাবাহিনী অতঃপর ইরাকী বিদ্রোহ দমনের অভিযানে নিয়োজিত হবে। চীন চেয়েছিলো, সমাজবাদী শিবিরের আণবিক শক্তিশক্তির প্রাধান্য প্রয়োগে সোভিয়েত রুশ পশ্চিমী সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করুক। ক্রুশ্চেভের সামনে উভয়সঙ্কট। পশ্চিমীরা ইরাক আক্রমণ করলে তাদের রুশতে হবে যার পরিণতিতে ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। অপরপক্ষে, আক্রান্ত ইরাকের সহায়তায় এগিয়ে না গেলে ইরাকী স্বাধীনতার সংগ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সোভিয়েত রুশের পক্ষে সে এক মারাত্মক পরিণতি। ক্রুশ্চেভ ব্যাকুল হয়ে উঠলো, পশ্চিমীদের সঙ্গে শীর্ষবৈঠকে বলে সঙ্কট-উত্তরণের ক্ষমতা। শীর্ষবৈঠকের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করতে পারলে যুদ্ধ অনিবার্য। ক্রুশ্চেভের ভাষায় "The guns have already started to speak," ১৮ই জুলাই ক্রুশ্চেভ আইসেনহাওয়ারকে চিঠি লিখলো। ভাষা তার নরম, অমুরোধে ঙ্কিত: We address you not from a position of intimidation but from a position of reason. We believe at this momentous hour that it would be more reason-

able not to bring the heated atmosphere to boiling point, it is sufficiently inflammable as it is."

আর চীন কী করল? চীন ক্রুশ্চেভের আবেদন-নিবেদনের ঘোরতর বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদীদের শিক্ষাদেবার এই সুযোগ! তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সময় সাম্রাজ্যবাদীদের মোক্ষম আঘাত হানতে হবে। ক্রুশ্চেভ যে দিন আইসেনহাওয়ারের কাছে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তাপ উপশমের জন্য আবেদন জানালো তারপর দিন, অর্থাৎ ১৯শে জুলাই, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের মুখপত্র 'পিপলস ডেইলিতে' তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলো। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল "পৃথিবীর যে সব দেশ এবং মানুষ শান্তি ও স্বাধীনতাকে ভালবাসে তারা নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে পারে না।" ("The Countries and Peoples of the world who Love Peace and Freedom cannot look on with folded Arms")। সম্পাদকীয়ে একটি অংশে লেখা হোলো: "Nothing can be saved by yielding to evil, and cowardly wrong only helps the devil.....if the U. S.—British aggressors refuse to withdraw from Lebanon and Jordan, and insist on expanding their aggression, then the only course left to the

people of the world is to hit the aggressor on the head!.....The imperialists have always bullied the weak and been afraid of the strong. The only language they understand is that of force." ক্রুশ্চেভের শীর্ষবৈঠকের আবেদনে কয়েকদিন বাদে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিও সম্মতি দিয়েছিলো। ততোদিনে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, যে পশ্চিমীরা ইরাক আক্রমণ করবে না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের এই সঙ্কট প্রমাণ করে দিয়ে গেলো ১৯৫৭-সালে মস্কো ঘোষণায় চীন-রুশের ঐক্যমত সত্ত্বেও হুইপক আদর্শগতভাবে হুই মেরুতে অবস্থান করছে এবং রুশের ও চীনের দ্বন্দ্ব একেবারে মৌলিক—আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কৌশলগত কিম্বা কর্মসূচীগত মনে হলেও।

১৯৫৭-র মস্কো ঘোষণা যে রুশ-চীনের কাছে বিপরীত অর্থ বহন করে নিয়ে গেছে, তার আর একটি অব্যবহিত সাক্ষ্য ১৯৫৮-এর আগষ্ট মাসে পাওয়া গেলো। পশ্চিমী শক্তিদের চাইতে সোভিয়েত রুশের সামরিক শক্তির ভারসাম্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৯৫৮-র গ্রীষ্মে চীনা ভূখণ্ডের সংলগ্ন কুয়েময় ও মাংসু দ্বীপ চীনা কম্যুনিষ্টরা আক্রমণের উত্তোগ শুরু করলে, চীনা নেতাদের ভরসা সেই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রুশ তাদের উন্নত সমরসজ্জা নিয়ে চীনের পেছনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সোভিয়েত রুশ চীনকে হতাশ করতে বিন্দুমাত্র ছিঁদা করে নাই। ঘটনার পরস্পরা

কতকটা এই ধরণের। ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত রুশের প্রতিরক্ষা সচিব ম্যালিনভস্কিকে নিয়ে ১৯৫৮-র ৩১শে জুলাই থেকে ওরা আগষ্ট পর্যন্ত চীন সফর করেন। মাংসু এবং কুয়েময় দ্বীপ আক্রমণ নিয়ে চীন-রুশ আলোচনা হয়েছিলো কি না, তা সঠিক জানা না গেলেও এটা স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা শক্ত নয় যে চীনারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে সোভিয়েত রুশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলো। চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের পরবর্তী পরিণতি থেকে বিশেষজ্ঞদের অনুমান সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত রুশের সেনাধ্যক্ষের কতৃৎস্বাধীনে ক্ষেপণাস্র দিতে সম্মত হয়েছিলো। যে সর্ত চীনের পক্ষে মেনে নেওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল।

চীনা নেতৃবৃন্দ কিন্তু দমলো না। ১৯৫৮-র ২৩শে আগষ্ট তারা কুয়েময় দ্বীপে কামান দাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা চীনকে সতর্ক করে বললো যে চীনারা কুয়েময় দ্বীপ আক্রমণ করলে আমেরিকা তা শুধু প্রতিহত করবে না, প্রয়োজনবোধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগে তারা কুয়েময় দ্বীপকে রক্ষা করবে। সোভিয়েত রুশ একেবারে নীরব রইলো। তাদের হাতে ক্ষেপণাস্র, থাকা সত্ত্বেও এবং সে-সময় পশ্চিমীদের চাইতে সোভিয়েত সামরিক শক্তির অবিসম্বাদী প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও মাও-সে-তুং-এর 'the east wind is prevailing over west wind' অথবা 'the Socialist forces are overwhelmingly superior to the imperialist forces'—এর মূল্যায়ন কোনো কাজেই

লাগলো না। চীন কুয়েময় দ্বীপে বোমা ফেলা বন্ধ করলো, কুয়েময় আক্রমণ তো দূরের কথা! পরবর্তী-কালে কুয়েময়-এর ওপর এই বোমা বর্ষণকে আমেরিকা ও চ্যাং-কাই-শেকের প্রতি প্ররোচনা-মূলক আচরণরূপে সোভিয়েত রুশ চিহ্নিত করে এবং এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৫০-এ স্বাক্ষরিত রুশ-চীন মৈত্রীচুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে—সোভিয়েত রুশ সরাসরি চীনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে। কারণ ১৯৫০-এর চুক্তির ৪নং ধারার (Article IV) পারস্পরিক আলোচনার সর্ত অনুযায়ী সোভিয়েত রুশের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করেই চীন একতরফা কুয়েময় দ্বীপে বোমা বর্ষণ করে। ৪নং ধারাটিতে বলা আছে: "Both High contracting Parties will consult with each other in regard to all important international problems affecting the common interests of China and the Soviet Union, being guided by the interests of Consolidating peace and universal security."

চীন ও সোভিয়েত রুশের মধ্যে সমাজবাদী শিবিরের তাত্ত্বিক মূল্যায়নের বিপরীত প্রকৃতি ১৯৫৭ এর মস্কো সম্মেলনের অল্পকালের মধ্যেই আর একবার আত্মপ্রকাশ করলো।

অতীত-বিরোধ

১৯৫৭-এর আগস্টে চীন-রুশের সম্পর্কের পথে যে

কণ্টক শয্যা ছিল, তার আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আরও সবিস্তারে কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ দরকার।

স্ট্যালিন তো কোনোদিনই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার নেতা মাও-সে-তুং-এর উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন না। শোনা যায় স্ট্যালিন মাওকে একজন মেকি কম্যুনিষ্টরূপে (“a margarine Communist”) আখ্যাত করতেন। মাও-এর ওপর চ্যাং কাইশেককে যে স্থান দিয়েছেন, ইতিহাসে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। চীন থেকে যে প্রথম জাঁকালো দলটি সোভিয়েত রুশ সামরিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার জন্ত প্রেরিত হয়, তার নেতা ছিল চীনের ১৯১১ র জাতীয় বিপ্লবের জনক ডঃ সান-ইয়াং-সেনের মন্ত্রিসভা যুবক চ্যাং কাইশেক। লেনিন সে-সময় বিশ্ববিপ্লবের কথা ভাবছেন। রুশ বিপ্লবের পর ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে সে-সব দেশের আমিকরা বিপ্লবের মহড়া নেবে,—বিশেষভাবে জার্মানিতে—এই ছিল সেদিন বিপ্লবের প্রথম নির্ভর-স্থল। কিন্তু লেনিন হতাশ হলেন তার স্বপ্নে গড়ে ওঠা বিপ্লব ব্যর্থ হল। তবুও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংস্থা “কমিনটার্ন” (Comintern) রয়েছে ১৯১৯ লেনিনের হাতে তৈরী। চীনের কম্যুনিষ্ট বিপ্লবে এই সংস্থাকে কাজে লাগানো যায় না। লেনিনের সঙ্গে চীনের জাতীয় বিপ্লবের নেতা ডঃ সান-ইয়াং-সেন এর সম্পর্ক সোহান্তের। সান-ইয়াং-সেন ১৯২৩ সালে চেয়ে পাঠালেন রুশ পরামর্শদাতা। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ও বিপ্লবী মিখাইল বোরোডিন এলেন সুখ্য পরামর্শদাতারূপে সঙ্গে এলেন মার্শাল

ব্রুখের। এরা কমিনটার্নের প্রতিনিধি তো বটেই, তার চাইতেও বেশী—এরা স্ট্যালিনের বিশেষ প্রতিনিধি রূপে এলেন। কারণ ততোদিনে লেনিন লোকান্তরিত এবং স্ট্যালিন সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের পদে আসীন হয়ে ট্রটস্কি বিতাড়নের উদ্যোগ করেছেন।

বোরোডিন রুশ-বিপ্লব থেকে বিপ্লবের বাঁধাধরা ছক শিখেছেন। শিল্পাঞ্চলের সংগঠিত আমিকরা বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে, তাদের সাহায্য করবে কৃষকের দল। কম্যুনিষ্ট পার্টির সাহায্য তো রয়েছেই। স্ট্যালিন গোড়া থেকেই চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির দিকে না ঝুঁকে চ্যাং কাই-শেকের দিকেই বেশী ঝুঁকেছিলেন। কারণ তার বিশ্বাস ছিল মাও-সে-তুং এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির চাইতে চ্যাং কাই শেকের ও কুওমিং টাং-এর কমতা বেশী। মস্কোতে শিক্ষানবীশ করে অ-কম্যুনিষ্ট সংগঠনকে ভেতর থেকে জীর্ণ করে ফেলার কম্যুনিষ্টদের নীতি সম্পর্কে চ্যাং-কাই-শেক সজাগ ছিল। বোরোডিন এবং তার রুশ সাজোপাজোরা স্ট্যালিনের নির্দেশে চ্যাং কে আড়াল করে তাদের বিপ্লবের কৌশলকে রূপ দেবার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত চ্যাংকে দিশেহারা করবার জন্ত ক্যাপটন-এ একটি ব্যর্থ আমিক-বিদ্রোহের অমুষ্ঠান করলো। চ্যাং-কাই-শেক কম্যুনিষ্টদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাপটন-এ এবং অল্পকয় সহস্র সহস্র কম্যুনিষ্টদের হত্যা করলো। স্ট্যালিনের চীন নীতি সম্পূর্ণরূপে বিফল ও পরাজিত হল।

মাও কিন্তু স্ট্যালিন-বোরোডিনের বিপ্লবের

কৌশলের সঙ্গে কোনোমতেই জড়িত ছিল না। মাও-জিলেন কবি, সাহিত্যিক এবং পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহকারী প্রোগ্রামারিক। পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রোগ্রামারিক এবং ইতিহাসের অধ্যাপক লী-টা-চাও-এর (Li-Ta-Chao) দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। মাও-এর বয়স তখন ২৭ বছর। ছানান প্রদেশের মধ্যবিন্দু কৃষক পরিবারের ছেলে মাও, ১৯২০ সাল পর্যন্ত মাজ্ঞবাদের পাঠ গ্রহণ করেন নাই। তার রাজনৈতিক মতও দানা বাঁধে নাই। নিজে কখনও আদর্শবাদী ভাবতেন, কখনও বা উদারপন্থী কিম্বা গণতান্ত্রিক সংস্কারবাদী। মোট কথা চিন্তার অস্বচ্ছতায় তার মন তখন পরিপূর্ণ। সহপাঠীদের সঙ্গে কখনও নাকি চীনে নৈরাজ্যবাদের প্রয়োগ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

১৯২১-এর জুলাইতে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে মাও ছানানের (Hunan) প্রতিনিধি-রূপে হাজির হন। এর বেশী নয় এবং চাং সাতে (Chansha) মাজ্ঞবাদী পার্টিচক্র সংগঠিত করেন। এই গোষ্ঠির একজন সদস্য কবি এমি সিয়াও-এর (Emi Siao) মতে এই পার্টিচক্রের আলোচনায় আদর্শবাদের ছোয়াচ ছিল এবং কনফুসিয়াস ও কান্টের দর্শনের ধারা যার মধ্যে মিশে ছিল। এমি সিয়াও—যার দীর্ঘদিন মস্কো প্রবাসে কেটেছে—সঠিক বলেছেন কি বলেন নাই, সেই বিতর্ক বাদ দিয়েও মাও-এর রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মতবাদের সঙ্গে বিস্তর প্রভেদ ছিল। সেদিনকার চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির

ফাল্গুন '৮২—২

কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি নির্ধারিত হোতো সোভিয়েত রুশের নেতৃত্বে যার প্রতিনিধিরূপে বোরোডিন চীনে উপস্থিত ছিল। মাও-এর দৃষ্টিতে চীন সে-সময় কম্যুনিজমের পক্ষে অনেকটা অগ্রসর হয়ে সমাজ-বিপ্লবের ('Socialist revolution') স্তরে পৌঁছেছে, আর মাও-এর সতীর্থদের চোখে চীন 'শ্রমিক-কৃষক' বৈপ্লবিক স্তরে ('Worker-peasant') পৌঁছেছে মাত্র। বোরোডিন-নীতি এবং নেতৃত্ব ১৯২৭-এ পর্যুদস্ত হয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও ভেঙ্গেচুরে দিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির রুশ নেতৃত্ব ১৯২৮-এ চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ষষ্ঠতম কংগ্রেসে মাও-সে-তুং-এর নীতির তীব্র নিন্দা করে। সে-বছর কমিনটার্ন কংগ্রেসেও মাও নীতির তীব্রতম ভাষায় নিন্দা করা হয় এবং ট্রুটস্কির ১৯০৫-এর রুশ-বিপ্লব মূল্যায়নের ভাস্কির সঙ্গে মাও-এর চীনা পরিস্থিতির মূল্যায়নের তুলনা করে স্ট্যালিন, ট্রুটস্কির মত মাও-কে উচ্ছেদের চেষ্টা করে।

মাও-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্ত্বেও মাওকে চ্যাং কাইশেক স্পর্শ করতে পারে নাই। কারণ, বোরোডিনের নীতি ও কর্মসূচী থেকে মাও দূরে ছিল, সাং হাই-এ ১৯২৭-এ চ্যাং কাইশেক যখন সহস্র সহস্র কম্যুনিষ্ট নিধনে বাস্ত, মাও সেখানে ছিল না; ক্যান্টনে বোরোডিনদের আয়োজিত 'শ্রমিক বিদ্রোহ' থেকেও মাও দূরে ছিল। তাই যখন বোরোডিন সুখার প্রভুতি চ্যাং কাইশেক-এর ভয়ে দেশত্যাগ করে মাও তখন দেশের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে

সরে গিয়ে লাল ফৌজ গড়ে তুলেছে, অস্ত্রাশ্রু ক্ষুজ ক্ষুজ দল ও তাদের নেতাদের সম্বায়ে। মাও কৃষক-ভিত্তিক বিপ্লবের পন্থন করে এক নতুন পরীক্ষা শুরু করলেন। এই পরীক্ষা সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টি ও তার নেতা স্ট্যালিনের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই পরীক্ষা যদি সফল হয় রুশ বিপ্লবের বিকল্প নীতি ও কৌশল উদ্ভাবিত হবে তাই নয়, চীনে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বোরোডিন যে দায়িত্ব আসীন ছিল, তা সংশয়াতীতরূপে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে। সুতরাং মাও, দলের পলিট ব্যুরো থেকে বিতাড়িত হোলেন সেই সঙ্গে তাঁর নীতি ও কৌশল পরিত্যক্ত হল।

মাও তাঁর তাত্ত্বিক দর্শনের পরিচয় ১৯২৭-এর রাজনৈতিক ঝগড়ার মধ্যে রেখে গেছেন একটি প্রবন্ধে তাতে লিখছেন অনতিবিলম্বে তিনি লক্ষ লক্ষ কৃষককে সজ্জাবদ্ধ করবেন। তারা কি করবে? "They will be violent and as unstoppable as a hurricane. No force can hold them back. They will destroy all obstacles in their path and rush on to freedom. They will dig the grave of any and all imperialists, militarists, bureaucrats.... They will subject every revolutionary party and group and every revolutionary to the strictest examination. Some they will accept, some they will reject."

সাবধান, "কৃষকের চোখ ভুল করে না"—সতর্ক করে দিলেন মাও-সে-তুং।

বিপ্লবে কাদের ভূমিকা সবচাইতে বড়ো হবে? মাও চীন বিপ্লব সম্বন্ধে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। তার মতে চীনে কৃষকরা শতকরা ৭০ ভাগ এবং শহুরে অধিবাসী ও সেনাবাহিনীরা শতকরা ত্রিশ ভাগ অংশ গ্রহণ করবে। মাও-এর এই মূল্যায়নকে মস্কো যে রূপ দিল তাতে চীনা কমুনিষ্ট পার্টি কৃষকদের পার্টি হয়ে দাঁড়ালো এবং মাও হয়ে দাঁড়ালেন কৃষক পার্টির নেতা।

১৯২৭-এ চ্যাংকাইশেকের হাতে চীনা কমুনিষ্ট পার্টি বিশ্বস্ত হবার পর সোভিয়েত রুশের আভ্যন্তরীণ নানা পরিস্থিতি এবং হিটলারের অভ্যুদয়ের ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ঘনায়মান সঙ্কট নিয়ে স্ট্যালিন ব্যাপৃত ছিল। ইউরোপে কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিক-এর সম্পাদক ডিমিট্রিফ-এর নেতৃত্বে ১৯৩৬ সাল থেকে ইউরোপে এবং অস্ত্রাশ্রু দেশে কমুনিষ্টরা যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। ১৯৩৭-এ জাপান আবার চীন আক্রমণ করলে সেই যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি চীনে মস্কোর অনুপ্রেরণায় অনুমত হল। আর চীনে যুক্তফ্রন্টের অর্থ চ্যাং কাই-শেক ও তার দল জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে জোটবঁধা। ১৯৩৯ সালের মধ্যে মস্কো চ্যাংকে আড়াই শ মিলিয়ন ডলার সামরিক ঋণ এবং এতো সমরাস্ত্র দিল যে তা দিয়ে ২৪টি চীনা ডিভিসন ট্যাঙ্ক, প্লেন, ইত্যাদি দিয়ে সাজানো যায়। চীনা কমুনিষ্টরা মস্কো থেকে কোনো যক্ষম সামরিক সাহায্য না

পেলেও চ্যাং-এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুসরণ করে গেছে। মাও বার বার মস্কোর কাছে সাহায্য চেয়ে বিফল হয়েছে। ১৯৩৯-এর জুন-এ সোভিয়েত প্রতিনিধি মন্ত্রী মার্শাল ভেরোশিনভকে একজন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চ্যাং যে চিঠি লেখে তাতেই বোঝা যায় মস্কোর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো যদিও মস্কোর দেওয়া সামরিক শস্ত্র নিয়ে চীনা কম্যুনিষ্টদের মাঝে মাঝে আক্রমণ করতে তার বাধে নাই। জাপানীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েতের সামরিক সাহায্য উল্লেখ করে চ্যাং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছে: 'deep interest and sympathy shown by the army and the people of the Soviet Union in providing China with the material and moral aid which gives her the possibility of carrying on his long liberating war.'

স্ট্যালিনের ধারণা জন্মেছিল মাও এবং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনে ক্ষমতায় আসতে পারবে না, সেজন্য ত্রিশ দশকে তো দূরের কথা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও স্ট্যালিন মাও-কে সাহায্য করে নাই। এমন কি আমেরিকা হিরোসিমায বোমা আক্রমণের পর সোভিয়েত সামরিক বাহিনী জাপান আক্রমণ করলে ১৯৪৫ এর ১৪ই আগস্ট তারিখে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য স্ট্যালিন চ্যাং কাইশেক ও তার জাশজালিষ্ট সরকারের সঙ্গে মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করে

(Treaty of friendship and mutual aid), মাও-এর সঙ্গে নয়।

এছাড়া জাপানী পবাক্ষয়ের পর মাঞ্চুরিয়াতে সোভিয়েত রুশের আচরণ খেঁচও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে তারা ভেবেছিলো যুক্তরাষ্ট্র চীন শাসন করবে চ্যাং কাইশেক, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি নয়। সোভিয়েত সেনারা মাঞ্চুরিয়ার কলকারখানা হয় লুট করে জাহাজ বোঝাই করে রাশিয়ায় নিয়ে গেছে, না হয় ভেঙে চুণমার করে ফেলেছে। সোভিয়েত রুশ বাহিনী ১৯৪৫ এর নভেম্বরে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনা বাহিনী যাতে মাঞ্চুরিয়ার অব্যবহিত দখল না নিতে পারে সে-জন্য চ্যাং কাই শেক-এর অনুরোধে সোভিয়েত বাহিনী ১৯৪৬-এর মার্চ পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়ার দখল রেখে দিলো। ঠিক সেইভাবে চ্যাং কাই শেক-এর সঙ্গে পূর্বসম্মত প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েত বাহিনী পোর্ট আর্থার, ডাইয়েন এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ দখলে রেখে দেয়। সুতরাং যুদ্ধ সমাপ্তির পরও সোভিয়েত বাহিনী চ্যাং কাই শেক-এর স্বার্থের পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল। চীন বিপ্লবকে স্বাধিত করার জন্য চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার নেতা মাও-সে-তুং এর প্রতি তাদের সহায়ক হস্ত প্রসারিত হতে দেখা যায় নাই।

১৯৪৬, ১৯৪৭ সালে, যে সময় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জর্জ মার্শাল চীনা জাতীয়তাবাদী ও চীনা কম্যুনিষ্টদের মধ্যে মীমাংসাস্থাপনের পর এই দুই দলের কোয়ালিশনের চেষ্টায় নিরত ছিলেন,

স্ট্যালিনও চীনা কম্যুনিষ্টদের সেই কোয়ালিশনে যোগদানের জন্ত চাপ দিয়েছিলেন। স্ট্যালিন তার ভুল বুঝেছিলেন কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্টরা চীনে ক্ষমতা দখলের পর। তা না হলে ১৯৪৯-এর ১লা অক্টোবর যেদিন মাও পিকিং-এ সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্টদের সরকার ঘোষণা করলেন, সেদিন পর্যন্ত চ্যাং কাইশেক-এর ক্যান্টনের আশানালিষ্ট সরকারের দরবারে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত এন, ভি, রসচিন (N. V. Roschin) নিযুক্ত থাকতো না। চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার ঘোষণার পরদিন, অর্থাৎ ২রা অক্টোবর স্ট্যালিন রসচিনকে চ্যাং কাইশেকের বিভাড়াই আশানালিষ্ট সরকারের রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে চীনা কম্যুনিষ্ট সরকারের রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত করলেন।

চীনে কম্যুনিষ্ট সরকারের পতন হয়েছে। পৃথিবীতে সে-এক অভূতপূর্ব ঘটনা। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের ওপর কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হোলো। এবার ছই দেশের ছই নেতার—স্ট্যালিন ও মাও-এর—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহামিলন হবে। কিন্তু কৈ? তা তো ঘটতে দেখা গেলো না! চীনে ক্ষমতা দখলের আড়াই মাস পর ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে মাও রণাচ্ছতাবে মস্কো পৌঁছালেন, সোভিয়েত রুশের সঙ্গে মৈত্রীযুক্তির আলোচনার জন্ত। মাওকে নিয়ে জমকালো অভিনন্দন কিছু হোলো না। কয়েকদিন কয়েকটি রুটিনমাসিক অফিসানে মাও-এর উপস্থিতির পর, সংবাদপত্রে মাও-এর সংবাদ পাওয়া গেলো না। এদিকে মৈত্রী আলোচনারও শেষ নেই। চলছে তো চলছেই।

তাই একটা সন্দেহ দেখা দিল, স্ট্যালিনের সঙ্গে মাও-এর মতবৈধ হয়েছে। অবশেষে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সে-সংবাদ ঘোষিত হোলো, কিন্তু মাও তার পূর্বেই পিকিং ফিরে গেছেন।

চুক্তিতে ছই পক্ষের দরকষাকষির স্বাক্ষর হয়ে গেলো বিস্তার। সোভিয়েত রুশ মাকুরিয়া ও কোয়াটাং উপদ্বীপে (Peninsula) ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে যে অধিকার হারিয়েছিলো, এবং ১৯৪৫-এ জাপানের আত্মসমর্পণের পর যে অধিকার পুনরুদ্ধার করেছিলো, সেটা বজায় রেখে দিল। পোর্ট আরথার ও ডাইরেন বন্দর সোভিয়েত রুশের অধিকারে থাকলেও, চীন যৌথভাবে এই বন্দর দুটি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। কিন্তু জাপানী শাস্তি-চুক্তি সম্পাদিত হলে অথবা ১৯৫২ সাল এসে পৌঁছলো, এই বন্দর দুটি চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই মৈত্রীচুক্তিতে সিনকিয়াং প্রদেশেও সোভিয়েত রুশ নিজেদের জন্ত সংরক্ষিত সুযোগের ব্যবস্থা করে নিলো। এছাড়া সোভিয়েত রুশ সুদ-সমেত পরিশোধ্য, পাঁচবছরের জন্ত তিন শ মিলিয়ন ডলার—বছরে ৬০ মিলিয়ন ডলার—ঋণ দিতে প্রতিশ্রুত হোলো। যৌথ রুশ-চীন কোম্পানী গঠন করা হোলো চীনের সিনকিয়াং প্রদেশে এবং অন্ত্র তৈল ও খনিজ সম্পদ উদ্ধারের জন্ত। এই যৌথ কোম্পানীগুলির সর্বদেখে নূতন কম্যুনিষ্ট দেশ চীনকে শোষণের রুশ প্রবণতার একটা অসুমান করা যায়। এই কোম্পানীগুলির মৌল সম্পদ যোগাবে

চীন, কারিগরী বিদ্যা যোগাবে সোভিয়েত রুশ।
সোভিয়েত রুশ এই কোম্পানীগুলির পূর্বকর্তৃত্বে
থেকে মজুদমালের শতকরা ৪১ ভাগের অংশীদার
হবে।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর ঊনিশ মাস পরে, ১৯৫৪র
অক্টোবর মাসে স্ট্যালিনের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে
পিং-এর ক্ষমতাসীলদের সত্যিকারের কার্যক্রম
আলোচনা হয়। এই বৈঠকে একদিকে ছিলেন
জুশ্চেভ, বুলগানিন ও তাদের সহকর্মীরা অষ্টাদিকে
মাও এবং চৌ-এন-লাই। সোভিয়েত রুশের কর্তারা
পোর্ট আর্থার ও ডাইরেনের অধিকার চীনাদের হাতে
প্রত্যাপনের ব্যৱস্থা করে। স্ট্যালিনের সঙ্গে ১৯৫০
এর চুক্তিতে কথা ছিল ১৯৫২ সাল কিম্বা জাপান
শান্তিচুক্তি, যেটা আগে আসবে সে-সময়ই এই দুইটি
বন্দর চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৫০-এর
২৫শে জুন রাতে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া
আক্রমণ করে। যুদ্ধ চলে কয়েক বছর। সেই
অজুহাতে ১৯৫২ এর সময়সীমা বাড়িয়েও নেওয়া
হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫৩-র ৫ই মার্চ স্ট্যালিনও
লোকান্তরিত হয়েছেন। সুতরাং তার মৃত্যুর পর
প্রথম সূযোগে সোভিয়েত রুশের নতুন কর্মকর্তারা
পোর্ট আর্থার ও ডাইরেন বন্দর নিয়ে স্ট্যালিন
১৯৫০ চীনের প্রতি যে অস্থায়ী করেছিলেন তার
প্রতিকার করলেন। মস্কো-নিয়ন্ত্রিত নতুন চীনের
স্বার্থবিরোধী, স্ট্যালিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যৌথ
কোম্পানীগুলিও তারা ভেঙ্গে দিলেন ১৯৫৪-র
অক্টোবরের চীন-রুশ আলোচনার সময়।

চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সময়
উত্তর কোরিয়ায় স্ট্যালিনের নিজস্ব বাছাই মস্কোতে
বসিত, কিম, ইল, সুং ক্ষমতায় আসীন ছিল।
মঙ্গোলিয়াকে স্ট্যালিন সোভিয়েত রুশের প্রত্যক্ষ
দেশরূপেই চইবালসান নামে (Choibalsan)
তারই এক বিশ্বস্ত অত্যাচারী, শাসকের হাত দিয়ে
শাসিত হত। মাঙ্গুরিয়াতে প্রচুর সোভিয়েত সৈন্য
মোতায়েন ছিল এবং চ্যাং কাইশেকের সঙ্গে বোঝাপড়া
স্ট্যালিন করে সেখানকার বিশেষ রুশী অধিকার-
গুলিকে দীর্ঘতর করে নিয়েছিলো। ১৯৫৪-র
অক্টোবরে সীমানা পুনর্বিশ্লেষ নিয়ে, যে-সব
চীনা অঞ্চল দীর্ঘকাল রাশিয়ার কুক্ষিগত হয়েছিলে,
মঙ্গোলিয়ার রাজনৈতিক সত্বা, সোভিয়েত রুশকে
চীনে যে সকল আঞ্চলিক শ্রুযোগ দেওয়া হয়েছে—
এই সব বিষয় সম্পর্কে মাও এবং চৌ সামগ্রিক
আলোচনা করতে চাইলে রুশ নেতারা কোনো
আলোচনায় আসতে অস্বীকার করে। ১৯৫০ এর
আলোচনায় স্ট্যালিন ভূমিকা নিয়েছিলো মদমন্ত
বুহং শক্তিমান রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান শাসকের, আরও
মাও-এর সঙ্গে তার ব্যবহার আজ্ঞাবহ বশবদেব।
অপমানের ছালায় মাও আলোচনা প্রায় ভেঙ্গে
দিয়েছিলেন। একমাত্র মাংগিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি রুশ-
চীনের বৈরীমূলক মনোভাব তাদের আলোচনার
সূত্রে গোঁথে রেখেছিলো।

চীনা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সেই গোড়ার বছরগুলিতে
দুই রাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে কি রকম বিবেচ্য জমে
উঠেছিলো, তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এক

মাকিণী সাংবাদিকের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে। ১৯৫৪র জেনেভায় ইন্দোচীন সম্পর্কিত সকল চুক্তি সম্পন্ন করে মস্কো হয়ে পিকিং ফিরছেন। সোভিয়েত রুশের পররাষ্ট্র দপ্তরের কূটনৈতিক প্রাসাদ ‘স্পিরিডোনভকায়’ (Spiridonovka) ক্রেমলিনের নূতন নেতারা চৌ-কে সম্বর্জনা জানাচ্ছেন। নূতন নেতাদের মধ্যে রয়েছেন; মালেনকভ, মলোটোভ, কাগানেভিচ, ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন ও অখ্রাখরা। স্পিরিডোনভকার রীতি ছিল একটি আভ্যন্তরীণ কক্ষে শাসকদের এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ নেতাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট বৈদেশিক অতিথির আসন। অখ্রাখ-দের আসন অখ্রাখ কক্ষে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সেই নির্ধারিত কক্ষে একমাত্র সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্যদের সঙ্গে চৌ-এর নিভৃত অভ্যর্থনা চলছিল না সেই কক্ষে অখ্রাখ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরা ছিলেন যেমন ব্রিটিশ, সুইডিশ, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। চৌ ছিলেন সেই অভ্যর্থনার প্রাণস্বরূপ মদের গ্রাস হাতে ঘুরে ঘুরে ইংরাজীতে উপস্থিত রুশ অভ্যাগতদের শুভকামনা করেছিলেন। প্রতিবার চীনের পক্ষ থেকে শুভকামনা জানানো হলে, সেটা ইংরাজী থেকে রুশ ভাষায় তর্জমার পর রুশী অভ্যর্থনাকারীরা তার উত্তর দিচ্ছেন, কারণ রুশী পলিটব্যুরোর সদস্যরা তাকি কেউ ইংরাজী জানেন না। ক্রমে ক্রমে চৌ আনাসতাস মাইকোয়ান এর

কাছে হাজির হয়ে মদের গ্রাস তুলে ইংরেজীতে শুভকামনা জানানেন। মাইকোয়ান রুশ ভাষায় জবাব প্রসঙ্গে বলেন।

“চৌ, তুমি তো আমাদের ভাষা খুব ভালো ভাবে জানো, তবে রুশ ভাষায় তুমি বলছো না কেন?”

চৌ ঝটিকি ইংরাজীতে বলেন :

“মাইকোয়ান শোনো, এতোদিনে তোমাদের চীনাভাষা শেখা উচিত ছিল। আমি তো রুশ ভাষা শিখেছি।

চৌ এর কথা রুশভাষায় তর্জমা করে বলার পর মাইকোয়ান রুশ ভাষায় জবাবে বলেন :

“চীনা ভাষা শেখা বড় শক্ত”

“রুশ ভাষার চাইতে শক্ত নয়”—চৌ বলে উঠলেন। “আমাদের রাষ্ট্রদূতবাসে সকালবেলা চলে এসো। আমরা খানন্দের সঙ্গে তোমাকে চীনা ভাষা শিখিয়ে দেবো”—যোগ করে দিলেন চৌ।

মস্কোর অখ্রাখ রাষ্ট্রদূতদের উপস্থিতিতে চৌ এইভাবে সোভিয়েত রুশের নেতাদের অপদস্থ করে সেদিন বিভিন্ন সভায়।

সোভিয়েত রুশের নেতাদের হাতে চীনের অসম্মানের আংশিক প্রতিশোধ নিলো বলা যেতে পারে সেদিন চৌ।

(ক্রমশঃ)

রোগ শয্যা
প্রফুল্লকুমার দত্ত

তার কোনো ছবি নেই এই পৃথিবীতে ;
আমার মনের কোণে তার মুখ ম্লান হয়ে আছে—
চরম হঃখের দিনে সেই ম্লান মুখ কঁাদে বুকের ভিতরে ।
চল্লিশ বছর ধরে এই পৃথিবীর গ্রীষ্মে শীতে
বিক্ষলিত, কখন আমি ছুটি নিয়ে যাবো তার কাছে—
সে-দিকে সে ম্লান দৃষ্টি রেখে কৈদে মরে ।

মিষ্ণু বর্ষমানে বাঁধা আমি, তার দিকে যখনই তাকাই—
দেশি, সে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে মনে মনে সান্নিধ্যের মতো,
কপালে আঙ্গুল রেখে বলে ওঠে—‘খোকা অতো ভয় কেন ? শোন—
বুকের ভিতরে আমি বসে আছি ; কে বলেছে, আমি কাছে নেই ?’
ঘুম ভেঙে যায়, দেশি জীবন-সংগিনী রেখা, ভালোবাসা নত,
চুম্বনের চেয়ে নম্র আঙুলের আকর্ষণে বুকে টেনে যাচে আলিঙ্গন ।

যার কোনো ছবি নেই, সে কি তবে খোঁজে কারো কায় ?
মনের মতন কোনো কায় পেলে বেঁচে ওঠে দৃষ্টির আড়ালে ?
চল্লিশ বছর ধরে, তা না-হলে, এই পৃথিবীর গ্রীষ্মে-শীতে
আমার বাঁচার কথা ছিলো না তো । তাই নানাবিধ মুহূ-ছায়া
শিয়রে যতোই গাঢ় হয়ে ওঠে—ভালোবাসা আঙ্গুল বাড়ালে
ইচ্ছা হয়—আরো কিছু দিন বেঁচে থাকি পৃথিবীতে ॥

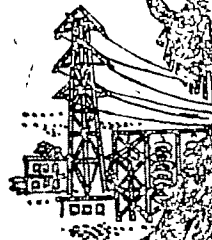
দেশ এগিয়ে চলেছে

বাল্মীকি বিদ্যুৎশক্তির অগ্রগতি

১৯৭৪ সালে আমাদের বিদ্যুৎশক্তি
উৎপাদনের ক্ষমতা ১ কোটি ৯০
লক্ষ কিলোওয়াট পৌঁছোছে। ১৯৭৭
সালে এই ক্ষমতার পরিমাণ দ্বিগুণ
মাত্র ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট।

আজ ১.৫ লক্ষ গ্রামে বিদ্যুৎ-
সঞ্চার করা হয়েছে। ক্ষেত-
ধামারে ২৪ লক্ষ ৪০ হাজারটি
পাম্প-সেটকে বিদ্যুৎশক্তি পূর্ণ করা
হয়েছে। চলতি বছরে অতিবিক্ত
২৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি
যোগ করা হবে।

দ্রুত সংকল্প ও
কঠোর পরিশ্রম আমাদের
এগিয়ে নিয়ে যাবে



অধ্যাপক জীবনারম্ভে নিজ ধর্ম বেছে নিয়েছিলেন। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের বাঙা চাকরি (প্রাইম পোস্ট) সামনে উপস্থিত ছিল। তা তিনি নিেন নাই। নিতেন তো যেতেন। তা হত তাঁর পক্ষে পরধর্ম ভয়াবহ, তা হ'ত ফিশ আউট অব ওয়াটারের—ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ছুংদ অবস্থা। বিজ্ঞাত্যাস ও বিজ্ঞাদান ছিল তাঁর সহজাত ধর্ম।

তিনি ছিলেন কর্মযোগী (আজ তিনি স্ববির)। কর্মজাত ফলের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। এটাই না কর্মযোগীর লক্ষণ। ফলাকাজক্ষায় অভিনিবেশ খণ্ডিত হয় না বলে কর্মযোগীর কম অস্তুর কর্ম অপেক্ষা স্বভাবতই উৎকৃষ্টতর ও নিখুঁত হয়ে থাকে। এরও কর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল।

বিজ্ঞার্থী জীবনেই অধ্যাপক আয়েশের পথ ছেড়ে আয়াসের পথ ধরেছিলেন। আদর্শ নিয়েছিলেন—বিজ্ঞাধিন: কুতো স্তথম্ এই শ্লোকার্থ। বিজ্ঞার্থী জীবনের এই আয়াস বোঝা নয় পরন্তু আনন্দের সংযত অপিচ অবিরাম উৎস।

কর্মযোগী কর্মের আনন্দে কর্ম করেন। অধ্যাপকের কর্মজাত আনন্দের আভাস এক দূর দেশের কর্মযোগী অধ্যাপকের এই কথায় দেওয়া

ফাঙ্কন '৮৭—৩

যেতে পারে। “শুড়তে য আমার কী ভাল লাগে তা অস্ত্রকে সখ্যক বুঝাতে পারব বলে আমার মনে হয় না। অস্ত্র কোন বস্তুি অবলম্বনে জীবিকা অর্জনের প্রবৃত্তি আমার নেই। শুড়তে আমার কেমন ভাল লাগে। যেমন ভাল লাগে চিত্রাঙ্কন চিত্রকরের কাছে, যেমন ভাল লাগে বীণার স্বকার বীণাকারের কাছে, যেমন ভাল লাগে সঙ্গীতের মুহূর্ত সঙ্গীতজ্ঞের কাছে, যেমন ভাল লাগে দৌড়ের প্রতিযোগিতা দৌড়দক্ষের কাছে।”

ভাল, আমাদের অধ্যাপকের অধ্যাপনার প্রতি অমুরাগের পরিচয় দিতে বারো-শতাধিক যৌজন পথ অতিক্রমণ করতে যাই কেন? শিক্ষকের বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সর্বদেশে ও সর্বকালে সেই একই—শিক্ষক পড়ান না তো শিষ্য বেশে ছাত্ররূপে সম্মুখে উপবিষ্ট ভগবানের পূজা করেন। পূজক স্নানান্তে বেছে বেছে পুষ্প চয়ন করে: পুষ্প নিঃশ্বাসে উচ্ছষ্ট না হয় সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকে। সবচেয়ে সে

১. William Lyon Phelps উইলিয়াম লায়ন ফেল্পস ইয়েল (Yale University) র ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

চন্দন ঘষে। শুচ্যাসনে উপবিষ্ট অর্চক লঘুহস্তে গন্ধামূলি পুষ্প আরাধ্য দেবে অর্পণ করে। এই ক্রিয়ায় তার ক্লাস্তি নেই—আছে অফুরন্ত সন্তোষ।

এই প্রসঙ্গে আর এক অধ্যাপকের মূর্তি চোখে ভেসে উঠছে। সন, ১৯১৭ স্থান-ঢাকা জগন্নাথ কলেজের দ্বিতল বি. এ ক্লাসের কক্ষ। একদিন কক্ষের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক বলেন, “আজ ক্লাস মেন না। তৈরি হতে পারি নি।” “তৈরী হতে পারি নি” কথা কয়টি আজও কানে ধ্বনিত হচ্ছে। সেদিনকার ক্লাস ছিল The Merchant of Venice কিংবা Macbeth-এর, ঠিক মনে নেই। যে অধ্যাপকের কথা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন খ্যাতনামা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের অন্ততম ছিলেন। যখনকার কথা তার পূর্বে একাধিকবার এই দুই নাটক তিনি পড়িয়েছিলেন। আর ছাত্রও ছিলেন তিনি তাঁর বছরের সেরা না হলেও দ্বিতীয় সেরা। তাঁর নিজের কথায়ই—সে কথা বলা যাচ্ছে। কোন সহাধ্যায়ী তাঁকে বলেন “ললিত, তুই এবার পরীক্ষা দিসনে। তুই এবার প্রথম হতে পারবিনে। প্রথম হবে যত্ন (ঐতিহাসিক যত্ননাথ সরকার)। এই কথার জবাবে ললিতমোহন বলেছিলেন, “যত্নর কাছে দ্বিতীয় হবে তাতে আমার লাজ কোথা। যত্ন ইজ এ জ্যেণ্ট।” অধ্যাপকের হাতে Verity র Edition থাকত।

২. ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

বই-এর সমাপ্তি কাটা কাগজে সুন্দর হস্তাকরে নোট লিখে আনতেন। তিনি সেদিনকার পড়া অবলীলা ক্রমে পড়াতে পারতেন আর তাতে ছাত্রদের হর্ষও উপজিত হত। কিন্তু একবার যা দিয়েছেন তা তো নির্মালা হয়ে গেছে। তা আর একবার কি ছাত্রদেরকে নিবেদন করা চলে। গুরু দৃষ্টি অজালা, গুরু চান নিত্যনূতন দেব। আর দেব তা যত ভাল করে পারি তত ভাল করে। অধ্যাপক ডক্টর ঘোষের ছিল এবাধ্বন গুরুদৃষ্টি।

এই তন্ময়তার (বিষয়বুদ্ধি বলবে পাগল পনার) অভাস মিলে অধ্যাপকের এই কথা থেকে : “ছুটির দিন ছাড়া কখনও আমি সকাল বেলা গৃহের বাইরে যেতাম না। সকালের দিকে বাইরের কাজ রাখতাম না। গোটা সকালটা ৩ ক্লাসের পাঠনবস্ত্ত তৈরী করতে যেত।” কোন ছাত্র একদিন আমাকে বলে “আপনি যে নোট দেন তাতো কোন বইয়ে দেখতে পাই না।” “বুঝ তো?” “বুঝি জলের মত সহজ।” “তবেই হল। পাবে কোথেকে কোনও এক বই দৃষ্টে আমি নোট তৈরী করি না। যেখানে (বলা

৩. সকাল বেলাবার পড়াশুনার কথায় অধ্যাপক ৩ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্ত প্রায়ই প্রকৃতিতে স্মরণ করেন। তা এই; আশুতোষ চাইতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাঁর কাছে যান। গেলে তিনি খুশী হতেন। কিন্তু সকাল বেলা কোন শিক্ষক গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, বলতেন, সকাল বেলা যে বড় এখানে। ক্লাস নেই?”

বাহুল্য, যে কোন জ্ঞানপিপাসু, অহুসঙ্কিন্সু বিজ্ঞানীর শ্রায় এই অধ্যাপকও ফ্রেন্স, জার্মান, তথা রুশ ভাষা অধিকার করেছিলেন) যে বস্তুর বাঞ্ছনা উত্তম দেখতে পাই চয়ন করি, পরিপাক করি, আর তা তোমাদের মতো করে তোমাদের কাছে ধরি।”

এক্লশ কর্তব্যনিষ্ঠা, ছাত্রহিতচিন্তা অনেকে না হোক কিছু সংখ্যক শিক্ষকে শিক্ষাক্ষেত্রের এই ঘোর দুর্যোগের দিনে আজও মিলবে। কিন্তু বর্তমান অধ্যাপকের অধ্যাপনার জীবনে এমন এক ভাবাবেশ দেখা যায় যার নজির অতীব বিরল।^৪ সেই তদগতভাবে যে কী ছিল তা তাঁর নিজের কথায় এই :

“আমার পঁয়ত্রিশ বছরের অধ্যাপনার জীবনে আমি এক দিনেও প্রিভিলেজ লীভ (Privilege Leave) নিই নাই। ক্যাজুয়েল লীভ (Casual leave) নিয়েছি তেইশ দিনের।” তার মানে কর্মই ছিল তাঁর জীবনের অবশ্যন। কাজেই যত কিছু আনন্দ। মাহের আশ্রয় জল, দুধ নয়। মাহকে বলুন “জল থেকে দুধ দামো, এস দুধ থাকবে।” মাহ কি বলবে? বলবে “জলই আমার জীবন, দুধে আমার মরণ।” অধ্যয়ন অধ্যাপনার সহিত অধ্যাপকের ছিল মাহ-জল সম্বন্ধ।

৪. এই এসঙ্গে আর এক মহান সেবকের নাম স্মরণীয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজিয়তি পদ থেকে তিনি পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপী কর্ম-জীবনান্তে অবসর গ্রহণ করেন। সার জর্জ নক্স তাঁর দীর্ঘকাল ব্যাপী কর্মজীবনে এক দিন মাত্র ছুটি নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক শিক্ষকতার বৃত্তি (পূর্বে বলেছি তাঁর স্বধর্ম) কর্ম-জীবনান্তে গেছে নিয়েছিলেন। স্নাতকোত্তর অধ্যাপক তখন তাঁর বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ রত্ন। অচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে বলেন, “হ্যাঁ রে বিলেত যানি? বাবস্থা করে দেব।” যুবক বলেন বিলেত গিয়ে কি হবে? আমার বিষয়ে এখন সেখানে তেমন কোন দিগ্‌গজ পাণ্ডিত দেখছি না। তাই লাভ হবে না। বিলেত ঘুরে এলে বড় চাকরি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি করব শিক্ষকতা।” হলেন রিসার্চ-স্কলার—জলপানি ৭৫ টাকা। এই প্রস্তাবের বছর দুই আগে আর এক মোহন প্রস্তাব এসেছিল কোন সহাধ্যায়ী এঁকে বলেন “বিয়ে করনি? জমিদারের রূপসী কন্যা। লক্ষ টাকা দক্ষিণা, উপরন্তু বিলেত প্রবাসের খরচ।” বিধি বাম; লক্ষ্মা খণ্ডিত হলেন। যুবক অগটেড্‌ ফর বুন্স এণ্ড টু-ডেন্টস্‌।

এই নির্বাচনের অন্তরালে এক অদৃশ্য প্রভাব ক্রিয়মান ছিল। অধ্যাপকের নিকট সম্পর্কে এগেছেন এমন ব্যক্তিদের অনেকে তাঁর মুখে একটি কাহিনী একাধিকবার শুনে থাকবেন। তাঁর নিজের কথায় কাহিনীটি এই—আমাদের ছোটবেলায় প্রত্যহ অপরাহ্নে এক ‘পাণ্ডিত মশাই’^৫ আমাদের বাড়ী

৫. মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কসংস্কার। পূর্বানবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাখ্যান দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে পাণ্ডিত প্রবর কলিকাতায় আসেন।

(জোড়া-সাঁকোর গৃহে) আসতেন। স্নানাদির পরে সায়ং সন্ধ্যাস্তে কফি খেতেন। ইত্যবসরে বড়দের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলত। আমরা ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অনেক কাহিনী তাঁর মুখে শুনতে পেতাম! চুটকি অথচ শিকাবাহ গল্পও তিনি আমাদের বলতেন। তার একটি আমার মনে আজও হামেশা জাগে, ...লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোন। হলে কি হয়, দুইয়ে চির বিরোধ—একে তোমার উপর তুষ্ট হন তো আর এক হন রুষ্ট। একে বলে আমার আশ্রয় কর। ধন দেব, দৌলত দেব, দেব অফুরন্ত তৃষ্ণা। অপর বলে—আমার শরণ নাও। বিদ্যা দেব, জ্ঞান দেব, আর দেব অখণ্ড সম্ভাব। লক্ষ্মী দেন ঘড়া ঘড়া টাকা। খাও দাও মজা ওড়াও। সরস্বতী দেন ঝুড়ি ঝুড়ি বই। নাও পড়ে মর। ...সরস্বতীকে বরণ করেছ তো লক্ষ্মী কটমট করে তোমার দিকে তাকান। তা হোক, শত হলেও লক্ষ্মীর দৃষ্টি তো। সরস্বতীর শরণার্থী ভাতে কষ্ট পায় না। আলো চাল আর কাঁচকলা জুটে যায়।”

আর এক চরিত্রের একটি জীবন-ঘটনার কাহিনী অধ্যাপকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ঘটনাটি বন্ধুবান্ধবদের তিনি শোনাতে ভালবাসেন।

দর্শনীরূপে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১০,০০০ মুদ্রা পান। এই অর্থে এবং ঘোষ পরিবার প্রদত্ত অনুপূর্বক ছয় সহস্র মুদ্রায় ঘোষ পরিবার সংলগ্ন ভূখণ্ডে বাটী নির্মাণ করে কলিকাতা বাসী হন।

সেই ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। তা থেকে অধ্যাপকের চরিত্রের আর এক দিকে—আপন সুখ সুবিধার বিষয়ে কার্পণ্য এবং অপরের দুঃখদৈন্ত দূর করার বিষয়ে মুক্ত-হস্ততা—আলোক সম্পাত হবে। সেই কাহিনীটি এই: তারকনাথ প্রামাণিক ভোরে গঙ্গাস্নানে যেতেন। এক শীতের প্রাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ছাত থেকে দেখলেন প্রামাণিক মহাশয় ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে গঙ্গাস্নানে চলেছেন। প্রামাণিক মহাশয়কে সম্বোধন করে সিংহ মহাশয় বললেন “দাদা ধুতির খুঁট জড়িয়ে চলেছ, কম্বলও একখানা ঝোটে না।” প্রামাণিক মহাশয় প্রতি উত্তরে বললেন, “হাঁ ভাই, হাঁ ভাই।” কিছু দিন পরে, হবে হয় তো পৌষ সংক্রান্তির প্রত্যুষে, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁদের ছাত থেকে দেখতে পেলেন শত খানেক লোক গোটা রাস্তাটা লালে লাল করে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে গঙ্গাভিযুখে এগুচ্ছে। সেই চলন্ত লাল জনপ্রবাহের পশ্চাতে প্রামাণিক মহাশয়—সেদিন তাঁর গায়েও অস্ত্রদের মতো লাল ইতালিয়ান কম্বল। সিংহ মহাশয় দেখিনা-দখি করে ছাত থেকে সরে গেলেন না। উল্টো প্রামাণিক মহাশয়কে সম্বোধন করে বললেন “আচ্ছা জুতো লাগালে দাদা।” প্রতি উত্তরে প্রামাণিক মহাশয় বললেন, “না ভাই, না ভাই।”

জোড়াসাঁকো ঘোষদের আদি নিবাস ছিল গোবিন্দপুর। ফোর্ট উইলিয়াম যখন হয়, বেহালায় উঠে যান। বেহালা থেকে আসেন জোড়াসাঁকোতে। পিতামহ হরচন্দ্র ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. ছিলেন। কলকাতা স্মল-কল-কোর্টের চীফ জজের পদে আসীন হয়েছিলেন। একে সম্পন্ন গৃহে জন্ম, তায় মা-বাপের কনিষ্ঠ সন্তান, তায় অত্যন্ত স্নেহে বলে শঙ্কিত অধ্যাপকের মানুষ হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ছিল বহু। তাঁর নিজের কথায় সেই অন্তরায়ের স্বরূপ ছিল এটো : “শৈশবে নেহাত রোগা ছিলাম। একটুতেই সংজ্ঞা লোপ পেত। ডাক্তারেরা বলেছিলেন আমার উর্দ্ধ আয়ুষ্কাল বারো বছর। তাই আমাকে কারো কিছু বলার জো ছিল না। বললে বড়রা তার উপর মার-মুখো হতেন। এভাবে আমার মাথা-খাওয়ার সর্বাবস্থা বিঘ্নমান ছিল। বেঁচে গিয়েছি মায়ের পুণ্য বলে।”

আট চল্লিশ উনপঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। যুগধপে-সাদাধুতি, পাঞ্জাবি পরনে, মুখে শূণ্ণ, একহারা উন্নতদেহ, গৌরবর্ণ, শ্রিয়দর্শন এক যুবককে কলেজ স্ট্রীট ৩৪ নং থেকে পূর্বদিকে শিয়ালদহ অভিমুখে যেতে দেখতাম। বিষয়ে ভাবতাম এই ব্যক্তি শিক্ষা না বাঙালী। পঞ্জাবী বলে মনে হত যুবকের ফর্সা রং, দীর্ঘ দেহ্যষ্টি ও সর্বোপরি শূণ্ণ দেখে। আর খটকা বাধতো চুল ঝুটবঁধা ছিল না বলে। পরিচয় হলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম “এ বয়সে এ খেয়াল কেন? দাড়ি কেন?” উত্তর এসেছিল, “খেয়াল নয়, রেখেছি প্রয়োজনে।” বিস্ময় করে বলেছিলেন, তখন আমি ছাত্র, নাপিত বাঁধা ছিল। হুগুয় ছদ্ম আসত। দাড়ি কামানোর উমেদার ছিল অনেক। হু-একবার চেষ্টা করেছিলাম—

সকালবেলায় অনেকটা সময় নষ্ট হত। মনে হল, দুয় ছাই পড়ার ক্ষতি করতে যাই কেন। দাড়ি রাখলেই তো চুকে যায়।” সেই দাড়ি আজও আছে। তখন ছিল কাল মিশ মিশে, এখন সাদা ধবধবে।

অধ্যাপক বহির্বাহীর এক ঘরে পড়াশুনা করতেন। আর ঘুমতেন ঐ ঘরেই। রাতে সকাল সকাল উঠে পড়তেন। মা ঘোষ-জায়া পতিত পাবনী একটা বাটিতে খানিকটা ছুধ রেখে যেতেন। চারটায় ঘুম থেকে উঠতেন। হাত মুখ ধুয়ে ফোঁতে কফি বানিয়ে খেয়ে পড়তে বসতেন। সেই স্বাবলম্বন বৃত্তি কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত চলে আসছিল। অধ্যয়ন অধ্যাপনার জ্ঞান সময় বাঁচাবার নিমিত্ত কয়েক বছর ইকমিক-কুকারে ছুটি সিন্দ করে নিতেন। আজ বছর কুড়ি ছুধ-শাউরুটিতে জীবন চলছে। গান্ধী-আদর্শে অনুপ্রাণিত বেশভূষায় আকর্ষণ কোন কালেই তাঁর ছিল না। খাদির জন্ম থেকে অধ্যাপক বরাবর খাদ পড়ে আসছেন। ১৮-২০ বছর নিয়মিত স্নাতক কাটতেন। তখন প্রায় বস্ত্র-স্বাবলম্বী ছিলেন। যতদিন সামর্থ্যে কুলিয়েছে নিজহাতে জামা-কাপড় কেচে নিতেন। ধোপদস্ত না হলেও দেখেছি পরিধেয় সব সময় তকতকে পরিষ্কার। স্বল্পতম মূল্যের পাছপা ও ছত্র ব্যবহার করতেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান পান নাই। আই-এস-সি তে (আই এ ও আই-এস-সি মিলিয়ে) ৮ম স্থান অধিকার করেন। তারপর বরাবর একঃ এব অধিতীয়ম। বৃত্তি পেলেন

তো সংকল্প করলেন যত টাকা বৃত্তি বাবদ পাবেন তার পাঁচগুণ দশের কাজে দেবেন। এই সংকল্পের মূলে কি ভাব ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রতি প্রশ্ন করলেন, ছাত্র বেতনে কি ক্ষুণ্ণ কলেজ চলে? আর নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজেই বললেন, “না চলে না। সমাজ ঐ উন পূরণ করে। যাকে অল্পদান বলা হয় সেই টাকাও জনসাধারণের পকেট থেকেই আসে। ঐ ঋণ পরিশোধের একটা চেষ্টা। ঋণ ঠিক পরিশোধ করা যায় না, চেষ্টা করা যায় মাত্র। সেই চেষ্টা করছি।”

লক্ষ বৃত্তির অঙ্ক দশ হাজার ছিল (সাইটাদ প্রেস্টোদ বৃত্তি সহ)। দানের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার কবেই পার হয়ে নব্বই হাজার অতিক্রম করেছে। লক্ষ্য লক্ষ পূরাবেন। দান অনেকে করেন, আর দানের অঙ্কও কোটি কোটিতে গিয়ে ঠেকে। এই ব্যক্তির দান দারিদ্র্য বরণ করে পীড়িতের জন্ত দান। বেনামা দান। তিনি তাঁদের একজন নন “Who give little of the much they have and they give it for recognition” পরন্তু তাঁদের একজন “Who have little and give it all.” কল্পণ কষ্ট করে পয়সা বাঁচান তার একটু নমুনা নিন; দক্ষিণ-বঙ্ক-উত্তরমুখো স্বল্প-পরিসর এক ঘরে থাকেন। ৩৬৫ দিন এক ফালি রোদ ঘরে প্রবেশ করে না। অতীব ক্ষণ দেহ। শীতে বেজায় কাবু হন। একটু রোদের জন্ত মন হাহাকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব খোলা রবিকরোজ্জ্বল গৃহে থাকবার সজ্জা থাকলেও

ঐ অঙ্করূপে তাঁর দিন কাটে। নিঃসঙ্গ জীবন। পরিচারক পর্যন্ত নেই।

খ্যাতি যে চায় না। খ্যাতি তাকে বরণ করে। ঘোষ প্রফেসর অব গ্র্যাম্মারেড ম্যাথিমেটিক্স এর পদ শূন্য। কত বৃকে কত আশা। অধ্যাপক প্রার্থী পর্যন্ত নন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেচে তাঁকে ঐ আসন দেন। অধ্যাপক কি করলেন? স্বীকার করলেন। কিন্তু ঐ আসনে বসলেন না। পাশের আসনে বসে আসনের কাজ করতেন। একগুণটা করবার হেতু কি এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, “কর্তৃপক্ষের আসন নয় তো জাহ্নবী আসন, আমি দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা পাঁছে এই ভাব আঁমায় পেয়ে বসে।”

হার্ডিঞ্জ প্রফেসর অব পিও ম্যাথিমেটিক্স এর পদও অমূরূপ অযাচিত ভাবে আসে। স্বকীয় পোয়াতে হবে ভয়ে প্রথমে অস্বীকার করেন। উপাচার্যের অনুরোধে এবং প্রয়োজন মতো তিনি সাহায্য করবেন এই আশ্বাস পেয়ে পরে স্বীকার করেন।

অধ্যাপক ঘোষ ঠিক করেন ভারতের যেখানে গুণী গণিতজ্ঞ পাবেন বেছে বেছে পরপর তাঁদের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার প্রেসিডেন্ট করবেন। নিঃস্পৃহতার কারণ ও চরিত্র প্রভাবে করলেনও একাদিক্রমে এগারবার। “দেখতে পাচ্ছি আপনি একবারও প্রেসিডেন্ট হন নি।” একবার জবাবে ডক্টর ঘোষ বলেছিলেন, নিজে প্রেসিডেন্ট হলে যোগ্যতম ব্যক্তিদের কি পাস করতে পারতুম। তাও কি শেষরক্ষা হয়েছে! বারো বারের বার

সংকীর্ণ স্বার্থের চোরাবালিতে আমার প্রস্তাবিত ব্যক্তি ভোটে উৎরান নি। কথা দিয়েছিলেন এমন ব্যক্তিদের কেউ কেউ কথার অজ্ঞা আচরণ করেছিলেন।”

অধ্যাপকের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল—একটা স্কুল অব ম্যাথমেটিক্স গড়বেন যেমন গড়েছিলেন স্কুল অব কেমিস্ট্রী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। সেই সুযোগ এসেও ছিল। তবে এসেছিল এক রকম বিলম্বে। এক ব্যক্তি অধ্যাপক ঘোষকে বলেন, “আই আই টির (খড়গপুর) অধ্যাপক ডিরেক্টর নেওয়া হবে। আপনি কি ঐ পদ-প্রার্থী হবেন?” ডিরেক্টর ঘোষ বলেন “না, হব না। একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্কুল অব মেথিম্যাটিক্স গড়ব। সে সুযোগ তো ওখানে পাওয়া যাবে না। ডিরেক্টর পদের প্রশাসনিক ঝগড়া রয়েছে। তা হবে স্কুল গড়ার পক্ষে অন্তরায়। তা ছাড়া অবসর গ্রহণের সময়ও হয়ে এল।”

ভদ্রলোক বললেন, “আপনি যখন যাচ্ছেন না তবে আমি ঐ পদপ্রার্থী হতে পারি। আমি প্রার্থী হব।” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর জ্ঞান ঘোষের কানে অধ্যাপক ঘোষের একথা কোন সুরে পৌঁছে। ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপককে বলে পাঠান যে প্রশাসনিক ঝগড়া তাঁর পোয়াতে হবে না। ওদিকটা দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অধীনে অল্প লোক দেবেন। আর একথাও জানান যে ডক্টর ঘোষের কর্মকাল বাড়িয়ে দেওয়া হবে। অধ্যাপক তাঁর অপারগতা জানিয়ে বলেন যে তিনি এক ব্যক্তিকে কথা দিয়েছেন

যে তিনি ঐ পদপ্রার্থী হবেন না; আর সে মতে ঐ ব্যক্তি ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হয়েছেন। ভাইস চ্যান্সেলর তখন বলে পাঠান, যে বিশ্ববিদ্যালয় ঐ প্রার্থীকে যোগ্যতম বলে মনে করেন না। সুতরাং তাঁকে নিয়োগ করা হবে না (আর করাও হয়নি)। কিন্তু অধ্যাপক ধরে নিলেন। ডিরেক্টর পদ স্বীকার করলে তাঁর সত্যানিষ্ঠার অপমাত হবে। এই দৃষ্টির সহিত ঝগড়া করা চলে না, যত্বপি একথাও সমান মত যে প্রবীণ গণিতিক এই ক্ষেত্রে তখনকার মতো ভুলে গিয়ে থাকবেন যে জ্যামিতির বিন্দু বা সরল-রেখা সংজ্ঞাতেই নিখুঁত, আঁকতে গেলেই হয় স-খুঁত। অথবা বুঝি ওটা ছিল আদর্শের কাছে আকাঙ্ক্ষার বলিদান।

অধ্যাপকের আর একটা কার্যেও মন সমালোচনা-ভিক্ষু হয়। অবসর-প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন থেকে মাসিক ৫০০ টাকা। হিসাবে পাঁচ বছর ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ঐ ভাতা অধ্যাপক নেন নি। “কেন নেন নি?” এই প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক বলেছিলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন কম। রিসার্চ করা, রিসার্চ কণ্ডাক্ট করার বা সেমিনার পরিচালনা করার অছিলায় তাঁদের কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া এই ভাতার উদ্দেশ্য। এই ব্যয়ে রিসার্চ করা চলে না। রিসার্চ কণ্ডাক্ট করা যায়। কিন্তু আমার দিক থেকে ঐ দিকে একটা বাধা ছিল। সেমিনার পরিচালনা করতে একাধিক ব্যক্তির দরকার। সেমিনার সার্থক করতে হলে পাড়াশোনা ও ভাবনা-

চিন্তা করতে হয়। যাদের নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা তাঁদের অনেকে ওদিকে ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন না। তবে আর অধ্যাপকদের দিক-দর্শন করানো যাবে কি করে? ডক্টর ঘোষের ঐ ভাবটাকে যেন সেল্ফ-রাইটাস্-নেস্ এর (Self-righteousness) বাস রয়েছে। মনে হয়েছে, আপন ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে অন্তদের তো তিনি কর্তব্যে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করে দেখতে পারতেন। বুঝবা একটু অবিচার করা হল। এমনটাও তো হতে পারে যে যেরূপ অনগ্রসর ব্যক্তিরকে কর্ম দিব্যরূপ ধরে না সেরূপ অনগ্র সাধনার অগ্রতুলতা অধ্যাপক লক্ষ্য করেছিলেন। এ কথার সমর্থন মিলে তাঁর অতীব এক প্রিয়জনের মস্তব্যে মর্মাহত হয়ে অধ্যাপক ব্যথিত কণ্ঠে যে উক্তি করেছিলেন তা থেকে—
“অন্যকে বলে কি না আমি চাল মেয়ে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিশনের টাকাটা পায়ে ঠেলেছি। ওরা এর কি বুঝবে! Idealism এর ধার ধরা ধারে না। আইডিয়ালিজমের মূল্য ওদের কাছে নেই।”

অধ্যাপকের সত্যনিষ্ঠা ও আইডিয়ালিজমের কথায় তাঁর সময় নিষ্ঠা তথা কর্তব্যনিষ্ঠার (এ দুই এক থেকে আর এক পৃথক নয়) কথা এসে যাচ্ছে। অধ্যাপক চিরদিন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ক্লাশে প্রবেশ করতেন। এর খেলাপ একদিনও হয় নি। একদিনের কথা। কলেজে যাচ্ছেন, ট্রামটা অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অধ্যাপক বড়ি দেখলেন।

নেমে পড়লেন। বাকী পথটা দৌড়ে গিয়ে ঠিক সময়ে ক্লাসে হাজির হলেন।

সময়নিষ্ঠার অপরদিক কর্তব্যনিষ্ঠার দিকে তাকান। একদিনের কথা। স্কুল-কলেজ খোলা ছিল, ট্রেন-ট্রাম বাস ছিল বন্ধ। অধ্যাপক ফার্ম রোড (দক্ষিণ কলিকাতা) থেকে হেটে গিয়ে আপার সারকুলার রোডে বিভ্রান্ত কলেজে ঠিক সময়ে হাজিরা দেন। দারোয়ানরা খাটিয়ায় বসে তাস খেলছিল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘর খুলে দেয়। অধ্যাপক হাজিরা বইয়ে নাম স্বাক্ষর করেন। মনে হতে পারে এতো কুইজোটিক ব্যাপার। কেন? অন্তের অপেক্ষা না রেখে তিনি তার কর্তব্য করেছিলেন। আয়ত্তে যতটা ছিল ততটা অধ্যাপক করেছিলেন। ট্রেন-ট্রামের চাকা ঘুরে নাই কিন্তু তাঁর পদচক্র তো ঘিল ধরে নাই। শিক্ষক কি ছাত্রদের সেরেফ বাইরের বস্তুই দেন? না যা দেন তাতে তাঁর মনের ছোপও লাগে আর চরিত্রের ছায়াপাতও হয়! “What the teacher teaches is not really separable from his personality. The material he offers is not just objective stuff; it is material mixed with the teacher's mind and not with the intellect only, but his will and character.” “শিক্ষক ছাত্রদের যা দেন তা বস্তুত বাইরের বস্তু মাত্র নয়। যা তিনি দেন তাতে তাঁর মনের ছোপ লাগে। কেবল মনের ছোপই লাগে তা নয়, তাতে তার মনঃ-চিন্তন ও চরিত্রের ছায়াপাত হয়।” এর পরেও যদি তাঁকে

ব্যবহার বুদ্ধি-রহিত স্বপ্ন-বিলাসী বলিতে চান, বলুন। তা হলে এক জগৎ-বরণীয় ব্যক্তিকেও, এঁটে উঠতে না পেরে ইংরেজ রাজনীতিকরা ষাঁকে বলতেন hard-headed Bania। সেই গাঙ্গীকেও ব্যবহার-বুদ্ধি-রহিত বলতে হবে। গাঙ্গীর ব্যবহার বুদ্ধি—রহিত্যের কাহিনীটি কাকা কালেক্টরের কথায় এই; “১৯২৭ সাল। বাপুর সঙ্গে ওড়িশ্বার বালেশ্বরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ভদ্রকে জন-সভায় যাওয়ার কথা ছিল। বাপু আমাকে বলেন “আমি যেতে পারছি না। আপনি যান। সভায়-বলবেন কেন আমি যেতে পারছি না।” আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু কেউ নিতে আসে নাই। সময় হয়ে গেছে দেখে বাপু আমায় বললেন— “দেখছি, আপনি এখন এখানে।” বললাম যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছি। কেউ নিতে এলে তবে না?” বাপু অচ্যুত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন “এ ভাবে তো কাজ চলে না। সময় হতেই আপনার রওনা হওয়া কর্তব্য ছিল। মোটর আসেনি তো কি? পায়ে হেঁটে রওনা হওয়া আমাদের হাতে; পৌঁছান আমাদের হাতে নয়।” লজ্জায় মরে গেলাম, রওনা হলাম।.....”

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ্য। ইউনিভার্সিটি টিচার ইউনিয়নের সভা হওয়ার জন্ত অমুদ্রিত হলে অধ্যাপক প্রস্তাবকের নিকট জানতে চান দাবি আদায়ের জন্ত ইউনিয়ন ট্রাইক করবে কি না। বলা হয়, প্রয়োজন হলে করা হবে।

অধ্যাপক তখন বলেন, তা কি আচার্যকুলসম্মত

কাল ৭২-৪

কাজ হবে? মানে, সমযোগ্যতা সম্পন্ন ইউনিভার্সিটি টিচারদের বেতন সরকারী কলেজের টিচারদের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। পেট তো উভয়েরই সমান। কিন্তু আমাদের বেলায় তা আদায়ের পথ ট্রাইক নয়। আচার্যকুলের দায় ও গৌরব পথ প্রদর্শন, অহ আদর্শ সংস্থাপন।”

কর্তব্যে সদা-জাগ্রত। অর্থের বিষয়ে সদা উদাসীন। অধ্যাপকের শিক্ষক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঠিক একদিন বলেন, “হেড একজামিনার তুই হস না কেন? ঐ টাকায় তো বই কিনতে পারিস।” ছাত্র সতিনয় বলেছিলেন, “স্বার, ছুটির দিনগুলি যদি হেড একজামিনরের ডিউটি করতে যায় তবে আর পড়ব কখন? দিনেই না আমি বিশেষ পড়াশুনা করে থাকি।” কিন্তু এম-এর কাগজ তো দেখতে হতই। তবে সে কাজ ছিল স্বল্প-সময় সাপেক্ষ। সে টাকাও সব সময় নেওয়া হত না। তখন বিল করে টাকা নিতে হত। অনেক স্থলে বিল করার সময়টা বইয়ে কেড়ে নিত। আর খাতা দেখার টাকা সময় সময় অনাদায়ী থেকে যেত।

একদিন অধ্যাপককে বলতে শুনেছিলাম, “বলুন তো, আমাদের এত টাকা দেয় কেন? দেয় বই কেনার জন্ত; সদা-এগিয়ে চলা জ্ঞান প্রবাহ থেকে পিছিয়ে না পড়ি, তাই না।” ভাল কত টাকায় এত টাকা। আড়াই শতে, তিন শতে? তখন অধ্যাপকের বেতন ঐ রকম ছিল। আর জীবন-সাম্রাট্টে বইগুলি তিনি বিলিয়ে দিলেন মায় এত

বছরের Journals যা সংগ্রহ করার জন্য কোন কোন ক্রয় বিক্রয় সংস্থা উদ্ভাব।

এক সন্ধ্যার কথা। নানা জনে নানা কাজে অধ্যাপক এগারশ টাকা দেন এবং খানিক পরে কোন বন্ধুকে বলেন, আজ খুব ভাল ঘুম হবে।”

এই সন্ধ্যার নিদ্রা : অধ্যাপকের দৃষ্টিতে জ্ঞান দানের বস্তু, অর্থ আহরণের পণ্য নয়। কিছু নইলে চলে না। তাই চলার মতো কিছু নিতেন।

যৌবনে কেরার বদলি গিয়েছিলেম। কেরার-নাথের কাছে এক বিচিত্র বর চাইলেন—ঠাকুর, আমায় তোমার না-চাওয়ার বৃত্তি দাও। এসব বৃত্তি বা প্রার্থিত এই বরের প্রভাব।

যখনই আর্তির কথা কানে এসেছে, কিছু দেওয়ার জন্য অধ্যাপকের হাত চুলকিয়েছে (আজও চুলকায়)। তাঁর টাকা সংস্থাও পেয়েছে, ব্যক্তিও (সর্বপ্রাণে পেয়েছে হাতেরা) পেয়েছে। মাদার থেরেসাও পেয়েছেন, পূর্ব বাংলার মুক্তিবাহিনীও পেয়েছে। মিশনও পেয়েছে, সংঘও পেয়েছে। পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকারকারী ও মুজিব-নগরের আনুগত্য স্বীকারকারী ডেপুটী হাই কমিশনারও পেয়েছেন। ডেপুটী কমিশনার কৃতজ্ঞতা জানালে তার প্রেরিত ব্যক্তিকে অধ্যাপক ঘোষ বলেছিলেন, “হোসেনালী সাহেবকে বলবেন, আমি অষ্টভুজবাদী। মুক্তিবাহিনীকে টাকা দিই নি তো নিজেদেরই দিয়েছি।”

জানা ছিল অধ্যাপক ঘোষের কাছে গান্ধীর খান-কয়েক (৪ খান) পত্র আছে। গান্ধী সংগ্রহালয়ের

জন্ত পত্রগুলি তাঁর কাছে চাই। অধ্যাপক বলেন, “নেই, পত্রগুলি পুড়িয়ে দিয়েছি।” কেন পুড়িয়ে ফেললেন? এই কথার জবাবে বলেন, “কোন খ্যাতিনামা কংগ্রেস-সেবীর অসত্যাচরণের প্রতি আমি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। গান্ধীজীর পত্রে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য ছিল। তাঁর বিরোধী-পক্ষের লোকেরা এই পত্রগুলি হাত করার চেষ্টায় ছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পত্রগুলি চেয়ে লোক পাঠিয়ে ছিলেন। কোন অসতর্ক মুহুর্তে পত্রগুলি তাদের হাতে চলে যায়, আর তারা সেগুলি নিয়ে এই কংগ্রেস সেবীকে লোক চক্ষে হেয় করার জন্য নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যবহার করে এই ভয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি।” এই কথা শুনে মনে মনে, উচ্চারণ করেছিলাম, “Every one’s honour is safe in his hands”

পঞ্চাশাদিক বর্ষকাল এই অধ্যাপকের সহিত পরিচয়। তাতে বাল্যমনের অযৌক্তিক জেদ দেখেছি, দেখেছি হঠাৎ উপজিত হঠাৎ প্রশমিত ক্রোধ, ক্ষেত্র বিশেষে দেখেছি বিজ্ঞানীতে অবৈজ্ঞানিক রুদ্ধ হার মনোভাব, শুনেছি লোকের কার্যকলাপের নিন্দা, কিন্তু কখনকালেও ব্যক্তির নিন্দা শুনি নি। উল্টা দেখেছি, কেউ তিল প্রমাণ ভাল কোথাও করেন তো তার ভাল প্রমাণ স্তুতি তি নি করে থাকেন।

৬. গান্ধী সম্পর্কে এই কথা কয়টি নটরাজন Social Reformer এ লিখেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে এক অতীব পুতচরিত্র পুরুষের একটি উক্তি মনে পড়ছে :

“যে লোক কেবল অশ্রুর দোষ দেখে সে অধম। যে লোক অশ্রুর দোষগুণ দুই দেখে সে মধ্যম। যে মানুষ অশ্রুর গুণ দেখে সে উত্তম। আর যে ব্যক্তি অশ্রুর ছোট গুণ বড় করে দেখে সে উত্তমোত্তম।”

অধ্যাপকের সম্বন্ধে বলা যাবে কি?

নাহি কণ্ঠী নাহি ভিজক—বৈষ্ণব। ন জটিল মুণ্ডি ন লুক্কিত কেশ ন কাষায়স্বর বেশ—সন্ন্যাসী।

এঁরা আসেন, নীরবে কাজ করেন, নীরবে চলে যান। তাই না ছুনিয়া চলে, আগে বাড়ে—Such as these are the salt of the earth.

কে এই অধ্যাপক? অধ্যাপকের নাম শ্রীশুদ্ধোদন ঘোষ।

জয়ন্তী প্রকাশনের কলেকটি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ

১ম খণ্ড ৯.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০

ও ৩য় খণ্ড ১৩.৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়

সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০

সুভাষচন্দ্র ও গ্রামিনাল প্ল্যানিং

শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬.০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

Paper back 4/- Board 5/-

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, লিকাতা-২৬

ঐ মহামানব আসে : চারণিক

৬.০০

NETAJI THROUGH

GERMAN LENS

Nanda Mookerjee

১২.৫০

রামমোহন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

৪.০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

অনিল রায়

৪.০০/৬.০০

বাংলাদেশের বিপ্লব

সুনীল দাস

১.২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অনিল রায়

২.০০

দেশ প্রিয়ের চেষ্টা

শাঁদের নিজস্ব বাসস্থান নেই তাঁদের জন্য বসত বাড়ী

আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ এখন জমি পাচ্ছেন, বাড়ীর জন্য 32,42,408টি জমি ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। কুড়ি-সকল কার্যসূচীর আওতায় আরও জমি দেওয়া হবে।

নয়টি সামাজিক গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 8.8 লক্ষ বাড়ী তৈরীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 6.43 লক্ষ বাড়ী ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে।

দূর সংকল্প
ও
কঠোর পরিশ্রম
আমাদের
প্রিয়-নিয়-যাবে।



devp 75/453

নারীত্ব

ও

ব্যক্তিত্ব

আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যক্তিত্ব ও নারীত্ব, এই শব্দদ্বয়টি কি পরস্পর রিবোধী? জৈবিক প্রভেদ অনুযায়ী মানবসমাজের দুটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় নারী ও পুরুষ, কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ কি থাকা উচিত?

বর্তমানে পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতে এটাই হলো বড় প্রশ্ন। অবশ্য অর্থনৈতিক অধিকার যেখানে সমান এবং সামাজিক অধিকারও সমান, সেখানে নারী হওয়াটা মোটেও যে নিম্নতর শ্রেণীতে পরিগণিত হওয়া নয়, সেটা তর্কের খাতিরে সহজেই স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। তবু সে ক্ষেত্রেও কোনো কোনো ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষের সহযোগিতা না পেলে নারীর পক্ষে সাংসারিক সার্থক হওয়া সম্ভবপর নয়। এবং এই সাংসারিক সার্থকতাই নারীদের পক্ষে একটি মূল্যবান কামনা। এ সমস্যার নানা আলোচনা আজকে হচ্ছে, এবং এর সমাধান কোন পথে আসবে তাও বলা শক্ত।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভারতীয় নারী সমাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। ভারতবর্ষ

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও পৃথিবীর ক্রম-গঠনশীল দেশের মধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ পশ্চাৎ-পদ দেশ বলেই তাকে এখনো গণনা করা হয়। নিরক্ষরতার পরিমাণ বিচার করলে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ পুরুষ অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, তার ত্রিগুণ পরিমাণ নারী নিরক্ষর। কর্মক্ষেত্রে, যেখানে শতকরা ৮০ জন পুরুষ জীবন ধারণের মান অনুযায়ী বলতে গেলে স্বল্প আয় করে, যা জীবন ধারণের পক্ষে অসুপযুক্ত, সেখানে স্ত্রীলোক যে সমান পরিশ্রমের জন্য অর্ধেক পারিশ্রমিক পাবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সার্থক বর্টন ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে এ বিষয়ে হয়ত ভবিষ্যতে কিছু পরিবর্তন হবে। এ সম্বন্ধে যে সংগ্রাম করার কথা, তা সামগ্রিক, নারীপুরুষ নিবিশেষে। এক্ষেত্রে নারীত্ব ও পৌরুষ নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে এ সব সমস্যা নিয়েও যে একটা বিশেষ আন্দোলন করার প্রচেষ্টা হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার, তবে মূল লক্ষ্যটাকে স্থিরভাবে রেখেই তা করা উচিত।

বৈদিক যুগে নারীর স্থান যে কত উচ্চে ছিল, বর্তমানে তা কোথায় নেমেছে, এ প্রশ্নে বেশ কিছু আশ্চর্য্যকর চোখ আছে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা বিশ্ববারা ইত্যাদি ব্রহ্মবাদিনী নারীরা সর্বত্র নির্বিচারে উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হন। একথাগুলি বললে বৈদিক যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন ধারণা হয় না; বরং বৈদিক যুগের এই কটি নারীই বিজ্ঞান জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন, অস্ত্রেরা কী করতেন এই প্রশ্নটাও মনে আসতে পারে। বেদ-মন্ত্রের কতকগুলি কোতুহলোদ্দীপক শ্লোকও উদ্ধৃত করা যায় এ বিষয়ে, তাতে গভীর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার চেয়ে মানবজীবনের সুরল উপলব্ধি এবং আশা আকাঙ্ক্ষারই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক বর্তন ব্যবস্থায় নারীর স্থান কতখানি সমানাধিকার ভিত্তিক ছিল, তা না জানলে বৈদিক যুগ সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা আসা যায় না। পৌরাণিক যুগে নারীর য পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া সমাজজীবনে নারীর স্থান ভোগ্য পণ্যের চেয়ে উন্নত ছিল না। বয়সের ক্রম অনুযায়ী নারী পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন থাকবেন এরকম ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে। তা ছাড়াও পুত্র জন্মের উদ্দেশ্যেই দার পরিগ্রহের ব্যবস্থা অবশ্য ‘প্রজনার্থং মহাভাগা পূজারী গৃহদীপ্তয়ঃ’ বলা হয়েছে কিন্তু তাতেই শুধু চিড়ে-ভেজে না। ‘কোদাল কে খনিজ নাম দিয়ে একটু শ্রুতি স্মরণ করে তোলা হয় মাত্র।

গার্গী প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীরা যে সর্বথা ব্যক্তিত্বের সংগ্রামে জরী হতেন তা বলা যায় না। সমকালীন স্ত্রীদের কাছে নানাভাবে ধর্মকথাওয়ায় অভিজ্ঞতাও আছে। প্রশংসিতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর কথোপকথন উল্লেখ বোঝা।

পৌরাণিক যুগের ইতিহাসও নিতান্তই ধর্মগ্রন্থ এবং পুরাণ-কাহিনী ভিত্তিক। সমাজের সর্বাঙ্গীণ চিত্র তাতে পাওয়া সম্ভব নয়, তার আশাও করা উচিত নয়।

মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে নারীকে যে অবস্থায় এনে ফেলা হয়, তা অতীব দুঃখজনক। অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর অনুগ্রহবেশ নিষিদ্ধ, নারী বেদপাঠের অমুপযুক্ত, ‘নারীকে শিক্ষাদানের অবশ্যস্বাভাবী পরিণাম তার বৈধব্য’ ইত্যাদি ‘শাস্ত্রীয় বাক্যের সাহায্যে তার ব্যক্তিত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়ার এক বিপুল প্রচেষ্টার ইতিহাসই এই সময়ের ইতিহাস। সতীদাহের অগ্নিখালায় এই যুগের নারীকে পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে। বাল্যবিবাহের যুগকাল্টে এই যুগের নারীদের বলিদান করে সাড়ম্বরে সংস্কার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়েছে।

কিন্তু এর মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের অভাব নেই। বৈদিক যুগের নারীদের ব্যক্তিত্ব পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনা। বিজ্ঞকার কোতুকপূর্ণ দস্তোক্তির উল্লেখ করার লোভ সামলানো এ ক্ষেত্রে কঠিন,

“নীলোৎপলদলস্তামা বিজ্ঞকং ন বিজানীতা।

বৃথৈব দণ্ডিনা শ্রোক্তা সর্বত্বা সর্বত্বতী ॥

এমনিতরো বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু তার সামাজিক স্বীকৃতি তখন কল্পনার অতীত।

বিপ্লব শতাব্দীতে এই বিপুল সংখ্যক নারীর প্রতি এই অবিচার দূর করার জন্য বিরাট আন্দোলন সূত্র হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, যারা এই আন্দোলনের পুরোধা, তাঁদের প্রকৃত মনোভাবটী কি? নারী বলতে তাঁরা কি সমব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনুষ্য জাতির কথা ভেবে ছিলেন? অবশ্য এই মনোভাবের প্রশ্ন উত্থাপন করে সংকর্মের নিন্দাবাদ এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য নারী সমাজকে আলাদা ভাবে দেখার মধ্যে যে একটা আঙ্গুত্ব আছে। সেটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বিংশ শতকের এই সপ্তম দশকেও সমাজ জীবনে নারীর স্থান কোথায়, তা যখন চিন্তা করতে হয়, সেক্ষেত্রে অতীত ভয়াবহ, কল্পনার অতীত। আজকেও একজন ডাক্তার যদি পুরুষ হন, তাহলে তিনি পুরোপুরি ডাক্তার। আর যদি নারী হন, তাহলে তিনি অবিবাহিতা থাকলে 'পাত্রী' যার জন্য 'উপার্জনশীল' 'পাত্র' চাই বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এবং যথাকালে দেনাপাওনার সমস্ত কথাবার্তা মিটিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে বিয়ের পিড়িতে তাঁকে বসতে হবে এবং বধূজীবনের সমস্ত কর্তব্য, অর্থাৎ তাঁর দিদিমার আমলে যে কর্তব্য বালিকা বধূদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো, তা ঠিক সেই ভাবেই করতে

হবে। প্রয়োজন হলে, চাকরি করা, বা হাসপাতালে যাওয়া বন্ধ করেও বাড়িতে অলস জীবনযাপন করতে হবে। মজা এই, নারীরাই এ ব্যাপারে বেশী জড়িত। তাঁরা মনে করেন কর্ম-জীবনের প্রধান ক্ষেত্র ঘর, স্বামীর অধীনতা, বাকি ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা বা বিশেষ পেশা সেটা নিতান্তই আলাংকারিক। অমূরূপ মনোভাবের দ্বারা তড়িত হয়ে অধ্যাপিকাও যখন বড়ো চাকুরের ঘরপী হয়ে সামাজিকতা রক্ষা করেন এবং গবেষণা কেন্দ্রে থেকে বহুদূরে শাড়ী পয়সা এবং পার্টি আসরের সুবিপুল অবসরে অবস্থত হন, তখন এই সমস্ত নারী আন্দোলনের চেহারাটা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। 'পাত্র-পাত্রী' সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলোই প্রমাণ, যে পুরুষদের উপার্জনশীলতাই একমাত্র মানদণ্ড, নারীর রূপগুণ বিজ্ঞাবুদ্ধি যোগ্যতা সবকিছু ঐখানে আত্ম সমর্পণের জন্যই।

ভারতের সংবিধানের প্রথম পাতাতেই নারী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত, সুতরাং আজকের সংগ্রামের উদ্দেশ্য যদি সমান অধিকারের জন্য হয় তাহলে তা অকারণ। এক্ষেত্রে দেখতে হবে অধিকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাকে অধিকার দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জ্ঞাপনের ব্যবস্থাও তৈরি হচ্ছে কিনা। যে চিরকাল অস্পৃশ্য থেকেছে, তাকে অস্পৃশ্যতাজনিত হীনতাবোধ থেকে মুক্ত করার সুস্থ সহজ চেষ্টা না করে হঠাৎ ঘর্টা করে মালা চন্দন পরিবেশ তার সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করলেই

অস্পৃশ্যতা বর্জন সার্থক হয় না। নারী মুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা। হীনতা বোধের শৃঙ্খল এখনো যেখানে জড়িয়ে আছে, সেখানে কয়েকটা কথার মাধ্যমে মুক্তি আনা যাবে না। এক্ষেত্রে দরকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব, এবং তাও হওয়া উচিত সর্বাতিশায়ী। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যে বিরাট দ্বিতীয় গ্রাম ও নগর জীবনে সমভাবে সমাজ জীবনের নড়বড়ে কাঠামোটাকে ভেঙে ফেলেছিল সেই ধ্বংসস্তূপেই নারী খুঁজে পেয়েছে তার ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের যে স্তরটি চিরকাল সমাজের পচনশীল ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোটাকে ধরে রাখে, তার মধ্যেই প্রথম এসেছিল সেই ক্ষুরণ। তারপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। দেশবিভাগের নানা ফলশ্রুতির অমৃত-গরল আমরা পান করেছি, কিন্তু নীলকণ্ঠ হওয়ার বদলে হয়তো বিষই উদগীর

হয়েছে, তবু নারী তার ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাবার পথে যে অনেক অগ্রসর হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আজ তাই সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের নিকট আবেদন নারী নামক অসহায় প্রণয়ভীরু কপোতী প্রতিমা ললিতাদের অকারণ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব না নিয়ে ব্যক্তি হিসাবে সকলকে ভাবতে শুরু করুন। নারীদের জন্য উৎসাহবাহীর আতিশয্য দূর করে সমাজে সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও অসুস্থ ব্যক্তিত্ব এই ভিন্নতা টুকুকে উপলব্ধি করুন। নারী সমাজ মান সমাজে তার পূর্ণ স্থানটি এটুকু সহযোগিতাতেই খুঁজে পাবে এই আশা রাখি।

পরিশেষে বলতে হয় এই ছুরারোহণীয় পর্বতমালা অতিক্রম করার কাজ নারীর নিজের হীনতা বোধ থেকে মুক্তি।

বর্তমান প্রসঙ্গ

ভারত-বন্ধু ডেভিড হেয়ার

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ভারত-বন্ধু ডেভিড হেয়ারের ত্রিশতবার্ষিকী কলকাতায় উদ্‌যাপিত হোলো। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে লণ্ডনের এক ঘড়ি নির্মাতার পুত্র ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসায় করতে এসে ভারত হিতৈষণায়, বিশেষভাবে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁর সকল অর্থ ও সামর্থ্য ঢেলে দিয়ে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতায়ই লোকান্তরিত হন। তাঁর শ্রবাস্থার নিয়ে সেকালের ক'লকাতার সকল স্তরের দীর্ঘ তিনমাইল ব্যাপী মানুষের শোকযাত্রা, তাঁর প্রদীপ্ত ভারতহিতৈষণার স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষায় যারা অগ্রণী ছিলেন, এ-বিষয়ে রাজা রামমোহনের ষাঁরা সহযাত্রী ছিলেন, ডেভিড হেয়ার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অথচ তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে এদেশে আসেননি যে শাসকদের স্বার্থে ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অসুপ্রাণিত হবেন কিম্বা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার দিক থেকেও তিনি এই মহৎ কর্তব্য সাধনে এগিয়ে আসেন নি, কারণ চার্চ বা ধর্মযাজকদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক রহিত ছিলেন। তাঁর নিজের শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। ইংরাজীর

ফাল্গুন ১৮৭০-৭১

মাধ্যমে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার ভেতর দিয়ে ভারতীয়-দের পাশ্চাত্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করবার প্রেরণা নিয়ে ১৮১৫ সালে রামমোহনের গৃহে ডেভিড হেয়ার ভারতের বন্ধন-মুক্তির আদি-জ্ঞনকের সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার পরিকল্পনা রচনা করেন। যার ফলে সেদিনকার স্মৃশ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার এডওয়ার্ড হাইড-এর আজ্ঞিত বিদ্বৎমণ্ডলীর সম্মত সমর্থনে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কর্তমান কলেজ স্কয়ারের উত্তর দিকে ডেভিড হেয়ারের দান করা জমিতে কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১৮২৬-এর ১ মে এই জমির ওপর নির্মিত ভবনে হিন্দুকলেজটি স্থানান্তরিত হয়।

সেকালে ঘড়ি ছিল সমাজে পদমর্যাদার প্রতীক। তাই ঘড়ির ব্যবসায়ের সূত্রে ডেভিড হেয়ার সেকালের সমাজের গণ্যমান্যদের সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। বাঙালী সমাজের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের হৃদয়তা, বাঙালী যুবকদের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার নিঃস্বার্থ কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি এই দেশকেই স্বদেশ জ্ঞানে এই দেশবাসীর সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর উদার আর্থিক সহমতিতা ডেভিড হেয়ারকে প্রকৃতই

ভারতবন্ধু করে তুলেছিল। তাঁর জন্ম-দ্বিশত-বার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ, জাতীয় কর্তব্য পালনের পর্যায়ভুক্ত।

পশ্চিম বাংলার বাজেট

গত ১লা মার্চ পশ্চিম বঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ বিধান সভায় ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেট পেশ করেছেন। এই অনুমিত বাজেটে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য করে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা উদ্ধৃত্ত দেখান হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে কর ধার্যের পর অনুমিত ২৭ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্তের পরিবর্তে ৬৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকা উদ্ধৃত্ত হবে বলে সংশোধিত বাজেটে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনার স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা ১৩০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট থেকে নেওয়া ৩০ কোটি টাকা ওভারড্রাফট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গত চার বছরে বিক্রয় করের আদায় হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর একটি কৃজিষের দাবী গত চার বছরে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থ চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে ভারত সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী পরিকল্পনার বরাদ্দ ছিল ৬২ কোটি টাকা; ১৯৭৬-৭৭ সালে সেই বরাদ্দের পরিমাণ হয়েছে ২৩২ কোটি টাকা। আর ১৯৭৫-৭৬ সালে যদিও বাজেটে পরিকল্পনার বরাদ্দ ছিল

১৭১ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই খাতে ব্যয় করেছেন ১৯৯ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বল্প সঞ্চয়ের সার্থক অভিযানের পুরস্কার স্বরূপ তারা উৎসাহাতক বোনাস পাবে ১৪.৮৬ কোটি টাকার। সুত্তরাং পরিকল্পনা খাতে অতিরিক্ত ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ের অবশিষ্ট ১৩.১৪ কোটি টাকা ঘটিতি মেটাবার জন্য ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে নূতন প্রায় ১১ কোটি টাকা ট্যাক্স ধার্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তবে একটা ফাঁক রয়ে গেছে ব্যয় বরাদ্দে। রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে হলে, বর্তমানের এই খাতে বরাদ্দ ২৩ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৪৫ কোটি টাকায় আনতে হবে। সেক্ষেত্রে বাজেটে ঘটিতি হণে বেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব খাতের আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে, গত কয়েক বছর যাবৎ। ১৯৭৪-৭৫ সালে রাজস্ব খাতে প্রকৃত আয় হয়েছে ৪৬০ কোটি, ১৮ লক্ষ, ৭৯ হাজার টাকা আর এবার অনুমিত আয় ৫৯৬ কোটি, ২৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, অর্থাৎ ২ বছরে এই খাতের আয় আনুমানিক বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৬ কোটি ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। বর্ষ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রের নিকট থেকে বিভিন্ন খাতে রাজ্য সরকারের বর্ধিত পাওনা এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে আদায়ীকৃত ট্যাক্সের, বিশেষভাবে বিক্রয়কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের রাজস্ব খাতের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয় করের আদায় বৃদ্ধিতে সরকারের বাজেট

ব্যবস্থাপনা বার্ষিকতার সীমানা ছাড়িয়ে সার্বিকতার দিকন্তের দিকে পা বাড়িয়েছে বলা যেতে পারে। গত ১৫ বছর যাবৎ বিরোধীদের কোনো কোনো সদস্যরা বিক্রয় কর থেকে প্রভূত সম্পদ আদায়ের ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন।

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে সামান্য উদ্ধৃত্ত হলও, ঘাটতি বাজেটের অভিধাপ মুক্ত হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই বড়ো কথা। কিন্তু আরও বড়ো কথা রয়েছে—বেকারের কর্মবর্ধমান হারকে অতিক্রম করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। পশ্চিম বঙ্গে সারা ভারতের শতকরা

৮ ভাগ জনসংখ্যার বাস, আর সারা ভারতের

বেকারের শতকরা ১৭ ভাগ এই রাজ্যে। এই কর্মবর্ধমান বেকারের হারকে রাজ্যসরকারের গতিশীল বাজেট (Dynamic budget) স্বয়ং-উন্নয়নশীলতার (self-generating growth)

পাখায় ভর করে যেদিন সম্পদ সৃষ্টি করবে, সেদিনই রাজ্য সরকারের বাজেট সার্বিক কৃতিত্বের দাবী করতে পারবে। সেদিক থেকে ক্ষুণ্ণ বাজেট

ব্যবস্থাপনা (Budget-management) কোনো, কৃতিত্ব নয়। বিলম্বে হলও একটি অনিবার্য দায়িত্ব পালন মাত্র।

নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা

পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ-ই ভেঙে পড়েছে।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে শিক্ষা জগতে একটা টাল-মাটাল চলেছে পুরাণো বনিয়াদের ওপর। ফল দাঁড়িয়েছে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা জীবন থেকে যোগসূত্রহীন হয়ে পড়েছে।

... ..

... .. পৃথিবীর আধুনিকতম

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞান উৎকর্ষের

সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে যেমন ভারতবর্ষের

তরুণ-যুবাদের বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য

সর্বজনীন প্রস্তুতির ভিত্তিস্থাপন দেশের শিক্ষা-

ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হবে। তেমনি

নিজ দেশের সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক

জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সহজ সমাধান

দিয়ে তাদের বৃহত্তর জীবনের উদার প্রাঙ্গনে

পৌছে দেবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাদের জীবন-

মুখী করে তুলবে। আর সেই সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার

জাতির স্বকীয়তাবোধে তরুণ যুবামনকে উদ্দীপিত

করবার জন্য জাতির আত্মিক শক্তিকে অতীতের

মণিকোঠা থেকে বর্তমানের সূর্যালোকে পৌছে

দিতে হবে। আজকাল উচুমহলে ‘ভারতীয়তাবোধ’

বা ‘Indianness’-এর সম্পদের কথা প্রায়ই

উচ্চারিত হতে শোনা যায়। কিন্তু বিভাগান্তর

ভারতবর্ষে যারা শিক্ষায়নের দিশারী, তারা

বুহং বুহং শিল্পকে দেবতার আসনে বসিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অত্যাধুনিক নগর-সভ্যতার স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন, 'ভারতীয়-বোধকে শিল্প-দেবতার বেদীমূলে জলাঞ্জলি দিয়েই কান্ত হয় নাই, যারা 'ভারতীয়বোধ'কে ভারতীয় জীবনের মূল উপাদানের মর্যাদা দিয়ে অতীত-ভারতের অধ্যাত্মশক্তিকে বর্তমান জীবনের ভিত্তিমূলে স্থাপন করে, ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি ও খণ্ড খণ্ড জীবনবোধকে অখণ্ড ভারতীয় জীবনবোধে পৌঁছে দেবার সঙ্কল্পে অটুট থেকে সকল প্রকার বিচ্যুতির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন।

অখণ্ড জীবনবোধের এবং ভারতের অধ্যাত্ম-শক্তির স্বীকৃতির ওপর ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দাঁড় করাতে হবে! নূতন যে ১০+২+৩-এর ত্রিধাপ—আসলে এটা চার ধাপের—শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কর্মশালায় সঙ্গে অধ্যাত্মশক্তির সমন্বয়ের একটি বাহ্য চেষ্টা রয়েছে বটে; কিন্তু এই ব্যবস্থাপনায় অনভিজ্ঞতার অল্প প্রবেশ বটে ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকদের উদ্বিগ্নতার কারণ হয়েছে। পাঠক্রম নির্বাচনে অব্যবস্থিতচিত্ততা, নির্বাচিত পাঠক্রমের গুরুভার, অনেক ক্ষেত্রে নূতন পাঠক্রমের উপযোগী শিক্ষকের অভাব—পুরাতন উচ্চমাধ্যমিকে যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিলেন—এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অত্যধিক

বিলম্ব—সব মিলিয়ে একটা ঘুরপাকের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষার নামে ডিগ্রি বিতরণের কারখানা ছাড়া আর কিছু নয় এবং সেই ডিগ্রি পাবার জন্য পরীক্ষায় নতল করাটা যেন ছাত্রদের জন্মগত অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যিনি বা যারা বাধা দিয়েছেন তাদের কপালে ছাত্র-নামধারীদের হাতে প্রহার জুটেছে। ইদানীং পুলিশ পাহাড়া দিয়ে নকলবন্ধের চেষ্টা সবটা না হলেও, অনেকটা বন্ধ হয়েছে। পুলিশ দিয়ে নকল বন্ধ বেশী দিন চলতে পারে না; শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করে, জীবনমুখী শিক্ষা দিয়ে উচ্চশিক্ষার অনাগ্রহী ও অপারগদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের স্রোত বন্ধ করে নকল বন্ধের প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ-ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির গড়নেরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন—বিকেন্দ্রীকরণ তার মধ্যে একটি বড় ধাপ। এছাড়া বহু শিক্ষার্থীদের 'ফরমাল এডুকেশন'-এর বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে তাদের পট্টিবেশ মানসিক গড়ন ও জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা রেখে। 'ইনফরমাল এডুকেশন' বা আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। 'ওপেন ইউনিভারসিটি' বা 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' এই ধরনের নানা স্তরের নানা শিক্ষা-জিজ্ঞাসুদের শিক্ষার খোরাক মেটাবে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রকৃতির সমীপবর্তী মানস গড়ে তুলবার জন্য ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনের

শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করে, বিশেষ এই ধরনের শিক্ষার পথিকৃতের কাজ করে গেছেন। শিক্ষা যেদিন সামগ্রিক হবে, অশুভবিনবোধের উদ্দীপক হবে, সেদিন প্রশ্নার্থীদের প্রশ্ন এমন করে রচিত হওয়া সম্ভব হবে, যে কোনো বই বিশেষ-এর সাহায্য নিয়েও নকল করে সেই প্রশ্নোত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।

আসলে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়ায়ই গলদ হয়ে গেছে। শিক্ষার ভিত্তি প্রশস্ততর করাই যে কোনো শিক্ষা-পদ্ধতির লক্ষ্য।
... ..
প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে, ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে ৫টি শিশুর মধ্যে যে ৪টি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাদের শতকরা ৭৫ ভাগ, এই পর্যায়ের শিক্ষা সমাপনের পূর্বেই বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছেড়ে পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধির কাজে লেগে যায়। ৭ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে ৫ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১ জন উচ্চবিদ্যালয় কিম্বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্তরে পৌঁছায় এবং ২৫ জনের মধ্যে ১ জন কলেজ-শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়। ১১ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের বিনাবেতনে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পৌঁছে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রশস্ততর ভিত্তির ওপর স্থাপনের লক্ষ্য তাই এখনও বহু দূরের বস্তু। এই পোক্ত ভিত্তির ওপর উচ্চ, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ইমারত না গড়া পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার ভারসাম্য যেমন বার বার বিনষ্ট হবে, তেমনি এই ভিত্তির উপর

উচ্চ এবং উচ্চমাধ্যমিকের স্তর পেরিয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষায় অমুপযোগী ও অনাগ্রহীদের অনন্তোপায় হয়ে কলেজীয় কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দরজায় ধর্ণা দেবার শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে রেহাই দেবার ক্ষমতা প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্তরের পরই বৃদ্ধিমূলক, কারিগরী শিক্ষার পথ অগম করে দিতে হবে—যে শিক্ষা দেশের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষির সঙ্গে এবং শিল্প প্রধান অঞ্চলে শিল্পের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেবে। ১৪ বছর বয়সের পর উচ্চতর শিক্ষার জ্ঞান শতকরা কতজন শিক্ষার্থীর সুযোগ পাওয়া উচিত? এ-নিরে মন্তভেদ থাকলেও ইউনিভারসিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সতীশ চন্দ্রর হিসাবে এই সংখ্যা বর্তমানে ভারতে শতকরা ৩ ভাগ, মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৩৯ ভাগ, কানাডায় শতকরা ২০ ভাগ। সোভিয়েত ইউনিয়নে শতকরা ১৮ ভাগ জাভা শতকরা ৮ ভাগ। প্রফেসর চন্দ্রর মতে ভারতবর্ষে উচ্চতর শিক্ষার হার শতকরা ৪-এর নীচে নেমে যেতে দেওয়া বিপজ্জনক হবে—“It would be dangerous to permit the rate of expansion of higher education in India to fall below 4%”।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েৎ রাশিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কমিটির অমুমোদনক্রমে ক্রুশ্চেভ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সংকোচন করে শিক্ষা সংস্কার করেছিলো। সেদিন লক্ষ লক্ষ রুশ যুবক মাধ্যমিক শিক্ষার দরজা

অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় উচ্চশিক্ষার জন্য হানা দিচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। কারণ অতো ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থের অতীত হয়ে পড়েছিলো। সে-ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রেরও সঙ্গতির সামর্থের অতীত। এদিকে শিল্পায়ত রুশের কল-কারখানায় লোকবলের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তাই ক্রুশ্চেভকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দরজা থেকে রুশ তরুণদের কল-কারখানায় কারিগরীদের আসনে তাড়া দিয়ে নিরে যাবার উদ্যোগে নিয়োজিত হতে হয়েছে। ক্রুশ্চেভ বুঝেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ছাত্রদের ভাবী প্রত্যেকের স্নোহ করতে হলে, মাধ্যমিক স্কুলেই তাদের রুখে দিতে হবে। কিন্তু ক্রুশ্চেভকে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগে এই ছাঁটাই আরোপ করতে বেগ পেতে হয়েছে। ১৯৫৯-এর বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগের এই ছাঁটাই সাময়িক বলে ঘোষণা করতে হয়েছে। এ-ছাড়া পলিটেকনিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষা ও উৎপাদনক্ষম শ্রমের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার ও শ্রমের মর্যাদায় সমতা সপ্রমাণ করতে হয়েছে।

আমাদের দেশেও তাই যথেষ্ট মত ত্রিমাত্রিক—প্রাথমিক পর্যায় নিয়ে চারখাপের—শিক্ষার মস্ত উচ্চারণ না করে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষাকে জীবন-মুখীন করে তুলতে হবে এবং ভারতীয় জনাঙ্গসত্তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে

শিক্ষার সকল স্তরের মধ্য দিয়ে ভারতীয়ত্ববোধকে প্রদীপ্ত করে তুলতে হবে।

সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির পঞ্চবিংশতিতম কংগ্রেস

সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু বিধোষিত ২৫ তম কংগ্রেস মস্কোতে ১৯৭৬-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত ৪৯৯৮ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। এদের শতকরা ৭৫ ভাগ আনকোরা প্রতিনিধি এই প্রথম পাটি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, শতকরা ৩৪ভাগ শ্রমিক শ্রেণীভূক্ত, এবং ১১ জন মহাকাশচারী রয়েছেন। প্রতিনিধিদের শতকরা ৭০ ভাগের ওপর গড় বয়স ৫০ বছরের নীচে। এরা ছাড়া সারা বিশ্বের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি থেকে কয়েক শ' পর্যবেক্ষকও সমাবেশে হাজির হয়েছেন।

কংগ্রেসের প্রথম দিনই পার্টির নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ রিপোর্ট উপস্থাপন করে আলোচনার সূত্রপাত করে উপাস্তে বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শগত চিন্তার সম্পূর্ণ ঐক্যমতের কথা উল্লেখ করে বলেন : “The words (spoken) about proletarian internationalism, about the friendship of peoples, and the struggle for peace resounded in one voice. This is our policy and we will not retreat from it.”

কিন্তু 'শ্রমিকের আন্তর্জাতিকতা' এবং 'শাস্ত্রের সংগ্রামে ঐক্যতানে' এবার সায় মেলেনি। যা কখনও ঘটে নাই, এবার তাই ঘটেছে। ক্রেমলিনের মঞ্চ থেকে কয়েকটি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতারা বেসুরো বক্তৃতা দিয়েছে বললে কম বলা হয়। ক্রেমলিনের খবরদারী থেকে ক্রেমলিন নির্দেশিত পথ থেকে অর্থাৎ 'ক্রেমলিন লাইন' ('Kremlin Line') থেকে সরবে মুক্তি ঘোষণা করেছে। রুম্যানিয়ার নিকোলাই কিউসেসকিউ (Nicolae Ceausescu), কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক দলগুলির নিজস্ব রাজনৈতিক লাইন—political line—প্রচারের অবাধ অধিকার দাবী করে, ফরাসী ও ইতালীয় পার্টি'রাও বিভিন্ন পার্টি'র স্বাধীনতা স্বীকৃতির দাবী জানিয়েছে। ব্রিটিশ কম্যুনিষ্টরা নিজস্ব 'ব্রিটিশ' পথে চলবার এবং স্প্যানীয় কম্যুনিষ্টরা তাই দাবী করেছে। অর্থাৎ, এই পার্টি'গুলি কার্যত মস্কোর নেতৃত্বের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতা ইতালীয় স্কাটো (NATO) জোটের অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করে সোভিয়েত পক্ষীদের শিবিরে বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে, আর ফ্রান্সের পার্টি'র 'শ্রমিকের একনায়কত্ব'-এ নীতি ('dictatorship of the Proletariat') বিসর্জন দিয়ে মার্ক্সবাদের মূলেই কুঠারঘাত করেছে। তাছাড়া ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টি'র স্বাভাব্য ও স্বাধীনতা বোঝাবার জন্য এই প্রথম ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক—বর্তমানে জর্জ মার্কাইল (George Marchais)—সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট

পার্টি'র কংগ্রেসে গরহাজির হোলো। যুগোস্লাভিয়ার মাইলোভান জিলাস (Milovan Djilas) সর্বপ্রথম এবং পরে ইতালীর কম্যুনিষ্ট পার্টি'র লোকান্তরিত নেতা তোগলিয়াত্তি (Togliatti) কম্যুনিজম-এর জাতীয়তাবাদী বা 'জাশনাল কম্যুনিজম'-এ রূপান্তরের কথা বলে গেছেন। মস্কো ২৩ তম কংগ্রেসে স্বার্থ-হীনভাবে সেই অন্তিম পরিণতির আশ্বস্রকাশ দেখা গেলো। এই রূপান্তর খাঁচা না মেকী ইউরোপের সমাজবাদী দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় আরোহণ করে স্বমূর্তি ধারণের ছলনা কিনা, কোনো কোনো পশ্চিমী শাস্ত্রের মনে এই সংশয় রয়েছে। তবে 'জাশনাল কম্যুনিজম'-এর বিবর্তন লক্ষ্য করলে এই সংশয়ের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন কৃষি উৎপাদনে সোভিয়েত রুশের মারাত্মক ব্যর্থতা সত্ত্বেও ১৯৭৬-৮০ সালের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে সোভিয়েত অর্থনীতির এক রঙীন চিত্র আঁকেছেন। গত পরিকল্পনার আমলকে সোভিয়েত রুশের সর্বোত্তম পাঁচ বছররূপে উল্লেখ করে বলেন এই সময় শিল্প উৎপাদনের উন্নয়নের হার বছরে শতকরা ৭.৪ ভাগ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একই উন্নয়নের হার মাত্র শতকরা ১.২ ভাগ। এই উন্নয়ন সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে—যথা ভারতবর্ষ—'শ্রম-বিভাগ'ের (division of labour) শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর হচ্ছেন। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে "আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের", ('International division of labour') ভিত্তিতে অনেক পুর্বেই বৌদ্ধ উৎপাদনের

উদ্ভোপ হয়েছে। সেখানে অসম ফল ফলতে দেখা গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির বেলায় কি তার ব্যতিক্রম হবে? এটাই প্রশ্ন।

২৫-তম কংগ্রেসের সমাপ্তির পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নির্বাচন হয়ে গেছে। মোস্তিয়েভ কম্যানিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকরূপে ব্রেজনেভ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তেমনি হয়েছেন ডি, পলিয়ানস্কি (D. Polyansky) ছাড়া অন্যান্য সকল বর্তমান সদস্য। ১৯৭৫-এর কৃষি উৎপাদনে বার্ষিক পলিয়ানস্কির ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্ত দায়ী। ইতিপূর্বে ১৯৭৩ পলিয়ানস্কি ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীর পদ খুইয়ে কৃষির ভারপ্রাপ্ত হয়েছিল। পলিটব্যুরোর সদস্য রইলেন ১৬ জন, তাদের সঙ্গে ৬ জন উপ সদস্য (candidate Members)। লেনিনগ্রাদ পার্টির সম্পাদক ৫৩ বছর বয়স্ক গ্রিগরী রোমানভ (Grigory Romanov) এবং সেন্ট্রাল কমিটিতে প্রতিরক্ষা শিল্পের ভারপ্রাপ্ত ডিমিত্রি উসটিনভ (Dimitri Ustinov) এই উপ-সদস্যপদে উন্নীত হয়েছেন। আজেরবাইজান পার্টির নেতা গাইডার আলিয়েভ (Gaidar Aliyev) পলিট ব্যুরোর উপসদস্য পদে উন্নীত হয়েছেন।

পার্টির সেক্রেটারীর সংখ্যা ৯ থেকে ১১তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রাভদার সম্পাদক মিখাইল জিমায়ানিন (Mikhail Zimyanin) এবং উন্নয়নশীল দলের নেতা কনষ্টানটিন চেরনেনকো (Constantin Chernenko) সম্পাদক পদে নতুন সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি ২৪ তম কংগ্রেসের পর ২৪১ জন পূর্ব সদস্য ১৫৫ জন বিকল্প সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবার পার্টির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যাও যথাক্রমে ২৮৭ পূর্ণ ও ১৩৯ বিকল্প করা হয়েছে। পলিয়ানস্কি কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছে। 'টাস'-এর বড়কর্তা লিওনিদ জামাইয়াটিন (Leonid Zamayatin) এবং ইজভেসতিয়ার নতুন সম্পাদক পি. এক্সেলেক্সিয়েভ (P. F. Alexiev) পুরো সদস্য হয়েছে। নামীদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ গেছে তারা হচ্ছেন এক্সেলেক্সি শেলেপিন (Alexi Shelepin), পি, ই, শেলেস্ট (P. E. Shelest)। আনাস্তাস মাইকোয়ান (Anastas Mikoyan) এবার নিজেই সরে দাঁড়িয়েছেন।

চীনে আর এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী চু-এন-লাই-এর স্থলবর্তী প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগের সম্ভাবনাকে উপড়ে দিয়ে জিয়া কুয়ো-কে-এর নাম অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী-রূপে ঘোষিত হবার অব্যবহিত পূর্ব থেকেই 'পিপলস ডেইলী' পত্রিকা চীনের ক্ষমতায় আসীন পুঁজিবাদী পন্থী—'Capitalist roaders'—এবং দক্ষিণ পন্থায় স্থলিতদের—'Right Deviationists'—বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। ১৯৬৬ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরুতে গিউ সাঙ-চি এবং তেং নিয়াও-পেং-এর বিরুদ্ধে এই দুই অভিযোগের এক লক্ষ্যও দুই লক্ষ্য অপরাধী তত্ত্বা এঁটে দেওয়া

হয়েছিলো। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর লিউ শাও-চি অন্তর্হিত হয়েছেন। তেং সিয়াও-পেং এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বিপর্যস্ত অস্ফাট নেতাদের চু এন-লাই ধীরে ধীরে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন। এদের মধ্যে তেং সিয়াও-পেং পার্টিতে প্রশাসনে এবং সেনাবাহিনীতে সব চাইতে শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ। সুতরাং তেং-এর মত শক্তিশালী প্রধান মন্ত্রীর পদে নিশ্চিত-নিয়োগ প্রতিহত করতে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে দারুণ মতবিরোধ, বলতে গেলে ভাঙন—‘Split’—দেখা দেবে এবং স্বয়ং মাও সে-তুং-কে তেং বিরুদ্ধে ছয়া কুয়ো-ফেং-এর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদে মনোনয়নে নির্দেশ দিতে হবে—ঘটনার এই পরিণতি অবশ্যস্বাবী হয়ে উঠবেই।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় প্রাচীরপত্রে—
 চীনাভাষায় দাজিবাও—(Dazibao)—প্রথম তেং-এর বিরুদ্ধে প্রচেষ্টাভাবে প্রচণ্ড প্রচার শুরু হয়ে অস্ফাট বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। সাংহাইতেই ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রথম বিরাট জনসভায় প্রকাশ্যে প্রচণ্ডভাবে তেং-বিরোধী এই প্রচার অভিযানে গতিবেগ সঞ্চার করে সাংহাই-এর রাডিক্যালরা এবং সাংহাই বেতার থেকে বলা হয় মাও সে-তুং ব্যক্তিগতভাবে এই বৈপ্লবিক গণ-বিতর্কের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ১৯৫৬-র নভেম্বর সাংহাই রাডিক্যালদের অস্ফাটম নবীন নেতা জামাতা ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান (Yao Wen-Yuan) দিয়ে সাংহাইতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গোড়ালি মেরে দেন। সাংহাই-আর ছাই রাডিক্যাল নেতা

চ্যাং চুং-চিয়াও (Chang Chung Chiao), ৪০ বছর বয়স্ক ওয়াং হুং-ওয়েন (Wang Hung Wen)। এরা তিনজনই পলিট ব্যুরোর সদস্য। চ্যাং তিন নম্বর উপপ্রধান মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর চীফ পলিটিকাল কমিশনার। চ্যাং এবং ওয়াং হুং-ওয়েনই পলিট ব্যুরোর নয়-সদস্য বিশিষ্ট ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য; পার্টিতে চু-এর মুক্তার পর ওয়াং-এর স্থান মাও-সে-তুং-এর পরই এমন কি সাংহাই-এর বর্ষীয়ান র্যাডিক্যাল চ্যাং-এরও ওপরে—১ নম্বর ভাইস-চেয়ারম্যান রূপে। মাও জামাতা ইয়াও-এর কোনো সরকারী পদ না থাকলেও চীনের প্রচার যন্ত্রগুলির ওপর—সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন-এর ওপর সাংহাই-এর র্যাডিক্যালদের বিশেষভাবে মাও-জামাতা ইয়াও-এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এছাড়া সাংহাইতে অস্ফাটম র্যাডিক্যাল মাও-পন্থী চিয়াং চিং (Chiang Ching) রয়েছেন নবীন নেতাদের পথ কেটে দেবার জন্য।

প্রাচীরপত্রে তেংকে ‘চীনের দ্বিতীয় ক্রুশ্চেন্দরপে’ বর্ণনা করা হয়েছে—লিউ শাও-চি নামাঙ্কিত হয়েছিলো ‘প্রথম ক্রুশ্চেন্দরপে’। তাছাড়া ১৯৬২তে তেং-এর উদ্ধৃতিগুলি : “বেড়ালটা কাল কি সাদা তাতে কিছুই এসে যায় না, ইঁহর ধরতে পারলেই হয়” কিংবা “উত্তর কিংবা দক্ষিণ যেদিক থেকেই পর্বতারোহণ করা না কেন তাতে কিছুই এসে যায় না, যদি পর্বতের চূড়ায় পৌঁছাতে পারি স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলা হলে, বারা অধরধর কখা বয়ে

তাদের কাছে কাজ হাসিল করাটাই বড়ো কথা। আদর্শগত প্রশ্ন একেবারে গোপন। কাজ হাসিল করার নামে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বে যে সব অস্বাভাবিক রীতি-নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো, পুজিবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তেং ক্ষমতায় ফিরে এসে সেগুলিই অনুসরণ করছেন, যদিও পুনর্বাসনের পূর্বে অতীত ভুলের জন্য তেং দুঃখপ্রকাশ করেছিল—মাও নিজেরই সরাসরি এই অভিযোগে সার দিয়েছেন গত ১০ই মার্চ পিপলস ডেইলীর একটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম লিখে দিয়ে। সম্পাদকীয়তে তেং-এর নামোল্লেখ না থাকলেও, আক্রমণের লক্ষ্য যে তেং সেকথা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। সম্পাদকীয়টির শিরোনামে মাও-এর দেওয়া কথাগুলো: “The reversal of the verdicts of cultural Revolution cannot win the people over.”

গত চার বছরে তেং ক্ষমতায় দৃঢ়মূল হয়েছেন। অপরপক্ষে সাংহাই রাডিকালদের পার্টির বাইরে সেনাবাহিনীতে কিংবা প্রশাসনে কোনো প্রভাব নাই বলা চলে। একমাত্র চ্যাং চুং-চিয়াও তিন নম্বর উপপ্রধানমন্ত্রীর এবং সেনাবাহিনীর চীফ পলিটিক্যাল কমিশনাররূপে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকবেন। কিন্তু তেং এক উপপ্রধান-মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাবাহিনায়ক—চীফ অফ দি আর্মি ষ্টাফ, চীনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিকরূপে স্বীকৃত। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিরীষ পরিচালক যৌথ খামার ও কয়লা নেতাদের এবং সেনাবাহিনীর সমর্থনে যতদূর খাটতি

না পড়তে তেংকে উৎসাদিত করা সহজ হবে না। স্বয়ং মাও সে-তুং সরাসরি একাঙ্গে এগিয়ে এলে সঙ্কটের আবর্ত অনিবার্যভাবে ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি বিপদসঙ্কেত দেখা যাচ্ছে। মাও ওয়াটারগেট কলঙ্কের মসীলিপ্ত নিজেকে চীনে আমন্ত্রণ করে রাজকীয় সম্মান দিয়েছেন এবং চীনের বর্তমান, ঘরোয়া সঙ্কটের মূল ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া পিপলস ডেইলী মাও-এর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়েছে যেখানে মাও বলছেন বর্তমান সঙ্কটের মূল পক্ষাংশ দশকে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে পার্টির একশ্রেণীর বিরোধিতায় নিহিত রয়েছে: “The target of the socialist revolution was myself. There were objections within the party ever since the collectivism (during the 1950’s when China nationalised all industries and started the communes)” আর একটি সংবাদে জামা যায় সাংহাই এবং লিয়াওইং (Liaoning) প্রদেশের সেনইয়াং (Shenyang) শহরে অবস্থিত চীনা মুক্তি বাহিনীর দুইটি শাখা এই অভিযানে যোগ দিয়েছে, শেযোক্ত শহরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যোগদানকারী কিছু সংখ্যক রেড গার্ড (Red Guard) যোগ দিয়েছে।

এই খানেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সঙ্গে এখন পর্যন্ত বর্তমান অভিযানের প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। সেই বিপ্লবে যুবকদের আহ্বান করে রেড গার্ড গঠন করা হয়েছিলো। বাদের প্রচার অভিযান অবিলম্বে

হিংস্রতায় পূর্ববিস্তৃত হলে চু এন-সাই-মাও-এর সম্মতিক্রমে—সেনাবাহিনীকে দিয়ে তাদের দমন করতে এবং ভেঙে দিতে বাধ্য হয়। এবারকার অভিযানে যুবকদের দিয়ে রেড গার্ড গঠনের এই বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা মাওকে এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে নিরস্ত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তেং-এর সঙ্কট-উত্তরণের পথ খোলা থাকবে, অসম্মান করা যেতে পারে।

রেল বাজেট

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি ১০ই মার্চ ১৯৭৬-৭৭ সালের উপস্থাপিত রেল বাজেটে অত্যাবশ্যক পণ্য ছাড়া মালের ভাড়া বৃদ্ধি করলেও যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করেন নাই। মালের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত ৮৭.৩৫ কোটি টাকা উদ্ধৃত্ত থাকবে। কিন্তু এই আয় বৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৯৭৫-৭৬-এর ২১ কোটি ৪০ লক্ষ টোন মালের পরিবর্তে ১৯৭৬-৭৭-এ ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টোন মাল রেল চলাচল করবে এবং যাত্রী সংখ্যা শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পাবে ২৪ কোটি টন মাল চলাচলের এবং তদনুযায়ী যাত্রী বৃদ্ধির উপযোগী যে প্রচুর অর্থ ৪র্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা হয়েছে, সে লক্ষ্য এখনও বহুদূর। কিন্তু মালের ভাড়ার উপর এই নূতন সার চার্জের ফলে শিল্প পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেবে এবং মূল্যস্থিতির প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে। তাছাড়া আগামী বছরে প্রায় নয়কোটি টাকা উদ্ধৃত্ত হবে, তারও নিশ্চয়তা নেই। কারণ ১৯৭৪-৭৫-এর

আনুমানিক ২৩ কোটি টাকার উদ্ধৃত্ত বছর শেষে ৬৩ কোটি টাকার ঘাটতিতে পরিণত হয়েছে।

পোস্টাল চার্জের বৃদ্ধি

১লা মার্চ থেকে পোস্টকার্ড ও ইনল্যাণ্ড বাদে রেজিষ্ট্রেশন, ভি, পি, পি, মনি অর্ডার কমিশন, ইনসিওরেন্স ফি, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকার বলেছেন সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পোস্টাল সার্ভিস ছাড়া ঘাটতি পূরণের জন্য পোস্টাল চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ মনি অর্ডার, রেজিষ্ট্রেশন, ভি, পি, পি ইনসিওরেন্স টেলিফোন ও টেলিগ্রাম/সব কিছু স্বেচ্ছায়ই কম বেশী ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। সাধারণ লোক রেহাই পেলো এ-যুক্তি খাটে না।

২০ দফার জম্ম ১৯৭৬-৭৭-এর বরাদ্দ

১৯৭৬-৭৭ সনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশ দফার জম্ম ২,১৬০.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যে ২১৩৩.৩২ কোটি টাকা রাজ্য-গুলির এর ২৭.৫৬ কোটি টাকা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জম্ম এর মধ্যে সব চাইতে বেশী উত্তর প্রদেশের জম্ম ৩৬৯.৩ কোটি টাকা; পশ্চিমবঙ্গের জম্ম : ১১১.৪৮ কোটি টাকা।

ভূমি সংস্কার আইন

ভূমির উৎকর্ষতম সীমা এবং অস্বাচ্ছন্দ ভূমি সংস্কার সমস্যা নিয়ে আলোচনার জম্ম প্রধান মন্ত্রী মুখ্য-

মন্ত্রীদেব দিল্লীতে যে দুইদিন, ব্যাপী সভা ডেকেছিলেন তাতে স্থির হয়েছে যে ৩০শে জুনের মধ্যে গুরুতর আইনসমিতি বাধা না থাকলে ভূমির উৎকর্ষ সীমার আইন আগামী ৩০ জুনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে এবং তালুক বা তহসিল ভিত্তিতে ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট

গত ১৫ই মার্চ, ১৯৭৬ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সি. ইন্ড্রানিথম লোক সভায় ১৯৭৬-৭৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন। রাজস্ব খাতে গতবারের ১৯৭৫-৭৬ সালের—সংশোধিত বাজেটের ৮০২৩ কোটি টাকার তুলনায় এবারকার বাজেটে ১৯৭৬-৭৭ সালের ঐ খাতে অল্পমিত আয় ৮২২৭ কোটি টাকা। আর রাজস্বখাতে ব্যয় গতবছরের সংশোধিত বাজেটের (১৯৭৫-৭৬) ৭১১৭ কোটি টাকার তুলনায় এবারকার অল্পমিত বাজেটে ব্যয় (১৯৭৬-৭৭) ৭৬৯০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, রাজস্ব খাতে আয় এই এক বছরে বাড়বে শতকরা ১২.৫ ভাগ কিন্তু ঐ খাতে একই সময়ে ব্যয় বাড়বে শতকরা ১৮ ভাগ। সুতরাং বাজেটের হিসাবে ঐ খাতে এই এক বছরে ব্যয় বাড়বে আনুপাতিক হারে আয়ের চাইতে শতকরা ৫.৫ ভাগ বেশী। অথচ, নূরু বাজেটে রাজস্ব খাতের ব্যয় রাজস্ব খাতের আয় দিয়ে মেটাবার দায়িত্ব থেকে যায়। রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়ের সমতার মাপকাঠি সাধারণ বাজেটে যেমন গতিশীল বা 'dynamic' বাজেটের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

মূলধনী খাতের চেহারাটা অশ্রুতকম। ঐ খাতে ১৯৭৫-৭৬-এর সংশোধিত আয়ের চাইতে ১৯৭৬-৭৭-এর বাজেটে অল্পমিত আয় শতকরা ১৭ ভাগ বাড়লেও, ঐ খাতে এই দুই বাজেটে ১৯৭৫-৭৬ এর তুলনায় ১৯৭৬-৭৭ সালে ব্যয় শতকরা ৪.৪ ভাগ। এরই ফলে ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে মোট অল্পমিত ঘাটতির পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ এর সংশোধন বাজেটের ঘাটতির চাইতে কম।

এই ঘাটতি কত? ১৯৭৫-৭৬ এর অল্পমিত বাজেটে ঘাটতি ছিল ২৪৭ কোটি টাকা, ১৯৭৫-৭৬ এর সংশোধিত বাজেটে সেই ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯০ কোটি টাকায়। ১৯৭৫-৭৬ সালে অতিরিক্ত নুতন করের বিপুল পরিমাণ ছিল ২৮৮ কোটি টাকার। এবার সে তুলনায় নুতন কর ধার্য হয়েছে অনেক কম, ৮০ কোটি টাকার। তার মধ্যে কেন্দ্র পাবে ৪৮ কোটি টাকা অবশিষ্ট ৩২ কোটি টাকা যাবে রাজ্যসরকারগুলির ভাগে। এই ৪৮ কোটি টাকা নুতন করের ফলে ১৯৭৬-৭৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৬৮ কোটি টাকার ঘাটতি কমে এসে দাঁড়াবে ৩২০ কোটি টাকায়। সুতরাং গতবারের ৪৯০ কোটি টাকার ঘাটতির পর এবারকার অর্থাৎ ১৯৭৬-৭৭ এর প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থমন্ত্রী ৩২০ কোটি টাকার ঘাটতি রেখে দিয়েছেন; এই বিপুল ঘাটতি পূরণের জন্য কোনোভাবেই তিনি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। গতবারের অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ এর সংশোধিত বাজেটের ৪৯০

কোটি টাকার বিপুল ঘাটতি যেমন মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয় নাই, তেমনি ১৯৭৬-৭৭-এর প্রস্তাবিত বাজেটের ৩২০ কোটি টাকার ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধির কারণ হবে না, এ-বিষয়ে অর্থমন্ত্রী নিরুদ্বিগ্ন। তাই যাদ হয়, তাহলে ৮০ কোটি টাকার অতিরিক্ত নুতন কর ধার্য করাই বা কেন? এবারও তো অর্থমন্ত্রী ৩৬৮ কোটি টাকার ঘাটতি রেখে নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারতেন? এই নিরুদ্বিগ্নতার কারণ হল এবারকার বিপুল পরিমাণ খাজানা-পাওনা—প্রায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টেনের সীমানা, পরিকল্পনার খাতে ১৯৭৫-৭৬-এর চাইতে এবারকার অনুমিত বাজেটে শতকরা ৩১.৬ ভাগ বিনিয়োগ বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রা-তহবিলের স্বাচ্ছন্দ্য-বিভিন্ন খাতে কর-ছাড়ের ফলে বর্ধিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-বিবৃদ্ধি মুখীন অর্থনৈতিক (growth-oriented economy) পরিস্থিতির আমুক্য সৃষ্টি। ১৯৭৬-৭৭ সালে পরিকল্পনার বরাদ্দ ৭৮৫২ কোটি টাকা গতবছরের চাইতে ৩১.৬ ভাগ বৃদ্ধি হলেও এই খাতে গতবছরের (১৯৭৫-৭৬) শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে এই বছরের পরিকল্পনার বরাদ্দের একটা প্রভেদ রয়েছে যে, ১৯৭৫-৭৬-এর প্রথমার্ধে মূল্যবৃদ্ধির ফলে সেবারকার শতকরা ২৫ ভাগ বর্ধিত পরিকল্পনার বরাদ্দের অর্থের প্রকৃত পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়ে গিয়েছিলো। এবার সেটা হ্রাস পাবে না বলে অর্থমন্ত্রী অনুমান করেছেন। এই অনুমানের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, মূল্যস্তর হ্রাস পেয়ে স্থিতি লাভ করেছে এবং এবারের বিপুল পরিমাণ

বিনিয়োগ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক নানা বিধি-নিষেধ ও অনুশাসন প্রয়োগ করার ফলে মূল্যস্তর-বৃদ্ধি-পেয়ে সেই স্থিতি-বিপর্যস্ত হবে না। অবশ্য অর্থমন্ত্রী একটু কঁাক রেখে শেষ কথা বলেছেন : অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।

অর্থমন্ত্রী সঙ্গতভাবেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় সাংগঠনিক ক্ষমতা অনুযায়ী পাবলিক সেক্টরে যাতেটা সম্ভব বেশী বিনিয়োগের অনিবার্যতার কথা বলেছেন এবং সেই অনুযায়ী এ-বছর (১৯৭৬-৭৭) বাবদ কেন্দ্রীয় তদারক ৪০৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দ করা হয়েছে; ১৯৭৫-৭৬ সালে এই বিনিয়োগের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩১৫৪ কোটি টাকা। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বরাদ্দের থেকে মোট বিনিয়োগের বরাদ্দের পরিমাণ ১৯৭৬-৭৭ সালে ৩৭৬২ কোটি টাকা। ১৯৭৫-৭৬ সালে ছিল ২৮১২ কোটি টাকা।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সরকারী নিরিখে বাজেটের গড়ন যেমন অর্থ-বিবৃদ্ধি মুখীন হবে (Self-generating), তেমনি হবে ক্ষমতামুখীন (egalitarian)। বাজেটের গড়নের দৌলতে অর্থনৈতিক স্থিত-স্বার্থদের (Status quoist) শক্তি বৃদ্ধি পাবে, অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিক হীনবলদের সামর্থ্য আরও হ্রাস পাবে, এটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে কর-ছাড় ও নতুন বৃদ্ধির রকমকর-এ সেধরণের প্রবণতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে কি না, সেটা বিচারে ও বাজেটের ভাল-

মন্দ অবশ্যই যাচাই করতে হবে। কারণ সমাজে বঞ্চিতদের বোঝা যে বাজেট বাড়াবে তার পরিণামে বৈষম্য বাড়বে, বঞ্চনাও পীড়ন বাড়বে এবং তার অন্তিম পরিণতি হবে বহুমানুষের ক্রয়ের সামর্থ্য ক্রমশঃ কমে হয়ে পরিকল্পনা দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের মজুত বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনীতিতে অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে। বর্তমানে পাইকারী স্তরের মূল্য হ্রাস পেলেও চাহিদার অভাবে পণ্যের মজুদের পরিমাণ শিল্পে অনেকটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে। প্রস্তুত বিত বাজেটের গড়নে সেই নিরিখের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলে মনে পড়ে। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের-এর সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও ক্রেতা সাধারণের আয়ের ক্ষেত্রে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির পরিপন্থী হতে পারে বাজেটে কর ছাড়ের বিস্তারিত প্রয়োজন।

আয়করের ক্ষেত্রে বর্তমানে করের বোল আনা ছাড়ের মাত্রা ৮০০০ টাকার সীমানায় বজায় রাখা হয়েছে। এই সীমানা আরও বাড়ানো হয় নাই। সরকারী স্বীকৃতিতেই জানা গেছে বর্তমান টাকার মূল্য ৩০ পয়সার কাছাকাছি নেমে এসেছে। সেক্ষেত্রে ৮০০০ টাকার প্রকৃত মূল্যমান ২৪০০ টাকার কাছাকাছি। এই টাকার উপার্জনকারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রেতা-সাধারণ। প্রকৃত মূল্যমানের ৫০০০ টাকা সীমানা পর্যন্ত ছাড় হলে, অর্থাৎ বর্তমান

মুজার নিরিখে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় হলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রেতা-সাধারণ বাস্তবিক পক্ষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতো। ১৫০০০ টাকা না হলেও ১২০০০ টাকা, নিম্নে পক্ষে ১০,০০০ টাকা ছাড় দিলেও এই আদায়কারীদের বঞ্চনার কিছুটা মাত্রা লাঘব করা হতো। সেক্ষেত্রে দেখা যায় ৮০০১ থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের ছাড়ের হার শতকরা ১৭ থেকে শতকরা ১৫তে আনা হয়েছে। ১৫০০১ থেকে ২০০০০ টাকা পর্যন্ত আয় কর হ্রাস হয়েছে শতকরা ২০ থেকে ১৮ ভাগ, অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকার আয়ের ওপর ধর্ম কর শতকরা ৭৭ থেকে শতকরা ৬৬ ভাগে এবং ৭০,০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধর্ম আয়কর শতকরা ৭০ থেকে শতকরা ৫৫ ভাগে কমানো হয়েছে। সংক্ষেপে নিম্নতম আয়ের স্তরে আনুপাতিক হারে আয়কর কমলো শতকরা ১১.৭ ভাগ আর উচ্চতম আয়ের স্তরে আয়করের আনুপাতিক হার কমলো শতকরা ১২.৫ ভাগ। উর্ধ্বতম আয়ের সীমানাগুলির ওপর করের হার কমিয়ে পোপন আয় থেকে আয়কর বৃদ্ধির সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগুক সেটা অবশ্যই কাম্য কিন্তু এই পথে স্বল্প আয় সম্পন্নদের ওপর করের আনুপাতিক বর্ধিত হারে বৈষম্য বৃদ্ধি পেলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলে, শিল্প-বাণিজ্যে অতিরিক্ত বিনিয়োগের উৎপাদন যে কাটতি হবে না, পণ্য মজুদ বাড়বে, পরিণামে অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি হবে সেই আশঙ্কা কি

উপেক্ষণীয়? বর্তমান বাজেটের গড়ন সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে। অর্থমন্ত্রী সম্পদ করের হারও বিভিন্ন গোষ্ঠির ক্ষতি কমিয়েছেন। সেখানেও বিস্তারিত গোষ্ঠীদের কর কমতির শতকরা হার স্বল্পবিস্তদের চাইতে অনেক বেশী।

বাজেটে করপোরেট সেক্টরকে কয়েকটি বিষয়ে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৬-এর ৩১শে মার্চের পর অগ্রাধিকারী শিল্পে যে সব কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের নূতন যন্ত্রপাতি ফ্রয়মুল্যের উপর শতকরা ২৫ ভাগ বিনিয়োগ এলাউয়েন্স (investment allowance) দেওয়া হবে, চলতি ডিপ্রিসিয়েশন এলাউয়েন্স (depreciation allowance) বাতিল হয়ে যাবে। আর ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্সের (Capital Gains Tax) শতকরা হারের হ্রাস এবং ১৯৬৪৪ র কোম্পানী সার্চার্জ অ্যাক্ট (Companies Surcharge Act) অনুযায়ী দেয় সার্চার্জের ছাড়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

কাপড় কাচা সাবান, রেডিমেন্ট পোষাক মোটা কাপড়, টেনলেন্স স্টীলের রেল, কম দামের গায়ে মাথা সাবান ইত্যাদির সঙ্গে মাঝারি রেফ্রিজারেটর ও ছোট টেলিভিশন সেটের ওপর শুল্ক হয় কমান হয়েছে মা হয় রদ করা হয়েছে। কিন্তু তারই পাশে কাগজের ও পেটেন্ট ওষুধের ওপর শুল্ক বৃদ্ধিতে

হতবাক হতে হয়। কাগজ তো সাধারণ লোকের ব্যবহার্য, পেটেন্ট ওষুধও আজকাল চিকিৎসকেরা সব রকম রোগের উপশমের জন্য ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকেন! এগুলির ওপর কর চাপিয়ে সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে পৌঁছে দেওয়া কি জায়-বিচার অনুমোদিত? তাছাড়া কাগজের উপর শুল্ক এতোকাল ছিল ওজন-নির্ভর এখন করা হল মূল্য-নির্ভর। বর্তমানে এক কেজি কাগজের উৎপাদন শুধু ১৫ পয়সা, অর্থাৎ এক টনে ১৫০ টাকা। কিন্তু ১৯৭৬-৭৭-এর বাজেটে অর্থ মন্ত্রী ওজনের পরিবর্তে দামের ওপর শুল্ক বসিয়েছেন। ফলে বাজেট উত্তর এক টন কাগজের শুল্ক ১৫০ টাকা থেকে হয়ে দাঁড়াবে ১১৭০ টাকা। কি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব! টেনলেন্স স্টীল-এর ওপরও মূল্য নির্ভর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। টেনলেন্স স্টীল যেমন মূল শিল্পের প্রয়োজনের উপাদান, তেমনি আজকাল কাসার বাসনের জ্বলবর্তী হয়ে স্বল্পবিস্তদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করেছে।

অনেকগুলি “যদি”র ঘেরাটোপে সুরভিত এই বাজেট নিঃসন্দেহে গতানুগতিক নয়। তবে “যদি”র বেড়াগুলি ডিঙাতে না পারলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাবে, মন্দাও কাটিয়ে ওঠা কুশাল্য হবে।

১৭/৩/৭৬

জয়ন্তী মাস ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
৫২০	১ম	৪	হলাও	পোলাও
৫২৫	১ম	১৩	ডাক দিলেন	ডাক দিলেন
			১৯৪৪ সালে	
৫৩৪	১ম	২১	১৯৬৮	১৯৩৮
			সালে	
৫৩৬	২য়	৭	সমাজ বিপ্লব	সমাজ বিপ্লব
			সমাপ্ত করতে হবে।	
৫৫৪	২য়	২৩	পররাষ্ট্র মন্ত্রী	প্রতিরক্ষা
			মন্ত্রী	
৫৫৬	১ম	২২	চীনে	চীনকে
৫৫৬	১ম	২৪	৪৭	৪০
৫৫৭	১ম	৩	হুয়া কুয়ো-কিং	হুয়া
			কুয়ো-ফেন	
			(Hua Kuo-fcg) (Hua	
			Kuo-feng)	
৫৫৭	২য়	১৪	দিকটিতে	দিনটিতে
৫৫৮	১ম	২১-২৫	৭ই জানুয়ারী	৭ই
			ফেব্রুয়ারী	

উপরোক্ত ভুলগুলির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক, জয়ন্তী

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১২'০০। বাৎসরিক ৬'০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের স্বযোগ সর্বাপেক্ষে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার করকে কুলক্যাপের একপৃষ্ঠার লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, সাপুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
- কবিতা লব্ধক্রেও একই নিয়ম।
৪. রচনা করণ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স সোলায় নবম্বর রোড
কলিকাতা-২৬

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ) ১২'০০

পকেট গীতা ৫'০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১০'০০

ভারত-আত্মার বাণী ৭'৫০

Soul of India Speaks ৭'৫০

কর্মবাণী ১'৫০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১'৫০

শ্রীশ্রীচণ্ডী ২'০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিভাসাগর ৩'০০

ছোটদের গল্পগুচ্ছ ৩'০০

ভূপর্ষটক রমানাথ বিশ্বাসের

তকণ তুর্কী ৩'০০

ভয়ংকর আফ্রিকা ১ম, ২য় খণ্ড ৩'২৫

বেতুইনের দেশে ৩'০০

নিবেদিতা ১০'০০

বিভাসাগর ১০'০০

শিবরামের কিশোর নাটক ২'০০

ছোটদের সেরাগল্প ৪'০০

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী ৪'০০

বীরত্বে বাঙালী ৩'৫০

বিজ্ঞানে বাঙালী ৫'৫০

বাংলার ঋষি ৫'০০

বাংলার বিজুঘী ৩'৫০

বাংলার মনীষী

রাজর্ষি রামমোহন ৩'০০

যুগার্চ্য বিবেকানন্দ ২'৫০

আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪'০০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ২'৫০

রবীন্দ্রনাথ ৩'০০

জীবনগড়া ৭৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪'০০

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান

৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবর্তিত

সংস্করণ)

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী ৬'০০

আয়রনম্যান নীরদ সরকারের

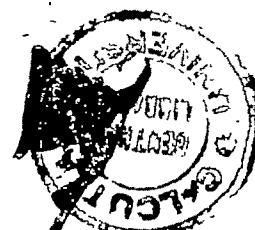
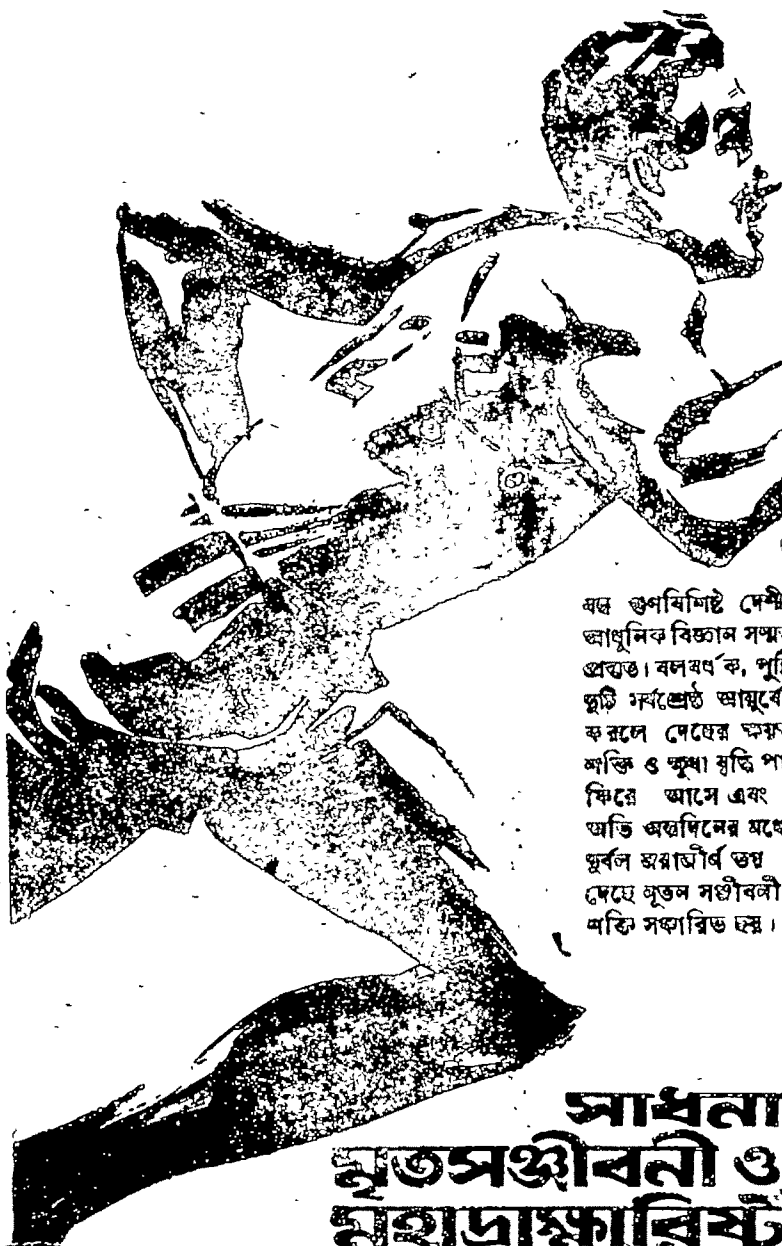
যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়াম রোগ শরীর ও শক্তি ৩'০০

নিবারণ ৫'০০ সরল যোগ ও ব্যায়াম ৩'০০

যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৩'০০ নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন ২'৫০

ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন ৩'০০ আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট ১'০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার কলিকাতা - ১২



স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

যদি গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে,
জ্যোতিষিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে
প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও অস্তিস্থানী এই
দুটি মনোজ্ঞেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন
করলে দেহের অক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, ইজম
শক্তি ও কৃষ্ণা মৃতি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য
কিমে আসে এবং
অতি অল্পদিনের মধ্যে
দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন
দেহে নতুন সঞ্জীবনী
শক্তি সঞ্চারিত হয়।

30 MAR 1976



সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদাম্কারিষট্

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

ব্যবাস্তা: যোগেন্দ্র বোম্ব এম.এ.

আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী. এম.সি.এস. (লন্ডন)

এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগনপুর

কলকাতার রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

কলকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেন্দ্র বোম্ব, এম.বি.এস. (কলি)



চায়ের চামচের ৪ চামচ
মহাদাম্কারিষট্‌র সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম্ম পবিমাপ জলসহ
প্রত্যহ দু'বার আহারের
পর সেব্য।



SMM-2/08

Central Registration No 287 Per Copy Rs 1-00 with Regtd Postage
Rs 1-70 : 20-A, Prince Gola Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116

সংগ্রহ—শ্রীমান দাস



४० वर्ष

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ : ୧୦୫୨

জয়ন্তীর চল্লিশ বৎসর পূর্তি

উৎসব সংখ্যা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'জয়ন্তী' বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত মহিলাদের মুখপত্ররূপে ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তা সর্বসাধারণের পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ছ'বার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বৈশাখ ১৩৮২-এ জয়ন্তী চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো।

জয়ন্তী পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস, এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সাধনার ও দুর্জয় সংকল্পের ইতিহাস। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ন্তীর যাত্রা শুরু। আর এই দীর্ঘ সংগ্রাম-মুখর পথে জয়ন্তী কত বিপ্লবী, কবি, শিল্পী, কথাসাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি, বিজ্ঞাপনদাতার উষ্ণ সাহচর্য পেয়েছে তাঁদের আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

জয়ন্তী চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসব সংখ্যা ১৩৮৩ সালের প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জয়ন্তীর শুভানুধ্যায়ী যারা নানা সময়ে নানাভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার কাছেই আমরা পরামর্শ ও সহযোগিতা চাই।

তাঁদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক

জয়ন্তী

২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১৭১০

জয়শ্রী : বৈশাখ ১৩৮৩ : বার্ষিক সংখ্যা

সাহিত্য সমালোচনা, অর্থনীতি বিষয়ে একটি অমূল্য সংকলন।

সাহিত্য-সমালোচনা

গুলাগ দ্বিতীয় পর্ব : নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

মানবাত্মার মুক্তি : শাখারভ সলবিনিং সিন্ : অভয়শঙ্কর শর্মা

বিবেকানন্দ চর্চা : দেশে বিদেশে : পবিত্রকুমার ঘোষ

আঞ্চলিক সাহিত্য : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার রেনেসাঁস : সমদর্শী

বিষয় চলচ্চিত্র : শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

সুডাম গবেষণা নতুন দিক গ্রন্থাকার সুভাষচন্দ্র : শিবব্রত ঘোষ

স্মৃতিচারণ : অনিল কুমার চন্দ, গঙ্গা রাষ্ট্র : রাজধিরঞ্জন দাশগুপ্ত

শরৎ প্রসঙ্গ

বাংলার শরৎ ভারতের দরবারে : সংকলন

শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা : নারায়ণ চৌধুরী

ব্যাক্ষিৎ : একটি সেমিনার : পরিচালনা : ডঃ সুব্রত গুপ্ত

অংশগ্রহণ করছেন : ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক।

১৯৭৬ এর বাজেট প্রসঙ্গ : অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক রাখাল দত্ত

কবিতা গুচ্ছ : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দাম : তিন টাকা

নিবেদন

† চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'উৎসব সংখ্যা' নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। নানা প্রকার বাধা বিপত্তির দরুন আমরা সেই সংখ্যা জয়শ্রীর বারোমাসের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। ভবিষ্যতে এই স্মরণীয় মুহূর্তের স্মারকরূপে একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা রইলো, এবং তার বিস্তারিত বিবরণ জয়শ্রীতে প্রকাশ করা হবে। পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা পরিবর্তনে ক্ষুঃখিত। —সম্পাদক জয়শ্রী

জয়ন্তী ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

প্রধানত অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত গল্পকারদের জন্যই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রতি গল্পকার একটি কি দুটি গল্প পাঠাতে পারবেন। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্প ফুলস্কাপ কাগজের এক পিঠে এবং বা দিকে পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখতে হবে। পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ শে মে ১৯৭৬। লেখা জয়ন্তী অফিসে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোই বাঞ্ছনীয়।

গল্পগুলি মৌলিক ও অপ্রকাশিত হওয়া চাই। নির্বাচন সাপেক্ষে নিচের ফর্মটি যথাযথ পূরণ করে পাঠাতে হবে।

বিচারক মণ্ডলী

সদরঞ্জিত দাশগুপ্ত ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচারকদের মনোনয়ন চূড়ান্ত বলে ধার্য হবে এবং প্রথম স্থানধিকারীকে একশত টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া গুণানুসারে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত গল্পগুলি জয়ন্তীর সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে।

প্রচারসম্পাদক, জয়ন্তী

জয়ন্তী ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

- ১। নাম—
 - ২। ঠিকানা—
 - ৩। জন্মসন ও স্থান—
 - ৪। শিক্ষা—
 - ৫। পেশা—
 - ৬। আপনি কি ধরনের বই পড়তে ভালবাসেন—
 - ৭। কবে থেকে লিখছেন—
 - ৮। এতদ্ব্যতীত বা কোনও সংকলনে আপনার গল্প প্রকাশিত হয়েছে কি ?
- আমার গল্পটি 'শুধুমাত্র জয়ন্তী'র জন্য পাঠালাম।

স্বাক্ষর ও তারিখ

সূচীপত্র

জয়ন্তী ত্রৈতী : : ১৩৮২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিজয়িনী নাই তব ভয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০৯
কম-চীন হৃদয়	অভয়শঙ্কর শর্মা	৬১০

(ষাণ্মাহিক প্রবন্ধ)

দোকানদার	বিজয় কুমার ঘোষ	৬১০
----------	-----------------	-----

(গল্প)

বিবেকানন্দের বাংলা কবিতা

(আলোচনা) নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

৬২৯

বঙ্কিমচন্দ্র : একটি প্রত্যুত্তর

অভিজিৎ মজুমদার ৬৩৭

শরৎচন্দ্র (কবিতা) ডাঃ রামকৃষ্ণ চন্দ্র ৬৪১

লক্ষ্য (কবিতা) হুমন্ত গুহ ৬৪২

বর্তমান প্রসঙ্গ ৬৪৩

সম্পাদক : সুনীল দাস

সাধনা

বিউটি

ক্রীম



তাঁর মনোহারিনী মৌন্দর্য!



প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনমূলভ কমলীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরঙ্গ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

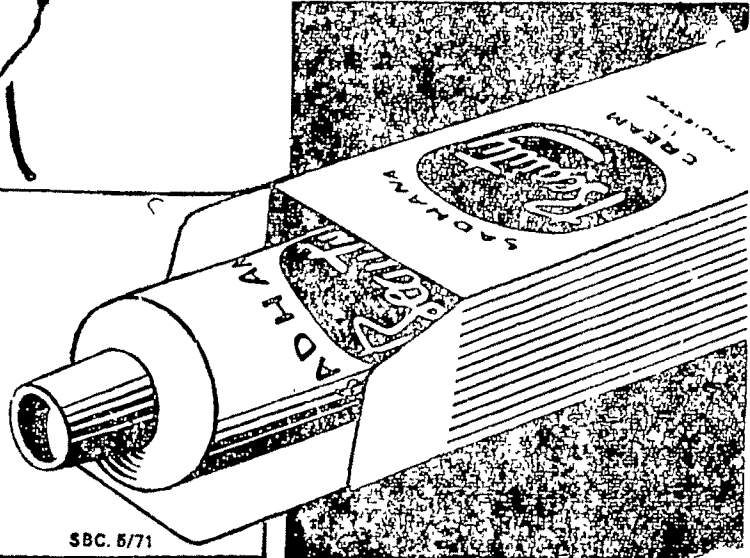
সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮



J. C. Ghose

শাখা ভারতের সর্বত্র



SBC. 5/71

ଜାୟଞ୍ଜୀ

୪୦ ବର୍ଷ • ଦ୍ଵାଦଶ ମାସ • ଚେତ୍ର ୧୩

୩

ବିଚାରିଣୀ ନାହିଁ ତବ ଡ଼ର,
ଦୁଃଖେ ଓ ଲଜରେ ତର କମ୍ପା
ଅନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ
ଅନ୍ୟାୟ ଲଜିତ ଦାସ,
କହିଲେ ଏହି କବିତା ॥

ସ୍ଵାମୀନାଥ

୩୦ ଜାନୁଆରୀ
୧୯୭୮

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব

অভ্যুদয় শর্মা

বিরোধের বিস্তৃতি

তাই এতো বিরোধ ও বিবেচনের মধ্যে রুশ-চীন সম্পর্কে যেন ১৯৫৭ সালে পায়ের তলায় ঘাসের মত্পন আস্তরণ পেলো। কিন্তু তাও অল্পকালের জন্য বলতে হয়। ১৯৫৫-এ ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং সম্মেলনে কম্যুনিষ্ট চীন পৃথিবীর পাদপীঠে এসে হাজির হ'ল। জহরলাল নেহেরুই এ-কাজে অগ্রণী। বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চাশকের কীর্তন হ'ল, কম্যুনিষ্ট চীনের মুখপাত্র চৌ-এন-লাই-এর মুখ থেকে তখন যেন মধু বরছে। কিন্তু তারই মধ্যে চীন সোভিয়েত রুশের উপর টেকা দিয়ে বৃষ্টিয়ে দিলো, সোভিয়েত রুশ কোনো এশীয় শক্তি নয়—বান্দুং-এ তাদের অমুপস্থিতির কারণও তাই। সোভিয়েত রুশ ও চীনের এই কৌশল বুঝে নিয়ে এশিয়ায় সোভিয়েত রুশের প্রভাব রুদ্ধির জন্য বন্ধু খুঁজতে বার হল। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ক্রুশ্চেভ এবং তৎকালীন সাক্ষীগোপাল প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন এই উদ্দেশ্যে ষটিটি ভারতবর্ষ, বর্মা ও আফগানিস্তান সফর করে গেলো। তারা নেহেরুকেও রুশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলো।

এছাড়া ১৯৫৭-র ডিসেম্বরে মস্কো সম্মেলনের বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই চীনের আভ্যন্তরীণ জীবনের আর্থিক বিভ্রাসে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে ১৯৫৭র মস্কো-সম্মেলন-উত্তর রুশ-চীন বিরোধের বিস্তৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৫৭-র নভেম্বরে মস্কো সম্মেলনের মাত্র কয়েকমাস পূর্বে মাও-সে-তুং-এর সম্মুখস্থ নীতি একটি বড় রকমের সাধারণ। মাও-এর ধারণা হয়েছিলো যে চীনে কম্যুনিজম-এর ভিত্তি এতোটা সুদৃঢ় হয়ে গেছে যে চীনের বিভিন্ন ধরনের চিন্তার রুদ্ধ দরজা অব্যাহত করে দিলেও মাও-এর রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে সেই সব অব্যাহত চিন্তার সূত্রের কোনো বিরোধ দেখা দেবে না। মাও তার এই নীতিকে কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত করে বললেন : "Let a Hundred Flowers Bloom, Let Hundred opinions contend." অর্থাৎ, 'শত শত পুষ্প ফুটে উঠুক, শত শত বিভিন্ন মতের পারস্পরিক বিনিময় হোক।' কিন্তু যা ঘটলো, তাতে মাও-সে-তুং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পেলেন। তাঁর রাষ্ট্র-চিন্তার এতো সমালোচনা

হবে, কম্যুনিজমের এতো বিরোধিতা হবে, মাও ভাবতেই পারেন নাই। কাজেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রস্তুতি পুষ্পগুলিকে ধ্বংস করে ফেলা হোলো, সঙ্গে সঙ্গে চীনের জাতীয় জীবনে কড়া অনুশাসন ফিরে এলো। ১৯৫৭-এর মস্কো সম্মেলনে কঠিন অনুশাসনে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে বেঁধে সোভিয়েত নেতৃত্বের আওতায় কেন্দ্রীভূত করবার পেছনে মাও-এর “শত শত পুষ্প প্রস্তুতি হোক” নীতির সর্বনাশা পরিণতির অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। তাই মস্কো সম্মেলনের ঘোষণায় মাও-এর কাছে যেটা ছিল নীতি, ক্রুশ্চেভের কাছে সেটা ছিল কৌশল। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের পর একটু সামলে নেবার প্রয়োজন ছিল ক্রুশ্চেভের। ‘Non-inevitability of war’—অর্থাৎ যুদ্ধ অনিবার্য নয়—এই তত্ত্ব এবং শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্ব স্ট্যালিনোত্তর সোভিয়েত রুশ নেতৃত্বের মূল নীতি। মস্কো সম্মেলনে তারা এই নীতির অনিবার্য অস্থিম পরিণতি অপর বৃহৎ শক্তি আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া এবং সেক্ষেত্র প্রয়োজন রুশ-মার্কিন শীর্ষ বৈঠক। এই দুই বৃহৎ শক্তির সমঝোতাই তো একমাত্র যুদ্ধকে অনাবশ্যক করে তুলতে পারে। ক্রুশ্চেভের দৃষ্টি সেদিকে। আর মাও-এর দৃষ্টি সমঝোতা নয়, সংঘাতের দিকে।

তার কারণও ছিল। সোভিয়েত রুশ ও চীনের আভ্যন্তরীণ জীবনের দিকে তাকালেই তা অনেকটা স্পষ্ট হবে। চীন কৃষিপ্রধান দেশ। দুর্ভিক্ষ তার নিত্যসঙ্গী। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসে

কৃষিব্যবস্থাকে আরও সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। কিন্তু চীনা কৃষকরা পরিশ্রমী এবং ছোট ছোট জোতে নিবিড় চাষে তাদের দক্ষতাও রয়েছে। ক্ষমতা দখলের পর কৃষির ও খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতির জন্য চীনা নেতারা সোভিয়েত রুশের যৌথ খামার প্রথা নিবিচার অনুকরণ করলো। অথচ এদিকে সোভিয়েত রুশ যৌথ খামার প্রথা স্ট্যালিনের আমলেই ব্যর্থ হয়েছে, সোভিয়েত কৃষিতে সঙ্কট উত্তরণের জন্য ক্রুশ্চেভ বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামারের আওতায়—যৌথ খামার নয়—অকর্ষিত নতুন নতুন জমি চাষে আনলো। ১৯৫৫-এ মাও-সে-তুং চীনে সোভিয়েত রুশের অনুকরণে যৌথ খামার প্রথা প্রবর্তনের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যৌথ খামার দিয়ে কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব হবে না। যৌথ খামারে চাষীদের ব্যক্তিগত উত্তোগের যেমন স্বীকৃতি ছিল না, তেমনি তাদের ওপর বাঁধনও ছিল না। ফল যা হবার তাই হল। যৌথ খামার প্রথা ব্যর্থ হল। চীনে উদ্ভূত অকর্ষিত জমি নাই যে সেই সব জমি চাষে এনে সঙ্কট মুক্ত হবেন। তাই ১৯৫৮-এ চীনে কৃষির রূপান্তর ঘটলো। কম্যুন প্রথার প্রবর্তন হলো। গার্হস্থ্য জীবন ভেঙে খান খান হ’ল। স্বামী-স্ত্রী পৃথক পৃথক কম্যুনে মনুষ্যোত্তর জাতির মত যুগবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হল। ব্যক্তি-পরিচয় সেখানে অপ্রাসঙ্গিক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের যুগ্মত্ব হল প্রত্যেকের আমরা সকলের তরে, সকলে আমরা প্রত্যেকের তরে। এই কম্যুনগুলি কম্যুনিজমের পথে অনিবার্য পদক্ষেপ

রূপেই চীনারা গ্রহণ করে। কম্যুনগুলি পরিচালিত হোতো নৈব্যক্তিক অনুশাসনে সামরিক শিবিরের মত। কম্যুনে পরিষ্করের বিনিময়ে খাওয়া, আশ্রয় আর না হোলে নয় এমন ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ কম্যুনের অধিবাসীদের জন্ত বরাদ্দ ছিল।

চীনের আর সবুর নয় না। চীনা কম্যুনিষ্টদের নেতাদের সামনে কঠিন পরীক্ষা। শিল্প-বিপ্লবের সার্থকতার পর্যায় অতিক্রম না করেও কৃষিপ্রধান দেশ চীনের কম্যুনিজমে উত্তরণ সম্ভব—এই কঠিন পরীক্ষা দেবার কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে চীনা নেতারা অগ্রসর হচ্ছেন। এ-পথে চীনা নরনারীশিশুর জুসেহ রক্ত-মোক্ষণও তাদের নিরস্ত করবে না। কম্যুনের হাতিয়ার দিয়ে অনতিকালেই কৃষির শিল্পায়ন সম্ভব করে তুলতে হবে। বড় শিল্পের পাশাপাশি অল্প ছোট ছোট শিল্প সংগঠিত করতে হবে। সহরের শ্রমিক কর্মীদেরও কম্যুনে সংহত করে কৃষক-শ্রমিক ভেদ মুছে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে তারা সামনের দিকে মস্ত লাফের’ (“Great Leap Forward”) নীতি নিয়ে ধ্বনি তুললেন। ‘বিশ বছরের অগ্রগতি একটি দিনের মধ্যে বিধৃত হবে’—twenty years of progress concentrated in a single day’। ১৯৫৮-এ ‘সামনের দিকে মস্ত লাফ দিয়ে —‘Great Leap Forward’—সরাসরি কম্যুনিজম-এ উত্তরণের দিকে অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ দিয়ে চীন সোভিয়েত রুশকে নীরব চ্যালেঞ্জও জানিয়ে দিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ কমতা দখলের মাত্র আট বছরের মধ্যে কম্যুনিজমের দিকে চীনের স্পর্ধিত

পদক্ষেপ। আর তা ছাড়া সোভিয়েত রুশের বাঁধা-ধরা ছক অনুযায়ী যৌথ খামারগুলিকে রাষ্ট্রীয় খামারে পরিবর্তিত না করে সরাসরি যৌথ খামার থেকে কম্যুনের পথে কম্যুনিজম-এ উত্তরণের চেষ্টা? যেখানে শিল্পে, বিজ্ঞানে, কলিত কারিগরী বিজ্ঞায় অশ্রুতপূর্ব উৎকর্ষ লাভের পরও সোভিয়েত রুশ কমতা দখলের ৪০ বছর পরও সমাজবাদের জ্বরই অতিক্রম করতে পারেনি! এরও তিন বছর পর ১৯৬১ সালে সমাজবাদ থেকে কম্যুনিজম এ উত্তরণের কুড়ি বছরের কর্মসূচী নিয়ে ক্রুশ্চেভ হাজির হবেন।

পৃথিবীর অমূল্যত দেশগুলি, দরিদ্র দেশগুলি, শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলি কম্যুনিজমের দিকে চীনের এই স্পর্ধিত অভিযানে তো আকৃষ্ট হবে। কম্যুনিজমের লক্ষ্য উত্তরণের প্রতিযোগিতায় চীন যদি সত্যিই সোভিয়েত রুশের সমীপবর্তী হয়ে পড়ে? কিম্বা তাকে ডিঙিয়ে যায়?

সুতরাং ক্রুশ্চেভ আর কাল বিলম্ব না করে চীনের স্পর্ধিত অভিযানের উত্তর দিতে শুরু করলেন। সমসময়ে একটি অনুষ্ঠানে ক্রুশ্চেভ খোলাখুলি কম্যুনিজমের সঙ্গে প্রাচুর্যের বন্টিত সম্পর্ক আবিষ্কার করে বলেন: “We cannot achieve Communism until we have abundance. We cannot have abundance until we lower costs. And we cannot lower costs without the yardstick of the rouble”। সুতরাং কেবলমাত্র উৎপাদিত পণ্যের বন্টনের মধ্য দিয়েই কম্যুনিজম আসবে না। উৎপাদিত জ্বোয়

বাজারে রুবলের মাপকাঠিতে লেনদেন চাই। ক্রুশ্চেভ এ-কথাই বলতে চেয়েছেন। ১৯৫৯র ফেব্রুয়ারীতে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির একুশতম কংগ্রেসে পরোক্ষ কমানের প্রতি কটাক্ষ করে ক্রুশ্চেভ যৌথ খামারের উল্লেখ করে বলেন যে এইগুলি কৃষির উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়নকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে : 'serves and can go on serving for a long time the development of the productive forces of agriculture'। উৎপাদনের প্রাচুর্য নিরপেক্ষ কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ ক্ষেত্রে কম্যুনিজমের প্রয়োগ যে অবাস্তব এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য, ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ২১ তম সম্মেলনের পূর্বে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমেরিকার সিনেটার হামফ্রেকে বলেন যে বিপ্লবের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাময়িকভাবে কমান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলো—সেটা ছিল War Communism-এর সময়। সে সময় সব পণ্যেরই কল্পনাভীত ঘাটতি ছিল। পণ্যের প্রাচুর্য ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোকের কম্যুনিজম-এ উত্তরণ অসম্ভব ঘটনা। ১৯৬১ সালে জুলাই মাসের শেষে ক্রুশ্চেভ কুড়ি বছরের মেয়াদে সোভিয়েত কৃষির, সমাজবাদ থেকে কম্যুনিজম উত্তরণের প্রস্তাবের সভা সরকারী ভাবে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ত উত্থাপন করলেন।

সোভিয়েত রুশ-এ ভোগাজবোর প্রাচুর্য চাই। ক্রুশ্চেভ এই প্রাচুর্যের সঙ্গে কম্যুনিজমের সমীকরণ করে ১৯৬২-র জুলাইতে বলেছিলেন প্রাচুর্য ছাড়া

কম্যুনিজম-এর আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ক্রুশ্চেভের ভাষায় :

'...A man may be content with moral and political factors today, tomorrow and the day after tomorrow, let us say. But after that he may well start to say it would be a good thing to couple moral and political satisfaction with an abundance of meat, milk, butter and other products. That is right, for without increasing the output of material values in Society it will be hard to advance the cause.'

চীনা কম্যুনিষ্টদের কাছে 'cause' বা আদর্শ মানে যুদ্ধের অনিবার্যতা, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কম্যুনিজমে উত্তরণ। সেজন্ত পথের বাঁকে বাঁকে তাদের জন্ত লাজুক, অনাহার, যুগ্ম অপেক্ষা করছে। মাংস, দুধ ও মাখনের প্রাচুর্য তাদের চোখে কম্যুনিজমের বিকৃতি বিপ্লবের নামে পরিহাস।

আর একই সময়ে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ক্রুশ্চেভ ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্যের পাশাপাশি পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী পুঞ্জিগাদী দেশ আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে বৈঠক ও বোঝা-পড়ার চিন্তায় মশগুল।

সুতরাং ১৯৫৭-এর মস্কো সম্মেলনের এক পিঠে যেমন মাও-সে-তুং এবং ক্রুশ্চেভের নৈকট্য মূর্ত হয়ে উঠেছিলো, তেমনি দৃষ্টির অগোচরে অস্ত পিঠে

তাদের বৈপরীত্যের পারস্পরিক শক্তিশূলি দানা বেঁধে উঠতে লাগলো।

“নিজের নিজের ঘড়ি মিলাও”

১৯৫৮ সালে যে বিরোধের অঙ্কুর মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো ১৯৫৯-এ তা আরও এগিয়ে গেলো। ক্রুশ্চেভের তখন খান-স্তান হয়ে উঠেছে কত তাঁড়াতাড়ি আমেরিকার প্রেনিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসে ক্ষমতার সমকক্ষতাবোধে উদ্দীপ্ত হতে পারে। সে-বছর ফেব্রুয়ারীতে মস্কোতে দলের কংগ্রেস জেকে ঘরের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় উৎসব করলো, আর তারই সঙ্গে বিভিন্ন সমাজবাদী দেশে কম্যুনিজমে উত্তরণের একটা সাধারণ সময়সূচী নির্ধারণের বিধান দিয়ে চক্ষুজ্জ্বল হাত থেকে রেহাই পেতে চাইলেন। চক্ষুজ্জ্বল কেন? সব সমাজবাদী দেশে একই সময়ে তো কম্যুনিজম আসতে পারে না। অনিবার্যভাবেই সোভিয়েত রুশের মত উন্নতি এবং শিল্পমুখ্য দেশে ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য আসবে চীনের মত অসমুখ্য দেশের অনেক আগে। সোভিয়েত রুশের প্রাচুর্যের কথা বললে, চীনের সাধারণ মানুষকেও একটা প্রত্যাশা দিতে হয়। কিন্তু বুঝ তো দিতে হবে যারা সোভিয়েত রুশের মত উন্নত নয় তাদের যে, তোমাদের পেছনে ফেলে আমরা ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্য নিয়ে মাতবো না। তাই ফেব্রুয়ারীর দলীয় সমাবেশে প্রস্তাবিত হলো সব সমাজবাদী দেশে কম্যুনিজম আসবে সমসময়ে—‘more or less at the same time’। ক্রুশ্চেভ

এই স্লোকবাক্যে অবশ্যই সায় দিলেন। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে রুশ পার্টির প্রাচুর্যনীতির প্রতিক্রিয়া এই দুই পার্টির স্বম্ভব উদ্ভাপ পরবর্তীকালে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি করে।

বিরোধের আর একটি খোঁচার কারণ হয়ে ওঠে মে মাসের একটি ঘটনা। মে মাসে ক্রুশ্চেভ আলবানিয়ার চীনসমর্থক রাষ্ট্রনায়ক এনভার হোজ্জার (Enver Hoxha) সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে সেখানে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল পেন্গ তে ছুয়াই-এর (Marshal Peng Teh-huai) সাক্ষাৎ পান। মার্শাল পেন্গ চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য, সামনের দিকে বড় লাফ (‘Great Leap Forward’) এবং কম্যুন (commune)—মাও-এর এই দুইটি নীতির তিনি খোঁরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে তার মত ব্যক্ত করে একটি স্মারকলিপি তৈরী করেছেন—উদ্দেশ্য, দেশে দলের নেতাদের কাছে দাখিল করবেন। কিন্তু তার পূর্বেই আলবানিয়াতেই স্মারকলিপির সেই খসড়াটি তিনি ক্রুশ্চেভকে দেখান। দেশে ফিরে পেন্গ গ্রেপ্তার, ও পদচ্যুত হন এবং অত্যন্ত অবমাননাকর অবস্থায় তাঁর সংশোধনের জন্ত তাকে একটি জাম-শিবিরে পাঠানো হয়। পেন্গ-এর ঘটনা ক্রুশ্চেভকে চীনা কম্যুন বিরোধিতাও আরও উৎসাহিত করে। তাছাড়া, পেন্গ-এর এই গুরুতর অপরাধের জন্ত চীনা নেতারা ক্রুশ্চেভকে দায়ী করতে ছাড়েন নাই, সে কথাও অমুমান করা যেতে পারে। আর ক্রুশ্চেভ এই ঘটনা নিয়ে চীনা নেতাদের বিজ্ঞপ করতে ছাড়ে

নাই। বন্ধু কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতার সঙ্গে পেরু-এর বিদেশে আলোচনার দুঃসাহস হয়েছিলো, সুতরাং, তাকে শ্রম শিবিরে ঠেসে দাও-ক্লুশ্চেনের বিক্রপের ধরণটা ছিলো এরকম।

ক্লুশ্চেন তখন সুখস্বপ্ন দেখছেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুঞ্জিবাদী রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রপতির নিকট আমন্ত্রণটি আসবে, যার জন্ম ক্লুশ্চেনের কত ছলা-কলা। মাঝখানে চীনারা আবার ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বরে হিমালয় সীমান্ত লঙ্ঘন করে কাষত ভারত সীমান্ত আক্রমণ করলো। কয়েকজন ভারতীয় ফৌজও নিহত হলেন। তার পরই আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে আমেরিকার ক্যাম্প ডেভিডে ক্লুশ্চেনের আমন্ত্রণ এলো। সোভিয়েত রুশের পক্ষে অসম্মান করা স্বাভাবিক চীনাদের ঠিক এই মুহূর্তে ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের একমাত্র উদ্দেশ্য ক্লুশ্চেন-আইসেনহাওয়ার সাক্ষাৎকার বানচাল করে দেওয়া। সোভিয়েত রুশের সুম্পষ্ট অভিমত যে ১৯৫০-এর ১১ই এপ্রিল-এর চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি, চীন ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বরে ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন করে স্বৈচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেছে। কারণ এই চুক্তির সোভিয়েত রুশের মতে ৪নং ধারায়, (Article IV) যে বিধান আছে সে বিধান অগ্রাহ্য করে চীনারা একতরফা আক্রমণাত্মক কাজ করে চুক্তি কার্যত বাতিল করে দিয়েছে। সরকারীভাবে কোনো পক্ষই এই চুক্তি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৬৪ র অক্টোবরে চৌ-এন-লাই একটি জাপানী প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত

করে বলেন যে যুদ্ধ বাধলে চীনের দৃঢ় বিশ্বাস সোভিয়েত রুশ তাকে সাহায্য করতে আসবে এবং চীন-রুশ মৈত্রীচুক্তিও সংশয়াতীত ভাবে বলবৎ রয়েছে—“Still very much alive”।

ক্যাম্প ডেভিডে (Camp David) আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে মিলনের আকস্মিক উদ্বেলিত ক্লুশ্চেন, সেপ্টেম্বরে আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বহুপূর্ব থেকেই আনন্দে ডগমগ হয়ে রয়েছেন। সোভিয়েত রুশ এবং আমেরিকা—এরা বিশ্বের সব চাইতে শক্তিশালী দুইটি রাষ্ট্র। এদের মধ্যে লড়াই লাগলে সর্বনাশ। এদের কেউ ধামাঝার নেই, এরা ধামবেও না। আর অস্বাভাবিক রাষ্ট্ররা যদি লড়াই শুরু করে তবে তাদের ধামিয়ে দেওয়া যাবে। খুশীর জোয়াড়ে এই ধরণের উক্তি ক্লুশ্চেন প্রথম করেন একদল মার্কিনী প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে; তারপর নিজের দেশে ২৮শে জুলাই নেদ্রোপেট্রোভ-স্ক-এর (Dnepropetrovsk) এক জনতার কাছে :

....“Our country and the United States are the two most mighty powers in the world. If other countries fight among themselves they can be separated ; but if war breaks out between America and our Country, no one will be able to stop it. It will be a Catastrophe on a colossal scale.

‘আমরা আর আমেরিকা’—ক্রুশ্চেভ-এর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চীনা নেতারা খুশী হবেন কেন? ক্রুশ্চেভ যদিও বা বলতেন আমরা দুই শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ও আমেরিকা—এরাই পৃথিবীর নিয়ামক হতে পারে তবুও হাতো। কিন্তু ক্রুশ্চেভের মাথায় তখন আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতা করে কম্যুনিজম-এর প্রাচুর্যের পথে উত্তরণের পরিকল্পনা ঘুরছে। সোভিয়েত রুশকে সে-পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

চীনের ভাষ্যে কৃচ্ছতার পথ দীর্ঘায়িত হয়ে রয়েছে। সেই কৃচ্ছতার সোভিয়েত রুশ যোগান দিলো হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ডে ১৯৫৬-এর অভ্যুত্থানের পর। সোভিয়েত রুশ ১৯৫৬-এর পূর্বের এক দশক তার পূর্ব ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের উপগ্রহদের সম্পদ কেবলই লুণ্ঠন করে রিক্ত করে রেখেছে। সোভিয়েত রুশের আর্থিক পুষ্টিসাধনের জন্য পূর্ব ইউরোপের রুশ ভাবেদারদের অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এদের সঙ্গে সোভিয়েত রুশের সম্পর্ক অর্থনৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে উপনিবেশের সম্পর্কের বেশী ছিল না। অথচ, ১৯৫৬-এর হাঙ্গেরী-পোল্যান্ডের ভূকম্পন-এর পর এদের থেকে সম্পদ কেড়ে নেওয়া তো দূরের কথা, এদের কিছু আর্থিক সাহায্য না দিলে চলবে না। সুতরাং ১৯৫৭ সালেই ক্রুশ্চেভকে এই সাম্রাজ্যে একশ কোটি ডলার সাহায্য দিতে হয়েছে। এহীতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, দাতার অকুলান হয়। তাই দাতাকেও এহীতার সংখ্যা কমিয়ে থয়রাতির

পরিমাণ সীমিত রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রে কপাল পুড়লো চীনের। তাদের যেটা সোভিয়েত রুশের দেয় ছিল, সেটায় কমতি করে পূর্ব ইউরোপের রুশ ভাবেদারদের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে সহজতর করতে হল, সোভিয়েত রুশের কর্তাদের। সোভিয়েত রুশের সাহায্যের পরিমাণ হ্রাসে চীনের স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে স্মরণ করিয়ে দিলো। তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে, ফলে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে পারবে—এই মনোভাবও কোনো কোনো নেতার মনে সে-সময় দেখা দিয়েছে। ১৯৫৭-এর মে মাসে স্ট্রেট প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান লী-ফু-চুন (Li-Fu-Chun) চীনাগের সতর্ক করে দিয়ে বলেন ‘ষতটা পারে’ স্বনির্ভর হও। তারই মাসখানেক বাদে স্ট্রেট ইকনমিক কমিশনের চেয়ারম্যান, পো-ই-পো (Po Yi-Po), প্রায় একই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করে বলেন ‘বিদেশের উপর নির্ভরতা’ চীনকে কমিয়ে আনতে হবে। আর্থিক কৃচ্ছতার চাপে চীন নতুন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হল। তাই ১৯৬৭-এর মস্কো সম্মেলনে যে সময় মাও-সে-তুং ক্রুশ্চেভের পাশে বসে মস্কো ঘোষণাপত্রের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করছেন, প্রায় একই সময়ে চীন আর্থিক সঙ্কটের ঝাপ্টায় অর্থনীতির নতুন পথ নিল। এলো কম্যুন (Commune) এলো ‘এক লাফে এগিয়ে যাবার নীতি’ (Great Leap Forward), আর সেই সঙ্গে এলো কম্যুনিজমের নামে ক্রুশ্চেভের প্রাচুর্যের কল্পলোক বিহারের বিরুদ্ধে প্রবল উদ্বেজন, বিষে ও হিংস্রতা।

প্রাচ্যের দেশ পুঁজিপতি আমেরিকার সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাৎ করে ক্রুশ্চভ ফিরে এলেন। তার উচ্চ উপচে পড়ছে : আইসেনহাওয়ারের মত বিজ্ঞ ও শাস্তিপ্রিয় রাষ্ট্রনীতিবিদ নাকি দুর্বল! এই শাস্তির দৃষ্টি আমেরিকার দুর্বল প্রতিরক্ষা দপ্তরকে—পেন্টাগন নামে যার পরিচয় স্ববশে রাখবার ক্রমতা রাখেন। ক্যাম্প ডেভিড শাস্তির অরুণোদয় দেখে দেশে ফিরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৫৯র ১লা অক্টোবর ক্রুশ্চভ চীনা বিপ্লবের দশম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পিকিং পৌঁছালেন। ক্রুশ্চভের আইসেনহাওয়ার স্তুতিতে চীনা নেতারা অগ্নিশর্মা হয়ে রয়েছেন। তাই ক্রুশ্চভের জন্য কোনো স্বাগত অভ্যর্থনার কথা বিদায় অভিনন্দনের কোনো বাজনাই বাজলো না। চীনা নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর যথারীতি কোনো ঘোষণা বিবৃতিও প্রকাশিত হ'ল না। ক্রুশ্চভ অবশিষ্ট পিকিং-এ থাকাকালীন তার দুইটি ভাষণে আইসেনহাওয়ারের স্তুতি থেকে বিরত রইলেন। কিন্তু তার যা প্রাণের কথা তা ক্রুশ্চভ বলতে পিছপা হলেন না। তার বলতে বাধে নাই যে দায়িত্বশীল সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ ও শাস্তির নীতিতে বাস্তবায়ন দৃষ্টিভঙ্গির (realistic and sober approach) দিকে ঝুঁকছে। শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি এবং যুদ্ধ-পরিহার নীতির স্বপক্ষে স্বার্থহীনভাবে তার মত প্রকাশ করলেন। যে-সময় চীনারা ভারত-সীমান্ত লঙ্ঘন করে যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ামকরূপে প্রয়োগকে বাস্তব-

জৈ ৮২—২

রূপ দিয়েছে, ঠিক সেই সময় ক্রুশ্চভ পিকিং-এর মাটিতে দাঁড়িয়ে বলছেন; কম্যুনিষ্টরা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের শাস্ত্রবল প্রয়োগ করা আরো চলবে না। একবছর বাদে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তেং-সিয়াও-পিং মস্কোর ১৯৬ - এর ৮-১-দলের বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে তীব্র আবেগের সঙ্গে ক্রুশ্চভ-এর আইসেনহাওয়ার স্তুতির নিন্দা করেন। তেং সেই মহা-সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বলেন 'তাস' পত্রিকা ৯ সেপ্টেম্বর (১৯৫৯) চীন-ভারত বিরোধসম্পর্কে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবৃতি প্রচার করে, যে বিবৃতি : 'আমাদের মধ্যে বিরোধ পৃথিবীর নিকট বিজ্ঞাপিত করে'—“This Communique revealed our differences to the world’। আর আইসেনহাওয়ার স্তুতির বিরুদ্ধে মস্কো সেই সম্মেলনে তেং এর অনলবর্ষী কশাঘাত ক্রুশ্চভের উদ্দেশ্যে লাভাপ্রবাহের মত ধাবিত হ'ল; 'No considerations of diplomatic protocol can explain away, or excuse, Khrushchev's tactless eulogy of Eisenhower and other imperialists, when he said in public that Eisenhower enjoyed the complete support of the American people.' আইসেনহাওয়ার প্রশস্তির জন্য চীনাদের সরব ও নীরব তিরস্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে মস্কোর ফিরে এসে ক্রুশ্চভ যেন নিবিকার। তার ওপর যে-সময় প্রাকৃতিক হুঁধ্যোগে

এবং নিজেদের অনুসৃত কর্মসূচীর ব্যর্থতার প্রাণিত্তে জর্জরিত চীনারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মরিয়া হয়ে তাদের কৃষকদের সামরিক বাহিনীর খাঁচে কৃষিতে নিযুক্ত করেছে যে-সময় চীনাদের পক্ষে সোভিয়েত-এর আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন দূরন্ত হয়ে উঠেছে। চীনাদের সেই দারুণ দুদিনে ক্রুশ্চেভ যেন তাদের ব্যঙ্গ করবার জন্যই রুশ শ্রমিকদের কাজের সময় দৈনিক ছয় ঘণ্টায় সীমিত করবার কথা বলছেন। শুধু তাই বা কেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞার উন্নয়নের ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েত রুশের শ্রমিকদের কাজের সময় দৈনিক তিন কিম্বা চার ঘণ্টায় নামিয়ে আনবার স্বপ্ন দেখতেও ক্রুশ্চেভ কল্প করলেন না।

অক্টোবর মাসের শেষে ক্রুশ্চেভ পিকিং থেকে ফিরে আসার পর সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি অজ্ঞাত সৌভাগ্যপূর্ণ কম্যুনিষ্ট পার্টির বরাবরে আমেরিকা সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের সাম্প্রতিক প্রীতিকর মনোভাবের ব্যাখ্যা করে একটি সমর্থনসূচক পত্র লেখে। এ-ছাড়া সোভিয়েত রুশের সংবাদপত্রে সে-সময়কাব সোভিয়েত প্রচার মন্ত্রী ইলিচেভ একটি প্রবন্ধে লিখে চীনাদের 'অতিবাম' নীতিকে ধ্বংস করেন। একাঞ্জে ইলিচেভ লেনিনকে অনুসরণ করে চীনা কম্যুনিষ্টদের 'বাম-মার্গী কম্যুনিষ্ট'—'Left-wing Communists' আখ্যা দিয়ে ঝাঁঝালো ভাষায় তিরস্কার করেন। রুশ বিপ্লবের পর নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করবার জন্য লেনিনের কাছে সে-সময় কোনো পদ্ধতিই বর্জনীয় নয়,

কোনো সমঝোতা, কোনো মৈত্রী, কোনো কৌশলই হয় নয়। মার্ক্সীয় তত্ত্বকে লঙ্ঘন করে যে কোনো পন্থা অবলম্বনে যদি নবজাত সোভিয়েত ব্যবস্থা রক্ষা পায়, সে ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় তত্ত্বও প্রয়োজনবোধে লেনিন বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন, করেছেনও। সেদিন যারা তত্ত্বের প্রতি গৌড়ামির বশবর্তী হয়ে তার কৌশলকে নিন্দা করেছেন—তাদের দ্বিধার দেবার জন্য লেনিন একটি কৌশলগত পুস্তিকা লেখেন : 'Left-wing Communism an infantile disorder'। অর্থাৎ 'বাম-মার্গী কম্যুনিজম, একটি শিশুরোগ বিশেষ।' জার্মান কম্যুনিষ্টদের গৌড়ামিতে লেনিন ধৈর্যহারা হয়ে বলেছিলেন : জার্মান বামমার্গীরা না জেনে পারে না যে অক্টোবর বিপ্লবের আগে এবং পরে বলশেভিকদের ইতিহাস অপর দলের সঙ্গে পারস্পরিক কালক্ষেপণে এবং আপসে ভর্তি এই দলগুলির মধ্যে বুর্জোয়া দলগুলিও রয়েছে—'The German Lefts cannot but know that the whole history of Bolshevism both before and after the October Revolution, is full of instances of manoeuvring, temporizing and Compromising with other parties, bourgeois parties included ! জার্মান কম্যুনিষ্টদের অপরাধ তারা পার্লামেন্টে প্রবেশ করে এবং প্রতিনিধি ট্রেন্ড ইউনিয়নগুলিতে যোগদান করে তাদের বিপ্লবী সত্বকে খর্ব করতে অস্বীকার করেছিলেন।

রুশ-চীন দ্বন্দ্ব ১৯৫২-এর অক্টোবরের শেষে রুশ মন্ত্রী ইলিচেভ অপাঙ্গে চীনা কম্যুনিষ্ট নেতাদের বামদৈর্ঘ্য কম্যুনিজম-এর অপবাদ আরোপ করে। এই বামদৈর্ঘ্য শিক্তরোপাগ্রস্ত কম্যুনিষ্টদের লেনিন যে কুটু-কাটব্য বর্ষণ করেছিলেন শুধু সে-কথা মনে করিয়ে দিতে চায় নাই, অধিকন্তু কম্যুনিজমকে রক্ষা করতে প্রয়োজনবোধ হলে মার্ক্সীয়-তত্ত্ব বর্জন করে কম্যুনিষ্টদের নানা রকম কৌশলগত সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করবার যে বিধান দিয়ে গেছেন তাও স্মরণ করিয়ে দিলো। এই নীতির মূল কথা ছিল যেন তে প্রকারেই ক্ষমতা দখল এবং যে সকল দলের সহযোগে ক্ষমতা দখল করা হবে একে একে সেই সব দলের উৎপাদন। রুশ বিপ্লবের পর থেকে লেনিন থেকে শুরু করে ষ্টালিন এবং অষ্টাশ দলের কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখলের জন্য এই কৌশলকেই সার বলে জেনেছেন। লেনিন তাঁর উল্লিখিত পুস্তিকায় বিধান দিয়ে গেছেন :

"It is possible to conquer the more powerful enemy only by exerting our efforts to the utmost and by necessarily, though carefully and attentively and skilfully, taking advantage of every 'fissure', however small, in the ranks of our enemies, of every antagonism of interests among the bourgeoisie in the various countries, among the various groups or types of bour-

geoisie in the various countries; by taking advantage of every opportunity, however small, of gaining an ally among the masses, even though this ally be temporary, vacillating, unstable unreliable and conditional. Those who do not understand this, do not understand even a grain of Marxism and of Scientific modern Socialism in general."

অতঃপর রুপকই মার্ক্স লেনিনের তত্ত্বের দৌঁহাই দিয়ে নিজ নিজ যুক্তি খাড়া করতে প্রয়াসী হল। চীনারা ইলিচেভের প্রবন্ধ হজম না করে সময়মত জবাব নিয়ে অসরে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে সোভিয়েত রুশের সুপ্রিম সোভিয়েতে ক্রুশ্চভ ৩০শে অক্টোবর আর একদফা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূখ্যমি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করে দিয়ে ট্রিটজার সঙ্গে চীনাদের হঠকারিতার তির্যক তুলনা করে কম্যুনিষ্টদের চোখে চীনা কম্যুনিষ্ট নেতাদের ট্রিটজার সমগোত্রীয় প্রতিপন্ন করতে চাইলো। এই সমীকরণ ভবিষ্যতে চীনাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের একটি অনিবার্য উপাদান হয়ে দাঁড়ালো। সুপ্রিম সোভিয়েতের এই সভায় ক্রুশ্চভ আরও দুইটি শক্তিশেল ছুঁড়ে মারলো চীনা নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষে ক্রুশ্চভ সুস্পষ্টভাবে সোভিয়েত রুশের নিরপেক্ষতা প্রকাশ করে চীনের ভারত-সীমান্ত নীতির প্রকাশ্য

বিরোধিতা করে! তাছাড়া আলজিরিয়ার মুক্তি-যুদ্ধের অবসানের জ্ঞাত্ত গলের আলজিরিয়ার সঙ্গে আপসের নীতিকে সমর্থন করে ক্রুশ্চভ বক্তৃতা দিলেও চীনারা জ্ঞাত্ত গলকে আক্রমণের নীতি অব্যাহত রাখলো এবং আলজিরিয় মুক্তি সংঘ এক, এল, এনকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করতে থাকলো। আলজিরিয়ার প্রশ্নে পরাদীন জাতির মুক্তিযুদ্ধে সর্বপ্রথম সোভিয়েত রুশ এবং কমুনিষ্ট চীন পরিবার ছুই বিপরীত দিকে মুখোমুখী সংঘাতে লিপ্ত হোলো।

১৯৫৯-এর ১লা ডিসেম্বর হাঙ্গেরীয় কমুনিষ্ট পার্টির বৃদাপেন্স সমাবেশে ক্রুশ্চভ কমুনিষ্ট আন্দোলনে মতপার্থক্যের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, বিভিন্ন দেশের কমুনিষ্টদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে হুকুমের সুরে বলেন, 'তোমাদের ঘড়ি মিলাতে হবে'—must synchronise their watches.' কার ঘড়ির সঙ্গে ঘড়ি মিলাতে হবে। কার ঘড়ির সময় ঠিক। চীনারা পরবর্তীকালে এ-প্রশ্ন তুলেছে। সে-সময় ছ'পক্ষই কমুনিষ্ট আন্দোলনে ভাঙনের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।

লেনিনবাদী তত্ত্বের বিপ্লবী ধরতাপ

১৯৬০ গড়িয়ে এলো। রুশ-চীন দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমেই অধিকতর জমজমাট হল। ১৯৬০-এর ফেব্রুয়ারীতে মস্কোতে ওয়ারশ-চুক্তি আদর্শ দেশ-গুলির সভায় ক্রুশ্চভ আর একদফা চীনা কমুনিষ্ট

নেতাদের নীতির তীব্র সমালোচনা করে। মার্চ মাসে সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টি চীনা কমুনিষ্ট পার্টির একটি প্রতিনিধিদলকে মস্কোতে উপস্থিত হয়ে দুই দলের বিরোধগুলি আলোচনার জ্ঞাত্ত আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানায়। চীনারা এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। এপ্রিল মাসে লেনিনের নব্বুই-তম জন্মোৎসবের সমকালে চীনাদের প্রতি আক্রমণ শুরু হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রবন্ধে এই বিরোধ একটি উচ্চপর্ষায়ের তাত্ত্বিক স্তরে পৌঁছালে বোঝা গেলো মাও-সে-তুং কেবলমাত্র ক্রুশ্চভের সমালোচনার জবাবেই সন্তুষ্ট নন। কমুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ক্রুশ্চভের হাত থেকে কেড়ে নিতে তিন বন্ধপরিষ্কার।

১৬ই এপ্রিল চীনা কমুনিষ্ট পার্টির পাক্ষিক পত্রিকা 'রেড ফ্লাগ'-এ (Red Flag) 'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক'—'Long Live Leninism'—শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেনিনবাদের রুক্ষ তাত্ত্বিক উপস্থাপনায় বিপ্লব সম্পন্ন করবার এই দলিলটি নঞ্জীরহীন হয়ে রয়েছে। বিশ্ব বিপ্লবের পথে হ্রস্বতম পথে দ্রুবার গতিতে চলতে হবে। এ-পথে কোনো আপস নাই। কোনো পেছনে ফেরা নাই। আর যদি একবার বিপ্লব বাধে হয়ও বা বার বার সে-পথেই চলবে নব নব বিপ্লবী অভ্যুত্থান, যতদিন না বিপ্লব স্বার্থক হয়ে ওঠে ১৮৭১ সালে প্যারিস শহরে যে প্লেবক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কম্যুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সেই কম্যুন প্রতিষ্ঠাকে কার্জ

মাত্র যে চোখে দেখেছিলেন, উপরোক্ত প্রবন্ধটি মাত্রের সেই উদাস্ত প্রত্যয় দিয়ে শুরু হয়েছিলো :

"Even if the Commune should be destroyed, the struggle will only be postponed. The Principles of Communism are perpetual and indestructible the will present themselves again and again, until the working class is liberated."

এই প্রবন্ধে ক্রুশ্চভের তিনটি মূল নীতিকেই সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে। পুঞ্জিবাদীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, যুদ্ধের অন-অনিবার্যতা এবং শান্তিপূর্ণ পথে বিপ্লবসাধন এই ত্রয়ী ক্রুশ্চভী নীতিকে ধূলিসাৎ করে ক্রুশ্চভের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে প্রতারণিত করার জনসাধারণকে নিরঙ্কুশে তাদের সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেবার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। দলিলটির মূল বক্তব্য, সাম্রাজ্যবাদীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে তাদের বিরুদ্ধে পরাধীন ও শোষিতদের বৈপ্লবিক অভিযান হুঁসিয়ার করে তুলতে হবে। সুতরাং পুঞ্জিবাদী দেশে সকল রকম বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান এবং জাতীয় মুক্তির বিপ্লবকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে হবে। যতদিন পুঞ্জিবাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হবে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দিগন্ত আচ্ছিন্ন করে থাকবে। আর সহ-অবস্থান। লেনিন তো বলেই গেছেন ওটা তো একটা কৌশলমাত্র। যতদিন প্রয়োজন সহ-অবস্থান চলবে, আর বৈপ্লবিক অভিযানের প্রকাশ্য

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে, সহ-অবস্থান আত্মাইড়ে বিদায় নেবে।

'রেড ক্লাগে'-এর ১৬ই এপ্রিলের প্রবন্ধে বল-প্রয়োগ-এর সাহায্যে বিপ্লব সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

Revolution means the use of revolutionary violence by the oppressed class it means revolutionary War. This is also true of the bourgeois revolutions. Lenin has put it well.

History teaches us that no oppressed class ever achieved power, nor could achieve power, without going through a period of dictatorship, i.e, the conquest of political power and suppression by force of the most desperate, frenzied resistance offered by the exploiters.

And again still quoting Lenin :

Not a single great revolution in history has ever carried out without a civil war and no serious Marxist will believe it possible to make the transition from capitalism to socialism' without a civil war."

এই প্রবন্ধ আর একটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে ক্রুশ্চভকে খর্ব করার চেষ্টা করলো। সোভিয়েত রাশের ক্ষেপণাস্রম রয়েছে, ধ্বংসাত্মক

অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রশস্ত্রের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু বর্তমান জগতে অস্ত্রই শেষ কথা নয়। জনসংখ্যা অস্ত্র ও যন্ত্রকলাকৃশলের চাইতে শ্রেষ্ঠতর সম্ভার। স্বয়ং মাও-সে-তুং এ-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর চীনের রয়েছে জনসংখ্যার অসংখ্য প্রাধান্য :

“...Marxist-Leninists have always maintained that in world history it is not technique but men, the masses of people, that determine the fate of mankind..... Comrade Mao-tse-Tung has pointed out that the most abundant source of strength in war lies in the masses, and that a peoples army organised by awakened and united masses of people would be invincible through-out the world”

অর্থাৎ সোভিয়েত রুশ পারমাণবিক গুল্লের যুদ্ধ-নিরোধক শক্তির উপর নির্ভর করছে আর চীনের রয়েছে বিপুল জনসংখ্যা। ১৬ই এপ্রিলের অবস্থা প্রকাশিত হবার পর কয়েকদিন পরেই আমেরিকার গোয়েন্দা বিমান ইউ-২কে সোভিয়েত রুশের স্তর-

ডলভ্‌স্ক-এ (Sverdlovsk) গুলি করে নামাবার পর ক্রুশ্চভ আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে প্যারিশে শীর্ষ বৈঠক ভেঙ্গে দিয়ে মুখরক্ষা করলেন। কিন্তু ক্রুশ্চভ এতো প্রতিকূলতায়ও দমেন নাই। ১০ই জুন সোভিয়েত রাশিয়া নামক সংবাদপত্রে শেভলিয়াগিন নামক এক লেখককে দিয়ে চীনাঁদের বিরুদ্ধে লিখলেন : ‘সেই সব বাঘা বিপ্লবীরা, যারা বিপ্লবের মুহূর্ত পৌছাবার পূর্বেই বিপ্লব ঘটাবার জন্য ছুটোছুটি করে।’ এই ১০ই জুন তারিখে পিকিং-এ বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের শেষ দিনের শেষ দিনে এই সংগঠনের চীনা ভাইস-প্রেসিডেন্ট লিউ-চান-শেঙ সোভিয়েত রুশের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবসমূহকে কপটচারণরূপে চিহ্নিত করছিল এবং সমবেত প্রতিনিধিদের চীনা মতের স্বপক্ষে প্রভাবিত করতে চীনারা অবিস্থাস্তরূপে তৎপর হয়ে উঠেছিলো।

এর দশদিন পর ১৯৬০-এর ২০শে জুন বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত কম্যুনিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে ভাঙন গোপন রক্তাধ খেঁকে কম্যুনিষ্টদের সমাবেশের সদরে আত্মপ্রকাশ করলো।

[ক্রমশঃ]

ফ্লিশ বছরের একটি নির্ভীক সং পত্রিকাকে বাঁচানোয়

আপনার কি কিছু করণীয় আছে?

‘জয়ন্তী’কে বাঁচাতে নিজেপন দিন

দোকানদার

বিজ্ঞানকুমার ঘোষ

সকাল থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে কোড়ো হাওয়া। গায়ের ওপর যেন খারালো র্রেড হয়ে কেটে বসছে। পৌষ মাস।

গত কাল থেকে বেরোতে পারছে না হরেকেষ্ট।
খাঁ, বেরিয়ে ছল একবার সকালের দিকে। তার আগের দিনের কিছু কুমড়া, বেগুন ছিল। কিছু ব্যসনও। ঢাকুরিয়া স্টেশনের গায়ে লেভেল ক্রশিংয়ের পাশে হরেকেষ্টের একখানা তেলেভাজার দোকান আছে। পাঁচ মাস ধরে চলছে। প্রথম দিনে আলুর চপ, বেগুনী, পেঁয়াজের সাইজ অসম্ভব বড় করে এবং গলায় নানা রকম চিকোরের হাট বসিয়ে 'গুডউইল' তৈরী করে নিয়েছিল। তারপর থেকে সাইজ এখন পাঁচটা দোকানের মতই, কিন্তু ওই যে 'গুডউইল,' তারই জোরে দোকানের সামনে এখনো ছেলে ছোকরাদের কিছু ভিড় হয়। আর হয় ঢাকুরিয়া বাজারের কিছু ব্যাপারী আর ফড়েদের, যারা ট্রেনে করে দক্ষিণ থেকে কাঁচা আনাঙ্গ, মাছ, মালাপএ বয়ে আনে। দিনে দেড় টাকা, দু' টাকা পর্যন্ত হয়। সময়তে আড়াই টাকাও। লেভেল ক্রশিংয়ের পাশে লাইব্রেরীর সামনে এক টুকরো জমিতে চারটে কাঠি পুতে, ওপরে ছেঁড়া ত্রিপল টাউন্ডিয়ে হরেকেষ্টের দোকান। মাঝে মাঝে জল

পিরিয়ডে হরেকেষ্ট বাজখাই গলায় হাঁক ছাড়ে, পচা তেল পাবেন না, দেখেগুনে খাবেন, জ্বিত পুড়ে যাবে—

তেলেভাজা তৈরীর কায়দাটা হরেকেষ্ট প্রথমে মার কাছ থেকে শিখে নেয়। কারখানার এক বন্ধু পাঁচু ওর মাস দেড়েক আগেই দোকান দিয়েছে হালতু বাজারের সামনে। তেলেভাজারই। ফলে বিনা কয়কজিতে এই দেড় মাসের অভিজ্ঞতাটা হরেকেষ্ট চেটেপুটে নিয়েছে পাঁচুর কাছ থেকে। পাঁচু বলেছে, শেষ বাজারে গিয়ে পোকা কাটা বেগুন, পচা কুমড়া, পেঁয়াজ ঝেঁটিয়ে কিনে নিবি। খিদিরপুরে গিয়ে কিনবি বাসন এক সঙ্গে পাঁচ কিলো কিনলে একটু সস্তা পড়বে।

হরেকেষ্ট বলেছে, কিন্তু পোকা কাটা বেগুন কেন? পচা কুমড়া, পেঁয়াজ কেন?

পাঁচু দিগ্গজের ভঙ্গীতে হেসেছে।

—না হলে লাভের গুড়ে পিপড়ে ডন মারবে রে শালা। খুব কড়া করে আল দিবি, কড়া করে ভাজবি। কোন শালা ধরতে পারলে পাঁচু খোনার কানটা কেটে দিস।

পরশু রাতে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে রেলের লোকদের সঙ্গে চালের চোরা কারবারীদের কি

একটা গম্বুগোল হয়েছিল, সেই থেকে দক্ষিণের সমস্ত লাইনের ট্রেন চলাচল বন্ধ। খদ্দেরও আসছে না, পচা কুমড়া, পোকা কাটা বেগুনও মিলছে না। ঝড়তি পড়তি যা মাল ছিল তাই দিয়ে গত কাল দোকান দিয়েছিল হরেকেষ্ট। আজ একেবারে ঝাড়া হাত পা। গায়ে কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টি দেখছে। মুখটা আজকাল বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। মা ঘরে রয়েছে, তবু বৃষ্টির বাপ তুলে পর পর কয়েকটা খিন্তি দিল। ছুটো বিড়ি ছাই করে আড়মোড়া ভাঙ্গল।

পাঁচু এল সন্ধ্যা নাগাদ। হি-হি করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে।

—বেড়ে আছিস। আমিও দোকান খুলিনি। মালপত্র নেই, খদ্দের নেই। শালার বৃষ্টির ইয়ে মারি। দে বিড়ি দে—

পাঁচু খাটের এক কোনায় বসে পড়ে কাঁধার ভিতর ঠাণ্ডা পা' ছুটো ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগল। দেখে বিরক্ত হল হরেকেষ্ট।

—তোর আর কি! আমার মত তো মাস মাস ভাড়া গুণতে হয় না? নিজের বাড়িতে বাস করিস।

ওদের কারখানায় আট মাস হয় লক-আউট চলছে। এই খোলার ঘরখানায় ভাড়া পনের টাকা। অতি কষ্টে হরেকেষ্ট সেটা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্তে ভারী অহঙ্কার।

রেপে উঠল পাঁচু। কলোনির মধ্যে একখানা ঘর আছে তাই নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে।

—সংসার বলতে তুই আর তোঁর মা। আমি বিয়ে করেছি। ছেলে মেয়ে আছে। একটা বেকার ভাই ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। অমনি চলছে?

পাঁচু যে কোন সময় ভাইকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে। কিন্তু দেয় না। তা পাঁচুর অহঙ্কারই বা কম কি।

—কিছু শুনলি?—হরেকেষ্ট অশ্রু প্রসঙ্গে যেতে চাইল : কবে মিটেবে মনে করছিস।

—আর মিটেছে। আমাদের তেলেশাকার দোকানই চালাতে হবে। শালা, বিড়িও সঁজিয়ে গেছে।—পাঁচু এবার কথাবার্তার ফাঁকে ছুটো পা-ই ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—দূর, তাতে কি সংসার চলে? ছুটো মোটে কার্ড, তারই রেশন তুলতে পারিনে।

—ওসব বাদ দে। যত ভাববি ততই মাথা গরম হবে।—এই সময় চোখে মটকা মারল পাঁচু : এখন কি হলে মানায় বল তো?

—ভাগু শালা। আগে দানার চিন্তা কর তারপর দারু।—হরেকেষ্ট হাই তুলল : জানিস ওয়ার্কস ম্যানেজার এই পাড়ায় বাসা নিয়েছে। বউটা মাইরি কড়া দেখতে!

ওয়ার্কস ম্যানেজার একবার পাঁচুকে ছয় দিনের জন্ত সাসপেন্ড করেছিল। সেই থেকে পাঁচু 'শালা' ডাকে। বলল, শালা তো বালিগঞ্জ থাকত রে।

—হু-হু, আর বালিগঞ্জ থাকতে হবে না। এবার বারুইপুরে যেতে হবে। ছ' মাসের ভাড়া বাকী।

শেষ টান দিয়ে বৃত্তির মধ্যে ছুঁড়ে দিতেই ছাঁৎ করে শব্দ হল। ছ' দিনে প্রায় পঞ্চাশ টাকার মত কাটা গিয়েছিল। ভাল সাবজেক্ট পেয়ে সিধে হয়ে বসল পাঁচু।

—কি করে জানলি।

—বাঃ, আমার সাথে বাড়িওয়ার আলাপ আছে না। সেদিন বলল, তুমি দোকান দিয়েও ভাড়াটা ঠিক চালিয়ে যাচ্ছ, আর আমি তোমার ম্যানেজারকে বসিয়ে কপাল চাপড়াচ্ছি।

—তা আমাদের সাথে তেলেশাজার দোকান দিতে বল না?

হুঁজুনেই বৃত্তি ছাপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

ভাত নামিয়ে চায়ের জল চাপানোর হরেকেষ্টর মায়ের রাগ চড়ে গিয়েছিল। ঘরে এক ফোটা হুখ নেই! ছোটো বিবাদ চায়ের কাপ হুঁজুনের মাঝখানে রেখে বিরক্তি প্রকাশ করল, এ হাসি আসে কিসের? আট মাস কারখানা বন্ধ। বলিহারি বাপু!

সে কথায় কান না দিয়ে পাঁচু ফিস ফিস করে বলল, বউটা কড়া বলছিল, না?

মা'র দুরত্বটা মেনে, সেই অমুখায়াী গলার আওয়াজ দিয়ে হরেকেষ্ট বলল, হ্যাঁ। আমার সাথে দেখা হতেই বলল, তোমাদের পাড়ায় এলাম, এবটু দেখো টেকো। মাইরি একেবারে নরম—

—বেশ হয়েছে। শালা আমার পৌনে লেগেছিল, মনে নেই?

চৈত্র ৮২—৩

—বাঃ, ও রকম বলতে নেই। মাসুকের কখন কি হয়! বাইরে থেকে এমন সময় ডাক এল, হরেকেষ্ট বাবু আছেন?

—কোন শালা এল?—হরেকেষ্ট কান খাড়া করল।

বলতে বলতে লোকটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে ছাতা। বৃত্তিতে কাঁপছে। কয়েক দিন ওয়ার্কস ম্যানেজারের পেছনে পেছনে বাজার দেখেছে। মনে পড়তেই লাক্ষিয়ে উঠল হরেকেষ্ট।

—বাবু আপনাকে ডেকেছে।

—কে, আমাদের সাহেব?

—হ্যাঁ।

পাঁচু আধ শোওয়া হয়েছিল, তাড়াতাড়ি মেমে এল। ওপাশ থেকে হরেকেষ্টর মা-ও এসে দাঁড়িয়েছে। কোন নতুন খবর আছে নাকি? তারা কতী ব্যক্তি। কারখানা কি খুলবে?

লোকটা চল্লিশের কাছাকাছি। খুব রোগা। শীতে দাঁত ঠকঠক করছে।

—কেন, কি হয়েছে?—হুঁজুনেই এক সঙ্গে বলে উঠল।

—দিদিমণির জ্ঞান হচ্ছে না। আপনি একবার আনুন।

হরেকেষ্ট মুখ থেকে বিড়িটা কেলে দিল। তাড়াতাড়ি জামা পড়ল। হারিকেনটা হঠাৎ উলকে দিয়ে বেন বলতে চাইল, ডাখ, ওয়ার্কস ম্যানেজারের বোয়ের অহুখ হলে আমার ডাক পড়ে। কিন্তু পাঁচুর দিকে ডাকিয়ে বিরক্ত হল।

—আই, তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

—চল না, আমিও যাই তোর সঙ্গে। দেখে আসি।

—না না, কোন প্রাইভেট কথা হতে পারে।—
পাঁচু সঙ্গে যাক, এটা সে চায় না।

—প্রাইভেট কথা আর কি। ওই তো বলল, জ্ঞান ফিরছে না। তাকে হয়ত ডাক্তার ডাকতে বলবে।

এক ছাতার তলে তিন জন ভিজতে ভিজতে হাজির হল ওয়ার্কস ম্যানেজারের বাড়িতে। হরেকেষ্ট পাঁচুর গায়ে চিমটি কাটল, ওখানে গিয়ে আবোল তাবোল কিছু বকিস না।

বাড়িটা বেশ ভাল। ঢাকুরিয়া স্টেশনের খুব কাছেই। তিনখানা রুম। সামনে গ্রিল দেওয়া বারান্দা। বাড়িওয়ালা রাধেশবাবু বলেছিলেন, বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভর করে আমার সংসার চলে। তোমাদের সাহেবকে বসিয়ে এখন কপাল চাপড়াচ্ছি।

জানালা দিয়ে উকি দিল হরেকেষ্ট। ঘরের মধ্যে কয়েকজন ব্যস্ত সমস্ত চলাফেরা করছে। ডাক্তার পি. রায় মাখনের মত একখানা হাত ভুলে ধরে বসে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ভাল করে দেখার জন্যে পাঁচু উসখুস করতেই হরেকেষ্ট আবার চিমটি দিল।

ওয়ার্কস ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন। হরেকেষ্ট এগিয়ে গেল। পাঁচু দেখতে পেল হরেকেষ্টের একটি হাত ধরেছে ওয়ার্কস ম্যানেজার। সব তেল

তাহলে বেরিয়ে গেছে। ছ' দিনের মাইনে সাত চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এক কথায় কেটে নিয়েছিল শালা। এখন সুন্দরী বোয়ের জ্ঞান হচ্ছে না দেখে ভিরমি লেপেছে। রোয়াব কত! আবার দু'খানা দশ টাকার নোট দিল হরেকেষ্টকে। বেহালার ওদিকে পঞ্চাননতলায়, না কোথায় তেনার স্বস্তর বাড়ি—সেখানে খবর দিতে হবে। আবার ট্যাক্সি করে নিয়ে আসতে হবে। বামেলা অনেক। এখন তুমিও যা আমিও তা। কারখানা খুললে তখন না হয় সেলাম ঠোকা যাবে।

—ও কে, পাঁচু না?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ স্তার।—পাঁচু এগিয়ে এল।

—তুমি ভাই একটু সঙ্গে যাও। দেখতেই তো পাচ্ছ কি বিপদে পড়েছি।—ওয়ার্কস ম্যানেজার হাত ধরলেন।

—সে বলতে হবে না স্তার।—পাঁচু করসা নরম হাতে অল্প চাপ দিল; আপনি আমাদের পাড়ায় এসেছেন, এটুকু তো দেখতেই হবে।

টিপ টিপ বৃষ্টি সমানে বরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের কাঁপুনি লাগছে। রাস্তাঘাট কাঁকা। ছেঁড়া জুতোয় কাদা উঠে আসছে। লেভেল ক্রশিংয়ের কাছে এসে ট্যাক্সি পেল। কাচ তুলতে তুলতে পাঁচু বলল, মাইরি, ট্যাক্সি না চড়ে ওই পয়সায় মাল খেলে হত।

—ধাম, একটা লোক বিপদে পড়ে পাঠাচ্ছে!

—অত দরদ কেন রে? শালা আমাকে ছ'দিন সান্বেপ্ত করেছিল।

—তোরই দোষ, মুখে মুখে তুচ্ছ করলি কেন?

সাহেব মাহুয।

—দূর, কত সাহেব দেখেছি! তোকেও তো এক দিন সাসুপেণ্ড করেছিল। মনে নেই?

পঞ্চাননভলার মুখে এসে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল। আর যেতে চায় না। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল ছই বন্ধু। সেই জল কাদা আর হাড় কাঁপানো বাতাসের শাকা। অন্ধকার গলি। রাস্তার আলোটা হঠাৎ

ঘলে উঠে আবার নিভে যাচ্ছে। এলোপাখাড়ি খানিকক্ষণ হাঁটল। কেউ নেই যে সাহেবের স্বপ্তরের ঠিকানাটা একবার খালিয়ে নেয়। পর পর দরজা বন্ধ। জানালার কাচ ভেদ করে চৌকো আলো মাঝ রাস্তায় গুরে আছে। সেই দিকে তাকিয়ে পাঁচু বলল, বড্ড খিদে লেগেছে রে।

—আমারো।—এই প্রথম হরেকেষ্ট সাপোর্ট করল।

—চল না কিছু খেয়ে নিই।

—ছিঃ! ভাড়া দিতে পারছে না লোকটা, তার ওপর বৌয়ের অন্ত্র।

অন্ধকারে আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর পাঁচু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর নাক পুলিশের কুকুরের মত। ঠিক গন্ধ পেয়ে গেছে। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে এখনো বেশ কিছু হাতে আছে। আর আজকের রাতটা বড় দামাল রাত। বাছ জানে!

হরেকেষ্টকে তবু খানিকটা প্রতিবাদ করতে হল। কিন্তু জলে কাদায় গলার স্বরটা যেন ভিজে গেছে। বলল, ঠিক আছে, তিন টাকার বেশি খরচ করতে

পারব না। আমাকে আবার বিশ্বাস করে খুব। আহা, বড্ড টানাটানি যাচ্ছে।—বলতে বলতে ছ'জনে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

যখন বেরোল, ছ'জনেরই পা' টলছে। বৃষ্টি আরও জাঁকিয়ে এসেছে। কিছুতেই ঠিকানা মিলিয়ে ম্যানেজারের স্বপ্তর বাড়ির হৃদিস পেল না। কথা জড়িয়ে আসছে, পা' আরো টলছে—ক্লান্তি। এক বাড়ির শুকনো রোয়াক পেতেই ছ'জনে বসে পড়ল। শুয়েও পড়ল আর এণ্ট্রি পরে। মাথার মধ্যে কি রকম যেন ঘোর লাগছে।

—মাইরি, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে।—হরেকেষ্ট বলল।

—বেশ হয়েছে! শালা আমার সাত চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা জব্দ দিয়েছে।

—তোকে তো দায়িত্ব দেয়নি, দিয়েছে আমাকে। যখন ধরবে বুঝবি ঠালা। শালা, বাড়িটাও খুঁজে পেলাম না।

—চূপ কর। এখন ঘুমো দেখি। ভোরে উঠে যা হোক ভাবা যাবে।

—তোকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে। হরেকেষ্টর মাথায় ঘোর লেপে থাকলেও যারপর নাই বিরক্ত হল। তেলভাজা বিক্রীর পরামর্শটা ভাল হলেও, আজকের পরামর্শটা একেবারেই খারাপ। ম্যানেজারের বৌ অজ্ঞান হয়ে গেছে, বিশ্বাস করে স্বপ্তর বাড়িতে পাঠিয়েছে, এদিকে সব টাকার মাল খেয়ে রাস্তার মধ্যে বেঁহুশ। ছি ছি। কি করে মুখ দেখাবে? কি করে টাকাটা শোধ দেবে?

একটু পরে পাঁচুর নাসিকা গর্জন শোনা গেল।
হরেকেষ্টর সারা শরীরটাই কি রকম ঝিম মেয়ে
গেছে। ম্যানেজার লোকটা খারাপ না। পেট
কামড়াচ্ছে বলায় তিন দিন ভাড়াভাড়া ছুটি দিয়ে
দিয়েছিল।

তিন দিন পর সকালের দিকে হরেকেষ্ট যখন
গরম তেল হেঁকে পেঁয়াজগুলি তুলছে, হঠাৎ সামনে
জাকিয়ে হিম হয়ে গেল।

—কিহে, তোমার যে পাত্তাই নেই।

হরেকেষ্ট কোন কথা জোগাতে না পেয়ে হাত
কচলাতে লাগল। তার পরে একটু ভেবে বলল,
আজ্ঞে সময় পাচ্ছি না স্তার—

ম্যানেজার ওদিকে না গিয়ে বললেন, আমাকেও
তেলেভাজার দোকান দিতে হবে দেখছি। তা কেমন
লাভ হয়?

হরেকেষ্ট যেন প্রাণের কথাটা পেয়ে গেল।

—বেশ হয় স্তার। আমার পাশেই জায়গা
আছে, আমি দেখিয়ে দেব স্তার।

ম্যানেজার চাকর সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে
এসেছিলেন। এই কথা শুনে আর দাঁড়ালেন না।
হরেকেষ্ট ভাড়াভাড়া একটা ঠোঙায় কিছু তেলেভাজা
ভরে দৌড়ে গিয়ে সেটা চাকরটার হাতে গুজে দিল।

—ও কি করছ!—ম্যানেজার অবাক হলেন
হরেকেষ্টর কাণ্ড দেখে।

—কিছু নয় স্তার। বৌদিগ জন্মে সামান্য—।

জয়ন্তী প্রকাশনের কয়েকটি বই

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ

১ম খণ্ড ৯.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০

ও ৩য় খণ্ড ১৩.৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়

সাধারণ ২.৫০, বাঁধাই ৩.৫০

সুভাষচন্দ্র ও আশনাল প্ল্যানিং

শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬.০০

NETAJI SPEAKS

Volume One

A collection of speeches & writings

Paper back 4/- Board 5/-

জয়ন্তী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

ঐ মহামানব আসে : চাবনিক

৬.০০

NETAJI THROUGH

GERMAN LENS

Nanda Mookerjee

১২.৫০

রামমোহন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

৬.০০/৩.০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

অনিল রায়

৪.০০/৬.০০

বাংলাদেশের বিপ্লব

সুনীল দাস

১.২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অনিল রায়

২.০০

বিবেকানন্দের বাংলা কবিতা

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

এক

কবি হিসেবে নিশ্চয়ই বিবেকানন্দ সুপরিচিত নন। তাঁর কয়েকটি পান, কবিতা, প্রবন্ধ আর চিঠি পত্রেরই তাঁর সাহিত্যিক প্রয়াসের যা কিছু উদাহরণ বিদ্যমান। তিনি মুখ্যত ছিলেন অধ্যাত্ম-আদর্শ উপলব্ধির এক আশ্চর্য আধার, গৌণত ছিলেন লেখক—একথা আদিতেই মনে রাখা দরকার।^১

প্রথম সাহিত্যবোধ এবং সৃষ্টি মানস থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ নিহক সাহিত্যিকে পর্যাবসতি হন নি, কারণ তাঁর জীবনসাধনা আরো ব্যাপক এবং বিচিত্র। তবু তাঁর লেখায় পরিণত সাহিত্য-গুণ রয়েছে। অনুভব, প্রকাশভঙ্গী, শব্দভূষমা, চিত্র-সৌন্দর্য, প্রেরণাশক্তি—সব মিলিয়েই সৃষ্টি হয় সাহিত্য। আর সেই বিচারে বিবেকানন্দের রচনা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। এটা অবিসংবাদিত সত্য।^২

সাহিত্যবোধ ছিল তাঁর আটকশোর। ইংরেজ কবিদের মধ্যে মিল্টন ছিলেন বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয়। বাল্যেই তিনি মিল্টনের কবিতা আবৃত্তি

করতেন। সেঙ্গপীরারের গ্রন্থগুলোর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। বাইরন এবং ওয়াড্‌স-ওয়ার্থের কবিতাও তাঁর খুব ভাল লাগত। ডঃ ব্রজেননাথ শীল নরেন্দ্রনাথকে শৈশব কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করেন। ক্রমে নরেন্দ্রনাথ শৈশব ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

আমাদের কবিদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে সব চাইতে আকৃষ্ট করেছিলেন মধুসূদন। মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। বিশেষ করে, ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তিনি অনেক সময় বলতেনঃ মাইকেলই বাঙ্গালা দেশে একটা বিশেষ কবি প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ‘সুদর্শন সবিতা’ কাব্যটি নরেন্দ্রনাথ বিশেষ পছন্দ করতেন। তেমনি তাঁর প্রিয় ছিল গিরিশচন্দ্রের ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গী। বিবেকানন্দ তাঁর কাব্যভাষা এবং ছন্দের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত কবিদের নিশ্চয়ই কিছুটা অনুসরণ করেছেন। কিন্তু, এটা মনে রাখতে হবে যে, ভাবের ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের কারো দ্বারাই প্রভাবিত হন নি। ভাব সম্পর্কে উপনিষদের ভারতীয় স্বাধিগণই ছিলেন স্বামীজীর একান্ত আদর্শ। বেদান্তের মহিমাষিত বাণী বা ভাবরসই তাঁর প্রায় সব কবিতার উৎস।^৩

স্বামীজী বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখেছেন।

ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় লিখিত কবিতার মধ্যে তাঁর ইংরেজী কবিতাই বেশী। তাঁর ইংরেজী কবিতাগুলি তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আর বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের নিভুল প্রতিচ্ছবি। সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্রের আকারে লিখিত স্তব-স্ততিগুলির সবই তাঁর নিজস্ব অধ্যাস-ভাব-সজ্জাত।

বাংলাভাষায় লিখিত তাঁর কবিতার সংখ্যা খুবই কম। তাঁর নিজস্ব ভাবদর্শন এবং প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে কবিতাগুলি নিশ্চয়ই বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এই জাতীয় কবিতা আমাদের কাব্যজগতে দুর্লভ এটা স্বীকার করতেই হবে। ‘ঐরামকৃষ্ণ-আরাট্রিক ভজন’, ‘শিবসঙ্গীত’, ‘সৃষ্টি’, ‘প্রলয়-বা গভীর সমাধি’, ‘সখার প্রতি’, ‘নাচুক তাহাতে শ্রামা’, ‘পাই গীত শুনাতে তোমার’ এবং ‘সাগর বন্ধে’ কবিতাগুলি তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক হয়ে আছে।

স্বামীজীও শেলী বা বিহারীলালের মতো রোমান্টিকতা থেকে মিস্টিকতায় উত্তরণের কবি। ও তবু স্বীকার করতে হবে, কবিত্বের দিক থেকে স্বামীজী একেবারেই স্বতন্ত্র শ্রেণীর। সুগভীর অধ্যাসচেতনাকে তিনি যেভাবে ভাবগম্যীয় ছন্দে প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিশ্চিতভাবেই।

তুই

স্বামীজীর রচিত ‘সৃষ্টি’, ‘প্রলয় বা গভীর সমাধি’

এবং ‘পাই গীত শুনাতে তোমার’—এই তিনটি কবিতায় কাব্যরসের চাইতে চব্ব্বস্তুই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর সাধনালব্ধ অধ্যাস-অনুভূতিই এই কবিতা তিনটির মৌল প্রেরণা। কিন্তু, তাঁর দুটো কবিতা—‘লেখার প্রতি’ ও ‘নাচুক তাহাতে শ্রামা’ কাব্যগুণে নিশ্চয়ই পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

‘সখার প্রতি’ কবিতাটিতে স্বামীজীর আত্ম জীবনের তিস্ত অভিজ্ঞতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তারই মধ্যে রূপলাভ করেছে তাঁর উন্নত জীবনদর্শন। এই কবিতায় হৃৎকের সুর আছে সত্যি, কিন্তু সেই হৃৎস্ববাদ পাশ্চাত্য কবি-দার্শনিকের হৃৎস্ববাদ নয় মোটেই, তারও মূলে আছে সনাতন ভারতীয় জীবনদৃষ্টি।

এই কবিতায় তিনি মানুষের হৃৎ-ব্যাধি-অন্ধকার আর স্বার্থান্ধতার যে রূপ উদ্ঘাটন করেছেন, তা আধুনিক কালের বাস্তববাদী কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির কথাই মনে করিয়ে দেয়। কুটিল স্বার্থপরতায় আর নির্ভর ঔদাসীয়ে এই পৃথিবীতে যে আদর্শবাদী মানুষের স্থান হতে পারে না, সে সম্বন্ধে তিনি দ্বিধাহীন।

‘জেনেছি সূতের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত হৃৎ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদীবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক। এ জগতে নাহি তব

স্থান;

লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয়?
হও জড়প্রায়, আত নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—

সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে

স্থান।

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা সাময়িক বিদ্রোহ
ভাব স্বামীজীর মনে এসেছিল, এটা ঠিক। তাঁর
নিজের জীবনের ভিত্তি স্থিতি আর মধুসূদন মিশ্রের
বিপ্লবী-চেতনাও বোধ হয় একজু দায়ী। কিন্তু দুঃখই
মানুষের জীবনের চূড়ান্ত পরিণাম এই সিদ্ধান্ত রেখে
যাবার মানুষ স্বামীজী নিশ্চয়ই ছিলেন না। সেই
জন্মই একটা নেতিবাচক মনোভাব স্বামীজীকে
স্বল্পসময়ের জন্ত আচ্ছন্ন করলেও, বিশ্বশ্রেমিক
সন্ন্যাসী গঠনধর্মী উপলক্ষিতে শেষ পর্যন্ত অনায়াসে
পৌঁছে গেছেন। পরমশ্রিয় সথাকে সম্বোধন করে
লিখেছেন।

‘শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার-
তরঙ্গ-আকুল ভাবধোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগভোগ বুদ্ধির বিভ্রম; ‘শ্রেম’ ‘শ্রেম’—এই মাত্র
ধন।

তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, শ্রেমের শক্তিই
পৃথিবীতে অনন্ত। এই মহাশক্তির দ্বারাই জীবনের
ক্ষুদ্রতা-নীচতাকে জয় করা যায়। তাঁর ভাষায়—

হে শ্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষকের কবে বল স্থখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, শ্রেমসিদ্ধ হৃদে বিজ্ঞান।

এই কবিতারই শেষ ছুটি ছত্র—‘বহুরূপে সম্মুখ
‘তোমার’ প্রভৃতি আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত।

বিবেকানন্দের বাংলা লেখা সম্বন্ধে যারা তেমন
অবহিত নন, তাঁদের কাছেই ছত্রছোটো নিশ্চয়ই
অপরিচিত নয়। ছত্রছোটো এতই জনপ্রিয় যে, এটা
একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ কাব্য মস্তের অমর মহিমা লাভ
করেছে।

কবিতাটির ভাবগাম্ভীর্য বিলম্বিত পয়ার ছন্দ
ওজোধর্মী ভাষার গুণে যথার্থভাবেই রক্ষিত হয়েছে।
ও সুনির্বাচিত শব্দপ্রয়োগ এবং যুক্তাক্ষরের
প্রাচুর্য এই কবিতাটিতে লক্ষ্যণীয়। অথচ স্বামীজীর
কাব্যকৃতির মৌল বৈশিষ্ট্য—প্রকাশের ঘনবদ্ধতা—
এই কবিতাটিতেও নিশ্চয়ই বিজ্ঞমান।

তিন

স্বামীজী বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি
কেবলমাত্র ব্রহ্মের নিরাকার অস্তিত্বে সন্তুষ্ট হতে
পারেন নি। সন্তান আর নিষ্ঠুর ব্রহ্মবাদ তাঁকে
সমানভাবে আগ্রহ করেছিল। তাঁর রচিত গানে
যেমন অরূপ-সাধনার ইঙ্গিত আছে, তেমনই
‘শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন’ এবং ‘শিব সঙ্গীত’ গান
ছোটোতে তাঁর রূপমুগ্ধতার প্রমাণ পাই। শিব সঙ্গীত
গানটিতে তিনি লিখেছেন :

‘তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,

বম্ বব বাজে গাল।

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, ছলিছে কপাল মাল।

গরজে গঙ্গা জটা-মাঝে, উগারে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক ধক ধক মৌলিবদ্ধ ছলে শশাঙ্ক ভাল।

নিশ্চয়ই নৃত্যরত শিবের একটি অঙ্গুর চিত্র

পাওয়া যাবে এই কবিতায়। শব্দচয়নে যে বিবেকানন্দ চিত্রের আভাষ ফুটিয়ে তুলতে পারেন, গানটি তারই উজ্জ্বল প্রমাণ।

‘নাচুক তাহাতে শ্রামা’ কবিতাটি কিন্তু দেবী মহাকালীর নৃত্যবর্ণনা নয়। কবিতাটিতে স্বামীজীর বোধিদৃষ্টি আর বাস্তবদৃষ্টি এক আশ্চর্য সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। স্বামীজীর বাংলা কবিতাগুলোর মধ্যে গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে এটা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। আমাদের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এটা একটা সার্বক শাক্ত কবিতা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

কবিতাটিতে ললিত মধুর এবং রূঢ় কঠোর ভাব পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। বাঙালী শুধু অপক্লপ রূপ পীতবসন বনমালীর আরাধনা করে নি। তার সাধনায় মৃত্যুরূপা ভয়ঙ্করী কালীও দীর্ঘকাল ধরে, আসন পেতেছেন। কিন্তু বাঙালী ললিত মধুর ভাবের মাত্রাতিরিক্ত চর্চায় মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠতাকে হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্রৈব্যকে জয় করার সাধনাই বিবেকানন্দের একমাত্র সঙ্কল্প, তাই দগ্ধকার শ্রামার আরাধনা।

‘রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা
এলোকেশী।
উষা ধার, রুধির উদগার, ভীম তরবার খসাইয়ে
দেয় বাঁশী ॥
সত্য ভূমি বৃত্তজরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার
মায়ায় ছায়া।

করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়া ভেদ, অশ্বশ্বপ
দেহে দয়া ॥

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয়
দয়াময়ী।

প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস নগ্ন দিকুবাস, বলে মা
দানবজয়ী ॥

যথার্থ শক্তি সাধনার আদর্শ থেকে আমরা ভ্রষ্ট
বলেই আমাদের জীবনে এত দুর্গতি। স্বামীজী
আমাদের বীর্যের সাধনায়, মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে
আহ্বান জানিয়েছেন—

‘জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি
তোমার সাজে ?

হুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি
চিতা মাঝে।

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না
ডরাক তোমা।

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক
তাহাতে শ্রামা ॥

এটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। উপনিষদ সাহিত্যের একটি মাত্র শব্দে বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনাদর্শন বিধৃত—অভীঃ। নবজাগ্রত ভারতবাসীর হৃদয়ে এই অভীঃ মন্ত্র সঞ্চারই ছিল তাঁর কর্ম সাধনার মূল প্রেরণা। তাই উপনিষদ থেকেই তিনি তাঁর ধ্যান ও সংগ্রামের বাণী আহরণ করেছেন। তাঁর বারবার মনে হয়েছে, জাতিকে বীর্যের সাধনাতেই সজীবিত করে, তুলতে হবে। সেনিক

থেকে শক্তি বোধের রূপকল্পনাও তাঁর পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু শুধু শক্তিসংকল্প নয়, এই কবিতার অধ্যাত্ম বক্তব্যও আছে। বিবেকানন্দ দেখেছেন—

ফুল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে
আশেপাশে।

শুভ্র শশী, যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে
ধরা বাসে ॥

মুহুমন্দ মলয়পবন, যার পরশণ, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
স্রীদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল
দোলে।

এই সৌন্দর্য্য অবশ্যই সেই চৈতন্য সত্তার বা
মহাশক্তির বিকাশ। কিন্তু সেই মহাশক্তি শুধু
সৌন্দর্য্যেই বিবৃত নন। যুহুর্ন্তের মধ্যেই এই
সৌন্দর্য্য সেই শক্তির প্রতিফলনে ধ্বংসে রূপান্তরিত
হয়। ধ্বংসের মুহুর্ত্তেই সেই ঐশী আবির্ভাব
বিবেকানন্দ আশ্চর্য্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন :

মধুমন্ত্র কুলিশ-নিষন, মহারণ, ভুলোক ছালক-
ব্যাপী।

অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুকার শ্বসিছে বায়ু ॥
বগলিকি বগলিকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলী-
আলা।

ফেনময় গজি মহাকায়, উর্মি ধায় লজ্জতে পর্বত
চূড়া ॥

ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায়
বেগে ॥

চৈত্র '৮২-৪

সৃষ্টি অপার ধ্বংস, জীবন ও মৃত্যু এই
চক্রাবর্ত্তনেই সৃষ্টির অনন্ত প্রবাহে ধাবিত হয়। এক
মহাশক্তিই তাই হুম্মর আর বীভৎস উভয় রূপে
প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই মহাশক্তিই স্বামীজীর
দৃষ্টিতে মহাকালী। কিন্তু স্বামীজী কালীর মাধুর্য্য-
মণ্ডিতা, বরাভয়রূপের ধ্যান করেন নি। তাঁর উপাস্ত
দেবী ভয়ঙ্করী, ভীমরূপা, ধ্বংসের অধিষ্ঠাত্রী বিপুল-
দশনা।

বাঙালী শাক্ত কবিতায়ও শক্তির পটভূমি রচনা
করতে পারেন নি। তাই বিবেকানন্দ লিখেছেন :
ডাকে ভেরী, বাক্কে ঝরু ঝরু দামামা লুকাড়,
বীরদাপে কাঁপে ধরা।

ঘোষে তোপ বব-বব বোম, বব-বব-বম বম্বুকের
কড়কড়া ॥
ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত
আলামুখী।

এই কবিতাটি স্বামীজীর বলিষ্ঠ ভাবদর্শনের
চিরন্তন স্মারক হয়ে আছে। তিনি একবার
লিখেছেন : আসল কথা, ঐ কাপুরুষের চেয়ে পাপ
নেই ; কাপুরুষের উদ্ধার হ' না—এ নিশ্চিত। আর
সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে
আমার আর সম্পর্ক চলে কি?...এক বা খেলে দশ
বা মেড়ে মারতে হবে।

তাঁর এই বলিষ্ঠ আদর্শের যথার্থ রূপায়ন ঘটেছে
তাঁর বিভিন্ন সময়ের বাণী এবং লেখাতো
আলোচ্য কবিতাটিও সেই ভাবের বাহন হিসেবে
স্বরসী হয়ে থাকবে।

চার

‘গাই গীত শুনাতে তোমায়’ কবিতাটির প্রকাশ-ভঙ্গী কিন্তু অন্তরকম। স্বামীজীর উচ্চাঙ্গ এবং ভক্তিভাব সঙ্গীতমুখর ছন্দে রূপায়িত হয়েছে। এই কবিতাটির প্রকাশ রীতিতে তিনি যে গৈরিশ ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। ব্যক্তিগত ভক্তিভাব প্রকাশের জন্য তিনি অন্তরঙ্গ ভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন, এই ছন্দের প্রয়োগেই তা সম্ভব হয়েছে।

মহাযোগী শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন :

আহ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে।

সাধক-জীবনে বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ অমুচর। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় আভায় বিবেকানন্দের জীবন পথ নির্ধারিত হয়েছিল। তবু কণিকের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন স্বামীজী। পরিভ্রাজক অবস্থায় গাজীপুরে তিনি যোগীবর পণ্ডহারী বাবার কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন এক সময়। সহসা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বীয় গুরুদেবের অলৌকিক মূর্তি। করুণ নয়নে যেন সেই দেব শিশু বিবেকানন্দের দিকে চেয়েছিলেন অনেকক্ষণ। লাজ্জিত বিবেকানন্দ ভুল যুগ্মেছিলেন তখন।^২

সেই বিনম্র বিবেকানন্দই যেন আত্মপ্রকাশ

করেছেন নিম্নোক্ত ছত্রগুলোতে—

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে,
শিয়রে দাঁড়িয়ে তুমি রেতে,
নির্বাক অনন, ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পাঁয়ে ধরি,
কিন্তু কমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।

পুত্র তব, অস্ত্র কে সহিবে প্রপল্লভতা।

ক্রমে বিবেকানন্দ পৌঁছে গেছেন উপলব্ধির শেষ
প্রান্তে—

আমি আদি করি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত।

আমি করি খেলা শক্তিরূপা মন মায়া সবে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।

‘সাগরবন্দে’ কবিতার প্রাকৃতিক রূপচিত্রের মাধ্যমে স্বামীজী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সত্যতা ও সংস্কৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার যুরোপ যাত্রার সময়ে সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ‘অন্তর-রূপ’ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের উচ্চল জীবন-যাত্রার প্রতিচ্ছন্দে তিনি যেন ভূমধ্যসাগরের তীব্র-দীপাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। অথচ শান্ত সমাহৃতি

ভারতীয় জীবনই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশী করে।

তিনি দেখেছেন :

বহে বায়ু আপনার মনে,
প্রভঞ্জন করিছে গঠন—
কণে পড়ে, ভালে আর কণে—
কতমত সত্য অসম্ভব—
জড়, জীব, বর্ণ, রূপ, ভাব।

ঐ আসে তুলারশি সম।

কিন্তু বিবেকানন্দ জানেন তার পরে কি—

পরকণে হের মহানাগ,
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম,
আর দেখ প্রনয়ি যুগল;
শেষে সব আকাশে মিলায়।

নীচে সিদ্ধু গায় নানা তান;

মহীয়ান্ সে নহে, ভারত।
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার;
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।

সামুদ্রিক বর্ণনার পটভূমিতে তাঁর বক্তব্য নিশ্চয় কাব্যময় হয়ে উঠেছে অত্যন্ত স্বল্প আয়াসেই।

পাঁচ

সব দেশের, সব কালের কবিদের মতো
বিবেকানন্দও কাব্যকৃতিষে সমকালীন কাব্যরীতি-
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সেই জন্যই তাঁর কবিতায়
কখনো গিরিশচন্দ্র, কখনো মধুসূদনের কাব্যকৃতির

প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে বিবেকানন্দ
প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে অত্যন্ত সচেতন শিল্পী
ছিলেন। সেইজন্যই ভাব-অনুসারেই ছন্দ-কাঠামো
এবং শব্দনির্বাচনে তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন।
এদিক থেকে বিচার করলে, তাঁর সার্থকতা সম্বন্ধে
কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়।

‘নাচুক তাহাতে শ্রামা’ কবিতায় বিবেকানন্দ
মেঘমল্লশব্দে শক্তির আরাধনা করেছেন। তাঁর
ভাবাবেগ ভাবাপত্ত সংযমে যে সংহতি লাভ করেছে,
তা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা
দান করে। সংস্কৃত শব্দের পত্তীর বাঞ্ছনা এবং
ধ্বনি নির্বোধে কবিতাটা এক অপার্থিব ঐশ্বর্যে
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে,
মধুসূদনের পরে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ বীররসের
মেঘমল্লশব্দ আবার আমরা বিবেকানন্দের কণ্ঠেই
শুনতে পেলাম। ১০

অথচ গাই ‘গীত শুনাতে তোমায়’ কবিতায়
গৈরিশী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তার কারণ যে
ব্যক্তিগত স্মৃতি সঞ্চারন এই কবিতার মূল ভাব,
তাতে শব্দবাঞ্ছনা বা ধ্বনিগাঙ্গৌষ্ঠ্যের প্রয়োজন ছিল
না। সাগরবক্ষে কবিতাতেও এই সৃষ্টি সচেতনতার
পরিচয় পাই।

কবি বিবেকানন্দের মূল বৈশিষ্ট্য কাব্যকৃতির
ঘনবদ্ধতায়। এক এক সময় সংহত আবেগে কবি
যেন মল্লোচ্চারণ করেছেন মেঘমল্লশব্দে। সেইজন্য
মাঝে মাঝে এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন তিনি যা
ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রাখে। যেমন, ‘প্রাণসাকী

শিশুর ক্রন্দন.' 'স্বরময় পটত্রিনিচয়' প্রভৃতি। এই ধরণের অক্ষয়চরণে নিশ্চয়ই কবি প্রতিভার প্রতিকলন ঘটে।

কবিতা রচনায় বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই বিরলদৃষ্ট অসামান্যতা দেখান নি। তাঁর কর্মময় জীবনে প্রয়োজনীয় অনুশীলনের সুযোগ সত্যিই ছিল না।^{১১} আর বাংলা কাব্যক্ষেত্রে স্থায়ী কিছু সংযোজনের মানসিকতাও বিবেকানন্দের ছিল না।

তাঁর ক্ষেত্র আরো অনেক বড়। তাঁর সাধনা আরো অনেক ব্যাপক। তবু মাঝে মাঝে তিনি তাঁর অধ্যাত্ম বিশ্বাস আর জীবন সাধনার সূত্রগুলোর কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন। যে-কোনো সাহিত্য নিরিখেই সেগুলো সার্থক কবিতা হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। সব চাইতে বড় কথা, বিবেকানন্দের কবিতা-গুলি একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে থেকে যায়, আগে পরে রচিত কোনো কবিতার সঙ্গেই তাদের মৌলিক সাম্য নেই ॥

১. ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা, পৃঃ ১২০
২. ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ—আজকের বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ, পার্থসারথী, বিবেকানন্দ সংখ্যা।
৩. ডঃ অধীররঞ্জন দে—সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৪৪।
৪. ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ—বিবেকানন্দ ও বাংলা কবিতা, পৃঃ ১৭৫।

৫. ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য—বিবেকানন্দ স্মৃতি, পৃঃ ১৮৯।

৬. ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ—বিবেকানন্দ কবি-মণীষী, বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫।

৭. বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮০।

৮. নিবেদিতা লিখেছেন স্বামীজীর বাণী হলঃ
Worship the terrible! Worship death! All else is vain. yet this is not coward's love of death, not the love of the weak, or the suicide. It is the welcome of the strong man who has sounded every thing to his depths, and knows that there is no alternative—The Master as I saw Him—Complete works of Sister Nivedita, Vol I, p. 128.

৯. Swami Vivekananda on Himself p. 108.

১০. ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ—বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩৩২।

১১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—কবি বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ-স্মৃতি, পৃঃ ১৮৮।

বঙ্কিমচন্দ্র : একটি প্রত্যুত্তর

অভিজিৎ মজুমদার

['কুন্তিবাস' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা প্রসঙ্গে যে আলোচনা (বঙ্কিমচন্দ্র-বিরচিত কপালকুণ্ডলা বইটা কেমন? এখন, একশো বছর পরে, কী মনে হয়?) প্রকাশিত হয় সেই মতামত সম্বন্ধে অনেকেই একমত হতে পারেননি। অভিজিৎ মজুমদার তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, প্রত্যুত্তর বিলম্বে হলেও প্রাসঙ্গিক মনে করে প্রকাশ করা হল। মতামত লেখকের নিজস্ব। সম্পাদক, জয়শ্রী]

কুন্তিবাসের জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ সংখ্যায় শুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটির একটি আলোচনা গ্রন্থপরিচিতি বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। একজন আধুনিক ঔপন্যাসিকের চোখে শতাব্দীপূর্বের মহৎ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের রচনা কেমন লেগেছে জানার কৌতূহলে লেখাটিতে চোখ বুলিয়েছিলাম।

সমালোচক পভীরভাবে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটিতে আলোকপাত করে বলেছেন যে "উপন্যাসে মূল প্রশ্ন এই নয় যে মেয়েটি কাপালিককে ভালতে পারবে কিনা। তারচেয়েও বড় প্রশ্ন কাপালিক ঐ মেয়েটিকে ভালতে পারবে কিনা।" এই আবিষ্কারে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতেন সম্ভবত, লেখক বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। তুর্ভাগ্যবশতঃ এই লেখা তাঁর চোখে পড়লো না।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনায়

অবাস্তবতার অভিযোগই তুলেছেন সবচেয়ে বেশি। বিশেষতঃ চরিত্রগুলিতে। এ সমালোচনার জবাব নেই। শুধু কপালকুণ্ডলা কেন, সমগ্র বঙ্কিম-উপন্যাসই তো অবাস্তব; কারণ এর চলতি নাম রোমান্স।

বঙ্কিম 'কপালকুণ্ডলা' এই 'পরীক্ষণমূলক' উপন্যাসটি রচনা করতে সুদূর ষোড়শ শতকের আকবর-সেলিমের রাজত্বকালে ফিরে গিয়েছেন। 'বাস্তব' একটি যেহেতু অস্থির ও স্থিতিস্থাপক সেহেতু উপন্যাসটির চরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী কি না এ প্রশ্নে আমাদের উপন্যাসটির রচনা কালকে বিন্মুত হলে চলবে না। কিন্তু শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এই যুগকাল কে উপেক্ষা করে কপালকুণ্ডলার সমালোচনা করেছেন বলেই তাঁর চোখে কপালকুণ্ডলা অবাস্তব, মতিবিবি নিরাক্তকর।

আলোচনার ক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটিকে

ছ'ভাগে ভাগ করা যায়। কাপালিকের কপাল-কুণ্ডলা আর নবকুমার ও শ্রীমাসুন্দরীর মুগ্ধরী। অরণ্যসমুদ্রের অবকাশে প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে আকস্মিকভাবেই সাক্ষাৎ ঘটেছে নবকুমারের। কপালকুণ্ডলাই নবকুমারকে পথ দেখিয়ে, জনহীন সমুদ্রসৈকত থেকে আপাত সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে গিয়েছে, আবার একসময় কাপালিকের শাণিত খড়্গের সম্মুখ থেকেও রক্ষা করেছে। কোনরূপ সংসার ধর্ম বা বিবাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা হয়েও কপালকুণ্ডলা অধিকারীর নির্দেশে নবকুমারকে বিয়ে করে তার হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এই অংশে অমূলকতা কোথায়? কপালকুণ্ডলা এমন একটি নারী যার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমান আছে শুধু অভিব্যক্ত নরহত্যা এক কাপালিক আর সঙ্গী ক্ষণধির উদ্ভালতরঙ্গমালা, যে যোল বছর বয়সেও সমাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞা বলেই আরণ্যক প্রান্তরে একাকী সৌম্যকান্তি যুবাণুরূপ নবকুমারকে দেখে একবারও প্রণয়—সম্ভাষণ করেনি। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে শুধুই নিষ্পাপ এক রমণীর সহজাত স্নেহকোমল বৃত্তিসমূহই প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এরপর কপালকুণ্ডলা হয়েছে মুগ্ধরী। ঘটনাবর্তে নবকুমারের সঙ্গে গণ্ডিবদ্ধ হয়েছে সামাজিক গণ্ডিতে। তথাপি একবৎসর পরেও সে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তার স্বামী সঙ্গ ঘটেছে কিন্তু আসঙ্গ-লিপ্সা জাগেনি। এই নিরাসক্তির কারণ হিসেবে আমরা সাগরতীরের আকর্ষণ ও ভুবানীর নির্দেশের কথা উল্লেখ করতে পারি। দ্বীপ-

ভাগের অব্যবহিত পূর্বেই ভুবানী যে তার বিবরণ গ্রহণ করেননি তা কপালকুণ্ডলাকে বিবাহোত্তর জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে বারংবার সন্দেহান্বিত করে তুলেছে। এর সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ আছে কিনা তা আমরা আলোচনা করব না। কারণ এই ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে সম্ভাব্য বাস্তবতা অর্থাৎ আমাদের চোখে দেখা কোন কপালকুণ্ডলা উপস্থানের কপালকুণ্ডলার সমতুল আচরণ করতে পারে কিনা তাই লক্ষণীয়। অ্যান্টিস্ফটলের মতে যার মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই বা যার মধ্যে অস্তিত্বের সামান্য সম্ভাবনাটুকু আছে, তাকেই আমরা বাস্তব বলবো। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় আবার একজায়গায় কপালকুণ্ডলা চরিত্রের অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করতে ব্রাহ্মণবেশী লিখিত চিঠিরও উল্লেখ করেছেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের মতে একজন সামান্য অরণ্যবাসী কখনোই চিঠি পড়তে পারে না। কিন্তু সমালোচক বোধহয় বিস্মৃত হয়েছেন যে কথাসঙ্গমে কপালকুণ্ডলা একসময়ে শ্রীমাসুন্দরী কে বলেছে যে যথা 'নিষুস্তোহ স্মি তথা' করোমি। সুতরাং যে কপালকুণ্ডলা সংস্কৃতির গূঢ় সমাজদর্শন ব্যাখ্যা করেছে সে যে সামান্য একটি চিঠি পড়তে সমর্থ এটাই আমরা আশা করব।

মতিবিবির চারিত্রিক বিশ্লেষণ করে সমালোচক বলেছেন যে বঙ্কিম কর্মূলামতনই কপালকুণ্ডলার মত এক সরল নিষ্পাপ মেয়ের চরিত্র আঁকতে গিয়ে মতিবিবির মত এক ডানপিটে মেয়েকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে মতিবিবির যাবতীয়

মতিগতি ও কার্যকলাপ খুবই বিরক্তিকর।' এ সম্পর্কে আলোচনার অবসর আছে। শুধুমাত্র নারী চরিত্রই নয়—কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিম অত্যন্ত সংযত ও সচেতন ভাবেই এক একটি চরিত্রকে অপর এক একটি চরিত্রের পরিপূরক রূপে অঙ্কিত করেছেন। যেমন, কালিকাতাপস কাপালিক ও অধিকারী চরিত্র।

বর্তমানের কয়েকজন তরুণ সমালোচক মনে করেন বঙ্কিম প্রথম উপন্যাস 'হুর্গেশনন্দিনী'তে এক ঐতিহাসিক চরিত্রের রোমান্স দেখিয়েছিলেন বলেই দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে একটি ইতিহাস নির্ভর চরিত্রের রোমান্স দেখাতে উৎসুক ছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসে তাই মতিবিবির চরিত্র অধিকর্তর গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ নায়িকা হলেও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা-চরিত্র ইতিহাস নির্ভর নয়। ইতিহাস নির্ভর চরিত্র মতিবিবি।

কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির তুলনামূলক আলোচনার আকৃশ্যে একটা কথা অবশ্যই স্মর্তব্য, তা হোল কপালকুণ্ডলা বঙ্কিম লিখিত একটি পরীক্ষামূলক চরিত্র। নির্জন অরণ্যানীতে তাত্ত্বিক প্রতিপালিতা একটি অতীত-ভবিষ্যৎ শূন্য মেয়ের বিবাহোত্তর সামাজিক জীবনের পরিণাম দেখানোই ছিল লেখকের অভিপ্রেত।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের সমালোচনাটি পড়ে মনে হোল কাপালিকটি যে অকারণ সংস্কৃত-বহুল কথা বলেছে এতে তিনি বিরক্ত। কিন্তু সমগ্র কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটির যে স্বাভাবিক একটি

অংশ সমালোচককে আকৃষ্ট করেছে সেখানেও তো কপালকুণ্ডলা সাধারণ কথা ভাষাকে বর্জন করে অর্চলিত সাধু গাঢ়েই নবকুমার কে বলেছে—'পৃথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?'

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় যদি আলোচ্য উপন্যাসটিকে মনোযোগ সহকারে পড়তেন তাহলে যে সকল ক্রটি কে তিনি খুব বড় করে দেখিয়েছেন সেগুলি আদৌ ক্রটি বলেই মনে হোত না। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন যে কাপালিকটিতে মদ কিনতে শহরে আসতে হোত। কিন্তু বঙ্কিম তো উপন্যাসের শেষভাগে বলেছেন যে "ঐ সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্ত প্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা।"

প্রবন্ধের পরিশেষে একাধিক উপন্যাস বিশ্লেষণ করে সমালোচক আমাদের দেখিয়েছেন যে বঙ্কিম-সৃষ্ট উপন্যাসগুলির নারীরা প্রায়ই রাতের অন্ধকারে ঘর ছাড়া হয়েছে, এর মূলে রয়েছে বিদেশী লেখকদের প্রভাব। প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে উপন্যাসের কাঠামো ও অশ্রাব্য ধর্ম সম্পর্কে সমাক অভিজ্ঞ হ'তেও স্কট প্রভৃতি বিদেশী উপন্যাসিক দের রচনা পড়তে হয়েছে। তাই তাঁর রচনায় স্বাভাবিকভাবেই বিদেশী চরিতাদর্শ, situation তৈরির ও পরিবেশগত চিত্র দেখতে পাই। কিন্তু বঙ্কিমতো সংস্কৃত গ্রন্থাদিও পাঠ করেছেন যেখানে শ্রীরাধিকা নৈশাভিসারে গিয়েছেন। কপালকুণ্ডলা নামটিও ভবভূতর সংস্কৃত নাটক 'মালতী মাধব' থেকে সংগৃহীত এবং আলোচ্য

চরিত্র কালিদাসের শকুন্তলার ছায়াও পড়েছে যথেষ্ট।

কাহিনীর অন্তিম পর্বে কপালকুণ্ডলা যে একাকিনী অরণ্যমধ্যে গিয়েছে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় তাকে ‘অসম্ভব ও অবাস্তব’ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন যে অরণ্য মধ্যে একাকিনী নিশীথ ভ্রমণে অভ্যস্তা কপালকুণ্ডলা উপলব্ধি করতে পারেনি যে নিশ্চিন্তে শহরের একটি সজ্জীনা কুলাবধূর ঘরের বাইরে যাতায়াত দৃশ্যীয়। এখানে কাহিনীকার যদি সামাজিক রীতি নীতিতে অভ্যস্তা শ্রামশূন্যরীকে একাকিনী রাত্রি ঐ আরণ্যক প্রান্তরে ঔষধ আনতে পাঠাতেন তবেই উপজ্ঞাসটির স্বাভাবিক ধর্মচ্যুতি ঘটতো সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমকে সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক, কিন্তু বঙ্কিম অমুজ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। কপালকুণ্ডলার পরিণতি কি হ’বে বঙ্কিমের এই জিজ্ঞাসার সঞ্জীবপ্রদত্ত উত্তরটি বিশ্লেষণ করে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে ‘সঞ্জীবচন্দ্রের ফ্রেড প্রীতি ছিল না!’ কিন্তু ‘সঞ্জীবচন্দ্রের ফ্রেড প্রীতি’ থাকবে কি করে? ফ্রেডীয় তত্ত্ব তখন কোথায়? ফ্রেড তো তখন ন.দশ বছরের শিশু মাত্র।

পরিশেষে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে বিনীত নিবেদন যে স্বকপোল-কল্পিত কপালকুণ্ডলাকে কিছুকালের জন্য বিজ্ঞান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পাঠকের পদ গ্রহণ করান তাহলে আর উপজ্ঞাসটিকে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনা পূর্ণ ব্যর্থ বই বলে মনে করতে হবে না।

জয়ন্তীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মডাক ১২.০০। ষাণ্মাসিক ৬.০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বপ্রথমে দেওয়া হয়।
২. লেখা পরিকার হরকে ফুলফাপের একপৃষ্ঠার লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
৩. কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।
৪. রচনা করণ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্তী

অফিস : ২০ এ, প্রিন্স গোলাদ মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬

শরৎচন্দ্র

[শততম অধ্যায়]

ডাঃ রামকৃষ্ণ চন্দ্র

দীন, হুঃখীর দরদী বন্ধু
ভূমি-যে শরৎ চন্দ্র,
দৃষ্টি তোমার খুঁজেছে নিয়ত
সমাজের কোথা রক্ত !
খুঁজেছে কেবলই কোথা সে পতিতা
কোথা-যে নির্ধারিততা ;
এদেশেতে হয় নীরবে কোথায়
আছে নারী নিপীড়িতা ?
লেখনী ধরিয়৷ সদা জাগ্রত,
নয়ন ছিল অতন্দ্র ।
দীন-হুঃখীর দরদী বন্ধু
ভূমি যে শরৎচন্দ্র ॥
'রমার' হুঃখ, 'বায়ু' নর মেয়ে'
অশ্রু ক'রেছে সজল,
'দেবদাস—পারু' প্রেমের স্বর্গ—
গ'ড়েছিল এক ভাঙ্গমহল ।
'অন্নদাদিদি,' 'ইন্দ্র,' 'শ্রীকান্ত'
হারাবেনা কোন কালে,
বিভ্রত কভু হ'নি 'কমল'
'শেষ প্রহর'র জালে ।

স্নেহ-প্রেমময়ী 'বড়দিদি' যেন
নিত্য নতুন সাজে,
আমাদের-ই দেশে ঘরে ঘরে আজও
অন্ধান হ'য়ে রাজে ।
বিস্তার লোভে 'বিজয়া'-চিত্তে
ভিড়িল 'বিলাস'-খেয়া,
ফিরালো সে তারে—হৃদয়ের ধন,
যায় না সগারে দেয়া ।
'গৃহদাহ' ক'রে 'অচলা' কৈদছে
সেতো 'অভাগী'র স্বর্গ,
'প্রিয়দর্শিনী'র 'বন্দনা' হ'নে
আপন হৃদয়ে ঝড়ো ।
'দেনা-পাওনা'র সীমানা ছাড়ায়ে
'গফু' ভ'রোছে মন,
'বিন্দু-অমূল্য,' 'নারায়ণী-গাম'
রচে নব রামায়ণ ।
'চিত্রিত্তী'র 'চৈতন্য' হীন চ'িত্র,
কোথাও খুঁজে না পাই,
'শেষের পরিচয়'র তোমার
তুলনা কোথাও নাই ।

নীচুর মাঝেও উচু মন আছে
 দেখায়ে তো ব'রে বারে,
 কু-সংস্কারের সংস্কার লাগি'
 খুলেছা আলোর দার ।
 রাজার শক্তি চূর্ণ করিতে
 ধরো নাই হাতে অগ্নি,
 বজ্র-কঠোর হস্তে ধ'রেছো
 কঠিন লেখনী-মসী ।

দিশাহারা সেট অগ্নি-যুগেতে
 রেখেছা 'পনের দাবী,
 'সবাসাচী'র গোপনে দিয়েছা
 গোপন ঘরের চাবি ।
 আছে, আছে আরও কত চরিত্র—
 ভাগে ও ধর্মে নিবন্ধ ।
 নির্মেষ নভে চির ভাস্বর—
 অমর শরৎচন্দ্র ॥
 ২১শে জানুয়ারী ১



লক্ষ্য

সুমনস্তু গুহ

আমি অস্থির,
 আমি চঞ্চল,—
 আমি নিভৃত,
 আমি দিশাহারা—
 চাই হতে শাস্ত,
 হতে চাই ধীরস্থির,
 চিন্তাই মোর কামা,
 পাই তাত্ত লক্ষ্য ।

বর্তমান প্রসঙ্গ

প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী

৮শে মার্চ জন্মুতে এক বিরাট জনসভায় যে কোনো সময় দেশের বাইরে থেকে সবার সম্ভাবনা সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন : 'বাইরের চোখ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে আমরা মনে মনে বিপদ একদিক থেকে আসতে পারে। এখনো 'দিক থেকে—পাহাড়, সমতল ভূমি, —এই বিপদ আসতে পারে।'

আণবিক বোমার আতঙ্ক

আণবিক বোমা উৎপাদনের সঙ্গে কোনো ভাবে সংশ্লিষ্ট চারজন ব্যক্তির নামে বিজ্ঞানী বৃহৎশক্তি-বর্গের মধ্যে আণবিক বিক্রয়ের প্রতিযোগিতায় উদ্বেগ প্রকাশিত। গত ৩০শে মার্চ লন্ডন থেকে সংবাদটি এসেছে। তারা বলেছেন আগামী দশ বছর মধ্যে আণবিক শক্তি উৎপাদনের প্রসারতার ফলে টোনিয়াম তৈরী হবে—যা আণবিক বোমার অপরিহার্য জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হবে। বর্তমান উন্নত প্রযুক্তি বিজ্ঞানের পরিসরে প্লুটোনিয়ামই একটি আণবিক বোমা

তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট। এঁদের মতে আগামী কয়েক-বছরের মধ্যে আণবিক শক্তি-উৎপাদক চুল্লীতে অল্পতঃ হিরোমিমা নাগাসাকিতে নির্মিত আণবিক বোমার আকারের দশহাজার আণবিক বোমা তৈরীর প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হবে। এই বিজ্ঞানী চতুষ্টয় আরো বলেছেন তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির কাছে আণবিক বোমা মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় কৃষিকমিশন

সম্প্রতি জাতীয় কৃষিকমিশন তাদের ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৮৫ সালে ভারতবর্ষের খাদ্যপরিবাহিত 'আতঙ্কজনক' হবে। এই শতাব্দীর মধ্যে ভারত খাদ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

১৯৮৫ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে ১৫ কোটি ১০ লক্ষ টন থেকে ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ টন। ২০০০ সালের মধ্যে খাদ্যের উৎপাদন হবে ২০ কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টন।

এই শতাব্দীর মধ্যে মাছের উৎপাদন বছরে ৮০ লক্ষ টন করতে হবে।

২০০১ খৃষ্টাব্দে ভারতের গ্রামীণ শ্রমজীবীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২৫ কোটি। ১৯৭১ সালে শিশুদের বাদ দিয়ে, এই সংখ্যা ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ। কৃষি শ্রমিকদের ৩০ শতাংশকে গ্রামের কৃষি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান দিতে হবে। ভারতের জনসংখ্যা ১৯৭১ সালের ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০০০ সালে ৯৩ কোটি ৫০ লক্ষ হবে। কৃষিক্ষেত্রের রিপোর্টে কৃষি ও ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-শ্রমিক

গত ১৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় 'Labour in West Bengal', 1970 পঃ বঃ সরকার প্রকাশিত পুস্তিকাটি সদস্যদের হাতে দেওয়া হয়। পঃ বঙ্গের কৃষি-শ্রমিকদের সম্পর্কেও নানা তথ্য এই পুস্তিকাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পুস্তিকা থেকে জানা যায় পঃ বঃ কৃষি-শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু দৈনিক গড় আয় ৩৭ পয়সা। কৃষিপরিবারের সদস্যসংখ্যা গড়ে তিন-চার জনের মত। একজন কৃষি-শ্রমিককে তিন চার জনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। এরা একবছরে ১৫০ থেকে ১৭০ দিনের কাজ পায়।

১৯৬১-র সেন্সাস থেকে ১৯৭১-এর সেন্সাসের মধ্যে পঃ বঙ্গের কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৮২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ তে রাজ্যের শ্রমিকদের শতকরা ১৫.৩০ ভাগ ছিল কৃষিশ্রমিক। সেটা

বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১-এ হয়েছে শতকরা ২ এই দশ বছরে চাষীদের সংখ্যা কমেছে তারা ছিল রাজ্যের শ্রমিকদের শতকরা ১ ১৯৭১ সালে কমে হয়েছে শতকরা ৩১ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জমি হস্তান্তর এই সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ! কৃষি শ্রমিকদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ মজুরির তুলনায় কৃষি-উৎপাদনের অনেকগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলতে শ্রমিকরা 'সবুজ বিপ্লবের' সামান্য সুযোগ মাত্র।

চাল-গম সংগ্রহ

এবার গোটা ভারতে ৬০ লক্ষ টন চাল হবার আশা রয়েছে। চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টন। ৩০ শে মার্চে লক্ষ টন সংগৃহীত হয়ে গেছে। ১৯৭১ রেকর্ড করা চাল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার টন। বর্তমান সংগ্রহ শতকরা ৩১ ভাগ বেশী সংগ্রহ হই গেছে।

গমের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ১০ টন। কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন সাধারণ সংগ্রহমূল্য ১০৫ টাকা কুন্টাল বৈধে গমের দাম এর চাইতে কমে গেলে, সরকারি গম কিনে নেবার ক্ষমতা বাতিল প্রদত্ত রেখেছেন।

বর্তমান প্রসঙ্গ

চীনের নূতন প্রধান মন্ত্রী

১৯৫৫ সালের ৭ মার্চ ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা
৭ বছর প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকে
ত্যাগ করলে তার স্থলাভিষিক্তি নির্বাচনের
১৯৫৭ সনদে বিশিষ্ট শ্রমিকদলের জেনারেল
পররাষ্ট্র মন্ত্রী), মাইকেল ফুট (কর্ম-
(), ডেনিস হিলি (অর্থ-মন্ত্রী), রয়
রাষ্ট্র মন্ত্রী) টনি বেন (শাস্ত্র মন্ত্রী) ও
— এম্বলী ফ্রসল্যাণ্ড। শ্রমিক দলের
— ১য় শতকরা ৫০ ভোটের বেশী না পেলে
থাকে জয়ী ঘোষণা করা যাবে না।
বার ভোট নিয়ে নেতৃত্বের মীমাংসা
২ প্রথম বার মাইকেল ফুট ৯০, কালাঘান
— কস ৫৬ টান বেন, ৩৭, ডেনিস হিলি
— ফ্রসল্যাণ্ড ১৭ ভোট পান। দ্বিতীয়বার
৪১ মাইকেল ফুট ১৩৩, হিলি ৩৮
তৃতীয় ব্যালটে কালাঘান ১৭৬,
১৩৭। কালাঘান নেতা নির্বাচিত
জাবেথ বর্ডার মন্ত্রীসভা গঠনে আজ্ঞিত

ম সিহানুক-এর পদত্যাগ

ম্বোডিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি নরোদম
এই এপ্রিল রাষ্ট্রপতির পদ
এবং উপপ্রধানমন্ত্রী এবং ফেমর
— খিউ সাম্পান রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ

চীনের দ্বন্দ্ব

চীনের আদর্শগত দ্বন্দ্ব কোন দিকে পরিণতি
নেবে তা বোঝা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে।
মার্চের মাঝামাঝি অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জুয়া কুয়ো-
ফেং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে 'পুজিয়াদৌ পণ্ডিত'দের
বিক্রম তত্ত্ব আক্রমণ—য আক্রমণের পেছনে স্বয়ং
মাও সে তুং-এর সক্রিয় নেতৃত্ব সম্পর্কে পিপলস
ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট বিপ্লবীরা নিঃসন্দেহ করেছে
— চীনের দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করবে না।
এ-ছাড়া উচ্চতর মহল থেকে নানা নীতি-নির্দেশক
বিধি আরোপ করে আন্দোলনকে শাস্তিপূর্ণ রাখতে
উৎপাদনের এবং প্রতিরক্ষার পক্ষে কোনো অতিবন্ধক
সৃষ্টি না করাতে বলা হয়েছিলো। চরমপন্থীরাও
তাদের সমর্থকদের রাস্তায় হাজির করতে ব্যর্থ
হয়েছিলো। কিন্তু গত ৫ই এপ্রিল একদল চীনা
জনতা তিয়েন মেন স্কোয়ারে চু-এন-লাই-এর
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিপত্রের ক্ষণে সমবেত
হলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের সংবাদ
প্রকাশিত হবার পর চীনে ক্ষমতার লড়াই
এক নতুন মোড় নিচ্ছে অসুস্থ মান করা যেতে
পারে। বিক্ষোভকারী জনতা সেনাবাহিনীর জীপ
গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রেট হলের
দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। নিরাপত্তা
বাহিনী চু-র স্বতন্ত্র স্বাধীন কাগজের মালা
টেনে ছিঁড়ে ফেললে উত্তেজনা নাকি আরও বৃদ্ধি
পায়। জনতা-সেনা সংঘর্ষ বাধে। পিপলস
ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট বিপ্লবীরা

৬১৬ জয়শ্রী, চৈত্র ১৩৮২

মাও-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। পরে শত শত বিকোভকারী-দের গ্রেপ্তার করা হয়। পিকিং-এর মেয়র নাকি বলেছেন মাও-এর সঙ্গে তেং-এর কুমতার লড়াই-এর সঙ্গে এই এশিয়ার পিকিং-এর রাজপথে জনতা-সেনা সংঘর্ষের সম্পর্ক রয়েছে। বিকোভকারীদের মধ্যে তেং-এর সমর্থকও ছিল এবং জনতার একাংশও চু-এর স্বাতির প্রতি আকাঙ্ক্ষী। এ যাবৎ ১৯৬৬র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মত 'রেড গার্ডের আবির্ভাব' হয় নাই। পিপলস ডেইলী 'রেড গার্ডের বর্তমান সংঘাত থেকে ইতিপূর্বে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1981

Advertisement Rate Schedule

[From June, 1975]

Ordinary

Full Page :	Rs. 250.00
Half Page :	Rs. 150.00
Quarter Page :	Rs. 80.00
Special Position :	15% extra

Cover Page

Second Cover :	Rs. 350.00
Third Cover :	Rs. 400.00
Fourth Cover :	Rs. 600.00

For Special Position contact *Advt.*
Jayasree.

Advertising Space 20.5Cm x 15
(8" x 6")

Contact

Manager, Jayasree

Office : 20A Prince Golum Md.

Calcutta—26

Phone : 46-1701

জয়ন্তী বর্ষসূচী

৪০ বর্ষ। বৈশাখ—চৈত্র। ১৩৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাবীরের নির্বাণ পঞ্চাংশ		অনিলকুমার চন্দ	সামান্য তিনটি ঘটনা ও	
শতবার্ষিকী (প্রবন্ধ) ১২			অসামান্য একটি লোক	
মুক্তিবাদ : পুনশ্চ চিঠি ২৭৫			(স্মৃতিচারণ) - ৪৬৩ -	
চিরঞ্জয়ী আত্মার শক্তি ৭০		অভিজিৎ মজুমদার	বঙ্কিমচন্দ্র :	
ব্যসুধ সেন			একটি প্রত্যুত্তর ৬৩৭	
নেতাজী স্মৃতি		আগমনী জাহিড়ী	শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য	
(নাট্যোক্ত ইতিহাস)			(আলোচনা) ৪৫৬	
১০৫, ১৫৩, ১৯৬		আরতি গঙ্গোপাধ্যায়	নারীত্ব ও ব্যক্তি	
অনু-পারসান ১৭৮			(আলোচনা) ৫৮৯	
চীনের চতুর্থ পিপলস্		আর্যদেব	রিলকে জন্ম	
কংগ্রেস (সমীক্ষা) ২১৪			শতবর্ষ : ১৯৭৫ ৫৩৭	
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম		আমাদের কথা	৩৩৭	
২৫৪			ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ	
রুশ-চীন দ্বন্দ্ব			ইণ্ডিয়া ৪৮৬	
(পারাবাহিক প্রবন্ধ)		কালীচরণ ঘোষ	আইন ও সমাজ সঙ্কার	
৩৪৪, ৩৮২, ৫১৪			৩৬৩, ৩৯৭	
৫৬২, ৬১০			Subhas Bose's English	
গায় বন্দোজবনের চিঠিপত্র ২৬১			Composition &	
দিদি (প্রবন্ধ) ৩৪০			humour	
শশুপ্ত বয়েসটি ২১			(ইংরাজী প্রবন্ধ) ৪২৯	
(কবিতা) ২৮৮		কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	একমাত্র তখনই	
গী পৌরুষ (গল্প) ৩১০			(কবিতা) ৫৬	
জীবনের আয়না (গল্প) ৫৪১			ছবি (কবিতা) ২৮৬	

বর্ষসূচী

৪০ বর্ষ। বৈশাখ—চৈত্র। ১৩৮২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়
কৃষ্ণ	আমার কবিতা (অমুবাদ) ২৮৯		দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	জৈকে
	মূল : কোত্রাক তাকায়রা			আলো থেকে
কণেশ্বর ঘোষাল	ভারতের জাতীয়তা ও স্বভাষচক্র (প্রবন্ধ) ১১৫, ১৬১, ২০৩, ৩৫১, ৪০৫		নন্দলাল মুখোপাধ্যায়	Subhas Ch
	স্বাধীনতার স্বরূপ ও স্বভাষচক্র (প্রবন্ধ) ৪৬৯			Bose an
	দাদার জীবন পূর্ণতার সাধনার জীবন			Arab F
	(প্রবন্ধতর্পণ) ৫২৫		নরেন সরকার	Move
গোপাল ভৌমিক	কামনা (অমুবাদ কবিতা)			(ইংরাজী)
	মূল : পদ্মা সচদেব ২৮৬		নটিকেন্তা ভরদ্বাজ	তীর্থপথে (বাংলা)
চারণিক	'প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর' ৫ 'দিন আগত ঐ' ২৬৫ 'দিবস রঞ্জনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি'		নির্মল সেনগুপ্ত	বিল্লপত
কোতিরিস্ত্রনাথ মজুমদার	ডক্টর সর্বপল্লী			শ্বেতপদ্ম : দেশ
	রাধাকৃষ্ণণের সান্নিধ্যে ২০৫		নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ	লীলারায়কে
উষরধারী	সেদিন শারদ স্বচ্ছ প্রভাতে (সত্যঘটনা অবলম্বনে) ১২১, ১৬৯, ২১১, ২৪৯			(ক)
দেবদাস জোয়ারদার	বই পড়া ও বই পাড়া (প্রবন্ধ) ৩৩		নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত	নিরবধি প্রাণে
				(
				ভারতীয় জী
				(আলোচ
				গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ
				(সমা
				সাগর-ভারতী
				(একটি স্ব
				কবিতা (আ.লা

বর্নমালা

৪০ বর্ষ। বৈশাখ—চৈত্র। ১৩৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘোষা	একটি বিশ্বদিক্‌লয়ের অর্থ (আলোচনা) ৩৫	মজুমদার দাশগুপ্ত	ঐশ্বর্য (কবিতা) .	১৩৫
	শেষ ও অশেষ (আলোচনা) ৪৭৭		না বলা (কবিতা)	২৪৫
দেশ সরকার	নরেন গোস্বাই যেদিন রাজসাক্ষী হলেন (বিপ্লবী যুগের এককলক) ২১, ১৪৫, ১৮৯, ২২৭, ৩৮৮	মানস রায় চৌধুরী মিহির মুখোপাধ্যায় মানসী দাশগুপ্ত অধ্যাপক রাখাল দত্ত	ঐতিম্য কোথায় (কবিতা)	২৯১
দত্ত	রোগশয্যায় (কবিতা) ৫৭৫		গবেষণা (কবিতা)	২৮৭
সঙ্গ	আপৎকালীন সরকারী ঘোষণা ১৩০, ১৭৪, ২৪৫, ৩৭৭, ৪১৭, ৫২৭, ৫৪৭, ৫৯৩, ৬৪৩	রমেন্দ্রলাল রায় রামকৃষ্ণ চন্দ্র রাধারানী দেবী	অলৌকিক (গল্প)	২৯৫
১৭	প্রাকৃত (কবিতা) ১৩৪		সোনালী মাহ (গল্প)	৩১৬
	অন্ততঃ প্রণাম (কবিতা) ২৮৯		চীনের কৃষ-অভিজ্ঞতা ও সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য (ঐবন্ধ) ১৭, ২৯, ১৬৫	
দত্ত	বিশ্বস্ত দশকের স্মৃতিতে (কবিতা) ১৩৫	রাজবিরজেন দাশগুপ্ত	ভারত পবিত্র (কবিতা)	৫০৬
	সীমারেখা (কবিতা) ২৯২		শরৎচন্দ্র (কবিতা)	৬৪১
১৮	অবস্থা (গল্প), ৩০৪		শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র (স্মৃতিচারণ)	২৭৩
	দোকানদার (গল্প) ৬২৩		পরশমণির সন্ধানে (ঐবন্ধ) ২৮২	
গুহ	বর্মযাগী অধ্যাপক (প্রজ্ঞাবর্ধ) ৫৭৭	কচিরা মুখোপাধ্যায় অকেজো (গল্প)		৩০৭
১৯	সুভাষচন্দ্র তৃতীয় খণ্ড ৫৮৯ (পুস্তক পরিচয়)	লক্ষ্মীধর সিংহ	পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাশিল্পের ক্রমবিকাশ (ধারাবাহিক ঐবন্ধ) ৮৩, ১৩৭, ১৮৩ ২২২, ৩৪৬, ৩৮৮	
		শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	ভারতবর্ষ বিষয়ক (কবিতা)	৫৭
			মুঠো খুলে যায় (কবিতা)	১৯০

বর্ষসূচী

৪০ বর্ষ। বৈশাখ—চৈত্র। ১৩৮২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক	বিষয়
	কবিতাগুচ্ছ	৩৭৫	সমদর্শী	পুস্তক পরিচয় ৬৬
	টমাস ম্যান : জন্মশতবার্ষিক		শুভাষচন্দ্র বসু	অজ্ঞাত ভাষণ ও রচনা (সংকলন)
	ভাবনা ৩৯৫			
	রিলকের কবিতা		সম্পাদকীয়	ছাড়ো ডাক হে রুদ্ৰ
	(অনুবাদ কবিতা) ৫৩৯			বৈশাখ
শচীন্দ্রনাথ বসু	খোলা জানলা			সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
	মূল : সানী			এই স্বাধীনতা কেন?
	(অনুবাদ গল্প) ৩২৭			শহাদ অমল দাস
শান্তশীল দাশ	আমার ঐশ্বর্য তুমি			(স্মৃতি তর্পণ)
	(কবিতা) ৫৮			সমসাময়িক দৃষ্টিতে
	চিঠি (কবিতা) ৭৩৫			শুভাষচন্দ্র
	জয়ন্ত শূভাষ জয়			Struggle Still Sa
	(কবিতা) ৫০৫			(ইংরাজী)
শিবদাস চক্রবর্তী	গণজীবনের আদিকণকার		হুমন্ত গুহ	লক্ষ্য (কবিতা)
	শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ) ৩৩১		হিরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের জীবন
সাগরিকা ঘোষ	সমাজ দিল্লিতে নারীর			তত্ত্ব (আলোচনা)
	ভূমিকা (আলোচনা) ৫৩২			বৈদিক সমাজে না
অনীল দাস	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়			(২)
	অসমাপ্ত বিপ্লবের সমাপ্তির		হরিদাস কর	কীর্তন শাস্ত্রীয় সঙ্গী
	এক ধাপ (সমীক্ষা) ২২			পর্যায়ভুক্ত কী (২)
জিজ্ঞাসু কুমার মুখোপাধ্যায়	পুষ্ক.ষা.গ্রন্থ (কবিতা) ৫৫		এইচ. ভি. কামাথ	Netaji : Philoso
	স্বরসিক আশ্রমিক			Soldier and State
	(রস রচনা) ২৭৮			(ইংরাজী প্রাথমিক)



124 APR 1955

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

দ্রুগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ	লেখক ত্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ
র শ্রেষ্ঠ সংস্করণ) ১৫'০০	ব্যায়ামে বাঙালী ৮'০০
৭'০০	বীরহে বাঙালী ৩'৫০
গবত ধর্ম ১০'০০	বিজ্ঞানে বাঙালী ৫'৫০
বাণী ৭'৫০	বাংলার ঋষি ৫'০০
Idia Speaks ৭'৫০	বাংলার বিদুষী ৩'৫০
১'৫০	বাংলার মনীষী ২'৫০
শিক্ষা ১'৫০	রাজর্ষি রামমোহন ৩'০০
৫'০০	মৃগাচার্য বিবেকানন্দ ৩'০০
ঘোষ এম. এ. বি. টি.	আচার্য জগদীশচন্দ্র ৮'০০
৩'০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ২'৫০
গুচ্ছ ৩'০০	ববীন্দ্রনাথ ৩'০০
মিনাথ বিশ্বাসের	জীবনগড়া ১'০০
৩'০০	ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪'০০
১ম, ২য় খণ্ড প্রতিখণ্ড ৩'৫০	(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান
৩'০০	৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত বঙ্গল পরিবর্তিত
১০'০০	সংস্করণ)
১০'০০	শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী
নাটক ২'০০	সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী ৬'০০
৪'০০	
আয়রনম্যান নীল সরকাবের	
ব্যায়াম রোগ	শরীর ও শক্তি ৩'০০
৫'০০	সরল যোগ ও ব্যায়াম ৩'০০
মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৩'০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন ৩'০০
ব্যায়াম ও আসন ৩'০০	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট প্রতিটি ১'০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী	: : ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা - ১২

24 APR 1976



পুনঃ
অভি

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সহ
আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভূত একটি বিশেষ প্র
ক্রান্ত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিক
দ্রুতি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন এক
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ
শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ আস্থা
কিমে আসে এবং
অভি প্রত্যাহারের মধ্যে
দ্রুত জরাজীর্ণ শরীর
দেখে মৃত্যু সঞ্জীবনী
শক্তি সঞ্চারিত হয়।



সাধনা মৃত্যুসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিস্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেবিকা)। ভাগলপুর
কলেজের বসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব প্রফেসর।



কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. (কলি)
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী

চাখের চামচে ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিস্টের সঙ্গে
২ চামচ মৃত্যুসঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যাহ দু'বার আত্মাবেব
পর্ব সেব্য।



Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 1.00 with Regt
Rs 1.70 : 20-A, Prince Golam Md Road, Calcutta-26. Phone : 4

সম্পাদক : প্রবীণ দাস